নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৩

সম্পাদনা :
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

মুদ্রক :
বংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২, নরেন সেন স্কোয়ার, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :
রূপায়ণ
কলকাতা-৫

সূচীপত্র

উপন্যাস :

গল্প ও কাহিনী :

স্মৃতি চিন্তা :

উপন্যাস

চেনা মহল

উৎসর্গ

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

বন্ধুবরেষু

বৈঠকখানা ঘরের বড় ঘড়িটা একটানা বেজেই চলেছে—ঢং ঢং ঢং ঢং। ও মা, আরো যে বাজে। আবার বুঝি আগের মত বিগড়েছে ঘড়ি। বারোটা না বাজবার আগে আর থামবে না। কিন্তু এদিকে বাইরের অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। ভুবনময়ী শিয়রের জানালা দিয়ে একবার তাকিয়েই তা টের পেলেন। ভোর হয়ে এল বলে। চারটে নাকি সাড়ে চারটেই বাজল। কিন্তু ঘড়ির বাজনার শব্দে তা বুঝবার জন্যে ভুবনময়ীকে ঘড়ির দিকে তাকাতে হয় না। ঘড়ির শব্দে কানও পাততে হয় না তাঁকে। সময় তিনি অমনিতেই টের পান। ঠিক তিনটের সময় রোজই তাঁর ঘুম ভাঙে। আজও তাই ভেঙেছে। ঠিক যা ভেবেছেন। বারো বার শব্দ করবার পর ঘড়িটা থামল। আবার মাসখানেক হল বিগড়েছে। বাড়িতে এত লোক। কিন্তু এ ঘড়ি তেমন ভালো করে মেরামত করবার দিকে কারো ঝোঁক নেই। এ ঘড়ির জন্যে তো কেউ অপেক্ষা করে না। জনে জনে ছেলে-বুড়ো অনেকের হাতেই এখন ঘড়ি হয়েছে। তারা সেই হাত-ঘড়ি দেখেই কলেজে যায়, অফিসে যায়।

দেওয়াল ঘড়ির দিকে কারো তাকাবার দরকার হয় না।

ছেলে বৈদ্যনাথ বলেছিল, 'মা, এবার ঘড়িটাকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলি।'

ভুবনময়ী বলেছিলেন, 'সরিয়ে ফেলবি কেন। সারিয়ে আন।'

বৈদ্যনাথ বলেছিল, 'কতবার সারালাম! ও আর ঠিক হবে না।'

ভুবনময়ী জবাব দিয়েছিলেন, 'না হয় না হল। তবু ও ঘড়ি ওখানেই থাকবে। খবরদার ওতে পাছে হাত দিস। ও তাঁর হাতের জিনিস।'

ছেলে তা জানে। তাই আর কোন কথা বলে নি।

কর্তার নিজের হাতে কেনা ঘড়ি। সেই থেকে আজ কুড়ি বছর ধরে ওই একই জায়গায় ঘড়িটা রয়েছে। তাঁর হাতের জিনিস কেবল কি ওই ঘড়ি। বাড়ি ভরেই তো তাঁর জিনিস ছড়ান।

জিনিস পড়ে থাকে। শুধু মানুষ থাকে না।

ভুবনময়ী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। কতকাল হয়ে গেল চলে গেছেন। যাওয়ার আগে বলেছিলেন, ভেবো না, তোমাকেও দু-দিন বাদে টেনে নেব। ওগো, এই বুঝি

তোমার দু-দিন। যুগ-যুগান্তর হয়ে গেল যে। আর কতকাল ফেলে রাখবে, আর কতকাল ভুলে থাকবে।

কিন্তু ভুবনময়ী নিজেও কি ভুলে থাকেন নি? কই, কত সময় তাঁর কথা মনে পড়ে, তাঁর মুখ মনে পড়ে? মনে পড়বার কি জো আছে?

একপাল শত্রু যে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। কেবল বাঁধন, কেবল বাঁধন। 'লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার দাস-খত লিখে নিয়েছে হায়।' তিনি গাইতেন। ভারি চমৎকার ছিল গলা।

কিন্তু মেয়েটার কাণ্ড দেখ। শোওয়ার ছিরি দেখ ওর।

'ও মিণ্টু, পা-টা একেবারে আমার গলার ওপর তুলে দিলি নাকি, এ্যাঁ? মেরে ফেলবি নাকি আমাকে? বজ্জাত মাগী। আট উৎরে ন-বছর বয়স হল তোমার, তবু শোওয়া ঠিক হল না?'

নাতনী মিণ্টুর পা-টা একটু রাগ করেই সরিয়ে দিলেন ভুবনময়ী।

একতলার ঘরের মেঝেয় ঢালা বিছানা। ডাইনে বাঁয়ে ছোট বড় নানা বয়সী ডজন-খানেক পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী নিয়ে ভুবনময়ীকে রাত কাটাতে হয়। দিনটাও এদের পরিচর্যায় আর রাগারাগি চেঁচা-মেচিতেই কাটে। আচ্ছা ফ্যাসাদ হয়েছে যা হোক। একটুকাল নির্জনে শান্তিতে বসে দু-দণ্ড যে ঠাকুর-দেবতার নাম করবেন তা হবার জো নেই। সে পথে কাঁটা দিয়েছে শত্রুরা। সব শত্রু, সব শত্রু। নিজের পেটে হয়েছিল দুটি। তাদের ভিতর থেকে কতগুলি বেরিয়েছে দেখ। রাবণের বংশ।

ঠাকুরমার ধাক্কা খেয়ে মিণ্টুর ঘুম ভেঙ্গে গেছে; অভিমানে সে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে একটুকাল চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'আমার পা-টা মুচড়ে দিলে কেন ঠামা?'

ভুবনময়ী বললেন, 'ঈস মুচড়ে কেন, একেবারে ভেঙে দিয়েছি। দিয়েছি তো বেশ করেছি। যা কাল থেকে আমার কাছে আর থাকিস নে। আসিস নে আর এ-ঘর সুদ্ধু। নিজের বাপ-মার কাছে থাকিস! মার-গুঁতো খাওয়ার জন্যে পরের কাছে এসে দরকার কি। বেশ মজা পেয়েছে তোদের বাপ মা। বছর বছর একটি করে হবে আর এক একটিকে নিচের ঘরে ঠেলে পাঠাবে। নিজেরা আরামে নাক ডেকে ঘুমুতে পারলেই হল। আর কেউ সারা রাতের মধ্যে চোখের পাতা এক করতে না পারুক তাতে কার কি এসে যায়! হ্যাঁরে মিণ্টু, সত্যিই লেগেছে নাকি তোর পায়ে? দেখি আয় দেখি এদিকে।' এবার মিণ্টু সরে এসে সাদরে ঠাকুরমার গলা জড়িয়ে ধরল, 'একটুও লাগে নি ঠামা। একটুও না। আমি অমনি অমনি বলছিলাম।' তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে

বলল, 'আজ কি হবে জানো ঠামা ?' ভুবনময়ী বললেন, 'এই মুখ সরা, মুখ সরা। অমন করিস নে মিণ্টু। আমার শুড়শুড়ি লাগে।'

এপাশে ওপাশে নাতি-নাতনীর দল খিল খিল করে হেসে উঠল। শুড়শুড়ি কথাটাই তাদের শুড়শুড়ি দিয়েছে।

মিণ্টু কিন্তু মুখ সরাল না। ঠাকুরমার কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে তেমনি ফিস ফিস করেই বলল, 'জানো ঠামা আজ নান্তুদা আসছে। দিল্লী থেকে নান্তুদা আসছে আজ। মনে আছে তোমার ?'

ভুবনময়ী বললেন,'না আমার মনে নেই, তোমার আছে। রাত তিনটেয় ঘুম ভাঙতেই সে কথা আমার মনে পড়েছে। নান্তু আসবে, সে কথা আমার মনে নাই ? শোন কথা !'

অন্তু সন্তু টুলু বুলুর দল কল্ কল্ করে উঠল, 'আমাদের সকলেরই মনে আছে। নান্তুদা আসবে, সে কথা কালও তো আমরা বলাবলি করতে করতে ঘুমালাম। মিণ্টু তো আগে ঘুমিয়ে পড়েছিল।'

মিণ্টু প্রতিবাদ করল, 'এই মিথ্যে কথা বলবি নে,—'

ভুবনময়ী ধমক দিলেন, 'হ্যাঁ, এই নিয়ে ঝগড়া কর সক্কালবেলা। আর সারাদিন মারামারি কাটা-কাটি করে মর। একটা ভালো কথা, কি কোন ঠাকুর-দেবতার নাম তো কোনদিন মুখে নিয়ে উঠবি নে। বাপ-মার যেমন শিক্ষে, তেমন তো হবে। আর তোদের পাল্লায় পড়ে, তোদের সঙ্গে থেকে আমারও জপ-তপ, শিক্ষা-দীক্ষা সব গেছে।' বিছানা ছেড়ে এবার উঠে পড়লেন ভুবনময়ী। ফের তাড়া দিলেন নাতি-নাতনীদের, 'আর গড়াগড়ি করিস নে। ওঠ এবার, উঠে বিছানা তোল।'

খিল খুলে ভুবনময়ী বেরুলেন ঘর থেকে। সামনেই মেয়ের সঙ্গে দেখা। দোতলা থেকে ভুবনময়ীর মেয়ে বাসন্তী নেমে এসেছেন। মেয়েকে দেখে ভুবনময়ী একটু যেন থমকে দাঁড়ালেন, 'ও বাসি, তুই আবার এত ভোরে উঠলি কেন। তোর না শরীর খারাপ। জ্বর জ্বর হচ্ছে ক'দিন ধরে ! কেন উঠলি তুই। যা আর একটু শুয়ে থাক গে যা।'

তেতাল্লিশ উৎরে চুয়াল্লিশে পা দিয়েছেন বাসন্তী। তাঁর বড় ছেলের বয়সই এখন ছাব্বিশ। কিন্তু মার ধমকাবার ধরন দেখ। বাসন্তী যেন এখনও তের চোদ্দ বছরের সেই ছোট্ট মেয়েটি রয়ে গেছেন। অসময়ে বিছানা থেকে উঠে এসেছেন বলে মা ফের তাই ধমকে শুতে পাঠাচ্ছেন ঘরে। না, সেই ছোট্টটি তিনি আর নেই ! অনেক বয়স হয়ে গেছে। যতটা না বয়স হয়েছে তার চেয়ে বেশি বুড়ো দেখায়। এমন কি স্বামী অবনীমোহন পর্যন্ত

সেই খোঁটা দেন। কিন্তু শুধু মার কাছে দাঁড়ালেই, মার সামনে দাঁড়ালেই নিজের বয়সের কথা আর মনে থাকে না। মনে হয় সেই ছোট্টটিই আছেন।

মার কথার জবাবে বাসন্তী বললেন, 'না উঠলে চলবে কেন মা। কত কাজ পড়ে রয়েছে। ঝি আসছে না ক'দিন ধরে। একরাশ বাসন পড়ে আছে কলতলায়।'

ভুবনময়ী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বাসন পড়ে রয়েছে তার তুই কি করবি। রোগা শরীর নিয়ে তুই বুঝি মাজতে বসবি সারাগুষ্ঠীর এই এঁটো বাসন। কেন, বাড়িতে আর লোক নেই? আর কেউ না থাকে তোর নিজের মেয়েগুলি তো আছে। তাদের ডেকে দে। তারা এসে বসুক বাসন মাজতে। মেয়েগুলিকে ডাক, মেয়েগুলিকে ডাক। তাদের আর বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াস নে। আহ্লাদ দিয়ে পরকাল নষ্ট করিস নে তাদের।'

বাসন্তী মৃদু হাসলেন, এখনও তাঁকে বেশ সুন্দর দেখায় হাসলে। রঙ তেমন ফর্সা নয়, কিন্তু মুখের গড়নটুকু বেশ মিষ্টি। রোগে ভুগে ভুগে আর বেশি সন্তান হয়ে হয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছে। চোয়ালের আর চিবুকের হাড়গুলি দেখা যায়। তবু কিসের একটু লাবণ্য যেন একেবারে যাই যাই করেও যায় নি। বাসন্তী মার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আমি যেন আমার মেয়েদের আহ্লাদ দিচ্ছি মা। আর তুমি তোমার মেয়েকে কি করেছ। তুমি তোমার মেয়েকে কি ভাবে বড় করে তুলেছ। সেই তুলনায় আমি ওদের কি করি, কতটুকু করতে পারি। তোমার নাতি-নাতনীরা বলে কি জানো, তুমি শুধু আমাকেই ভালোবাস, ওদের বাস না।' বলে বাসন্তী ফের একটু হাসলেন।

কিন্তু ভুবনময়ী হাসলেন না, খানিকক্ষণ মুখ গম্ভীর করে রইলেন। তারপর রূঢ় কণ্ঠে বললেন, 'কেবল ওদের কেন, তোমারও সেই ধারণা। তা আমার জানতে বাকি নেই বাছা, ভালবাসিই তো না। কেন বাসব? মেয়ের পেটের ছেলেমেয়ে। তারা আমার কে? তাদের ভালোবাসলে আমার কোন্ গুণ দেবে? দূরে দূরে চোখের আড়ালে থাকলে ছ-মাস বা বছরেও তো একবার দেখা-সাক্ষাৎ হত না। নেহাৎই কাছে আছি, কাছে রেখেছি, তাই ভোরে উঠেই মুখ দেখতে হয়।' ভুবনময়ী এর পর গলার স্বর বদলালেন, 'আমি ভালবাসি নে ওদের, এ কথা তুই বললি! পেটের মেয়ে হয়ে এই খোঁটা দিলি আমাকে। যাদের জন্যে দিনরাত আমার এক ফোঁটা অবসর নেই, মুখে ভাত নেই, চোখে ঘুম নেই, তাদের নাকি আমি দেখতে পারি নে। ভগবান তুমিই শোন তুমিই শোন।'

ভুবনময়ীর আক্ষেপোক্তি উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে লাগল। এ ঘরে ও ঘরে বাড়ির সবাই জেগে উঠল। কেউ কেউ মুখ বাড়াল জানালা দিয়ে।

বাসন্তী অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আচ্ছা জ্বালা হয়েছে এই বুড়ো মাকে নিয়ে।

এর সঙ্গে কথা বলাও বিপদ। বাসন্তী বা কোন্ ধরনে কথাটা বললেন আর মা তার জবাবে কি শুরু করলেন দেখ। মার সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল আগে তাঁর স্নেহের কথা ভেবে বাসন্তীর মন মাধুর্যে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল, এখন সেই মনেই বিরক্তির সীমা রইল না। ঝকমারি করেছেন বাসন্তী মার সঙ্গে কথা বলে। আর কক্ষনও কথা বলতে যাবেন না।

সিঁড়ি বেয়ে ততক্ষণে আর একটি মহিলা নীচে নেমে এসে দুজনের পাশে দাঁড়ালেন, 'কি হয়েছে মা?'

মেয়ে নয়, ছেলের বউ। পরের মেয়ে, তবু তার মুখে মাতৃ-সম্বোধন ভুবনময়ীর কানে এক মুহূর্তে নিজের মেয়ের মা ডাকের চাইতেও বেশি মধুর লাগল। তিনি মুখ তুলে নালিশের ভঙ্গিতে বললেন, 'শোন, তোমার ননদ কি বলছে। আমি নাকি ওর ছেলেমেয়েদের ভালবাসি নে, শুধু তোমার ছেলেমেয়েদেরই সোহাগ আদর করি।'

বাসন্তী প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'ও কথা আবার আমি কখন বললাম মা। সকালবেলা তুমি কেন কতগুলি মিথ্যে কথা বানিয়ে বানিয়ে বললে আমার নামে। তোমার উদ্দেশ্যটা কি। তুমি কি চাও এ বাড়ি ছেড়ে আমরা চলে যাই?'

কনকলতা বাথরুমের দিকে এগুচ্ছিলেন, ননদের কথায় এবার ফিরে দাঁড়ালেন, তারপর অনুত্তেজ আর অনুচ্চ গলায় বললেন, 'যাওয়া-যাওয়ির কি হল ঠাকুরঝি। অবনীবাবু তো এ বাড়িতে ঘরজামাই হয়ে নেই যে, পান থেকে চুন খসলেই তোমরা সব উঠে যাবার ভয় দেখাবে। ভাড়াটে বাড়ি। ভাড়া দিয়ে তোমরাও আছ, আমরাও আছি। সকলেরই সমান অধিকার। যাওয়ার কথা উঠল কিসে। আসল কথা তো নিজেরা ওঠা নয়, উঠে যেতে বলা। এ বাড়ির খোঁজ এনেছিলেন অবনীবাবু, বাড়িওয়ালার সঙ্গে তাঁরই খাতির বেশি। তোমরা কেন উঠবে, উঠতে হয় আমরাই উঠে যাব।'

বাসন্তী স্থির দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বউদি, তুমি আবার কেন এলে আমাদের কথার মধ্যে।'

কনকলতা বললেন, 'শুধু তোমাদের কথাই যদি হত ঠাকুরঝি, তাহলে বলতে আসতাম না। নিজের গায়ে না লাগলে কার বাঁ পা যায় কথা বলতে।'

ধীরে ধীরে পা ফেলে কনকলতা চৌবাচ্চার দিকে এগিয়ে গেলেন। ঠিক মুখের মত জবাব দিতে না পেরে বাসন্তী রুদ্ধ আক্রোশে একটুকাল কনকলতার গমনভঙ্গির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কনকলতা বাসন্তীরই সমবয়সী এবং প্রায় সমসংখ্যক সন্তানের জননী। কিন্তু কনকলতার চেহারা দেখলে মনেই হয় না যে, সত্যিই অতগুলি ছেলেমেয়ে তাঁর হয়েছে। কনকলতা

যেমন সুন্দরী, তেমনি স্বাস্থ্যবতী। এখনও তাঁর গায়ে পাকা সোনার রঙ, নিটোল মুখের সুন্দর গড়ন, বড় বড় কালো চোখের কোলে কোথাও একটু কুঁচকে যায় নি, মুখের কোথাও একটু ক্ষীণতম রেখাও পড়ে নি যেন। এখনও সেজেগুজে দাঁড়ালে বাড়ির যে কোন অনূঢ়া তরুণী মেয়ের সঙ্গে তিনি পাল্লা দিতে পারেন। সাজগোজের দিকে বেশ একটু ঝোঁকও রয়েছে কনকলতার। সান্ধ্য প্রসাধনে তাঁর বেশ একটু সময় যায়, সময় লাগে চুল বাঁধতে। তা পিঠ ভরা যাঁর এখনও অত চুলের রাশ, তাঁর কিছু সময় লাগলই বা। তাছাড়া দিনের অন্য সময়েও বেশ ফিটফাট হয়ে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে থাকতে ভালবাসেন কনকলতা। নিজের রূপ সম্বন্ধে তিনি আত্ম-সচেতন। রূপ আর স্বাস্থ্য যে শরীরকে একটু তোয়াজে না রাখলে থাকে না, তা তিনি জানেন। বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে রূপসী বলে তাঁর মনে অহঙ্কারও একটু আছে। কিন্তু তা খুব প্রচ্ছন্ন। কথায়বার্তায় তা সহজে ধরা পড়ে না। শুধু চালচলনে একটু একটু ফুটে বেরোয়। তা বেরোলই বা। শোভন সীমার মধ্যে রূপবতীর মনের অহঙ্কার, তার গায়ের অলঙ্কারেরই মত।

এ কথাটা বাসন্তীর স্বামী অবনীমোহনই বলতেন। এখনও বলেন, অবশ্য অন্য ভাষায় বলেন। বেশি সন্তান হলেই যে সকলের স্বাস্থ্য ভাঙে না, তার চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত হিসাবে মাঝে মাঝে কনকলতার কথাটা ওঠে তাঁদের মধ্যে। আর এই তুলনাটা বাসন্তীর ভাল লাগে না। বউদির ওপর স্বামীর যে একটু পক্ষপাতিত্ব আছে, তা বাসন্তী ভালো করেই জানেন। এর জন্যে আগে আগে যেমন খোঁচা লাগত, খটকা লাগত, এখন আর তা লাগে না। অবনীমোহন দেবচরিত্রের মানুষ। তাঁর আচার আচরণে কেউ কোনদিন অশোভনতার অপবাদ দেয় নি। আরও অনেকের মত এ কথা বাসন্তীও জানেন। তবু কনকলতার সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্যের তুলনায় বাসন্তীর মন এখনও অপ্রসন্ন হয়। এই তুলনা আর যে দেয় দিক অবনীমোহনের দেওয়া তো উচিত নয়। তিনি কি জানেন না বাসন্তীর স্বাস্থ্যভঙ্গের মূল অবনীমোহন নিজে। তিনি কি জানেন না, শুধু সন্তানাধিক্যই নয়, স্বামীর মহানুভবতার আধিক্যই বাসন্তীকে এমন অকালজীর্ণ করে ফেলেছে। কিন্তু এ কথা কোনদিন অবনীমোহন স্বীকার করবেন না।

এঁটো বাসনের পাঁজার পাশ ঘেঁষে ছোঁয়া বাঁচিয়ে কনকলতা কলের জলছিটিয়ে ছিটিয়ে চোখমুখ ধুয়ে নিলেন। আঁচল দিয়ে মুখ মুছলেন না সঙ্গে সঙ্গে। মুখের এখানে ওখানে বিন্দু বিন্দু জল লেগে রইল। ফুটন্ত পদ্মে যেন ফোঁটা ফোঁটা শিশির।

এ উপমাও অবনীমোহনেরই দেওয়া। অনেককাল আগে তরুণ বয়সে কাব্যসাহিত্যের বড় ভক্ত ছিলেন অবনীমোহন। তখনকার কথা। এখন অবশ্য জলের ফোঁটা বউদির

মুখে তেমন করে মানায় না। অন্তত বাসন্তীর তো তাই মনে হয়। কিন্তু বউদি অনেক স্নেহ মমতা উপকারের কথা ভুললেও এই উপমাটুকুর কথা সযত্নে মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছে। ঝি না আসায় কনকলতাদেরও বাসনের স্তূপ পড়ে রয়েছে এক পাশে। কিন্তু তিনি দিব্যি পাশ কাটিয়ে চলে এলেন। সহজে তিনি হাত দেবেন না এঁটো বাসনে। মেয়েরা মাজবে। নেহাৎই যদি ওরা কেউ কোন একটা ব্যবস্থা না করে, নিজে এসে বসবেন তখন।

বাসন্তী আর দেরি করলেন না। এগিয়ে গিয়ে বসলেন নিজের পাঁজার কাছে। কাজে হাত লাগালেন।

ভুবনময়ী মেয়ে আর ছেলের বউয়ের কথা কাটাকাটিতে এতক্ষণ হতবাক হয়ে ছিলেন। কনকলতার কাছে বাসন্তীর নামে অমন একটা মিথ্যে কথা বলে ফেলে তিনি নিজেও বড় কম অপ্রতিভ হন নি। কেন বললেন। ওকথা বলা তো তাঁর ইচ্ছে ছিল না। আজকাল ছেলেমেয়ে নাতী-নাতনীগুলির মত নিজের জিভটাও যেন আর নিজের শাসন মানে না। ফস করে এক একটা কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধে। ওরা বোঝেন না যে, বুড়ো মানুষের মুখের কথাটাই সব কথা নয়। তা ধরতে নেই।

কিন্তু জেদী মেয়ের কাণ্ড দেখ। শরীর খারাপ তবু গিয়ে বসল এঁটো বাসনগুলি নিয়ে। মেয়েকে ধমক দিলেন, 'আচ্ছা বাসি, এত বয়স হল, বুড়ো হতে চললি, এখনও তোর একগুঁয়েমি গেল না। এখনও সেই কচি খুকীটি আছিস নাকি তুই? বললুম যে দরকার নেই তোর আজ বাসন মেজে। তবু তুই কথা শুনবি নে। তোর মত জেদী আর দুটি দেখি নি দুনিয়ায়। সরে আয় বলছি।'

বাসন্তী দ্রুত হাতে কাজ করতে করতে বললেন, 'সরে এলে চলবে না মা। তুমি মিছামিছি বক বক না করে নিজের কাজে যাও।'

মেয়ের রূঢ় কথায় ভুবনময়ী এবার রাগ করলেন না। খানিকক্ষণ আগের অপরাধের কথা তাঁর মনে আছে।

তিনি এবার কোমল স্বরে অনুরোধের ভঙ্গিতে বললেন, 'লক্ষ্মীটি, উঠে আয়, আমার কথা শোন। আজ না নান্তু আসবে বাড়িতে। ওর গাড়ি তো সকালের দিকেই। এসে যদি দেখে তুই এই বাসনের রাশ নিয়ে বসেছিস তাহলে আর রক্ষে রাখবে না।'

প্রবাসী ছেলের বাড়ি আসবার প্রসঙ্গে বাসন্তীর মনটা মুহূর্তের জন্য প্রসন্ন হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল কি অবস্থায় ছেলে বাড়ি ফিরছে। মার দিকে তাকিয়ে বাসন্তী বললেন, 'না রক্ষে রাখবে না। ছেলে আমার সব দুঃখ দূর করবে

বলেই তো চাকরি-বাকরি সব খুইয়ে বাড়িতে এসে বসছে। কে যে আমাকে কতখানি রাজা করবে, তা আমার জানা আছে।'

প্রায় দু'শো টাকা মাইনের ভালো সরকারী চাকরিটা নান্তুর চলে গেছে। তা নিয়ে ভুবনময়ীর নিজের মনেও আফসোস কম নেই। তবু সান্ত্বনার সুরে মেয়েকে বললেন, 'আহা, পুরুষ ছেলের চাকরি কখনও হয়, কখনও যায়, তাই বলে কি ঘরের ছেলে ঘরে আসবে না ? এ তোর বড় অন্যায় কথা বাসি।'

বাসন্তী বললেন, 'আর ঘর কোথায় ? কোন ঘরে কি এক ফোঁটা জায়গা আছে যে মাথা গুঁজবে ? চিলে কোঠার এই খুপিটুকুর মধ্যে সে থাকত, সেখানেও তো—'

বলে বাসন্তী হঠাৎ থেমে গেলেন। সেখানে কনকলতার জামাই সুবিমল আছে ক'মাস ধরে। তারও চাকরি নাই। এখানে থেকে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছে। কিন্তু কথাটা বাসন্তী চাপতে চাইলেও কনকলতা চাপতে দিলেন না। মুখ ধুয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছিলেন, ফের কয়েক সিঁড়ি নিচে নেমে এলেন। তারপর ননদ আর শাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে তেমনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'সেখানা সুবিমল বেদখল করেছে এই তো ঠাকুরঝি। কিন্তু ছেলে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ঘর তোমরা ফিরে পেলেই তো হল। সেজন্য ভাবনা নেই তোমার। আমি তো প্রথম যেতেই দিতে চাই নি সুবিমলকে ও ঘরে। আমি আগেই বলেছিলুম, ওটা নান্তুর 'পড়া' ঘর, ছুটি ছাটায় এসে থাকে। ও ঘরে কাউকে ঢুকতে দেখলে তার সহ্য হয় না, ও ঘরে গিয়ে কাজ নেই সুবিমলের। আছে জামাই আছে, তবু সে নিচের ঘরে চাকর-বাকরদের সঙ্গেই থাকুক। কি করবে। তার শ্বশুরের যেমন সাধ্য। তার বেশী তো আর কিছু করবার জো নেই। কিন্তু অবনীবাবুই তো তা হতে দিলেন না। তিনি তো তখন ভালোমানুষি দেখিয়ে নিজে সব ব্যবস্থা করলেন।'

সিঁড়িতে এবার একটি পুরুষের গলা শোনা গেল ; 'কি বিষয়টা কি। সকাল থেকে সকলে মিলে সেই যে বক বক শুরু করেছ, হয়েছে কি তোমাদের !' ঘাড় ফিরিয়ে স্বামীকে দেখে নিয়ে মাথার আঁচলটা আর একটু টেনে সরে দাঁড়ালেন কনকলতা। বৈদ্যনাথ দ্রুত নিচে নেমে এলেন। পরনে নীল রঙের লুঙ্গি। খোলা গা। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। রূপবান নয় তবে স্বাস্থ্যবান পুরুষ। বেঁটে খাটো আঁটসাঁট গড়ন। এখনও বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। একহাতে ছোট্ট একটা হাতুড়ি।

নেমে এসে বোনের দিকে তাকিয়ে বৈদ্যনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে রে বাসন্তী ?'

বাসন্তী বললেন, 'কিছু হয় নি দাদা।'

কনকলতা বললেন, 'হবে না কেন, অনেক কথা হয়েছে। সুবিমলকে এখনি চিলে কোঠা ছেড়ে দিতে বলো। সে আজই কোন মেসে-টেসে চলে যাক।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'কেন, মেসে যাওয়ার কি হয়েছে। মেসে যাবে খাবে কি। চাকরি নেই বাকরি নেই, খরচ চালাবে কি করে।'

কনকলতা বললেন, 'সে কথা তো আর অন্য মানুষে বুঝতে আসবে না। তুমি আজই সুবিমলকে উঠে যেতে বলো। নান্তুর ঘর যেন ও এখনই ছেড়ে দেয়। আর যে কয় মাস জামাইকে পরের ঘরে রেখেছ, তার জন্য ভাড়াটা হিসেব করে গুনে দিয়ো। খাই না খাই, আমি কারো অনুগ্রহ নিতে চাই নে।' বলে কনকলতা তরতর করে উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

বৈদ্যনাথ গম্ভীরভাবে বললেন, 'হুঁ'। তারপর বৈঠকখানা ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ভুবনময়ী বাধা দিয়ে বললেন, 'উঠেই ও দিকে আবার কোথায় যাচ্ছিস বৈদ্য।' বৈদ্যনাথ বললে, 'ঘড়িটা ঠিক করতে হবে। রাত থেকে আবার বেয়াড়াভাবে বাজতে শুরু করেছে।'

ভুবনময়ী বললেন, 'তা করে করুক। ও ঘড়িতে তোমার হাত দিয়ে কাজ নেই বাপু।' বৈদ্যনাথ চটে উঠে বললেন, 'কেন, আমার ঘড়িতে আমি হাত দেব, তাতে তোমার কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হবে শুনি ?'

ভুবনময়ী অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 'মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, কিন্তু ঘড়িটা যাবে। যাবে কি গেছে। তুমিই ওটাকে নষ্ট করেছ। তোমার কেরামতি মেরামতিতে ও ঘড়ির যেটুকু আছে সেটুকুও আর থাকবে না।'

বৈদ্যনাথ গলা চড়িয়ে বললেন, 'বেশ না থাকে না থাকবে। আমার জিনিস আমি নষ্ট করি, কি যা খুশি তাই করি, তা তোমার দেখতে আসবার দরকার নেই মা। সব সময় বক বক না করে একটু চুপ করে থাক তো।'

ভুবনময়ীও তিড়বিড় করে উঠলেন, 'কেন, চুপ করে থাকবার কি হয়েছে শুনি ? কেন চুপ করে থাকব ? কার ভয়ে চুপ করে থাকব ? তোমার ভয়ে ? তুমি দুটি খেতে পরতে দিচ্ছ সেই জন্যে। দিও না খেতে। তোমাকে তো হাজার বার বলেছি, খেতে তুমি আমাকে দিও না। তুমি ছাড়া আমার আরও অনেক গতি আছে।'

বৈদ্যনাথ তিক্তস্বরে বললেন, 'তা তো আছেই। সেই আশা আছে বলেই তো তোমার গলায় এখনও এত জোর আছে। সেই আস্কারা পেয়েই তো তোমার চেঁচানি কমছে না। একটু কিছু হতে না হতেই চেঁচিয়ে একেবারে বাড়ী মাথায় করে তুলছ।'

ইঙ্গিতটা অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্তত বাসন্তীর তা বুঝতে কিছু মাত্র অসুবিধা হল না। বাসন মাজতে মাজতে তিনি ফের মুখ ফেরালেন, 'নিজেরা মায়-পোয়ে যত খুশি ঝগড়া কর দাদা, কিন্তু মিছিমিছি অন্য মানুষকে দুষতে যেয়ো না। কেউ কাউকে আস্কারা দেয় নি, দেবেও না, বিনা আস্কারাতেই এই। এরপর আস্কারা দিলে কি আর রক্ষে ছিল।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'তোর আবার হল কি বাসি? তোর গায়ে আবার কোত্থেকে কোন্ ফোস্কা পড়ল?'

বাসন্তী বললেন, 'চামড়ার গা হলেই তাতে ফোস্কা হয় দাদা। মাটি কি পাথর দিয়ে তৈরি হলে ফোস্কা পড়ার কোন বালাই থাকে না। তাতে সব সয়। রক্ত মাংস দিয়ে তৈরি না করে বিধাতা যদি কাঠ কি পাথর দিয়ে আমাকে তৈরি করতেন, তাহলেই তোমাদের সকলের পক্ষে সুবিধে ছিল।'

সামনের চৌবাচ্চায় মগ ডুবাবার একটু শব্দ হতেই বাসন্তী চোখ ফিরিয়ে তাকালেন। অবনীমোহন নিঃশব্দে দোতলার ঘর থেকে কখন নেমে এসেছেন। উঠান পেরিয়ে কখন এসে চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়েছেন মগে, কেউ টেরও পায় নি। মুখ দিয়ে সহজে তো কোন কথাই বেরোয় না অবনীমোহনের, চলাফেরাটাও যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে সারেন। একটু আগে মাটি কি পাথরে গড়া মানুষের কথা বলছিলেন বাসন্তী। স্বামীর সম্বন্ধে তাঁর সেই কথাই মনে হয়। একেবারে পাথরের মানুষ। কালো পাথরের নয়, রঙীন পাথরের। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে বয়স। কিন্তু স্নিগ্ধ মসৃণ গৌর বর্ণ এখনও তেমন ম্লান হয় নি। দীর্ঘ সুন্দর চেহারা, সবল আর তেমন বলা চলে না, স্বাস্থ্যবানও নয়। দেহে ভাঙন ধরেছে অবনীমোহনের। কপালের ত্রিবলী একটু যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কানের কাছে পাক ধরেছে চুলে। তবু তাঁর রূপ চোখে পড়ে। এ রূপ কনকলতার মত যত্ন করে রাখা নয়, প্রসাধনে মার্জিত নয়, অবহেলায় অনাদৃত।

বাথরুমের দিকে যাওয়ার আগে অবনীমোহন একবার সকলের মুখের দিকে তাকালেন। তাঁকে দেখেই সকলেই মুহূর্তের জন্যে কথা থামিয়েছে। অবশ্য এই থামাই থামা নয়। অবনীমোহন তা জানেন। আজকাল অতখানি শ্রদ্ধা সমীহ তিনি আর দাবী করেন না। তিনি বাথরুমে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে এরা আবার কলহ শুরু করবে। তারপর শ্রান্ত হয়ে কিংবা দৈনন্দিন কাজের তাগিদে আপনিই সবাই থেমে যাবে।

তার আগে ধমক দিলে শুনবে না, অনুরোধ করলে শুনবে না। তাতে কিছু লাভ নেই।

অবনীমোহন জলের মগ হাতে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে।

পিছনে ঝগড়া চলতে লাগল।

বোনের কথার জবাবে বৈদ্যনাথ বললেন, 'থাক, থাক আর মাটি পাথরের কথা তুলিস নে। কে কোন্ ধাতু দিয়ে তৈরি, কার যে কত ধৈর্য স্থৈর্য তা আমার আর জানতে বাকি নেই। চিনতে আর কাউকে বাকি নেই আমার।'

বাসন্তী কোন জবাব দিলেন না।

ভুবনময়ী আগের কথার জের টেনে বলতে লাগলেন, 'কেবল আমার যা খুশি তাই করব, আমার জিনিস আমি নষ্ট করব। দিনরাত কেবল এই বুলি। কপালপোড়া, নষ্টই তো করলি সারা জীবন ভরে। ভেঙে ফেলা ছাড়া গড়তে পারলি কোন্‌টা। রাখতে পারলি তাঁর হাতের কোন জিনিস! একটা একটা করে নিজের খেয়ালে সবই তো খোয়ালি। টাকা গেল, পয়সা গেল, বিষয়-আশায় গেল। শেষে আমার যে ক'খানা গয়না ছিল তাও রইল না। নষ্ট করা ছাড়া তুই আর কি করতে পারলি জীবনে।'

অভিযোগগুলি সত্য। তাই বৈদ্যনাথ মুহূর্তকালের জন্য একটু চুপ করে রইলেন। ছেলেমেয়ে ভাগ্নে-ভাগ্নীরা ততক্ষণে প্রায় সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁদের এই বচসা শুনছে লক্ষ্য করে নিজের ছোট ছেলে বিনুকে এক প্রচণ্ড ধমক দিলেন বৈদ্যনাথ, 'যা হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসগে যা। কি দেখছিস, কি শুনছিস হাঁ করে। যা ভাবছিস তা নয়। তোদের বাবা মদ খেয়ে বদমাশি করে রেশ খেলে তার বাবার একটা পয়সাও ওড়ায় নি। সৎপথে ব্যবসা করতে গিয়েই সব খুইয়েছে। আর খুইয়েছে বলে তার মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই।' হঠাৎ ঘড়ি সারবার কাজের কথাটা ফের মনে পড়ে গেল বৈদ্যনাথের। তিনি আর দেরি না করে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

বৈঠকখানা অবশ্য নামেই বৈঠকখানা। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বাইরের ঘর। ভিতরে যাদের স্থান সঙ্কুলান হয় নি তাদেরই কেউ কেউ এসে উপছে পড়েছে এ ঘরে। তাই চেয়ার টেবিল কৌচ সোফায় না সাজিয়ে সস্তা দামের দুখানা বড় বড় তক্তপোশ জুড়ে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলেদের মধ্যে যারা বড় হয়েছে, মা ঠাকুরমার গণ্ডি পেরিয়ে এসে তারা এ ঘরে স্থান নেয়। অতিথি-অভ্যাগত কেউ এলেও অপেক্ষাকৃত একটু ভালো বিছানা বালিশের ব্যবস্থা করে এই ঘরেই তাদের অভ্যর্থনা করা হয়, দিনের বেলায় ছেলেরা কেউ কেউ পড়ে। কিন্তু এখন তক্তপোশ খালি। সবাই বিছানা গুটিয়ে উঠে গেছে। শুধু বাঁ কাৎ হয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে অতুল। অবনীমোহনের মেজো ছেলে। তেইশ চব্বিশ বছরের জোয়ান। স্বাস্থ্যবান চেহারা। গায়ের রঙ কালো হলেও নাক চোখের গড়ন সুন্দর।

বৈদ্যনাথ তার পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে ঘড়ি সারবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ঘুমন্ত ভাগ্নের একখানা হাত পায়ের উপর এসে পড়ল। তা পড়ুক। নেহাৎ বিজয়া দশমীর

দিন ছাড়া সজ্ঞানে জাগ্রত অবস্থায় তো ভাগ্নেরা পায়ে হাত বড় একটা দেয় না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যদি হাত দেয় তো দিক। তাও কত বেলা অবধি ঘুমুচ্ছে। ঘুমুবে না?

সারারাত বাইরে বাইরে কাটিয়ে এসেছে। কোথায় কালীকীর্তনের না কি একটা দল আছে পাড়ায়, সেখানে গিয়ে জুটেছে। কি করে আর কি না করে ভগবানই জানেন। একেবারে বয়ে গেছে ছোঁড়া। লেখাপড়া কিচ্ছু হল না। টেনে মেনে ফার্স্ট ক্লাস অবধি উঠেছিল। পর পর দুই বছর ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। পাড়া ভরে শহর ভরে হৈ-চৈ মারামারি করে বেড়ানো ছাড়া এখন আর ওর কোন কাজ নেই। বছরের পর বছর একই ভাবে কাটছে। আশ্চর্য বাপ। অবনী বলেই তার ছেলে এমন হতে পেরেছে। বৈদ্যনাথের কোন ছেলে এমন বিগড়ে গেলে তিনি তাকে চাব্‌কে সোজা করতেন। তাতেও যদি না শোধরাত বাড়ি থেকে বের করে দিতেন, দেখতেন কেমন না শোধরায়। ঢং করে একটা শব্দ হল ঘড়ির। কিন্তু বাজে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা। 'দাঁড়াও তোমাকে বাজাচ্ছি।' মনে মনে বললেন বৈদ্যনাথ। তারপর ওপরের ডায়ালটা খুলে ফেললেন।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজার কাছে ঠুন ঠুন করে রিকৃসার শব্দ হল! সেই সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়েদের একযোগে কলস্বর শোনা গেল, 'নান্তুদা এসেছে, নান্তুদা এসেছে।'

বৈদ্যনাথ নিজের জায়গা ছেড়ে বিন্দুমাত্র নডলেন না। দুই বুড়ো আঙুলের উপর ভর করে যেমন ঘড়ির কলকজাগুলি পরীক্ষা করছিলেন, তেমনি করে যেতে লাগলেন।

কিন্তু বাড়ির আর সবাই বৈঠকখানার দোরের কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। ঘরখানা ভরে গেল লোকে। সবাইকে ধরলও না। সব চেয়ে পিছনে এসে দাঁড়ালেন ছাই মাটিতে হাত-মাখা বাসন্তী। মুখে অপূর্ব স্নিগ্ধ বাৎসল্যের হাসি। এই মুহূর্তে তিনি ভুলে গেছেন ছেলে বেকার হয়ে এসেছে। প্রবাসী ছেলে ঘরে এসেছে এখনকার মত এই তো ঢের।

রিকৃসাওয়ালাকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে অরুণ এসে দোরের সামনে দাঁড়ালো। তার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে ছোট ভাইদের মধ্যে ততক্ষণে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। কেউ ধরেছে হোল্ড-অলটা, কেউ সুটকেস, কেউ ট্রাঙ্কটা নিয়ে টানাটানি করছে। মামাতো ভাই বিজু থার্ড ইয়ারে পড়ে। আর কেউ পারছে না দেখে সে নিজে এসে তুলে নিয়ে গেল ট্রাঙ্কটা। নিজের জিনিসপত্রে অন্য কেউ হাত দেয় অরুণ তা একটা বড় পছন্দ করে না। ছেলে-পুলেদের কলরব তার খুব সহনীয় নয়, কিন্তু আজকের দিনটা আলাদা, আজকের ধরনটা আলাদা। হাসিমুখে নিজের জিনিস আর ভাইবোনগুলির দিকে তাকিয়ে সে ভিতরে ঢুকতে গেল। আর ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ চৌকাঠে ঠুকে গেল মাথাটা।

ভুবনময়ী বলে উঠলেন, 'আহা ষাট ষাট। দিল্লীর জলবাতাসে তুই কি আরও লম্বা হয়ে গেলি নাকি নান্তু? গায়ে পায়ে তো কিছু বাড়ে নি।'

অরুণ দিদিমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'এর চেয়ে আর কি বাড়বে দিদা? তাহলে তো তোমাদের দরজা দিয়ে একেবারেই ঢুকতে পারতাম না। বাইরে থেকেই বিদায় নিতে হত।'

ভুবনময়ী বললেন, 'ঈস কথার ছিরি দেখ না ছেলের। যা একখানা তালপাতার সেপাইয়ের মত চেহারা, তাই নিয়ে আবার বড়াই।'

কথাটা ঠিক। দৈর্ঘ্যের তুলনায় অরুণের প্রস্থের স্বল্পতাটা চোখে পড়ে। ওকে ঠিক সুপুরুষ বলা যায় না, স্বাস্থ্যবান পুরুষ তো নয়ই। তবু ওর নিজস্ব একটা শ্রী আছে। শুধু নাকটাই তীক্ষ্ণ নয়, চোখ দুটিও ধারাল। বিদ্যে-বুদ্ধির ছাপটা বেশ ধরা যায়। চওড়া কপাল, পাৎলা ঠোঁট, ছোট্ট চিবুকে একটু আত্মগম্ভীরতারও আঁচ করা কঠিন হয় না।

দিদিমাকে প্রণাম সেরে নিচু হয়ে অরুণ মামীমার পায়ে দুটি আঙুল ছোঁয়াল কি ছোঁয়াল না, তারপর মাথা তুলে সোজা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ রাঙা মামী?'

কনকলতা বললেন, 'তোর মামী কটা রে নান্তু যে রাঙা মামী বলছিস? ফাজিল ছেলে।'

অরুণ বলল, 'বাঃ, যা টুকটুকে তোমার রঙ, রাঙা কথাটাই সবচেয়ে আগে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে।'

লজ্জিত হলেন কনকলতা। লঘু-গুরু জ্ঞান নেই অরুণের। বাইরের চাকরিতে গিয়ে ফিচলেমিটা আরও বেড়েছে। কনকলতা বললেন, 'তোর বাবার গায়ে তো রঙ নেহাৎ কম নেই, তাহলে তাঁকেও তো—' হঠাৎ বাবার কথাটা মনে পড়ায় অরুণের মুখে কিসের একটা ছায়া পড়ল। ঘরের দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিল। না, তাঁকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তিনি আসেন নি। তিনি নামেন নি নিচে। যে কথাটা অরুণ এতক্ষণ ভুলে ছিল, সেই কথা ফের মনে পড়ল। তার চাকরি গেছে। যুদ্ধের সময়কার ডি জি এম পি অফিসে চাকরি। একেবারে শেষের দিকে জুটেছিল। কলকাতার অফিস উঠে গিয়েছিল দিল্লীতে। তার পর ভারত স্বাধীন হবার বছর খানেক যেতে না যেতেই ভারত গভর্ণমেণ্ট তাকেও সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিয়েছেন। আরও অনেক সহ-কর্মীদের সঙ্গে সেও পড়েছে ছাঁটাইতে। এ চাকরি যে একান্ত অস্থায়ী বাবা তা জানতেন, ছাঁটাইয়ের কথাটাও অনেকদিন ধরে চলছিল। আঘাতটা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়, তবু আঘাত তো বটে। আর তাঁরই সব চেয়ে লাগবার কথা। কারণ ভুগতে তাঁকেই

হবে, বিপুল পরিবারের ভার তাঁর কাঁধেই পড়বে এবার থেকে। অরুণ সব বুঝতে পারছে। তবু একবার তিনি এলেও তো পারতেন। মনটা কেমন যেন অপ্রসন্ন হয়ে রইল অরুণের। একটু এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে মাকে প্রণাম করে তাঁর দিকে তাকাল। বাসন্তীও তাকালেন ছেলের দিকে, 'কেমন আছিস ?'

অরুণ সংক্ষেপে বলল, 'ভালো।'

হঠাৎ চোখে পড়ল, তক্তপোশের ওপর দাঁড়িয়ে মামা কি ঠুক ঠুক করছেন। এগিয়ে এসে পা-টা আলগোছে একটু ছুঁয়ে বলল, 'ও করছেন কি ?'

বৈদ্যনাথ ঘড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে ভাগ্নের মুখের দিকে তাকালেন, 'এই যে,ভালো আছিস ? গাড়ি কি লেট ছিল ?'

অরুণ বলল, 'সামান্য। করছেন কি ওখানে ?'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'ঘড়িটা সারছি। দিন কয়েক হল ফের বিকল হয়েছে। ঠিক টাইম দিচ্ছে না।'

অরুণ হাসি চেপে বলল, 'দেখুন চেষ্টা করে।'

প্রায় জন্মাবধি এই ঘড়ি মামাকে সারতে দেখে আসছে অরুণ। নিজের মনেই ফের একটু হাসল। ও ঘড়ি আর সেরেছে।

ভিতরের দিকে আরও খানিকটা এগুতেই শ্যামবর্ণা আঠার উনিশ বছরের একটি তরুণী মেয়ে অরুণের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'কি নান্তুদা, আমাকে যে চিনতেই পারছ না, রাজধানী থেকে এসে গরীবের দিকে বুঝি আর নজরই পড়ছে না ?'

মামাত বোন অণিমা।

অরুণ বলল, 'চোখে পড়লেই কি আর চিনতে পারব ? সিঁথিতে সিঁদুর-টিদুর লেপে তুই তো একেবারে কালীঘাটের কালী সেজেছিস।'

অণিমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আহা !'

তার পাশে প্রায় তারই সমবয়সী আরও একটি মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ফর্সা সুন্দর চেহারা। অরুণের নিজের বোন। তার বিয়ে হয় নি। ম্যাট্রিক পাশ করে ঘরে বসে আছে। অরুণ বাবাকে লিখেছিল কলেজে ভর্তি করে দিতে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তাঁর সাধ্য নেই। অরুণের মনে হয়েছে শুধু সাধ্যের কথাই নয়, বাবার আর ইচ্ছেও নেই ওকে পড়াবার।

অরুণ বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি রে, অমন মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে ? বিয়ে হয় নি বলে ? কলেজে ভর্তি হতে পারিস নি বলে, না কি আমার চাকরি গেছে সেই দুঃখে ?'

প্রীতি বলল, 'তা ছাড়া আর বুঝি কোন কারণ থাকতে নেই দাদা ?'

অরুণ বলল, 'আর আবার কি কারণ থাকবে ? তবে কি প্রেমে-ট্রেমে পড়লি নাকি ?'

হেসে উঠল অরুণ। হাসতে হাসতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। দোতলার সিঁড়ির ডাইনে বামে তিনখানা ঘর। একখানায় সপরিবারে থাকেন বৈদ্যনাথ। আর পাশাপাশি দুখানায় থাকেন অবনীমোহন আর তাঁর মেজো ভাই মৃগাঙ্কমোহন। একটু ইতস্ততঃ করে কাকার ঘরেই আগে ঢুকল অরুণ।

'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' এ কথার আর একবার প্রমাণ পাওয়া যায় মৃগাঙ্কের ঘরে এলে। ঘর আর ঘরণী একাত্ম না হোক ঘর যে ঘরণীরই প্রতিচ্ছায়া, তার শিক্ষা দীক্ষা ও রুচির ছাপে চিহ্নিত, এ কথা মৃগাঙ্ক আর সুরমার ঘর দেখে বিশেষভাবেই মনে পড়ে।

বাড়ির বৌ-ঝিদের মধ্যে রূপ সুরমার সবচেয়ে কম। দেখতে কালো ছিপ-ছিপে লম্বা। দেহের গঠনও এমন কিছু সৌন্দর্যব্যঞ্জক নয়।

কিন্তু বিদ্যা সবচেয়ে বেশি। আই. এ. পাশ করে বি. এ-তে ভর্তি হয়েছিল তখন সুরমার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পরও পরীক্ষার জন্যে দুবার তৈরী হয়েছিল সুরমা। কিন্তু দু-দুবারই ঠিক সময় বুঝে ছেলেমেয়ে হল, পরীক্ষা দেওয়া আর হল না। সুরমার ছেলেমেয়েরা সহজে আসে নি। ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে পরিবারের অনেক অনেক টাকা খরচ করিয়ে মায়ের প্রাণ-সংশয় ঘটিয়ে তবে তারা ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এক একটি হওয়ার পর অনেক ধকল গেছে সুরমার শরীরের ওপর দিয়ে। মা বলেছেন, 'ভগবান করুন, তোর যেন আর না হয়, যারা হয়েছে তারা বেঁচে থাকুক।' কিন্তু সুরমা শুধু ভগবানের ওপরই নির্ভর করে নেই। নিজেরাও সতর্ক হয়েছে। যে দুটি সন্তান হয়েছে তাদেরই পেলে পুষে মানুষ করা তাদের পক্ষে শক্ত, আর সংখ্যা বাড়িয়ে কি হবে ?

কলেজের পড়া বন্ধ হলেও বাড়িতে সাধ্যমত পড়াশুনোর অভ্যাসটা রেখেছে সুরম মৃগাঙ্ক কাজ করে কলেজ স্ট্রীটের এক নাম করা প্রকাশক আর বই বিক্রেতার দোকানে। বই শুধু পরের কাছে বিক্রিই করে না, নিজেরও সংগ্রহ করার দিকে ঝোঁক আছে। দু-দুটি কাঁচের আলমারি ভরতি হয়ে সুরমার বই উপছে পড়েছে র‍্যাকে সেল্‌ফে। আর একটি আলমারি কিনলে ভালো হয়। কিন্তু ফার্নিচারের দাম চড়ে গেছে। টাকা সংগ্রহ করে নতুন আলমারি আর কেনা হচ্ছে না সুরমাদের।

মৃগাঙ্কের পড়াশুনোর দিকে যে তেমন ঝোঁক আছে তা নয়, বই সংগ্রহ করেই খালাস। এই বইগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে ঝেড়ে পুছে যত্ন করে রাখা সুরমার নিত্যকর্ম। সময় সময় আগ্রহের অভাবে পড়াশুনোয় ইদানিং অনেকটা ঘাটতি পড়েছে সুরমার, কিন্তু বই-এর তত্ত্বাবধানে আলস্য আসে নি। এই লাইব্রেরী যেন ওদের তৃতীয় সন্তান।

তক্তপোশের তলায় দু-একটা ট্রাঙ্ক স্যুটকেশ আর জামাকাপড় রাখবার আলনা ছাড়া গৃহস্থালীর অন্য কোন জিনিস এ ঘরে স্থান পায় নি। সে সব থাকে বড় জা' বাসন্তীর ঘরে। এ ঘরে আছে দু-তিনখানা চেয়ার, পড়বার টেবিল, তার উপর সুরমার নিজের হাতের তৈরী এমব্রয়ডারি করা ঢাকনি। তাকের উপর দুটি ফুলদানী। তাতে কখনও ফুল থাকে, কখনও থাকে না। কিন্তু ফুলদানী দুটিই এমন সুন্দর যে, দেখতে সেগুলি প্রায় বড় বড় দুটি ফুলের মত। দেয়ালে গান্ধীজী আর রবীন্দ্রনাথের মাঝারি আকারের দুখানি ফটো।

মৃগাঙ্কের ঘুম ভাঙে একটু দেরিতে। কিন্তু নিচের সোরগোলে অন্যদিনের চেয়ে আজ সকালেই উঠে পড়েছে ওরা।

অরুণ ঘরে ঢুকতেই তক্তপোশ থেকে নেমে এসে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়াল। চেহারার দিক থেকে পরস্পরের সঙ্গে আজও মৃগাঙ্ক-সুরমাকে ঠিক মানায় না। চল্লিশ উৎরে গেলে কি হবে, মৃগাঙ্ককে এখনও বেশ সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক বলেই মনে হয়। গায়ের রঙ ফর্সা, চোখ মুখের গড়নও মোটামুটি সুন্দর। আর সবে তিরিশ পেরোলেও বয়সের তুলনায় সুরমাকে বেশি গম্ভীর আর রাশভারি দেখায়।

কেবল আকৃতির অমিলই নয়, প্রকৃতিগত অমিলও দুজনের মধ্যে যথেষ্ট আছে। মৃগাঙ্ক চঞ্চল, ফুর্তিবাজ, হৈ-হল্লাপ্রিয়। আর সুরমা নিরীহ, শান্ত, একান্তে শান্তিতে থাকতে ভালবাসে। কিন্তু তবু দুজনের মধ্যে মিল আছে বেশ। দাম্পত্য কলহ যে এক আধ সময় না হয় তা নয়, কিন্তু না প্রবচনকে লঙ্ঘন করে না। লঘু ক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মৃগাঙ্ক নিজে পছন্দ করে দেখে শুনে সুরমাকে বিয়ে করেছে। আর বিয়ের পর সুরমা পছন্দ করেছে মৃগাঙ্ককে। দুজনে দুজনের বৈপরীত্যকে যেন ভালবেসেছে।

মৃগাঙ্ক বলল, 'ভাল আছিস ?'

অরুণ মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল।

পায়ে হাত দিতে যাওয়ায় সুরমা একটু পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'থাক থাক। তারপর খবর কি তোমার ?'

অরুণ বলল, 'খবর মোটেই সুখবর নয় তা তো আগেই শুনেছেন। চাকরি-বাকরি খুইয়ে কাশ্যপগোত্র হয়ে ফিরে এসেছি।'

কাকার ঘর থেকে বাবার ঘরে এসে ঢুকল অরুণ। মনে মনে ভাবল খুব প্রীতিকর কর্তব্য নয়, তবু সেরে আসা যাক।

হাতমুখ ধুয়ে এসে তক্তপোশের ওপর বসে সকালের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিলেন অবনী-মোহন। কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়ানো। ছেলে এসে পায়ে হাত দিতেই চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, 'এই যে, শরীর ভাল আছে তো ?'

অরুণ বললে, 'হ্যাঁ, আপনার ?'

অবনীমোহন ছেলের দিকে তাকিয়ে একটু যেন হাসলেন, 'আমি ভালই আছি।' তারপর মিনিট খানেক চুপচাপ কাটল। অবনীমোহন কম কথা বলেন। কিন্তু অরুণ তো আর তা নয়। বন্ধুরা তাকে বলে 'বকতিয়ার খিলিজী,' সে একবার কথা বলতে শুরু করলে আর কারো মুখ খুলবার জো থাকে না। কিন্তু বাবার কাছে এসে অরুণের নিজের থেকেই বাক্‌সংযম আসে। ভয়ে নয়। আজকাল বাবাকে সে আর ভয় করে না। কিন্তু কেমন একটা দূরত্ব যেন অনুভব করে! যেন অর্ধপরিচিত এক ভদ্রলোক তার সামনে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে শুধু সাধারণ কুশল প্রশ্নেরই আদান-প্রদান চলে, তার বেশি আলাপ চালানো অশিষ্টতা। অরুণের মনে হয়, বাবা যে তার কাছে শুধু মুখ খোলেন না তা নয়, মনও খোলেন না। একটু বাদে অবনীমোহন নিজেই কথা বললেন, 'যাও হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম কর গিয়ে।'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ যাচ্ছি।'

তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তেতলার ছাদে লাগা ছোট একখানি ঘর। সারা বাড়ির মধ্যে এই ঘর খানিই একান্ত করে তার। সমস্ত কৈশোর আর যৌবনের প্রারম্ভ তার এই ঘরটুকুর মধ্যে কেটেছে। বছরের সমস্ত সময়টা বন্ধু-মহলে আড্ডা দিয়ে পরীক্ষার কিছুদিন আগে বইপত্র নিয়ে চিলে কোঠার ঘরে স্বেচ্ছাবন্দী হয়েছে অরুণ। এম. এ. পর্যন্ত এই ছিল ওর পাঠাভ্যাসের পদ্ধতি প্রবাস থেকে যতবার নিজেদের বাড়ির কথা ওর মনে হয়েছে, সবচেয়ে আগে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে চিলে কোঠার এই ঘরখানি। কিন্তু নিজের ঘরের অবস্থা দেখে অরুণ মুহূর্তকাল স্তম্ভিত হয়ে রইল। বিড়ি আর সিগারেটের টুকরোয় ঘর ভরতি। তারই মধ্যে বিছানা পেতে অরুণেরই সমবয়সী কি দু-এক বছরের বড় একটি যুবক নির্বিকার ঔদাসীন্যে শুয়ে রয়েছে। নিদ্রামগ্ন নয়, ডান হাতের তালুতে মাথা রেখে গভীর চিন্তামগ্ন। কিন্তু কিসের একটা শব্দে তার ধ্যান ভাঙল। তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর উঠে বসল। তারপর হাসিমুখে মধুর আপ্যায়নের সুরে বলল, 'এই যে আসুন আসুন।'

মামাতো বোনের এই স্বামীটির সঙ্গে বেশী আলাপ নেই অরুণের। দেখা সাক্ষাৎ অল্পই হয়েছে। কিন্তু ভদ্রলোকের এই অতি অন্তরঙ্গতায় অরুণ যেন সর্বাঙ্গে এক অস্বস্তি বোধ করল। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি আগে বেরিয়ে আসুন! ঘরটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করাই, তারপর আসব। যা অবস্থা করে রেখেছেন, মানুষ ও ঘরে ঢুকতে পারে না।'

সুবিমল কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিছন থেকে একটি নারীকণ্ঠ শোনা গেল ;'সুবিমল,

তুমি উঠে আমার ঘরে এসো। ওঘর আমাদের নয়।'

অরুণ মুখ ফিরিয়ে দেখল কখন মামীমা এসে দাঁড়িয়েছেন।

কনকলতা বললেন, 'তোমার ঘর আমি এক্ষুনি পরিষ্কার করে দিচ্ছি নান্তু, একটু দাঁড়াও।'

অরুণ বলতে গেল, 'মামীমা—'

কনকলতা জামাইয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'এসো সুবিমল। ঘুম যদি এখনও ভেঙে না থাকে, আমার ঘরে গিয়ে ঘুমোবে, এসো।' সুবিমল এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার পর সমস্ত অপমান ও যেন গা থেকে ঝেড়ে ফেলেছে, তেমনি ভাব দেখিয়ে একটু হাসল, 'ও আপনার ঘর বেদখল করে ছিলাম বুঝি, আসুন আসুন দখল নিন। এতক্ষণ বুঝতেই পারি নি।'

কনকলতা বললেন, 'এবার তো বুঝেছ ? এসো।'

অরুণ ফের ডাকল, 'মামীমা।'

কিন্তু সাড়া দেওয়ার জন্যে কনকলতা আর দাঁড়ালেন না। জামাইকে সঙ্গে নিয়ে দোতলায় নেমে গেলেন।

দখল-বেদখলের পর্ব অবশ্য এখানেই শেষ হল না। চা-টা খেয়ে সুবিমল প্রায় তখনই বেরিয়ে পড়ল। ফিরে এল এগারটা নাগাদ। নিজের বাক্স বিছানা একটা রিকসায় তুলে অরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলি, কিছু মনে করবেন না। মাঝে মাঝে পায়ের ধুলো দেবেন।'

অরুণ বলল, 'সে কি ! এই দুপুর বেলায় না খেয়েদেয়ে কোথায় চললেন ?'

সুবিমল বলল, 'আপাতত এক বন্ধুর মেসে। সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। দেখি আবার কাকে বেদখল করে রাখতে পারি। ওই তো আমাদের কাজ।'

অরুণের আসার সময় যেমন হয়েছিল, সুবিমলের যাওয়ার সময়েও তেমনি বাড়িসুদ্ধ লোক সদরের কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। শুধু পুরুষেরা ছাড়া, তাঁরা সব অফিসে বেরিয়ে গেছেন।

সব চেয়ে আগে এলেন ভুবনময়ী। স্থূল দেহখানাকে তাড়াতাড়ি টেনে আনতে আনতে তিনি প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছেন। ভুবনময়ী বললেন, 'আমার মাথা খাও সুবিমল, তুমি এমন ভাবে যেয়ো না।'

বাসন্তী বললেন, 'তুমি এসো। আমার ঘর তোমাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। জামাই তুমি। তোমার থাকবার জায়গার অভাব হবে নাকি এ-বাড়িতে।' সুবিমল বলল, 'আমি তো তা বলি নি। থাকবার জায়গার কেন অভাব হবে।' রিকসায় উঠে বসল সুবিমল।

ভুবনময়ী বলতে লাগলেন, 'শালা-ভগ্নীপতে কত কথা হয়, কত রঙ্গ-রসিকতা হয়, তাই বলে কি এমন কাণ্ড করে বসে নাকি মানুষে! আমি তো বাপের জন্মেও দেখি নি এমন। একি কেলেঙ্কারি কাণ্ড।'

সুবিমল রিকসাওয়ালাকে চলতে হুকুম দিল।

বাসন্তী কনকলতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বউদি, আমাদের জব্দ করার জন্যেই তুমি এ-কাজ করেছ। তুমিই এর মূলে। সকাল থেকেই মেস মেস করছিলে। সেই মেসেই পাঠালে জামাইকে। শুধু আমাকে জব্দ করার জন্যে।'

কনকলতা বললেন, 'জব্দ কে কাকে করছে তা সবাই দেখতে পাচ্ছে। যার জামাই না খেয়েদেয়ে দুপুর বেলায় বাড়ি থেকে রাগ করে চলে গেল, সে জব্দ হল না, ব্যথা লাগল পাড়াপড়শীর। কার জন্যে কার যে কতটুকু ব্যথা তা আর জানতে বাকি নেই আমার!'

বাসন্তী বললেন, 'পাড়াপড়শী? হ্যাঁ! এখন তো পাড়াপড়শীই হয়েছি। পাড়াপড়শীর চেয়েও তুমি আমাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছ।'

অরুণ মাকে ধমক দিয়ে বলল, 'মা তুমি কি থামবে না? আমার বাড়ি আসাই অন্যায় হয়েছে দেখছি।'

বাসন্তী বললেন, 'এলি কেন? না এলেই আর পাঁচজন স্বস্তিতে থাকত!'

খাওয়া-দাওয়া আর সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সারাদিন ধরে ননদ-ভাজে কথা কাটাকাটি আর ঝগড়া চলতে লাগল। শুনতে শুনতে অরুণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। আসতে না আসতেই একি শুরু হল বাড়িতে। এখানে সে থাকবে কি করে।

সন্ধ্যার একটু আগে আগে সবাই বাড়ি ফিরলেন। বৈদ্যনাথ কাজ করেন বড়বাজারের এক মাড়োয়ারী মার্চেণ্ট অফিসে। ক্লাইভ রোয়ের ন্যাশানাল ইনসিওরেন্সে অবনীমোহনের চাকরি। দুজনে একই ট্রামে ফিরলেন। 'ফিরে এসে যাঁর যাঁর স্ত্রীর মুখে প্রায় একই সময় শুনলেন ঘটনার বিবরণ। কনকলতা বললেন, 'আমি এ-বাড়িতে আর থাকব না। তুমি যদি কালই অন্য বাড়ির ব্যবস্থা না করো আমি যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাব।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'হুঁ, এবার সেই ব্যবস্থা করতে হবে দেখছি। লোকের সহ্য করবার একটা সীমা আছে। কিন্তু সুবিমলেরই বা একবারে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কি হল? বাড়িতে আর কোন ঘরদোর ছিল না এমন তো নয়। ওপরের ঘরখানার ভাড়াই না হয় অবনীরা দেয়, কিন্তু নিচের দুখানা তো আমাদেরই, তাতে ওর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেই হত।'

কনকলতা বললেন, 'আমি তো তাই বলেছিলাম। কিন্তু সুবিমল শুনল কই।' অণিমা কাছেই ছিল, এবার এসে পাশে দাঁড়াল, 'না মা, তার চলে যাওয়াই ভাল হয়েছে। অন্ত

কোন ঘরে থাকতে হলে তা নিয়েও গোলমাল হত। তার চেয়ে এই ভাল। কলকাতা শহরে তার থাকবার জায়গার অভাব কি, আত্মীয় বন্ধু আছে। তোমরা বলেছিলে বলেই এতদিন ছিল, না হলে কবে চলে যেত।'

পাশের ঘরে ঠিক এই বিষয় নিয়েই দাম্পত্যালাপ চলল খানিকক্ষণ।

বাসন্তী বললেন, 'রোজ রোজ এই কেলেঙ্কারী আর সহ্য হয় না। এবার তোমরা অন্য বাসা দেখ।'

অবনীমোহন চায়ের কাপে চুমুক দিলেন, 'তা না হয় দেখব। কিন্তু সুবিমল হঠাৎ চলে গেল কেন?'

বাসন্তী কিছুটা অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বললেন, 'কেন তা আমি কি করে জানব।'

অবনীমোহন বললেন, 'বেশ, যে জানে, তাকেই জিজ্ঞেস করছি।'

অরুণকে ডেকে পাঠালেন অবনীমোহন।

সব শুনে বললেন, 'তুমি অন্যায় করেছ।'

বাসন্তী বললেন, 'নিজের ছেলেমেয়ের দোষ ছাড়া তো তোমার আর কিছু চোখে পড়ে না।'

অবনীমোহন এবার একটু হাসলেন, 'আর একজনের দোষও চোখে পড়েছে।' বাসন্তী বললেন, 'তা তো পড়বেই। আমার দোষ তো তুমি চোখ মেলতে না মেলতেই দেখতে পাও। কিন্তু আসল দোষ যে কোথায়, তাই শুধু তোমার নজরে পড়ে না।'

বাসন্তী হয়তো আরও দু-একটা কথা বলতেন, কিন্তু ছেলে কাছে আছে বলে থেমে গেলেন।

অবনীমোহন ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার অন্যায় হয়েছে একথা স্বীকার করা ভালো।'

অরুণ একটু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'আমি তো তা অস্বীকার করছি নে। ঘরটা অত নোংরা হয়েছে দেখে আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারি নি।'

অবনীমোহন বললেন, 'মানুষের বাইরের নোংরামিই কি সব? ভিতরের দিকেও তাকাতে হয়। বিশেষ করে নিজের।'

অরুণ একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি তাহলে এখন কি করতে বলেন?'

অবনীমোহন বললেন, 'আমি আর কিছুই বলি নে। তোমার বয়স হয়েছে। লেখাপড়া শিখেছ, তার ফলে বুদ্ধি বিবেচনাও কিছু হয়েছে বলে লোকে আশা করে।' কথা শেষ না করে সেল্ফ থেকে মেটেরিয়া মেডিকাখানা টেনে নিলেন অবনীমোহন। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তাঁর শখের প্র্যাকটিস আছে।

অরুণ স্থির হয়ে একটু কাল তাকিয়ে রইল। তারপর মার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বেশ, কাল সকালে গিয়ে সুবিমলকে পায়ে ধরে সেধে নিয়ে আসব। তা হলে তো আর কোন দোষ থাকবে না? আমি আজ রাত্রে কিছু খাব না মা। ক্ষিদে নেই। আর নিচের বৈঠকখানা ঘরেই আমার বিছানা পেতে দাও। বড্ড ঘুম পেয়েছে।'

অবনীমোহন বই থেকে মুখ তুললেন না।

ফলে নিজের আস্ফালনটা নিজের কাছেই ভারি ছেলেমানুষি বলে মনে হতে লাগল অরুণের।

বাসন্তী ঘরের বাইরে এসে পরম স্নেহে ছেলের হাত ধরলেন। তারপর স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'তুই কি পাগল হলি নাকি। খাবি নে কেন। উনি তো অমন কতই বলেন। অত ভাল মানুষ বলেই তো এই দশা করে তুলেছেন এই সংসারের।'

রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে ভাত বেড়ে পাতের কাছে বসে ছেলেকে খাওয়ালেন বাসন্তী। নান্তুর এই এক দোষ। একটু কিছু হলেই যত রাগ যায় ওর খাওয়ার ওপর। 'হ্যাঁরে, এত দেশ-বিদেশ ঘুরলি, এখনও কি তেমনি আছিস। কথায় কথায় রাগ হয় তোর? দিল্লীতে রাগ করতি কার ওপর? ঠাকুর চাকরের ওপর? মাসের মধ্যে কদিন থাকতি না খেয়ে?' বাসন্তী একটু হাসলেন, তারপর ছেলের পাতের দিকে চোখ পড়তেই ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওকি! মাছটুকু ফেলে যাচ্ছিস কেন? ওটুকু খেয়ে ফেল। আমার কথা শোন। খা। তোমার আর ভদ্রতা করতে হবে না বাপু। সবার জন্যেই আছে। তুমি খাও। না খেয়ে খেয়ে যা চেহারা বানিয়েছ।'

বৈঠকখানা ঘরে কিছুতেই অরুণের জন্যে বিছানা পাতলেন না বাসন্তী। অত ভিড়ের মধ্যে ওর ঘুম হবে না। এইটুকুন বয়স থেকে ওর একটু নিরিবিলিতে থাকা স্বভাব। বাসন্তীর তো কিছু আর জানতে বাকি নেই।

নিজে তোশক বালিশ টেনে ট্রাঙ্ক থেকে ফর্সা চাদর বের করে তেতলার চিলে কোঠায় ছেলের জন্যে বিছানা পেতে দিলেন বাসন্তী। বললেন, 'কাল গাড়িতে ঘুম হয় নি। আজ সকাল সকাল ঘুমো, না হলে শরীর খারাপ হয়ে পড়বে।'

চলে যেতে যেতে আবার একটু ফিরে দাঁড়ালেন, 'পার তো চাকরি-বাকরির কথা ভেবে রাত ভোর করো না। তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে যেয়ো না। মন খারাপ করো না। চাকরি গেছে আবার হবে। অকাট মুখ্য তো নও, গতি একটা হবেই। ঘুমোও এবার। আর আলো জেলে রেখে কাজ নেই।'

নিজেই স্যুইচটা অফ করে দিয়ে গেলেন বাসন্তী। পায়ের কাছ থেকে পাতলা

চাদরখানা টেনে এনে গায়ে দিল অরুণ। মায়ের পুরনো ট্রাঙ্কের গন্ধ আছে এই চাদরে। মায়ের নিজের গায়ের গন্ধের মত। অদ্ভুত মায়ের স্নেহ। অরুণের সমস্ত অযোগ্যতা, সমস্ত অপরাধ মা আদর দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। বাবা তাঁর ঔদার্য নিয়ে দূরে সরে রইলেন। কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতায় ধরা দিলেন না। মা ছোট, এই চিলে কোঠার মতই স্বল্পপরিসরের। কিন্তু একান্ত নিজস্ব, একান্ত আপন। অরুণ পাশ ফিরল। ঘুম আসছে না। মায়ের হাতের সযত্নে পাতা এমন স্থন্দর নরম বিছানাতেও আজ যেন ঘুম আসতে চাইছে না। ঠিক বেছে বেছে আজকেই মা এত আদর না দেখালেও পারতেন। এই স্নেহের দান আর গ্রহণের মধ্যে কিসের যেন একটা লজ্জা জড়িয়ে থাকে। অল্প বয়সে নির্বিচারে মায়ের আদর নেওয়া যায়, কিন্তু বয়স বাড়লে নিজের পৌরুষ দিয়ে না নিলে, যোগ্যতা দিয়ে না নিলে ঠিক যেন নেওয়ার মত নেওয়া হয় না। বাবার চোখের সামনে মার যে অনুদার পক্ষপাত আর স্বার্থপর স্নেহ প্রকাশ হয়ে পড়ল তার জন্যে হঠাৎ যেন ভারি লজ্জা বোধ হল অরুণের—মার জন্যে লজ্জা, নিজের জন্যে লজ্জা। সকালের কাণ্ডটার কথা মনে পড়ল। স্থবিমল সত্যিই ভারি নোংরা ভাবে ছিল। অরুণ নিজেও এমন কিছু গোছাল স্বভাবের নয়। কিন্তু স্থবিমল তার চেয়েও বেশি অপরিচ্ছন্ন। মাথায় হাত দিয়ে অমন করে ভাবছিল কি ও? চাকরি-বাকরির কথা? চাকরির কথা তো কাল থেকে অরুণকেও ভাবতে হবে। অবশ্য মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে হবে না, তবু ভাবতে তো হবেই। এতক্ষণ বাদে স্থবিমলের জন্য হঠাৎ কেমন একটু সহানুভূতি হল অরুণের, আর এই মমত্ববোধ নিজের কাছেই ভালো লাগলো। কিন্তু ঘুম বোধ হয় আজ আর সহজে আসবে না। আরও কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল অরুণ। এসে দাঁড়াল ছাদে। আস্তে আস্তে পায়চারি করতে করতে আলসের কাছে এসে দাঁড়াল। কারা ওখানে? পায়ের শব্দে গলার শব্দে ওরাও ফিরে তাকিয়েছে। প্রীতি এগিয়ে এসে বলল, 'আমরা।'

অরুণ হেসে বলল, 'ও তোরা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিস বুঝি?'

প্রীতি বলল, 'হ্যাঁ, ঘুম আসছিল না।' বিজু বলল, 'আর যা গরম।' অরুণ হেসে বলল, 'হ্যাঁ, সব রকমেরই গরম আছে। ঝগড়ার গরমটাও নেহাৎ কম নয়।'

বিজু বলল, 'এরা কথায় কথায় এমন ঝগড়া করে কি যে আনন্দ পায় বুঝি নে।' অরুণের ভারি ভাল লাগল। এসে অবধি সকাল থেকে দুই পরিবারের মধ্যে কেবল ঝগড়া আর চেঁচামেচি শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এত বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যেও দুটি আত্মীয় পরিবারের দুজন প্রতিনিধি দুটি ছেলে-মেয়ে তাদের অন্তরঙ্গতার কথা মনে রেখেছে। তারাভরা একই আকাশের নিচে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গল্প করছে দুজনে।

প্রীতি বলল, 'এবার যাই দাদা, শোবার ব্যবস্থা করি গিয়ে।'

অরুণ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় শুস তুই ?'

প্রীতি বলল, 'নিচে দিদিমার ঘরে। অণি থাকে আমার সঙ্গে। আজ তো সে রেগে টং হয়ে রয়েছে। কিচ্ছু খেল না। তুমি কাজটা ভাল করনি দাদা।'

অরুণ বলল, 'সত্যি, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে।'

বিজু বলল, 'এমন কিছু অন্যায় হয় নি। সামান্য কথা নিয়ে সুবিমলবাবুরই কি অত কাণ্ড করা উচিত হয়েছে ?' বলে বিজু নিচে নেমে গেল।

শান্ত সংযত সাংসারিক ব্যাপারে খানিকটা নির্লিপ্ত ধরনের ছেলে বিজু। পড়াশুনোয় ভালো। অরুণের মত কেবল পরীক্ষার সময়েই বইয়ের খোঁজ করে না। সারা বছর ধরে পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। কুড়ি উৎরে একুশে পড়েছে। অসুখের জন্যে একটি বছর ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে দেরী হয়েছিল। না হলে এবার বি, কম্, পাশ করে যেত। মামাত ভাইবোনদের মধ্যে ওকে খুব ভালবাসত অরুণ।

প্রীতি বলল, 'তোমার আর কিছু লাগবে নাকি দাদা ? জলটল সব ঠিক আছে তো ?'

অরুণ বলল, 'আছে। তুই এবার যা। পতির অপমানে সতী ওদিকে দেহত্যাগ করল কিনা দেখ গিয়ে।'

প্রীতি চলে গেলে অরুণ এসে ফের বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখ বুজতেই এবার একটি মেয়ের মুখের আদল ফুটে উঠল অন্ধকারে। সহকর্মী বন্ধু হিরণ্ময় মজুমদারের বোন করবী। বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেও হয়েছে একটি। বছর তিনেক বয়স। মার মতই বেশ ফুটফুটে সুন্দর চেহারা।

সাধারণত ছোটছেলেকে আদর করতে পারে না অরুণ। কিন্তু করবীর ছেলেকে খুব আদর করেছিল। তা দেখে করবী বলেছিল, 'আপনি তো দেখছি একেবারে বাৎসল্যে ভরপুর। ওর বাবা কিন্তু ওকে দেখতেই পারে না।'

হিরণ্ময় জবাব দিয়েছিল, 'রক্ষা যে পারে না। তাহলে পরেশকে কি তুই দেখতে পারতি ? বাৎসল্যটা পুরুষের বেশি বয়সে আসে। বেশি বয়সে আসাই ভালো।'

ছুটি না পাওয়ায় পরেশবাবু যেতে পারেন নি। ছেলেকে নিয়ে করবী একাই গিয়েছিল দাদা বৌদির কাছে। হিরণ্ময়ই লিখেছিল তাকে যেতে।

'অস্থায়ী চাকরি কবে আছে কবে নেই। এসে একবার বেড়িয়ে যা।'

সবাই মিলে খুব বেড়িয়েছিল যা হোক। শেষের দিকে হিরণ্ময়ের স্ত্রী নমিতা আর যেতেন না। পিপলুকে বৌদির কাছে গছিয়ে করবী একাই বেরুত তাদের সঙ্গে। মাস-খানেক ছিল, খুব হৈ হৈ করে কাটিয়ে এসেছে। আসার সময় করবী ঠিকানা দিয়ে

এসেছিল, 'কলকাতা গিয়ে অবশ্যই যাবেন। ভবানীপুরের শাঁখারীপাড়া চেনেন তো?'

অরুণ অপরিচয়ের ভান করে বলেছিল, 'কই না।'

করবী জবাব দিয়েছিল, 'না চিনলেও চৌরঙ্গী থেকে জিজ্ঞেস করতে করতে যাবেন। আমি যেমন জিজ্ঞেস করতে করতে দিল্লী এসেছি।'

ভারি প্রগল্‌ভা। বছর বাইশ তেইশ বয়স। স্বামীপুত্রের সুখে সৌভাগ্যবতী, সেই সমৃদ্ধি নিজের মধ্যে চাপা রাখতে পারে না। আপনা থেকেই উপচে পড়ে। ঠিকানা দিয়ে বলেছিল, 'আলাপ করে আসবেন বোস মশায়ের সঙ্গে। অবশ্য তিনি যা আলাপী —' বলে মৃদু হেসেছিল করবী।

অরুণ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন, পরেশবাবু আলাপ করতে ভালবাসেন না বুঝি?'

করবী বলেছিল, 'ভালো ঠিকই বাসেন, পারেন না। চিঠিপত্রে খুব কলম চলে, কিন্তু আপনার মত অত মুখ চলে না।' আর একবার অনুরোধ করেছিল করবী, 'যাবেন কিন্তু।'

পথে প্রবাসে অমন কতজনের সঙ্গেই তো আলাপ হয়, কতজনই তো ঠিকানা দিয়ে ভদ্রতা করে যেতে বলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই না যাওয়াটাই ভদ্রতা। তাছাড়া গিয়ে কি বলবে? চাকরি গেছে? ছুটিতে আসে নি, একেবারে ছাঁটাই হয়ে এসেছে? করবী হয়তো একটু সহানুভূতি জানাবে। অনুকম্পা বোধ করবে। সেই অনুকম্পা কুড়োতে গিয়ে লাভ কি।

করবীর দাদা—হিরণ্ময়ের চাকরি এখনও অক্ষত আছে। সে অনেক আগে ঢুকেছিল। পদে দু ধাপ ওপরে। মাইনেও বেশী। তাছাড়া ওপরওয়ালার মন জুগিয়ে চাকরি কি করে রাখতে হয় তা সে জানে। ও চাকরি গেলে অন্য ভালো চাকরি জুটিয়ে নিতে তার দেরী হবে না। বন্ধুর জন্যে খানিকটা ঈর্ষা বোধ করল অরুণ। কিন্তু সেই সঙ্গে বন্ধুর বোনের নিমন্ত্রণের কথাটা আর একবার মনে পড়ল। পড়ুক গিয়ে। কাল থেকে শহরের অফিসে অরুণকে ধন্না দিয়ে বেড়াতে হবে। অত নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ রাখবার তার সময় কই।

আগের দিন যাঁরা প্রায় ঝগড়া মুখে নিয়ে উঠেছিলেন, আজ সারাদিনের কাজ-কর্মের মধ্যে অনেকবার মুখোমুখি হলেও সেই বাসন্তী, আর কনকলতা কেউ কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বললেন না। বাক্যালাপ বন্ধ রইল বৈদ্যনাথ আর বাসন্তীর মধ্যে। দুজন যে ভাই-বোন তা সহজে বুঝবার জো নেই। প্রত্যেকেই এমনভাবে চলতে লাগলেন যেন কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক তো দূরের কথা, পরিচয় মাত্র নেই। এও ঝগড়া। এই শব্দহীন কলহ দুই পরিবারের মধ্যে কিছুদিন ধরে চলবে। তারপর

আপনিই একদিন মিটমাট হয়ে যাবে। এ তো তবু জামাইকে উপলক্ষ করে ঝগড়া হয়েছে। এর চেয়েও তুচ্ছ কারণে—কলের জলের ভাগ নিয়ে, যৌথ ঝি-এর কাজ আর মাইনে নিয়ে, ছাদে কাপড় মেলার জায়গা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে হঠাৎ কলহ লেগে যায়। তারপর কিছুদিন ধরে চলে মন-কষাকষির পালা। দুই পক্ষই আস্ফালন করে, এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এই কেলেঙ্কারীর মধ্যে কেউ আর থাকবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারোরই যাওয়া হয় না। সবাই থেকে যায়।

আজ কুড়ি বছর ধরে এমনি হয়ে আসছে। অবশ্য গোড়াতেই যে এত ঝগড়া লাগত, কথায় কথায় কথা বন্ধ হত তা নয়, তখনকার ঝগড়া ছিল শরতের মেঘের মত। তখন আকাশ এমন থমথমে হয়ে থাকত না। ঝড়-বৃষ্টি কদাচিৎ হত। একজনের হাসি-পরিহাসে আর একজনের মনের আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেতে মোটেই সময় লাগত না। দুদিন একদিন নয়, বছর কুড়ি আগে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের এই তেতলা বাড়িটার সামনে একই ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমেছিলেন বাসন্তী আর কনকলতা। তখন এত ছেলেপুলে ছিল না, লোকজন ছিল না। কনকলতার কোলে তখন মাস-কয়েকের একটি ছেলে। আর বাসন্তীরও মাত্র দুটি। তাদের নিয়ে ভুবনময়ী ছিলেন পিছনের গাড়িতে। শ্যামবাজারের বাড়িতে মাস দেড়েক আগে স্বামী মারা গেছেন। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার পর ভুবনময়ী বললেন, 'এ অলুক্ষুনে বাড়িতে আমি টিকতে পারব না। এ-পাড়ায়ও আমার আর থাকবার ইচ্ছে নেই। তোমরা অন্য পাড়ায় অন্য বাড়ি দেখ।'

ছেলে আর জামাই দুজনেই তাঁকে বুঝাল, বাড়ির কি দোষ। কিন্তু ভুবনময়ী কিছুতেই সে কথা শুনলেন না। বাড়ি তিনি বদলাবেনই। অবনী চন্দ আর বৈদ্যনাথ দত্ত দুজনেই শহর ভরে বাড়ির খোঁজ শুরু করলেন। জায়গামত পছন্দমত ভালো বাড়ি পাওয়া যায় না। অবশেষে অবনীমোহনই একদিন খোঁজ আনলেন এই বাড়ির। ঘরের সংখ্যা অনেক। বাড়িটাও প্রায় নতুন। শুধু অসুবিধে এই, বাড়িওয়ালা আলাদা আলাদা করে ঘর ভাড়া দেবেন না। দিতে হয় গোটা বাড়িটাই দেবেন একজনকে। ভুবনময়ী বললেন, 'গোটা বাড়িই তো আমার চাই। দু-একখানা ঘর দিয়ে কি করব।'

আগে শ্যামবাজারের একটি পুরো বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছিলেন আদিনাথ দত্ত। কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল ভালো। বেলেঘাটার কুণ্ডুদের ধান-চালের আড়তে কাজ করতেন। গোড়ায় দশটাকার মাইনেতে ঢুকেছিলেন, কিছুদিন যেতে না যেতেই হয়ে উঠেছিলেন মনিবের দক্ষিণ হস্ত। তাঁর আয় শুধু মাইনের টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সোনা-গহনায়, আসবাবপত্রে, নগদ টাকায় বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ বলেই পরিচিত মহলে গণ্য ছিলেন আদিনাথ। কিন্তু বৈদ্যনাথ তো আর তা নয়। পর পর বার-দুই আই. এ.

ফেল করে মার্চেন্ট অফিসে ঢুকেছেন। একটা গোটা বাড়ি তিনি ভাড়া নেবেন কি করে। আর তার দরকারই বা কি।

কিন্তু ভুবনময়ী বললেন, 'দরকার আছে। পুরো বাড়িই আমার দরকার। আমার ছেলে থাকবে মেয়েও থাকবে। কাউকেই আমি আর কাছ ছাড়া করব না। যাবার সময় তিনি সেই কথাই বলে গেছেন। বলেছেন দু-জনকে এক জায়গায় রেখ।'

বাবার অসুখের সময় বাসন্তী এসেছিলেন তাঁর কাছে। ননদ ভাজে একসঙ্গে সেবা-শুশ্রূষা করতেন। রাত জাগতেন পালা করে। অবনী থাকতেন মেসে। সেখান থেকে এসে দেখে যেতেন পীড়িত শ্বশুরকে। ভুবনময়ীর প্রস্তাবে অবনীমোহন বললেন, 'তাই কি হয়! এক জায়গায় কি সকলের থাকা সম্ভব?' ভুবনময়ী বললেন, 'কেন অসম্ভব কিসে? দেশের বাড়িতে কতদিনই বা তুমি আমার মেয়েকে আর ফেলে রাখবে। এখানে যখন চাকরি-বাকরি করছ, এইখানেই থাকতে হবে তোমাকে। ভাইদেরও এখানে নিয়ে এসো, তারাও পড়ুক-শুনুক, চাকরি-বাকরির চেষ্টা করুক। কলকাতায় তোমার একটা বাসা না থাকলে কি চলে।'

অবনীমোহন ভেবে দেখলেন কথাটা ঠিক। বাবা মা মারা গেছেন। কাকারা আর খুড়তুতো ভাইরা আছেন দেশের বাড়িতে। সম্পত্তির যা আয় তাতে কেউ বসে খেতে পারবে না। কলকাতায় আসতেই হবে ভাইদের। বাসা এখানে একটা করা দরকার। কিন্তু শ্বশুরকুলের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার প্রস্তাবে তাঁর মন সহজে সায় দিল না। বৈবাহিক সূত্রে যাঁরা আত্মীয়, বাইরের দিক থেকে একটু দূরে দূরে থাকলেই তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বজায় থাকে।

ভুবনময়ী জামাই-এর মনোভাব আন্দাজ করতে পেরে বললেন, 'আমি জানি তুমি কি ভাবছ। একসঙ্গে থাকতে গেলে কুটুম্বিতা থাকবে না, আমার মেয়ে আর বউয়ের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লাগবে, এই হয়েছে তোমার চিন্তা, না?'

অবনীমোহন লজ্জিত হয়ে বললেন, 'না, না, তা নয়।'

ভুবনময়ী একটু হাসলেন, 'ঠিক তাই। কিন্তু অবনী, এই কি তোমার কুটুম্বিতা বিচারের সময়? তিনি অসময়ে চলে গেলেন। আমি ভাবলাম আমার দুই ছেলে রইল। তুমি বড়, বৈদ্যনাথ ছোট। তুমিই রইলে ওর অভিভাবক। তুমি না থাকলে আমি কাকে নিয়ে ভরসা করে ফের সংসার বাঁধব? ওকে নিয়ে? ওর কেবল বয়সই হয়েছে। কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধিসুদ্ধি ধীরতা স্থিরতা কি আছে? কথায় কথায় কেমন মাথা গরম করে দেখ তো।' অবনীমোহন ফের ভেবে দেখলেন। অল্প বয়সে মা মারা গেছেন। সে মাতৃস্নেহের স্বাদ তিনি খানিকটা পেয়েছেন ভুবনময়ীর কাছে। জামাইয়ের মত নয়, নিজের ছেলের

মতই তাঁকে দেখেছেন ভুবনময়ী। আদিনাথও তাই ভাবতেন। সন্ত শোকার্তা বিধবা শাশুড়ীকে আঘাত দিতে তাঁর বাধল। মনে মনে ভাবলেন, এখনকার মত ওঁর অনুরোধ রক্ষা করা যাক, পরে সুযোগ সুবিধে মত ভিন্ন বাসায় উঠে গেলেই হবে। শাশুড়ীর প্রস্তাবে রাজী হলেন অবনীমোহন।

ভুবনময়ী খুশী হয়ে মেয়ে আর বউকে কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা এসো এদিকে, শোন। আমার জামাইয়ের কিন্তু ভয় হয়েছে পাছে তোমাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হয়। খবরদার পাছে ঝগড়া-টগড়া কেউ করো।'

ঘরে অবনী ও বৈদ্যনাথ দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। তাই বাসন্তী আর কনকলতা শুধু ঘাড় নেড়ে জানালেন যে, তেমন আশঙ্কার কোন কারণ নেই। কিন্তু পরক্ষণেই পাশের ঘরে এসে দুজনের সে কি হাসি। হাসতে হাসতে বাসন্তী গলা জড়িয়ে ধরলেন কনকলতার, 'ঝগড়া করবে নাকি বৌদি ? কেমন করে করবে ?'

কনকলতাও হেসে ননদের দু-কাঁধে হাত রাখলেন, 'করব আবার না ? রাত-দিন ঝগড়া করব। ভেবেছ কি তুমি ?'

বাসন্তী বললেন, 'হুঁ, তুমি আবার করবে ঝগড়া। মুখ থেকে মোটে কথা বেরোয় না। না ভাই, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে সুখ হবে না।' কনকলতা তাকে ভরসা দিলেন, 'হবে গো হবে। তুমি মুখে বলবে আর আমি চোখ ঘুরাব, হাত-পা নাড়াব, ঠিক আমার ছোট পিসিমার মত।'

বলে কনকলতা হেসে উঠলেন।

বাসন্তীও হাসলেন।

তখন দুজনেই সবে কুড়ি পেরিয়েছেন। বাসন্তীই দু-এক বছরের বড় হবেন বয়সের হিসেবে। কিন্তু কনকলতা তা কিছুতেই স্বীকার করতে চান না। বলেন, 'বৌদি আবার ছোট হয় নাকি কোন দিন। আমিই বড়, ঢের বড়। তোমার পূজনীয়া। চিঠিতে পাঠ লিখবে শ্রীশ্রীচরণকমলেষু। অমন ভাই, বন্ধু-টন্ধু চলবে না!'

বাসন্তী বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা! দেখি শ্রীচরণখানা। ঈস্ এই ছিরি হয়েছে নাকি চরণের। এসো আলতা পরিয়ে দিই। তোমার মত পা হলে আমি আলতার বালতির মধ্যে পা ডুবিয়ে রাখতাম। শিশিতে কুলোত না।' এরপর শুরু হল প্রসাধনের পালা। শিশি খুলে দুজনে দুজনের পায়ে আলতা পরিয়ে দিলেন। চুল বেঁধে দিলেন পরস্পরের।

বাড়িভাড়ার সময় তর্ক উঠল বাড়িটা কার নামে হবে। অবনীমোহন বললেন, 'বৈদ্যদা, আপনার নামেই ভাড়া হোক।'

বৈদ্যনাথ বললেন, তা হবে না। তোমার মতলব আমি বুঝতে পারছি অবনী।

বলা নেই কওয়া নেই, তুমি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে একদিন খিরকি দোর দিয়ে পালিয়ে যাবে আর গোটা বাড়িটা মাথায় করে আমি পথে দাঁড়াব। ভাড়া হবে তোমার নামে।'

ভুবনময়ী মীমাংসা করে দিলেন। বললেন, 'আচ্ছা দুজনের নামেই থাক।' তাই হল।

রান্নাঘরসুদ্ধ ওপর-নিচ সব মিলিয়ে আটখানা ঘর। ভিতরে এক টুকরো উঠানও আছে। মাথার ওপরে সেই মাপের এক-টুকরো ছাদ। ভাড়া পঁয়তাল্লিশ। এক এক জনের ভাগে পড়ল সাড়ে বাইশ করে। কনকলতা বললেন, 'নাও ঠাকুরঝি, তোমার যে যে ঘর পছন্দ বেছে নাও।'

বাসন্তী বললেন, 'উঁহু, তুমিই আগে বাছ।'

ভুবনময়ী বললেন, 'বাছাবাছির কি আছে। যার যে ঘরে ইচ্ছে ঢুকে পড়। রাতখানা শুধু শুয়ে কাটানো। তারপর এ ঘরও যাদের ও ঘরও তাদের। আমার অবনীর কি ভাবনাই না ছিল, যদি একসঙ্গে তোমরা না থাকতে পার। না পারার কি আছে। এক পেটে যাদের জায়গা হয়েছে, এক বাড়িতে তাদের স্থান হবে না?'

প্রথম প্রথম কোন স্থানাভাবই ঘটে নি। শুধু শোওয়ার ঘর দুখানাই আলাদা আলাদা রইল। আর সব চলল এক সঙ্গে। একখানি রান্নাঘর, একটি হাঁড়ি। কোনদিন কনকলতা রাঁধেন, স্বামী আর ভাইকে পাশাপাশি ঠাঁই করে খেতে দেন বাসন্তী।

'মাছের ঝোল কেমন হয়েছে দাদা?'

'ভালো।'

'বল তো কে রেঁধেছে?'

'তুই। না হলে কি এত সেধে জিজ্ঞেস করছিস?'

'মোটেই না। রান্নাটি বউদির।'

'তাহলে কিছু ভাল হয় নি।'

বাসন্তী আর একটা তরকারি পরিবেশন করতে করতে স্বামীর দিকে তাকালেন, 'কি খাচ্ছ বল তো?'

অবনী বললেন, 'মুড়ি-ঘণ্ট।'

'কেমন হয়েছে রান্না?'

'ভালো।'

'কে রেঁধেছে বল তো?'

'সোনা বউয়ের রান্না বলেই মনে হচ্ছে।'

'হুঁ, যা ভালো তাই সোনা বউয়ের রান্না। আর বুঝি কেউ কিছু রাঁধতে জানে না!'

তখন ষাট টাকা মাইনে পান বৈদ্যনাথ। সামান্য কিছু পকেট খরচ রেখে সব ধরে দিলেন অবনীর কাছে, 'নাও হে সংসার চালাও।'

অবনী বললেন, 'ওসব আমার কাজ নয়।'

বাসন্তী বললেন, 'ভালো মানুষ ঠিক করেছ দাদা। নিজেই চলতে জানে না, আবার সংসার চালাবে। বরং তুমি নিয়ে হিসেবপত্তর করে চালাও সংসার।'

স্বামীর মাইনে আশি টাকা এনে দাদার হাতে ধরে দিলেন বাসন্তী। বৈদ্যনাথ বললেন, 'আচ্ছা সব টাকা তোর কাছেই রেখে দে। খরচপত্তর যা লাগবে আমি চেয়ে নেব। মোটামুটি একটা জমা-খরচ রাখিস তাহলেই হবে।'

বাসন্তী বললেন, 'জমা-খরচ রাখবে বউদি।'

কনকলতা বললেন, 'উহুঁ, ও সব আমার দ্বারা হবে না।'

বাসন্তী বললেন, 'তবে তোমার দ্বারা কি হবে? সংসারের কোন্ কাজটা করবে তুমি?'

অবনীমোহন বললেন, 'আর বুঝি কাজ নেই। সোনা বউ ছেলেদের মাথা আঁচড়ে দেবে, জামা পরাবে, পছন্দমত করে সাজাবে, আর বসে বসে পান সাজবে।'

পানটা একটু বেশি খান অবনীমোহন। অফিসে যাওয়ার সময় ডিবা ভরে পান না নিলে তাঁর চলে না।

বাসন্তী বললেন, 'ভিতরে ভিতরে বুঝি তোমাদের এই চুক্তি হয়েছে? আর তুমি কি করবে?'

স্বামীর দিকে ফিরে তাকালেন বাসন্তী।

অবনীমোহন বললেন, 'আমি আর কি করব!'

বাসন্তী বললেন, 'উনি শুধু ওপর ওপর কর্তৃত্ব করবেন, বুঝলে দাদা?'

এইভাবে যৌথ-সংসার চলেছিল একটানা বছর চারেক। তারপর আস্তে আস্তে ফাটল ধরল। অবনীমোহনের দুই ভাই এসে পড়ল দেশ থেকে। একজন পড়বে আর একজন চাকরি করবে। আত্মীয়-স্বজনের যাতায়াত বাড়ল। দুজনেরই ছেলে-মেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগল। অথচ আয় সেই হারে বাড়ল না। মাঝখানে রাখী মালের কারবার করে বৈদ্যনাথ পৈতৃক পুঁজি লোকসান দিলেন। তারপর থেকে সাংসারিক ব্যাপারে খুব হিসেবী হয়ে গেলেন। হিসেব করে দেখলেন, একান্নে বড় অসুবিধে, বড় ঝামেলা। সংসারের কোন্ দিক দিয়ে যে কি খরচ হয়, তা টেরও পাওয়া যায় না। জমা-খরচের খাতায় তা ধরা পড়ে না। অনেক অদৃশ্য খাতে ব্যয় হয়ে যায় টাকা।

অবনীমোহনও অসুবিধেটা বুঝতে পারলেন। তবু নিজে কিছু মুখ ফুটে বললেন না। কিন্তু আপনা থেকেই ক্রমে সব ফুটে বেরুতে লাগল। যৌথ-সংসারে বোন কর্ত্রী, ভাই কর্তা। ব্যবস্থাটা গোড়ার দিকে যত নিখুত মনে হয়েছিল, কিছুদিন বাদে তেমন আর রইল না। নানারকম খুঁত বেরিয়ে পড়তে লাগল। কনকলতার হাতে একখানা পোস্টকার্ড কেনার পয়সা থাকে না যে, বাপের বাড়িতে চিঠি লিখবেন। এই নিয়ে একদিন কথান্তর হওয়ায় বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে আলাদা করে হাত-খরচ দিতে লাগলেন। চা-বাগানের শেয়ার থেকে যে টাকাটা আসত, তাও বৈদ্যনাথ ভিন্ন করে রাখলেন। অথচ অবনীমোহন বোনাসের টাকাটা পুরোপুরিই যৌথ-সংসারের তহবিলে জমা দিয়েছেন। বাসন্তী কনক-লতার কাছে কথাটা উল্লেখ করতে ছাড়লেন না। অবনীমোহন আর বৈদ্যনাথ দুজনে মিলে ঠিক করলেন যে, প্রত্যেকেরই ছেলেপুলে হয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎটা আর না দেখলে চলে না। রোজগারের সব টাকা যদি কেবল বাজার আর বাড়ি ভাড়াতেই ব্যয় হয়ে যায়, দু-দিন পরে কি হবে। স্থির হল খোরাক পোশাক আর বাড়িভাড়াটা যৌথ তহবিল থেকে ব্যয় হবে। অন্য খরচ যার যার নিজের তহবিল থেকে করবেন। ইনসিও-রেন্সের প্রিমিয়াম আলাদা আলাদা দেবেন, সে হিসেব সাধারণ জমা-খরচের খাতায় লেখা হবে না। বছরখানেক বাদে পোশাকের বেলাতেও অসুবিধে দেখা গেল। কনকলতার শাড়ি দু-তিনখানা বেশি লাগে। আধময়লা কাপড়ও তিনি পরতে পারেন না। ফলে ধোপা-খরচ বেশি হয়ে যায়। একদিন মাসের শেষে দেখা গেল, তাঁর সবগুলি শাড়িই ছিড়ে গেছে। একজোড়া শাড়ি না কিনলেই নয়। বাসন্তী মুখ ভার করে বললেন, 'তহবিলে যা আছে, তা থেকে যদি শাড়ি কেনার টাকা নাও দাদা, একদিনও আর বাজার চলবে না।' বৈদ্যনাথ গম্ভীর মুখে চুপ করে রইলেন। হঠাৎ কোন কথা বললেন না।

বাসন্তী বললেন, 'আর এই বা শাড়ি পরার কি ধরন। দুজনের শাড়ি তো এক সঙ্গেই এসেছে, কই আমি তো দিব্যি পরছি। আমাকে কে কয় জোড়া শাড়ি বেশি এনে দিয়েছে। আর সপ্তাহে দু-বার করে এত যদি ধোয়ানো হয়, কাপড় কি টেঁকে? কাপড় তো সুতোরই তৈরী, লোহার তো নয়।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'থাক থাক। তোর আর বক্তৃতা দিতে হবে না। শাড়ির আমি ব্যবস্থা করছি।'

বৈদ্যনাথ মাসের শেষে বেশ একজোড়া মিহি চওড়াপেড়ে নতুন শাড়ি কিনে দিলেন স্ত্রীকে।

বাসন্তীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। রাত্রে স্বামীকে বললেন, 'একি এক-চোখামি বল তো।'

অবনীমোহন বললেন, 'ছি ছি ছি থামো। তাঁর স্ত্রীকে তিনি আলাদা করে কাপড় কিনে দিয়েছেন, এতে আমাদের বলবার কি আছে।'

বাসন্তী বললেন, 'বলবার কিছু থাকত না, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে আলাদা করে অমন জোড়ায় জোড়ায় শাড়ি কিনে দিতে পারতে। আমার শাড়িও তো ছিঁড়ে গেছে। আমি কি পরে বেড়াচ্ছি, তা সংসারের কার চোখে পড়ল।'

অবনীমোহন বললেন, 'আঃ, থামো।'

কিন্তু বাসন্তী তখনকার মত থামলেও দিনের বেলায় প্রসঙ্গটা উল্লেখ করতে ছাড়লেন না।

কনকলতাও অধীর হয়ে বললেন, 'কি জানি, এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবস্থা তো আমি জন্মেও দেখি নি। একজন শাড়ি পরলে আর একজনের চোখ টাটাবে। বাজারে তো আর শাড়ির অভাব নেই। গিয়ে কিনে নিলেই হয়। কেউ তো কারো ঘাড়ে বসে খাচ্ছে না। যার যার রোজগারে সে সে খাচ্ছে পরছে। তার এত কথা কিসের।'

তবু কথার পিঠে কথা চলতে লাগল। কথান্তর হল এই নিয়ে। শেষে ব্যবস্থা হল খোরাকটাই শুধু একসঙ্গে চলবে, পোশাকের খরচ যার যার তার তার। কনকলতা নিজে আলাদা ধোপার খাতা খুললেন: 'শ্রীকনকলতা দত্ত।' নিজের নামটা নিজের চোখেই বড় সুন্দর লাগল দেখতে। নিজের খরচটা নিজের হাতে আসায় দেখা গেল, সপ্তাহে দু-বারের বদলে দেড় সপ্তাহে একবার ধোয়ানো হচ্ছে তাঁদের ঘরের জামা-কাপড়।

হিসেবটা স্বামীকে বাসন্তীই বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখলে বউদির কাণ্ড? যখন একসঙ্গে ছিলাম, তখন দু-দিনের বেশি এক শাড়ি পরতে পারত না। এখন তো বেশ পারে।'

পোশাকের পর আলাদা হল দুধ আর জলখাবার। কারণ দুধ নিয়েও একদিন কথা উঠেছিল। অসময়ে বাসন্তীর দেওর মৃগাঙ্কের একদল বন্ধু এসে হাজির, তাদের চা করে দিতে দিতে বাড়ির সব দুধ গেল ফুরিয়ে। রাত্রে আর দুধ মিলল না। কোলের মেয়ে বিরক্ত করায় রাগ করে তার পিঠে গোটাকয়েক চড় দিলেন কনকলতা। মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল। বৈদ্যনাথও কম চেঁচালেন না।

তারপর থেকে দুধ আর জলখাবারের বন্দোবস্ত আলাদা হয়ে গেল। যৌথ রইল শুধু ভাত ডাল মাছ তরকারি।

কিন্তু একদিন তা নিয়েও গোলমাল বাধল। কনকলতার ঘুম থেকে উঠতে সাধারণত দেরি হয়। এদিকে অফিসের ভাত দিতে হলে অত দেরিতে উঠলে চলে না। বাসন্তীই আগে উঠে উনোনে আঁচ দিয়ে রান্না চড়িয়ে দেন। কিন্তু সেদিন বাসন্তী উঠলেন না, বললেন, তাঁর শরীর ভাল নেই—জ্বর হয়েছে।

কনকলতা উঠে দেখেন ভোরের কাজ সব পড়ে রয়েছে। উনোনে আঁচ দেওয়াও হয় নি। বাসন্তীর ঘরে গিয়ে বললেন, 'ব্যাপার কি ঠাকুরঝি। আজ কি সব অফিস আদালত বন্ধ। এখনও শুয়ে রয়েছ যে?'

বাসন্তী লেপের ভিতর থেকে বললেন, 'এমন কি দাসখত লিখে দিয়েছি সংসারে যে, শরীর খারাপ হলেও একটু কাল শুয়ে থাকতে পারব না? কি এমন দায় পড়েছে যে, অসুখ নেই বিসুখ নেই রাত থাকতে উঠে নিত্যি আমাকে হাঁড়ি ঠেলতে হবে? অফিসের ভাত তো কেবল আমার ঘরের জন্যেই হয় না, সকলের ঘরের জন্যেই দরকার হয়।'

কনকলতা একটু কাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বললেন,'ও, সেই কথা বল। মিথ্যে অসুখ-বিসুখের অজুহাত এতক্ষণ দিচ্ছিলে কেন। কাল রাত্রে বলে দিলেই পারতে যে, তুমি আজ রাঁধতে পারবে না, আমাকে রাঁধতে হবে। এমন তো নয়, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে খাই, আর সংসারের সব কাজই তুমি দেখ।'

বাসন্তী বললেন, 'দেখিই তো। এর চেয়ে আবার বেশি দেখবার ক্ষমতা আছে কার! অসুখ নেই বিসুখ নেই, ঠাকুরঝিকে তো ঝি-এর মত খাটিয়ে নিচ্ছ, তবু তোমার আশ মেটে না বউদি?'

কনকলতা বললেন, 'বেশ খেট না। দেখি সংসার চলে কি না চলে। কেবল কি আমার জন্যেই খাটছ, আমার আর ক'জন লোক। নিজের সংসারের জন্যে নিজে খাটবে, তার আবার অত খোঁটা কিসের। খাই না খাই খোঁটা আমি কারো শুনতে পারব না।'

ভুবনময়ী এসে বললেন, 'কি হল আবার। রোজ কাজ নিয়ে তোদের খিটমিট, ছি ছি ছি। তিন শ' পঁয়ষট্টি দিন একহাতে বত্রিশজন লোকের হাঁড়ি ঠেলেছি। তাও দু-এক বছর নয়, বছরের পর বছর। চেঁচামেচি দূরের কথা, আমার মুখের কথাটি কেউ শুনতে পায় নি। আর তোরা কেবল নিজের সোয়ামী-পুতকে ভাত রেঁধে দিতে বাড়ি মাথায় করে নিয়েছিস। তোদের কারো কিচ্ছু করতে হবে না। আমি রাঁধব। যাস নে তোরা কেউ রান্নাঘরে।'

কিন্তু এভাবে সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হল না। কনকলতা নিজে গিয়ে উনোনে আঁচ দিয়ে ভাত চড়ালেন। সেই সঙ্গে মেজাজও চড়তে লাগল।

বৈদ্যনাথ নিচে নেমে এসে বললেন, 'এ কি কেলেঙ্কারি। কাজ নিয়ে রোজই তোমাদের মধ্যে ভাগাভাগি ঠেলাঠেলি লেগেই আছে। এর চেয়ে হাঁড়ি আলাদা করে নিলেই হয়।'

বাসন্তী বললেন, 'তোমার মনের ইচ্ছেটা তো তাই দাদা।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'কেবল আমার মনের কেন, সকলের মনেরই সেই ইচ্ছে। শুধু আমার মুখ দিয়ে বার করানোটা ছিল তোদের মতলব। বেশ দিলুম বের করে। আমি অত ঢাক-ঢাক গুর-গুর পছন্দ করি নে। আমি সোজা কথার মানুষ। এক হাঁড়িতে বনিবনাও হচ্ছে না। বেশ, হাঁড়িটা আলাদা করে নাও, তাতে লজ্জা কিসের। এ তো আর দুই ভাই নয়, ভাই বোন। দুজনের দুই আলাদা সংসার। একসঙ্গে জোর করে মেশাতে গেলে মিশবে কেন।'

অবনীমোহনকেও বৈদ্যনাথ বুঝিয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে সঙ্কীর্ণচেতা মনে করতে পার।'

অবনীমোহন বাধা দিয়ে বললেন, 'না সে কি কথা।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'আমি একটা প্রিন্সিপল্ নিয়ে চলি। আমার প্রিন্সিপল্ হচ্ছে শান্তিতে থাকা। দেখা যাচ্ছে, আমরা যে ভাবে আছি তাতে শান্তি থাকছে না। ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই আছে। মেয়েদের রান্নাবান্নার ব্যবস্থা আলাদা করে না দিলে এ ঝগড়া মিটবে না। মাঝখান থেকে বিরোধ আরও বেড়ে যাবে।'

অবনীমোহন একটু হাসলেন, 'শুধু রান্নার হাঁড়ি-উনান আলাদা করলেই কি সব ঝগড়া মিটবে?'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'অনেকখানি মিটবে। অন্তত রোজ এমন গোলমাল বাধবে না।'

তাই হল। খুব বেশি যে ঝগড়া-ঝাঁটি হল তা নয়। দুই ভাই আলাদা হতে গেলে যে হাঙ্গামা লাগে, রাগ দুঃখ ভাবাবেগের পাল্লা উল্টোপাল্টা চলতে থাকে, এক্ষেত্রে তা হল না। তাঁদের পক্ষে স্বতন্ত্র থাকাটাই স্বাভাবিক, একথা দুই পরিবারের সকলেই বুঝতে পেরেছেন। পাঁচ বছর আগে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পৃথকান্নে ছিলেন। এখনও তাই থাকবেন, এতে অস্বাভাবিকতার কি আছে।

অবস্থাটা সকলেই শান্তভাবে মেনে নিলেন। কারো মনে খুব যে বেশি আঘাত লেগেছে তা মনে হল না, শুধু ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন ভুবনময়ী, 'এ তোরা কি করলি, কি সর্বনাশ করলি।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'তুমি থাম তো মা। সর্বনাশ সর্বনাশ করো না। তোমার বুদ্ধিতেই সর্বনাশ হচ্ছিল। দুনিয়াভর যা চলেছে,তার উল্টোটা করতে গেলে চলবে কেন।'

রান্নাঘরখানা বেশ বড়। পশ্চিম দিকে একটা নতুন উনোন পাতা হল। একটু দূরে দূরে ঘরের দুই প্রান্তে বসে বাসন্তী আর কনকলতা দুজনেই রান্না চড়ালেন। ঠিক প্রথমেই পরস্পরের দিকে.কেউ তাকাতে পারলেন না। কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগে। মাঝখানে একটা দেয়াল থাকলে যেন ভাল হত। অন্তত পক্ষে একটা পর্দা।

খানিক বাদে বিরাট স্থূল দেহ নিয়ে ভুবনময়ী এসে বঁটি পেতে মাঝখানে বসলেন। ভুবনময়ী বললেন, 'দাও কার কি কুটতে কাটতে হবে কুটে দিচ্ছি। সাধ যখন হয়েছে আলাদা খাবে খাও। খেয়ে দেখ কি মজা।'

আলাদা আলাদা থালা নিয়ে তুজনেরই তরকারি কুটে দিলেন ভুবনময়ী। চার বছরের দৌহিত্রী প্রীতি এসে বলল, 'দিদা, তুমি কাদের ভাগে? আমাদের না?'

ছ-বছরের পৌত্র বিজু বলল, 'ঈস্, আমাদের। না ঠামা? তাই না?'

ভুবনময়ী বঁটি ফেলে তুজনকেই কোলে টেনে নিলেন, 'হ্যাঁ, এবার তোরা আমাকে কেটে ভাগ করে নে। তাই তো এখন বাকি আছে।'

কিন্তু ভুবনময়ীকে তখনকার মত ভাগ করা হল না। তিনি যৌথই রইলেন। সাধ্যমত তুই পরিবারেরই কাজ করেন। ছেলে আর মেয়ে তুজনেরই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাঁর কাছে শোয়। পৌত্র-পৌত্রী দৌহিত্র-দৌহিত্রী সবারই তিনি পরিচর্যা করেন। ছেলে আর জামাই তুজনেরই খাওয়ার সময় গিয়ে বসেন সামনে। নিজের রান্না নিরামিষ তরকারি বাটিতে করে তুজনের সামনেই এগিয়ে দেন।

ভুবনময়ী ছাড়া এই তুই পৃথক পরিবারে আরও কিছু জিনিস এজমালি রইল, এখনও আছে। বৈঠকখানা নামে বৈদ্যনাথের হলেও এজমালি ঘর হিসাবেই সেখানার ব্যবহার চলে। তুই পরিবারেরই আসবাবপত্র এঘরে আছে। বৈদ্যনাথের আছে দেওয়াল-ঘড়ি আর তক্তপোশ, অবনীমোহনদের আছে খানকয়েক চেয়ার। তুজনেরই বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এখানে এসে বসেন। তুজনেরই বয়স্ক ছেলেদের কেউ কেউ রাত্রে এ ঘরে এসে শোয়। একখানা বাংলা কাগজ রাখেন বৈদ্যনাথ, একখানা ইংরেজী দৈনিক রাখেন অবনীমোহন। একই হকার তুখানা কাগজ একসঙ্গে ফেলে দিয়ে যায়। বাংলা কাগজখানা তুই পরিবারের মেয়েরাই পড়েন, ইংরেজীখানায় তুই পরিবারের পুরুষরাই চোখ বুলোন। বাইরে চিঠির বাক্সও একটাই রয়েছে। তুই পরিবারের চিঠিই এই একই বাক্সে পিয়ন রেখে দিয়ে যায়।

ছাদের ঘরখানা অবনীমোহনের নামে থাকলেও সেখানে খানিকটা অলিখিত এজমালি স্বত্ব আছে বৈদ্যনাথের। তাঁর শ্বশুর কি শালা এলে এঘরে শুতে দেওয়া হয়। পরীক্ষার সময় তাঁর ছেলেমেয়েরাও এই নির্জন ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। কিন্তু অরুণ বাড়ি এলে কেউ আর সে ঘরে ঢুকতে পারে না।

কনকলতা স্বামীকে বললেন, 'তেতলার ঘরে আমাদের যদি একেবারেই কোন অধিকার না থাকে, তাহলে একতলার বৈঠকখানার ঘরও তো—'

বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে ধমক দিলেন, 'বেশি বাড়াবাড়ি করো না। তুমি কি বলতে চাও

বৈঠকখানা ঘরে আমি ওদের যাওয়া বন্ধ করব? ওরা ছোট হতে পেরেছে বলে পাল্লা দিয়ে আমিও ছোট হব? সব কিছুরই একটা সীমা আছে।'

ধমক খেয়ে কনকলতা চুপ করে রইলেন।

বৈঠকখানা ঘরের মালিকানা নিয়ে কনকলতা আর কোন কথাই বললেন না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুধু বললেন, 'আমার তো নিজের ঘর দোর কিছু নেই এ বাড়িতে, আমার ঘরে বাইরের বাজে লোক এসে থাকলেও মুখ ফুটে আমার কিছু বলবার জো নেই। এ বাড়িতে আছি এই পর্যন্ত।'

বাস, আর কিছু বলতে হল না। এতেই সব টের পেলেন বাসন্তী। দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করে শুধু মুখের দিকে তাকালেই একজন আর একজনের মনের ভাব টের পান। মুখের কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না।

কনকলতার মনের ভাব টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাসন্তী চলে এলেন বাইরের ঘরে। মণীন্দ্র ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। সে অবনীমোহনের অফিসের বেয়ারা আর বাড়ির বাজার সরকার। অফিস থেকে কোন রকমে কয়েকদিন ছুটি যোগাড় করতে পারলেই সে অবনী-মোহনের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে দেশে চলে যায়। ছোট ভাইয়ের অভিভাবকত্বে এখনও তার বউ আর ছেলেমেয়েরা পাকিস্থানের গাঁয়ের বাড়িতেই রয়েছে। মণীন্দ্র নিজে কলকাতায় থাকে। মন পড়ে থাকে দেশে। এবার ছুটি পেয়ে অসুস্থ দেহ নিয়েও সেখানে ছুটেছে।

এ ঘরে জোড়া তক্তপোশের একখানায় থাকে এখন অতুল আর একখানায় শোয় ঝিন্টু, আর বিন্টু—ওর দুই মামাত ভাই। তারা অনেক আগেই উঠে গেছে। প্রাত্যহিক অভ্যাসমত আজও অনেক বেলায় ঘুম ভেঙেছে অতুলের। উঠে সে কেবল বিছানা গুটিয়ে রাখছে, বাসন্তী এসে দাঁড়ালেন, 'তোর বিছানা আর এখানে রেখে দরকার নেই। ওপরে নিয়ে যা।'

অতুল মার দিকে তাকাল, 'কি যে বল তার ঠিক নেই, ওপরে কোথায় রাখব!'

বাসন্তী বললেন, 'তোর দাদার ঘরে। আজ থেকে সেখানেই শুবি তুই।'

অতুল বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে মা? অতটুকু ঘরে একসঙ্গে শোয়া যায়?'

বাসন্তী বললেন, 'বাড়িতে আর জায়গা না থাকলে কি করবি?'

অতুল বলল, 'কেন এ ঘরে তো যথেষ্ট জায়গা আছে। এ ঘরের কি দোষ হল?'

বাসন্তী গম্ভীরভাবে বললেন, 'না, এ ঘরে তোদের আর থাকা চলবে না।'

অতুল মুহূর্তকাল মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'ফের বুঝি তোমাদের ভাই-বোনের মধ্যে শরিকী বিবাদ শুরু হয়েছে? তোমাদের জ্বালায় আর পারলাম না মা। তা ভাই-বোনে যত খুশি ঝগড়াঝাটি কর, কেউ তো বাধা দিচ্ছে না। আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন বাবা। আমাকে এখান থেকে কেউ নড়াতে পারবে না। তোমার দাদা তো দাদা, তোমার মরা বাপ যদি চিতে থেকে উঠে আসে তারও সাধ্য নেই আমাকে বেদখল করে। ভূতে মানুষে এক হাত লড়ব, তারপর যা হয় কিছু একটা সেটেলড হবে।'

মনে এত অশান্তি সত্ত্বেও ছেলের কথায় বাসন্তী না হেসে পারলেন না। হাসি চেপে বললেন, 'বাঁদর কোথাকার, আমার বাবা পুণ্যাত্মা ছিলেন। তিনি মরে স্বর্গে গেছেন, তিনি কেন ভূত হতে যাবেন, ভূত তো তুই নিজে।'

অতুল বলল, 'আমি তো ভূতই। সেইজন্যেই তো তোমাদের মত মানুষের সঙ্গে আমার বনে না।'

বাসন্তী বললেন, 'হ্যাঁ, যত দোষ তো আমাদেরই। জোয়ান ছেলে। পড়াশুনা করলি নে, চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখলি নে। পাড়াময় কেবল হৈ-হৈ করে বেড়াবি। হ্যাঁ রে, এমনি করেই কি দিন যাবে? এই তো দাদার চাকরিটি গেল, কাকা যা করে তাতে তাদের নিজেদেরই কুলোয় না। সমস্ত ভার ওই একজন মানুষের ঘাড়ে। সংসারের জন্যে একটুও ভাবনা হয় না তোর?'

অতুল বলল, 'ভেবে কি করব!'

বাসন্তী বললেন, 'তা তো ঠিকই। বাড়ির সঙ্গে তোর কেবল খাওয়া আর শোওয়ার সম্পর্ক। আর তো কোন সম্পর্ক নেই। সারাদিনের মধ্যে আর তোর টিকিটিও দেখা যাবে না। রাত্রেও ফিরবি সেই বারোটা একটায়। কাল কখন ফিরেছিলি?'

অতুল বলল, 'সে খবরে তোমার দরকার কি?'

বাসন্তী বললেন, 'তা তো ঠিকই! সে খবরে আমার দরকার কিসের! আমি মা। তোমার চলা-ফেরার খবর আমি রাখব না, রাখবে পাড়াপড়শী। তারাই তো রাখছে। তাদের কাছ থেকেই তো সব খবর কানে আসছে আমার। শোন অতুল, আজ থেকে তুমি ওপরে না শোও আমার ঘরে গিয়ে শোবে। আর সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরবে। অত রাত করতে পারবে না। কথা যদি না শোন অনর্থ হবে আমি বলে দিলুম।'

থলিতে করে নিজেদের বাজার নিয়ে বৈদ্যনাথ এসে ঢুকলেন। অন্দরে যাওয়ার

পথ এই ঘরের ভিতর দিয়েই। দাদাকে দেখে বাসন্তী তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। কেউ কোন কথা বললেন না।

'বেগুন কত করে আনলেন মামা ?' অতুল একপাশে দাঁড়িয়ে পরম নিরীহ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু বৈদ্যনাথ একথার কোন জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি সোজা ভিতরে চলে গেলেন।

অতুল পিছন থেকে অস্ফুটস্বরে বলল, 'তোমার দাদার মুখ একেবারে—' বাকি কথাটুকু মুখে না বলে দুই হাতের ভঙ্গিতে একটি হাঁড়ির আকার মাকে দেখাল অতুল।

বাসন্তী হাসি চেপে বললেন, 'বাঁদর কোথাকার। তোর না মামা, গুরুজন না তোর !'

অতুল বলল, 'তাতে কি। তোমার না দাদা, গুরুজন না তোমার ? আমি না হয় হাত দিয়ে ওর হাঁড়ি-মুখের নকল করেছি। আর তুমি ? তুমি তো নিজের মুখখানাসুদ্ধ হাঁড়ি বানিয়ে ওকে ভ্যাংচাচ্ছ।'

অতুল এবার বিছানাটাকে গুটিয়ে জায়গামত রেখে দিল। তারপর হাতমুখ ধোয়ার জন্যে চলে গেল ভিতরে।

বাসন্তী পিছন থেকে ওর দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই আর একবার বললেন, 'বাঁদর।'

হাত-মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে ঢুকে অতুল হাঁক দিল, 'এই প্রীতি আমার জন্যে চা-টা কিছু রেখেছিস নাকি ? রেখে থাকলে দে।'

কেটলিতে চা করাই ছিল, প্রীতি তার থেকে এক কাপ চা আর ছোট বাটিতে করে এক বাটি মুড়ি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও দাদা।'

অতুল চায়ে চুমুক দিয়েই বলল, 'ঈস্, একেবারে সরবৎ করে রেখেছিস।'

প্রীতি অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'খুব জুড়িয়ে গেছে বুঝি ? দাও আর একবার গরম করে দিচ্ছি !'

অতুল মাথা নেড়ে বলল, 'দিয়েছিস এই ঢের। আমার ওপর যা তোদের দরদ আর ভক্তি-শ্রদ্ধা সবই আমার জানা আছে।'

বলে অতুল চা আর মুড়ির বাটি শেষ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। ভুবনময়ী সদর দরজায় ওর পথ আটকে ধরলেন, 'বেরুচ্ছিস বুঝি ?'

অতুল বলল, 'হ্যাঁ।'

ভুবনময়ী বললেন, 'সারা শহর ভরে তো টই-টই করে ঘুরিস। সুবিমল যে চলে গেল তার একবার খোঁজ খবর নিবিনে তোরা ?'

অতুল গুনি নি গুনি নি করে বেরিয়ে গেল।

শুধু অতুলকেই নয়, যার সঙ্গে দেখা হল ভুবনময়ী তাকেই বললেন, 'তোমরা স্থবিমলের কেউ একটা কোন খোঁজ করলে না? এটা কি উচিত হচ্ছে, শত হলেও এ বাড়ির জামাই তো সে?'

বৈদ্যনাথকে ডেকে বললেন, 'হ্যাঁ রে বৈদ্য, আর কারো না পুড়ুক তোর তো পোড়ে, তুই এমন গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছিস কেন? বেরিয়ে দেখ একটু চেষ্টা চরিত্র করে।'

বৈদ্যনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ, তুমি একটু চুপ করো তো মা। যা করবার করা যাবে, তুমি একটু থামো।'

ভুবনময়ী বললেন, আমি তো চুপ করেই আছি। কিন্তু কথা না বললেও চলে না দেখছি। তোমরা একটা না একটা অনাসৃষ্টি বাধাবেই বাধাবে।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'তুমি কথা বললেই কি অনাসৃষ্টি সব আটকে থাকবে?'

নিচ থেকে শ্যালক আর শাশুড়ীর আলাপ শুনে নিয়ে অবনীমোহন স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'শোন।'

বাসন্তী রান্না ঘরে যাচ্ছিলেন, স্বামীর ডাকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'কি বলছ?'

অবনীমোহন বললেন, 'স্থবিমলের একটা খোঁজ খবর করা সত্যিই তোমার উচিত ছিল।'

বাসন্তী রেগে উঠে বললেন, 'আমার উচিত ছিল? কেন স্থবিমল কি আমার জন্যেই চলে গেছে? বাড়ি থেকে আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি বলতে চাও। সংসারে আমার দোষ ছাড়া কি আর কারো দোষই চোখে পড়ে না?'

জামা-কাপড় পরে অরুণ পাড়ায় বন্ধুবান্ধবদের খোঁজ খবর নিতে যাচ্ছিল, মা বাপের ঝগড়া শুনে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি হয়েছে মা, আজ আবার কি চেঁচামেচি শুরু হল তোমাদের?'

বাসন্তী বললেন, 'তোমরা তো কেবল আমার গলা, আমার চেঁচামেচিই শোন, সংসারে আর তো কেউ কোন কথাও বলে না, আর কারো কোন দোষও নেই।'

অরুণ বলল, 'হয়েছে কি শুনি।'

বাসন্তী বললেন, 'হবে আবার কি, স্থবিমলকে আমি যেতে বলেছি, আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। সব দোষ হল আমার। ঘরের লোকে যদি মিথ্যে এমন বদনাম দেয় নাস্ত,

বাইরের লোকে কি ভাবে বল তো। রাতদিন কথায় কথায় এই যন্ত্রণা আমার আর সয় না, তোরা এখন বাড়ি ঘরে এসেছিস, আমার একটা ব্যবস্থা ট্যবস্থা কর, আমি চলে যাই, উনি থাকুন ওঁর সংসার নিয়ে।'

অরুণ বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাকে মিছামিছি দোষ দিচ্ছেন কেন? সুবিমলবাবু নিজের ইচ্ছাতেই চলে গেছেন।'

অবনীমোহন শান্তভাবে বললেন, 'কেন যে গেছে তা সবাই জানে। কিন্তু গেছে এই কথাটা জেনেই কি তোমরা চুপ করে থাকবে? তাকে খুঁজে আনতে হবে না, তার কাছে একবার যেতে হবে না?'

অরুণ বলল, 'কি করে যাব। তিনি তো শুনেছি কাউকেই ঠিকানা দিয়ে যান নি।'

অবনীমোহন ভাববাচ্যে বললেন, 'ইচ্ছে থাকলে সবই করা যায়। কলকাতায় তার অন্য যে সব আত্মীয়-স্বজন আছে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করতে হয়। ইচ্ছে থাকলে কি একজন লোককে কলকাতা শহরে খুঁজে বের করা যায় না?'

বাসন্তী বললেন, 'হ্যাঁ, অন্য কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে চাকরি-বাকরির চেষ্টা না করে দিনরাত গুষ্টিসুদ্ধ লোক এখন তাকে খুঁজে বেড়াক, তাহলেই সকলের পেট ভরবে। তা ছাড়া সে কি আমাদের কথায় আসবে? আসতই যদি তাহলে অমন সামান্য কথায় চলে যেত না। সেধে ভজে যারা আনতে পারবে তারা গা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে বসে মজা দেখছে আর আমরা এদিকে মরছি ঝগড়া করে। আচ্ছা জ্বালা হয়েছে আমার!'

অরুণ মুহূর্তকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মায়ের এতখানি সঙ্কীর্ণতা যেমন সহ্য করা যায় না, বাবার অর্থহীন ঔদার্যও তেমন অসহনীয় মনে হয় অরুণের। বাবার মধ্যে কোথায় যেন একটা বাড়াবাড়ি আছে। পারিবারিক ছোট ছোট বিষয়-গুলিকে তিনি বড করে দেখেন, সেইজন্যেই বড় বিষয়গুলি ওঁর চোখে পড়ে না। বাবা একান্ত করে পারিবারিক মানুষ হয়ে পড়েছেন। সুবিমল যদি চলে গিয়েই থাকে তা নিয়ে অত মাথা ঘামাবার কি আছে? সত্যিই তো এ বাড়িতে জায়গা হচ্ছে না, নানারকম অসুবিধে হচ্ছে, এ অবস্থায় শ্বশুরবাড়িতে পড়ে থাকা তার পক্ষেও তো তেমন মর্যাদাকর নয়। এই সব নানা দিক ভেবেই সে গেছে। কিন্তু বাবা সেসব মোটেই যেন ভাবতে চাইছেন না। তাঁর দুর্ভাবনা পাছে তাঁর শালা আর শালাবউ তাঁকে অনুদার সঙ্কীর্ণচিত্ত মনে করে। যার যেখানে দুর্বলতা, মনে মনে একটু হাসল অরুণ। তারপর নিজের কাজে বেরিয়ে গেল।

অবনীমোহন ব্যাপারটাকে অন্য দিক থেকে ভেবে দেখেছিলেন। এই সব ছোট ছোট উপলক্ষ্যেই মানুষের হৃদয়কে চেনা যায়। এ ধরনের ছোট-খাটো পরিবারের মধ্যে যাদের চিত্ত উদার নয়, বৃহৎ পরিধিতেও তারা ছোটই থেকে যায়। ঝোঁকের মাথায় হয়ত এক একটা বড় বড় কাজ তারা করে ফেলে, কিন্তু তাতে তারা সত্যি বড় হয় না। ঝোঁকটা সেরে গেলেই তাদের মহত্ত্ব ছেঁড়া বেলুনের মত চুপসে ছোট হয়ে যায়। জোয়ারের জল সরে যাওয়ার পর পাঁকটা তখন আরও বেশি করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সকলের ভাগ্যে তো মহত্তর ক্ষেত্র জোটে না। অল্প-পরিসর চার দেয়াল ঘেরা পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেই বেশির ভাগ জীবন কেটে যায়। তাই দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনকে ছোট বলে তুচ্ছ করা চলে না। এরই মধ্যে মহত্বের, বৃহত্বের অনুশীলন করতে হয়।

অবনীমোহন তক্তপোশ থেকে নামলেন, নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে ঢুকলেন বৈগুনাথের ঘরে। বাজার থেকে এসে বৈদ্যনাথ জমাখরচের খাতায় হিসাবটা সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলছিলেন আর পাশে দাঁড়ানো স্ত্রীকে খরচ কমাবার জন্য উপদেশ দিচ্ছিলেন। অবনীমোহনকে দেখে দুজনেই একবার তাকালেন, কিন্তু কেউ হঠাৎ কোন কথা বললেন না।

অবনীমোহন একটু কাল চুপ করে থেকে কনকলতার সঙ্গেই প্রথম কথা আরম্ভ করলেন, 'কি খুব ব্যস্ত নাকি ?'

কনকলতা বললেন, 'না ব্যস্ত আর কি, বস্থন।'

একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন কনকলতা।

অবনীমোহন একটু রসিকতা করে বললেন, 'তবু ভালো যে ভদ্রতা করে বসতে বললেন। আমি তো ভেবেছিলাম ঘরে ঢুকতেই দেবেন না, যা ঝগড়াঝাটি আপনাদের মধ্যে চলেছে আজকাল। বিপক্ষ শিবিরে ঢুকতেই ভয় হচ্ছিল।'

কনকলতা একটু হাসলেন, 'আপনার সঙ্গে তো আর ঝগড়া হয় নি, তাছাড়া আপনি তো দূত, অবধ্য। বিপক্ষ শিবিরে আপনার ভয় কিসের ?'

অবনীমোহন এলে. পরিহাস করে কথা বললে যত ঝগড়াঝাটিই থাকুক কনকলতা আজকালও হেসেই জবাব দেন, পরিহাসের স্বরটা বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। অবশ্য সব সময় যে প্রসন্নমনে করেন তা নয়, তবু অবনীমোহনের মত মানুষের সঙ্গে ভদ্রতাটা বজায় না রাখলে চলে না।

পরিহাস ছেড়ে আসল কথায় এলেন অবনীমোহন, 'আচ্ছা, সুবিমলের ঠিকানাটা কি, ওর একবার খোঁজ করতে হয় না ? বাড়িসুদ্ধ সবাই যদি আপনারা এমন পাগল

হয়ে ওঠেন, তাহলে চলে কি করে। ওর ঠিকানাটা বলুন, আর কেউ না যায়, ছুটির পর আমি গিয়ে ওর খোঁজ নিয়ে আসব।'

কনকলতার মুখ এবার গম্ভীর হল, বললেন, 'ঠিকানাটা তো সে কাউকে জানিয়ে যায় নি। তাছাড়া অত হাঙ্গামায় আর দরকারই বা কি।'

খরচটা যোগ দিয়ে খাতা বন্ধ করলেন বৈদ্যনাথ, তারপর গামছা কাঁধে নিচে নেমে যেতে যেতে বললেন, 'হ্যাঁ, ওসব হাঙ্গামায় আর দরকার নেই অবনী। যে গেছে তাকে যেতে দাও। এখানে তো সে আর স্থায়ীভাবে থাকবার জন্য আসে নি। চাকরি-বাকরি পেলে দু-দিন পরে তো চলে যেত, না পেলেও যেত, না হয় দু-দিন আগেই গেছে।'

অবনীমোহন বললেন, 'তবু এভাবে যাওয়াটা তো মোটেই ভাল দেখায় না।'

এ কথার আর কোন উত্তর দিলেন না বৈদ্যনাথ, তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন, তাঁর অফিসের বেলা হয়ে গেছে। অবনীমোহন কনকলতাকেই আর একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যিই ঠিকানা জানেন না আপনি? সুবিমল কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গিয়ে উঠল নাকি?'

কনকলতা অবনীমোহনের দিকে তাকালেন, 'যা শিক্ষা হয়েছে, তাতে ফের কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি উঠবে বলে তো মনে হয় না।' বলে একটু হাসতে চেষ্টা করলেন কনকলতা, 'যাই রান্না রয়েছে উনুনে।' তারপর তিনিও বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অবনীমোহন ভালমানুষ সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি ভাল বলে সংসারের মন্দ জিনিসগুলি তো আর আটকে থাকে না। অন্যায় অবিচার যা হবার তা হয়ই।

দুজনে চলে যাওয়ার পরেও একটু কাল বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অবনী-মোহন। যে আশা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, তা সফল হয় নি। তিনি এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু ওরা এগিয়ে এল না। এত সহজে যেন ওরা বিরোধের মীমাংসা করতে চায় না, মনোমালিন্যটা জীইয়ে রাখাই যেন ওদের ইচ্ছা। মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন অবনী, একটু যেন অপমানও বোধ করলেন। কিন্তু তার পরক্ষণেই মনে মনে ভাবলেন, না এও ঠিক হচ্ছে না, এভাবেও তিনি অন্যের ওপর অবিচারই করছেন। ওরাই আঘাত পেয়েছে বেশি, দুঃখ পেয়েছে বেশি। রাগ অভিমান ওদের তো হবারই কথা। একবারের চেষ্টায় ওদের মনের রাগ যদি না মেটে, অবনীমোহন ওদের দোষ দিতে পারেন না।

অবনীমোহন কোন কথা বললেন না। এতদিন তাঁরও তাই ধারণা ছিল, জোর করে লাভ নেই। জবরদস্তীতে ফল খারাপ হয় বেশি। নিজের স্ত্রী-পুত্র সম্বন্ধে এই ধারণা নিয়ে

চলেন অবনীমোহন। ছেলেমেয়েদের তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন। লেখাপড়ার জন্ত যতটুকু লক্ষ্য রাখবার রেখেছেন। বেশি জোর খাটান নি। স্বাভাবিকভাবে ওরা গড়ে উঠুক। যে যা হতে পারে তাই হোক। কিন্তু সবাই আশানুরূপ হচ্ছে কই। খুঁটিনাটি নিয়ে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বাসন্তীর কলহ লেগেই আছে। স্বামী-পুত্রের গণ্ডীঘেরা ছোট সংসারের বাইরে সে একটি পা বেশি ফেলতে অনিচ্ছুক। বড় ছেলে এম. এ. পাশ করেছে কিন্তু ভাল রকম চাকরি-বাকরি কিছু জোটাতে পারে নি। সবচেয়ে ভাবনার কথা, সে একটু বেশি রকম আত্মপরায়ণ। সংসারের সম্বন্ধে তার মমত্ব কই, অবনী যেমনটি চান তেমন ঔদার্য কই তার মনে। মেজো অতুলের তো পড়াশুনা কিছুই হল না। দিনরাত আড্ডা আর বন্ধুবান্ধব নিয়েই আছে। অনেকের ধারণা, অবনীমোহনের ঔদাসীন্যেই এমন হয়েছে। বাজে কথা। যে যেমন হবার তেমন সে হবেই। অবনীমোহন কি গোড়ার দিকে কম যত্ন নিয়েছেন, কম লক্ষ্য রেখেছেন ওর ওপর। তবু হল না, পড়াশুনার দিকে ওর মন গেল না। ওর অবাধ্যতার জন্যে মাঝে মাঝে অবনীমোহনের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে। নিজের হাতে ওকে বেত মেরেছেন, বেঁধে আটকে রেখেছেন ঘরে, তার ফল আরও খারাপ হয়েছে। সব দেখে শুনে অবনীমোহন ওর নিজের মতিগতির উপরই ছেড়ে দিয়েছেন ওকে। আর জোর করবেন না। ও যা হতে চায়, ও যা হয়ে ওঠে, তাই হোক। কিন্তু তাতেও সমালোচনার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। নিন্দাটা শুনতে হয়েছে বেশির ভাগ স্ত্রীর কাছ থেকে। বাসন্তী বহুদিন বলেছেন, 'তোমার জন্যেই এমন হল, তোমার জন্যেই ও এমন বিগড়ে গেল, তুমি ওকে মোটে শাসন করবে না।'

অবনীমোহন বলেছেন, 'যখন শাসন করেছি, তখন তো তুমি ঠিক উল্টোটাই বলেছ।'

বাসন্তী জবাব দিয়েছেন, 'বলব বই কি। তোমার সবটাই বেশি বেশি। যখন শাসন করেছ, তখন শুধু শাসনই করেছ, আবার আজকাল একেবারে নির্বিকার, খোঁজ খবর তত্ত্বতালাসই করছ না। এইভাবে কি আর ছেলেপুলে মানুষ হয়? দেখ না দাদা কি করে।'

তা ঠিক। বৈদ্যনাথের মত সংসারকে অমন আঁটসাট করে বাঁধতে পারে নি অবনীমোহন। বৈদ্যনাথ প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। তাদের শাসনও করেন, স্নেহও করেন। বাপকে ছেলেমেয়েরা ভয়ও করে, শ্রদ্ধাও করে। সব বিষয়েই বৈদ্যনাথের একটা পরিমিতি বোধ আছে। নিজের পছন্দ অপছন্দটাকে জোর গলায় তিনি জাহির করতে পারেন, নিজের রীতিনীতি আদর্শকে তিনি ঠিক জায়গামত প্রয়োগ করতে পারেন। সেই আদর্শ, সেই পদ্ধতি অবনীমোহন হয়তো বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তবু নিজের মতে পথে চলতে পেরে বৈদ্যনাথ তো মোটামুটি সুখেই আছেন। স্ত্রী কি ছেলে-

পুলে নিয়ে তাঁর কোনরকম অশান্তি আছে বলে তো মনে হয় না। শুধু অবনীমোহনেরই যেন নিজের ওপর তেমন আস্থা নেই, সুখী হবার মত জোর নেই মনের।

শুধু কি স্ত্রী-পুত্র সম্বন্ধে, নিজের ভাই সম্পর্কেও অবনীমোহনের চিত্ত এমনি দ্বিধাগ্রস্ত। মৃগাঙ্ক তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তবু বাবা মারা যাওয়ার পর ছেলেবেলা থেকে ভাইকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করেছেন, সব রকম স্বাধীনতা দিয়েছেন, কোনদিন তেমন কোন কড়া কথা বলেন নি, কিন্তু সে কি তার আশা পূর্ণ করেছে? মৃগাঙ্ক অবশ্য সংসারী। কিন্তু সে ব্যাপক ভাবে সমস্ত পরিবারটির কথা ভাবতে চায় না, ভাবতে পারে না। বাইরে তার নিজের খেয়াল আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, আর ঘরে অবসর যাপনের জন্যে আছে নিজের স্ত্রী-পুত্র। কোন সাংসারিক পরামর্শে সে আসে না, কোন চিন্তাভাবনার ভাগ নেয় না। মাস অন্তে মাইনের সামান্য ভগ্নাংশ দাদার হাতে পৌঁছে দিয়েই খালাস। তাতে কি হয়।

অবনীমোহন একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আর টাকা কি করলি?'

মৃগাঙ্ক জবাব দিয়েছিল, 'আগের দেনাটা আছে তাই শোধ করতে হচ্ছে।'

অবনীমোহন আর কোন কথা বলেন নি। কিন্তু বাসন্তী পীড়াপীড়ি করতে ছাড়েন না, 'নিজে তুমি মুখ ফুটে বল, এমন করলে চলে নাকি, যা দেয় তাতে তো ওদেরই হয় না।'

অবনীমোহন বলেছেন, 'ছিঃ, চুপ কর। একান্নবর্তী পরিবারে ওদের আর আমাদের বলে আলাদা কিছু নেই, সবই আমাদের। যতদিন পারব চালিয়ে যাব।'

বাসন্তী বলেছেন, 'চালাতে আর পারছ কই, দেনাদায়ে ক্রমেই তো তলিয়ে যাচ্ছ। ওদের এবার বুঝিয়ে বল।'

অবনীমোহন একটু চুপ করে থেকে শেষে বলেছেন, 'বলবার আর কি আছে। যখন বুঝবে তখন না বললেও বুঝবে। আর যদি বুঝতে না চায় আমি হাজার বললেও কি বোঝাতে পারব। মিছামিছি অশান্তির সৃষ্টি করে লাভ কি?'

বাসন্তী রাগ করে পাশ ফিরে শুয়েছেন, 'বেশ, থাকো তুমি তোমার শান্তি নিয়ে।'

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি মনের মধ্যে পাচ্ছেন কই অবনীমোহন। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এ-ও ঠিক হচ্ছে না, ও-ও ঠিক হচ্ছে না। ঠিক মত চলছেন না তিনি, ঠিকমত কর্তব্য পালন করছেন না। ছোটদের কর্তব্য নির্দেশও তাঁর কর্তব্য। ওদের একবার বলতে হবে। কিন্তু বলতে গিয়ে বলতে পারেন নি অবনীমোহন, পিছিয়ে এসেছেন। যদি ওরা ভুল বোঝে, যদি ওরা তাকে ছোট মনে করে, কিংবা যদি তিনি সত্যিই ছোট হয়ে যান। একে তো এই ছোট পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আটকে আছেন। হৃদয়ের পরিধিকে আরও ছোট করলে বাঁচবেন কি করে।

'বাবা অফিসের বেলা হল না আপনার ? নাইতে যাচ্ছেন না যে।' মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকালেন অবনীমোহন।

ভিজে চুলের রাশ পিঠময় ছড়ানো। পরনে হালকা চাঁপা রঙের শাড়ি। চমৎকার মানিয়েছে প্রীতিকে।

প্রীতি আবার বলল, 'তেল গামছা কি ওপরে এনে দেব ?'

অবনীমোহন বললেন, 'না না আমিই নিচে যাচ্ছি চল।'

'অণিমা কই রে ?'

'নিচে আছে। ডেকে দেব বাবা ?'

অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বেরুবার আগে আমার সঙ্গে যেন একবার দেখা করে। বলিস ওকে।'

খেয়ে দেয়ে সাদা খদ্দরের জামার পকেটে পানের ডিবেটা ভরে অবনীমোহন ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছেন, অণিমা এসে নতমুখে দাঁড়াল, 'আমাকে ডেকেছেন পিসেমশাই ?'

অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ', তারপর মৃদু একটু হাসলেন, 'বল তো কেন ডেকেছি।'

অণিমা বলল, 'বাঃ রে, তা আমি কি করে বলব।'

অবনীমোহন বললেন, 'আচ্ছা তবে আমিই বলি। সুবিমলের ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে দাও তো মা।'

অণিমা মুখ নিচু করে বলল, 'ঠিকানাটা তো দিয়ে যায় নি।'

অবনীমোহন বললেন, 'এই বুঝি। আমার কাছে মিথ্যে কথা বলতে হয় ? তাহলে কিন্তু এরপর থেকে কোন দিন আর মা বলব না, মাসী বলব।'

অণিমা বলল, 'কিন্তু সবাইকে জানাতে সে বারণ করেছে !'

অবনীমোহন বললেন, 'আমি তার মধ্যে নিশ্চয় বাদ আছি। ভয় নেই, ঠিকানাটা বলে ফেল। তোমার বাবা মা কেউ নেই ধারে কাছে।'

অনিমা মৃদু হেসে বলল, 'থাকলই বা।'

তারপর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের মেসের ঠিকানাটা বলে দিল পিসেমশাইকে।

সন্ধ্যার পর আবার এসে অবনীমোহন গোপনে সাক্ষাৎ করলেন অণিমার সঙ্গে। বললেন, 'বাবাজীর ক্ষমতা আছে। মেসে একটি সীট সত্যিই ভাড়া করে নিয়েছে এরই মধ্যে। একটা চাকরির কথাবার্তাও নাকি চলেছে। নিমন্ত্রণ করে এসেছি। রবিবার আসবে। আমার ওপর নাকি তার মোটেই রাগ নেই।'

অণিমা খুশী হয়ে বলল, 'নেই-ই তো। আপনাকে সে সবচেয়ে ভালবাসে।'

'বল কি। সবচেয়ে!'

জামাটা খুলতে খুলতে মৃদু হাসলেন অবনীমোহন। অকর্তব্যের গ্লানি থেকে এতক্ষণে তিনি মুক্ত হতে পেরেছেন।

মাসখানেক বন্ধুমহলে ঘোরাঘুরি করেই কাটল অরুণের। সবাই বলল, 'এসো এসো। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছ ভালই হয়েছে। ওসব দিল্লী-টিল্লী কি আমাদের পোষায়? এত জায়গা তো ঘুরলে, কিন্তু কলকাতার মত এমন শহর কি কোথাও চোখে পড়েছে?'

অরুণকে স্বীকার করতে হল তা পড়ে নি। কিন্তু দু-বছর আগে ছেড়ে যাওয়া কলকাতার সঙ্গে এই কলকাতার যেন অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। সে প্রভেদটা যতখানি মনে মনে টের পাওয়া যায়, ততটা অবশ্য চোখে দেখা যায় না। আবাল্যের পরিচিত এই পরিবেশের যেন ভিতরে ভিতরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাইরের দিক থেকে সে পরিবর্তন সামান্য। কোন বন্ধুর বিয়ে হয়েছে, কোন বিবাহিত বন্ধু হয়েছে সন্তানের জনক, কোন বেকার বন্ধু চাকরি পেয়েছে, কারো বা উন্নতি হয়েছে চাকরিতে। প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-টালাপ হল, কেউ কেউ বাড়িতে ডেকে চা খাওয়াল, মা বোন কি স্ত্রী দু-একটা কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু ওই পর্যন্তই। আগের মত অন্তরঙ্গতার সুর কারো আলাপ ব্যবহারেই ধরা পড়ল না। কিছুতে যেন এই বন্ধুব্যূহের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে পারল না অরুণ। নিতান্তই বাইরের ঘরের অভ্যাগতের মত রয়ে গেল। অরুণ মনে মনে ভাবল, একি বন্ধুচক্রেরই দোষ না তার নিজেরই অক্ষমতা। চাকরি না থাকায় নিজের মনের হীনতাবোধই তার পরিচিত মহলের এমন একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করছে। তার চাকরি না থাকায় নিজেদের যত অসুবিধা তেমন তো আর কারোরই নয়। তবু অন্য পরিবারের লোকজন মৌখিক সহানুভূতি জানাতে ছাড়ে না, 'কি অরুণ। কিছু সুবিধে-টুবিধে হল? আর যা দিনকাল পড়েছে, চাকরি-বাকরির যা ব্যাপার, তাতে সুবিধে-সুযোগ হবেই বা কি করে?'

অনুকম্পায় একটু কোমল শোনায় তাদের গলা। অরুণের ভারি অসহ্য লাগে। ইতিমধ্যে চাকরির জন্যে চেষ্টা-চরিত্রও শুরু করতে হয়েছে। ওয়ানটেড কলমের বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে আবেদন ছেড়েছে কয়েকটা। দেখা-সাক্ষাৎ করেছে সরকারী বেসরকারী দু-একজন পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে। সকলেই মৌখিক আশ্বাস দিয়েছেন অরুণের জন্যে, তাঁরা অবশ্যই চেষ্টা [illegible]: কিন্তু চেষ্টার ফল এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। অবশ্য এত অল্পেই অসহিষ্ণু হয়ে লাভ নেই। দ্বিতীয়বার তাগিদ দেওয়ার সময় এ পর্যন্ত আসে নি। কিন্তু পারিবারিক অবস্থা সবুর করবার মত নয়। দারিদ্র্যটা ক্রমেই তার চোখের সামনে উদঘাটিত হয়ে উঠছে!

বাবা অবশ্য মুখফুটে কিছু বলেন না। কাকারাও প্রায় নির্বিকার। শুধু মা-ই মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যাঁ রে, কোন ইণ্টারভিউ-টিউর কলও পেলি নে ?'

অরুণ বলে, 'না।'

বাসন্তী একটুকাল চুপ করে থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে নিজের কাজে চলে যান।

পরিবারের খাওয়া-পরার কৃচ্ছ্রতাও ক্রমেই বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তেতলার চিলে-কোঠায় থেকেও একতলার চেঁচামেচি মাঝে মাঝে ভেসে আসে অরুণের কানে। ছোট ভাই রঙ্কু অনুনাসিক সুরে আবদার তুলেছে, 'আজ আমি মুড়ি খাব না মা। রোজ রোজ বাসি মুড়ি খাব নাকি আমি ?'

বাসন্তী ধমক দেন, 'মুড়ি খাবি না, কি খাবি ? কোন্ রাজভোগ তৈরী হয়েছে তোর জন্যে ?'

রঙ্কু বলে, 'আমি বিস্কুট খাব। বড়দার মত আমিও চা আর বিস্কুট খাব মা।'

চিলেকোঠার ঘরে অরুণের জন্যে প্রীতি চায়ের কাপ আর দুখানা বিস্কুট নিয়ে এসেছিল। বাড়ির বড় ছেলে বলে বেকার হলেও এই সম্মান আর মর্যাদাটুকু তার এখনও আছে। মুড়ি অরুণ পছন্দ করে না, খেতে পারে না। তাই চায়ের সঙ্গে কোনদিন বা দুখানা বিস্কুট কোনদিন বা একচিলতে পাঁউরুটি তার বরাদ্দে জোটে।

কিন্তু আজ বিস্কুট দু'খানা হাতে নিল না অরুণ, শুধু চায়ের কাপটি নিয়ে বলল, 'বিস্কুট তুই নিয়ে যা প্রীতি। আমার দরকার নেই।'

প্রীতি বলল, 'তুমি বুঝি রঙ্কুর কথা শুনে অমন করছ দাদা ? রঙ্কুর ওই রকমই স্বভাব। খাওয়া নিয়ে ভারি কোন্দল করে। বিস্কুট দুখানা নাও তুমি। সকালবেলা খালিপেটে চা খাওয়া তো ভাল না।'

অরুণ বিরক্ত হয়ে বলল, 'আঃ, কেন মিছিমিছি বক বক করছিস। বলছি যে খাব না। কথা গ্রাহ্য হচ্ছে না, না ?'

প্রীতি আর কোন কথা না বলে চলে গেল। অরুণ মনে মনে লজ্জিত হল। সত্যি ওকে অমন করে এই সকালবেলায় বকুনি না দিলেই হত। ওর কি দোষ। মেজাজটা আজকাল তার বড় খিটখিটে হয়ে গেছে। কিন্তু এত অল্পেই অধীর হলে চলবে কেন। বেকার-জীবনের এই তো সবে শুরু। এর পর দুরবস্থা যখন আরও বাড়বে, তখন করবে কি ?

তবু এই পারিবারিক পরিবেশ আর ভালো লাগছে না। এরই মধ্যে সব কিছু দুঃসহ হয়ে উঠেছে। কোথাও বেরিয়ে পড়তে পারলে যেন বাঁচে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আলনা থেকে পাঞ্জাবিটা পেড়ে গায়ে চড়াল অরুণ। তারপর স্যাণ্ডেলপায়ে বেরিয়ে পড়ল।

খানিকটা এগুতেই গলির মোড়ে অতুল আর গোবিন্দের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অরুণের। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে আর গল্প করছে।

গোবিন্দ অতুলেরই সমবয়সী। বছর বাইশ তেইশ হবে বয়স। তবে অতুলের মত অত স্বাস্থ্যবান নয়। ফর্সা, বেঁটেখাট চেহারা। দীর্ঘকায় বন্ধুর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে গোবিন্দকে বার বার উধ্বর্মুখ হতে হচ্ছিল।

অরুণ একটু দূর থেকে ওদের দুজনের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। তারপর ভাইকে ডেকে বলল, 'অতুল এদিকে আয়, শোন একবার।' গোবিন্দ অরুণের সামনেই আজকাল সিগারেট খায়, কিন্তু দাদাকে দেখে অতুল হাতের সিগারেটটা একটু আড়াল করে বলল, 'কি বলছ এইখানেই বল না।'

অরুণ বলল, 'না এখানে বলা যাবে না। তুই আয় আমার সঙ্গে।' গোবিন্দ নিরীহ-ভাবে বন্ধুকে সুপরামর্শ দিয়ে বলল, 'যা না অতুল, অরুণদার যখন বিশেষ দরকারী কথা আছে শুনে আয় না। আমিও যাচ্ছি এবার। পরে দেখা হবে।'

গোবিন্দ চলে গেলে অতুল ফের জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছ?'

অরুণ বলল, 'চল, কোন একটা জায়গায় গিয়ে বসি। চা খাবি?'

অতুল বলল, 'না, কি বলছিলে বল। আমার অন্য কাজ আছে।'

অরুণ এবার অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'কাজের মধ্যে তো দিনরাত কেবল আড্ডা দেওয়া। আর কি কাজ আছে তোর?'

অতুল স্থিরদৃষ্টিতে দাদার দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল, তারপর রাগ চেপে মুখে একটু হাসি টেনেই বলল, 'তাতে কি আর এসে যায়। তুমি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াও। আমি আমার বন্ধুদের কাছে যাই।'

বছর দুয়েকের বড় এই দাদাকে ছেলেবেলা থেকেই অতুল তেমন আমল দেয় নি। বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে অরুণও যখন তাকে শাসন করতে এসেছে, অতুল ভারি অপমানবোধ করেছে। না হয় রাতদিন তোতাপাখীর মত বই মুখস্থ করে গোটা কয়েক পাশই করেছে, কিন্তু তাই বলে এমন কি অধিকার হয়ে গেছে ওর যে অতুলকে শাসন করতে আসবে? ওই তো চেহারা, ওই তো শক্তিসামর্থ্য। এক ঘুঁষি দিলে আর এক ঘুঁষির জায়গা যার দেহে নেই তার আবার অত বড়াই, আর দাদাগিরি ফলানো কেন। আগে আগে অতুলের এই ছিল মনোভাব। ভাবকে মাঝে মাঝে ভাষাতে যে প্রকাশ না করেছে, তা নয়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতুলের প্রকাশভঙ্গি আজকাল কিছু কিছু বদলেছে। এখন সে সব সময় সবাইকে সোজাসুজি গালাগালি দেয় না, ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে শ্লেষব্যঙ্গও করে। অরুণ একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'আমি কি করছি না

করছি তা তোর দেখতে আসতে হবে না।'

অতুল বলল, 'কেবল আমি কি করছি না করছি তাই বুঝি তুমি দেখে বেড়াবে? তুমি আমার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াবে, আর আমি কিছু বলতে গেলেই বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?'

অরুণ মুহূর্তকাল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সরে এল সেখান থেকে।

গলি থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ভিতর ঢুকে পড়ল অরুণ। এই গাছপালা-তৃণগুল্মহীন পার্কটি ছেলেবেলা থেকেই অরুণের খুব প্রিয়। স্কুল-কলেজের শেষে কত সকাল-সন্ধ্যা এই পার্কে তার কেটেছে। অতুল এখানে ব্যায়াম করেছে,কসরৎ দেখিয়েছে, অরুণ নিজের সহপাঠী বন্ধুকে নিয়ে একটি বেঞ্চ দখল করে তার সঙ্গে একটা গল্প করে চলেছে। সম্ভ-পঠিত উপন্যাসের আলোচনা থেকে শুরু করে দর্শন, রাজনীতি কিছুই বাদ থাকে নি। সেসব বন্ধুরা এখন এখানে সেখানে ছিটকে পড়েছে। যারা কাছা-কাছি আছে, তাদের সঙ্গে মনের যোগ নেই। এই মুহূর্তে হঠাৎ নিজেকে ভারি নিঃসহায় নির্বান্ধব মনে হল অরুণের। পার্কটার দক্ষিণে পায়চারি করতে করতে ভাবল, অতুলের চালচলন নিয়ে কোন কথা বলতে না যাওয়াই তার উচিত ছিল। ওর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে, আর কোন সম্পর্ক তো তার নেই। প্রাপ্তবয়সে ভাই বন্ধুর স্থান নেয়। সে হয় সুহৃদ। পরস্পরের মধ্যে সেই সৌহার্দ্যই যদি না জন্মাল, তা হলে রক্তের সম্বন্ধের দাবীটা খুব বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। অতুল যে শুধু কম লেখাপড়া জানে, তাই নয়, অল্পবিদ্যার জন্যে লজ্জা, সঙ্কোচ, বিনয়ের বালাইও তার নেই। আর অরুণকে ছেলেবেলা থেকেই সে ঈর্ষা করে। অল্পবয়সে পিঠাপিঠি দুই ভাইয়ের মধ্যে হিংসা থাকাটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বয়স বাড়ার পরেও সেই বিদ্বেষভাবটা অতুলের মোটেই কমে নি। শিক্ষিত বিদ্বান ছেলে হিসাবে পরিবারে, পাড়ায় অরুণের সম্মান বেশি, এটা অতুল এখনও ভাল-ভাবে নিতে পারে না। তার ধারণা অরুণ অনেক জিনিস ফাঁকি দিয়ে আদায় করে। তার ধারণা অরুণ অনেক বেশি পায় বলেই অতুল তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। এই ধারণা যাতে ভাঙে, তার জন্যে অরুণ কম চেষ্টা করে নি। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে ভাল ব্যবহারও করে দেখেছে। মাঝে মাঝে নিজের অল্পদিন ব্যবহার করা জামাজুতা উপহার দিতে গেছে ভাইকে, কিন্তু অতুল কিছুতেই তা নেয় নি। পাড়ার বন্ধুদের কাছ থেকে চেয়ে আনা ছেঁড়া জামা আর পুরনো র‍্যাপারও তাকে গায়ে দিয়ে ঘুরতে বেড়াতে দেখা গেছে, তবু অরুণের দেওয়া জিনিষ সে ছোঁয় নি। মুখের ওপর বলেছে, 'ও সব কলেজী পোশাক আমার গায়ে মানাবে না দাদা, ও তুমি নিজেই পর।'

অতুলের এই ব্যবহারে অরুণের মনও ক্রমে বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছে। তবু দিল্লী থেকে দু-একবার ভাইকে অরুণ চিঠি লিখেছিল। অতুল জবাব দেয় নি। ছুটি-ছাটায় বাড়ি এসে অরুণ জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার চিঠির জবাব দিলি নে যে?'

অতুল পরিষ্কার বলেছে, 'ও সব চিঠিপিঠি আমার আসে না। অত কাব্য করতেই যদি জানব, তাহলে তো তোমার মতই হতাম।'

না, তার কোন দাক্ষিণ্যকেই অতুল গ্রহণ করে নি। তাকে সে বাদ দিয়ে দিয়েই চলেছে। চলুক। ও যদি চলতে পারে, অরুণই বা পারবে না কেন? তা ছাড়া সত্যি বলতে কি, ছোট ভাইয়ের সম্বন্ধে কর্তব্যবোধই যা একটু-আধটু আছে, মমত্ববোধ তেমন নেই। অরুণকে অতুল যদি আমলই না দেয়, তার বিদ্যাবুদ্ধির গৌরবকে যদি স্বীকার না করে, তা হলে অরুণই বা কি করে তাকে ভালবাসবে? মা এখনও মাঝে মাঝে বলেন, 'ছোট ভাইকে দেখিস, ওকে ফেলে দিস নে নান্তু। হাজার হলেও তোরই তো ভাই।'

কিন্তু সে কথা কি কেবল একজনের মনে রাখলে চলে? দুজনেরই মনে রাখতে হয়।

সারাটি দিন বড় বিশ্রীভাবে কাটল অরুণের। খাওয়া-দাওয়ার পর একটা গল্পের বই নিয়ে পড়তে চেষ্টা করল। মন লাগল না। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকবার পর হঠাৎ এক সময় বেরিয়ে পড়ল। বিকেলের দিকে মনে হোল শাঁখারীপাড়া রোডের সেই ট্যুইশানের বিজ্ঞাপনের কথা। আজকার সকালের কাগজেই বিজ্ঞাপনটি দেখেছে অরুণ। ট্যুইশান এম, এ, পড়তে পড়তে দু-একটা করেছে। চাকরি জোটবার আগেও করে দেখেছে কয়েকবার। কিন্তু এখন এই বয়সে ছাত্র পড়ানো কি ফের পোষাবে? তাও আবার স্কুলের ছাত্র। কেঁচেগণ্ডূষ করা কি ভাল লাগবে? কিন্তু ভাল না লাগলেও একটা কিছু না জোটালে আর চলবে না অরুণের। অন্তত নিজের হাতখরচা চালাবার জন্যেও কিছু একটা চাই। দিল্লী থেকে আসবার পর রাহাখরচ বাদে যা সামান্য দু-চার টাকা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন নিজের খরচের জন্যে মা কি কাকার কাছে হাতপাতা ছাড়া আর জো থাকবে না, তবু সে না হয় লজ্জাসরম ত্যাগ করে চাইল, হাত পাতলো, কিন্তু সংসারের যা অবস্থা তাতে অন্ন খরচ কুলিয়ে তার হাতে যে বাড়তি দু-চারটে পয়সা পড়বে তেমন সম্ভাবনাই বা কই। নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে কোল্যাপসিবল গেটওয়ালা একটি বড় দোতলা বাড়ির সামনে অরুণ যখন এসে থামল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আলো জ্বলে উঠেছে ভিতরে বাইরে। দরজাটা খোলাই ছিল। ঠেলে ঢুকে পড়ল অরুণ। ফতুয়া গায়ে ষাট পঁয়ষট্টি বছরের পাকাচুলওয়ালা এক বৃদ্ধ উঠানের লনে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন, অরুণকে দেখে এগিয়ে এলেন, 'কি চাই আপনার?'

অরুণ বলল, 'আপনারাই কি টিউটরের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, মশাই, হ্যাঁ। দিয়ে ঝকমারি করেছিলাম। সকালে বিকালে এই নিয়ে জন বার-তের হল। যত সব বাজে টাইপের লোক। ছেলে পড়াবে কি নিজে-দেরই জ্ঞানগম্যি কিছু নেই। যাকগে, আপনি পড়াতে চান নাকি ?'

অরুণ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার নিজের পড়াশুনো কতদূর ?'

অরুণ বলল, 'আজ্ঞে এম.এ. পাশ করেছি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'কোন সাব্জেক্টে ?'

'বাঙলায়।'

ভদ্রলোকের কথার ভঙ্গিতে নৈরাশ্য ব্যঞ্জিত হল, 'বাঙলায়! বাঙলা দিয়ে কি করব ? আমার দরকার যে ইংরেজী আর অঙ্কের। ফার্স্ট ক্লাসের ছেলেকে ইংরেজী অঙ্ক কষাতে পারবেন ?'

অরুণ বলল, 'তা পারব না কেন ? ইংরেজী অঙ্ক তো আমাদেরও শিখতে হয়েছে।'

ভদ্রলোক অরুণের সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে কি দেখে নিলেন তারপর বললেন, 'তা অবশ্য হয়েছে। আচ্ছা আসুন, ভিতরে আসুন, আলাপ করি আপনার সঙ্গে।'

সোফা কৌচে সাজান বড়লোকের ড্রয়িংরুম। গদি-আঁটা একটা চেয়ার দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'বসুন। দেখুন, এসব টিউটর-ফিউটরের হাতে ছেলে মানুষ হয় না। আমরা নিজেরা যখন পড়েছি কোন টিউটরের দরকার হয় নি। আজকাল হচ্ছে। কিন্তু হয়ে লাভ হচ্ছে কি ? ও সব টিউটর-ফিউটর কিছুই লাগত না। নিজের ছেলেকে নিজেই পড়াতে পারতাম। কিন্তু দিনরাত রুগীপত্রই ঘাঁটব, পেটের অন্নই জোগাব, না ওই বাঁদরটার পিছনে ছুটোছুটি করে বেড়াব বলুন তো ?'

অরুণ বলল, 'তা তো ঠিকই। এইজন্যেই তো টিউটর রাখা, পছন্দ না করলেও রাখতে হয়।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিক বলেছেন। পছন্দ না করলেও নিজের প্রিন্সিপলের বিরুদ্ধে গিয়েও অনেক জিনিস করতে হয় সংসারে। ছেলের মা দিনরাত যদি কানের কাছে 'টিউটর রাখ, টিউটর রাখ' করে, তা হলে কে না রেখে পারে মশাই ?'

অরুণ বলল, 'সেক্ষেত্রে অবশ্য টিউটর রাখাটাই নিরাপদ। স্ত্রীর কারটেন লেকচার শুনতে হয় না।'

ভদ্রলোক অরুণের দিকে তাকালেন, 'আপনার তো বেশ রসবোধ আছে। নিজে বিয়ে থা করেছেন ?'

অরুণ বললে, 'আজ্ঞে না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'বিয়ে করলে বুঝতেন ও লেকচারের বিষয়বস্তু নিত্য নতুন, একবার শুরু হলে ওর আর শেষ নেই। আচ্ছা আপনি ছাত্রকে আমার সামনে একটু পড়ান তো দেখি। বেশি নয় দু-চার মিনিট। পড়াবার ধরন দেখলেই আমি বুঝতে পারব। এই শঙ্কর! শঙ্কর! এদিকে আয় তো আর একবার।'

কিন্তু ডাকাডাকি করেও শঙ্করের পাত্তা পাওয়া গেল না। চাকর এসে খবর দিল, 'ছোটবাবুকে বাড়িতে দেখা যাচ্ছে না, তিনি বোধ হয় পিছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'দেখুন, কাণ্ড দেখুন ছেলের। এর জন্যে টিউটর রেখে কোন লাভ আছে? আমি সামনে বসে আর পিছন দিয়ে ও কিনা পালিয়ে গেল। সাহসটা দেখুন একবার।'

ভদ্রলোক ফের অরুণের দিকে তাকালেন, 'থাকগে ধরে নিচ্ছি আপনি ইংরেজী অঙ্ক দুই-ই পড়াতে পারবেন, কত দিতে হবে আপনাকে?'

অরুণ বলল, 'সে আপনি বিবেচনা করে দেখবেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'উঁহু, কেবল একপক্ষের বিবেচনার কাজ তো নয়। আপনিও বিবেচনা করে বলুন।'

অরুণ একটু চিন্তা করে বলল, 'সব সাব্‌জেক্ট পড়াতে হলে অন্তত টাকা চল্লিশেকের কমে হয় কি করে?'

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'চল্লিশ টাকা সোজা কথা নাকি? চল্লিশ টাকা আপনাকে দিলে আমি খাব কি? উঁহু, অত দিতে পারব না। টাকা কুড়ির বেশি আমি কিছুতেই দিতে পারব না। আপনি আসুন তাহলে।'

অরুণ ভাবল কিছু কম-টম করে বললেও হত। কিন্তু কুড়ি টাকায় সেই বা রাজী হয় কি করে। ট্রাম বাসের খরচ বাদ দিয়ে তাহলে তার কিই বা থাকে।

অরুণ বেরিয়ে আসছিল, ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার ঠিকানাটা রেখে যান।'

'ঠিকানা রেখে আর কি হবে?'

'রেখে তো যান। ঠিকানা সবাই দিয়ে গেছেন। আপনিও ইচ্ছে করলে রেখে যেতে পারেন।'

অরুণ নিঃশব্দে একটুকরো কাগজে নিজের ঠিকানা লিখে দিয়ে ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এল।

খানিকটা এগুতে হঠাৎ মনে পড়ল করবীর সঙ্গে দেখা করে গেলে কেমন হয়। এদিকে

তো আর আসা হয় না, আজ যদি এসেছি একবার দেখা করলে ক্ষতি কি। চাকরি গেছে সে কথা গোপন করলেই হবে; বলবে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। ট্যুইশনের উমেদার হয়ে এ-পাড়ায় এসেছিল তা না বললেই হবে। বলবে অন্য দরকার ছিল। বলবে বন্ধু হিরণ্ময়ের খবর নিতে এসেছে। দিল্লী থেকে এসে অবধি তার কোন খোঁজখবর পায় নি অরুণ। চিঠি দিয়ে জবাব পায় নি। আজ দিনটা বড় খারাপ কেটেছে। সারাদিন ভরে চলেছে ক্লান্তি, মনান্তর, ব্যর্থতা, নৈরাশ্যের পালা। এমন দিনে যদি একটি সুন্দরী সৌভাগ্যবতী তরুণীর হাতে স্বাদ-গন্ধ-সৌরভময় এক কাপ চা জুটেই যায় অরুণের কপালে, মন্দ কি! দিল্লীতে থাকতে করবী অনেক চা করে খাইয়েছে। দূরে কোন জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার সময় ফ্লাস্কে করে নিয়ে গেছে চা। মেয়েটি ভারি বিলাসী। খেতে আর খাওয়াতে দুই-ই ভালবাসে। নম্বরটা মনে ছিল। খুঁজে খুঁজে একটু ভিতরের দিকে ছোট একটি একতলা বাড়ির সামনে এসে অরুণ দাঁড়াল। কড়া নাড়বার আগে মনে পড়ল করবীর স্বামীর কথা। দিল্লীতে যখন গিয়েছিল স্বামী সঙ্গে যায় নি। তাঁর বর্ণনা দিয়ে করবী বলেছে ভদ্রলোক বড় অমিশুক,আলাপে অপটু। তার মানে নিশ্চয়ই লোকজন তেমন পছন্দ করেন না। এতদিন বাদে দিল্লীর সেই আলাপের সূত্র ধরে এক অপরিচিত যুবক তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে দেখে তিনি মনে মনে কি ভাববেন কে জানে। হয়তো ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করবেন, 'কি চাই!' অরুণ হিরণ্ময়ের প্রসঙ্গ তুললে দু-এক কথায় জবাব সেরে বিদায় নমস্কার জানাবেন, এমনও হতে পারে। এক কাপ চায়ের সঙ্গে এ ধরনের একরাশ আশঙ্কাও জড়িয়ে আছে। অরুণ একটু ইতস্ততঃ করল, কড়া না নেড়ে ফিরে যাবে কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই অরুণ মত বদলে ফেলল। যা ভাগ্যে আছে হবে। কড়ায় যখন হাত দিয়েছে নাড়াও দেবে।

অরুণ আর দেরি করল না। আস্তে আস্তে বার দুই কড়া নাড়ল আর প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করতে লাগল একটি ভ্রূ-কুঞ্চিত গুরুগম্ভীর পুরুষমূর্তি কখন এসে দোর খুলে মুখ বাড়াবে।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করতে হল অরুণকে। তার পরে আলো জ্বলল। খিল খোলার শব্দ হল দরজার। অরুণ যা আশঙ্কা করেছিল, তা হয় নি। কোন অপরিচিত গৃহকর্তা তার সামনে এসে দাঁড়ান নি। করবীই এসে দরজার পাল্লা খুলে ধরেছে।

'আপনি!'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ, আপনারা তো আর কোন খোঁজখবর নিলেন না। আমিই এলাম শেষ পর্যন্ত খুঁজতে খুঁজতে। তারপর কেমন আছেন?' করবী কোন জবাব না দিয়ে শুধু বলল, 'আসুন।'

অরুণ তার পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকলো। ছোট্ট সরু প্যাসেজটুকু পার হতেই সামনে খানিকটা উঠান। উত্তর-পূর্ব কোণে কল আর চৌবাচ্চা। সেখানে চৌদ্দ-পনর বছরের একটি ছেলে এঁটো হাত ধুচ্ছিল, মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, 'কে বউদি?'

করবী বলল, 'অরুণবাবু, আমার দাদার বন্ধু। আর এটি আমার দেওর দিলীপ। তোমার এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল দিলু? আর কিছু লাগল না?'

দিলীপ একবার ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'না বউদি।'

পশ্চিমের দিকে সারে সারে তিনখানা ঘর। বাঁ দিকের ঘরখানায় প্রথমে অরুণকে নিয়ে বসাল করবী। বেশ বোঝা যায়, মধ্যবিত্ত পরিবারের এটি একখানি ড্রয়িংরুম। দক্ষিণ দিকে একটি বইয়ের সেল্‌ফ। বেশির ভাগ বই-ই রবীন্দ্রনাথের। শান্তিনিকেতনের খান-তিনেক বেতের চেয়ার-ঘেরা ছোট একটি টেবিল। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের বড় একখানা ফটো। ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি আঁকা একখানি সুন্দর ক্যালেণ্ডার। তার নীচে কুলুঙ্গির মধ্যে ছোট একটি টাইম্‌পিস্ ঘড়ি। ছোট একটা টুলের ওপর বসানো রেডিওসেট। দু-দিকের দেওয়ালে তিনটি জানলায় হালকা-নীল পর্দা টানা। উপকরণের কোন বাহুল্য নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিসে আর তার রাখার ভঙ্গিতে বেশ একটি পরিচ্ছন্ন শোভন রুচির ছাপ আছে। অরুণ মনে মনে ভাবল, এমন একখানা ঘর যদি তার হত। করবীর দিকে মুখ তুলে তাকাল অরুণ। বলল, 'বাঃ, ঘরখানা তো চমৎকার সাজিয়েছেন। তারপর খবর কি আপনার? কথাবার্তা বলছেন না যে? আপনার চেহারাও তো খুব খারাপ হয়ে গেছে। কোন অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি?'

করবী বলল, 'না।'

অরুণ বলল, 'তবে কি বাড়ির কর্তার ভয়ে এই বাক্যসংযম? সত্যি আপনাকে দেখে যেন চেনাই যায় না।'

করবী কোন কথা বলল না।

অরুণ বলল, 'দেওরের সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলেন। এবার তার দাদাটিকে বার করুন। না কি তাকে লুকিয়েই রাখবেন? পরেশবাবু কোথায়?'

করবী শান্তভাবে বলল, 'আপনি কি কিছুই জানেন না?'

'না।'

করবী বলল, 'তিনি আজ বাইশ দিন ধরে নেই।'

অরুণ বলল, 'কোথায় গেছেন?'

করবী বলল, 'মারা গেছেন।'

বলেই মুখ নিচু করল।

অরুণ বিস্মিত হয়ে শুধু বলতে পারল, 'সে কি !'

মুহূর্তকাল দুজনেই চুপ করে রইল। শান্ত স্তব্ধ ঘরখানায় শুধু ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। কেউ ঘড়িটাকে জোর করে বন্ধ করে দিলেই যেন ভাল হত। অরুণ করবীর দিকে আর একবার তাকিয়ে নিল। সে তেমনি মুখখানা নিচু করে রয়েছে। মাথায় আঁচল নেই, সিঁথি সিঁদুরহীন সাদা। কালো ফিতেপেড়ে একখানা শাড়ি পরনে। গলায় সরু একচিলতে হার। হাতে দু-গাছা চুড়ি। আর কোন আভরণ নেই। সত্যি করবীর চেহারা এবং তার শুকনো মুখ দেখে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা আগেই বোঝা উচিত ছিল। অনুমান করা উচিত ছিল তার দুরদৃষ্টকে, কিন্তু অরুণ তা পারে নি। মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে ও বেশি তাকায় না। এ সব ব্যাপারে ও ভারি অন্যমনস্ক। সারাদিন ধরে নানা অপ্রীতিকর ঘটনায় নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে অরুণ বিব্রত রয়েছে। কিন্তু করবীর যে দুর্ভাগ্য ঘটেছে তার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না। এ শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। সহানুভূতিপ্রকাশ নিরর্থক আনুষ্ঠানিক আচারমাত্র।

অরুণ সে চেষ্টা করল না, শুধু বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন।'

দাঁড়িয়ে থাকতে বোধ হয় করবীর নিজেরও কষ্ট হচ্ছিল। অরুণের সামনের বেতের চেয়ারটায় এবার ও বসে পড়ল।

ফের একটুকাল চুপ করে থাকবার পর অরুণ জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল ওঁর ?'

করবী বলল, 'ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া। দু-দিনমাত্র ভুগেছিলেন।'

অরুণ ফের কি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, দিলীপ এসে দাঁড়াল, বউদি 'মা ডাকছেন তোমাকে। কে এসেছেন জিজ্ঞেস করছিলেন।'

অরুণ করবীর দিকে তাকাল। করবী বলল, 'আমার বিধবা শাশুড়ি ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন। এই ঘটনার পরে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কে এল গেল শুয়েশুয়েই সব খবর রাখা চাই। আপনি কি যাবেন ?' করবী একটু ইতস্ততঃ করল।

অরুণ মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রইল। বাক্‌পটু বলে বন্ধুমহলে তার খ্যাতি আছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সে আলাপ জমাতে পারে। কিন্তু সদ্য পুত্রশোকাতুরা অপরিচিতা একটি মহিলার সঙ্গে সে কি আলাপ করবে। তবু তিনি যখন যেতেই বলছেন, না যাওয়াটা অন্যায় হয়।

অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন।'

করবী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মাঝখানের দরজাটা বাদ দিয়ে সব চেয়ে শেষের ঘরখানার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'মা।'

ঘরের দুদিকে দুখানি তক্তপোশ। তার একখানিতে পরেশের মা নিভাননী শুয়ে-

ছিলেন। অরুণকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসতে চেষ্টা করলেন।

করবী বলল, 'আপনি উঠছেন কেন, শুয়েই থাকুন, দিলু ও ঘর থেকে একখানা চেয়ার নিয়ে এস তো।'

নিভাননী কিন্তু শুয়ে রইলেন না, উঠেই বসলেন। দিলু একটা চেয়ার এনে তাঁর বিছানার পাশে পেতে দিল।

নিভাননী অরুণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বসো।' তারপর নিজেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন—

'কিছু মনে করো না। তুমি আমার ছেলের বয়সী। তুমিই বললাম তোমাকে।'

অরুণ বলল, 'তাতে কি।' নিভাননী তাকালেন তার দিকে, অরুণও একটুকাল চেয়ে রইল। পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছরের একটি বিধবা মহিলা।

একটু রোগাটে চেহারা। যৌবনে যে খুব সুন্দরী ছিলেন তা এখনো বোঝা যায়। সৌন্দর্যের সঙ্গে মুখভঙ্গিতে বেশ খানিকটা শিক্ষা আর ব্যক্তিত্বের ছাপও আছে বলে অরুণের মনে হল।

নিভাননী বললেন, 'করবীর মুখে তোমার নাম এর আগেও শুনেছি। দিল্লীতে হিরণ্ময়ের বাসায় বুঝি তোমাদের আলাপ হয়েছিল?'

অরুণ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

নিভাননী বললেন, 'দিল্লী থেকে কবে এসেছ? হিরণ্ময়েরা সব ভাল আছে?'

অরুণ বলল, মাসখানেক আগে সে এসেছে।

নিভাননী বললেন, 'এতদিনের ছুটি? আর হিরণ্ময় তো এসে দু-দিনের বেশী রইল না।'

অরুণ বলল, 'ছুটি নয়। রিট্রেঞ্চমেণ্টে চাকরি গেছে।'

করবী বলল, 'চাকরি নেই আপনার?'

অরুণ তার দিকে চেয়ে বলল—'না।'

প্রথমে ভেবেছিল এই চাকরি না থাকার কথাটা কি করেই বা বলবে। যদি এ প্রসঙ্গ না ওঠে তাহলে গোপনই করে যাবে কথাটা। কিন্তু এখন অতি সহজেই বলে ফেলল। আর বলতে পেরে একটু যেন তৃপ্তিই বোধ করল অরুণ। করবী জানল দুর্ভাগ্য শুধু তার একারই ঘটে নি, অরুণও কিছুটা খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়েছে। যদিও দুইয়ের মধ্যে মোটেই তুলনা হয় না, তবু অরুণ যে আগের মত সুখে নেই, বেকারজীবনের দুঃখদুর্ভোগ ভোগ করছে তা করবীকে জানাতে পেরে খানিকটা স্বস্তিই যেন বোধ করল।

করবী বলল, 'টেলিগ্রাম পেয়েই দাদা চলে এসেছিলেন। আর কোন কথা জিজ্ঞেস করার মত তখন অবস্থা ছিল না। মাত্র তুদিনই ছিলেন কলকাতায়।'

নিভাননী বললেন, 'হিরণ্ময় নিয়ে যেতে চেয়েছিল করবীকে। আমিও বললাম যাও, ঘুরে এসো। কিন্তু এমন জেদী মেয়ে, কারো কথা শুনলো না।' করবী বলল, 'শুনলে কি পিপলুকে ছেড়ে আপনি থাকতে পারতেন? এই তো শ্যামবাজারে বাবার বাসায় গিয়ে তু-দিন ছিলাম, তিনবার আপনি দিলুকে পাঠিয়েছেন খবর নিতে।'

এ কথার জবাব না দিয়ে নিভাননী বললেন, 'পিপলু কি না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল না কি?'

করবী শাশুড়ীকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছি। আপনি ভাববেন না। শুয়ে পড়ুন এবার।'

নিভাননী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'না, আর ভাববার কি আছে আমার, সব ভাবনাচিন্তা তার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। আমার সব শূন্য করে দিয়ে গেছে সে।' অরুণের দিকে ফিরে তাকালেন নিভাননী, 'এই শূন্যপুরীতে দিনরাত কি করে যে আমি কাটাব ভেবে পাই নে অরুণ। একবার ভাবি এখান থেকে বেরিয়ে কোথাও চলে যাই। কিন্তু যাব কি করে। সে আমার পায়ে শিকল পরিয়ে রেখে গেছে যে, শেল রেখে গেছে আমার সামনে। ওর এই মূর্তি চোখের ওপর আমি আর দেখতেও পারিনে, আবার চোখের আড়াল করব যে তারও জো নেই। যার জিনিস সে তো কত সহজে মায়া কাটিয়ে গেল অরুণ, কিন্তু আমি কাটাতে পারছি কই।'

এতক্ষণে নিভাননীর তুই চোখ জলে ভরে উঠল। আবেগে আটকে গেল গলা। অরুণ বলল, 'আপনি এবার শোন। শুয়ে বিশ্রাম করুন।'

নিভাননী বললেন, 'আমি বিশ্রাম না করলে আর কে করবে।' আঁচল দিয়ে নিজের চোখের জল মুছলেন নিভাননী, তারপর বললেন, 'এসো মাঝে মাঝে। আমাদের আত্মীয়-স্বজন আর বড় কেউ নেই। সময় পেলে এসে খোঁজখবর নিয়ো।'

অরুণ বলল, 'আসব বই কি। নিশ্চয়ই আসব।'

একটু বাদে নিভাননীর ঘর থেকে অরুণ আর করবী তু-জনেই বেরিয়ে এল। দিলীপ চেয়ার দিয়েই সরে এসেছিল, ও ঘরে আর দাঁড়ায় নি।

অরুণ বলল, 'পিপলু ঘুমুচ্ছে বুঝি?'

করবী বলল, 'হ্যাঁ, এই ঘরে।' তারপরে একটু ইতস্তত করে বলল, 'আসুন।' ভেজানো দরজা ঠেলে মাঝখানের বড় ঘরটিতে তুজনে ঢুকল করবীদের শোবার ঘরে। পশ্চিমদিকের দেয়াল ঘেঁষে পাতা বেশ বড় একখানা খাট। একপাশে ছোট্ট একটু

কোলবালিশের ওপর পা তুলে দিয়ে বছর তিনেকের একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। শিয়রের কাছে দেওয়ালে টাঙানো একটি যুবকের ফটো। অরুণ সেদিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল। এ প্রতিকৃতি যে করবীর মৃত স্বামী পরেশের তা বলে দেওয়ার দরকার হল না। অরুণ মনে মনে ভাবল বেশ সুপুরুষই ছিলেন ভদ্রলোক।

অরুণ বলল, 'ফটো তো বেশ উঠেছে। কতদিন আগে তুলেছিলেন?'

করবী বলল 'দু-বছর আগে। ওঁর জন্মদিনে তোলা হয়েছিল।'

ঘরের মাঝখানে বড় একটি কাঁচের আলমারি। ওপরের তাকে শৌখিন জিনিস-পত্র। নানারকম খেলনার মধ্যে শ্বেতপাথরের ছোট্ট একটি তাজমহলের প্রতিকৃতি। অরুণের মনে পড়ল মাসকয়েক আগে তিনদিনের ছুটি নিয়ে আগ্রায় যখন হিরণ্ময় আর করবীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল অরুণ, সে-ই পছন্দ করে করবীকে কিনে দিয়েছিল জিনিসটি। করবী দাম নিতে সাধাসাধি করেছিল, অরুণ নেয়নি।

করবী বলেছিল, 'ও আপনি উপহার দিচ্ছেন? সে কথা স্পষ্ট বললেই তো হয়। তার অত লুকোচুরির কি আছে? ভালোই হল। এর পর সব সময় আপনাকে সঙ্গে করে দোকানে বেরোব। দেখি, আপনি কত উপহার দিয়ে উঠতে পারেন।'

এখন কিন্তু করবী সেই তাজমহলটার দিকে তাকাল না। একটু এগিয়ে পূব-দিকের জানালা ঘেঁষে একটা টেবিলের ধারে গিয়ে বলল, 'এটা তাঁর লেখবার টেবিল।'

করবীর স্বামী যে কাস্টম অফিসের চাকরির ফাঁকে ফাঁকে নানা মাসিক সাপ্তাহিকে কবিতা আর প্রবন্ধ লিখত একথা দিল্লীতে কথায় কথায় করবী অরুণকে বলেছিল। কিন্তু তার অনুপস্থিত স্বামীর সম্বন্ধে অরুণ তখন তেমন ঔৎসুক্য দেখায় নি। এখন আগ্রহের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল, 'তাই নাকি? ওঁর আগের লেখা-টেখাগুলি সব আছে আপনার কাছে? বই-টই কিছু বেরিয়েছিল!' করবী জবাব দিল, 'না, বেরোবার কথা হচ্ছিল। আর সময় হল না।'

বলতে বলতে দুজনেই টেবিলের ধারে এসে দাঁড়াল। করবীর নিজের হাতের এমব্রয়ডারি করা সুন্দর সাদা একখানি টেবিল-ঢাকনি। ফটো-স্ট্যাণ্ডে স্বামী-স্ত্রীর দুখানি ফটো পাশাপাশি দাঁড়করানো। কালি-ভরা একটি পার্কার ফিফ্‌টি-ওয়ান্‌। একপাশে সুদৃশ্য চামড়ায় বাঁধানো ফাইলে লিখবার কাগজ।

অরুণ বলল, 'সব সাজিয়ে রেখেছেন?'

করবী বলল, 'এইরকমই ছিল। আমি আর সরাই নি। মাঝে মাঝে মনে হয় লিখতে লিখতে উঠে গেছেন। ফের এসে বসবেন চেয়ারে।'

গদি-আঁটা একখানা চেয়ার সামনেই পাতা ছিল। অরুণ লক্ষ্য করল সে চেয়ারে

করবী তাকে বসতে বলল না। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, 'দিলু, লক্ষ্মী ভাইটি, চেয়ারখানা ও ঘর থেকে আর একবার এনে দাও তো।'

অরুণ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না, আর চেয়ার দরকার নেই। আমি এবার উঠব। রাত হয়েছে।'

করবী বলল, 'সে কি। একটু চাও খাবেন না?'

এতক্ষণে চায়ের কথা মনে পড়েছে করবীর। অরুণ বলল, 'না না। চা আজ থাক।'

করবী বলল, 'থাকবে কেন। আপনি বরং ও ঘরে গিয়ে একটু বসুন, আমি এক্ষুনি চা করে আনছি। চা তো আপনি খুব ভালবাসেন খেতে।' এত দুঃখ-দুর্ভাগ্যের মধ্যেও করবী যে সে কথা মনে রেখেছে তা দেখে অরুণের বেশ একটু ভাল লাগল। আর কোন আপত্তি না করে বাইরের ঘরে একটা চেয়ারে বসে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু বাদে এক কাপ চা হাতে করবী এল ঘরে। বলল, 'নিন, শুধু চাই-ই দিলাম।'

অরুণ বলল, 'শুধু চা-ই তো ভাল। কিন্তু আপনি নিলেন না যে?'

করবী বলল, 'আমি! আমি তো চা খাইনে।'

অরুণ কোন কিছু না ভেবেই বলল, 'আগে তো খেতেন? আগে তো চায়ের বেলায় আপনার সময় অসময় ছিল না।'

করবী এ কথার কোন জবাব না দিয়ে একটুকাল চুপ করে থেকে অরুণকে বুঝিয়ে দিল আগের সঙ্গে এখনকার অবস্থার মোটেই আর মিল নেই।

একটু পরে করবী বলল, 'চা একদমই ছেড়ে দিয়েছিলাম। মা বকাবকি করতে লাগলেন। বললেন শরীর খারাপ করবে। তাই শুধু সকালে এক কাপ করে খাই। কিন্তু কোন স্বাদ পাই নে। আগে ঠিক সময়মত চায়ের কাপটি না হলে কি খারাপই না লাগত। কষ্ট হত, মাথা ধরত রীতিমত, আজকাল টেরও পাইনে। কেন এমন হত বলতে পারেন?' অরুণ চা শেষ করে কাপটি মাটিতে রাখতে যাচ্ছিল করবী তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে সেটি নিল। বলল, 'দিন আমার কাছে।'

অরুণ করবীর আগের কথার জবাবে বলল, 'দেখুন আজ পর্যন্ত কোন বড় রকমের অভিজ্ঞতা আমার হয় নি। কিন্তু আপনাকে দেখে জীবনে শোককে যেন আমি এই প্রত্যক্ষ করলাম। আপনার মত চঞ্চল স্ফূর্তিবাজ ধরনের মেয়ে যে এমনভাবে বদলে যেতে পারে তা না দেখলে আমি বিশ্বাস করতুম না। কিন্তু এই শোকও তো আপনাকে কাটিয়ে উঠতে হবে, সংসারে আপনার অনেক কর্তব্য আছে,

অনেক দায়িত্ব। আপনার সারাজীবন পড়ে আছে সামনে।'

'না না, অমন করে বলবেন না। আমি সে কথা, সারাজীবনের কথা ভাবতেও পারি নে। আমার আর কিচ্ছু নেই।'

করবীর চোখ সজল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সে অরুণের সামনে থেকে সরে গেল। প্রায় মিনিট দশেক কাটল সে আর ফিরে এল না।

অরুণ এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, ঘরের বাইরে এসে ডাকল, 'দিলীপ।'

দিলু এসে সামনে দাঁড়াল।

অরুণ বলল, 'তোমার বউদিকে বলো আমি চলে গেছি।'

দিলীপ বলল, 'বউদিকে ডেকে দেব ?'

অরুণ বলল 'না আর ডাকতে হবে না।'

দিলীপ সদর দরজা পর্যন্ত অরুণকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আর একদিন আসবেন।'

অরুণ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

ট্রামে পিছনের দিকে একটা নিরালা সীটে বসে সারাটা পথ অরুণ করবীর কথাই ভাবতে লাগল। স্বামী-পুত্রে সৌভাগ্যবতী করবীকে দেখে একদিন সে মনে মনে ভেবেছিল মেয়েটির মধ্যে কোথায় যেন একটু বেশী দেখানোপনা আছে। নিজের সম্পদভাগ্যে যেন বড় বেশী সুখী মেয়েটি, বেশি রকম পরিপূর্ণ। অতিপুষ্টাঙ্গী মেয়েকে যেমন অশোভন দেখায়, নিজের সুখ সম্বন্ধে অতি-সচেতন মেয়েকেও তেমনি স্থূল মনে হয়। কিন্তু আজ শোকার্তা করবীকে দেখে অরুণের মনে হতে লাগল এর চেয়ে ওর সেই স্থূল সৌভাগ্যই বরং ভাল ছিল। ভাল ছিল ওর সুখানুভূতির আতিশয্য। পরনে চড়া রঙের শাড়ি, সিঁথিতে পুরু সিঁদুরের দাগ, আর গা-ভরা গয়না, এর রিক্ততার চেয়ে সেই সবেই যেন বেশি মানিয়েছিল করবীকে। ওর উচ্ছ্বলতা সয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শুষ্কতা, শূন্যতা একেবারে দুঃসহ। আজ পরেশের অনুপস্থিতিটা অরুণ মনে মনে কামনা করেছিল। কিন্তু এমন চিরকালের জন্য সংসার ছেড়ে চলে যাবে তা তো অরুণ ভাবে নি চায়ও নি। পরেশ তো কেবল নিজেই সরে যায় নি, করবীকে ভিতরে ভিতরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এতদিন আড়ালে থেকে পরেশই আলো ফেলেছিল ওর মুখে। সেই আলো নিবে যাওয়ায় সব অন্ধকার হয়ে গেছে করবীর। সেই তনুসুন্দর দেহধারা তেমনি রয়েছে। কিন্তু রস নেই, প্রাণচাঞ্চল্য নেই, নদীর আকৃতি ঠিক তেমনিই রয়েছে, শুধু পথে পথে বরফ হয়ে গেছে জল। না, অরুণ কোনদিন আর যাবে না করবীদের ওখানে। যেয়ে আর কি হবে।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজের স্বার্থপরতার কথা ভেবে অরুণ লজ্জিত বোধ করল, ছিঃ এ কি ভাবছে সে। করবী আজ তার সঙ্গে হেসে কথা বলেনি, চটুল হাসি পরিহাসে যোগ দেয়নি, সেইজন্যেই নিজেকে সে বঞ্চিত মনে করেছে, আর তারই ঘনিষ্ঠ পরিচিত বান্ধবীপ্রায় একটি মেয়ে যে চিরজীবনের জন্য বঞ্চিত হল সে কথা অরুণ একবার ভেবেও দেখছে না।

বেশ রাত হল ফিরতে। রান্নাঘরে ঠাঁই করে, ভাত বেড়ে দিতে দিতে বাসন্তী জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ। কখনকার রান্না ভাত। যা গরম। নষ্ট হয়ে গেছে কিনা দেখ।'

অরুণ খেতে খেতে বলল, 'না ঠিকই আছে। আজ একটি মেয়েকে দেখে বড় দুঃখ লাগল মা।'

বাসন্তী হাতায় করে ছেলের পাতে ডাল তুলে দিতে দিতে বললেন, 'কেন রে, কোন্ মেয়েকে কোথায় আবার দেখলি তুই?'

অরুণ করবীর পরিচয় দিয়ে স্বামীর মৃত্যুর পর তার অবস্থার কথা বর্ণনা করে বলল, 'মেয়েটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে মা। মোটেই যেন আর চেনা যায় না।'

বাসন্তী সহানুভূতির সুরে বললেন, 'চেনা না যাওয়ারই কথা নাস্তু। সিঁথিতে সিঁদুর মুছলে হিন্দুর মেয়ের আর থাকে কি। আহা বেচারা! ওই একটি বুঝি পোনা রেখে গেছে?'

অরুণ খেতে খেতে বলল, 'হ্যাঁ। ওই একটি ছেলে।'

বাসন্তী বললেন, 'এখন ওই সব আশা ভরসা, ওকে মানুষ করে তুলতে পারলে তবেই তো—ওকি আর একমুঠো ভাত নিলি না যে নাস্তু? এই পাখীর আহার খেয়ে তুই বাঁচবি কি করে, হ্যাঁ রে।'

অরুণ হেসে বলল, 'এই সাতাশ বছর ধরে বেঁচে তো এলাম, আমি যদি এক এক বেলায় এক সের চালের ভাত খাই, তা হলেও তো তোমার কাছে পাখীর আহারই থাকবে।'

বাসন্তী বললেন, 'হ্যাঁ, সেই ভাগ্যই করে এসেছি কিনা যে, রাশ রাশ ভাত তোমাদের সামনে ধরে দিতে পারব। কত কলকারসাজি করে যে রাত্রে এই ভাত ক'টি রাখি তোমার জন্যে তা শুধু আমিই জানি।' রেশনে দু-বেলার চাল পাওয়া যায় না, কিছু কিছু ব্ল্যাকমার্কেটে কিনতে হয়। সব সপ্তাহে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই রাত্রে একেবারে ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া সকলের জন্যেই রুটির ব্যবস্থা করতে হয় বাসন্তীকে। অরুণ রুটি খেতে পারে না। তাই ওর জন্যেও ভাতই রাখেন বাসন্তী।

কথাটা অরুণের মনে পড়ে যাওয়ায় সে একটু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'রোজ রোজ আমার জন্যে ভাত তোমাকে কে রাখতে বলে মা? না রাখলেই পার। আর পাঁচজনে যা খায়, আমিও তাই খাব।'

বাসন্তী কোন জবাব দিলেন না। শুধু মুখ টিপে হাসলেন। আর পাঁচজনে যা পারে তাঁর নান্তু তা পারে না। সকলের ধাত তো আর সমান নয়। খাওয়া নিয়ে ছেলেবেলা থেকে এই ছেলে কি কম কেলেঙ্কারি করেছে। আজকাল আর তেমন কিছু করে না, কিন্তু একটু এদিক ওদিক হলেই খাওয়া ফেলে উঠে চলে যায়। পছন্দমত মাছ তরকারি না হলে আসতেই চায় না খেতে। বলে, 'আমার ক্ষিধে নেই।' এদিক থেকে অতুলই বরং লক্ষ্মী। ক্ষিদের সময় যা পায়, তাই তার যথেষ্ট। শুধু পরিমাণে বেশি হলেই হল। শাক হোক, মাছ হোক, কোন দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সবই তার মুখে রোচে। অনেক বিষয়েই অনেক রকমের গুণ আছে অতুলের। শুধু যদি পড়াশুনাটা হত তাহলে আর দুঃখ ছিল না।

'আচ্ছা ওর একটা কাজকর্ম খুঁজে পেতে তোরাও তো জুটিয়ে দিতে পারিস।'

অরুণ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কার কথা বলছ?'

বাসন্তী বললেন, 'কার কথা আবার। ওই পোড়াকপালে হতভাগাটার কথা। অতুলের একটা ব্যবস্থা তোরা করবি নে?'

সকালবেলায় ছোট ভাইয়ের ব্যবহারের কথা মনে পড়ে গেল অরুণের, খানিকটা বিতৃষ্ণার ভঙ্গিতে সে বলল, 'ওর কথা আমার কাছে আর তুলো না মা।'

বাসন্তী অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, 'তুই বলিস আমার কাছে তুলো না, উনি বলেন আমার কাছে তুলো না। ওর কথা আমি তাহলে কার কাছে বলব বল দেখি। মহা জ্বালা আমার।'

অরুণ বললে, 'কারো কাছেই বলবার দরকার নেই। পারো তো ওকেই বলো।'

বাসন্তী বললেন, 'আমি বুঝি বলি নে ভাবিস। দিনরাত রোজ দু-বেলা খাওয়ার সময় আমি ক্যাট ক্যাট করছিই। ও যদি না শোনে তো করব কি।'

অরুণ বলল, 'তেমন করে বলতে পারলে ও শোনে না ওর ঘাড় শোনে।'

আর কথা না বাড়িয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল অরুণ।

মুখ ধুয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছিল, ভুবনময়ী পিছন থেকে ডেকে বললেন, 'ও নান্তু, এত রাত করলি যে আজ?'

অরুণ ফিরে এসে ভুবনময়ীর সামনে দাঁড়াল, 'এমনিতেই একটু রাত হল দিদা, কি খাচ্ছ?'

দোরের সামনে বসে একটা বাটিতে করে কিছু সাদা খই আর একটু গুড় দিয়ে রাতের জলখাবার শেষ করছিলেন ভুবনময়ী, নান্তুর দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'দেখ এসে না কি খাচ্ছি। কত রাজভোগ, মোহনভোগ আছে হাঁড়িতে। খাওয়ার জিনিসের আমার অভাব আছে নাকি কিছু ? আয় নিবি একগাল ? দেব ?'

অরুণ হেসে বলল, 'না দিদা। এই তো ভাত খেয়ে এলাম। তুমি খাও।'

জুতো ছেড়ে দিদিমার পাশে এসে উটকোভাবে একটু বসল অরুণ, তারপর ভুবনময়ীর খাওয়া দেখতে দেখতে হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা দিদা ?'

'উঁ।'

'বিধবা হওয়ার পর থেকেই তুমি রোজ রাত্রে এই খই খেতে শুরু করেছ ? প্রায়ই দেখি তোমাকে খই খেতে।'

ভুবনময়ী বললেন, 'আর কোন্ পোড়া ছাই খাব !'

অরুণ বলল, 'মাঝে মাঝে লুচি-টুচিও তো খেতে পার।'

ভুবনময়ী বললেন, 'দূর। ওসব আমার পিরবিত্তি হয় না। বলে বয়সের কালেই খাই নি। এখন তো বুড়ো হয়ে মরতে চলেছি।'

করবীর কথা মনে পড়ল অরুণের। করবীও হয়তো এই রকম সামান্য কিছু খই-টই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছে। অথচ মেয়েটি মাছ, মাংস, পোলাও, কালিয়ার কি ভক্তই না ছিল। অবশ্য খাওয়ার চেয়ে রান্নাতেই শখ ছিল করবীর। বাবর রোডে হিরণ্ময়ের বাড়িতে কোমরে আঁচল-জড়ানো ওর সেই মাংস রান্নার ছবিটি চোখের সামনে ভেসে উঠল অরুণের। রাঁধতে রাঁধতে খানিকটা মাংস ছোট একখানি প্লেটে করে এনে অরুণের সামনে ধরেছিল করবী, 'নিন্, একটু চেখে দেখুন তো। ঠিকমত নুন ঝাল হয়েছে না কি। বুঝব তাক।'

অরুণ ঝোলের একটু স্বাদ নিয়ে বলেছিল, 'ঠিকই আছে।'

করবী বলেছিল, 'এমন ওপর ওপর দেখতে হবে না, ভাল করে চাখুন। একটু বেঠিক হলে কিন্তু সমস্ত দোষ আপনার ঘাড়ে চাপবে।'

অরুণ বলেছিল, 'সব আমার ঘাড়ে ? রাঁধুনীকে বুঝি কোন জবাবদিহিই আর করতে হবে না।'

করবী বলেছিল, 'মোটেই না, সব জবাবদিহির দায় তখন চাখুনীর জিভের।'

অরুণ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'বেশ আপনার মাংসে আরও খানিকটা নুন লাগবে তাহলে।'

করবী একটু বাদে অরুণের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, 'এই বুঝি ? আমার

মাংসকে নুনে কাটা করবার মতলব ? তোমার বন্ধুর কাণ্ড দেখছ দাদা ?'

একটু দূরে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে হিরণ্ময় নির্বিবাদে সিগারেট টেনে যাচ্ছিল। বোনের কথার জবাবে বলল, 'দেখছি বই কি। কিন্তু চাখুনী রাঁধুনীর লড়াইটা গরীবের মাংসের ওপর দিয়ে না চালালেই ভাল হয়।'

করবী অরুণের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমার গরীব দাদার আবেদনটা শুনলেন তো ? তার মুখের দিকে চেয়ে এবার লক্ষ্মী ছেলেটির মত ঠিক করে বলুন সত্যিই নুন ঝাল কিছু লাগবে কি না।'

নমিতা পিপলুকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসে বলেছিল, 'এত সাধাসাধি কিসের জন্যে ? রাঁধুনীর নিজের সঙ্গেও তো একটা জিভ আছে।' অরুণ বলেছিল, 'থাকলে কি হবে। সে জিভের তাকের ওপর রাঁধুনীর ভরসা নেই। সাধে কি আর কাউকে সাধতে আসে ?' সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া আর হৈ-হুল্লোড় চলেছিল হিরণ্ময়ের বাসায়।

অরুণ খেতে খেতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, 'চমৎকার রান্না হয়েছে আপনার।' করবী ছদ্ম কোপের ভঙ্গিতে বলেছিল, 'থামুন। আপনার জিভকে আর বিশ্বাস নেই। এমন চমৎকার মাংস নুনে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন আপনি। আপনার উচিত শাস্তি কি জানেন ? সারাজীবন মাংস বন্ধ করা।'

উল্টে শাস্তিটা অকারণে করবীকেই পেতে হল। সারাজীবনের জন্যেই ওর মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ভেবে ভারি খারাপ লাগল অরুণের।

'ও মা, ও কি ভাবে বসলি নান্তু ? বসবিই যদি ওই বিছানার ধারটায় বস না গিয়ে।'

দিদিমার কথায় চমক ভাঙল অরুণের। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না দিদা, আর বসব না। যাই শুই গিয়ে।'

শুয়েও অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না, বার বার করবীর কথা মনে পড়তে লাগল।

প্রীতি দুই দিন বাদে একটা পোষ্টকার্ড এগিয়ে অরুণের দিকে দিয়ে বলল, 'দাদা, তোমার চিঠি।'

অরুণ পড়ে দেখল শাঁখারীপাড়া রোড থেকে ডাঃ বিনোদবিহারী মজুমদার ইংরেজীতে একটা চিঠি দিয়ে তাকে জানিয়েছেন, ছেলের টিউটর হিসাবে অরুণকে রাখাই ঠিক করেছেন তিনি। তবে চল্লিশ টাকা নয় ত্রিশ টাকা পর্যন্ত দিতে পারবেন। অরুণ যদি তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয় তবে যেন অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

প্রীতি চিঠিটা আগেই পড়ে ফেলেছিল, বলল, 'তিরিশ টাকার জন্যে অত-দূরে গিয়ে টিউশনি করবে দাদা ?'

অরুণ বলল, 'উপায় কি। তিরিশের বেশি এখন আর জুটছে কই।'

প্রীতি বলল, 'কিন্তু পথেই যে তোমার সব খরচ হয়ে যাবে দাদা।'

অরুণ বলল, 'সব খরচ হবে না। দু-চার টাকা অন্তত বাঁচবে। তোর স্নো সাবানের পয়সাটা তো অন্তত হয়ে যাবে। কি বলিস ?'

প্রীতি বলল, 'আহা-হা।'

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ছাত্রটি যে কি পদার্থ অরুণ তা বেশ ভালভাবেই টের পেয়ে গেল। ছেলেটি ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে; কিন্তু ইংরেজী বাংলার জ্ঞান ফোর্থ ক্লাসের উপযোগীও নয়। খেলাধুলা, সিনেমা, রাজনীতি সব বিষয়েই শ্যামলের উৎসাহ আছে। শুধু পড়াশুনোয় তেমন আগ্রহ নেই। আর প্রাইভেট টিউটর যে বেতনভুক্‌ কর্মচারীমাত্র সে বোধটা এরই মধ্যে শ্যামলের জন্মে গেছে। পড়তে পড়তে হঠাৎ শ্যামল এক সময় উঠে যায়, 'মাস্টার মশাই বসুন, আমি একটু ওপর থেকে আসছি।'

'ওপরে আবার তোমার কি দরকার পড়ল ?'

'আছে একটু দরকার।'

তারপর মিনিট পনের কুড়ির মধ্যে আর শ্যামলের দেখা মেলে না। আর একদিন পাটীগণিত থেকে দুটি স্কোয়ার মেজারের অঙ্ক দেখিয়ে শ্যামল বলল, 'করুন তো মাস্টার মশাই।'

অরুণ বলল, 'তুমি কর, ভুল হলে আমি দেখিয়ে দেব।'

শ্যামল বলল, 'সোজা দেখে আপনি দু-একটা আগে করে দিন তারপর বাকিগুলি আমি করব।'

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম অঙ্কটার সঙ্গে ফলের মিল হল না।

অরুণ আবার চেষ্টা করে দেখছে, শ্যামল অঙ্কের বইটা হঠাৎ বন্ধ করে ফেলে বলল, 'যাকগে, যেতে দিন মাস্টার মশাই। ও আমি অন্য ছেলের খাতা দেখে টুকে নেব। আপনি বরং ইতিহাস পড়ান আজ।'

শ্যামলের কথার ভঙ্গিতে একটু যেন বিদ্রূপের সুর ছিল। অরুণ তা লক্ষ্য করে বিরক্ত হয়ে বলল, 'ইতিহাস পরে পড়াচ্ছি। অঙ্কটা কেন মিলছে না আগে দেখা যাক।'

শ্যামল বলল, 'ও আর দেখবেন কি। কতকগুলি অঙ্ক অমন বেয়াড়া অমিল ধরনেরই হয়। ও নিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। একটা অঙ্ক যতক্ষণ বসে আপনি করবেন ততক্ষণে পাঁচটা অঙ্ক আমার টোকা হয়ে যাবে।'

অরুণ বলল, 'না বুঝে টুকে লাভ কি ?'

শ্যামল কি বলতে যাচ্ছিল বিনোদবাবু ঘরে ঢুকলেন। স্টেথিস্কোপটা গলায় ঝুলানো।

কলে বেরুচ্ছেন। যাওয়ার পথে একবার খোঁজ নিয়ে গেলেন, 'কি মাস্টার মশাই, পড়াশুনো কেমন চলছে ?'

অরুণ বলল, 'ভাল।'

'ছাত্র কথা-টথা শুনছে তো ?'

'হ্যাঁ।'

বিনোদবাবু এবার ছেলের দিকে তাকালেন, 'কি রে ভাল করে বুঝেশুনে নিচ্ছিস তো সব ?'

শ্যামল সবিনয়ে বলল, 'হ্যাঁ বাবা।'

'অঙ্কটা ?'

শ্যামল বলল, 'সব বুঝে নিচ্ছি। কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আগের মাস্টার মশায়ের চাইতেও ইনি বেশ—'

বিনোদবাবু ধমক দিলেন—'থাক থাক তোকে আর তুলনা করতে হবে না। নিজে তো বিদ্যের বিশারদ। আবার মাস্টার মশায়ের বিচার হচ্ছে।'

বাইরে গাড়ি দাঁড়ানো ছিল। বিনোদবাবু গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন।

গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলও উঠে দাঁড়াল, বলল, 'আজ থাক মাস্টার মশাই। মাথাটা বড্ড ধরেছে।'

অরুণ বলল, 'এরই মধ্যে তোমার মাথা ধরে গেল ?'

শ্যামল বলল, 'হ্যাঁ, বাবা দূরেই বেরিয়েছেন, শিগ্‌গির ফিরবেন না।' বলে বই খাতা গুছিয়ে রেখে বিদায় চাইল, 'যাই মাস্টার মশাই।'

বাবা বেরিয়ে গেলেও মা বেরোন নি। শ্যামলের মার গলা শোনা গেল, 'ওকি এরই মধ্যে তোর পড়া হয়ে গেল খোকন ?'

'হ্যাঁ মা, আজ আর পড়ব না। বড্ড মাথা ধরেছে।' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে শ্যামল জবাব দিল।

শ্যামলের মা বললেন—'আজ মাথাধরা কাল পেটব্যথা। তোর একটা না একটা অজুহাত তো লেগেই আছে। আচ্ছা এ ফাঁকি তুই কাকে দিচ্ছিস খোকন ? নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছিস না ? মাসের পর মাস এতগুলি টাকা জলে যাচ্ছে।' কিন্তু শ্যামলের আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ভিতর থেকে বাইরের পড়বার ঘরে ঢুকলেন শ্যামলের মা হেমাঙ্গিনী। মাঝবয়সী মোটাসোটা মহিলা। অরুণ উঠে দাঁড়িয়েছিল। তিনি মাথায় আঁচলটা একটু টেনে দিয়ে বললেন, 'আপনি বসুন মাস্টার মশাই। ওকে রোজ রোজ অত সকালে ছেড়ে দেবেন না। আরও একটু বেশি সময় আটকে রাখবেন।'

অরুণ বলল, 'আজ্ঞে তাই তো রাখি। আজ মাথা ধরেছে বলে উঠে গেল।'

হেমাঙ্গিনী বললেন, 'ওর কোন কথা বিশ্বাস করবেন না। সব ফাঁকি। এমন ফাঁকিবাজ ছেলে পাড়ায় আর দুটি নেই।'

মা ছেলের যতই নিন্দা করুন না, প্রাইভেট টিউটরের পক্ষে অতখানি ছাত্র-নিন্দা শোভা পায় না। তাই একটু রেখে ঢেকে ছাত্রের দোষ-ত্রুটির ওপর খানিকটা স্নেহের প্রলেপ বুলিয়ে অরুণ বলল, 'হ্যাঁ, পড়াশুনোয় একটু যেন অন্যমনস্ক।'

হেমাঙ্গিনী বললেন, 'একটু কেন, খুব। নিজের ছেলে বলে আমি যে তার দোষ দেখব না, কেবল মাস্টারমশাইদের দায়ী করব তা নয়। অনর্থক পরকে দোষ দিয়ে লাভ কি? আপনি একটু ভাল করে চেষ্টা করে দেখবেন। গালমন্দ করে হোক, মেরেধরে হোক যে ভাবে পারেন। আমি কিছু বলব না।'

অরুণ হেসে বলল, 'আজ্ঞে, মারধোর করবার বয়স তো তার নেই। তাতে বরং উল্টো ফলই হয়। আমার নিজের একটি ভাইও ঠিক এমনি হয়েছে। মনে হয় ছেলেবেলার অতিরিক্ত শাসনের ফলেই তার কিছু হল না।'

অতুলের সম্বন্ধে হঠাৎ কেমন একটু মমতাবোধ করল অরুণ।

হেমাঙ্গিনীও পারিবারিক কথা পাড়লেন। চার মেয়ের পর এই ছেলে। বাড়িতে একটু বেশি আদরযত্নই পেয়েছে। বিনোদবাবু নিজেও মানুষ বড় ভাল নন। আদর যখন করবেন তখন খুবই আদর করবেন ছেলেকে। আবার শাসনের সময়ও একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যাবেন। ফলে ছেলেও হয়েছে একগুঁয়ে বদমেজাজী।

'কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না মাস্টারমশাই। বাপ-মাকে চেষ্টা তো করতেই হবে।' একটু অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন হেমাঙ্গিনী।

অরুণ বলল, 'তা তো নিশ্চয়ই; আপনি ভাববেন না। অল্প বয়সে অনেকেই এরকম থাকে। তারপর শুধরে যায়।'

হেমাঙ্গিনী খুশী হয়ে বললেন, 'দেখুন চেষ্টা-চরিত্র করে।'

ধীরে ধীরে আরও অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হল। অরুণের কথাবার্তা শুনে প্রথম দিনই হেমাঙ্গিনী তাকে পছন্দ করেছেন। বয়স্ক স্কুলমাস্টারের চাইতে অল্পবয়সী ছেলেরাই অনেক সময় ছাত্রদের ভাল পড়ায়। তারা ছাত্রের মন বুঝে তার সঙ্গে মিলেমিশে চলতে চেষ্টা করে; তাতে ফল অনেক সময় ভাল হয়। হেমাঙ্গিনী লক্ষ্য করে দেখেছেন বুড়ো মাস্টাররা একেবারেই শ্যামলকে বাগে আনতে পারেন না। ওর যেটুকু যা হয় কমবয়সী ছেলে-ছোকরাদের কাছেই হয়। কিন্তু বিনোদবাবুর মোটে ধৈর্য নেই। কেবলই মাস্টারদের পরখ করবেন, মাস্টার বদলাবেন। অত অধীর হলে কি চলে! অরুণ যেদিন

প্রথম আসে হেমাঙ্গিনী আড়াল থেকে তাকে দেখেছিলেন, তার কথাবার্তা শুনেছিলেন। তিনিই স্বামীকে দিয়ে জোর করে চিঠি লিখিয়েছেন। 'পড়ানো আবার দেখবে কি, কথায় বার্তায় তো বেশ ভাল ভদ্রঘরের ছেলে বলে মনে হল। একেই রাখ। আর কত টাকা কত-দিকে বেরিয়ে যায়, যত হিসেব বুঝি তোমার ছেলের টিউটর রাখবার বেলায়। যা চেয়েছে তাই দিয়েই রাখ টিউটর। বেশি টাকা না দিলে কি ভাল লোক পাওয়া যায়, না কেউ মন দিয়ে পড়ায় ?'

অরুণকে ভরসা দিলেন হেমাঙ্গিনী, টার্মিনাল পরীক্ষায় শ্যামল একটু ভাল করলেই তিনি তার মাইনে পুরোপুরি চল্লিশ করে দেবেন। অরুণ যেন তাঁর ছেলের দিকে একটু লক্ষ্য রাখে। ভাল করে মন দিয়ে যত্ন নিয়ে পড়ায়। অরুণ ছাত্রের মাকে আশ্বাস দিয়ে বলল তার চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না। হেমাঙ্গিনী খুশী হয়ে এতদিন বাদে ছেলের টিউটরের জন্য চা জলখাবার আনলেন। চাকরকে বললেন রোজ অরুণকে চা দিয়ে যেতে। ছাত্রের ডেঁপোমিতে অরুণ ভারি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ছাত্রের মা'র ব্যবহারটুকু এবার তার ভাল লাগল। নিজের মা'র কথা মনে পড়ে গেল, তার মনে পড়ল অতুলের জন্যে তাঁর উদ্বেগ অশান্তির কথা।

হেমাঙ্গিনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অরুণ বেরোচ্ছে, পথে দেখা হয়ে গেল দিলীপের সঙ্গে। তার হাতে একটা মিকশ্চারের শিশি। কম্পাউণ্ডারের কাছে ওষুধ নিতে এসেছিল দিলীপ।

অরুণ বলল, 'অসুখ কার ? তোমার মা'র নাকি ?'

দিলীপ বলল, 'না। বউদির।'

অরুণ বিস্মিত হয়ে বলল, 'সেকি ! তাঁর আবার কি হল ?'

দিলীপ বলল, 'জ্বর হয়েছে। আপনি যেদিন গেলেন না, তার পরদিন থেকেই জ্বর। আসবেন ? দেখে যাবেন বউদিকে ?'

ছাত্রের বাড়িতে আসা-যাওয়ার পথে রোজই অরুণের মনে হয়েছে করবীর সঙ্গে আর একবার দেখা করলে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। একটি শোকার্তা বিধবার কাছে বার বার গিয়ে কি লাভ। লোকে যেমন সান্ত্বনা দেয় তেমন মামুলী মৌখিক সান্ত্বনা অরুণের আসে না। অরুণ জানে সময়ই সব শোকের বড় সান্ত্বনা। সময় সমস্ত শোকের ওপর বিস্মৃতির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। তার আগে মোহ-মুদ্গর আউড়ে কোন লাভ নাই। কিন্তু শোকে যে অভিভূত তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা না করাও এক ধরনের অশোভন অসামাজিকতা। তাই অরুণ যতটা পারে এসব অবস্থায় দূরে থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু অন্য সকলের সম্বন্ধে যাই হোক, করবীর

বেলায় দূরে সরে থাকাটা ঠিক যেন ভাল লাগছিল না অরুণের। প্রায় তার বাড়ির সামনে দিয়েই রোজ যাতায়াত করে, কিন্তু একবার খোঁজ নিয়ে যেতে পারে না। অথচ খোঁজখবর নেওয়ার, দেখা করার ইচ্ছা হয়। নিজের মনের এই অকারণ দ্বিধায় তার নিজেরই ভারি খারাপ লাগছিল। দেখা করার ইচ্ছাটাকে নিজের মনেই সে বাতিল করে দিয়েছিল। কোন্ উপলক্ষে সে দেখা করবে। আর কোন নতুন ঘটনা, নতুন কারণ ঘটেছে যে, সেই সূত্র ধরে সে করবীর খবর নিতে যাবে। তার সঙ্গে তো এমন কোন আত্মীয়তা নেই, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব নেই যে, যখন-তখন ইচ্ছা করলেই যাওয়া যায়। তাছাড়া অরুণকে দেখে করবীর ভাব তেমন প্রীতিকর না-ও হতে পারে। দিল্লীর সেই চপল উচ্ছল দিনগুলির স্মৃতি করবীকে হয়তো এখন আর আনন্দ দেয় না। হয়তো করবী মনে মনে ভাবে সেই একটা মাস স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় কাটালেই ভাল হত। স্বামী-সান্নিধ্যের সুখ জীবনে আরও একটি মাস বাড়ত তাহলে।

কিন্তু অত হিসাব না করেও তো যাওয়া যায়। বলা যায়, এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, একটু কাজ ছিল এদিকে, আপনারা কেমন আছেন খোঁজ নিয়ে গেলাম। করবীর সঙ্গে তার যতটা পরিচয় তাতে যাতায়াতের পথে এমন মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ নেহাৎ অশোভন হয় না, এমন খোঁজ-খবর নেওয়াটা সামাজিক আদব-কায়দার মধ্যেই পড়ে। কিন্তু করবী যদি জিজ্ঞেস করে, 'কি কাজ ছিল আপনার ?' যদি মনে মনে ভাবে এতদিন অরুণের এদিকে কোন কাজ ছিল না, হঠাৎ কি কাজ পড়ল একথা যদি তার মনে ওঠে। তার মনের সংশয় দূর করবার জন্যেই অরুণকে সত্য কথাটাই বলতে হবে তাহলে। বলবে, এই রাস্তায় বিনোদবাবুর বাড়িতে একটা ট্যুইশন জুটেছে। সেইজন্যে রোজ আসতে হয়। কিন্তু যে অরুণ দিল্লীতে সরকারী চাকরি করত, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন থেকে এতদূরে এই ভবানীপুরে একটি স্কুলের ছেলেকে সামান্য মাইনেয় রোজ পড়াতে আসে সে, এ কথাটা শোনার সঙ্গে অরুণের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে করবীর মনের ভাবটা কি রকম হবে। অরুণের দারিদ্র্যের কথা বুঝতে কি কিছু আর বাকি থাকবে তার। কি দরকার একটি মেয়ের সামনে নিজের আর্থিক দৈন্যকে অমন করে উদ্ঘাটন করবার। তার চেয়ে আড়ালে থাকাই ভাল। নিজের অভাব-অনটন দুঃখ-দৈন্যকে আড়ালে রাখাই ভাল।

কিন্তু দিলীপ যখন করবীর অসুখের খবর জানিয়ে অরুণকে তাদের বাসায় আসবার জন্য অনুরোধ করলে তখন না যাওয়াটা ভারি অভদ্রতা হবে বলে মনে হল অরুণের।

দিলীপের কথার জবাবে বলল, 'আচ্ছা চল।'

যেতে যেতে দিলীপ বলল, 'আপনি বুঝি এ বাড়িতে শ্যামলকে পড়ান ? আপনাকে সেদিনও দেখলাম—'

অরুণ স্বীকার করে বলল, 'হ্যাঁ, ওকে পড়াই আমি। শ্যামলের সঙ্গে আলাপ আছে নাকি তোমার ?'

দিলীপ একটু হেসে বলল, 'বাঃ আলাপ থাকবে না ? এক ক্লাসেই তো পড়ি আমরা। এক বছর ওপরে ছিল আমার। গত বছর ফেল করায়—'

বলতে বলতে দিলীপ থেমে গেল।

অরুণ লক্ষ্য করল এক ক্লাসে পড়লেও শ্যামলের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছেলে দিলীপ। বয়সের তুলনায় একটু যেন বেশি শান্ত আর গম্ভীর।

অরুণ কড়া নাড়তে আজ করবীর শাশুড়ী নিভাননীই এসে দোর খুলে দিলেন। অরুণকে দেখে তিনি বললেন, 'এই যে, এসো।'

দিলীপ আর তার মার সঙ্গে করবীর ঘরে ঢুকলো অরুণ। খাটে শোয় নি করবী। মেঝেতেই রোগশয্যা পাতা হয়েছে। এই ক'দিনের জ্বরে বেশ একটু রোগা হয়ে গেছে চেহারা। অরুণকে দেখে করবী একটু মৃদু হাসল, বলল, 'আজ বুঝি দিলীপের হাত আর এড়াতে পারেন নি ? ও জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে ?'

অরুণ বলল, 'বাঃ ধরে নিয়ে আসবে কেন ?'

করবী একথার কোন জবাব না দিয়ে দিলীপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিলু, অরুণবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। বসতে দাও ওঁকে।'

দিলীপ তাড়াতাড়ি টেবিলের সামনে থেকে পরেশের সেই গদি-আঁটা ভাল চেয়ারটাই টেনে আনল।

করবী দিলীপের দিকে একবার তাকালো কিন্তু কোন কথা বলল না, বরং অরুণের দিকে চেয়েই অনুরোধ করল, 'বসুন আপনি।'

অরুণ অবস্থাটা বুঝতে পারল। করবীর স্বামীর চেয়ারটা এগিয়ে দেওয়ার সময় দিলীপ তেমন খেয়াল করে নি। কিন্তু এগিয়ে যখন একবার দিয়েইছে তখন তো আর সরিয়ে নেওয়া যায় না। তখন বসতে বলতেই হয়। কিন্তু কেউ একটু মৌখিক ভদ্রতা করে কিছু অনুরোধ করলেই অরুণ তা রক্ষা করবে তেমন ছেলেই সে নয়। এগিয়ে দেওয়া চেয়ারটায় না বসে অরুণ মেঝের ওপরেই বসে পড়ে বলল, 'না না চেয়ারে দরকার নেই, চেয়ার থাক।'

নিভাননী ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওকি তাই বলে মাটিতে বসলে কেন তুমি। অরুণকে একটা আসন-টাসন এনে দে না দিলু।'

তাই হল। একখানা আসন এনে দিলু করবীর বিছানার কাছে পেতে দিল। তারপর মেজার গ্লাসে শিশি থেকে ওষুধ ঢেলে দিয়ে করবীর মুখের সামনে এগিয়ে ধরে বলল,

'নাও বউদি।' করবী ওষুধটুকু খেয়ে ফেলে বলল, 'দেখেছেন ? সামান্য একটু ইনফ্লুয়েঞ্জা না কি হয়েছে তাতে মা আর ছেলে দুজনে মিলে আমাকে ওষুধ খাওয়ানোর কি ধুম লাগিয়েছেন।'

নিভাননী বললেন, 'হুঁ, সামান্যই তো। দু-দিন তো জ্বরের ঘোরে একেবারে অজ্ঞান হয়েছিলে।'

করবী মৃদু স্বরে বলল, 'বেশ ছিলুম। জ্ঞান যদি একেবারে ফিরে না আসত তাহলেই বাঁচতুম।'

একথার কেউ কোন জবাব দিল না। একটু বাদে নিভাননী পাশের ঘরে চলে গেলেন।

একটি প্লেটে করে বেদানার দানা ছাড়িয়ে দিলু করবীর দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'খেয়ে নাও বউদি।'

করবী বলল, 'আঃ, আবার ওগুলি এনেছ কেন।'

দিলীপ বলল, 'খাও, এই তো তেতো ওষুধগুলি খেলে। মুখটা ভাল লাগবে।' করবী সস্নেহে ছোট দেবরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে অরুণের দিকে চেয়ে বলল, 'ভারি ভালবাসে আমাকে ও, অসুখের মধ্যে কি সেবাটাই করছে। দিলু, তোমার অরুণদাকে একটু চা করে খাওয়াতে পার এবার ?'

দিলীপ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'যাচ্ছি বউদি।'

অরুণ বাধা দিয়ে বলল, 'না না চা এখন থাক। চা এইমাত্র খেয়ে এলাম।' করবী বলল, 'কোত্থেকে খেলেন ? ছাত্রের বাড়ি থেকে ?' ক্ষীণ একটু হাসল করবী। রোগশীর্ণ শুষ্ক ঠোঁটে সেই হাসিটুকু ভারি সুন্দর লাগল অরুণের চোখে।

অরুণ বলল, 'কি করে জানলেন আপনি ?'

করবী বলল, 'আমি সব জানি, সব খবর রাখি। দিলুই সেদিন বলল আমাকে, বউদি, অরুণদা রোজ আসেন এ পাড়ায়। ডাক্তারবাবুর ছেলে শ্যামলকে পড়ান। বললুম, আসতে বলো আমাদের এখানে। তা ও যা লাজুক। বোধ হয় বলতেই পারে নি। কিন্তু বলতেই বা হবে কেন। আপনি রোজ এদিকে আসছেন। অথচ একবারও খোঁজ নেন না।' এই অভিযোগের উত্তরে অরুণ কি বলবে হঠাৎ ভেবে পেল না, করবী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সেদিন আমার ব্যবহারে আপনি বোধ হয় রাগ করেছিলেন, আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে এলাম। খানিকক্ষণের মধ্যে কিছুতেই আর যেতে পারলাম না। যাওয়ার মত শরীরের অবস্থা ছিল না। সারা শরীর কেবল কাঁপছিল। কিছুক্ষণ বাদে ফের যখন গেলাম ও ঘরে, দিলু বলল, আপনি চলে গেছেন। কিছু মনে করবেন না।'

রোগশয্যায় শুয়েও করবী অনেক কথা বলেছে। কিন্তু এ যেন আর এক করবী। সেই পরিহাসচপল উচ্ছল প্রগল্‌ভা করবীর সাক্ষাৎ যেন আর কোনদিন মিলবে না। তবু এ করবীকে অরুণের ভাল লাগতে লাগল। ভারি কোমল আর করুণ ওর কথাগুলি। বলবার ভঙ্গিতে যেন ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা মাখানো। অরুণ চেয়ে দেখল ওর মুখের স্বাভাবিক গৌরবর্ণ একটু যেন ফ্যাকাশে হয়েছে। মাথায় আঁচল নেই। রুক্ষ কালো চুলের রাশের মধ্যে সিঁথির সাদা রেখা। ঠিক কুমারীর সিঁথির মত। করবীর দিকে তাকালে এখন আর বোঝা যায় না ওর কোনদিন বিয়ে হয়েছিল। অরুণের যেন মনে পড়তে চায় না দিল্লীতে মাসখানেক ধরে সিঁদুররঞ্জিত এই সিঁথিই সে দেখেছিল রোজ। কিন্তু করবীর এই সাদা সিঁথি এরই মধ্যে ওর চেহারার সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে, বরং যেন বেশিই মানিয়েছে। কুমারী অবস্থায় করবীকে তো অরুণ কোনদিন দেখে নি, তখন সিঁথির শুভ্রতা কি এরও চেয়ে সুন্দর দেখাত? কিন্তু এখনও করবী ঢের সুন্দরী। রূপবতীকে যে-কোন বেশেই সুন্দরী দেখায়। বাইরের রঙীন বসনভূষণ ছেড়ে রিক্ত হতে চাইলে কি হবে, রূপের ঐশ্বর্য যে করবীর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে।

করবী অরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ভাবছেন?'

অরুণ বলল, 'কিছুই ভাবছি না। আপনি ভারি রোগা হয়ে গেছেন তাই দেখছিলাম।'

করবী একটু লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল, তারপর বলল, 'ও রোগা! কিন্তু আপনি আসল কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন। সেদিন আপনি রাগ করে চলে গিয়েছিলেন কিনা সত্যি করে বলুন তো।'

অরুণ বলল, 'আচ্ছা আপনি আমাকে কি রকম মানুষ বলে মনে করেন বলুন তো। আমি কি অতই হৃদয়হীন যে আপনার এই অবস্থাতেও আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার ত্রুটি ধরব? আপনি কি ভাবে রিসিভ করলেন কি ভাবে বিদায় দিলেন তার খুঁটিনাটি বিচার করব? আমাকে কি আপনি সেইরকমই বলে ভাবেন?'

করবী বলল, 'না তা ভাবি নে।'

দিলু ঘরে ঢুকল। এক কাপ চা করে নিয়ে এসেছে। অরুণের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নিন অরুণদা। দেখুন তো খাওয়া যায় কিনা।'

এতক্ষণে মৃদু একটু হাসল দিলীপ। অরুণ কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে। খাওয়া যাবে না কি বলছ। তোমার চায়ের হাত তোমার বউদির চেয়েও ভাল।'

করবী একটু হেসে বলল, 'নাও হল তো? একেবারে চা-রসিকের সার্টিফিকেট পেয়ে গেলে।'

দিলীপ লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না, আমি অত ভাল করতে পারি নে। বউদি এবার কি পিপলুর দুধটা স্টোভে গরম করে নেব ?'

করবী বলল, 'নাও। কিন্তু ও তো মাও পারতেন। তুমি না হয় একটু পড় গিয়ে দিলু। তোমার পড়াশুনার কত ক্ষতি হচ্ছে। এবারেই পরীক্ষা।'

দিলু এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বোধ হয় দুধ গরমের জন্যেই পাশের ঘরে গেল।

অরুণ বলল, 'পিপলু কোথায় ?'

করবী জবাব দিল, 'মার কাছে ঘুমুচ্ছে। ক'দিন ধরে মার কাছেই থাকে।'

অরুণ বলল, 'ওর সঙ্গে আর দেখাই হল না। যেদিন আসি সেদিনই শুনি ঘুমুচ্ছে।'

করবী বলল, 'ওর কথা আর বলবেন না। সন্ধ্যা হতে না হতেই ওর চোখে ঘুম আসে। জ্বালায় বেশি রাত্রে। ওর সঙ্গে দেখা করতে হলে আপনাকে সন্ধ্যার আগে আসতে হবে। কাল তাই আসুন না। একটু সকাল করে আসুন। ট্যুইশানিতে যাওয়ার আগে এখানে হয়ে চা খেয়ে যাবেন।'

অরুণ ঘাড় নেড়ে বলল, 'আচ্ছা।'

আরও কিছুক্ষণ বাদে এ কথা ও কথার পর উঠে দাঁড়াল অরুণ। দাঁড়াতেই পরেশের লিখবার টেবিলটা চোখে পড়ল। আজও সুন্দর করে গুছান রয়েছে টেবিল। দু-পাশে বই। ফটোস্ট্যাণ্ডে স্বামী-স্ত্রীর সেই দুখানি ফটো। পরেশের ফটোতে একটি বেলফুলের মালা জড়ানো। একপাশে ছোট একটি ফুলদানিতে কয়েকটি রজনীগন্ধা।

অরুণ বলল, 'রোজ এ সব করেন বুঝি ?'

করবী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'যেদিন আমি না পারি, দিলুই করে। দাদা-অন্ত প্রাণ ছিল ওর। তিনিও ওকে ভালবাসতেন খুব। দিলু কিন্তু একবারও মুখে তাঁর নাম করে না। তাঁর কথা উঠলে সামনে থেকে সরে যায়। সইতে পারে না।'

অরুণ বলল, 'কলমটি কি হল ?'

করবী বলল, 'ও সবই আপনার চোখে পড়েছে ? কলমটি তুলে রেখেছি। পিপলু নষ্ট করে ফেলছিল। দামী জিনিস।'

অরুণ করবীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দামী তো নিশ্চয়ই।'

করবী এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'কাল আসছেন তাহলে।'

বেরিয়ে এসে অরুণ মনে মনে ভাবল করবীর সবই ভাল কিন্তু এই ফটোপূজার মধ্যে যেন একটু বাড়াবাড়ি আছে। অরুণ নিজে এমন প্রকাশ্যভাবে মৃত প্রিয়জনের পূজা-অর্চনা করতে পারত না। গভীর শোককে মনের গভীরে লালন করত।

অন্যের সামনে কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দিত না তার। কিন্তু পরক্ষণেই অরুণের মনে

হল সে হয়তো করবীর ওপর অবিচার করছে। জীবন্ত স্বামীর পূজা করাই যে দেশের রীতি, মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে সে দেশে পুষ্পার্ঘ্য যদি করবী দেয়ই অরুণের তাতে আপত্তি করবার কি আছে।

পরদিন করবীর অনুরোধ রাখল অরুণ। ট্যুইশানিতে যাওয়ার আগে তাদের বাড়ি হয়ে গেল। করবীর জ্বর ছেড়ে গেছে। কিন্তু দুর্বলতা যায় নি। অরুণকে দেখে একটু হেসে বলল, 'এই যে আসুন।'

পিপলুর সঙ্গেও আজ দেখা হল। ভারি দুরন্ত ছেলে। ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। অরুণ ওকে ধরে কাছে আনতে গেল কিন্তু কিছুতেই ও এল না। অরুণ বলল, 'আপনার ছেলে তো ভারি অকৃতজ্ঞ। ও আমাকে একেবারেই ভুলে গেছে।'

করবী হেসে বলল, 'তার জন্য দুঃখ করবেন না। দু-একদিন যান আসুন, তখন ও আপনার পিছু ছাড়তে চাইবে না দেখবেন।'

দিনকয়েকের মধ্যে যাতায়াতটা বেশ সহজ হয়ে এল। কোনদিন ছাত্র পড়াবার আগেই আসে অরুণ, কোনদিন পড়িয়ে আসে। করবীর অসুখ সেরে গেছে। সুস্থ হয়ে চলাফেরা কাজকর্ম করছে ও। সব দিন অরুণের সঙ্গে বসে গল্প করবার করবীর সময় হয় না। শুধু একবার এসে দেখা দিয়ে খোঁজ নিয়ে যায়। কিংবা সংসারের কাজ করতে করতেই কথা বলে। যখন করবী থাকে না অরুণ দিলীপের মা'র সঙ্গে কি দিলীপের সঙ্গে আলাপ করে। তার পড়া-শুনার খোঁজ খবর নেয়। অঙ্ক কষায় ট্রানশ্লেসন করতে দেয়। প্রথম প্রথম দিলীপের ভারি সঙ্কোচ ছিল। সে অরুণের কাছ থেকে কোন সাহায্য নিতে চাইত না। কিন্তু দিলীপকে সাহায্য করার, তার সঙ্গে ভাব জমাবার গরজ অরুণেরই যেন বেশি, কারণ অরুণ এটা লক্ষ্য করেছে করবী এতে খুশী হয়। করবী চায় দিলীপ আর তার মধ্যে শ্রদ্ধা আর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠুক। কিন্তু দিলীপ কথা বলে কম। যা বয়স সেই তুলনায় চাপল্য চাঞ্চল্য ওর প্রায় নেই বললেই চলে, ভারি গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে। দিলুর স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে ওর অসাক্ষাতে করবী আর তার শাশুড়ীর সঙ্গেও মাঝে মাঝে আলাপ করে অরুণ।

'আপনার দেওরটি একেবারে জন্ম-বুড়ো।' অরুণ মন্তব্য করে। 'এই বয়সে এত গুরুগম্ভীর ছেলে আমি আর দেখি নি।'

করবী বলে, 'হ্যাঁ, ওই রকমই।'

নিভাননী বললেন, 'একেবারে এতটা গম্ভীর ছিল না আগে। দাদার শোকে ও যেন একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে। প্রথম ক'দিন তো ওকে নাওয়াতে খাওয়াতেই পারি নি। ঘরের কোণে দেওয়ালে মাথা রেখে চুপ করে বসে থাকতো। কারো সামনে কাঁদত না,

লুকিয়ে কাঁদত। ওর ভাবচরিত্র দেখে ওকে নিয়েই হল আমার চিন্তা। যে গেছে সে তো গেছেই, এখন ওকে বাঁচাতে পারলেই হয়! আজকালও দেখ না কি রকম ভাব। খেলানো বেড়ানো কিছু নেই, স্কুলে কারোর কাছে যায় আসে না। স্কুল থেকে ফিরে এসে বইপত্র নিয়ে বাড়িতেই থাকে। বাকি সময়টুকু সংসারের কাজকর্ম করে, রেশন বাজার সব তো এখন ওকেই দেখতে হয়।'

অরুণ উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে, 'এ তো ঠিক নয়, ও যাতে একটু অন্যমনস্ক হয়, স্বাভাবিকভাবে খেলাধুলা হাসিগল্প করে সেই চেষ্টাই তো করা উচিত সকলের।'

নিভাননী বলেন, 'দেখ না বাপু তুমি একটু চেষ্টাচরিত্র ক'রে। তবু তুমি যাও আস, পড়াশুনা নিয়ে আলাপ করো, গল্প করো, আমার বেশ ভাল লাগে। যতক্ষণ তুমি থাকো ততক্ষণ বরং বাড়িতে একটু সাড়াশব্দ থাকে। অন্য সময় তো টেঁকাই যায় না।'

এ বাড়িতে তার প্রয়োজনীয়তা নিভাননীও যে অনুভব করছেন, সে কথা মুখ ফুটে স্বীকার করছেন তা দেখে অরুণের খুব ভাল লাগে। বেশ একটু নিশ্চিন্ত হয়। নিভাননী আলাপ ব্যবহারে বেশ ভাল। বাঙলা লেখাপড়া ভালোই জানেন। বয়স্কা হিন্দু বিধবা হওয়া সত্ত্বেও তেমন বিশেষ রক্ষণশীলতা নেই।

এক সময় ছেলেকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ওঁর স্বামী সেখানে মাস্টারি করতেন। ছেলে স্কুলে পড়ত। সে গল্পও মাঝে মাঝে করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওঁর ব্যক্তিগত আলাপ ছিল। বেশ একটু আত্মপ্রসাদের ভঙ্গিতে যখন সেই পুরনো দিনের কথা বলতে থাকেন নিভাননী, তখন তাঁর মুখ দেখলে মনে হয় না এই কিছুদিন আগেও অতবড় একটা শোক তিনি পেয়েছেন।

বেশ লাগে অরুণের। এই একটি নতুন পরিবারের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে তার প্রীতির আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠছে। কত পুরনো বন্ধু হারিয়ে গেছে, কত আত্মীয়তার ধারা শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু ভবানীপুরের এই গলিতে আর একটি পরিবারকে লোনা সমুদ্রে একটু নতুন সবুজ দ্বীপের মত আবিষ্কার করেছে অরুণ। ভারি অদ্ভুত এই জীবন। কোন্ দিক দিয়ে যে সে কি ভাবে ক্ষতিপূরণ করে দেয় তা বলা যায় না।

আজকাল নিজের বাড়ির চেয়ে, বন্ধুবান্ধবের দলের আড্ডার চেয়ে করবীদের এই ছোট সংসারের পরিবেশই যেন বেশি ভাল লাগে অরুণের। এ বাড়িতে আসার জন্যে সমস্ত মন যেন ওর উন্মুখ হয়ে থাকে। সবদিন আসে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করেই দু-একদিন বাদ দেয়। কিন্তু বাদ যে দিল—গেল যে না, সে কথাটা দিনের মধ্যে অনেকবার করে মনে পড়ে। পরদিন একটু আগে আগে গিয়েই উপস্থিত হয়। পকেটে করে লজেনস্

কি বিস্কুট নিয়ে যায় পিপলুর জন্যে। করবী অনুযোগ দেয়, 'কেন রোজ রোজ ওসব আনেন।'

অরুণ বলে, 'দেখি পিপলুর সঙ্গে খাতিরটা ফিরিয়ে আনতে পারি কি না।'

কিন্তু খাতিরটা কেন যেন ঠিক আগের মত ফিরে আসতে চায় না। পিপলু অরুণের দেওয়া জিনিসগুলি ঠিকই নেয়, কিন্তু তার কোলের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকে না, একটু বাদেই ছুটে চলে আসে।

অরুণ বলে, 'এসো, এসো।'

পিপলু দূরে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে, 'না যাব না। তুমি ভাল না।'

অরুণের মুখখানা একটু গম্ভীর দেখায়। করবী হাসে, ছেলের এই অসৌজন্যে সস্নেহে বেশ একটু ধমকও দেয়, 'একথা বলে নাকি? অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম ছেলে। এতক্ষণ ধরে লজেনস্‌গুলি খেলে কার? আর ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বলছ উনি ভাল নয়। আর কক্ষনো ওকে কিছু এনে দেবেন না বুঝলেন?'

অরুণের দিকে তাকিয়ে করবী একটু হাসে।

কিন্তু এই শাস্তির ভয়ে পিপলুকে মোটেই দমতে দেখা যায় না। ও তার সুন্দর লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটি উল্টিয়ে বলে, 'আমার কাকা আনবে?'

হঠাৎ মা'র কাছে এগিয়ে আসে পিপলু, 'আমার বাবা কোথায় গেছে মা?'

করবী কোন জবাব দেয় না।

পিপলু নিজেই বলে, 'স্বগ্‌গে গেছে, না? ঠামা বলে।'

করবী সায় দেয়, 'হু।'

পিপলু আবার জিজ্ঞেস করে, 'স্বগ্‌গ থেকে কবে আসবে মা? কতদিন তো গেছে, আসে না কেন?' এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে করবী চুপ করে থাকে। অরুণ আবার ডাকে, 'পিপলু, এদিকে এসো। শোন আর একটু, এসো আমার কাছে। আজ রাস্তায় কি হয়েছিল শোন। একটা ট্রাম আর একটা বাস বুঝলে—'

পিপলু এবার সত্যি সত্যিই এগিয়ে আসে কিন্তু ট্রাম বাসের গল্প শোনার জন্যে অন্যদিনের মত তেমন আগ্রহ দেখা যায় না, অরুণকে ঠিক আগের প্রশ্নই করে পিপলু, 'বাবা কবে আসবে বল না।'

অরুণ বলে, 'আসবেন একদিন।'

পিপলু বলে, 'কাল?'

অরুণ উত্তর দিতে না পেরে চুপ করে থাকে।

পিপলু আবার বলে, 'কাল আসবে না পরশু আসবে। পরশু ঠিক আসবে, তাই না?'

অরুণ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে করবী ঘর থেকে কখন চলে গেছে। আচ্ছা মানুষ তো। একা একা পিপলুর এই সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নের সামনে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে করবী।

পিপলুকে জানালার কাছে টেনে নিয়ে গেল অরুণ, 'দেখ দেখ একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে। কত বড় একটা ঘোড়া দেখেছ?'

পিপলু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সত্যিই একটা ঘোড়ার গাড়ি চলেছে রাস্তা দিয়ে। মোটেই বড় নয়। হাড় বের-করা রোগাটে চেহারার একটা ঘোড়া একখানি বোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে। গাড়ির ভিতরে মানুষ, ওপরে মাল।

পিপলু বলে, 'ওই গাড়িতে করে বাবা আসবে, না কাকু?'

অরুণ সায় দেয়, 'হুঁ।'

পিপলু পরক্ষণেই মাথা নেড়ে বলে 'উঁহু, গাড়িতে নয়। ঘোড়ায় চড়ে আসবে, বাবা ঘোড়ায় চড়ে আসবে কি মজা। কিন্তু বাবা তো ঘোড়ায় চড়তে জানে না, আসবে কি করে। তুমি ঘোড়ায় চড়তে জানো? বল না, জানো?'

একটু বাদে নিভাননী এসে উদ্ধার করেন অরুণকে। নাতিকে কোলে করে নিয়ে যেতে যেতে বলেন, 'পিপলু এসো, খাবে এসো।'

কিন্তু পিপলুর এ ধরনের শক্ত প্রশ্ন ছাড়াও সংসারে আরও প্রশ্ন আছে। তাও নেহাৎ কম কঠিন নয়। সে প্রশ্নের অস্তিত্ব অরুণ সেদিন টের পেল।

ছাত্র পড়াতে যাওয়ার আগে অরুণ সেদিনও করবীদের খোঁজ নিতে এসেছে।

নিভাননী দোর খুলে দিয়ে তাকে বাইরের ঘরে নিয়ে এসে বললেন, 'বসো। করবী একটু বেরিয়েছে এক্ষুনি আসবে।'

'আর দিলীপ?'

নিভাননী বললেন, 'তাকেও তো দেখছিনে।'

এরপর পিপলুর কথা জিজ্ঞেস করল অরুণ।

নিভাননী বললেন, 'এতক্ষণ দুষ্টুমি করছিল, অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি।'

তারপর আর কোন কথা জমল না। নিভাননী নিজের থেকেও আর কোন প্রসঙ্গ তুললেন না। তাঁর মুখের ভাব গম্ভীর। একটু যেন চিন্তাক্লিষ্ট।

অরুণ জিজ্ঞেস করল, 'আপনার শরীর কি ফের খারাপ হয়েছে?'

নিভাননী বললেন,'আর শরীর। না, শরীর আমার ভালই আছে। আসছি বোস তুমি।' বলে তিনি কি একটা কাজে চলে গেলেন।

একটু বাদেই সদরের কড়া নড়ে উঠল। অরুণই উঠে গিয়ে দোর খুলে দিল। করবী। অরুণ একটু হেসে বলল, 'অন্য দিন দোর খুলে দেন, আজ আপনার বাড়ির দোর

আমি খুললাম। কি ব্যাপার, বেরিয়েছিলেন কোথায়? মুখটুখ শুকনো, খুব হয়রান হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।'

করবী একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'হুঁ।'

ভিতরে এসে করবী বলল, 'কতক্ষণ এসেছেন?'

অরুণ বলল,'এই খানিকক্ষণ আগে। কিন্তু আপনি আমার কথার জবাব তো দিলেন না।'

'দিচ্ছি বসুন।'

বলে একটা চেয়ার একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে করবী জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আপনি চাকরি-টাকরি পেয়েছেন?'

অরুণ একটু হেসে বলল, 'কেন, আমায় দেখে কি সে রকম কিছু মনে হচ্ছে। চাকরি কোথায় যে পাব?'

করবী আস্তে আস্তে বলল, 'আমিও পেলাম না।'

অরুণ বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি! আপনিও চাকরির খোঁজে বেরিয়েছিলেন নাকি?'

করবী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ। না বেরোলে চলবে কি করে বলুন।'

একথার জবাবে অরুণ কি বলবে হঠাৎ ভেবে পেল না। করবীরও যে সমস্যা আছে একথা এতদিন তার মনেও হয় নি। আসবাবপত্রে এদের বেশ সাজানো গুছানো, ঘরদোর আর জানালা দরজায় রঙীন পর্দা দেখে অরুণের মনে হয়েছিল বাড়ির একমাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষ মারা যাওয়ার পরেও যারা এভাবে গুছিয়ে-টুছিয়ে নির্বিবাদে থাকতে পারে, তাদের নিশ্চয় অন্য কোন সংস্থান আছে। হয় টাকা আছে ব্যাঙ্কে, না হয় শেয়ার-টেয়ার থেকে অর্থাগমের অন্য ব্যবস্থা রয়েছে। করবীদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এক একবার যে কৌতূহল অরুণের না হয়েছে তা নয়, কিন্তু এতদিনের আলাপেও কিছুতেই সে কথা মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারে নি। করবী নিজে থেকেও ওসব প্রসঙ্গ তোলে নি কোন দিন। এমন কি নিভাননীও নয়। তাই আজ যখন করবী বলল চাকরির চেষ্টা ছাড়া তাদের চলবে না, অরুণ বেশ একটু বিস্মিতই হল। খানিক বাদে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনাকে ওসব কষ্ট করতে হবে না।'

করবী একটু হাসল, 'কেন করতে হবে না? আমাদের খুব বড়লোক বলে ভেবেছিলেন?

অরুণ বলল,'না বড়লোক ঠিক নয়, তবে ভেবেছিলাম পরেশবাবু কিছু রেখে-টেকে গেছেন।'

করবী বলল, 'কি আর রাখবেন বলুন, রাখবার সময় পেলেন কই। সব নিয়ে বছর পাঁচেকের তো চাকরি। তাও গোড়ার দিকের মাইনে তো খুবই কম ছিল। শেষে কিছু বাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে খরচও বাড়তে লাগল।'

অরুণ বলল, 'তাহলে কিছুই জমত না?'

করবী মাথা নাড়ল, 'না, মোটেই হিসেবি ছিলেন না। আমার হাতে দু-চার টাকা থাকলে তা চেয়ে নিয়ে খরচ করে ফেলতেন। বছর দুই আগে এক বন্ধুব পাল্লায় পড়ে হাজার আড়াই টাকার ইনসিওরেন্স শুরু করে গেছেন। তাই কেবল সম্বল। সে টাকা ইনসিওরেন্স অফিসেই পড়ে আছে। তা যদি এখনই ভাঙি, বিপদে আপদে—'

অরুণ বাধা দিয়ে বলল, 'না না, সে টাকা এখনই খরচ করবেন কেন। সে কোন কাজের কথা নয়।'

একটু বাদে বলল, 'আচ্ছা আপনাদের কোন আত্মীয়-স্বজন নেই ?'

এতদিন যা বলে নি, সেসব কথাও আজ ধীরে ধীরে বলতে লাগল করবী। আত্মীয়-স্বজন থাকবে না কেন, আছেন। বাবা আছেন, দাদা আছেন। কিন্তু প্রত্যেকেরই অল্প আয়, সংসারে খাইয়ে বেশি। এই দুর্দিনে তাঁদের কারো গলগ্রহ হওয়ার ইচ্ছে নেই করবীর। শ্বশুরকুলে স্বামীর দূর সম্পর্কের কাকা একজন আছেন। কিন্তু তাঁরও ঠিক একই রকম অবস্থা। তাছাড়া অনেক দিন আগে থেকেই তাঁরা পৃথগন্ন। আজ দুর্দশায় পড়েছে বলেই করবীরা তিন চার জনে সেখানে গিয়ে উঠতে পারে না। ভিতরে ভিতরে শাশুড়ীরও তা ইচ্ছে নয়। তাই করবীকে নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে। নিজের রোজগারেই চালাতে হবে সংসার। শাশুড়ী প্রথম প্রথম আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু এখন চার দিক দেখে শুনে মত দিয়েছেন। ভালো জায়গায় ভদ্র রকমের চাকরি-টাকরি কিছু যদি পায় করবী তা করুক। কিন্তু শাশুড়ীর সম্মতি পেলে কি হবে, চাকরি যে পাওয়া যাচ্ছে না। কালীঘাটে একটি গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে জানাশোনা আছে করবীদের। কলেজে একসঙ্গে পড়ত। সেই রেবা সেনের কাছেই গিয়েছিল করবী। তার স্কুলে একজন টিচারের দরকার হতে পারে বলে রেবা জানিয়েছিল। কিন্তু করবীকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। রেবাদের স্কুলে এখন কোন টিচার নেওয়া হবে না। সেক্রেটারী পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন কম লোক নিয়েই এখনকার মত কাজ চালিয়ে নিতে হবে। পরে নতুন বছরের শুরুতে দেখা যাবে চেষ্টা করে। কিন্তু তার তো আরও তিন চার মাস দেরি। ততদিন চলবে কি করে।

সব শুনে অরুণ বলল, 'আপনি এতদিন বলেন নি কেন।'

করবী একটু হাসল, 'বললেই বা কি করতেন। আপনি নিজেই তো চাকরি খুঁজছেন।'

অরুণ বলল, 'সেই সঙ্গে আপনার চাকরিও খুঁজতুম।'

করবী বলল, 'সে খোঁজার সময় তো এখনও যায় নি।'

অরুণ বলল, 'তা ঠিক, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি। কিছু মনে করবেন না।

কতটা অবধি পড়াশুনা করেছিলেন ?'

করবী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'সে আর জিজ্ঞেস করবেন না। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছিলাম। তার পর এগোয় নি। আমার খুবই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কেবল একজনের ইচ্ছেতেই তো হয় না।'

মৃত স্বামীর বিরুদ্ধে একটু অভিযোগের ইঙ্গিত দিয়ে করবী চুপ করল। অরুণ বিস্মিত হয়ে ভাবল করবীর সাহস তো কম নয়, এই বিদ্যায় আজকালকার দিনে চাকরি যোগাড় করে সে পরিবার প্রতিপালন করতে চায়। স্কুলে যদি চাকরি জোটেই তা হলেই বা কত টাকা মাইনে হবে। বড় জোর চল্লিশ, তাতে কি করে সংসার চালাবে করবী, নিজের ভাবনার চেয়ে মুহূর্তের জন্যে করবীর সমস্যাই যেন বেশি হয়ে উঠল অরুণের কাছে।

একটু কাল চুপ করে থেকে করবী বলল, 'দু-একটা অফিসেও এর মধ্যে ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছি। বলেছিল তো খবর দেবে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন চিঠিপত্র পেলাম না। অন্তত আপনার মত ট্যুউশানি পেলেও হত। তার জন্যেও খোঁজ-খবর করছি, কিন্তু যখন জোটে না তখন কিছুই জুটতে চায় না।'

অরুণ বলল, 'তা ঠিক। আচ্ছা আপনি করবেন ট্যুউশানি ?'

করবী বলল, 'পেলে নিশ্চয়ই করব। আছে নাকি আপনার হাতে ?'

অরুণ বলল, 'হাতে মাত্র একটি ট্যুউশানি আছে। ওইটিই আপনি করুন না। বলুন যদি রাজী থাকেন বলে কয়ে ঠিক করে দেই। বাড়ির কাছে আছে তিরিশ টাকা করে পাবেন।'

করবী বলল, 'তা না হয় পেলাম। কিন্তু ছেলের জন্যে মেয়ে টিউটর ওরা রাখবেই বা কেন ?'

অরুণ বলল, 'এতদিন পুরুষ টিউটরেরা ওকে একেবারে বিদ্যাদিগ্‌গজ করে ছেড়েছে, এবার আপনদের একটা চান্স দেওয়া ভাল।'

করবী একটু হেসে বলল, 'তাই নাকি। কিন্তু খুব যে উদারতা দেখছি, আপনার নিজের ট্যুউশানি আমাকে ছেড়ে দিতে চাইছেন।'

অরুণ বলল, 'আপনার প্রয়োজন আমার চাইতে বেশি সেইজন্যে।'

করবী বলল, 'সত্যি কি তাই। না, তিরিশ টাকার একটি বাজে ট্যুউশানি বলে ছাত্রকে ম্যানেজ করতে পারছেন না বলে ছেড়ে দিয়ে রেহাই পেতে চাইছেন ? এই যদি তিনশ টাকার একটি মোটা চাকরি হত তা হলে প্রাণ ধরে দিতে পারতেন আমাকে ?'

করবীর কথার ভঙ্গিতে পরিহাসের সুর। অনেকদিন পরে, সেই উচ্ছল তারল্য যেন ফিরে এসেছে ওর ভাষার ইঙ্গিতে। অরুণ বলল, 'নিশ্চয়ই পারতাম।'

পরিহাস-প্রিয় সেও বড় কম নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে তার কথার ধরনটা মোটেই ঠাট্টার মত শোনাল না। সে যেন করবীকে সত্যিই নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে তেমন একটা দামী চাকরিও অরুণ করবীর জন্যে ছেড়ে দিতে পারে। করবী অরুণের দিকে একবার চেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। সে যেন এমন নিশ্চিত আশ্বাস আশা করে নি। পরিহাসের জবাবে অরুণের কাছ থেকে পরিহাস চেয়েছিল।

অমনভাবে কথাটা বলে ফেলে অরুণ নিজেও কম অপ্রস্তুত হয় নি। এবার যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলি।'

করবী বলল, সেকি! চা-টা খেয়ে যাবেন না?'

অরুণ বলল, 'না, আজ আর সময় হবে না, আজ যাই।'

করবী আর তেমন অনুরোধ করল না, বলল, 'আচ্ছা।'

দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আসবেন আর একদিন।'

অরুণ সংক্ষেপে বলল, 'আসব।'

সকালবেলা চা খেয়ে অতুল এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়ছিল, বাসন্তী রেশনকার্ড আর রেশনব্যাগগুলি হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি এসে পথ আগলে দাঁড়ালেন, 'কোথায় যাচ্ছিস অতুল?'

অতুল বলল, 'আমার কাজ আছে মা।'

বাসন্তী কঠিন ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমার কাজের মধ্যে তো সারা শহর টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো আর সব বদ জায়গায় আড্ডা দেওয়া। সে কাজ পরে করলেও চলবে। আজ রেশন না নিয়ে এলে এবেলা হাঁড়ি চড়বে না।'

অতুল বলল, 'না চড়ে তো আমি কি করব। আমি তো প্রত্যেক সপ্তাহেই রেশন আনি। আজ আর কাউকে বলো না।'

বাসন্তী বললেন, আর আবার কাকে বলব। মণীন্দ্র বাজার করে দিয়ে ওরই কি একটা দরকারী কাজে বেরিয়েছে। শন্তু-বন্তু পড়ছে, কে আনবে রেশন।'

অতুল বলল, 'কেন বড়বাবু তো তাঁর ঘরে বসে বসে কাগজ পড়ছেন, আর গল্প করছেন। তাঁকে বলো না।'

বাসন্তী বললেন, 'সে কোনদিন এসব এনেছে যে আজ আনবে। আর কথায় কথায় তুই নান্তুর সঙ্গে তুলনা করিসনে অতুল। তোর মুখে তুলনাটা শোভা পায় না।'

মার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটু কাল তাকিয়ে থেকে অতুল বলল, 'শোভা পায় না?'

বাসন্তী কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'পায়ই তো না, হাজারবার পায় না। পায় কি না পায়,

তা তুই বুঝিস নে? বেয়াদপ বাঁদর কোথাকার, আবার আমাকে চোখ রাঙাচ্ছিস, লজ্জা করে না তোর!'

বাড়ির আর সব ছেলেমেয়েরা অনেকেই ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। অতুলের মনে হল সবাই তার অপমানে মজা দেখছে।

রাগে সে-ও চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি অমন যখন তখন সকলের সামনে আমাকে যা তা বলে গালাগালি করো না মা, করলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

বাসন্তী বললেন, 'গালাগাল করব না! একশবার করব। গালাগালের কাজ করলেই গালাগাল খাবি।'

অবনীমোহন নেমে এলেন ওপর থেকে, 'কি ব্যাপার। সকাল থেকেই এমন চেঁচামেচি করছ কেন?'

বাসন্তী বললেন, 'করছি কি আর সাধে? রেশন আনা নিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে আমাকে এই হাঙ্গামা পোয়াতে হয়, চেঁচিয়ে গলা ছিঁড়ে ফেলতে হয়। আমি আর পারব না। যেমন করে পারো রেশন আনাও।'

অবনীমোহন ছেলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন, অতুল, রেশন নিয়ে এসো। এ নিয়ে আর যেন কোনদিন কোন গোলমাল শুনতে না হয়।'

অতুল বলল, 'আমি পারব না, আমার কাজ আছে। দরকারী কাজ আছে।'

অবনীমোহন ছেলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এ কাজ তার চেয়ে অনেক বেশি দরকারী।'

অতুল উদ্ধতভাবে বলল, 'আমার কি দরকার না দরকার, তা আপনি কি করে বুঝবেন?'

এতক্ষণে অবনীমোহনেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বললেন, 'না, তা আমি বুঝি নে, বুঝতে চাইনেও। সংসারের দরকার যে না বুঝবে, এ সংসারে তার জায়গা নেই, এ সংসারে তার খাওয়া-পরা জুটবে না আমি পষ্ট করে বলে দিচ্ছি।'

অবনীমোহন ওপরে চলে গেলেন।

তাঁকে এমন অসহিষ্ণু হতে সহজে দেখা যায় নি। কিন্তু ইদানীং তিনিও বড় বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। আর্থিক কৃচ্ছ্রতা যত বাড়ছে সকলেরই তত বেশি করে মেজাজ বিগড়াচ্ছে, অবনীমোহনও বাদ যাচ্ছেন না।

স্বামী চলে গেলে বাসন্তী ছেলের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'দেখছিস তো উনি পর্যন্ত কি রকম রেগে গেছেন। যা ভালোয় ভালোয় রেশনটা এনে দিয়ে যে কাজ থাকে

তুই করগে।'

কিন্তু অতুল আর কোন কথা না বলে দোরের দিকে এগুতে লাগল। এতখানি অবজ্ঞা বাসন্তীর সহ্য হল না, তিনি সদর পর্যন্ত এগিয়ে এসে বললেন, 'এ কিন্তু ভাল হল না অতুল, মোটেই ভাল না। তোমার বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে। আজ আর খাওয়া জুটবে না এখানে বলে রাখছি।'

যেতে যেতে অতুল ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, 'আচ্ছা আচ্ছা। না জোটে তো নাই জুটবে। না খেয়ে যদি উপোস করেও মরি, তোমাদের বাড়িতে আর পাত পাততে আসব না। তেমন কুকুর আমি নই। অতুল উত্তেজিতভাবে গলির ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেল। পথে নেমে একটা বিড়ি ধরিয়ে মনে মনে বলল, দূর শালার সংসার। মা বল, ভাই বল, বোন বল, কেউ আপন নয় এখানে। সকলের সঙ্গে শুধু টাকার সম্পর্ক। টাকা থাকলে পরও আপন, না থাকলে আপনও পর।

আজ কিন্তু সত্যিই দরকারী কাজ ছিল অতুলের। আর্মেনিয়ান ঘাটে স্টীমার কোম্পানিতে কাজ করেন সুরেন দাস। এক সময় একসঙ্গে পড়ত। কথায় কথায় সেই সেদিন বলেছিল, 'ভোরে উঠে আসিস আমার শোভাবাজারের বাসায়। সঙ্গে করে মেসোমশায়ের ওখানে নিয়ে যাব।'

সুরেনের মেসোমশাই অফিসের হেড ক্লার্ক।

এর আগেও চাকরি দু-একবার যে অতুল না করেছে তা নয়, অফিসে কেরানীর কাজ জোটে নি। কারখানা ফ্যাক্টরীতে কাজ জুটেছিল। কিন্তু জুটলে কি হবে, বেশি দিন কোন জায়গায় মন লাগিয়ে কাজ করতে পারে নি। ওপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে কোনবার চাকরি ছেড়েছে, কোনবার চাকরি গেছে। এক একবারে যে ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ফের আর কোন কাজে যাওয়ার ওর ইচ্ছে হয় নি। বীতস্পৃহাটা কাটলে যখন ফের চেষ্টা শুরু করেছে, তখন আর শিগ্‌গির কিছু জোটে নি। বাড়িতে ইচ্ছে করেই এবারকার চেষ্টা-চরিত্রের কথাটা কাউকে জানায় নি অতুল। তার ধারণা জানালে কেউ বিশ্বাস করবে না। সে কোন কিছু করবে কিংবা করতে পারবে এ বিশ্বাস বাড়ির ছেলে বুড়ো কারোরই আর নেই তার ওপর। তাই আগে থেকেই কথাটা ফাঁস করবার ইচ্ছে হয় নি অতুলের। ভেবেছে কোন একটা কাজকর্মে ঢুকে মাইনের টাকাটা মার হাতে তুলে দিয়ে কথাটা বলবে। তার আগে কাউকে কিছু জানতে দেবে না। কিন্তু তার মন্ত্রগুপ্তির ফল একেবারে উল্টো হয়ে গেল। মা বকলেন, বাবা বকলেন, দুজনেই খাওয়ার খোঁটা দিলেন। না, মাসে মাসে রোজগার করে টাকা না দেওয়া পর্যন্ত বাড়িতে আর থাবে না অতুল। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক এই শেষ। ঘুরে ঘুরে শোভাবাজারে আনন্দ খাঁ লেনে

সুরেনের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল অতুল। সুরেন তখন সবে কাজে বেরোচ্ছে। খেয়ে-দেয়ে পান মুখে দিয়েছে একটা। সিগারেটও ধরিয়েছে।

অতুলকে দেখে বলল, 'কি রে, কি খবর ?'

অতুল বলল, 'খবর তো তোরই কাছে।'

সুরেন বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু বড দেরী করে ফেললি। মেসোমশাইর সঙ্গে এখন আর দেখা হবে না। তা ছাড়া আমাকেও আজ একটু সকাল সকাল বেরুতে হচ্ছে। তুই বেশ আছিস ভাই। চাকরির যা মজা। ঢুকে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।'

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে ট্রাম লাইন পর্যন্ত এল।

অতুল বলল, 'তোর মেশোমশাইর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি বলেছিলি, চল না তোদের অফিসে। সেইখানেই দেখাসাক্ষাৎ করব।'

সুরেন একটু এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'না না, অফিসে এখন গিয়ে লাভ নেই। মেসোমশাইর সঙ্গে আমি তোর সম্বন্ধে আলাপ একটু করেও রেখেছি। কিন্তু এখন তো কিছু খালি নেই। খালি হলে তোকে খবর দেব।'

অতুল অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'তাহলে খেলার মাঠে তুই সেদিন নেহাৎই একটা বাজে কথা বলেছিলি। চাল মেরেছিলি বল।'

সুরেন মুহূর্তকাল বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুই বড় অভদ্র হয়েছিস অতুল। তোর সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল। আচ্ছা, আসিস আর একদিন।' বলতে বলতে একটা চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠল সুরেন, তার আর দাঁড়াবার সময় নেই।

বেলা বারটা পর্যন্ত এখানে ওখানে টো টো করে ঘুরে বেড়াল অতুল। ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। পকেটে মাত্র আনা দুই পয়সা ছিল সম্বল। চা আর বিড়ি খেতে তা শেষ করেছে। বার বার অতুলের ইচ্ছে করতে লাগল বাড়িতে ফিরে যায়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয় নি। মা নিশ্চয়ই তার জন্য ভাত বেড়ে রেখেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, না, যে প্রতিজ্ঞা সে করে এসেছে তা আর সে ভাঙতে পারে না। বিশেষ করে বাবা ও কথা বলবার পর আজই এ বেলা গিয়ে আর খেতে বসা যায় না রান্নাঘরে। তাহলে কারো কাছেই আর তার মুখ থাকবে না। তার চেয়ে উপোস করা অনেক ভাল।

কিন্তু পেটটা বড বেয়াড়া। মনের এত কঠোর সঙ্কল্পকে কিছুতেই যেন সে আর রাখতে দেবে না। পা জোড়া নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ির দিকে এগুতে লাগল অতুলের। আরপুলি লেন দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে মোড় ফিরতে গিয়ে সে ফের থমকে দাঁড়াল। আর একবার মনে পড়ল সকালের অপমানের কথা। ঘুরে দাঁড়াল অতুল। না, যাওয়া যায় না,

কিছুতেই যায় না।

কাছেই মধু গুপ্ত লেনে গোবিন্দদের বাড়ি। অতুল ঠিক করল তাদের বাইরের ঘরে দুপুরবেলা কোন রকমে শুয়ে কাটিয়ে দেবে। রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে খিদেটা আরও বাড়ে। তার চেয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকলে খানিকক্ষণ বোধ হয় স্থির থাকা যাবে। তারপর বিকেলে যা হয় একটা ব্যবস্থা করে নেবে।

খানিকটা এগিয়ে পাটকিলে রং-এর ছোটমত দোতলা একটা পুরনো বাড়ির সামনে এসে কড়া নাড়ল অতুল, সঙ্গে সঙ্গে ডাকল, 'গোবিন্দ, ও গোবিন্দ', কিছুক্ষণ কোন সাড়াশব্দ মিলল না। তারপর একটু বাদে দরজার হুড়কো খোলার শব্দ হল। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের শ্যামবর্ণা স্বাস্থ্যবতী তরুণী এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। পরনে খয়েরী রঙের শাড়ি, সদ্য স্নান সেরে এসেছে। একরাশ ভিজে চুল পিঠময় ছড়ানো। সিঁথির ফাঁকে সিঁদুরের দাগ। গোবিন্দের বড়দি রমা।

অতুলকে দেখে একটু হেসে বলল, 'ও তুমি। তা এই দুপুরের সময় কি মনে করে অতুল। একি চেহারা হয়েছে। এখনো বুঝি নাওয়া খাওয়া কিছু হয় নি?'

অতুল এত সব কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'গোবিন্দ অফিস বেরিয়ে গেছে নাকি রমাদি?'

রমা বলল, 'হ্যাঁ, সে তো সেই সকাল সাড়ে ন'টায় বেরিয়েছে। ভিতরে আসবে?'

অতুল একটু ইতস্তত করে বলল, 'অনেক ঘোরাঘুরি হল। শরীরটা ভাল লাগছিল না, ভাবলাম একটু জিরিয়ে যাই।'

রমা একটু কাল তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা, ভিতরে এস।' বাইরের ঘরে অতুলদের বাড়ির মতই একখানা তক্তপোশ পাতা। একধারে গোবিন্দের বিছানাটা গুটানো রয়েছে। খুব বেশি রাত হয়ে গেলে বন্ধুর সঙ্গে অনেক দিন এই বাড়িতেই চলে আসে অতুল। গোবিন্দের বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দেয়। আজও কোন কথা না বলে বন্ধুর বিছানাটা পেতে নিতে যাচ্ছে অতুল, রমা বাধা দিয়ে বলল, 'ও কি হচ্ছে।'

অতুল বলল, 'শুয়ে একটু বিশ্রাম করে নিই রমাদি। তুমি তোমার কাজে যাও।'

গোবিন্দর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই এ বাসায় অতুলের যাতায়াত আছে। শুধু যাতায়াত নয়, বাসার প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গেই বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে অতুলের। এ প্রায় নিজের বাসার মতই। গোবিন্দের মাকে সে মাসিমা বলে ডাকে, বাবাকে মেসোমশাই। অতুলের কথার জবাবে রমা বলল, 'আমার কাজের কথা তোমাকে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না অতুল। শুয়ে পড়লে চলবে না। ওঠো যা বলছি শোন।'

রমার গলায় আদেশের সুর।

অতুল রমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি বলছ?'

রমা বলল, 'এসো, চান করে খেয়ে নেবে।'

অতুল বলল, 'বা রে, আমার তো কখন খাওয়া হয়ে গেছে।'

রমা বলল, 'হু, খাওয়া যা হয়েছে তা মুখ দেখেই টের পাচ্ছি। আর দেরি না করে চলে এসো। যদি ভালোয় ভালোয় না আস, হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাব বলে দিলুম।'

অতুল কৌতুক বোধ করে বলল, 'ঈস, খুব দেখি শক্তির বড়াই করছ। নাও তো হিড় হিড় করে টেনে, কেমন গায়ের জোর দেখি তোমার।'

রমা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হল না, গম্ভীরভাবে বলল, 'হয়েছে। এসো এবার।'

রমার বলার ভঙ্গিতে ফের আদেশের সুর ফুটে উঠল। অতুল একটু কাল তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল। সদর বন্ধ করে ভিতরের দিকে চলে গেল রমা। অতুল গেল পিছনে পিছনে।

তেলের বাটি আর গামছা অতুলকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও। চৌবাচ্চায় জল রয়েছে। তাড়াতাড়ি দু-ঘটি ঢেলে নিয়ে চলে এসো। বাড়া ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।' অতুল আর বেশি ভদ্রতা করল না। স্নান সেরে শুকিয়ে যাওয়া গোবিন্দের লুঙ্গিটা পরে পিঁড়ি পেতে বসল। ভাত তরকারীর থালাটা ওর সামনে এগিয়ে দিল রমা।

অতুল খেতে খেতে বলল, 'আর সবাইর হয়ে গেছে? তুমি খেয়েছ? মাসিমা খেয়ে নিয়েছেন?'

রমা বলল, 'মার আজ বারের উপোস। সন্ধ্যা-টন্ধ্যা করে ওপরে ঘুমুচ্ছেন।

অতুল বলল, 'আর তুমি?'

রমা বলল, 'আমার খবরে তোমার কি দরকার।'

অতুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'ঈস বড্ড ভুল হয়ে গেল রমাদি। তোমার নিজের ভাতই বোধ হয় আমাকে দিয়ে দিয়েছ। নিশ্চয়ই তাই।'

রমা কোন জবাব দিল না।

অতুল বলল, 'ইয়ে, এক কাজ কর। তুমি এই থালা থেকে আলাদা করে তোমার জন্যে কিছু ভাত তুলে নাও। আমার সব লাগবে না। নাও আর একটা থালা নিয়ে এসো তাড়তাড়ি।'

ভারি একটা আন্তরিক ব্যগ্রতা ফুটে উঠল অতুলের গলায়।

তার দিকে তাকিয়ে রমা বলল, 'তোমার স্পর্ধা তো কম নয় অতুল। আমি জাতে

বামুন, বয়সে বড়। তুমি আমাকে পাতের প্রসাদ দিতে চাইছ? আমি কি গোবিন্দ নাকি যে তোমার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খাব?'

বেশ একটু তিরস্কারের সুর রমার গলায়।

অতুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'বড় ভুল হয়ে গেছে রমাদি।'

অতুলের অনুশোচনায় এবার একটু হাসল রমা, 'কোন্‌টা ভুল হয়েছে অতুল? আমার ভাগের ভাত খাওয়াটা না আমাকে সঙ্গে খেতে ডাকাটা?'

অতুল বলল, 'সঙ্গে খেতে তো আমি ডাকি নি।'

রমা বলল, 'প্রসাদ খেতে ডেকেছ। ঈস্ কি সম্মান!'

রমা হেঁসেলের কাজ সারতে লাগল।

অতুলের খেতে বেশি সময় লাগে না। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে উঠে মুখ ধুতে গেল। ফিরে এসে বলল, 'আমি চললুম। তুমি এবার মন দিয়ে রান্নাঘর গুছাও।'

রমা বলল, 'এখনি যাবে?'

অতুল বলল, 'আবার কি, খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক, খাওয়া তো হয়েই গেল।' বলে অতুল আর দেরি করল না।

মিনিট দশেক বাদে রান্নঘরের শিকল টেনে রমা বেরিয়ে আসছে, অতুল এসে সামনে দাঁড়াল। ওর এক হাতে দইয়ের ভাঁড়। আর এক হাতে মুড়কি আর মিষ্টির ঠোঙ্গা।

রমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও আবার কি, পয়সা পেলে কোথায়?'

অতুল বলল, 'পয়সা আর কোথায় পাব। পরাণের কাছ থেকে বাকিতে নিয়ে এলুম। বললুম চাকরি-বাকরি পেলে শোধ দেব। সে কটা দিন একটু সবুর করে থেক।'

রমা বলল, 'কিন্তু এই দুপুর বেলায় ওসব কে খাবে?'

অতুল বলল, 'কেন, তোমারও কি বারের উপোস নাকি? খেয়ে দেখ ফলারটা, ভাতের চেয়ে নেহাৎ মন্দ হবে না।'

রমা বলল, 'কিন্তু বাকিতে কেন আনতে গেলে। আমার কাছেই তো পয়সা ছিল।'

অতুল এবার কোন জবাব না দিয়ে বাইরের ঘরে চলে এল।

খানিক বাদে রমা এসে ঘরে ঢুকে বলল, 'ও কি, এরই মধ্যে বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

অতুল জবাব দিল, 'না, ঘুমোব কেন, ভাবছি।'

রমা বলল, 'তোমার আবার ভাবনা চিন্তাও আছে নাকি? কি ভাবছ শুনি?'

অতুল বলল, 'ভাবছি হীরেন জামাইবাবুটা সত্যিই কি আহাম্মক, তোমার মত

লক্ষ্মীমেয়ের মর্ম বুঝল না। ভাল প্লে করতে পারলে কি হবে, ভাল মেয়ে চিনবার তার ক্ষমতা নেই।'

রমা অতুলের দিকে একটু কাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'থাক ওসব পুরনো ভাবনা তোমার আর না ভাবলেও চলবে। পার তো নিজের ভাবনাই শুয়ে শুয়ে ভাব আর ভাবতে ভাবতে ঘুমোও। এই রইল তোমার সুপুরি। আমি চললুম।'

অতুল বলল, 'একটু বসবে না?'

রমা যেতে যেতে জবাব দিল, 'না, অনেক কাজ আছে।'

দোতলার সিঁড়িতে আস্তে আস্তে রমার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে রমা দেখল মা মেঝেয় বসে বালিশের ওয়াড় সেলাই করছেন।

রমা একটু কাল মা'র ক্ষয়ে যাওয়া নখগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা মা উপোস-টুপোসের দিন একটু বিশ্রাম করলেও তো পার, আমাকে বললে ওয়াড়টা কি আমি সেলাই করতাম না? না করি নে কোন দিন?'

কল্যাণী মেয়ের দিকে তাকালেন, 'আমি কি বলি যে তুই করিস নে? তুই তো সবই করিস। নীচে কে এসেছে রে, অতুল বুঝি? তার গলা শুনলাম যেন।' রমা একটু হাসল, 'হ্যাঁ অতুলই। বাড়ি থেকে আজ বুঝি রাগারাগি করে এসেছে। এখানে খেল।'

এমন আরও দু-একদিন হয়েছে। বাড়িতে ঝগড়া করে এ বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে অতুল। ছেলের এই বন্ধুটির আবদার উৎপাত কল্যাণীকে প্রায় সহ্য করতে হয়। মেয়ের দিকে চেয়ে কল্যাণী বললেন, 'নিজের ভাত বুঝি ধরে দিলি তাকে। আর নিজে রইলি উপোস করে? দেখ কেমন লাগে। ব্রত-পার্বণের উপোস তো কোন দিন করিস নে—'

রমা বলল, 'ওসব ধর্ম-কর্ম আমার সহ্য হয় না মা, তোমার সয় তুমিই কর।'

কল্যাণী চটে উঠলেন, 'দেখ কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল না। ধর্ম-কর্ম বাদ দিয়ে ম্লেচ্ছপনার ফল তো এই হল। সব থাকতেও কিছু ভোগে এল না। সব দেখে-শুনেই তো দিয়েছিলাম। বি. এ. পাশ, দেখতে রাজপুত্রের মত চেহারা। ভাল চাকরি-বাকরি করত। কিন্তু সে যে এমন হবে তা কে জানত। সব আমার কপাল। নইলে এই বয়সে স্বামী-পুত্র নিয়ে নিজের ঘর-সংসার করবি, তা নয় এখানে পড়ে আছিস। দু-বেলা হাঁড়ি ঠেলছিস। হ্যাঁরে, চিঠিপত্র লিখে দেখবি নাকি আর একবার।'

রমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'না, না। লেখালেখির আর কিছু নেই। তুমি চুপ কর। যা করছিলে তাই কর বসে বসে।' বলে নিজের ঘরে চলে এল রমা। ছোট একটু ঘর। দেয়াল ঘেঁষে একখানা তক্তপোশ। তার উপর বিছানাটা গুটানো। মাথার কাছে একটি তাক।

তার ওপর মোটা মোটা কয়েকখানা বই। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ, চৈতন্য চরিতামৃত। আর একখানা পকেট সংস্করণ গীতা। রমার বাবা কেশব মুখুজ্যেই বেছে বেছে এসব বই কিনে দিয়েছেন। বলেছেন, 'অবসর পেলেই এগুলি পড়বি। মন ভাল থাকবে, সব দুঃখের সান্ত্বনা পাবি।'

রমা বার দুই করে সব বই-ই শেষ করেছে। কিন্তু সান্ত্বনা কই। এখন আর পড়তে তার ইচ্ছা করে না। তার চেয়ে ঘরের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই তার ভাল লাগে। সংসারের প্রায় সমস্ত ভার তার হাতে ক্রমে ক্রমে ছেড়ে দিয়েছেন বাবা-মা। সংসারে কখন কি লাগবে, কোন্ জিনিস কখন আনতে হবে সব রমার কাছ থেকে শোনেন কেশববাবু। মাইনের টাকা এনে মেয়ের হাতেই তুলে দেন তিনি। স্ত্রীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, 'তোমার চেয়ে হিসেব নিকেশ রমা অনেক ভাল বোঝে। ও সংসারের ভার নেওয়ার পর থেকে আমি নিশ্চিন্ত আছি।'

কেবল বাবাই নয়, এমন যে উড়নচণ্ডী গোবিন্দ সেও হাত খরচ বাদ দিয়ে মাইনের বেশির ভাগ টাকা তার কাছে জমা রাখে। এতদিন বেকার ছিল গোবিন্দ। মাসকয়েক হোল পোর্টকমিশনারে চাকরি পেয়েছে। সংসারের অবস্থাটা স্বচ্ছল না হোক, আগের চেয়ে বেশ একটু ভাল হয়েছে। খরচের টাকা সব রমার হাতে। বাপ-ভাইয়ের সংসারের সেই এখন সর্বময়ী কর্ত্রী। তবু কেমন যেন এক এক সময় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বিশেষ করে, অসহ্য লাগে বাবা-মার দীর্ঘশ্বাস আর মাঝে মাঝে সেই পুরনো ঘটনার উল্লেখ। সেসব কথা কেন ওঁরা তোলেন। তুলে আর লাভ কি।

দু-একদিনের কথা নয় আট বছর আগে শ্যামবাজারের চাটুজ্যে বাড়িতে রমার বিয়ে হয়েছিল। হীরেন সবে বি. এ. পাশ করে এম. এ.-তে ভর্তি হয়েছে, তার ঠাকুরমা জোর করে বিয়ে দিলেন। বললেন, 'কবে আছি, কবে নেই। তোর বউয়ের মুখ আমি দেখে যাব।'

দেখে শুনে রমাকেই পছন্দ হল হীরেনের কাকার। তেমন সুন্দরী নয়, কিন্তু লক্ষ্মীশ্রী আছে চেহারায়। তেমন লেখাপড়া জানা পাসটাশ করা নয়, স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাস অবধি পড়েছে, কিন্তু কথায়-বার্তায় বেশ বুদ্ধিমতী বলে মনে হয়। ঘর-সংসারের সব কাজকর্ম জানে। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের পক্ষে এই রকম মেয়েই ভাল। দেখে হীরেনেরও তখন অপছন্দ হয় নি। বিয়ের পর বছর দুই দাম্পত্যজীবন বেশ ভালই কেটেছিল রমার। তার পরেই কপাল পুড়ল। তখন হীরেন সবে পাশ করে বেরিয়ে একটি মার্চেন্ট অফিসে চাকরি-নিয়েছে। মাইনেটা মনের মত নয়, তাই নিয়ে খুঁতখুঁতি আছে। রমা তাকে আশা ভরসা দেওয়ার ত্রুটি করছে না।

এই সময় একটা কাণ্ড ঘটল। নতুন জায়গা থেকে আশ্বাস পেল হীরেন। পাড়ার ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে থিয়েটারের আয়োজন চলছে। ছেলেরা ধরে পড়ল, 'হীরুদা, আপনাকে হিরোর পার্ট নিতে হবে।' চেহারায় চলনে-বলনে হীরেনকে নায়কের ভূমিকায় সবচেয়ে বেশি মানায়। কলেজের সোস্যালে অভিনয় করার অভ্যাসও যে একটু-আধটুকু না ছিল তা নয়। কিন্তু হীরেন ইতস্তত করতে লাগল, 'দূর, এই বয়সে কি রঙ কালি মেখে থিয়েটার করা সাজে।' রমা বলল, 'একেবারে ঠাকুরদার বয়সী হয়ে গেছ না? ওরা যখন এত করে বলছে প্লেতে তোমাকে নামতেই হবে। তোমার অভিনয় তো কোন-দিন দেখি নি। এবার একটু দেখাও।'

দু-একটা মহড়া হীরেনদের বাড়িই হল। রমার উৎসাহের অন্ত নেই। অন্দর থেকে চা পান যোগায়। কথা হল রমার দু-একখানা ভাল শাড়িও দিতে হবে শম্ভুকে। শম্ভু নাটকের নায়িকা। রমা তাতেও রাজী। হীরেন বলল, 'হ্যাঁ, তাই দাও, তবু যদি ওকে দেখে খানিকটা তোমার আদল মনে মনে আনতে পারি। ওই দাড়ি গোঁফ চাঁছা মুখের দিকে তাকিয়ে কি গলা দিয়ে প্রেমালাপ বেরোয়?'

রমা বলল, 'কি সর্বনাশ। প্রেমালাপ করবার জন্যে তুমি কি সত্যি একজন মেয়ে চাও নাকি?'

প্রথমে অবশ্য সত্যিকারের মেয়ের দরকার হল না। মেয়ে-বেশী শম্ভুর দিকে চেয়েই হীরেন দৃশ্যে এমন চমৎকার প্রণয় নিবেদন করল যে, রমার মনে হল তেমন ভালোবাসার আকুলতা হীরেন তার কাছেও কোনদিন দেখায় নি। শ্রোতারা বহুবার হাততালি দিল। প্রবীণ সিনেমা ডিরেক্টার শচীরঞ্জন চক্রবর্তীও তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। হীরেনের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে একটি সোনার মেডেল ঘোষণা করলেন আর হীরেনকে বললেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

দেখা করে এসে সুখবরটা স্ত্রীর কাছেই সবচেয়ে আগে বলল হীরেন। তার অভিনয় শচীরঞ্জনের খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি তাকে তাঁর নতুন ছবিতে উপনায়কের ভূমিকায় মনোনীত করেছেন।

রমা খুশী হয়ে বলল, 'সত্যি!'

মাস কয়েকের মধ্যে ছবি রিলিজও হল।

বক্সে স্বামীর পাশে বসে তার অভিনয়ের চিত্ররূপ উপভোগ করল রমা। এবার আর শম্ভু-বেশী হিরোইন নয়, সত্যিকারের সুন্দরী তরুণী নায়িকা পেয়েছে হীরেন। হয়তো সেইজন্যেই তার অভিনয়দক্ষতা আরও বেশি দেখাতে পেরেছে। সে ছবিতে নায়কের চেয়েও উপনায়কের নাম হল বেশি বেশি। আর পরের ছবিতে নায়কের ভূমিকায় উত্তীর্ণ

হল হীরেন। শমিতাই রয়ে গেল নায়িকা। শুধু পর্দায় নয় জীবনেও। স্টুডিওর কাজ ছাড়া অন্য সময়েও হীরেন তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে লাগল, তার বাড়িতে যাতায়াত চলল ঘন ঘন। কোন কোন রাত্রে এমনও হল যে হীরেন আর বাড়ি ফিরল না। রমা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কাল কোথায় ছিলে ?' হীরেন বলল, স্টুডিওতে শুটিং ছিল।'

রমা প্রতিবাদ করে বলল, 'মিথ্যে কথা। কাল কোন শুটিং ছিল না তোমার। আমি খবর নিয়েছি।'

হীরেন অম্লান মুখে বলল, 'তাহলে আর মিছামিছি জিজ্ঞেস করছ কেন।'

রমা বলল, 'আমার কপাল যে এমনভাবে পুড়বে তা কোনদিন ভাবি নি। তুমি সিনেমা ছেড়ে দাও।'

হীরেন বলল, 'অসম্ভব। একমাত্র অভিনয়ের মধ্যে যা কিছু দেওয়ার আমি দিতে পারব। এতদিনে নিজের পথ আমি খুঁজে পেয়েছি।'

কিন্তু সে পথের সঙ্গী রমা নয়, শমিতা। হীরেন অফিসের চাকরি আগেই ছেড়ে দিয়েছিল ; এবার বাড়ি আসাও প্রায় ছাড়লো। মাসে দু-একদিন যখন তার দেখা পাওয়া যায় রমা বলে, 'তুমি মদও ধরেছ ?'

হীরেন বলল, 'একে ঠিক ধরা বলে না, বলে ছোঁয়া। স্টুডিওতে কাজ করতে হলে এসব একটু আধটু ছুঁয়ে দেখতে হয়।'

দিদিশাশুড়ী এসব দেখবার জন্যে বেঁচে ছিলেন না। শাশুড়ী, খুড়শ্বশুর রমাকেই গঞ্জনা দিতে লাগলেন। পুরুষের মন তেমন করে বেঁধে রাখবার ক্ষমতা নেই বলেই হীরেনের মন অন্যদিকে গেছে। নইলে সে তো এর আগে এমন ছিল না। রমা চুপ করে এই খোঁটা সহ্য করল। তারপর হীরেন যখন বাড়ি আসা একেবারে ছেড়েই দিল, খবর পাওয়া গেল শমিতাকে নিয়ে সে ভিন্ন সংসার পেতেছে, তখন আর সহ্য হল না, বাবাকে খবর দিয়ে আনিয়ে বলল,'আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও বাবা। আমি আর টিকতে পারছি নে।'

কেশববাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'চল, তুই আমার কাছেই থাকবি।' রমার শাশুড়ী বাধা দিয়েছিলেন, 'এটা কি ভাল হল বেয়াই। তবু এখানে থাকলে আমরা চেষ্টা-চরিত্র করে দেখতে পারতাম।'

কেশববাবু বললেন, 'চেষ্টা আপনারা তো যথেষ্টই করেছেন। আর কিছু করবার নেই।'

রমাও বলল, 'তুমি আমাকে নিয়ে যাও বাবা। নামমাত্র শ্বশুরবাড়িতে আমি আর থাকতে চাইনে।'

কেশববাবু বললেন, 'তাই চল। আমার যদি দু-মুঠো জোটে, তোরও জুটবে।'

বাড়িতে এনে সংসারের ভার কেশববাবু বড় মেয়ের ওপর ছেড়ে দিলেন। বললেন,

'আজ থেকে মনে করব আমি তোর বিয়ে দিই নি। মনে করব, আমার জামাই মরে গেছে। ওই দুশ্চরিত্র লোকটার হাতে আমি আর তোকে ছেড়ে দেব না। সে যদি পায়ে ধরে এসে সাধে তবুও না।' কিন্তু সাধাসাধির লক্ষণ হীরেনদের পক্ষ থেকে দেখা গেল না। কুশলী অভিনেতা হিসাবে তার খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়তে লাগল। রমার মা কল্যাণী আক্ষেপ করে বললেন, 'সংসারে ধর্মাধর্ম কিছু নেই, নাহলে এমন পাপীর নামও লোকের মুখে ঘোরে। তারও এত শ্রীবৃদ্ধি হয়।'

রমা একটু হাসল, 'অনর্থক পরকে হিংসে করে লাভ কি মা। শুধু কি শাপ দিয়ে তুমি কারো উন্নতি আটকাতে পারবে!'

শাশুড়ীর অসুখের সময় আরও একবার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিল রমা। কল্যাণীই জোর করে তাকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রমা বেশিদিন সেখানে থাকে নি। যেখানে আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই, সেখানে কে ক'দিন টিকতে পারে। ফিরে এসে বাপের সংসারের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে রমা। ছোট বোন ইলার বিয়ে দিয়েছে। আরও যারা ছোট বেণু, মনু, রুচি, রীতি তাদের সেবা-যত্ন পড়া শুনার ভার নিয়েছে। বাকি জীবন এইভাবে এদের নিয়েই কাটিয়ে দেবে রমা। আগে অসহ্য লাগত। এখন ক্রমে ক্রমে সবই সয়ে যাচ্ছে। বিবাহিত জীবনের কথা, স্বামী-সংসারের কথা এখন আর রমার মনেও পড়ে না। মনে করতেও সে চায় না। কিন্তু মনে করিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব নেই। নিজের মা-বাবা আছেন, পাড়া-পড়শীরা আছে। তারা মাঝে মাঝে আফসোস করে, 'আহা এমন মেয়ের এমন পোড়া ভাগ্য।'

সামনে থাকলে রমা প্রতিবাদ করে, 'ভাগ্য আমার খারাপ দেখলেন কোথায় মাসিমা। আমি তো বেশ আছি।' প্রতিবেশিনী মাসীমা আর কোন জবাব দেন না।

আশ্চর্য, এটা শুধু মুখের কথা নয় রমার। তার চালচলন আচার আচরণেও কোন রকম দুঃখ ক্ষোভ নৈরাশ্যের অভিব্যক্তি চোখে পড়ে না। সে সংসারের কাজকর্ম করে, পাড়াপড়শীর আনন্দে, আহ্লাদে বিয়ে চুড়োয় যোগ দেয়, অসুখ-বিসুখের সময় পেলে সেবা-শুশ্রূষা করে।

পড়শীরা বলে, 'ধন্যি মেয়ে বাবা। আর কেউ হলে দুঃখে মরে যেত, ঘর থেকে বেরুত না।'

এসব মন্তব্য কানে গেলে রমা স্পষ্ট জবাব দেয়, 'কেন, না বেরোবার কি হয়েছে। আমার লজ্জা কিসের যে আমি ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে থাকব। স্বামী তো আমাকে ত্যাগ করে নি, আমিই দুশ্চরিত্র স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছি। আমি কেন লজ্জা করতে যাব।'

কথাটা ঠিক। তবুও এত তেজ, এত স্পর্ধা সকলের কানে ভাল শোনায় না। এমন কি

কল্যাণীর কানেও মাঝে মাঝে বড় খারাপ লাগে। নিজের দুর্ভাগ্যে মেয়েটা যদি মুখ বুজে মৃতপ্রায় হয়ে থাকত, দিনের মধ্যে কয়েকবার সান্ত্বনা দিয়ে ওকে সবল করে তুলতে হত, এ অবস্থায় তাই যেন স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রমা একেবারে উল্টো। বড় শক্ত ওর দেহের গড়ন, নিষ্ঠুর ওর প্রাণ। মেয়ে হয়েও যেন মেয়ে নয়, কিংবা আজকালকার মেয়েরা এই রকমই হয়। কল্যাণী মাঝে মাঝে ভাবেন ওর এই অতিরিক্ত তেজ আর সাহস; চড়া মেজাজ আর কড়া কথাই কি হীরেনকে বিমুখ করেছে। কিন্তু তাই বা বলেন কি করে। গোড়ায় এমন রুক্ষ, রুঠা প্রকৃতির মেয়ে তো ছিল না রমা। না কি ঘা খেয়েই ও এমন পাষাণ শক্ত হয়ে গেছে।

বিচিত্র নয়। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে মোটামুটি একটা রফা করতে গিয়ে রমার মধ্যে এতটা কাঠিন্য এসেছে। কিংবা যতখানি কঠিন সে নয়, তার চেয়ে বেশি কাঠিন্যের ভাব দেখাতে তার ভাল লাগে। ছোট ভাইবোনগুলিকে সে স্নেহ যেমন করে, দুষ্টামি করলে শাসনও কম করে না। শুধু মুখে নয়, মাঝে মাঝে কড়া রকমের চড়-চাপড় দেয়। তবু ভাই-বোনগুলি ওর কাছ থেকে নড়তে চায় না। গোবিন্দ পর্যন্ত ওকে ভয় করে। আড়ালে-আবডালে যাই করুক সামনে একেবারে পোষা বিড়ালের মত থাকে। গোবিন্দর অন্যান্য বন্ধুরাও তাই। কেবল অতুলের ধরন-ধারণ একটু আলাদা। গোবিন্দের এই গোঁয়ার বন্ধুটিকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারে নি রমা। ওর ভয় ডর নেই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহস আর দুষ্টামি বুদ্ধি বেড়েছে। এক আধটু ঠাট্টা তামাসা রমার সঙ্গেও করতে চায়। যখন তখন এসে খাওয়ার আবদার করে, মাঝে মাঝে দু-এক টাকা ধারও নিয়ে যায়। ওর ওপর আর এক ধরনের সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভাব আছে রমার।

'তোমার ভাগের ভাত কেড়ে খেলাম বলে রাগ করে নিচেই গেলে না বুঝি। কি করছ বসে রমাদি। পান খাচ্ছ নাকি? আমাকে দাও একটা।' মেজেয় বসে সত্যিই পান সাজছিল রমা, অতুলের গলার শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'ঘুম হয়ে গেল?'

অতুল বলল, 'দূর, দিনে আমার কোনদিন ঘুম হয় না। চুপচাপ কতক্ষণ আর পড়ে থাকা যায়।'

রমা বলল, 'তাই বুঝি জ্বালাতে এলে?'

অতুল বলল, 'উঁহু, জ্বালাবার মত সময় নেই আমার। পানটা পেলেই চলে যাব।'

রমা বলল, 'পুরুষ ছেলের পান খেতে নেই। আচ্ছা অতুল, তুমি কি এমনি করেই বখাটে ছেলের মত বেড়াবে? চাকরি-বাকরি করবে না?'

অতুল বলল, 'চাকরি আমাকে কে দেবে যে করব। তুমি কিছু টাকা আমাকে ধার দাও না, ব্যবসা করি।'

রমা একটু হাসল, 'হুঁ, টাকার গাছ গজিয়েছে কিনা আমার কাছে। তা ছাড়া ধার দেওয়ার আর লোক পেলাম না।'

অতুল বলল, 'দাও না। আমি কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেব। ফাঁকি দেব না।'

রমা বলল, 'আচ্ছা দেখি, বিবেচনা করে। কিন্তু তার আগে তুমি আমার একটা কাজ কর তো।'

অতুল বলল, 'কি কাজ ?'

রমা বলল, 'রেশনটা এনে দাও। গোবিন্দ কখন ফেরে তার ঠিক নেই। অফিস থেকে বাবার ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে। তাছাড়া তাঁকে দিয়ে তো এসব কাজ হয় না। স্কুল থেকে মন্টু বেণু অবশ্য আসবে। কিন্তু ওদের খেলার সময়টা কাজ দিয়ে আটকে রাখতে ইচ্ছে করে না। তুমি যদি এনে দিতে—'

রমার গলায় একটু অনুনয়ের স্বর ফুটে উঠল।

অতুল বলল, 'আমি আনব ?'

'কেন, তাতে তোমার মান যাবে নাকি ?'

'না মান যাওয়া-টাওয়া কিছু নয়, কিন্তু জানো আজ সকালে রেশন আনা নিয়েই বাড়ির সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়েছি।'

রমা বলল, 'ওমা, তাই নাকি। ব্যাপারটা কি বল তো।'

অতুল সবিস্তারে সকালের ঘটনাটা বলতে লাগল। রমা সব শুনে বলল, 'তাহলে তো তোমাকে দিয়েই রেশনটা আনাতে হবে আমার। যেমন বেয়াদব অবাধ্য ছেলে, তেমনি তার শাস্তি হবে।'

অতুল বলল, 'আমাকে শাস্তি দিতে তোমার বুঝি খুব ভাল লাগে ?'

'লাগেই তো।'

বলে উঠে গিয়ে রমা সত্যিই পাশের ঘর থেকে কার্ড আর ব্যাগগুলি নিয়ে এসে অতুলের সামনে ধরল।

অতুল রমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু কি দেখল, তারপর বাধ্য ছেলের মত তার হাত থেকে ব্যাগ আর কার্ডগুলি গুছিয়ে নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে গেল।

রমা মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি এসো না কিন্তু অতুল। পারো তো কোন আড্ডায়-টাড্ডায় ভিড়ে যেয়ো।'

অতুল হাসিমুখে জবাব দিল, 'তা তো ভিড়বোই, সে কথা কি তোমাকে বলে দিতে হবে।'

পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে নিল অতুল, তারপর চলল রেশনের

দোকানে। কাজ করতে তার কোন আলস্য নেই, অনিচ্ছা নেই, একটু মুখের মিষ্টি পেলে সে সব করতে পারে। কিন্তু নিজের বাড়িতে কারো কাছ থেকে এমন একটা মিষ্টি কথার প্রত্যাশা যেন নেই অতুলের। রমাদিও তাকে হুকুম দেয়, তাকে দিয়ে নানারকম কাজ করিয়ে নেয়। কিন্তু যা বলে হাসি মুখে বলে, মিষ্টি করে বলে। সবাই বলে রমার রস-কস নেই। কিন্তু অতুল মনে মনে জানে সে কথা সত্য নয়। এমন অনেক কাজ আছে যা অতুলকে দিয়ে রমার না করালেও চলে। তবু তার জন্যে বেছে বেছে সে অতুলকেই অনুরোধ উপরোধ করবে। অতুল বুঝতে পেরেছে তাকে অনুরোধ করতে রমার ভাল লাগে। রমা তাকে আর কিছু দিতে পারে না, তাই কাজ দেয়।

আজ নিয়ে এ-বাসায় অতুলের তিন দিন তিন রাত কাটল। এক পাড়ায় হলেও পরেরই তো বাসা। কিন্তু অত সঙ্কোচের বালাই নেই অতুলের। পর মনে করলেই পর। ভোর বেলা ঘুম ভেঙে একটা কথা মনে পড়ায় অতুলের হঠাৎ হাসি পেল, আচ্ছা ওর অবস্থায় দাদা পড়লে কেমন হত? অবশ্য পরের বাসায় এমনভাবে অরুণের কোনদিন রাত কাটানোর কথাই ওঠে না, কিন্তু তবু যদি কোনদিন কোন কারণ ঘটত কি হত তাহলে? তার সেই বাড়ির পরিপাটি করা বিছানার শোকে ঘুম তো দূরের কথা শোয়াই হয়ে উঠত না। অতুলের সে জ্বালাই নেই। পর মনে করলেই পর। একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে অতুলের মনে হয় সবই এক, একই আকাঠার তক্তপোশ এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে। সাবেক কালের কেনা রং-ওঠা সুতো বার হওয়া সতরঞ্চ পাতা। তাতে তক্তপোশের সবটা ঢাকা পড়ে না কোন বাড়িরই। সকালে চায়ের বৈঠক, তার আয়োজন যতটা আড়ম্বর তার চেয়ে তিন গুণ। দু-বাড়িতেই পাকা বাজার-করিয়ের ছুটপাট করে বাজারে ছোটা, তারপর সাড়ে ন'টা একবার বাজলে হয় কে কোন্ দিক দিয়ে অফিসে ছুটবে দিশে পায় না। সময় তো একটুকু, অথচ এরই মধ্যে শোরগোল কত। এটা হল না, সেটা পড়ে রইল। অবশ্য তাদের বাড়ির তুলনায় এ বাড়িতে শোরগোলটা অনেকখানি কম। চারদিকে চোখ আছে রমাদির। কাজের একটা সিজিল-মিছিল আছে। টুক্‌টাক কাজ কিছু কিছু এ ক'দিন অতুলকে করতে হচ্ছে বৈকি। কাল রমাদির কাছে কে বলে গেল এর মধ্যে কণ্ট্রোলের দোকানে কাপড় আসার কথা, অতুল দুপুরে গিয়ে খবর নিয়ে এসেছে, আসে নি এখনো, কিন্তু এলে আর পড়তে পাবে না। না হয় রোজই গিয়ে একবার করে খবর নিয়ে এসে দেবে। অতুলের তাতে ক্লান্তি নেই।

হাত মুখ ধুয়ে এসে ঝোলান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অতুল চুলটা ঠিক করে নিল। ছোট আয়না তা আবার নিচুতে টাঙান, কুঁজো হয়ে না দাঁড়ালে মুখ দেখা যায় না। গোবিন্দর ওজনে টাঙান, গোবিন্দটা বেশ একটু বেঁটে। ভাই বোন সবাই ওরা একটু বেঁটে

ধরনের, এমন কি রমাদিও। কিন্তু আশ্চর্য, হঠাৎ দেখলে কিন্তু রমাদিকে তা মনে হয় না। চেহারার সঙ্গে দৈর্ঘ্যটা কিরকম মানিয়ে গেছে। মাথায় চিরুনি চালাতে চালাতে অতুল আড় চোখে চেয়ে দেখল গোবিন্দ এখনও ঘুমুচ্ছে। বেশ ভারি নিশ্বাস পড়ছে ওর। চিরুনি দিয়েই অতুল ওকে একটা খোঁচা মারল। 'নে ওঠ এবার, আর কত ঘুমুবি ?'

খোঁচা খেয়ে ঘুম চটে গেল গোবিন্দর। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'তুই দেখি বাবারও ওপর দিয়ে গেলি। সাতটাও তো বাজেনি বোধ হয়, এই ব্রাহ্মমুহূর্তে টেনে তুলে গঙ্গাস্নান করিয়ে আনার মতলবে আছিস নাকি ?'

'গঙ্গাজল নয় গরম জল যে ওদিকে তৈরী হয়ে গেল।' অতুল রান্নাঘরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, 'নে উঠে পড়।'

চা তৈরী করে রমা একবার ওদের ডেকে গেছে। অতুলের ইচ্ছা ছিল ওদের দুজনের চা এ ঘরে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু গোবিন্দটা উঠতে দেরি করেই সব মাটি করল। অগত্যা রান্নাঘরেই যেতে হল। একটু উঁচু একটা মোড়ার উপর বসে কেশববাবু চা খাচ্ছিলেন। অতুল ঘরে ঢুকতে মুখের কাপ না নামিয়েই বললেন, 'এসো অতুল, এসো।'

মুখে অতুলের অভ্যর্থনা করলেন বটে, কিন্তু তাঁর চোখ রয়েছে ছোট মেয়ে দুটির মুড়ির বাটির দিকে। কারো বাটি থেকে একটা মুড়ি মাটিতে পড়েছে কি ধমকে উঠবেন। কি জানি কেন লোকটিকে অতুলের মোটেই ভাল লাগে না। অতি সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে অনর্থক চেঁচামেচি করেন। এদিকে দেখি সব ব্যবস্থাই রমাদির হাতে, অথচ মাঝখান থেকে ফুট করে কি একটু বলেন আর অমনি গোলমাল লেগে যায়। লাগান অবশ্য মাসিমা, থামায় রমাদি। ধমকাতে তার জুড়ি আর নেই। কোথায় লাগে অরুণের গলা, বাবা-মার মধ্যে কথা কাটাকাটি যখন হয় তখন অরুণও তো থামায়। কিন্তু রমাদির গলার তার আলাদা। চায়ের পেয়ালা অতুল হাতের তেলোর ওপর তুলে নিল। একটু পরে কেশববাবুই ফের কথা বললেন, 'শুনলাম কাল নাকি তোমাদের মণীন্দ্র এসেছিল তোমার খবর নিতে, গেলেই তো পারতে। বাপ-মার ওপর বেশিদিন রাগ করা কি ভাল ?'

অতুল চট করে কোন জবাব দিল না। একবার রমার দিকে আবার মাসীমার দিকে চাইল শুধু। জবাব দিলেন মাসীমা, যাবেই বা কেন ? মণীন্দ্রকে পাঠিয়েছে, কেন আর লোক ছিল না বাড়িতে ? নাকি অন্য কেউ এলে মান যেত ?'

কেশববাবু বললেন, 'তুমি চুপ কর, মান অপমানের কথা হচ্ছে না। বাড়ির ছেলে বাড়ি যাবে তার আবার মান অপমান কি ? তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।'

অতুল হেসে বলল, 'আপনি থামুন মাসীমা, যেই আসুক বাড়ি আমি যেতাম না। বাড়ি আমি যাবও না।'

'তবে কোথায় যাবে ঠিক করেছ শুনি।' রমা হেসেই বলল কথাটা, কিন্তু ঢংটা অতুলের ভাল লাগল না।

অতুল যখনই গম্ভীরভাবে কোন কথা বলতে যায়, রমা তা হেসে উড়িয়ে দেয়। ওর কথা যেন কথাই নয়। রমার প্রশ্ন এড়িয়ে অতুল বলল, 'গেলেই হল এক জায়গায়।'

'না হল না, তার চেয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত বাড়িই যাও গিয়ে আজ।' অতুল গুম হয়ে রইল।

কেশববাবু একবার ওর দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'আরে, আজ না যায় নাই গেল, এও তো নিজের বাড়ির মত। থাক না যে ক'দিন খুশি। তবে হ্যাঁ কাজকর্ম একটা দেখতে হবে বই কি।' লোকটার কথাই এমনি উল্টোপাল্টা, অতুল ভাবল। এক কথা বলে পরক্ষণেই সেটা সামলানোর চেষ্টা। অতুলের আর সহ্য হল না, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'দিন না একটা জুটিয়ে। আপনারও তো কত অফিস-টফিসে জানাশুনা আছে।'

কেশববাবু মুখ নিচু করে হাসলেন। চেষ্টা-চরিত্র করলে কোথাও কি আর জুটিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু তারপর সে ঝক্কি সামলাবে কে ? যা মেজাজ, কোন দিন কাকে দু-ঘা বসিয়ে দেবে তার ঠিক কি ? মুখে বললেন, 'দেব বই কি, খোঁজ পেলে কি আর এমন বসে থাকতে হবে ? আমার কাছে গোবিন্দও যা তুমিও তাই।'

এতদিন অতুলেরও সেই ধারণাই ছিল। কিন্তু দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর অতুলের মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগল। একটু আগে বাপের পিঠ পিঠ গোবিন্দও অফিসে বেরিয়ে গেছে। রমার রান্নাঘরের কাজ এখনও শেষ হয় নি, থালাবাসন নাড়ার শব্দ আসছে। তক্তপোশের ওপর উঠে বসে অতুল একটা বিড়ি ধরাল। তবে কি ওর সকালবেলার ভাবনা ভুল ? মেসোমশায় তাহলে খরচের দিকটা ভাবছে না তো ? ভাবলেও তো দোষ দেওয়া যায় না। সে বাজার নেই, বোঝার ওপর শাকের আঁটিও আজকাল সয় না কোন সংসারে।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রমা এসে সামনে দাঁড়াল। এতক্ষণে ওর খাওয়া শেষ হল, যে কাপড়ের আঁচলে হাত মুছছে রমা তার পাড়ের রং উঠে গেছে। কাপড়টা বেশ পুরনো হয়েছে বোঝা যায়। অতুল ওর হাতের দিকে চেয়ে রইল। কাজ করে করে আঙুলের ডগাগুলো কেমন ক্ষয়ে গেছে। নাঃ, সংসারের পিছনে খাটুনি আছে রমাদির। অতুল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। আবার কোন্ ফরমায়েস করে বসবে কে জানে! কাজ করে দিতে পারে বলে কি কেবল ফুট-ফরমাস খাটা যায়, না তা খাটতে ভাল লাগে ? মেয়েলি কাজ অতুলের আসে না। গলির মুখে বেরিয়েই আবার পকেটে হাত পড়ল, বিড়ি নেই। বিড়ির আর দোষ কি ? দু-আনার বিড়ি আর কতক্ষণ থাকে পকেটে। অতুলের ঐ

আরেক রোগ, মন মেজাজ বিগড়ে গেলে ঝক্কি পড়ে বিড়ির ওপর। তখন হয়তো পাঁচ মিনিটেই দুটো টেনে শেষ করল। মোড়েই গোলক দাসের বিড়ির দোকান। চেনা দোকানদার, বিড়ি বাকিতেই কেনে। হিসেব গোলোকই রাখে, অতুলকে রাখতে হয় না। বেশ কিছু জমে গেলে দু-চার আনা দিলেই আবার চুপ করে থাকে কিছুদিন।

গোলোকের দোকানে এসে অতুল বিড়ি চাইল। 'গোলোকদা, বিড়ি দাও তো চার পয়সার।'

চার পয়সার বিড়ি গুনে অতুলের হাতে দিয়ে গোলোক বলল, 'এই চার পয়সা নিয়ে কিন্তু টাকা পুরল।'

'পুরল তো কি হয়েছে। নিও দু-একদিন বাদে।'

কিন্তু ধমকে আজ আর দমল না গোলোক, অতুলকে ধমক দিয়ে উঠল, বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাদে বাদে করেই তো দু-হপ্তা চালালে; তবু যদি আগের ছ-আনা পড়ে না থাকত।'

অতুল আজ কোন জবাব দিল না। এর জবাব তো মুখে নয়, হাতে দিতে হয়। ওর দোকানের দড়ি থেকে অতুলের আর বিড়ি ধরানোর প্রবৃত্তি হল না। আরেকটু এগুতেই আমহার্স্ট স্ট্রীটে গিয়ে পড়ল। সামনে একটা বিড়ির দোকান থেকে বাঁ হাতে দড়ি তুলতেই শরিক দাঁড়াল তার একজন, মাথায় অতুলের চেয়ে খাটই হবে। বয়সও কম। রেডিমেড্ ফ্রক, প্যান্ট, ইজেরের দোকান নিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়েছে। ছোকরাকে অতুল চিনতে পারল না। বোধ হয় নতুন এসেছে। কথায় কথায় আলাপ করল ওর সাথে, এ ব্যবসা মন্দ না, সম্বল বলতে বিশেষ কিছুই নেই, তবু করে তো খাচ্ছে!

দমদমে ফুরন করা দর্জি আছে। বড়বাজারথেকেনানা রকম ছিটের থান যায় সেখানে; আর রেডিমেড্ হাফ্ প্যান্ট, ইজের তৈরী হয়ে আসে। থান পৌঁছে দিয়ে তৈরী মাল নিয়ে আসার জন্যে অবশ্য আলাদা লোক আছে। অতুল বলল, 'সে তো বুঝলাম কিন্তু কাপড় কেনার তো টাকা চাই।'

ছেলেটি বলল, 'দু-একটা কিস্তি চালিয়ে নিতে পারলে তারপর বাকিও পাবেন। শেষে তো মাছের তেলে মাছ ভাজা আর কি।'

'কিন্তু রেডিমেড্ কটাই বা বিক্রী হবে।'

'কি যে বলেন' ছেলেটি হেসে বলল, ছাঁট-কাট যদি ভাল হয়, দোকানে দোকানে টেনে নেবে না আপনার মাল? তখন আর আপনাকে খুচরো বিক্রীর আশায় বসে থাকতে হবে না।'

ছাঁটকাট ভালই হবে, ওদের ফ্রক প্যান্ট কাটে রমাদি। হ্যাঁ অনেক পাকা দর্জির

চেয়েও ভাল হবে। অতুল ভাবল, রমাদির হাতের কাজ সে দেখেছে, বাসায় ভাইবোনেদের ফ্রক, প্যাণ্ট সবই তো রমাদি কাটে, তার হাতে সেলাই হয়। অতুল মনে মনে প্ল্যান ঠিক করে ফেলল। তাই করবে সে। চাকরির চেষ্টা তার দ্বারা হবে না। সুরেনের সেদিনকার ব্যবহারের কথা অতুলের মনে পড়ল। ঐ তো চাকরি তার ঠাট দেখলে গা জ্বালা ধরে। এতক্ষণে অতুলের মনটা যেন বেশ হাল্কা হয়ে উঠল। কাছেপিঠের দু-একজন বন্ধুর খোঁজ খবর নিয়ে বিকেল হবার আগেই অতুল ফের রমাদের বাসায় ফিরে এল। কড়া নাড়তে রমা এসে দোর খুলে দাঁড়াল। চোখ মুখ দেখে মনে হল এই মাত্র ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে। দোর খুলে দিয়েই রমা আর দেরি করল না, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। পিছনে পিছনে অতুলও উপরে উঠে এসেছে। দোরের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে অতুল বলল, 'ঠিক করে এলাম।'

রমা ফিরে তাকাল, 'কি চাকরি নাকি ?'

'না তার চেয়ে ঢের ভাল জিনিস।'

'জিনিসটা কি শুনিই না আগে।'

'কিন্তু তাতে তোমাকে চাই' অতুল হেসে বলল।

অতুল তার প্ল্যান সমস্ত খুলে বলল রমাকে। রমার বিছানার শিয়রের দিকে ওদের হাতে চালানো সেলাই কলটা ঢাকনি মোড়া রয়েছে। শিগ্‌গির কোন কিছু করাও হয় নি। ওতে হাতও পড়ে নি। সেদিকে চেয়ে রমা বলল, 'হ্যাঁ, এখন বসে বসে তোমার অর্ডারের প্যাণ্ট সেলাই করি। আর তো কোন কাজ নেই আমার।'

অতুল বলল, 'আরম্ভ করেই দেখ না। দেখবে এ কাজ তোমার ঐ পাঠ-টাটের চেয়ে খারাপ নয়।'

রমা হেসে বলল, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে। এক্ষুনি তো আর কিছু হচ্ছে না। যাও, নিচে যাও। একটু ঘুমুতে দাও দেখি।'

'যাচ্ছি, কিন্তু আমার কথাটা ভেবে দেখ।' বলে অতুল আর দাঁড়াল না। ভাববার সময় রমাকে মোটেই দিল না অতুল। পরদিন এক থান ছিট কাপড় এনে রমার সামনে ফেলে দিয়ে বলল, 'নাও। গোটা কয়েক শার্ট তৈরি করো তো বসে বসে। কিছু প্রমাণ সাইজের আর কিছু আট-দশ বছরের ছেলেদের গায়ের মাপের।'

রমা অবাক হয়ে বলল, 'কাপড় কেনার টাকা কোথায় পেলে ?'

অতুল বলল, 'ডাকাতি করেছি। কেন, এক থান কাপড়ের টাকা দেবার বন্ধুও কি আমার সারা শহরে নেই ?'

তারপরে ব্যাপারটা খুলেই বলল অতুল। বউবাজার স্ট্রিটে রেডিমেড্ জামা আর

ফ্রক-প্যাণ্টের দোকান আছে নিশানাথ নন্দীর, তার সঙ্গে অতুলের বহুদিনের বন্ধুত্ব। সে-ই এক থান কাপড় অতুলকে জোগাড় করে দিয়েছে। ভাল কাট-ছাঁট হলে বিক্রির ব্যবস্থা সে-ই করবে।

রমা বলল, 'আর যদি ভাল না হয় ?'

অতুল বলল, 'তাহলে আমি ঘাড়ে করে সেগুলিকে শহরের পথে বিক্রি করে বেড়াব। কিন্তু ভাল হবেই-বা না কেন। তোমার হাত তো খারাপ নয়।'

রমা বলল, 'যত তোষামোদই কর, আমার দ্বারা ওসব হবে না। তুমি অন্য লোক দেখ। আমার আর খেয়ে না খেয়ে কাজ নেই, বসে বসে তোমার খাম-খেয়াল মেটাই। নিয়ে যাও তোমার থান কাপড়। যার জিনিস তাকে ফেরত দিয়ে এসো গিয়ে।'

কিন্তু অতুল সেকথা কানেই নিল না। যেন শুনতেই পায় নি, তেমনি ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল।

পুরো একটা দিন পড়ে রইল সে কাপড়। রমা হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখল না। কিন্তু অতুল নির্বিকার। ওর ভঙ্গি দেখে রমা চটে উঠে বলল, 'তোমার জিনিস আমার ঘর থেকে সরিয়ে নেবে তো নাও, না হলে আমি জানালা দিয়ে ফেলে দেব বলে দিচ্ছি।'

অতুল বলল, 'বেশ ! দিতে যদি পার দাও।'

রমা বলল, 'আমি যেন হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি। সংসারের কোন কাজকর্ম নেই। ওর মত বেকার হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। উনি আমাকে কাজ জুটিয়ে দিলেন।'

অতুল বলল, 'দিলামই তো। আমি রাস্তায় বেকার, তুমি ঘরে বেকার। তোমারই বা নিজের বলে কোন্ কাজ আছে। কিন্তু যদি কাজটা করতে পার, তাহলে এক একটা শার্টে এক একটি টাকা। তোমার আট আনা থাকবে আমার আট আনা।'

রমা এবার ঠোঁট টিপে হাসল, 'ঈস, ভাগাভাগির বেলায় তো জ্ঞানের নাড়ি খুব টনটনে দেখছি। আমি খাটব, আমি তৈরি করব, আর তুমি বুঝি আট আনা ভাগ পাবে?'

অতুল হাসল, 'বেশ কত দিতে চাও বল ?'

রমা বলল, 'কত আবার—কিছুই না।'

অতুল বলল, 'সর্বনাশ। একেবারেই বঞ্চিত করতে চাও নাকি ?'

রমা অতুলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে রইল। তারপর ধমকের সুরে বলল, 'এর আবার বঞ্চনা-অবঞ্চনার কি আছে। নেহাতই যদি দিতে হয় মুটে ভাড়ার এক আনা তুমি পাবে।'

অতুল বলল, 'বেশ তাই দিয়ো। যা দিয়ে তুমি খুশী থাক, তাই ভাল।'

রমা ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, 'তাছাড়া আবার কি, কিন্তু তুমি যা ভেবেছ, তা হবে না।

ওসব সেলাই-ফোঁড়াই কিছুতেই করতে পারব না আমি।'

বলে রমা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে ও অন্য দিনের মত বই নিয়ে শুয়ে পড়ল না। কাঁচি আর সেই ছিট কাপড়ের থান নিয়ে এসে বসল হ্যাণ্ড মেসিনের কাছে।

মেসিনের শব্দে বিরক্ত হয়ে কল্যাণী উঠে দোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন, 'বলি তুই নিজেও একটুকাল ঘুমুবি নে, আর আমাকেও ঘুমুতে দিবি নে, ভাবলি কি তুই।'

মেসিন চালাতে চালাতে রমা বললে, 'কেন, ঘুমোও গিয়ে। ঘুমোতে তো তোমাকে কেউ বাধা দিচ্ছে না।'

কল্যাণী মেয়ের শেষ কথাটির পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'বাধা দিচ্ছে না। পাশের ঘরে কানের কাছে কেউ অমন খট খট করতে থাকলে অন্য লোকে ঘুমোতে পারে! ছোট মেয়েটাকে কত করে ঘুম পাড়িয়েছি। সেও উঠে পড়ল বলে। তা পড়ুক। কিন্তু রমা, তোর নিজেরও তো দেহ বলে একটা বস্তু আছে। এত যদি দিনরাত খাটিস, এক মুহূর্তও একটু বিশ্রাম না দিস, দেহ টিকবে কি করে।'

রমা মার দিকে তাকিয়ে মেসিন চালাতে চালাতে জবাব দিল, 'এ দেহ টিকিয়েই আর কি হবে মা।'

কল্যাণী একটুকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই রুক্ষ, কঠোর স্বভাবের মেয়েটির গলা থেকে অমন করুণ আর কোমল স্বর শুনে তাঁর মনটা অনেকদিন বাদে আবার যেন কেমন করে উঠল। সত্যি, কোন্ সুখ আছে ওর মনে যে, ও দেহের দিকে নজর দেবে, দেহের যত্ন নেবে। দিন ভর খাটে। কাজ-কর্মের ভিতর দিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যকে ভুলে থাকতে চায়। এই বয়সে কোন সাধ নেই, আহ্লাদ নেই, সব থেকেও কিছু নেই মেয়েটার। আস্তে আস্তে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন কল্যাণী। করুক ওর যা খুশি, যেভাবে থেকে শান্তি পায় থাকুক।

কল্যাণী নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

খানিক বাদে পা টিপে টিপে অতুল এসে দাঁড়াল ; হেসে বলল, 'কি হচ্ছে। তবে নাকি কাপড়ে হাত দেবে না?'

রমা ফিরে তাকাল, 'তুমি যা ভেবেছ তা নয়। নিজের জন্য একটা শেমিজ করে নিচ্ছি।'

অতুল বলল, 'তোমার জন্যে একটা শেমিজ কর, আমার আর গোবিন্দের জন্যে গোটা কয়েক শার্ট, ব্যস। ওসব কেনা-বেচার হাঙ্গামায় আর কাজ নেই রমাদি।'

রমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'এরই মধ্যে শখ মিটল। ব্যবসা-বাণিজ্য করবার লোকই তুমি

বটে। আজ এ-বুদ্ধি কাল সে-বুদ্ধি, তুনিয়ার কোন কাজ যদি তোমাকে দিয়ে হয়। যাও আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও তুমি। যা দেখতে পারিনে তাই।' বলে রমা ফের নিজের কাজে মন দিল।

অতুল সকৌতুকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ রমার রাগ আর বিরক্তিটা উপভোগ করল, তারপর এক সময় নিচে নেমে গেল। কাজের সময় ওকে বাধা দিলে ও ভারি চটবে। কিন্তু এখন চটাতে চায় না অতুল। এগোক, তাই চায়। তাতে আরও তু-পয়সা হবে।

দিন কয়েকের মধ্যে গোটা কয়েক ছোট-বড় জামা তৈরি করে ফেলল রমা।

অতুল সেগুলি নিয়ে তার সেই বন্ধুর দোকানে জমা রেখে এল। রমা বলল, টাকা কই?'

অতুল বলল, 'বিক্রি হোক, তবে তো টাকা।'

টাকা যেদিনই পাক, রমা কিন্তু কাজে বেশ উৎসাহ পেয়ে গেছে। অবসর পেলেই ও মেসিনের কাছে গিয়ে বসে। সেখান থেকে নড়তে চায় না। এক থান কাপড় শেষ হল তো এল আর এক থান। এ থানের রঙ আর ছিটের নমুনা ভাল করে বুঝিয়ে দিল অতুলকে। একটানা একঘেয়ে জীবনে যেন বৈচিত্র্য এসেছে। বেঁচে থাকায় হঠাৎ যেন নতুন স্বাদ পেয়েছে রমা। কাটা কাপড়ের ব্যবসা চালান নিয়ে অতুলের সঙ্গে তার পরামর্শ চলে। দেখা যায়, অনেক বিষয়েই অতুলের চেয়ে তার বুদ্ধি বেশি। নিশাকান্ত পর্যন্ত তার হাতের কাজের তারিফ করে। মজুরি হিসাবে সপ্তাহে সপ্তাহে চার-পাঁচ টাকা করে দেয়ও।

টাকায় অঙ্ক সামান্য। কিন্তু রমা যে স্ফূর্তি পেল, যা উৎসাহ যোগাতে লাগল অতুলকে, তা খুব সামান্য নয়। ক্রমে গোবিন্দ এসেও দলে ভিড়ল। বলল, 'এরকম ছেলেখেলা করে লাভ কি। ব্যবসা যদি করতে হয়, ভাল করেই কর। বাইরের ঘরটা তো পড়েই আছে। ওটিকে ব্যবহার কর তোমরা। তুই নিজেও ছাঁটকাটের কাজটা শিখে নে। একটা ফুট মেসিন আনা, বসতে হলে ভাল করে জাঁকিয়ে বসো।'

কিন্তু গোবিন্দ উৎসাহ দিলে কি হবে, তার বাবা কেশববাবু আপত্তি করতে লাগলেন। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'হ্যাঁ, বাকি আছে এখন ওই। বাড়ির মধ্যে কত কিই তো ঢুকিয়েছ, এবার একটা দোকান এনে ঢোকাও।'

কল্যাণী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার কথাবার্তার ধরনই আলাদা। তোমার বাড়িতে আমি আবার কি ঢোকালাম, যা করবার তোমার ছেলে-মেয়েরাই করেছে। আমাকে কেন দোষ দিচ্ছ।'

কেশববাবু বললেন, 'ভিতরে ভিতরে তোমার সায় না থাকলে কি কেবল ওরা কিছু করতে পারে। দিন নেই, রাত নেই, মেসিনের ঘট-ঘটানিতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

খেটেখুটে এসে বাড়িতে যে একটু স্বস্থমত থাকব তার জো নেই। আর এই অতুলটাই বা ভেবেছে কি। ও কি চিরকালের জন্যে বাসা বাঁধল এখানে ?'

কল্যাণী বললেন, 'পরের ছেলেকে দোষ দিচ্ছ কেন। ও তো কবে থেকেই যাই যাই করছে। বলছে কোন হোটেলে মেসে গিয়ে থাকবে। কিন্তু গোবিন্দই তো যেতে দিচ্ছে না।'

কেশববাবু বললেন, 'কেবল গোবিন্দ কেন, তলে তলে তোমার মেয়েরও আস্কারা আছে।'

রমা কি একটা জিনিস নেওয়ার জন্যে এসেছিল, বাবা মার কথবার্তা কানে যেতেই দোরের আড়ালে সরে দাঁড়িয়েছিল। সব কথাই ওর কানে গেল। একটু বাদে গম্ভীর মুখে এসে ঘরে ঢুকে বলল, 'কি হয়েছে বাবা ?'

কেশববাবুর অমনি স্বর পাল্টে গেল, 'না-না, কিছু হয় নি। কি আবার হবে। আজ কি রান্না হচ্ছে মা।'

কল্যাণী মনে মনে হাসলেন। ছেলে মেয়ে দুজনকেই ভয় করেন উনি। আড়ালে যতই হৈ-চৈ করুন সামনে কিছুই বলতে চান না।

রমা বলল, 'অন্য দিন যা হয় তাই হচ্চে।' তারপর নিজের কাজ সেরে সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কেশববাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'শুনতে পেয়েছে নাকি ?'

কল্যাণী হেসে বললেন, 'কি জানি !'

কেশববাবু বললেন, 'শুনতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। যা একখানা মা মনসা তোমার মেয়ে, তবে যাই বল, অতুলের কিন্তু চলে যাওয়াই ভাল। শত হলেও বয়সের ছেলে। ঘরের মধ্যে সব সময় নড়া-চড়াটা আর যেন ভাল দেখায় না। লোকেই বা কি বলে।'

কল্যাণী বললেন, 'চুপ কর।'

তারপর ইশারায় সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন। রমা যায় নি। বারান্দায় পিন্টু-মিন্টুর ভিজে ফ্রক্-প্যান্টগুলি মেলে দিচ্ছে। কেশববাবু তাড়াতাড়ি কথা পাল্টে বললেন, 'ঈস, কত বেলা হয়ে গেল। আজ লেট হতে হবে অফিসে, যাও তেল গামছা নিয়ে এসো।'

দুপুরের সময় অতুল খেতে এলে রমা মুখ গম্ভীর করে রইল। ব্যবসা-সংক্রান্ত আলোচনাটা অন্য দিনের মত আর জমল না।

অতুল খেতে খেতে বার দুই জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি হয়েছে রমাদি। জামা

সেলাই করতে ঠোঁট দুটোও সেলাই করে রেখেছ নাকি, মোটেই কথাবার্তা নেই যে। নাকি খুব খিদে পেয়ে গেছে।' রমা ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'চুপ করে খেয়ে নাও তো। সব সময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না মানুষের।'

অতুল আর কোন কথা বলল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর অতুল রমার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, রমা বলল, 'আমাকে জ্বালাতন করো না অতুল, আজ আমার শরীর ভাল না। আমি এখন ঘুমুবো। নিচের ঘরে সুপুরি রেখে এসেছি, যাও খাও গিয়ে।'

অতুল মনে মনে হাসল। এই বদরাগী মেয়েটির মেজাজ দিনের মধ্যে কতবার যে বিগড়ায় তার হিসেব রাখা মুশকিল। হয়তো মা-বাবার সঙ্গে কথান্তর হয়েছে। তার শোধ নিচ্ছে অতুলের ওপর। কিন্তু এ সময় ওকে না চটানোই বুদ্ধিমানের কাজ। অতুল আর কোন কথা না বলে রমার সামনে থেকে সরে গেল। কিন্তু মেয়ের ঘরে দোর দেওয়ার শব্দ শুনে কল্যাণী এসে দাঁড়ালেন, 'ওকি, না খেয়েই তুই শুয়ে পড়লি যে।'

রমা ঘরের ভিতর থেকে জবাব দিল, 'আমি খাব না মা।'

কল্যাণী বললেন, 'কেন, এই দুপুর বেলায় না খেয়ে থাকার কি হয়েছে।'

রমা বিরক্তির ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'খাওয়ার ইচ্ছে নেই তাই খাব না। তুমি যাও, খেয়ে নাও গিয়ে।'

কল্যাণী বললেন, 'তোদের ধরন দেখলে আমার গা জ্বলে যায় বাপু। পান থেকে চুন খসলে আর কথা নেই। অমনিই রাগ। কেন তোকে কে কি বলেছে যে তুই রাগ করে না খেয়ে থাকবি। কথাটা অন্যায় হয়েছে কি। সত্যিই তো পরের ছেলের দায়িত্ব আর কতদিন মানুষ নিতে পারে, সেজন্যে গোবিন্দকেই উনি দোষ দিচ্ছিলেন, তোকে কিছু বলেন নি। আয়, উঠে আয় বলছি।'

রমা বলল, 'না আমি খাব না।'

'বেশ, কর তোমাদের যা ইচ্ছে। যন্ত্রণা আমার আর সয় না।' বলে কল্যাণী নিজের ঘরে গিয়ে দোর ভেজিয়ে দিলেন। রমা যদি না খেয়ে রাগ করে থাকে তিনিও খেতে যাবেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে দোর খুলে বেরিয়ে এল রমা, তারপর রান্নাঘরে গিয়ে মার আর নিজের ভাত বেড়ে নিল।

কল্যাণী খেতে বসে বললেন, 'কেন কথায় কথায় অত রাগ করিস বল তো, উনি যদি কিছু বলে থাকেন তোর ভালোর জন্যেই বলেছেন।'

রমা গম্ভীরভাবে বলল, 'হুঁ।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল রমা। খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল। কিন্তু স্থির থাকতে পারল না। বাবার ওই ধরনের কথাবার্তার পর অতুলকে স্পষ্ট করে তারই যেতে বলা উচিত। কিন্তু সেই বা কেন বলতে যাবে। বাবা নিজে বলতে পারেন না? অতুলের থাকা তিনি অপছন্দ করছেন সে কথা ওকে তিনি বলে দিলেই তো পারেন। সে সাহস বাবার নেই। গোবিন্দকে তিনি ভয় করেন। এই নিয়ে কোন কথা তুললেই গোবিন্দ হৈ-চৈ করবে, সংসারে হঠাৎ খরচপত্র দেওয়া বন্ধ করে দেবে। সেই ভয় আছে ওঁর মনে। কিন্তু রমাকে তাঁর কোন ভয় নেই। কারণ তিনি জানেন রমাকে যত দোষারোপই করা হোক সে ঘর-সংসারের কাজ বন্ধ করে থাকতে পারবে না। কারণ বাপ-ভাইয়ের ভাতই তাকে খেতে হবে। তার আর কোথাও নড়বার উপায় নেই সে কথা তিনি জানেন বলেই মেয়ের ওপর মিছামিছি দোষারোপ করতে তাঁর বাধে না। কিন্তু রমাও এসব আর সহ্য করবে না, সেও এবার থেকে স্বাধীনভাবে থাকবার চেষ্টা করবে। খোঁটা শুনেই যদি ভাত খেতে হয় সে তো শ্বশুরবাড়িতে থেকেও খেতে পারত। দু'বেলা খাটলে, শাশুড়ীর, খুড়শ্বশুরের যত্ন পরিচর্যা করলে সেখানেও তো ভাত কাপড়ের তার অভাব হত না। কিন্তু তেমনভাবে থাকতে তার প্রবৃত্তি হয় নি বলেই সে বাপের বাড়িতে চলে এসেছে। বাপ-মা অবশ্য ঘর সংসারের সব ভারই তার উপর তুলে দিয়েছে। কিন্তু একেক সময় রমার মনে হয় এ দান যেন বড়ই অনুগ্রহের দান। কোথায় যেন একটা লোক-দেখান ভদ্রতার ভাব আছে এর মধ্যে। সন্তান-স্নেহের চেয়ে সেইটাই বড়। কিন্তু সারাজীবন অন্যের এই সৌজন্যের বোঝা বয়ে বেড়াবে সে কি করে? এখন বাপ যে সৌজন্য দেখাচ্ছেন, পরে ভাই সে সৌজন্য দেখাবে। কিন্তু একটু ত্রুটি-বিচ্যুতি হলেই সেই সৌজন্যের মুখোশ মুখ থেকে খসে পড়বে সকলের। তখন এই কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে স্বামী পরিত্যক্তা রমা এ বাড়ির আশ্রিত ছাড়া আর কেউ নয়। সে যতই খাটুক, সংসারের জন্যে যতই দিনরাত পরিশ্রম করুক, এ বাড়িতে তার সত্যিকারের কোন স্থান নেই। একবার যখন গোত্রান্তরিত হয়ে গেছে এ কূলে সে আর ফিরে আসতে পারে না।

হঠাৎ সেলাইর কল আর স্তূপীকৃত কাটা কাপড়গুলির ওপর ভারি রাগ হল রমার। বাবা তার মুখের সামনে কিছু বলেন নি, কিন্তু আড়ালে এই নিয়ে রোজই বিরক্তি প্রকাশ করছেন। অথচ দু-চার টাকা যদি এর থেকে হয়ই রমা তো আর তা সঙ্গে করে কোথাও নিয়ে যাবে না। তা এই সংসারের কাজেই লাগবে। কিন্তু দরকার নেই তা দিয়ে। দরকার নেই রমার কোন সাধ-আহ্লাদে। নিজের পায়ে না দাঁড়ান পর্যন্ত নিজের ব্যবস্থা নিজে না করা পর্যন্ত সে এদের মর্জি মতই চলবে। নিজের পছন্দ থেকে নিজের ইচ্ছা থেকে কিছুই করবে না। অতুল শুয়ে শুয়ে বিড়ি টানছিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'নাও, আমি

আর পারব না, তোমার জিনিস তুমি নিয়ে চলে যাও।'

অতুল বিস্মিত হয়ে বলল, 'সেকি! কোনটা আধখানা সেলাই করে রেখেছ, কোনটায় হাতই দাও নি। এগুলি নিয়ে কি করব, ওতো বিক্রি হবে না।' রমা বলল, না হয় রাস্তায় ফেলে দিয়ো। আমি আর কিছু করতে পারব না। তাছাড়া এ বাড়িতে তোমার আর থাকা হবে না। তুমি অন্য ব্যবস্থা করো।'

অতুল খানিকক্ষণ রমার দিকে তাকিয়ে কি দেখল, তারপর বলল, 'ব্যবস্থা তো আমি কবেই করতাম। গোবিন্দই তো যেতে দিচ্ছে না।'

রমা কঠিন স্বরে বলল, না যেতে দিচ্ছে না, ওঁকে কেউ জোর করে ধরে রেখেছে এখানে। হাত পা বেঁধে রেখেছে। দিনের পর দিন অন্যের বাড়িতে পড়ে রয়েছ তোমার নিজেরই তো লজ্জা করা উচিত ছিল।'

অতুল বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল, 'না, লজ্জার কিছু নেই। আমি বিনা পয়সায় তোমাদের এখানে খাচ্ছিনে। যে কদিন খাবো খোরাকী দিয়ে খাব। মাস অন্তে পাই ফার্দিং পর্যন্ত হিসেব করে মিটিয়ে দেব। সে বোঝাপড়া আমার গোবিন্দের সঙ্গে হয়ে রয়েছে।' রমা জবাব দিল, 'কিন্তু গোবিন্দের সঙ্গে হলেই তো হবে না। গোবিন্দই তো এ বাড়ির কর্তা নয়। তাছাড়া খোরাকী দিয়ে খেতে হয় হোটেলে গেলেই তো পারো। এখানে কেন।'

অতুল বলল, 'বেশ তাই যাচ্ছি।'

গোবিন্দর একখানা লুঙ্গি পরা ছিল সেখানা ছেড়ে নিজের কাপড় পরে নিল অতুল। আলনা থেকে জামাটা গায়ে চড়াল। সবগুলি বোতাম লাগাবার সবুর সইল না, বলল, 'আমি চললুম। গোবিন্দ এলে তাকে বলো। আর খোরাকীর টাকা আমি যেভাবেই পারি দু-একদিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেব।'

অতুল বেরিয়ে যাচ্ছে, রমা পিছন থেকে ডেকে বলল, 'জামার কাপড়গুলি রেখে যাচ্ছ কার জন্যে? এগুলি দিয়ে কি করব?'

অতুল বলল, 'নর্দমায় ফেলে দিয়ো।'

তারপর সদর দরজার হুড়কো খুলে হন হন করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

এই অহেতুক অপমানে তার সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে যেতে লাগল। নেহাতই গোবিন্দের বড়দিদি। জাতে মেয়েমানুষ। অন্য কেউ হলে এমন কি গোবিন্দ হলেও অতুল কিছুতেই এসব সহ্য করত না। দু-চার ঘা লাগিয়ে দিত। কিন্তু রমা নেহাৎ মেয়ে বলেই বেঁচে গেল।

গলির ভিতর দিয়ে হন হন করে ছুটে চলল অতুল। না, তার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব

কিছু নেই। কারোরই সাহায্যের দরকার নেই তার। সবাইকে ছেড়ে চলতে পারে কিনা অতুল দেখে নেবে।

'এই যে কালাচাঁদ এবার তো দেখা পেয়েছি তোমার। এবার কোথায় তুমি পালাও তাই দেখব।'

দিদিমা ভুবনময়ী। দু-হাত দু-দিকে বাড়িয়ে তিনি পথ আটকে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর এক বাল্যসখী আছেন ছুতোরপাড়া লেনে। তাঁর অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছিলেন। সঙ্গে আছে সাত বছরের নাতনী টুলু।

ভুবনময়ী বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস আবার, বাড়ি আয়।'

অতুল বলন, 'তুমি যাও দিদা, আমি যাব না। তোমাদের বাড়ি আমি জন্মের মত ছেড়ে এসেছি। আর ঢুকব না ওখানে। হাত ছাড়, যেতে দাও আমাকে। 'ভুবনময়ী হাসলেন, 'ঈস্, যেতে দাও বললেই যেন যেতে দিলাম। যেতে হয় একা যেতে পারবি নে আমাকেও নিয়ে যা। লক্ষ্মী ছেলের মত কথা শুনবি তো শোন, নইলে আমি কিন্তু চেঁচিয়ে রাস্তায় লোক জড়ো করব।'

অতুল বলল, 'জড়ো করে কি বলবে।'

ভুবনময়ী বললেন, 'কি আবার বলব। লোককে ডেকে শোনাব আমার মানুষ আমাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসে এখন পথে ফেলে যাচ্ছে, তোমরা সবাই বিচার কর। এই বলে যদি চেঁচাতে শুরু করি মজাটা টের পাবি। রাস্তার লোকের কিল চড় কি রকম পড়ে পিঠের ওপর দেখবি একবার।'

পরিচিত দু-চারটি ছেলে এরই মধ্যে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। প্রকাশ্য পথের ওপর দিদিমার এই অসঙ্কোচ প্রণয় নিবেদনে সবাই হাসছে মুখ টিপে।

অতুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'চল যাচ্ছি। হাত ছেড়ে দাও।'

ভুবনময়ী বললেন, 'আর কি তোমাকে ছাড়ি কালোমাণিক। ছাড়া তো ভাল এখন একেবারে আঁচলে বেঁধে রাখব।'

নাতির হাত ধরে বাড়ির দিকে এগুতে এগুতে বললেন, 'গোবিন্দের বাড়িতে তো আমার যাতায়াত নেই। হুট করে গিয়ে উঠতে লজ্জা করে, কিন্তু সবাইকে বলেছি ছেলেটা রাগ করে পরের বাড়িতে রয়েছে, তোমরা ওকে ডেকে আন। তা যেমন বাপ তেমনি মা। এত বয়স হল কিন্তু অভিমানের পালাই ফুরাল না তাদের। আর তোকেও বলি অতুল, বাপ-মা কি এক সময় বলে না? তাই বলে অন্যের বাড়িতে থাকে নাকি গিয়ে বাড়ির ছেলে। এমন সৃষ্টিছাড়া কথা শুনেছিস কোথায়?'

দিদিমার এই পুরনো স্নেহ আদর যেন সম্পূর্ণ নতুন লাগতে লাগল অতুলের কাছে।

খানিক আগেও রমার নিষ্ঠুর অপমানে তার মনে হয়েছিল পৃথিবীতে তার কেউ নেই। সে একেবারে নির্বান্ধব আত্মীয়-স্বজনহীন। কিন্তু দিদিমার এই স্নেহস্পর্শে এক মুহূর্তের মধ্যে সে যেন আবার সব পেয়েছে।

এই কয়েকদিন যে অতুল রাগ করে অন্য জায়গায় গিয়ে ছিল তার জন্যে লজ্জা বোধ করবার অবসর দিলেন না ভুবনময়ী। হাসি-ঠাট্টায় সব ভাসিয়ে দিলেন, ভুলিয়ে দিলেন। বাড়ির অন্য কেউও তেমনি কোন মন্তব্য করবার সুযোগ পেল না। মা'র কাণ্ড দেখে বাসন্তীও মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।

ভুবনময়ী বললেন, 'আজ থেকে তোমার ছেলেকে আমার ঘরে থাকতে দিয়ো বাসন্তী, একেবারে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব।'

ক্লাবে গোবিন্দের সঙ্গে দেখা হল অতুলের। গোবিন্দ এগিয়ে এসে বলল, 'কি রে তুই নাকি রাগারাগি করে চলে এসেছিস?'

অতুল এবার সত্যিই রাগ করল, 'আমি রাগারাগি করেছি? কে বলেছে বল তো? তোর বড়দি নিশ্চয়ই। না'হক সে-ই তো কতকগুলো কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিল আমাকে, উল্টে আমার নামেই নালিশ?'

গোবিন্দ বলল, 'বড়দির কথা আর বলিস নে। মাঝে মাঝে ওর মাথায় ঠিক থাকে না। সামান্য কিছু হলেই মেজাজ বিগড়ে যায়। আমাকেই কি এক এক সময় কম গালা-গালি করে নাকি? কিন্তু আমি কিচ্ছু মনে করি নে, জবাব পর্যন্ত দিই নে। ওর মুখের দিকে চেয়ে সব সহ্য করে যাই। তুইও সহ্য করিস। আহা বড় দুঃখের জীবন ওর।'

অতুল বলল, 'দুঃখের আছে তো আছে। তাই বলে সময় নেই অসময় নেই, যাকে যা মুখে আসে বলে যাবে?'

গোবিন্দ অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'ওর কথায় রাগ করিসনে অতুল, জানিস তো ও ওই রকমই।'

অতুল বলল, 'তা যে রকমই হোক আমার কিছু এসে যায় না। তোর বড়দির দুঃখ তুই-ই বোঝ। আমার কিছু শুনে দরকার নেই।'

কিন্তু একেবারে অতটা নির্লিপ্ত থাকা অতুলের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না। দিন কয়েক বাদে পিণ্টু এক বাণ্ডিল সেলাইকরা জামা নিয়ে এসে অতুলের দিকে এগিয়ে দিল।

অতুল বলল, 'এ কি!'

পিণ্টু বলল, 'বড়দি পাঠিয়ে দিল। আর এই নিন।' বলে পেনসিলে লেখা এক টুকরো কাগজ অতুলের হাতে দিল পিণ্টু।

না চিঠি-পিঠি কিছু নয়। ছুঁচ সুতো কি কি লাগবে তার ফর্দ। গোটা গোটা সুন্দর

অক্ষরে লেখা। একটু আগেও জিনিসগুলি ফিরিয়ে দেবে ভেবেছিল অতুল। কিন্তু সেই অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে বলল, 'আচ্ছা তুই যা।'

পিণ্টু তখনকার মত চলে গেল। কিন্তু ওর যাতায়াত একেবারে বন্ধ হল না।

জামা ফ্রকের ব্যবসাটা পিণ্টুর মারফতই চলতে লাগল অতুলদের।

উনানে ডাল চড়িয়ে দিয়ে বঁটি পেতে আলু কুটতে বসেছিলেন বাসন্তী, ছোট মত একটা ইস্ত্রি হাতে প্রীতি এসে ঘরে ঢুকল, 'মা কড়াটা একটু নামাবে? আমি ইস্ত্রিটা একবার গরম করে নিয়েই চলে যাব।'

বাসন্তী বিরক্তির ভঙ্গিতে বললেন, 'ইস্ত্রি গরম করার তোমাদের আর সময় অসময় নেই বাপু। এখন তোমাদের ইস্ত্রি গরম করতে বসলে আমি অফিসের রান্না নামাব কখন? রান্না-টান্না হয়ে গেলে তারপরে এসো।'

প্রীতি কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাসন্তী আবার বললেন, 'কেন, কার জামা ইস্ত্রি করবি, অরুণের? কাল না লণ্ড্রী থেকে জামা-কাপড় এসেছে?'

প্রীতি বলল, 'না, তার না, বিজুদার জামাটা একটু টেনে দিতে হবে মা। সে আবার এই পরে কলেজে বেরোবে। তাদের কি একটা ফাংশনও নাকি আছে বিকেলে।'

পশ্চিম দিকের উনানের কাছে কনকলতাও রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, নিজের বড় ছেলের নামের উল্লেখে মুখ তুলে বললেন, 'তার ফাংশন তো মাসের মধ্যে তের দিন লেগে আছে। নবাব। নিজের জামাটা নিজে ইস্ত্রি করে নিতে পারে না বুঝি। আবার তোকে পাঠিয়েছে। আয়, আমার এখান থেকে গরম করে নিয়ে যা তোর ইস্ত্রি।'

বলে নিজের কড়াটা কনকলতা নামাতে যাচ্ছিলেন, বাসন্তী বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক, থাক, এখান থেকেই নিয়ে যা। ওর বিজুদা যখন বলেছে তখন কি আর জামা ইস্ত্রি না করে দিয়ে রক্ষে আছে প্রীতির?'

হেসে এবার ডালের কড়াটা নামিয়ে ইস্ত্রিটা মেয়েকে গরম করতে দিলেন বাসন্তী। কনকলতাও হাসলেন, 'যা বলেছ, বিজুর মুখের কথাটি ফেলবার জো নেই। বোন একটি পেয়েছে বটে।'

বাসন্তী বললেন, 'দাদায় দাদা, মাস্টারে মাস্টার। হুকুম মানবে না কেন।'

প্রীতিও মায়ের দিকে চেয়ে হাসল, 'আহা।'

তারপর ইস্ত্রি গরম করে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাসন্তী কড়াটা উনানের ওপর তুলে দিয়ে ফের তরকারী কুটতে লাগলেন। দু'টিতে খুব ভাব। তাঁর মেয়ে আর দাদার ছেলের, এই ঘনিষ্ঠতা দেখে নিজেদের কৈশোর

যৌবনের কথা মনে পড়ে যায় বাসন্তীর। তখন তিনিও ছিলেন দাদা-অন্ত প্রাণ। মায়ের হাতের পরিচর্যার চেয়ে বোনের পরিচর্যায় বৈদ্যনাথ প্রসন্ন হতেন বেশি, বাসন্তীও এমনি দাদার জামায় বোতাম পরিয়ে দিতেন, বেরোবার সময় রুমাল দিতেন পকেটে গুঁজে। বইয়ের সেলফ্, টেবিলের দেরাজ গুছাবার ভার ছিল বাসন্তীর উপর। বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে কতদিন যে ভাই-বোনে একজোট হয়েছেন তার ঠিক নেই। এখন সেই অন্তরঙ্গতার কথা ভাবাই যায় না। শুধু বিজু আর প্রীতিকে দেখলে তাঁর সেই সব দিনগুলির কথা মনে পড়ে। বিজুও নিজের ভাইবোনের চেয়ে প্রীতিকে বেশি ভালবাসে, বেশি পছন্দ করে। ওর পছন্দমত টুক-টাক শৌখীন জিনিসপত্র কিনে দেয়, পাড়ার লাইব্রেরী থেকে ওর জন্যে গল্পের বই জোগাড করে আনে। বিজু ভারি ভালোবাসে প্রীতিকে। প্রীতিও তেমনি ; নিজের দাদাদের চেয়ে মামাতো ভাই বিজুর ওপরই তার পক্ষপাতিত্ব বেশি। বিজুর জামাটা কোথায় ছিঁড়ে গেল, গেঞ্জিটা কখন ময়লা হল, সেদিকে প্রীতির যেমন নজর, বাড়ির আর কারো বেলা তেমন নয়। ওদের ব্যবহার ওদের ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় না তাঁরা আলাদা হয়ে আছেন। দাদার সঙ্গে বাসন্তীর যখন ঝগড়া লাগে, তখন বিজু আর প্রীতির মুখের দিকে যেন তাকানো যায় না। বেশ বোঝা যায় ওরা বিব্রত বোধ করছে, ভারি কষ্ট পাচ্ছে। ওরা এসব ঝগডাঝাটি বিবাদ-বিরোধ চায় না। ঝগডা লাগলেই প্রীতি এসে মাকে বুঝায়। বিজু নিজের মাকে থামাতে চেষ্টা করে। ঝগড়ার সময় ওদের এই শালিসীপনায় বাসন্তী খুবই বিরক্ত হন। কিন্তু অন্য সময় ওদের এই স্নেহ-ভালবাসা তিনি খুব উপভোগ করেন।

দুজনের স্বভাবের মধ্যে মিল আছে। দুজনেই শান্ত, শান্তিপ্রিয়। বইপত্র ভালোবাসে, গান-বাজনার দিকে ঝোঁক আছে।

বিজু অনেকদিন বলেছে, 'পিসীমা, প্রীতিকে একটা গানের স্কুলে ভর্তি করে দিন। ওর চমৎকার গলা।'

বাসন্তী বলেছেন, 'তোমাদের বোন তোমরা দিলেই পারো।'

প্রীতি প্রতিবাদ করেছে, 'হুঁ, গানের স্কুলে না আরও কিছু। আসলে নিজেরই ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা, বুঝলে মা। মামার ভয়ে পেরে উঠে না। আমি তোমার হয়ে মামার কাছে একটু ওকালতি করব নাকি বিজুদা।'

বিজু বলেছিল, 'ওরে বাবা, তাহলে কি রক্ষা আছে ?'

বাবাকে ভারি ভয় করে বিজু। তাঁর পছন্দ অপছন্দ সব সময় মেনে চলে। ওর নিজের ইচ্ছা ছিল আর্টস পড়ার। কিন্তু বৈদ্যনাথ ওকে জোর করে কমার্স ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছেন। তাঁর এক ব্যাঙ্কার বন্ধু ভরসা দিয়ে বলেছেন, বি. কম. পাস করলেই তিনি

ভাল মাইনেয় বিজুকে তাঁর ব্যাঙ্কে নিয়ে নিবেন। আর্টস পড়ে কি হবে। তাতে কি আজকাল কোন চাকরি-বাকরি মেলে। কমার্সটা বিজুর কাছে ভারি নীরস লাগছে। তবু বাবার কথা অমান্য করতে পারে নি। আড়ালে আবডালে পিসীমা আর পিসতুত বোনের কাছে তাই নিয়ে বিজু আক্ষেপ অভিযোগ করে।

বাসন্তী তাকে ভরসা দিয়ে বলেন, 'পড়লেই পাস করে যাবি। অত ভয় পাচ্ছিস কেন।'

বিজু বলে, 'উৎসাহই পাচ্ছিনে পিসীমা, সেইটাই আসল কথা। না হলে ভয় আমি পাই নে।'

প্রীতি ঠাট্টার স্বরে বলে, 'না ভয় আবার পান না। বিজুদার মত এমন জন্মভীরু মানুষ আমি আর দুটি দেখি নি মা।'

কি ভেবে প্রীতি যে এমন ঠাট্টা করে, বোঝা যায় না। বাসন্তী তা বুঝতে চেষ্টাও করেন না। দুজনের এই ছদ্ম-কলহ বেশ উপভোগ করেন। তাঁর আর বৈদ্যনাথের মধ্যেও আগেকার দিনে এমন লোক-দেখানো ঝগড়া হত। আজকালকার ঝগড়াগুলি লোক-দেখানো নয়, তবু লোকে দেখে। সেই দিন আর নেই। কিন্তু বিজু আর প্রীতির দিকে তাকালে সেই সব দিনের যেন খানিকটা আভাস মেলে। মামা-মামী আর মামাত ভাই-বোনদের ওপর প্রীতির পক্ষপাতিত্ব তাই বাসন্তী উপভোগ করেন। কারণ তাঁদের দিকে বিজুর পক্ষপাতও তো কম নয়, নিজের ছেলেদের অনুরোধ করলেও যা না করাতে পারেন, মুখের কথাটি বললে বিজু তৎক্ষণাৎ তা করে দেয়। এমন ধীর, স্থির, ভদ্রস্বভাবের ছেলে আজকাল বড় একটা হয় না। শার্টটা কড়া ইস্ত্রি করে প্রীতি বিজুদের দোতলার ঘরে গিয়ে বলল, 'দেখ পছন্দমত হয়েছে নাকি? তোমাদের ফ্রেণ্ডস লণ্ড্রীর চেয়ে ভাল ছাড়া খারাপ হয় নি, এটুকু বাজি রেখে বলতে পারি।'

বিজু মেঝের ওপর আয়নার সামনে বসে সেফটি রেজরে দাড়ি কামাচ্ছিল, প্রীতির কথায় তার দিকে ফিরে তাকাল, 'খুব যে আত্মবিশ্বাস দেখছি।'

প্রীতি বলল, 'বাঃ রে, এটুকু বিশ্বাস থাকবে না।'

বিজয় বলল, 'থাকলেই ভাল। কিন্তু ক'জায়গায় পুড়িয়েছ তাই বল।'

প্রীতি ছদ্ম কোপের ভঙ্গিতে বলল, 'অমন করলে কিন্তু সত্যি সত্যিই একদিন পোড়াব, বুঝবে মজা।'

বিজু ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'এই ওসব, কি হচ্ছে। আমি কেবল গুরুজন না, গুরুও। আমার কৃপায় সেবার ম্যাট্রিকুলেশনটা তরে গেছ। মন দিয়ে পড়াশুনা করলে ইণ্টার-মিডিয়েটটাও আমিই তরাব। আমাকে অমন অশ্রদ্ধা করলে নিজেই পস্তাবে।'

কিছুদিন চুপচাপ থেকে বিজুর উদ্যোগেই ফের পড়াশুনা আরম্ভ করেছে প্রীতি। বাবার অমতে কলেজে ভর্তি হতে পারে নি। বাড়িতে থেকেই প্রাইভেটে আই-এ দেওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছে। কিন্তু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করতে হলে বিজুর কাছে এসেই করে। প্রীতির নিজের দাদা অরুণের মত বিজু কথায় কথায় মুখঝামটা দেয় না। খুব ধৈর্যের সঙ্গে পড়ায়, পড়া বুঝিয়ে দেয়। এই অধ্যয়ন-অধ্যাপনাটা বৈদ্যনাথ বেশি পছন্দ করেন না। চোখে পড়লেই ছেলেকে ধমক দিয়ে বলেন, 'তুই তোর নিজের পড়া পড় বিজু। পরীক্ষার কয়েকটা মাস তোর আর পণ্ডিতী না করলেও চলবে।'

বাপের মুখের উপর বিজু কোন জবাব দেয় না। প্রীতির মুখের দিকে তাকিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মিটমিট করে হাসে। কিন্তু মামার ভয়ে প্রীতি আর বেশি দেরি করে না। সঙ্গে সঙ্গে বইপত্র নিয়ে উঠে যায়। পারতপক্ষে মামার সাক্ষাতে বিজুর কাছে পড়া জিজ্ঞেস করতে আসে না। বৈদ্যনাথ যখন বাড়ি থাকেন না, যখন তাঁর হঠাৎ এসে পড়বার আশঙ্কা থাকে না, তখন যায়। বিজুও এই গোপনীয়তাটুকু পছন্দ করে। সাধ্যমত বাবাকে এড়িয়েই চলতে চায়।

গালে সেফটি-রেজর বুলাতে বুলাতে বিজু বলল, 'আজকের ফাংশনটা সত্যিই কিন্তু খুব ভাল হবে। নামকরা আর্টিস্টরা আসবেন। চমৎকার গানবাজনার আয়োজন হয়েছে।'

প্রীতি মুখ ভার করে বলল, 'ভাল হলেই বা আমার কি। বেল পাকলে কাকের কি লাভ?'

বিজু হেসে বলল, 'ব্যস্ খুব যে আফসোস দেখছি। চেহারার দিক থেকে অবশ্য পাকা বেল বললে লোকে তোমাকেই বলবে, আর আমাকে দাঁড়কাক।' প্রীতি বিজুর দিকে তাকাল, 'থাক থাক, আর ফাজলামো করতে হবে না। আমাকে দিয়ে জুতো পালিশ আর জামা ইস্ত্রিই করিয়ে নিলে। একদিন যে গান-টান শোনাতে নেবে, তার নামে দেখা নেই।'

বিজু চুপ করে রইল। প্রীতির আবদারটি বড় সহজ নয়। মেয়েদের সম্বন্ধে তাদের বাড়ির রক্ষণশীলতা বড় বেশি। এ বাড়ির মেয়েরা বাড়ির ছাদে কিংবা উঠানে দাঁড়িয়ে চন্দ্র-সূর্যের মুখ হয়তো দেখে, কিন্তু বাড়ির বাইরে যাওয়ার নিয়ম কারোরই নেই। তাতে অন্য পুরুষের মুখ দেখবার আশঙ্কা আছে। বিজুর কিংবা অরুণ-অতুলের বন্ধুরা কেউ ভিতরে ঢুকতে পায় না। বাইরের বসবার ঘর পর্যন্ত তাদের গণ্ডী। সিনেমা-থিয়েটার সম্বন্ধেও খুব বিধি-নিষেধ। বছরে একবার কি দু-বার বাবা-কাকার সঙ্গে তারা সিনেমা দেখে আসতে পারে। এ সম্বন্ধে ভুবনময়ীর কড়াকড়ি সবচেয়ে বেশি। মেয়েদের কোন রকম প্রগল্‌ভতা তিনি সহ্য করতে পারেন না। একটু বেচাল দেখলেই রাগ করেন, গাল-মন্দ করেন। আর তার পরেই বৈদ্যনাথ। এসব ব্যাপারে মায়ের বিধি-নিষেধ, আদেশ-নির্দেশ

পালনে বৈদ্যনাথের উৎসাহ বেশি। যে সব মেয়েলি আচার-আচরণের সঙ্গত কারণ ভুবনময়ী বলতে পারেন না, শুধু 'ওটা দোষ,' 'ওতে গেরস্থের অমঙ্গল হয়' বলে নাতি-নাতনিদের নিরস্ত করতে চেষ্টা করেন, বৈদ্যনাথ সেগুলি যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠা না করে ছাড়েন না। তাঁর মতে আগেকার আচার-আচরণ বচন-প্রবচনের কিছুই নিরর্থক নয়। প্রায় প্রত্যেকটির পিছনে সমাজ-রক্ষার গভীর উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলির প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নি। অল্প-স্বল্প সংস্কার করে নিয়ে সেগুলিকে আজও কাজে লাগাতে হয়। কারণ ভারতীয় সমাজের কাঠামো আসলে বদলায় নি। জীবন-যাত্রার আদর্শ মূলতঃ ঠিকই আছে। এ সম্বন্ধে সময় পেলেই কোন রকম কোন উপলক্ষ পেলেই ছেলেমেয়ে বা ভাগ্নে-ভাগ্নীদের ডেকে বৈদ্যনাথ উপদেশ দেন। তিনি বলেন 'গোড়া থেকে সংযম দিয়ে জীবনকে বাঁধতে হয়। যে নিয়মই মান না কেন, নীতি নিয়মের বন্ধন তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। একটু শিথিল হলে আর রক্ষা নেই। প্রকৃতি কোন শৈথিল্যকে ক্ষমা করে না, অনিয়মকে সহ্য করে না। সে একদিন না একদিন শোধ নেয়।'

সব সময় যে বৈদ্যনাথ নিজের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে বলতে পারেন তা নয়। অনেক পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করেন। মনে হয় যেন মুখস্থ বলছেন। অরুণ মামার এই দার্শনিকতায় আড়ালে গিয়ে হাসে। কিন্তু বিজু হাসে না। পুরনোই হোক আর যাই হোক, মতের সঙ্গে মিলুক আর না মিলুক, বৈদ্যনাথের জীবন-দর্শন স্পষ্ট। বিশ্বাসের ভিৎ খুব দৃঢ়।

সব সময়েই তাঁর একটা স্পষ্ট মতামত আছে। ভাল-মন্দ কোন কিছু সম্বন্ধে সংশয় সন্দেহের ধার ধারেন না বৈদ্যনাথ। বিজুকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রীতি বলল, 'আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলছি নে। তোমাদের ফাংশনে তুমি একাই যেয়ো।'

বিজু বলল, 'দেখা যাক।'

সন্ধ্যার দিকে বাসন্তীর কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসল বিজু, 'প্রীতি আমার সঙ্গে একটু যাবে পিসীমা?'

বাসন্তী বললেন, 'ওমা ও আবার কোথায় যাবে এই রাত্রে!'

বিজু বলল, 'রাত বেশি হবে না, সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যেই আমরা ফিরে আসব।

বাসন্তী বললেন, 'বিষয়টা কি?'

বিষয়টা আর কিছুই নয়, রঙমহলে তাদের 'মিলন-সঙ্ঘের' উদ্যোগে একটা চ্যারিটি শো-এর ব্যবস্থা হয়েছে। সেই উপলক্ষে গান-বাজনার অনুষ্ঠান হবে। প্রীতি তো এসব খুব ভালোবাসে। তাই তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চায় বিজু। বাসন্তী বললেন, 'আমার তো কোন আপত্তি নেই। তোর পিসেমশাইও হয়তো তেমন কিছু বলবেন না। কিন্তু মা

আর দাদার খুঁৎখুঁতির কথা তো জানিস।' বিজু বলল, 'ওঁদের খুঁতখুতির কি মানে হয় পিসীমা? কত বাড়ির মেয়েরা আসবে সেখানে, ও তো আর একা যাচ্ছে না; এ সব জিনিষ ও ভালোবাসে বলেই ওকে যেতে বলছি। আর কাউকে তো নিতে চাইছি নে।' বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে অণিমাকে তার শ্বশুর এসে নিয়ে গেছেন। কিন্তু প্রীতির আরও দুই বোন আছে—ইলা ও নীলা, বিজুরও দুই বোন আছে—টুনু রুণু, তারাও এসে ঘিরে ধরল। প্রীতি যদি যায়, তারাই বা যেতে পারবে না কেন।

বিজু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কিন্তু টিকিট যে মাত্র দুখানা। আচ্ছা তোদের আর একদিন নিয়ে যাব, তোরা আর একদিন যাস।'

প্রীতি বলল, 'তার দরকার নেই, তুমি টুনুকেই নিয়ে যাও বিজুদা।'

টুনু ষোল উৎরে সতেরয় পড়েছে। সে এই প্রস্তাবে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'ঈস, আমি কেন যাব, যার জন্যে টিকিট আগে থেকেই কেটে রাখা হয়েছে, সেই যেতে পারবে।' কনকলতা আর বাসন্তী দুজনে এসে ছেলেমেয়েদের বিবাদ মিটিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল বিজু সবাইকে একদিন সিনেমা দেখাবে। টিকিটের দাম দেবেন বাসন্তী।

মীমাংসার পর প্রীতি আর বিজু বেরুতে যাচ্ছে ভুবনময়ী দোরের পাশ থেকে বললেন, সেজেগুজে কোথায় যাওয়া হচ্ছে এই সন্ধ্যার সময়?'

প্রীতি বলল, 'এই একটু ঘুরে আসি দিদিমা।'

ভুবনময়ী রুক্ষকণ্ঠে বললেন, 'ঘুরে আসবার আর সময় পেলে না। এই সন্ধ্যার সময় ঘরের মেয়ে বেরুচ্ছেন হাওয়া খেতে। যা কোন জন্মে দেখি নি তাই। কেন ঘরে বসে দুখানা বই পড়, কি সংসারের কাজ কর দুখানা।'

বাসন্তী এগিয়ে এলেন, 'তুমি যদি সব সময় ওদের সঙ্গে খিট খিট কর তাহলে ওরা কি ভাবে বলতো মা। ওদেরও তো একটু সাধ-আহ্লাদ আছে, ওদেরও তো দেখতে শুনতে ইচ্ছা করে। এই তো দেখবার শুনবার বয়স। তোমার মত তো ওরা বুড়ো হয়ে যায় নি।'

ভুবনময়ী রুষ্ট ভঙ্গিতে বললেন, 'বুঝতে পারছি। তোমাদের আস্কারাতেই এসব হচ্ছে। বেশ, যে ভাবে খুশি সেইভাবেই নিজেদের ছেলেমেয়েকে তোমরা গঠন কর। আমার কি, আমার কিছু বলতে আসাই অন্যায়।'

বাসন্তী আর কিছু বললেন না। কথায় কথা বাড়বে। মার আর দাদার এই অতিরিক্ত কড়াকড়ি তিনি পছন্দ করেন না। আজকালকার ছেলেমেয়েদের একটু স্বাধীনতা দেওয়া ভাল। আহা, তাদের তুলনায় ওরা কতটুকুই বা দেখে শুনে, কতটুকুই বা আনন্দ আহ্লাদ করে। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল বাসন্তীর। কিন্তু বিয়ের পর বহুদিন বাপমার কাছেই

কেটেছে। খুব বড়লোক না হোক অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন বাবা। মেয়ের সাধ আকাঙ্ক্ষা মেটাতে তিনি কার্পণ্য করতেন না। সার্কাস, থিয়েটার সব সঙ্গে করে করে দেখাতেন। সেই তুলনায় তাঁর মেয়েরা তো কিছুই দেখতে শুনতে পায় না, কোন রকম আমোদ স্ফূর্তি করে না। অথচ এই-ই শখ আহ্লাদের সময়। এর পর কোথায় কোন ঘরে পড়বে, রান্নাঘরে হাতবেড়ী নিয়ে আটকে থাকবে, সকাল থেকে রাত বারটা পর্যন্ত আর বেরুবার ফুরসুৎ পাবে না। তাঁদের মত খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকবার দিন তো ওদের পড়েই আছে। সেই জেল-হাজত ওদের কপালে এখনই কেন।

এই চার দেওয়ালঘেরা ছোট বাড়িটুকুর মধ্যে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন এইভাবে কাটাতে বাসন্তীর নিজেরই যেন এক এক সময় দম বন্ধ হয়ে আসে। আর তাঁর মেয়েদের আসবে না? বাসন্তীর নিজেরই তো এক এক সময় সব ফেলে বেরুতে ইচ্ছা করে। কিন্তু পারেন কই? একটা না একটা বাধা লেগেই থাকে। বাপের বাড়ি যদি দূর হত, দু-দিন গিয়ে সেখানেও থাকতে পারতেন। কিন্তু নিজেদের বাড়ির মধ্যেই বাপের বাড়ি হওয়ায় তাঁর সে সুখও গেছে। কনকলতা বছরে একমাস দেড়মাস করে বাপের বাড়িতে কাটিয়ে আসে, জা সুরমা আরও বেশি দিন থাকে, কিন্তু বাসন্তীর আর কোথাও নড়া হয় না। তাঁর ছুটি নেই। ঝগড়া-ঝাটি না থাকলে জামাইষষ্ঠীর দিনে কি পূজোর মধ্যে একটি দিন দাদা তাঁদের খেতে বলেন, কিন্তু তাতে কি বাপের বাড়ি যাওয়ার সাধ মেটে? তাতে কি একদিনের জন্যেও আরাম বিশ্রাম পাওয়া যায়? বিশ্রাম তো দূরের কথা কনকলতা যখন বাপের বাড়ি যান দুটি সংসারের ভারই বাসন্তীর উপর পড়ে। কিন্তু ভার বহনে কষ্টই হয়, আগের মত আনন্দ আর মেলে না। রোজকার হিসাব রোজ বৈদ্যনাথকে বুঝিয়ে দিতে হয়, সব সময় আশঙ্কা থাকে কনকলতা ফিরে এলে তাঁর কাছে কোন্ কৈফিয়ত দিতে হবে, কি জবাবদিহি করতে হবে তাঁর কাছে। তাই ভার নিয়েও শান্তি থাকে না বাসন্তীর মনে। অথচ চোখের ওপর মাকে খাটতে দেখে, দাদাকে মেয়েলি কাজে হাত দিতে দেখে, ছেলেমেয়েগুলির অসুবিধা দেখে ভার না নিয়েও বাসন্তী পারে না। ফলে মেজাজ আরও খিটখিটে হয়, কথাবার্তায় ঝাঁজ বাড়ে। বাসন্তীর মনে হয় এই সংসারের ভিতর থেকে একটু বেরুতে পারলে হত। কিন্তু বেরুতে পারেন না। তাই মেয়েরা যখন এক আধ দিন বাইরে যাবার আবদার করে বাসন্তী বাধা দেন না, বরং সাহায্য করেন। ওদের আমোদ আহ্লাদের ভিতর দিয়ে নিজেও যেন খানিকটা আনন্দ বোধ করেন। ওদের বেরুনো যেন নিজেরই বেরুনো।

রাস্তায় নেমে প্রীতি বলল, 'দূর, আমার না আসাই ভাল ছিল। জনে জনের কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে আসা। এভাবে আসতে কি ভাল লাগে?'

বিজু বলল, 'কেন, এই তো ভাল। এক আধটু বাধা বিপত্তি না ঠেলে আসতে পারলে মজা কিসের।'

প্রীতি বলল, 'তুমি আছ তোমার মজা নিয়ে। কেউ চোখ রাঙাবে, কারোও চোখ টাটাবে, আমার ভারি খারাপ লাগে। টুনিটা কি রকম বিশ্রী বিশ্রী সব কথা বললে শুনলে তো?'

বিজু বলল, 'বললই বা, ওদের কথায় কি এসে যায়। ওদের ফাঁকি দিয়ে তুমি একা একা বেড়াতে বেরোবে, গান শুনে নেবে আর ওরা টুঁ শব্দটি করবে না, তাই বা কি করে হয়?'

প্রীতি প্রতিবাদ করে বলল, 'ফাঁকি তো আমি ওদের দিতে চাই নে, দিলে তুমিই দিয়েছ। আর মিছামিছি বদনাম দিচ্ছ আমাকে।'

বিজু বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা যত দোষ আমার। হল তো। এবার সাবধানে বাসে ওঠ। দেখ দয়া করে এ্যাকসিডেণ্ট-টেণ্ট ঘটিয়ে বসো না যেন।

প্রীতি হেসে বলল, 'আহাহা, অতই আনাড়ি পেয়েছ বুঝি আমাকে।'

শ্যামবাজারগামী একটা বাস থামিয়ে প্রীতিকে নিয়ে উঠে পড়ল বিজু। লেডীজ মার্কা একটা ছোট বেঞ্চে এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন। প্রীতিদের দেখে অপ্রসন্ন মুখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বিজু তাঁর জায়গা দখল করে প্রীতির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'ভদ্রলোকের মুখখানার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। যেন বিশ্ব সংসারের ওপর হাড়ে হাড়ে চটে গেছেন।'

প্রীতি লক্ষ্য করেছে। বিজু অমনিতে বেশ একটু গম্ভীর আর শান্তশিষ্ট ধরনের ছেলে। কিন্তু দুজনে এক জায়গায় হলে তার স্বভাব যেন বদলে যায়। কথাবার্তায় কেমন একটু প্রগলভ চাপল্য আসে বিজুদার। এই তরলতা অবশ্য ভালোই লাগে প্রীতির। বিজু তার কাছে যা, টুনুদের কাছে ঠিক তা নয়, আবার গুরুজনদের কাছে ঠিক অন্যরকম। একজন লোকেরই ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। একজন মানুষ ঠিক একজন নয়, অনেকজন ভেবে ভারি অদ্ভুত লাগল প্রীতির।

বিজুর কথার জবাবে গলা নামিয়ে বলল, 'তুমি তো ভারি নিষ্ঠুর বিজুদা। ভদ্রলোককে একে তো উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করেছ, তার ওপর ওঁকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা শুরু করলে? তোমার মনে মোটে মায়া মমতা নেই?'

বিজু বলল, 'তাই নাকি। আর তোমার মনে যত রাজ্যের মমতা এসে বাসা বেঁধেছে। ভদ্রলোক তোমার জন্য উঠতে বাধ্য হয়েছেন, আমার জন্যে নয়। বেশ আমি উঠে যাচ্ছি। ভদ্রলোক এসে বসুন এখানে।'

বলে বিজু ছদ্ম রাগে উঠতে যাচ্ছিল, প্রীতি তাড়াতাড়ি ওর হাত চেপে ধরল, 'কি

যা তা করছ। লোকে কি ভাববে বলতো।'

সত্যি সে যে এক-বাস লোকের মধ্যে বসে আছে সে যেন বিজুর খেয়াল ছিল না। নিজের চাপল্যে একটু লজ্জিত হল বিজু। তারপর শান্ত গম্ভীরভাবে সামনের দিকে তাকাল।

বিডন স্ট্রীটের মোড ছাড়িয়ে বাস দ্রুত শ্যামবাজারের দিকে এগিয়ে চলেছে।

গেটের কাছে বিজুরই বয়সী একটি যুবক স্মিতমুখে তাদের অভিনন্দন জানাল, 'এই যে বিজু, এসো এসো, আমরা ভাবলাম তুমি বুঝি আর এলেই না, বই ছেড়ে তুমি উঠে আসতে পারবে কিনা আমরা সকলেই সন্দেহ করছিলাম।'

বিজু বলল, 'হুঁ, তোমরা তো ওই রকমই ভাব। পড়াশুনো যেন কেবল আমিই করি, তোমরা তো কেউ বই ছোঁও না।'

তারপর প্রীতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এস, পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বন্ধু সীতেশ সেন। একসঙ্গে আমরা পড়ি। আর প্রীতি চন্দ, আমার—'

কিন্তু সীতেশ বিজুকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মৃদু হেসে আর একজন আগন্তুকের প্রবেশপত্র দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

প্রীতি যেতে যেতে বলল, 'তোমার বন্ধুটি তো ভারি অসভ্য, বিজুদা।'

বিজু বলল, 'কেন, অসভ্যতার কি দেখলে?'

প্রীতি আর কোন কথা বলল না।

মেয়েদের জন্যে আলাদা বসবার ব্যবস্থা। প্রীতি এগিয়ে যেতে একটু ইতস্তত করছিল, বিজু বলল, ভয় নেই, নিশ্চিন্তে বসো গিয়ে ওখানে। হারিয়ে যাবে না, যাবার সময় আমি ডেকে নিয়ে যাব।'

প্রীতি লজ্জিত হয়ে বলল, 'আহাহা।'

একদল অপরিচিত সুসজ্জিত তরুণী মেয়ের মধ্যে গিয়ে বসল প্রীতি। মুহূর্তের মধ্যে তার মনের দ্বিধা সঙ্কোচ উদ্বেগ ভাবনা মন থেকে মুছে গেল।

একটু বাদেই অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। কণ্ঠ-সঙ্গীত, যন্ত্র-সঙ্গীত ছাড়াও ছোট একটি গীতি-নাট্যের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। একখানা ছাপান প্রোগ্রাম হাতে ছিল প্রীতির। তার সঙ্গে প্রত্যেকটি বিষয় মিলিয়ে দেখতে লাগল। এমন আনন্দ যেন আর সে পায় নি। গান বাজনা আবৃত্তি অভিনয় সবই প্রীতির অদ্ভুত ভাল লাগল। আর আনন্দের এই সুযোগ দেওয়ার জন্যে বিজুর ওপর কৃতজ্ঞতায় ওর মন ভরে উঠল।

অনুষ্ঠান শেষ হল সাড়ে বারোটায়। প্রীতি ভিড়ের মধ্যে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল,

বিজু এসে বলল, 'এই যে এসো। ঈস, কত রাত করে ফেললে।'

রাত্রি বেশি হওয়ায় প্রীতির মনও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বিজুর কথার প্রতিবাদ করে বলল, 'আমি বুঝি রাত করলাম, তুমি আমাকে ডাকলে না কেন।'

রাস্তায় নেমে এসে বিজু হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তুমি এত মুগ্ধ হয়ে শুনছিলে যে, ডাকতে কষ্ট হল। সত্যি গান বাজনা তুমি খুবই ভালবাসো প্রীতি। যদি সুযোগ সুবিধা পেতে তুমিও এ সব ফাংশনে গাইতে-টাইতে পারতে।'

প্রীতি বলল, 'থাক ওসব কথা আর বলো না। বলে পড়াটাই হল না, আর গান! কিছুই হবে না। মাঝে মাঝে মনে হয় সমস্ত জীবনটাই এমনি করে ব্যর্থ হয়ে যাবে বিজুদা।'

বিজু বলল, 'দূর জীবনের এই তো শুরু। এরই মধ্যে সমস্ত জীবনের কথা ভাববার কি হয়েছে।'

হাতের ইশারা করে বিজু একটা রিক্সা ডাকল।

প্রীতি বলল, 'আবার রিক্সা কেন। বাসে গেলেই তো তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। শেষ বাস এখনও পাওয়া যেতে পারে।'

বিজু বলল, 'না না রিক্সাই ভাল। বাসে বড় ভিড়। রিক্সায় দুজনে কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে।'

রিক্সায় দুজনে উঠে বসল। নির্জন পথ। আকাশে চাঁদ। এত রাত্রে এমনভাবে একসঙ্গে দুজনে আর চলাফেরা করে নি। ভারি অদ্ভুত, ভারি বিচিত্র আর নতুন মনে হতে লাগল সব কিছু।

বিজু বলল, 'বেশ লাগছে, না?'

প্রীতি ঘাড় নেড়ে বলল, 'হুঁ।'

বিজু বলল, 'এই একটু আগে তুমি সারাজীবন ব্যর্থ হয়ে গেল বলে আক্ষেপ করছিলে। এখন কি অন্য রকম মনে হয় না? এখন কি আর কোন আফসোসের কথা মনে পড়ে?'

প্রীতি বলল, 'আহা, কিসে আর কিসে। সত্যি, পুরুষ, ছেলে হওয়া অনেক সুবিধা।'

বিজু বলল, 'কেন, হঠাৎ একথাটা তোমার মনে হল কিসে, মেয়ে হওয়াতেই বা অসুবিধে কি?'

প্রীতি বলল, 'অসুবিধে নেই? তুমি কত স্বাধীন। ইচ্ছামত পড়াশুনা করছ। যখন খুশি তখন বাইরে বেরুচ্ছো। তোমার কত বন্ধুবান্ধব, আর আমি! আমি কি পাচ্ছি?'

বিজু সহানুভূতির স্বরে বলল, 'সত্যি। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি

নিজে যা পাচ্ছি তোমাকেও তাই দিতাম। লেখাপড়া গান-বাজনা শিখবার সব রকম সুযোগ দিতাম তোমাকে। স্বাধীনভাবে চলতে ফিরতে দিতাম।'

প্রীতি বলল, 'হুঁ, তুমি কর্তা হলে ঠিক বাবার মতই হতে, গোড়ায় সবাই ওই রকম বলে!'

বিজু বলল, 'মোটেই না। আমি সম্পূর্ণ অন্য রকম হতাম। আমি কিছুতেই স্বার্থপরের মত সব একা ভোগ করতাম না। একা ভোগ করলে ভোগ বলেই মনে হয় না। আর একজনকে ভাগ না দিলে, আর একজনের সঙ্গে ভোগ না করলে মনে হয় যেন আধখানা হল। পুরোপুরি পেলাম না। চ্যারিটি শোয়ের পাসটা যখন পেলাম, তখন তোমার কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, তুমি তো আমার চেয়েও বেশি গান-বাজনা ভালোবাস, তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাই, নিজে চেয়েচিন্তে জোগাড় করলাম আর একখানা। সাধারণত আমি এরকম করি নে। কিন্তু তোমার জন্যে—'

প্রীতি বললে, 'সত্যি তোমার জন্যেই এ-সুযোগটা পেলাম।'

রিক্সা এসে বাড়ির সামনে থামল। ভাড়া মিটিয়ে দুজনে সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বিজু কড়া নাড়তেই বৈদ্যনাথ এসে দোর খুলে দিলেন। তিনি বাইরের ঘরেই ছিলেন। কঠিন গম্ভীর তাঁর মুখ।

বিজু আর প্রীতি মাথা নীচু করে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু বৈদ্যনাথ পথ আগলে দাঁড়ালেন; ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দাঁড়া, কোথায় ছিলি এতক্ষণ পর্যন্ত?'

বিজু ক্ষীণ স্বরে বলল, 'একটা চ্যারিটি শো—'

বৈদ্যনাথ ধমক দিয়ে বললেন, 'চ্যারিটি শো! পরীক্ষার আর ক'মাস বাকি শুনি? পড়াশুনো সব গেছে। উনি চ্যারিটি শো করে বেড়াচ্ছেন। তা আবার একা নয়। একটা ধাড়ী মেয়েকে আবার সঙ্গে জুটিয়ে নেওয়া হয়েছে, নইলে তো আড্ডা জমে না। আস্কারা পেয়ে সব একেবারে মাথায় উঠেছ, না?'

বাসন্তী ঘুমোন নি। রান্নাঘরের কাজ মিটিয়ে কেবল নিজের ঘরে গিয়ে বসেছিলেন, চেঁচামেচি শুনে নিচে নেমে এলেন। ফিরতে এত বেশি দেরি করার জন্যে তিনিও বকলেন দুজনকে। তারপর দাদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আহা থাম। না হয় গান শুনতে গিয়ে একটু দেরিই করে ফেলেছে, রোজ তো আর এমন হয় না। তার জন্যে অত শাসন কিসের?'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'না, শাসন করবে কিসের, আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে আস্কারা দিয়ে দিয়ে তোর মত মাথায় চড়িয়ে রাখবে। নিজের ছেলেমেয়েগুলি তো গেছেই, যতদূর

বকাটে হবার হয় হয়েছে, এখন বাড়ির আর সব ছেলেমেয়েগুলি একটু ভালো থাকবে, তার জো নেই। তা তুই আর থাকতে দিবি নে। বাড়ির সবগুলি ছেলেমেয়ে নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তুই থামবি নে।'

বাসন্তী বললেন, 'দাদা, একথা তুমি বলতে পারলে? আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে তোমার ছেলেমেয়েরা নষ্ট হচ্ছে? এই কথা বললে তুমি?'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'বলবই তো। হাজারবার বলব। একটা পচা আপেল থলির সবগুলি আপেল নষ্ট করে তা জানিস? আমি সব সময় একটা প্রিন্সিপল্ নিয়ে চলি, পাড়ার কোন বাজে সংসর্গে ছেলেদের মিশতে দিই নে। কিন্তু আমার বাড়ির মধ্যেই অসৎ সঙ্গের বাসা, পাড়া সম্বন্ধে সাবধান হয়ে আমি কি করব, নইলে বিজুর সাহস কি পড়াশুনো ছেড়ে রাত একটা পর্যন্ত বাইরে বাইরে কাটায়?'

বাসন্তী স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। বিজু চলে যাচ্ছিল তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'শোন বিজু, তোমাকে আমি এই বলে রাখলুম, আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এরপর তোমরা আর মিশতে এসো না। আমাদের সঙ্গে কোন কথাবার্তা পর্যন্ত বলতে এসো না তোমরা। আমার ছেলেমেয়েরা খারাপ আছে সেই ভাল। তোমাদের আর খারাপ হয়ে দরকার নেই। খারাপ সংসর্গে গিয়ে কাজ নেই তোমার।'

ভুবনময়ী শুয়ে পড়েছিলেন। তিনি উঠে এসে ভাইবোনের ঝগড়া থামাতে চেষ্টা করে বললেন, 'তোরা কি হয়েছিস বল তো, বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে যে এত চেঁচামেচি শুরু করেছিস তোরা, ছেলেবেলায়ও তো এত ঝগড়া বিবাদ তোরা করিস নি। আর এই বুড়ো বয়সে—'

মা'র কথার কোন জবাব না দিয়ে বাসন্তী মেয়েকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তারপর কঠিন স্বরে মেয়েকে শাসন করে বললেন, 'খবরদার, ফের যদি ওদের ঘরে পা বাড়াতে দেখি, আমি তোমাকে আস্ত রাখব না। বিজুদা, বিজুদা, বিজুদার জামা, বিজুদার কাপড়, বিজুদার জুতো দিনরাত তো বিজুদার জিনিসপত্রের তদারক নিয়েই আছিস। আজ হল তো শিক্ষা? শুনলি তো সব? যদি একটুও মান-অপমান বোধ থাকে তাহলে ভুলেও আর ও-মুখো হবি নে। কানে যাচ্ছে কথা?'

প্রীতি বলল, 'যাচ্ছে মা।'

বাসন্তী আবার বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাকে আমি স্পষ্ট নিষেধ করে দিলাম, ওদের ছেলেমেয়ে কারো সঙ্গেই মিশতে পারবে না তোমরা। পড়াশুনো গল্পগুজব যা করবার নিজেদের ঘরে বসে নিজেদের ভাই-বোনের সঙ্গে করবে, ওদের সঙ্গে মেলামেশার মোটেই

দরকার নেই আর।'

অবনীমোহন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রীর চেঁচামেচির শব্দে তাঁরও ঘুম ভেঙে গেল। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার! রাত দুপুরে আবার কি হল তোমার?'

বাসন্তী বললেন, 'যা হবার হয়েছে। তুমি ঘুমুচ্ছ ঘুমোও, তুমি তো সংসারের সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তোমার আর কি। কারো মান-অপমানের ধার তো তোমাকে ধারতে হয় না।'

প্রীতির মন এক অদ্ভুত বিতৃষ্ণা আর বিস্বাদে ভরে উঠল। এই খানিকক্ষণ আগে জলসার গান-বাজনা শুনতে শুনতে কি আনন্দই না পেয়েছিল। আর তার পরিণতি হল এই কুশ্রী ঝগড়ায়। বিজুর ওপরও তার ভয়ঙ্কর রাগ হল। জানাই তো আছে যে তার বাবা এসব পছন্দ করেন না। তবু কেন জলসায় প্রীতিকে বিজু সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। সে না বললে তো আর প্রীতি যেত না। প্রীতি জানতেও পারত না। বিজুর জন্যেই মাকে এমন অপমান সহ্য করতে হল। দিন কয়েক মায়ের নির্দেশ প্রীতি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলল। বিজুর সঙ্গে কোন কথা বলল না। কোন পড়া বুঝবার জন্যে গেল না তার কাছে। শুধু বিজুর সঙ্গেই না, মামাত ভাই বোন সকলের সঙ্গেই সে কথা বন্ধ করল। বিজুও ক'দিন খুব গম্ভীর হয়ে রইল। এমন ভাব করল যেন প্রীতিকে সে চেনেই না। যেন সামান্য আলাপ পরিচয়ও নেই পরস্পরের সঙ্গে।

কিন্তু দুজনেরই মনটা খারাপ হয়ে রইল। যেন সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ আর শূন্য হয়ে গেছে।

একদিন বিকেলে চিলকোঠার আড়ালে প্রীতি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে কেবল বাড়ি আর বাড়ি। প্রাচীর আর প্রাচীর। এই নিষেধের বেড়া পার হয়ে আর বেরোবার জো নেই। সারাজীবন যেন এই বন্দীদশার মধ্যে কাটবে। কিসের এই শূন্যতা প্রীতি তা বুঝে উঠতে পারে না। আর ভাইবোন তো এর মধ্যেই সন্তুষ্ট। যা পাচ্ছে তাই নিয়েই খুশী। কিন্তু প্রীতি কি চায়। সে কেন খুশী হতে পারে না, কি হলে কি পেলে মনের এই শূন্যতা কাটে।

হঠাৎ প্রীতি চমকে উঠল। পিছন থেকে কে যেন আস্তে আলগোছে তার কাঁধে হাত রেখেছে।

প্রীতি মুখ ফিরিয়ে দু-পা পিছিয়ে গেল, বলল, 'যাও এখান থেকে। তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

বিজু প্রীতির রাগ দেখে একটু হেসে বলল, 'তাই নাকি!'

প্রীতি বলল, 'তাই নাকি মানে। সেদিন তোমার বাবা মাকে কি অপমানটাই না

করলেন আর তুমি একটা কথা পর্যন্ত বললে না, অথচ তোমার জন্যেই তো এমন হল। কিন্তু আশ্চর্য, একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত তোমার মুখ থেকে বেরুল না!'

বিজু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'মুখে প্রতিবাদ করে লাভ কি হত, তাতে ঝগড়াঝাটি বাড়ত ছাড়া কমত না। প্রতিবাদ করি তো আমরা কাজের ভিতর দিয়েই করব। এখন যেমন করছি।'

প্রীতি আর কোন কথা বলল না। কিন্তু বিজুর কথা বলার ভঙ্গি ওর ভারি ভাল লাগতে লাগল। মুহূর্তপূর্বের নীরবতা যেন আর নেই। সব শূন্যতা ফের ভরে উঠেছে।

একটু বাদে এদিকে কার পায়ের সাড়া পেয়ে বিজু চলে গেল। ঝগড়ার পরিসমাপ্তিতে দু-জনের মনেই শান্তি এসেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে ঝগড়ার সম্পর্ক যে আর নেই একথা বাইরে অন্য কাউকে তারা বুঝতে দিল না। আর সকলের সামনে তারা আগের মত মুখ ভার করেই চলে। পরস্পরের আত্মীয়তাকে স্বীকার করে না। কিন্তু রোজ দু-একবার করে বাড়ির অন্য সকলের চোখের আড়ালে তাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। বিনিময় হয় মাত্র দু-একটা কথার। কিন্তু সেই দু-একটা কথা যেন শুধু দু-একটা কথাই নয়, সেই দু-এক মিনিটের ব্যাপ্তিও অনেকখানি।

দুই পরিবারের ঝগড়া ফের মিটে গেল। বাসন্তী বৈদ্যনাথের সঙ্গে আবার কথাবার্তা বলতে লাগলেন। কিন্তু বিজু আর প্রীতির লোক-দেখানো মনোমালিন্য সহজে মিটল না। বাড়ির অন্য সকলের সামনে পরস্পর সম্বন্ধে তাদের ঔদাসীন্য অবজ্ঞার যেন আর সীমা নেই। কিন্তু সকলের চোখের আড়ালে মনের অবস্থাটা অন্যরকম।

এই লুকোচুরির মধ্যে যেন তারা এক নূতন রহস্যের আভাস পেয়েছে। স্বাদ পেয়েছে এক বিচিত্র সম্পর্কের।

অনেক খোঁজখবর চেষ্টা-চরিত্রের পর শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি মিলল করবীর। কোন অফিস-টফিসে নয়, পদ্মপুকুর বিদ্যাপীঠে। মেয়েদের হাইস্কুলে। কিন্তু মাইনে বড় কম। মাসে চল্লিশ টাকা। গ্রাজুয়েট হলে ষাট হত। খোঁজটা অরুণই নিয়ে এল। বলল, 'করবেন? এত অল্প টাকায় কি পোষাবে আপনার?' করবী বলল, 'না পোষালে উপায় কি—এখন যা পাই তাই নিতে হবে।'

অরুণ বলল, 'বেশ, তাহলে একদিন চলুন আমার সঙ্গে। মিসেস দত্তের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

মাধবী দত্ত অরুণেরই এক প্রফেসর বন্ধুর স্ত্রী। মনোহরপুকুর রোডে একটি ফ্ল্যাট নিয়ে সস্ত্রীক থাকেন প্রফেসর দত্ত। তাঁর স্ত্রী পদ্মপুকুর বিদ্যাপীঠের হেডমিস্ট্রেস।

আগে থেকে ব্যবস্থা করে করবীকে নিয়ে এক রবিবারে তাঁদের বাসায় গিয়ে দেখা করল অরুণ।

কথাবার্তা অরুণ মোটামুটি আগেই বলে রেখেছিল। নতুন করে বেশি কিছু আর বলতে হল না। মাধবীদেবী করবীদের আপ্যায়ন করে ড্রয়িং-রুমে বসালেন। চা, খাবার আনালেন। দু-চার কথা জিজ্ঞেস করার পর বললেন, 'আচ্ছা, একখানা এ্যাপ্‌লিকেশন আপনি কালই পাঠিয়ে দেবেন। একজন টিচার আমাদের নিতেই হবে। আপনার জন্যে আমি অবশ্যই চেষ্টা করব।'

ইংরেজীতে টাইপ করা আবেদনপত্র করবী সঙ্গে করেই এনেছিল। হেডমিস্ট্রেসের কাছে সেখানা রেখে গেল।

সেক্রেটারীর কাছে আর একদিন ইণ্টারভিউ দিতে হল করবীকে। তার দিনকয়েক পরই এল নিয়োগপত্র।

টিউশনি সেরে অরুণ এল রাত্রে দেখা করতে। বলল, 'চাকরি সত্যিই পেলেন তাহলে?'

করবী কৃতজ্ঞতার সুরে বলল, 'পেলাম, আপনার জন্যেই পেলাম। সত্যি আপনার নিজেরও তো চাকরি-বাকরি নেই। তবু এতদিন ধরে আমার জন্যেই আপনি চেষ্টা করেছেন।

অরুণ একটু হেসে বলল, 'না, যতটা পরার্থপর আমাকে মনে করেছেন, আমি ততটা নই। চেষ্টা দুজনের জন্যেই চালাচ্ছিলাম, একজনের অপাতত কিছু একটা হল। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় এ কিছুকে সামান্য কিছুও বলা যায় না। তবু একেবারে বেকার থামার চেয়ে—'

করবী বলল, 'তা তো ঠিকই।'

মাসখানেক পরে আরও একটু সুবিধা হল। পর পর দুটো টিউশনিও জুটে গেল করবীর। দুটোয় মিলে পঞ্চাশ টাকা। স্কুলের মাইনের চেয়ে বেশি। অবশ্য স্কুলে হেডমিস্ট্রেসের যোগাযোগেই টিউশনি দুটো জুটলো।

অরুণ খবর পেয়ে বলল, 'বেশ তো, আপনি নেহাৎ কম স্বার্থপর নয় দেখছি। পটাপট ভাল ভাল চাকরি আর টিউশনি জুটিয়ে নিচ্ছেন। আর আমি যে বেকার সেই বেকারই রয়ে গেলাম।'

করবী লজ্জিত হয়ে বলল, 'সত্যি, এবার আপনার জন্যেই আমার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু জানেন তো, আমাদের সাধ্যের সীমা।'

অরুণ বলল, 'থাক থাক, আপনাকে আর বিনয় করতে হবে না। আপনার সাধ্য কম নাকি?'

করবী বলল, 'কম নয়? কিসে বেশি দেখলেন বলুন?'

অরুণ সংক্ষেপে বলল, 'দেখছি।'

সাড়ে দশটায় স্কুল বসে। রোজ দশটার মধ্যে করবীকে বেরিয়ে পড়তে হয়। স্নান সেরে তৈরী হয়ে নিতে হয় তারও আগে। প্রথন প্রথম ক'দিন রান্নাও করত, কিন্তু ব্লাডপ্রেসারটা একটু কমে যাওয়ার পর শাশুড়ী নিজেই এসে বসলেন রাঁধতে। করবী আপত্তি করে বলেছিল, 'এ কি, আপনি এলেন কেন ?' নিভাননী বললেন, 'কদিন আমিই রাঁধি। তোমার তো কষ্ট হয়।'

করবী বলল, তাই বলে আপনি কেন রাঁধবেন। না না তা হবে না।'

নিভাননী এবার কড়া ধমক দিলেন পুত্রবধূকে—হবে না মানে ? তুমি কি সত্যিই একটা শক্ত অসুখ-বিসুখ ঘটাতে চাও করবী ? দিন-রাত এই খাটুনি, তারপর ফের যদি তুমি আগুনের তাপে এসে বসো, তাহলে কি শরীর থাকবে ? করবী বলল, 'কিন্তু আপনার শরীর তো ভাল নয় মা, এই বয়সে আগুনের তাপ আপনারই বা সইবে কেন ?

নিভাননী জবাব দিয়েছেন, 'সইবে সইবে। আগুনের তাপে আমার কিছু হবে না। রাঁধা-বাড়ার অভ্যাস আমার না আছে তা তো নয়। বসে বসে রাঁধব, তাতে কি এমন হবে। কিন্তু বেশি অত্যাচার অনাচার করে তুমি যদি শুয়ে পড়ো তাহলে আর উপায় থাকবে না।'

তারপর থেকে নিভাননী নিজেই রান্না-বান্না শুরু করলেন।

কাজে বেরুবার আগে করবী আসন পেতে গিয়ে খেতে বসে।

নিভাননী নিজের পুত্রবধূকে নিরামিষ তরকারীর সঙ্গে ভাত বেড়ে দেন। পাতের সামনে বসে খাওয়ার তদারক করেন। করবীর মনে পড়ে, তার স্বামী পরেশ যখন অফিসে যাওয়ার আগে খেতে বসত, তখনও নিভাননী তার পাতের কাছে বসে এইরকম করতেন। কম খাওয়ার জন্যে অনুযোগ আর বেশি খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতেন রোজ। ছেলে মারা যাওয়ার পর আজ ছেলের বউ সেই জায়গা নিয়েছে। করবীর রোজগারেই এখন সংসার চলবে।

তার ওপরই সবাইকে নির্ভর করতে হবে। তার শরীর যাতে একটু সুস্থ থাকে সে কাজকর্মে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, সে সম্বন্ধে লক্ষ্য না রাখলে চলে না।

দিন কয়েক পরে দিলীপ করবীর খাওয়ার সময় খুরিতে করে দু-আনার দই নিয়ে এল।

করবী বলল, 'ও আবার কি ?'

দিলীপ বলল, 'খাও বউদি। নিরামিষ খেতে তোমার তো ভারি কষ্ট হয়। পেট ভরে তো খেতেই পার না। মার না হয় খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে গেছে। তোমার তো আর হয় নি। কিন্তু একেবারে না খেলে শরীরই বা থাকবে কি করে ?

করবীর চোখ ছলছল করে উঠল। এই ছোট্ট দেওরের এত দরদ তার ওপর। স্বামী গেছেন। করবী ভেবেছিল, একজনের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি সবাই গেছে। কিন্তু সব তো যায় নি। তিনি তাঁর স্নেহ মমতা রেখে গেছেন এদের মধ্যে। ছেলে, দেওর আর শাশুড়ীর আদর যত্নের মধ্যে যেন স্বামীরই সেই ভালোবাসার স্বাদ পেল করবী। না, সব শূন্য হয় নি। সব শূন্য হয় না। রাখতে জানলে একজন গেলেও সব ভরে রাখা যায়। তার স্মৃতি দিয়ে সব ভরে রাখতে হয়। দইয়ের সবটুকু ঢেলে নিল না করবী। আধাআধি নিয়ে বাকিটুকু খুরিতে রেখে দিল।

নিভাননী বললেন, 'ওকি ওইটুকু দই, তার আবার রাখলে কেন ?'

করবী বলল, 'থাক একটু, দিলু আর পিপলুকে দেবেন।'

নিভাননী হেসে বললেন, 'আর আমি বুঝি বাদ যাব। কিন্তু কেবল দিলু আর পিপলুই বা কেন তোমার ওই ছোট দইয়ের খুরির ভাগ দেওয়ার জন্যে। দেখ পাড়া-পড়শীদের আর কাকে কাকে ডেকে আনবে।'

দিলীপ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, সেও হাসল, বলল, 'বউদি তোমার দই কি গল্পের সেই দীনবন্ধুদার দইয়ের মত যে, খুরি থেকে যত ঢালবে, ততই ভরে উঠবে ?'

করবী কোন জবাব দিল না। মনে মনে ভাবল, মাঝে মাঝে হৃদয় সেই দীনবন্ধুদাদার খুরি হতে চায় বটে, এক ফোঁটা করুণা, পৃথিবীর কাছ থেকে সামান্য একটু সদয় ব্যবহারে শুকনো, শূন্যহৃদয় অমৃতে এমন কানায় কানায় ভরে ওঠে যে, মনে হয় সবাইকে সেখানে নিমন্ত্রণ করে না আনতে পারলে যেন তৃপ্তি নেই। মনে হয়, যে দাক্ষিণ্য নিজে পেয়েছি, তা সবাই পাক ; যে মাধুর্যের স্বাদ নিজে অনুভব করেছি, তার অমৃত-স্বাদে সমস্ত পৃথিবী মধুর হয়ে উঠুক।

খাওয়া সেরে স্কুলে যাওয়ার জন্যে তৈরী হল করবী। কালো ফিতেপেড়ে ফর্সা শাড়িখানা পরে নিল। বেরুবার আগে স্বামীর ফটোর সামনে এসে দাঁড়াল করবী। রোজই দাঁড়ায়। মনে মনে অনুমতি নেয়। না, পরেশের কোন গোঁড়ামি ছিল না। মেয়েদের চাকরি-বাকরি করা সে পছন্দ করত। করবী বলত, 'তাহলে আমাকে দাও কিছু একটা যোগাড় করে।'

পরেশ বলত, 'দেব বইকি। যখন দরকার বোধ করব, নিশ্চয়ই দেব।'

কিন্তু পরেশের দরকার বোধ করবার দরকার হয় নি। তার আগেই সে চলে গেছে। আর সমস্ত প্রয়োজনের বোঝা চেপেছে আজ করবীর ঘাড়ে। কিন্তু তার জন্যে দুঃখিত নয় করবী। বিধবা হয়ে অন্যের আশ্রয়ে যে তাকে ভিক্ষা করতে হয় নি, বরং দেওর শাশুড়ীকে আশ্রয় দিতে পেরেছে, এর জন্যেই নিজের ভাগ্যকে সে ধন্যবাদ দেয়। নিজের

এই শক্তি-সামর্থ্য, মনের এই সাহস যেন তার চিরকাল থাকে। স্বামীর কাছেই যেন প্রার্থনা জানাল করবী প্রতিকৃতির মধ্যে পরেশের মুখ শান্ত, গম্ভীর, প্রশান্ত। তার স্নিগ্ধ দুটি অপলক চোখ করবীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। করবী মনে মনে বলল, 'হ্যাঁ, এমনি করেই তাকিয়ে থেক তুমি। এমনি করেই সব সময় আমাকে দেখ। তুমি আমার নয়নে নয়নে রেখ অন্তর মাঝে।'

'মা আমাকে ওই তাজমহলটা দাও না। আমি খেলব।'

পিপলুর কথায় চমকে উঠে করবী তাড়াতাড়ি মুখ ফেরাল। দুষ্টু ছেলে করেছে কি, চেয়ারটা টেনে নিয়ে গেছে কাঁচের আলমারীর কাছে। তারপর তার একটা পাল্লা ধরে ক্রমাগত টানাটানি করছে। ভিতর থেকে ছোট তাজমহলটা সে বের করবে। বের করে খেলবে।

ছেলেকে একটু ধমক দিল করবী, 'ও কি হচ্ছে ?'

পিপলু আবার বলল, 'আমাকে তাজমহলটা দাও না মা !'

করবী বলল, 'ছিঃ, এই দামী জিনিস দিয়ে কেউ খেলে না কি ?'

পিপলু বলল, 'খেলে না ? তবে কি করে ?'

করবী বলল, 'ঘরে তুলে রাখে, ঘর সাজিয়ে রাখে।'

কিন্তু পিপলু নাছোড়বান্দা। আজ ওই তাজমহলটা তার চাই-ই।

বিরক্ত হয়ে শাশুড়ীকে ডাকল করবী, 'মা, পিপলুকে নিয়ে যান তো এখান থেকে। বড় দুষ্টুমি শুরু করেছে।'

নিভাননী এসে ঘরে ঢুকল—'কি হয়েছে কি, সারাদিন তো তোমাকে দেখতে পায় না, তাই যাবার সময় এক-আধটু মাতলামি করে। সেজন্যে কি অমন করে ধমকাতে হয়। কি চাইছে কি ও ?'

করবী বলল, 'ওই তাজমহলটা চায়। দেখুন দেখি আবদার !'

নিভাননী নাতিকে কোলে টেনে নিতে নিতে বললেন, 'ছিঃ, কাজের জিনিস কি নেয় নাকি দাদু ?' তারপর করবীর দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। 'এটা তো অরুণ কিনে দিয়েছিল না বউমা, আচ্ছা, কি হয়েছে ছেলেটির বল তো ? কতদিন ধরে আসে না—একবার খোঁজ নিলে হয়।'

কথাটা নিজেও ভাবছিল করবী। নিজের মনের কথা শাশুড়ীর মুখে শুনতে পেয়ে ভারি খুশী হল। বলল, 'হ্যাঁ, খোঁজ নিতে হবে। ক'দিন ধরে আসছেন না আর। অসুখ-বিসুখ হয়ে পড়ল কি না কে জানে।'

হঠাৎ অরুণের জন্যে করবী মনে মনে বড় ব্যাকুলতা বোধ করল। বেশ আমুদে

ফূর্তিবাজ মানুষ। যতক্ষণ থাকেন, দিলীপ আর পিপলুকে নিয়ে খেলেন। হৈ-হল্লায় ছুটোছুটিতে সারা বাড়িটা বেশ সরগরম হয়ে উঠে। দু-একদিন বাদে বাদেই তো আসতেন। সেই মানুষের আজ প্রায় দিন সাতেক ধরে দেখা নেই। করবী নিজেও চাকরি আর নতুন টিউশনি নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে রয়েছে যে, আর কারো কথা ভাববারও সময় পায় নি। কিন্তু আজ যেন এই ক'দিনের বিস্মরণ তার শোধ তুলল। করবীর বার বার মনে হতে লাগল, অরুণের খবর তার একবার নেওয়া উচিত ছিল। অমন উপকারী বন্ধুর খোঁজ না নেওয়া তার অন্যায় হয়েছে।

বাইরের ঘরে দিলীপ বসে পড়ছে। করবী যাওয়ার আগে দিলীপের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

'দিলীপ শোন।'

'কি বউদি ?'

বইয়ের পাতা থেকে করবীর দিকে তাকাল দিলীপ।

করবী একটু ইতস্তত করে বলল, 'আচ্ছা, অরুণবাবুর কি হয়েছে জানো ? তিনি তো অনেক দিন আসেন না।'

দিলীপ বলল, 'জানি নে তো বউদি। তবে যদি বল স্কুলে খোঁজ নিতে পারি।'

করবী বলল, 'স্কুলে কি করে খোঁজ নেবে ?'

দিলিপ বলল, 'অরুণদা যে ছাত্রটিকে পড়ান, সে তো আমাদের ক্লাসেই পড়ে। তার কাছে জিজ্ঞেস করলেই হবে।'

করবী খুশী হয়ে বলল, 'ঠিক। তাহলে তার কাছেই একবার খোঁজ নিয়ে এসো। ভদ্রলোকের অসুখ-বিসুখ করল কি না কে জানে।' বলে করবী স্কুলে চলে গেল।

ছোট ছোট মেয়েদের ক্লাস। একটার পর আধঘণ্টা টিফিন আছে। ক্লাস সেরে খানিক-ক্ষণ বিশ্রামের জন্যে টিচারদের রুমে গিয়ে বসল করবী। সুলতা চাটার্জী স্কুলের সেকেণ্ড টিচার। বছর তিরিশেক বয়স। কিন্তু মিশতে পারে সব-বয়সী মেয়েদের সঙ্গে। করবী ঘরে ঢুকতেই তাকে ডেকে নিজের পাশের চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে আসুন, বসুন এসে এখানে।' করবী তার পাশে গিয়ে বসল।

সুলতা বলল, 'ভাল পড়াতে পারেন বলে এরই মধ্যে আপনার খুব নাম শুনছি মেয়েরা বলাবলি করছিল।'

করবী লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি যে বলেন !'

সুলতা বলল, 'আপনার গুণ থাকলে কি হবে দোষও আছে। সেকথাও কিছু বলব।'

করবী বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

সুলতা হেসে বলল, 'আপনি বড় অমিশুক। কারো সঙ্গে মিশবেন না, কথা বলবেন না, হাসি-গল্প করবেন না। শুধু মুখ বুজে কাজ করে যাবেন। তাহলে কি হয়? সে কাজে কি আর রস পাওয়া যায়। একেই তো এই মাস্টারীর মত কাজ। দু-বছর যেতে না যেতেই দেখবেন এমন একঘেয়ে বস্তু আর দুনিয়ায় নেই। যেটুকু সুখ, তা এই পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশায়। অমন করে মুখগম্ভীর করে থাকবেন না। লোকের সঙ্গে মিশবেন, আলাপ আলোচনা করবেন।'

করবী বলল, 'দেখুন, আগে খুব মিশতে পারতুম। আজকাল চেষ্টা করেও আর পারিনে। তেমন যেন ইচ্ছাই হয় না।'

সুলতা একটুকাল চুপ করে থেকে সহানুভূতির সুরে বলল, 'দেখুন, আমি সব শুনেছি। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, আপনার বুঝি বিয়ে-থা হয় নি, আপনাকে দেখলে কিন্তু তাই মনে হয়। পরে হেডমিস্ট্রেসের কাছে শুনলাম সব কথা। শুনে অবশ্য খুব দুঃখ হল। দুঃখেরই যে কথা। কিন্তু দুঃখ করে কি করব বলুন। আপনিই বা সেই দুঃখের কথা মনে রেখে কি করবেন। আপনাকে সব ভুলতে হবে।'

করবী একটু যেন চমকে উঠল—বলল, 'সব ভুলতে হবে!'

সুলতা বলল, 'ভুলতে হবে বইকি। সারাজীবন কি দুঃখ নিয়ে বাঁচা যায়।'

টিফিনের ঘণ্টা শেষ হওয়ার পর ফের ক্লাস আরম্ভ হল। মেয়েদের পড়াতে পড়াতে সুলতার কথাটা বার বার মনে পড়তে লাগল করবীর। সারাজীবন দুঃখ নিয়ে বাঁচা যায় না। তবে কি নিয়ে বাঁচা যায়, কি নিয়ে বাঁচবে করবী। স্বামীর সঙ্গে তো তার দুঃখের স্মৃতিই জড়ানো। দুঃখকে ভুললে যে তাকেই ভোলা হবে। কিন্তু তাই বা কেন। পাঁচ বছরের দাম্পত্যজীবনে সুখ-স্মৃতিও তো আছে। সেই সুখ-সম্ভোগের দিনগুলির কথা, রাতগুলির কথা মনে করে করে সারাজীবন কাটিয়ে দেবে করবী। সমস্ত জীবন সেই পাঁচ বছরকে অক্ষয় করে রাখবে। তার আর কোন সুখের প্রয়োজন নেই।

স্কুল ছুটির পরে টিউশনি। একই বাড়ির চার নম্বর আর ছ নম্বর ফ্ল্যাটে মাসখানেকের মধ্যে টিউশনি দুটি জুটে গেছে।

চার নম্বরে একটি ধনী ফার্নিচার ডিলারের পুত্রবধূকে পড়াতে হয়। ছ'নম্বরে পড়ায় ছোট ছোট দুটি মেয়েকে। দুই জায়গা থেকেই পঁচিশ টাকা করে পায়। প্রত্যেকটি টিউশনির পিছনে দেড় ঘণ্টা করে সময় যায়। সব মিলিয়ে তিন ঘণ্টা। কোন কোনদিন তার বেশিও লাগে।

কিন্তু আজ একটু সকাল সকালই ফিরতে পারল করবী। চার নম্বরের বউটি তার

স্বামীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে। তার শাশুড়ি বললেন, 'দেখুন দেখি, কি আক্কেল! সিনেমা দেখবে, রবিবার-টবিবার দেখলেই হয়। মিছামিছি একটা দিন নষ্ট।'

বাসায় আসবার সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ বলল, 'অরুণদার খবর পেয়েছি বউদি, ভালো খবর নয়।'

করবী একটু চমকে উঠে বলল, 'সে কি রে। কি হয়েছে তাঁর?'

দিলীপ বলল, 'না না, তেমন কিছু নয়। তাঁর এ পাড়ার টিউশনিটি গেছে।'

করবী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'ও তাই বল। তোমার ভূমিকা শুনে আমি ভেবেছিলাম, কি বিপদ-আপদই না জানি হয়েছে, কিন্তু টিউশনিটা গেল কি করে?'

দিলিপ বলল, 'ওঁদের বাড়িতে কি কোন টিউটরের বেশিদিন টিকবার জো আছে? বাপ-মা-ছেলে কেউ না কেউ অপছন্দ করে বসলেই হল। শ্যামল বলল, এবার কিন্তু ভাই আমার কোন দোষ নেই। মাস্টার মশাইর বিরুদ্ধে এবার আমি কোন কথা লাগাই নি, তবে ভদ্রলোক অঙ্ক-টঙ্ক কিছু পারতেন না।'

করবী চটে উঠে বলল, 'না, অঙ্ক পারতেন না। আর অঙ্কের জাহাজ বুঝি ও নিজে।'

দিলীপ একটু হেসে বলল, 'শ্যামলের একটা কথাও বিশ্বাস করো না বউদি। ও ভারি মিথ্যেবাদী। হয়তো ও নিজেই চক্রান্ত করে অরুণদাকে সরিয়েছে। ওর কিচ্ছু হবে না।'

করবী আর কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল। যাক, তাহলে কোন শক্ত অসুখ-বিসুখ নয়। কিন্তু বেকার মানুষের টিউশনি যাওয়ার বিপদটাও নেহাৎ কম নয়। নিতান্ত অসুবিধেয় না পড়লে এতদূরে অমন সামান্য মাইনেয় কেউ ছাত্র পড়াতে আসে না। মনে মনে অরুণের জন্যে ভারি সহানুভূতি বোধ করল করবী। কিন্তু এ-পাড়ার টিউশনিটি যে গেছে, এখন যে সে আর আসতে পারবে না, সে খবরটা করবীকে দিয়ে গেলেই তো পারত অরুণ। দেখা করে একবার জানিয়ে গেলে ক্ষতি ছিল কি। না, কি লজ্জা বোধ করছে। কিন্তু চাকরি যাবার চেয়েও কি টিউশনি চলে যাওয়াটা এমন বেশি অগৌরবের যে, সে কথা অরুণ তাকে জানিয়ে যেতে পারল না। তাকে না জানাক দিলীপকে না হয় তার মাকে তো জানিয়ে যেতে পারত। মনে মনে একটু অভিমানই হল করবীর। কেবল ছাত্রের বাড়ি ছাড়া কি এ-পাড়ায় আর কোন পরিচত লোক ছিল না, পরিচিত পরিবার ছিল না অরুণের? টিউশনি গেলেও কি তাদের একবার খোঁজ নেওয়ার কথা তার মনে হল না?

কিন্তু নিজের মনের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মান-অভিমানে করবী এক সময় নিজেই বিস্মিত হল, লজ্জিতও হল। সত্যি, এ কি সে ভাবছে, এত দাবী করছে. সে কার ওপর? দাদার অগণিত সহকর্মীদের মধ্যে অরুণও একজন। এখন তো আর সহকর্মীও নয়।

করবীর সঙ্গে মাত্র কয়েক মাসের আলাপ। তার আর্থিক দুরবস্থার কথা শুনে অল্প মাইনের একটা স্কুলমাস্টারী জুটিয়ে দিয়েছে, এই পর্যন্ত। সেই পরিচয়ের দাবীতে আর কি আশা করতে পারে করবী ? আশা করা সঙ্গতও নয়।

কিন্তু এই যুক্তিতে তেমন স্বস্তিবোধ করল না করবী, তেমন তৃপ্তি পেল না। মনে হল অরুণের ওপর সে অবিচার করছে। নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণে অরুণ এদিকে আসতে পারে নি। অসুস্থ হয়ে পড়াটাও বিচিত্র নয়। তাছাড়া এখন তো সে একেবারে বেকার, নিশ্চয়ই খুব অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। মন মেজাজও প্রসন্ন থাকবার কথা নয়। এ অবস্থায় করবীরই উচিত অরুণের খোঁজ-খবর নেওয়া। কৃতজ্ঞতা বলে তো একটা জিনিস আছে ! উপকার যতটুকু হোক করেছে তো। না স্বীকার করবার মত সৌজন্য করবীর কেন থাকবে না ? না, শিষ্টাচারের কোন ত্রুটি ঘটতে দেবে না করবী। অরুণের সে খোঁজ নেবে। কিন্তু কি করে খোঁজ-খবর নেওয়া যায় ? অরুণের ঠিকানা অবশ্য তার কাছে আছে। ইচ্ছা করলেই একটা চিঠি দেওয়া যায়। কিন্তু চিঠি দেওয়াটা কি ঠিক হবে ? স্বামী বেঁচে থাকতে তাঁর দু-একজন পুরুষ বন্ধুর অবশ্য করবী পত্রালাপ করেছে। কিন্তু অরুণ তো আর তা নয়। দাদার বন্ধু ইদানীং নিজেরও বন্ধু। তবু কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ তার কাছে চিঠি লেখায় কেমন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করল করবী। অথচ না লিখেও স্বস্তি নেই। পরদিন ভোরে উঠে দিলীপের কাছে গিয়ে বলল, 'আচ্ছা দিলীপ, অরুণবাবুর একটা খোঁজ নিলে হয় না ? ভদ্রলোক কেমন আছেন, কোন কাজকর্ম পেলেন কি না—'

দিলিপ উল্লসিত হয়ে বলল, 'সত্যি বউদি, আমাদের একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। আমি তো ঠিকানা জানি নে। তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম।'

করবী বলল, 'ঠিকানা আমি জানি। কিন্তু যাওয়ার দরকার নেই। তুমি বরং একখানা চিঠি লিখে দাও।'

দিলীপ বলল, 'চিঠি ! বেশ লিখব। কিন্তু কি লিখব বল তো ?'

করবী বলল, 'বাঃ রে, একখানা চিঠি কি করে লিখতে হয় তাও কি তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না কি ? কেন, স্কুলেও তো ইংরেজি-বাঙলায় চিঠি লেখা শেখায়।'

দিলীপ বলল, 'তা শেখায়, তবু সে তো স্কুলের চিঠি। তেমন চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে না। তার চেয়ে তুমি বরং বল, আমি লিখছি।' শেষ পর্যন্ত তাই হল। করবীই বলে বলে গেল কথাগুলি। দিলীপ একটা কাগজে লিখে নিল। অনেক কাটাকুটি অদল-বদলের পর চিঠিটা এইরকম দাঁড়াল :

'শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অনেকদিন হল আপনি এদিকে আসেন নি। দেখা-সাক্ষাৎ তো হয়ই না, সামান্য খোঁজ-খবরটুকু পর্যন্ত নেই। আমরা বড়ই চিন্তিত রয়েছি। আপনার শরীর কেমন আছে, বাড়ির সব কে কেমন আছেন, জানাতে দেরি করবেন না, আর সময় করে একবার যদি আসতে পারেন, খুবই ভাল হয়। সকলের সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারে। আশা করি, শিগগির আসবেন একদিন। সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহন করবেন। ইতি।'

কিন্তু করবীর মুসাবিদায় মোটেই খুশী হল না দিলীপ। বলল, 'এরকম চিঠি তো আমিও লিখতে পারতাম।'

করবী হেসে বলল, 'তুমি যা লিখতে পারতে তাই তো লিখিয়েছি।'

নিজের নাম স্বাক্ষর করেই চিঠিটা অবশ্য ডাকে দিল দিলীপ। কিন্তু মনটা ওর খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। এমন চিঠি সেও লিখতে পারত, কিন্তু লিখত না! চিঠির একটি শব্দও তাব নয়, সব বউদির। কথাগুলি যেন বড় মেয়েলী। এমন হবে জানলে সে বৌদিকে তার চিঠির মুসাবিদা করতে বলত না। কোনদিন আর বলবেও না। যা পারে, সে নিজেই লিখবে। নিজের কথা নিজে বানিয়ে না লিখলে কি মনের কথা লেখা যায়?

দিন দুই পরে পোষ্ট কার্ডে জবাব এল অরুণের। দিলীপের কাছে সে লিখেছে:

'কল্যাণীয়েষু,

হঠাৎ তোমার চিঠিখানা পেয়ে ভারি খুশী হলাম। জীবনে মাঝে মাঝে ছোট ছোট আশ্চর্য রকমের ঘটনা ঘটে। খুব বড় ধরনের কিছু নয়; পাহাড়ের চুড়ায় ওঠা, কি জাহাজসুদ্ধ সমুদ্রের তলায় ডুবে যাওয়ার মত বড় বড় রোমহর্ষক কোন কাণ্ড কারখানার কথা বলছি নে। নেহাৎই কারো একখানা চিঠি পাওয়া, কি পথ চলতে চলতে ভিড়ের মধ্যে কোন চেনা মানুষের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ার মত ঘটনা। যা রোজ ঘটতে পারে অথচ রোজ ঘটে না। তোমার চিঠিখানার মধ্যেও সেই জাতের রোমাঞ্চ আছে।

এতদিনে শুনেছ বোধহয় তোমাদের পাড়ার সেই টিউশনিটি গেছে। তোমাদের খবর দিয়ে আসবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সেদিন গিয়ে দেখলাম বাড়ির দোর জানালা সব বন্ধ। দল বেঁধে কোথায় যেন সব বেরিয়েছ। তাই চলে এলাম। আসছে রবিবার আবার যাব। সাক্ষাৎ মত সব বলব, শুনব। দেখো সেদিন আবার কেথাও যেন বেরিয়ো না। ঘরে থাকবার কথাটা মনে রেখো। ইতি—অরুণ চন্দ।'

চিঠিখানা বার কয়েক পড়ল দিলীপ। হাতের লেখাটি বেশ ভাল অরুণদার, কথাগুলি বেশ। তবু মনে হল চিঠিখানার সব কথা যেন তাকেই লেখা নয়, যেন আরও কাউকে কথাগুলি শোনাতে চান অরুণদা। কোনখানে তার নাম নেই, কিন্তু সবখানে তার গন্ধ

আছে। চিঠিটা হাতে করে দিলীপ গিয়ে করবীর কাছে দাঁড়াল, 'বউদি তোমার চিঠি।'

'কই দেখি।'

বলে দিলীপের হাত থেকে চিঠিটা তাড়াতাড়ি কেড়ে নিল করবী। তারপর এপিঠ ওপিঠ পড়ে চিঠিটা ফেরৎ দিয়ে বলল, 'দুষ্টু, এ চিঠি বুঝি আমার। এর কোন্ জায়গায় আমার কথা লেখা আছে বল তো?'

দিলীপ বলল, 'লেখা নেই, কিন্তু—'

করবী হেসে বলল—'আসলে আমার সম্বন্ধে একটা কথাও তো কোথাও জিজ্ঞেস করেন নি। সেইজন্যেই তুমি তাঁর দোষ ঢাকতে এসেছ।'

অন্য দিনের মত আজও স্কুলে গেল, ছাত্রী পড়াল করবী। কিন্তু আজকের দিনটি যেন ঠিক অন্যান্য দিনের মত নয়। কোথায় যেন একটু বৈশিষ্ট্য লেগে আছে দিনটির মধ্যে। কিসের যেন একটু মাধুর্য। অরুণ ঠিকই বলেছে। একটা সামান্য ছোট ঘটনাতেও দিনের রঙ পালটে যেতে পারে। অসামান্যতার ছোঁয়াচ লাগতে পারে জীবনে। কিন্তু একটু বাদেই করবী চমকে উঠল। এসব ভাবনার কি কোনো মানে হয়।

ফেরার পথে কিছু ফুল কিনে নিয়ে এল করবী। মালা গেঁথে ঝুলিয়ে দিল স্বামীর ফটোয়। সুগন্ধি ধূপ-কাঠি জ্বেলে দিল এক পাশে। তারপর সামনে এসে দাঁড়াল। মনে মনে বলল, 'তুমিই আমার একমাত্র অসামান্য। তোমার স্মৃতিই আমার সারাজীবনের পক্ষে যথেষ্ট। আমার আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।'

ঘুমের মধ্যে গড়াতে গড়াতে পিপলু বিছানার একেবারে এক কিনারে চলে গেছে। কাণ্ড দেখ ছেলের। তক্তপোশে উঠে এসে করবী ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। পিপলু যখন আছে তখন আর চিন্তা কি, তখন তার আর ভয় কি! ও যখন আছে তখন সব আছে।

রবিবার সন্ধ্যার পর অরুণ এসে হাজির হল।

করবী বলল, 'আসুন। খবর কি আপনার। যাতায়াত দেখাসাক্ষাৎ একেবারেই ছেড়ে দিলেন যে। টিউশনিটি গেছে সেই দুঃখে বুঝি?'

অরুণ হেসে বলল, 'সে দুঃখ কি কম। আপনার দু-দুটি টিউশনি আছে, সে দুঃখ আপনার বুঝবার কথা নয়।'

করবী বলল, 'আপনি তো ভারি হিংসুটে দেখছি। যতটা ভালোমানুষ ভেবেছিলাম ততটা তো নন।'

অরুণ বলল, 'তাই নাকি?'

অরুণকে বৈঠকখানার ঘরে এনে বসাল করবী। সাড়া পেয়ে পিপলুকে সঙ্গে নিয়ে নিভাননীও এলেন এ ঘরে। বললেন, 'এসো বাবা। ক'দিন ধরে তোমার আর কোন খোঁজ-খবর নেই। ভাবলাম অসুখ-বিসুখই হল না কি, বাসার সব ভাল আছে তো?'

অরুণ বলল,'বাড়িভরা লোক, কারো না কারো সর্দিকাসি, মাথা ধরাটরা একটু-আধটু থাকবেই। এসব বাদ দিলে একরকম ভালই বলা যায়।'

নিভাননী হেসে বললেন, 'অরুণের যেমন কথা। তারপর চাকরি-বাকরি কিছু হল না কি?'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ, তাও একটা হয়েছে, অনেক হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরির পর কেরাণীগিরি একটা জুটেছে কোন রকমে।'

করবী জিজ্ঞেস করল, কোথায়?'

অরুণ বলল, 'এ. জি. বেঙ্গলে।'

করবী উল্লসিত হয়ে বলল, 'তাই বলুন। তাহলে চাকরি-বাকরি জুটিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে বেড়াতে বেরিয়েছেন। আর এতক্ষণ খুব দুঃখের কথা বলা হচ্ছিল।'

অরুণ বলল, 'চাকরি জুটলেই কি সব দুঃখ ঘোচে?'

করবী অরুণের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। না চাকরি জুটলেই সব দুঃখ ঘোচে না, ঘোচে নি। কিন্তু অরুণের তো তা নয়। ওকে তো তেমন কোন দুঃখ পেতে হয়নি। শোকের আঘাতে অরুণের তো বুক চুরমার হয়ে যায় নি। তবুও অরুণ কেন দুঃখের কথা বলছে। অরুণ দুঃখের কি জানে, দুঃখের কি বোঝে। ওর তো সমস্ত সুখ, সমস্ত ভবিষ্যত সামনে। অরুণের আবার দুঃখ কি। না অরুণের কোন দুঃখ নেই। ও শুধু বলবার ভঙ্গি।

দিলীপও কাছেই ছিল। অরুণের চাকরির খবর শুনে বলল, 'যাক, চাকরি পেয়েছেন ভালই হয়েছে, এবার বউদিকে একদিন ভাল করে খাইয়ে-টাইয়ে দিন।'

অরুণ আর করবী পরস্পরের দিকে তাকাল। একটু বাদে নিভাননীর দিকে চেয়ে করবী বলল, 'দেখছেন মা, দিলীপের লজ্জার বহর। নিজের খাওয়ার কথাটা বলতে পারল না। আসলে নিজের ইচ্ছেটা চাপাচ্ছে আমার ওপর।' নিভাননীও হাসতে লাগলেন।

হঠাৎ অরুণের হাতের একখানা চটি বইয়ের ওপর চোখ পড়ল করবীর, বলল, 'ওখানা কি?'

অরুণ বলল, 'একখানা কবিতার বই। কাল বেরিয়েছে।'

করবী বলল, 'সে কি, আপনিও কবিতা লেখেন নাকি!'

অরুণ বলল, 'না না, আমি কেন লিখব। আমার একজন বন্ধুর বই। আসবার পথে ট্রামে দেখা। একখানা উপহার দিল।'

করবী বলল, 'দেখি।'

তারপর বইখানা নেড়ে দেখল করবী। বইয়ের আর লেখকের নাম পড়ল মনে মনে। জলতরঙ্গ—শুভেন্দু সেন। তারপর আস্তে আস্তে অরুণের হাতে বইখানা ফেরত দিয়ে বলল, 'বেশ হয়েছে গেট আপ।'

একটু বাদে হঠাৎ বলল, 'ওঁরও ভিতরে ভিতরে ইচ্ছা ছিল একখানা কবিতার বই বের করবার।'

একটুকাল সবাই চুপ করে রইল। তারপর অরুণ বলল, 'ইচ্ছা করলে এখনো তো পরেশবাবুর বই বের করা যায়। কবিতাগুলি আছে তো?'

করবী বলল, 'প্রায় সবই আছে। আমি গুছিয়ে ফাইল করে রেখেছি।'

অরুণ বলল, 'তাহলে তো ভালই হল। সে ফাইল থেকে বেছে কিছু কবিতা নিয়ে বেশ একখানা বই করা যায়।'

নিভাননী বললেন, 'তুমি সত্য বলছ অরুণ? এখনো ছাপা যায় তার বই?'

অরুণ বলল, 'কেন যাবে না! চেষ্টা করলে—'

নিভাননী সাগ্রহে বললেন, 'তাহলে তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ অরুণ। তোমার তো কতজনের সঙ্গে জানা শোনা আছে। তুমি একটু চেষ্টা করলে হয়তো হবে। ওর একটা হাতের চিহ্ন যদি থাকে—'

অরুণ বলল, 'নিশ্চয়ই।'

তারপর করবীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কবিতাগুলি একটু দেখাবেন আমাকে?'

করবী বলল, 'আজই দেখতে চান?'

অরুণ বলল, 'ক্ষতি কি, আবার কবে আসব! তার চেয়ে আজই দেখে রাখি, অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে—'

করবী বলল, 'না, না, আপত্তির কি আছে। আচ্ছা চলুন ও ঘরে।'

অরুণকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে নিয়ে গেল করবী, তারপর ড্রয়ার খুলে বার করল কয়েকটি কবিতার খাতা। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতার ফাইলটিও দিল বার করে। অরুণ আস্তে আস্তে পাতা উল্টিয়ে দেখতে লাগল কবিতাগুলি। করবী একবার মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে?'

অরুণ বলল, 'বেশ। বেশির ভাগই দেখছি প্রেমের কবিতা।'

করবী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ওই ধরনের কবিতাই বেশি। অথচ এসব কথা কোনদিনই তিনি মুখে বলতেন না। কিন্তু লেখার সময় ওই ছিল যেন তাঁর একমাত্র বিষয়বস্তু।'

অরুণ করবীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'তাই নাকি !'

করবী আরও লজ্জিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি বরং বলতুম—ও ছাড়া কি লিখবার তোমার অন্য কোন বিষয় নেই ? অন্য কিছু নিয়ে লেখ।'

অরুণ বলল, 'তিনি কি জবাব দিতেন ?'

করবী বলল, 'তিনি মুখ টিপে টিপে হাসতেন। বলতেন অন্য বিষয় নিয়ে যদি লিখতেই পারব তাহলে ও বিষয় নিয়ে লিখব কেন ? আমি যা পারি তাই লিখেছি, তাই লিখছি। সব বস্তু, সব রস তো আর একজনের জন্যে নয়।'

অরুণ বলল, 'ঠিক কথা।'

তারপর ফের কবিতা পড়ায় মন দিল।

করবী বলল, 'কি মনে হচ্ছে ? বই করে বার করা যায় তো ? কোন পাবলিশার কি নিতে রাজী হবে ?'

অরুণ একটু চিন্তা করে বলল, 'চেষ্টা করে দেখতে হবে কতদূর কি করা যায়।'

কবিতাগুলি একটু পুরনো ধরনের। ভাষা পুরনো, ভঙ্গি পুরনো, ভাবের মধ্যেও বিশেষ কোন মৌলিকতা নেই। যেটুকু আছে সেটুকু শুধু এক ধরনের সহজ সারল্য। আন্তরিক। কিন্তু শুধু এই সম্বলে এ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক পাওয়া শক্ত হবে। অরুণ তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল। কিন্তু করবীকে সঙ্গে সঙ্গে সে কথা বলতে পারল না। করবী হয়তো দুঃখ পাবে। বরং কবিতাগুলির একটু বেশি রকম প্রশংসা করে বলল, 'না না, কবিতাগুলি তো ভালোই, তবে সব পাবলিশার তো কবিতার বই প্রকাশ করে না। যারা করে তাদের কাছে গিয়ে বলে দেখতে হবে।'

করবী বলল, 'আপনাকে যদি এর জন্যে বেশি কষ্ট করতে হয় তাহলে বরং থাক। কাজ নেই অত হাঙ্গামায়।'

বলে খাতাগুলি করবী গুছিয়ে তুলে রাখতে যাচ্ছিল, অরুণ বাধা দিয়ে বলল, 'ওকি সব তুলে রাখছেন কেন ?'

করবী বলল, 'তবে কি করব !'

'আমাকে দিন দু-একটা। আমি পড়ি, দু-একজন পাবলিশার বন্ধুকে পড়তে দিই। তবে তো কাজ হবে।'

করবী একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'আমি ভাবছিলাম দরকার কি আপনার অত কষ্ট করে ?'

অরুণ বলল, 'করলামই বা কষ্ট। যে কোন কাজ করতে হলেই কিছু না কিছু কষ্ট করতে হয়। ভাল কাজের জন্যে আরও বেশি কষ্ট। তাই বলে কি কেউ ফেলে রাখে ?'

করবী বলল, 'আচ্ছা নিন তাহলে।'

অরুণ বেছে বেছে কিছু কবিতা নিল সঙ্গে। তারপর করবীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভয় নেই আপনার। এর একটা লেখাও হারাবে না।'

করবী হেসে বলল, 'আমি কি ভয় পেয়েছি যে আগে থেকেই আপনি অত ভরসা দিচ্ছেন? আপনার কাছ থেকে কিছু যে হারাবে না, সে বিশ্বাস আমার আছে। নইলে আর কাউকে যা দিতে পারি নি, তা আপনাকে দিলাম কি করে?'

বলেই করবী হঠাৎ থেমে গেল। স্বামীর কবিতার খাতা দিতে গিয়ে এত কথা না বললেও হত অরুণকে। আজকাল সহজেই বড ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ে করবী। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তার এই অভ্যাস হয়েছে। কথায় কথায় চোখে জল আসে, স্বর ভারি হয়ে ওঠে। কেমন যেন অসহায় মনে হয় নিজেকে। এমন একজন সহৃদয়, সহানুভূতিশীল বন্ধুকে কাছে পেতে ইচ্ছা করে, যার কাছে সব বলা যায়, হৃদয়ের সব দুঃখ নিবেদন করা চলে। নিজের দুঃখ তো শুধু নিজে বওয়া যায় না, শুধু একা সওয়া যায় না। অন্যকে তার ভাগ দিতে হয়, অন্যের দুঃখের ভাগ নিতে হয়। এই দেওয়ার মধ্যেই দুঃখের ভার লঘু হতে থাকে।

করবীর কথা শুনে অরুণ ওর মুখের দিকে একবার তাকাল। হঠাৎ এত-খানি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলে করবী যে লজ্জা পেয়েছে, তা বুঝতে অরুণের বাকি রইল না। বিষয়টাকে সহজ করে দেওয়ার জন্যে বলল, 'দেখুন, আপনার কাছে এসব খাতাগুলির যে কি মূল্য, তা আমি জানি। কিন্তু আমার ইচ্ছা এর মূল্য আরও বাড়ুক, শুধু আপনি আমি নয়, আরও পাঁচজনে এর থেকে রস পাক, আনন্দ পাক, তবেই তো পরেশবাবুর লেখাগুলি যোগ্য মর্যাদা পাবে।'

নিভাননী এসে দাঁড়ালেন দোরের সামনে, বললেন, 'কিসের মর্যাদার কথা বলছ অরুণ।'

অরুণ বলল, 'পরেশবাবুর লেখাগুলির। এত ভাল লেখা। এগুলিকে এতদিন প্রকাশ না করাই তো অন্যায় হয়েছে। এ তো বাক্সবন্দী করে লুকিয়ে রাখবার জিনিস নয়। তা যদি করি, লেখাগুলির ওপর অবিচার করা হবে।'

আনন্দে নিভাননীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'সত্যি বলছ? সত্যি এগুলি ছেপে বার করবার মত হয়েছে?'

অরুণ বলল, 'নিশ্চয়ই।'

নিভাননী বললেন, 'তাহলে তুমি এগুলি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ?'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ, কিছু কিছু নিলাম। করবী দেবী দিতে চাইছিলেন না, আমিই প্রায় জোর করে কেড়ে নিয়ে গেলাম ওঁর কাছ থেকে।'

অরুণ যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। নিভাননী বাধা দিয়ে বললেন, 'কত রাত হয়ে

গেছে। এখান থেকে খাওয়াটা সেরে গেলেই তো পারতে।'

অরুণ বলল, 'এই তো একটু আগে চা-টা খেয়ে নিলাম মাসীমা। খাওয়ার মধ্যে কি আছে ?'

নিভাননী বললেন,'খেয়ে গেলে বড় খুশী হতাম। অবশ্য বাইরের কাউকে খেতে বলবার মত কোন আয়োজনই আজ নেই,কিন্তু তোমাকে তো বাইরের ছেলে বলে মনে করি নে।'

অরুণ বলল, 'অত করে বলছেন কেন, বাড়িতে তো বলে আসি নি, মা হয়তো খাবার নিয়ে বসে থাকবেন। আর একদিন বরং আসব।'

করবী বলল, 'আর একদিন নয়। একেবারে তারিখ ঠিক করে দিয়ে যান।'

অরুণ বলল, 'বেশ, আপনি ঠিক করুন।'

করবী একটু চিন্তা করে বলল, 'তাহলে সামনের রবিবার আসুন সন্ধ্যার পর। ওদিন তো দুজনেরই ছুটি আছে। সেই ভাল হবে।' একটু থেমে বলল, 'কবিতার বই সম্বন্ধে কি হল না হল, তা জানতে পারব। ভাল কথা, এ বইটা যে আপনি ফেলে গেলেন।' বলে অরুণের আনা 'জলতরঙ্গ' বইখানা ওর দিকে এগিয়ে দিতে গেল করবী।

অরুণ বাধা দিয়ে বলল, 'আমি মোটামুটি দেখে নিয়েছি। ও বই থাক আপনার কাছে। আপনি দেখুন। আমি পরে আর একদিন এসে নেব।'

করবী বলল, 'আচ্ছা।'

অরুণ বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে ট্রাম ধরল। তার হাতে পরেশের কবিতার খাতা। অরুণ মনে মনে ভাবল, এই পরেশকে সে কোনদিন দেখে নি, কোনদিন দেখবেও না। করবীর মৃত স্বামী ছাড়া এই লোকটির আর কোন পরিচয়ই তার কাছে নেই। তবু তার কবিতার বই সে প্রকাশ করবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ তাতে করবী খুশী হবে। কিন্তু একথাটা নিজের কাছেও নিজে স্বীকার করতে লজ্জাবোধ হল অরুণের। না শুধু করবীর খুশী হওয়ার জন্যেই নয়, সাধারণ সাহিত্যপ্রীতি থেকেই এ কাজে সে অগ্রসর হয়েছে। একজন মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্ন রাখবার জন্যেই তার আগ্রহ। আর কোন উদ্দেশ্য আর কোন স্বার্থবোধ এর মধ্যে নেই।

পরদিন অফিস থেকে ফেরার পথে এক পাবলিশার বন্ধুর দোকানে গিয়ে হাজির হল।

বিমলেন্দু সান্যাল তাকে দেখে বলল, 'আরে অরুণ যে! কি ব্যাপার, হঠাৎ তুমি এ পাড়ায় ?'

অরুণ বলল, 'এলাম। তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।'

বিমলেন্দু বলল, 'বল।'

অরুণ পকেট থেকে কবিতার খাতাটা বের করে বলল, 'এর একটা ব্যবস্থা তোমাকে করে দিতে হবে।'

বিমলেন্দু বিস্মিত হবার ভঙ্গি করে বলল, 'বল কি হে। শেষ পর্যন্ত তুমিও কবিতা লিখতে শুরু করলে নাকি ? কিন্তু এ যে দেখছি কোন্ পরেশচন্দ্র বসুর নাম। লিখলেই যদি তবে আর ছদ্মনামে কেন ?'

অরুণ বলল, 'ছদ্মনাম নয়। ওইটাই ভদ্রলোকের আসল নাম।'

তারপর ধীরে ধীরে বন্ধুকে সব কথা খুলে বলল অরুণ। শেষে অনুরোধ জানাল, 'ভদ্রলোকের স্ত্রীর ভারি ইচ্ছা স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে একখানা বই অন্তত বের করেন—'

বিমলেন্দু মুচকি হেসে বলল, 'বুঝতে পেরেছি তাঁর ইচ্ছেটাই এখানে বড়, নারী ভূমিকাটাই এক্ষেত্রে আসল ভূমিকা।'

অরুণ ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'ছিঃ, এর যে একটি ভিন্ন দিক আছে, যে দিকটা অত্যন্ত করুণ, অত্যন্ত দুঃখের, সেটা কি তোমার চোখে পড়ছে না বিমল ?'

বিমল একটুকাল গম্ভীর হয়ে থেকে বলল, 'পড়বে না কেন অরুণ, পড়ছে। কিন্তু পড়লেও কি করব বল। কবিতার বই ছাপাবার মত অবস্থা এখন আমাদের নয়। তবে যদি সেই ভদ্রমহিলা নিজের খরচে ছাপেন, প্রকাশক বলে আমাদের নামটা বরং দিতে পারি, এর বেশি কিছু করবার সাধ্য আমাদের নেই।'

দিনকয়েক আরও দু-একটি পাবলিশারের কাছে ঘোরাঘুরি করল অরুণ। সকলের মুখেই এক কথা। এই অজ্ঞাত মৃত লেখকের কবিতার বই ছাপা অসম্ভব।

পরের রবিবার অরুণ ফের গিয়ে উপস্থিত হল করবীদের বাসায়।

করবী আপ্যায়ন করে বলল, 'আসুন।'

তারপর নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারটা এগিয়ে দিল অরুণের দিকে। একথা ওকথার পর সেই কবিতার খাতার কথা উঠল।'

করবী জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কি করলেন আপনার বইয়ের ?'

অরুণ বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমার বই !'

করবী লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'ওই হল। ব্যবস্থা-ট্যবস্থা কিছু করা গেল নাকি ?'

নৈরাশ্যকর খবরটা বেশ আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে করবীকে জানাল অরুণ। শেষে বলল, 'আমি অবশ্য এখনো চেষ্টা ছাড়ি নি— ।'

করবী একটুকাল গম্ভীর হয়ে থেকে বলল, 'না না, অনর্থক চেষ্টা করে কিছু লাভ হবে না। তার চেয়ে নিজের খরচেই আমরা ছাপব সেই ভাল। হয়তো একটু দেরি হবে। তার আর কি করা যাবে। আপনি বরং খোঁজ নিন, কত খরচ পড়তে পারে।'

তাই ঠিক হল। বই প্রকাশ করাটা আপাতত বন্ধ রইল। কিন্তু সে সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার অন্ত রইল না।

প্রায় প্রত্যেক রবিবার অরুণ আসে করবীদের ওখানে। পরেশের খাতাপত্রগুলি বের করে। দু-একটা কবিতা করবীকে শুনিয়ে শুনিয়ে আবৃত্তিও করে। তারপর তা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হয়। কবিতার চমৎকার ব্যাখ্যা করতে পারে অরুণ। ভিতরকার গূঢ় অর্থকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারে। নিজের কবিতার ভাববস্তু এমন করে বুঝিয়ে বলতে পরেশও হয়তো পারতেন না। ভারি অদ্ভুত লাগে করবীর। সে মুগ্ধ হয়ে শোনে। সত্যিই কি পরেশ এমন চমৎকার লিখত। আগে তো বুঝতে পারে নি করবী, আগে তো বুঝতে চেষ্টা করে নি! এখন অরুনের ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে পরেশের অনেক কবিতার অর্থ যেন সে নতুন করে উপলব্ধি করছে।

নিভাননী প্রথম প্রথম এসে বসতেন। অন্যের মুখে ছেলের কবিতার আলোচনা আর ব্যাখ্যা শুনতেন। কিন্তু অরুণ একটু সঙ্কোচ বোধ করে দেখে আস্তে আস্তে তিনি ওদের এই সাপ্তাহিক কাব্যালোচনার বৈঠক থেকে সরে গেলেন।

সপ্তাহের ছ'টা দিন খুবই ব্যস্ত থাকে করবী। কাজের চাপে তার যেন নিঃশ্বাস ফেলবার সময় থাকে না। রবিবারেও স্কুলের খাতাপত্র দেখতে হয়। তারপর বিকেলের পর থেকে সে অরুণের জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকে। অরুণ আর কেউ নয়, তার স্বামীর কাব্যের ব্যাখ্যাতা। তার স্বামীর কবিতার স্বাদ গ্রহণের সহায়ক।

করবী তার দূরসম্পর্কের বিধবা মাসীমাকে দেখেছে, স্বামীর ফটো তিনি পূজো করতেন। শুধু ফুল, চন্দন আর ধূপদীপই জ্বালতেন না, শ্বেত পাথরের রেকাবিতে করে নৈবেদ্যও সাজিয়ে দিতেন সামনে। কিন্তু বেঁচে থাকতে পরেশ একটা প্রণাম পর্যন্ত করবীর কাছ থেকে নেয় নি। ঠিক ওই ধরনের বিগ্রহ-পূজায় করবীর নিজেরও কেমন যেন এক ধরনের লজ্জা করে। তার চেয়ে পরেশের কীর্তির আলোচনা, তার রচিত কবিতার ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে স্বামীকে স্মরণ করতে ভাল লাগে করবীর ; এ-ও এক ধরনের পুজো। কিন্তু এর পদ্ধতি-প্রকরণটা বেশ আধুনিক। বাইরের একজন পূজক পুরোহিতের অবশ্য দরকার। কিন্তু সে তো নিতান্তই উপলক্ষ মাত্র। আসল পূজার অধিকারিণী তো করবী নিজে।

একদিন অরুণ এসে বলল, 'আজ আপনাকে একটা জিনিস দেখাব।'

করবী বলল, 'কি জিনিস?'

অরুণ অত সহজে গূঢ় রহস্য ভাঙল না, বলল—'অনুমান করুন দেখি।'

করবী বলল, 'আন্দাজ অনুমানের ক্ষমতা আমার নেই, আপনি বলে ফেলুন।'

অরুণ পকেট থেকে একটি পত্রিকা বের করে বলল, 'দেখুন তো কাগজখানা কেমন।' পত্রিকাখানির সব ক'টিই কবিতা। বিভিন্ন লেখকের লেখা। তার মধ্যে পরেশেরও নাম আছে, আর আছে পর পর তার দুটি কবিতা।

করবী খানিকক্ষণ কোন কথা বলল না। শুধু কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে অরুণের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু বাদে বলল, 'সত্যি, আপনি যা আমাদের জন্যে করছেন তার তুলনা হয় না। এমন বোধহয় কেউ কোনদিন করে নি।'

অরুণ বলল, 'এই বুঝি সৌজন্য শুরু হল। আমার তো ধারণা ছিল, ওসব পর্ব আমরা হয়ে এসেছি।'

করবী আস্তে আস্তে বলল, 'তা এসেছি।'

তারপর পত্রিকাখানি শাশুড়ীকে দেখাবার জন্যে পাশের ঘরে চলে গেল।

নিভাননীও দেখে খুশী হলেন। ছেলের কবিতা সম্বন্ধে তেমন কোন মন্তব্য না করে অরুণের উদ্দেশেই বললেন, 'সত্যি, ওর মত ছেলে হয় না।' করবী স্মিতমুখে চুপ করে রইল। অরুণের প্রশংসা তার নিজের প্রশংসারই মত। কারণ এই পারিবারিক বন্ধুটিকে সে নিজে আবিষ্কার করেছে। এর সমস্ত কৃতিত্ব করবীর।

যাওয়ার সময় অরুণ আরও একটি সুখবর দিয়ে গেল। এই কবিতার পত্রিকাটি যারা বের করে তাদের সঙ্গে পরেশের কবিতার বই সম্বন্ধে অরুণ কথা বলেছে। কাগজ কেনার টাকাটা যদি তাদের দেওয়া যায়, তারা নিজের খরচে ছাপবে এবং অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে বিজ্ঞাপন দেবে। এখন পুরো টাকাটা না দিলেও চলবে। কাজ আরম্ভ করার জন্যে সামান্য কিছু দিলেই হবে আপাতত।

করবী খুশী হয়ে বলল, 'বেশ তো, তা দেওয়া যাবে। আপনি কাজ শুরু করে দিন।'

অরুণ বলল, 'তাহলে কবিতাগুলি ফের বাছাই করে রাখুন।'

করবী বলল, 'বাঃ বাছাই করবার আমি কি জানি। যা করবার আপনিই করবেন।'

অরুণ বলল, উঁহু, আপনি অমন করে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবে না। যা করতে হয় দুজনে মিলেই করব।'

করবী বলল, 'আচ্ছা।'

অরুণ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ভাবছি বইয়ের ফ্ল্যাপে পরেশবাবুর একটু জীবনীর মত থাকলে মন্দ হয় না। আর সেই সঙ্গে ছোট মত একটু ভূমিকা। কাকে দিয়ে লেখান যায় বলুন তো। আপনি লিখবেন?'

করবী বলল, 'ক্ষেপেছেন? চিঠিপত্র ছাড়া আমি জীবনে কিছু লিখেছি যে আজ লিখব? বরং যা লিখবার আপনি লিখে দিন।'

অরুণ বলল, 'বেশ। আপনার কাছ থেকে শুনে শুনে লিখব। সে একরকম আপনারই লেখা হবে।'

নতুন করে বই প্রকাশের উদ্যোগ-আয়োজন চলতে লাগল। যাচাই বাছাই চলল কবিতার। অরুণ ভূমিকা লিখল, লিখল কবির জীবনচরিত। নাম সম্বন্ধেও দিনকয়েক লাগল মনস্থির করতে। তারপর মাসখানেক বাদে সত্যিই প্রকাশিত হল পরেশের প্রথম কবিতার বই, 'পাতাবাহার'। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার হয়েছে, সুন্দর হয়েছে প্রচ্ছদপট। করবী খুশী হয়ে বলল, 'এর সমস্ত কৃতিত্ব আপনার।'

তারপর উৎসর্গ পাতাটায় চোখ পড়ায় লজ্জিত হয়ে বলল, 'এ কি করেছেন ?'

পাতার মাঝখানে সংক্ষেপে লেখা আছে, 'করবীকে।' অরুণ একটু হাসল, 'কেন, ঠিকই তো আছে। পরেশবাবু থাকলে তো এ-ই করতেন।'

করবী আস্তে আস্তে বলল, 'না, তিনি তা করতেন না। এসব ব্যাপারে তাঁর ভারি সঙ্কোচ ছিল।'

অরুণ হঠাৎ বলল, 'বেশ, তাহলে ধরে নিন, এর জন্যে আমি দায়ী।'

করবী অরুণের দিকে একবার তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। তারপর ফের প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলল, 'না না, এটা ভাল হয় নি। এর জন্যে আমাকে সকলের কাছে বিশেষ করে মার কাছে বড়ই লজ্জা পেতে হবে।'

অরুণ অভয় দিয়ে বলল, 'বাঃ এতে লজ্জার কি আছে। আপনার স্বামীর বই, আপনার সঙ্কোচের তো কোন কারণ নেই।'

করবী আর কোন কথা বলল না।

বই দেখে নিভাননী ভারি খুশী হলেন। বললেন, 'সবই হল, শুধু যার জিনিস, সে দেখে যেতে পারল না।'

বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল, চোখে জল এসে পড়ল। নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার আগে তিনি অরুণকে ডেকে বললেন, 'তোমার মত বান্ধব আমাদের নেই। তুমি আত্মীয়ের চেয়েও বড়। আর কি বলব, তুমি দীর্ঘায়ু হও। তোমার মা-বাপ যেন কোনদিন আমার মত দুঃখ না পায়।'

রাত্রে শোয়ার আগে স্বামীর ফটোর সামনে তার একখানা বই রেখে দিল করবী। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। না, তেমন গভীর শোক কি দুঃখ এই মুহূর্তে তেমন করে যেন অনুভব করল না করবী। তার বদলে অদ্ভুত এক আত্মপ্রসাদ বোধ করল। লাজুক মুখচোরা স্বামীর গোপন ইচ্ছাকে এতদিনে সে বাস্তব করে তুলেছে। শুধু দুঃখ এই, পরেশ নিজের চোখে তা দেখল না।

একটু পরে আলো নিভিয়ে করবী শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল অরুণের কথা। যাওয়ার আগে সে বলছিল, 'কাজ এখনো শেষ হয় নি। তাড়াতাড়ি বইগুলির রিভিউর ব্যবস্থা করতে হবে। দোকানে দোকানে পাঠাতে হবে বিক্রীর জন্যে, এখনও অনেক কাজ বাকি আছে।' অরুণ কবি নয়, কিন্তু সত্যিই খুব কাজের লোক, করবী মনে মনে ভাবল।

চাকরি, টিউশানি আর সাংসারিক কাজকর্মের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আর একটি কাজ জুটল করবীর। স্বামীর বইয়ের তত্ত্বাবধান। এতদিন তার কেনা প্রিয় বইগুলি ঝেড়ে পুছে সেল্‌ফে যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে। এখন আরও একখানা বই বাড়ল। তা পরেশের নিজের। তার আকার ছোট হলেও করবীর কাছে তা ছোট নয়। এই বই তার স্বামীর স্মৃতিপূজার অঙ্গ। করবী খানকয়েক বই বেছে বেছে পরেশের দু-তিনজন বন্ধুকে উপহার পাঠাল, তারা কেউ চিঠিতে ধন্যবাদ দিল, কেউ বা নিজেরা এসে দেখা করে গেল। এক কপি পাঠাল দিল্লীতে দাদাকে। হিরন্ময়ও খুশী হয়ে চিঠি দিল, 'বেশ হয়েছে।' কি ভেবে স্কুলের হেডমিস্ট্রেসকেও একখানা বই উপহার দিল করবী, আর দিল সেকেণ্ড টিচার সুলতাকে। এই সহকর্মিণীটি কিছুদিনের মধ্যেই সহৃদয়া বন্ধুর স্থান নিয়েছে। স্কুল থেকে এক সঙ্গে বেরোয়, খানিকটা পথ এক সঙ্গে হেঁটে আসে। শুধু নিজের সুখ দুঃখের কথাই বলে না, খুঁটে খুঁটে করবীর কথাও জিজ্ঞেস করে।

বই পেয়ে সুলতা খুশী হয়ে বলল, 'এসব গুণও ছিল নাকি তাঁর? কই, এর আগে তো বল নি?'

করবী স্মিতমুখে চুপ করে রইল।

স্কুলের অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরাও কৌতূহলী হয়ে বইখানা চেয়ে নিয়ে পড়ল, কেউ কেউ সুখ্যাতিও করল। সমস্ত স্কুলে পরেশের নাম ছড়িয়ে পড়ল। আরও ছড়াক, স্বামীর কীর্তির মধ্যেই স্বামীকে সে অনুভব করবে।

কিন্তু কাগজে কাগজে যত তাড়াতাড়ি সমালোচনা বেরোবে ভাবা গিয়েছিল তা হল না। বই প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় দু' মাস কেটে গেল, কোথাও সমালোচনার দেখা নেই। করবী অধীর হয়ে অরুণকে বার বার তাগিদ দিতে লাগল, 'কই, কি হল? সমালোচনা তো কোথাও বেরুচ্ছে না?'

অরুণ বলল, 'চেষ্টা তো করছি।'

মাঝখানে এক রবিবার অরুণ এল না। করবীর বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল। স্বামীর কাব্যের আলোচনা সমালোচনা, তার বইয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হিসাবের জন্যই অরুণকে দরকার।

করবী এক সময় শাশুড়ীকে বলল, 'আজ বোধ হয় অরুণবাবু আর এলেন না।'

নিভাননী নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'হয়তো কোন কাজে আটকা পড়ে গেছে। দূর তো আর কম নয়।'

করবী আর কোন কথা বলল না। অরুণের সম্বন্ধে সে কি বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে ফেলেছে? শাশুড়ী কি কিছু ভাবলেন? কিন্তু ভাববার কি আছে? অরুণের মত হিতৈষী বন্ধু আর তো কেউ নেই।

সেদিন শনিবার, স্কুল দেড়টায় ছুটি হয়ে গেল। টিউশানিগুলি এ সময় সেরে যেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু ছাত্রীরা সন্ধ্যার আগে কেউ পড়বে না। করবী ফিরে এল বাড়িতে। কিন্তু বাড়িতেও মন টেকে না। মনে হয়, এর চেয়ে স্কুলই যেন ভাল ছিল। সারাদিন বাইরে বাইরে কাটাতে পারলে বাড়ির এই শূন্যতা মনকে ততখানি অস্থির করতে পারে না! মাঝে মাঝে ভারি শূন্য শূন্যই লাগে করবীর। সংসারে সবাই আছে, দেওর ছেলে শাশুড়ী—সকলেই তো ভালোবাসে করবীকে। তবু সেই একজন ছাড়া সবই শূন্য, সবই অন্ধকার। সেই অন্ধকার পুরী থেকে একটু আগে আগেই বেরিয়ে পড়ল করবী। কাজ নিয়ে সে ভুলে থাকতে চায়। কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে না পারলে দুঃখ-মুক্তির আর কোন পথ নেই।

নিভাননী বললেন, 'এই তো এলে। এখনই কোথায় বেরুচ্ছ আবার?'

করবী বলল, 'ভাল লাগছে না মা। যাই টিউশানিগুলি সেরে আসি।'

নিভাননী বললেন, 'শরীর যদি ভাল না থাকে তাহলে বরং আজ নাই বা গেলে। একদিন কামাই করলে আর কি হবে।'

করবী বলল, 'না না, কামাই করলেই বরং আরও খারাপ লাগবে। একেক সময় মনে হয়, শনি-রবিবারগুলি না থাকলেই আমার পক্ষে ভালো হোত।'

নিভাননী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তুমিই যদি এই কথা বল তাহলে আমি কি করে এর মধ্যে থাকি।'

করবী আর কিছু না বলে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

অন্যমনস্কভাবে হেঁটে চলেছে, হঠাৎ শুনতে পেল, 'এই যে আপনি, কোথায় যাচ্ছেন এ সময়?'

করবী মুখ তুলে তাকাল। অরুণ একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

হেসে বলল, 'আমি আপনাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম।'

করবী বলল, 'চলুন তাহলে।'

অরুণ বলল, 'না, না, আপনি যখন বেরিয়ে পড়েছেন—'

করবী একটু হাসল, 'বেরিয়ে পড়লে কি আর ফেরা যায় না ?'

অরুণ বলল, তাতে হয়তো আপনার কাজের ক্ষতি হবে।'

করবী বলল, 'না, না, ক্ষতির কি আছে। চলুন চা-টা খাবেন।'

অরুণ বলল, 'চা তো আপনি রোজই খাওয়ান। আজ না হয় আমি খাওয়াচ্ছি। শুনুন একটি সুখবর আছে। রিভিউ বেরিয়েছে। বেশ ভাল রিভিউ। কাগজখানা আজই আমার হাতে পড়ল ; তাই নিয়ে এলাম।'

করবী উল্লসিত হয়ে বলল, 'সত্যি ? কই দেখি দেখি।'

অরুণ বলল, 'এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখা যাবে না। তার চেয়ে চলুন না ওই রেস্টুরেণ্টটায়। চা খেতে খেতে দেখাব।'

করবী একটু ইতস্তত করে বলল, 'চলুন।'

ট্রাম লাইন পার হয়ে দুজনে মোড়ের রেস্টুরেণ্টে গিয়ে ঢুকল।

বয় একটা কেবিন দেখিয়ে দিয়ে দরজার কালো পর্দাটা ফাঁক করে ধরল। তারপর অরুণরা ভিতরে গিয়ে বসল, ফরমায়েস নেওয়ার জন্যে বয় একপাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি আনব, ফাউল কারি, চপ, কাটলেট—' অরুণ মাসিক কাগজখানা উল্টাতে উল্টাতে বলল, 'আচ্ছা, দুটো কাটলেট নিয়ে এসো আর চা।'

করবী বাধা দিয়ে বলল, 'না, না, দুটো নয়, শুধু একটা।'

অরুণ চমকে উঠে করবীর মুখের দিকে তাকাল, তারপর লজ্জিত অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি ভারি দুঃখিত। আমার মনে ছিল না। বিশ্বাস করুন, আমি ইচ্ছা করে—'

করবী ম্লান হেসে বলল, 'ইচ্ছে করে কেন বলবেন, আপনি খেয়াল করেন নি।'

তারপর বয়ের দিকে তাকিয়ে একটা কাটলেট আর দু কাপ চায়ের অর্ডার দিল করবী।

অরুণ বলল, 'না না, শুধু দু' কাপ চা। আর কিছু দরকার নেই।'

করবী বলল, 'কেন, দরকার নেই কেন, আপনি খান না।'

অরুণ মাথা নাড়ল, 'না, তা হয় না।'

রেস্টুরেণ্টের ছোকরাটি বলল, 'খুব ভাল কাটলেট ছিল বাবু, নিয়ে আসি দুখানা।'

অরুণ ধমক দিয়ে বলল, 'তোমাকে যা বলছি শোন। শুধু দু' কাপ চা নিয়ে এসো।'

বয় আর কোন কথা না বলে চলে গেল। দুজনে চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইল। কেউ কারো দিকে তাকাল না।

একটু পরে অরুণই ফের কথা বলল, 'সমালোচনাটা দেখবেন ?'

করবী বলল, 'বার করুন।'

অরুণ মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টে জায়গাটা খুলে করবীর সামনে রাখল।

করবী একবার চোখ বুলিয়ে দেখে বলল, 'ভালোই তো হয়েছে। বেশ ভালো হয়েছে।'

বয় দুজনের সামনে দু' কাপ চা দিয়ে চলে গেল।

অরুণ বলল, 'আপনি মন খুলে কথা বলছেন না। আপনি ভেবেছেন আমি ইচ্ছা করেই—'

করবী বলল, 'ছিঃ, তা কেন ভাবতে যাব। আপনার মত উপকারী বন্ধু আমাদের নেই। আপনি ইচ্ছা করে আমাকে আঘাত দেবেন একথা কি ভাবা যায়!'

অরুণ একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু এসব তো সংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়।'

করবী বলল, 'কোন্ সব?'

অরুণ বলল, 'এই খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার? স্মৃতির শ্রদ্ধা জানাবার এই বাহ্যিক অনুষ্ঠানই কি সব?'

করবী বলল, 'কিন্তু আমাদের সমাজের এই-ই রীতি। খাওয়া-পরা সম্বন্ধে বিধবাদের কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়।'

অরুণ বলল, 'চলতে যে হয় তা আপনিও জানেন আমিও জানি। কিন্তু কেন হয় সেইটাই প্রশ্ন। কই, বিপত্নীক পুরুষদের বেলায় তো এসব কোন বিধান নেই, তাই বলে কি মৃত স্ত্রীকে তারা ভুলে যায়, না তার জন্যে তাদের কোন শোক দুঃখ বোধ হয় না?'

করবী কোন কথা বলল না।

অরুণ ফের বলতে লাগল, 'অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তো এ ধরনের রীতি নিয়ম নেই, কিন্তু তাই বলে মৃত স্বামীর জন্যে তাদের দুঃখ কি কিছু কম?'

করবী আর্তস্বরে বলল, 'অরুণবাবু, এসব আলোচনা আজ থাক।' করবী উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু অরুণ তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'বসুন, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনাকে উপলক্ষ করেই কথাটা উঠল। আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।'

করবী ফের অধীরভাবে বলল, 'এসব আলোচনা আজ থাক অরুণবাবু।' খানিকক্ষণ কেউ আর কোন কথা বলল না। একটু বাদে দুজনে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এল।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই করবীর চোখে পড়ল কারা যেন তাদের সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় কথা কাটাকাটি করছে। আরও একটু এগুতেই তাদের চিনতে পারল করবী। বাড়িওয়ালার সরকার শীতলবাবু আর দিলীপ। পায়ে চটি, গায়ে

ফতুয়া, মাথায় টাক। বেঁটে খাট মোটাসোটা মাঝবয়সী ভদ্রলোক।

শীতলবাবু বললেন, 'তোমাদের মতলবখানা কি বল। কেবল ঘোরাচ্ছ, আর ঘোরাচ্ছ। ভাড়াটা দেওয়ার ইচ্ছা আছে কি নেই সোজা ভাষায় বলে দিলেই হয়।'

দিলীপ বলল, 'দেখুন, যা বলবার ভদ্র ভাষায় বলুন। ভাড়া আপনারা কবে না পেয়েছেন। এই মাসেই যা একটু দেরি হয়েছে দিতে।'

শীতলবাবু বললেন, 'এ-মাস মানে এই ছু' মাস হল। তোমাদের সবই তো চলছে। স্কুল, কলেজ, বেড়ান-চেড়ান, আমোদ-স্ফূর্তি কোনটাই তো বন্ধ নেই। যত অভাব অনটন বুঝি এই ভাড়া দেওয়ার বেলায়?'

করবী এসে সামনে দাঁড়াল, 'কি হয়েছে শীতলবাবু? আসুন ভিতরে এসে বসুন। দিলীপ সদর দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি তর্ক করছ। বাড়ির ভিতর কি জায়গা ছিল না?'

তিরস্কৃত হয়ে দিলীপ বউদির দিকে তাকাল, তারপর একটু রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'ভিতরে আমি যেতে বলেছিলাম বউদি, উনিই রাজী হন নি। তাছাড়া তুমি যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে, তা তো ভাবি নি। অনর্থক ওঁকে বসিয়ে রেখে লাভ কি হত।'

তার সঙ্গে এমন উদ্ধত ভঙ্গিতে সাধারণত কথা বলে না দিলীপ। করবী বুঝতে পারল, যে কোন কারণেই হোক ও আজ চটেছে। দিলীপের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শীতলবাবুর দিকে তাকিয়ে করবী বলল, 'আপনিই বা ছেলেমানুষের কাছে ভাড়ার কথা তুলতে গেছেন কেন শীতলবাবু। যা বলবার আমাকে বললেই পারতেন।'

শীতলবাবু বললেন, 'আপনাকেই তো বলতে এসেছিলাম মা। কিন্তু ছোকরা সামনে এসে চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা আরম্ভ করল। দেখতে ছেলেমানুষ হ'লে কি হবে, ভিতরে পেকে গেছে।'

করবী প্রতিবাদ করে বলল, 'না শীতলবাবু দিলীপ আমাদের তেমন ছেলে নয়।'

শীতলবাবু একটু হেসে বললেন, 'না হলেই ভাল মা। নিজের বাড়ির ছেলের কি কোন দোষ থাকে? থাকে না। সে যাকগে। আমি ভাড়ার জন্যে এসেছিলাম। আর তো দেরি করা যায় না। এর আগে ছু-দিন এসে ঘুরে গিয়েছি। কর্তা বড় তাগিদ দিচ্ছেন। এমাস নিয়ে ছু'মাস হোল।'

করবী গম্ভীর মুখে বলল. 'আচ্ছা, আপনি পরশু আসুন।'

শীতলবাবু বললেন, 'আবার পরশু? আচ্ছা। কিন্তু আর যেন কথার নড়চড় না হয়। তাহলে বড়ই অসুবিধেয় পড়ব মা।' শীতলবাবু বিদায় নিলেন।

করবী মুখ ভার করে বাড়ির ভিতরে ঢুকল।

আড়াল থেকে নিভাননী সব শুনছিলেন। তিনি বিরস ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমাদেরই

বা এ কোন্ ধরনের গৃহস্থালী বাপু। বাড়ি ভাড়াটা আগে চুকিয়ে দিলেই হয়। দু-দিন দেরি হলে যারা রোজ তাগিদ দিতে আসে, তাদের টাকা ফেলে রেখে সাধ করে কেন অপমান কুড়োন। আমার আর কিছু ভাল লাগে না।'

শাশুড়ীর কথার জবাব না দিয়ে করবী ঘরের ভিতরে চলে গেল। সত্যি সব অবস্থার জন্যে সেই তো দায়ী। বই ছাপানোর জন্যে শ' খানেক টাকা বেহিসেবী ব্যয় করে ফেলে এখন আর কিছুতেই কুলোতে পারছে না করবী। বড় ভুল হয়ে গেছে। বড় অবিবেচকের মত কাজ করে ফেলেছে করবী। সময় আর সুযোগ মত পরেশের বইখানা প্রকাশ করলেই হত। তার পরিবারের লোকজনই যদি কষ্ট পেল, বাইরের লোকের কাছে অপমানিত হল, তাহলে করবী নিজের দায়িত্ব পালন করল কি করে। স্বামীর বই নিজের চাকরির টাকায় প্রকাশ করে যে আত্মপ্রসাদ কিছুদিন আগেও বোধ করেছিল করবী, এই মুহূর্তে তার চিহ্নমাত্র রইল না। বরং অবসাদ আর নৈরাশ্যে মন ভরে উঠল করবীর। কি করে চালাবে সংসার। সামান্য স্কুল মাস্টারীর টাকায় এদের সে বাঁচিয়ে রাখবে কি করে। মান-সম্মান নিয়ে কি করে বেঁচে থাকতে পারবে।

'বউদি, তুমি রাগ করেছ?'

কখন দিলীপ এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। করবী চমকে উঠে ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, তারপর শান্তভাবে বলল, 'না, রাগের কি আছে?'

দিলীপ বলল, 'আমি তোমাকে বড় রূঢ় কথা বলেছি। শীতলবাবুর কথাগুলি আমার সহ্য হচ্ছিল না তাই—'

করবী সস্নেহে ওর পিঠে হাত রাখল, 'তা আমি জানি দিলীপ। তাতে কি হয়েছে। দোষ তো আমারই, দায় তো আমারই। তুমি যাও, মন স্থির করে পড়াশুনো করো গিয়ে।'

দিলীপ বলল, 'পড়াশুনোয় আমার কিছুতেই আর মন বসছে না বউদি। আমি ভেবেছি পড়া এখনকার মত বন্ধ রাখব।'

করবী অবাক হয়ে বলল, 'ছিঃ, ওসব তুমি কি বলছ দিলীপ। বাড়িওয়ালার লোক দু-দিন এসে তাগিদ দিয়ে গেছে। এতেই তুমি এত বিচলিত হয়েছ! কিন্তু আরও কত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে আমাদের চলতে হবে ভাই। ভয় করলে তো হবে না।'

দিলীপ বলল, 'দুঃখ-কষ্টকে মোটেই ভয় করছি নে বউদি। কিন্তু মেয়েছেলে হয়ে তুমি একা একা যে কষ্ট করছ, দিনরাত সংসারের জন্যে এত খাটছ, তা আমি সইতে পারছি নে।'

শীতলবাবু নেহাৎ মিথ্যা বলেন নি। বয়সের তুলনায় দিলীপ সত্যিই যেন একটু

ভারিক্কি হয়ে পড়েছে। করবী ওর কথার ভঙ্গিতে একটু হাসল, 'মেয়েছেলে হয়ে একা খাটছি বলে পুরুষ ছেলের বুঝি মানহানি হয়েছে। ঈস্, কত বড় পুরুষ তুমি।'

দিলীপ লজ্জিত হয়ে বলল, 'না, তা নয়। কিন্তু আমি যদি কাজকর্ম করে তিরিশ চল্লিশ টাকাও এনে দিতে পারি, তোমার তো কিছু সাহায্য হয়। লক্ষ্মী স্টোর্সের সুধাংশুবাবু বলেছিলেন, আমি যদি চাই, সেলসম্যানের কাজ দিতে পারেন আমাকে। তাঁদের একজন অল্পবয়সী সেলসম্যান নাকি দরকার।'

করবী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। এই চোদ্দ পনের বছরের ছেলেটি এত কথাও ভাবছে। এর মধ্যে পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি করবার চিন্তা করছে ও। হঠাৎ অসীম মমতায় মন ভরে উঠল করবীর। এদের জন্যে সে আরও খাটবে, আরও কষ্ট করবে। সকাল বেলায় আরও একটা কি দুটো টিউশানি জুটিয়ে নেবে। চেষ্টা করবে বেশি মাইনের চাকরিতে ঢুকতে, তবু কিছুতেই ওদের কষ্ট পেতে দেবে না।

দিলীপ আবার বলল, 'তুমি কি রাগ করলে, বউদি?'

করবী বলল, 'হ্যাঁ, রাগ করেছি। তুমি যত সব বাজে কথা বলবে, বাজে চিন্তা করবে আর আমি রাগ করব না?'

দিলীপ কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। করবী বলতে লাগল, 'ওসব ভাবনা তুমি ছেড়ে দাও। কারো কথায় কান দিয়ো না, যত কষ্টই হোক তোমাকে পড়তেই হবে। তোমার দাদার মত এম. এ. পাশ করতে হবে তোমাকে, তুমি মানুষ হলে তবেই তো আমাদের আশা ভরসা, তুমি মানুষ হলে তবেই তো পিপলুকে মানুষ করার চেষ্টা করবে। আমি যে তোমার মুখ চেয়েই বসে আছি ভাই।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। পরস্পরের মধ্যে সেই নিবিড় অন্তরঙ্গতা যেন আবার ফিরে এসেছে।

কিছুদিন যাবৎ দিলীপের মনে ভারি একটা অভিমান জন্মেছিল। বউদি যেন বড় বেশী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। বই বই করে এমন মেতেছে যে আর কোন দিকে আর কারো দিকে তার লক্ষ্য করবার অবসর মাত্র নেই। অবশ্য বই তার দাদারই। কিন্তু অরুণবাবুর এমন ভাব, যেন তার সবটুকু কৃতিত্ব তার। তার দাদা বইখানার একজন মৃত লেখক ছাড়া কিছু নয়। মনে মনে ভারি অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল দিলীপ। ইদানীং কেন যেন অরুণকে তার আর তেমন সহ্য হয় না, ভাল লাগে না বউদির সঙ্গে তার অতখানি ঘনিষ্ঠতা, অত অন্তরঙ্গতা। এই নিয়ে পাড়ার বকাটে ছেলেদের এক-আধটু ঠাট্টা তামাসাও কানে গেছে দিলীপের। দিলীপ অবশ্য তাদের ধমকে দিয়েছে, তাদের কথা মোটেই কানে তোলে নি। তবু তো বউদির একটু সাবধানে থাকা উচিত। দিলীপ

কদিনই ভেবেছে, বউদিকে কথাটা বলবে। কিন্তু বলি বলি করেও বলতে পারে নি। অদ্ভুত এক সঙ্কোচ বোধ করেছে। ছিঃ, ওকথা কি বলা যায়। বউদি হয়তো মনে দুঃখ পাবেন। ভাববেন, পাড়ার বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে দিলীপও বকাটে হয়ে গেছে। না, ও কথা সে বলতে পারবে না, মরে গেলেও না। হঠাৎ দিলীপের মনে পড়ল পরশু দিন শীতলবাবুকে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার কথা বলেছে বউদি। কিন্তু কি করে দেবে?

একটু ইতস্তত করে কথাটা সে স্পষ্ট জিজ্ঞেসই করে বলল, 'সোমবার তুমি কি করে টাকা দেবে বউদি? অত টাকা পাবে কোথায়?'

করবী বলল, 'সে তোমাকে ভাবতে হবে না। ধার-টার করে কোন রকমে চালিয়ে দিতেই হবে।'

দিলীপ বলল, 'কার কাছ থেকে ধার করবে?'

করবী বলল, 'দেখি ভেবে।'

দিলীপ হঠাৎ বলে বসল, 'আর যাই কর, অরুণদার কাছে ধার চেয়ো না।'

করবী চমকে উঠে দিলীপের মুখের দিকে তাকাল, 'কেন দিলীপ, ও কথা বলছ কেন? তাঁর কাছে ধার চাইলেই বা দোষ কি?'

দিলীপ বলল, 'না, দোষ কিছু নেই। তবে তিনি তো বাইরের লোক।'

করবী বলল, 'ধার তো আমাদের বাইরের লোকের কাছেই চাইতে হবে। ভিতরের লোক আর কোথায় পাব। অরুণবাবু আমাদের পরিবারের বন্ধু। অনেক সময় অনেক উপকার করেছেন। তাঁকে অশ্রদ্ধা করা আমাদের কারোই উচিত নয় দিলীপ।'

দিলীপ বলল, 'অশ্রদ্ধা আমি করি নি বউদি। অমনিই বলছিলাম। যাই পড়ি গিয়ে। কালকের অনেক পড়া বাকি আছে।' বলে দিলীপ আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সম্বন্ধটা বৈদ্যনাথই উপস্থিত করলেন। তাঁর অফিসের সহকর্মী বিপিন সরকারের ছেলে। বি. এ. পাশ করেছে। ফুড ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করে। এল্যাউন্স-ট্যালাউন্স মিলিয়ে শ' দেড়েক টাকার মত পায়। ছেলেটিকে দেখেছেন বৈদ্যনাথ; কথায়-বার্তায় বেশ চটপটে চালাক চতুর। এমন ছেলে জীবনে উন্নতি না করেই পারে না। আজকালকার ছেলেদের তো স্বাস্থ্যের দিকে তেমন লক্ষ্য নেই। মেয়েদের মত সাজগোজ পোশাক-আশাক নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু বিপিনবাবুর ছেলে রণজিৎ তেমন নয়। স্বাস্থ্য তার ভালোই। স্কুল কলেজে পড়বার সময় ব্যায়াম-ট্যায়াম করত। মাথার ওপর মা বাপ আছে, দাদা বউদি আছে। পাঁচজনের সংসার। বড়লোক না হলেও খাওয়া-পরার কোন কষ্ট নেই। এর চেয়ে ভাল সম্বন্ধ আর কি হতে পারে?

রান্নাঘরে বঁটি পেতে তরকারি কুটছিলেন বৈদ্যনাথ। পরনে নীল রঙের লুঙ্গি। এই মাত্র বাজার সেরে এসেছেন। কিন্তু বাজার করে দিয়েই ক্ষান্ত হন না বৈদ্যনাথ। কোন্ বেলা কি রান্না হবে, কিসে কোন্ তরকারি খাটাতে হবে স্ত্রীকে তারও নির্দেশ দেন। ইদানীং বৈদ্যনাথের কাজ আরও বেড়েছে। একদিন বাজার থেকে তিনপো আলু আর আধসের পটল এনেছিলেন, আর আনা চারেকের পুঁই শাক। মাছের বেশি দর বলে মাছ আনেন নি। কনকলতা তো বাজার দেখে রেগেই আগুন, 'এ বাজারে এতগুলি লোকের দু-বেলা কি করে পোষাবে? তুমি রাঁধো-বাড়ো এসে, আমি চললুম ঘর ছেড়ে।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'দেখ মাছ তরকারি কোটা আর রাঁধার ওপর সব নির্ভর করে। তা জানলে এ তো ভাল, এর অর্ধেক জিনিসেও সবাইকে পুষিয়ে দেওয়া যায়। তুমি যেভাবে মাছ কোট, যেরকম পোয়াটাক পরিমাণ খণ্ড করো এককেখানা, তাতে তিন সের মাছেও কুলোয় না। আবার তেমনভাবে দিতে থুতে জানলে তিনপোতেও কুলিয়ে দেওয়া যায়।'

কনকলতা রাগ করে বলেছিলেন, 'বেশ, এর পর থেকে তুমিই কুটে-টুটে দিয়ো। রান্নাবাড়া দেওয়া-থোওয়া তুমিই করো এসে। আমি কিন্তু পারব না।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'উঁহু। পারব না বললে তো আর সংসার চলে না। আমি যেভাবে দেখিয়ে শুনিয়ে দেব, আমি যেভাবে ডাইরেকশন দেব, সেইভাবে চলতে হবে।'

তারপর থেকে বঁটি নিয়ে তরকারি কুটতে বসে গেলেন বৈদ্যনাথ। শুধু হিসেব করে বাজার করাটাই এখনকার দিনে কোন কাজের কথা নয়, রান্না-বাড়ার সময়েও যদি হিসেবটা না রক্ষা করে চলা যায় তাহলে সংসারে আয় দেয় না। এর আগে বলে বলে হয়রান হয়েছেন বৈদ্যনাথ, কনকলতা তাঁর পরামর্শকে কাজে লাগাতে পারেন নি। তাই হাতে-কলমে স্ত্রীকে বৈদ্যনাথ দিনকয়েক দেখিয়ে দিতে লাগলেন।

ছেলেকে বঁটিতে তরকারি কুটতে দেখে ভুবনময়ী বললেন, 'ও বৈদ্য, তরকারি আমি কুটে দিচ্ছি, তুই ওঠ। শেষে হাত কেটে মরবি।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'কিচ্ছু হবে না মা, তুমি ওখানে চুপ করে বসে থাক, পারি কি না পারি দেখ।'

ভুবনময়ী বললেন, 'কিন্তু তোর এসব পারার দরকারই বা কি। বউ রয়েছে, মেয়েরা রয়েছে, আমিও তো সাধ্যমত যা করবার করছি। বাড়িতে তরকারি কুটবার লোকের অভাব আছে নাকি, তুই তোর কাজে যা।'

বৈদ্যনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এও একটা কাজ মা। আজকালকার দিনে কিভাবে সংসার চালাতে হয়, তা তোমাদের সবারই শেখা দরকার। আয়টা সংসারে সবাই করতে

পারে না, কিন্তু ব্যয়টা সবাই যদি বুঝে-শুনে করে তাহলে তার কাছ থেকেও প্রায় earning member-এর সাহায্যই পাওয়া যায়। তোমাদের সেই আগেকার আমল আর নেই। যত খুশি আনছ নিচ্ছ, ঢালছ খাচ্ছ। তা নেই এখন। যদি বাঁচতে হয় সবাইকে পা টিপে টিপে হিসেব করে চলতে হবে। না হলে পদস্খলন কেউ আটকাতে পারবে না।'

শুধু মুখের বক্তৃতাতেই নয়, নিজের পছন্দমত নিজের হিসেবমত মাছ তরকারি কুটে বৈদ্যনাথ দেখিয়ে দিলেন, তিনি সব পারেন। মেয়েলি কাজেও তাঁর সমান নৈপুণ্য আছে। কিন্তু স্বামীর এই নৈপুণ্যে কনকলতা যে তেমন খুশী হন তা নয়। প্রায়ই বলেন, 'আমার হাতের কাজ যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে আমাকে বিদায় করে দাও। এসব কি কাণ্ড। মেয়েদের কাজে যদি পুরুষে হাত বাড়াতে আসে সব সময়, তাহলে কি ভাল লাগে?

বাসন্তী হেসে বলেন, 'আহা অমন করো কেন বউদি, ভাল বুঝে তোমায় সাহায্য করতে আসে। আর তুমি কিনা—'

কনকলতা মুখ ঘুরিয়ে বলেন, 'কাজ নেই আমার অমন সাহায্যে। জ্বালায় জ্বালায় একেবারে অস্থির হয়ে গেলুম ঠাকুরঝি, আমার হাতের তরকারি কোটা পছন্দ হবে না, জামায় বোতাম লাগানো পছন্দ হবে না, বিছানা পাতা পছন্দ হবে না। সব নিজের হাতে করবেন তবে হবে। মেয়েদের কাজ এতই যদি অপছন্দ তবে আর বিয়ে করার দরকার ছিল কি। ঘোমটা দিয়ে নিজেই নিজের বউ সেজে থাকলেই হত। সেই যে সং দেখেছিলাম, একটি লোকের এক অঙ্গ পুরুষ আর এক অঙ্গ মেয়ে, তোমার দাদাটিও তাই। উনি একাই তোমার দাদা আর বউদি। এ সংসারে আমার আর কোন দরকার নেই।'

বাসন্তী হাসতে থাকেন। হাসতে হাসতে বলেন, 'তুমি এই কথা বলছ আর আমার ভাগ্য একেবারে উল্টো। মাথা কুটে মরলেও ওকে দিয়ে সংসারের কোন কাজ হয় না। না পুরুষের কাজ, না মেয়েদের কাজ। কিছুতেই হাত দেবেন না। একেবারে নিষ্কর্মার গোঁসাই ঠাকুর। কেবল মাইনের টাকাটি এনে দিয়েই খালাস।'

কনকলতা বললেন, 'নিষ্কর্মা তো তুমি বানিয়েছ। তুমি অবনীবাবুকে কিছু করতে দাও যে তিনি কিছু করবেন? সেদিক থেকে তুমিও অর্ধনারীশ্বর। তোমাদের ভাই-বোনের মধ্যে বেশ স্বভাবের মিল আছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, তোমরা যদি ভাইবোন না হতে, তোমরা যদি—'

বাসন্তী ধমক দেন, 'কি যা তা শুরু করেছ। তোমার মুখ তো নয়—'

কনকলতা মুখ টিপে হাসেন।

বাসন্তী মনে মনে ভাবেন, এর চেয়েও তো বেশি মিল ছিল তাঁর দাদার সঙ্গে। শুধু

স্বভাবের মিল নয়, মনের মিল, অন্তরের মিল, ভাবের মিল। সে মিল কোথায় মিলিয়ে গেল। দুজনে এত কাছাকাছি আছেন, নিত্য দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে, তবু যেন মনে হয়, কত দূরের মানুষ। যেন নিজের দাদা নয়, সম্পূর্ণ পর, ভাড়াটে বাড়ির আলাদা এক ঘর ভাড়াটে মাত্র। একেক সময় পরের চেয়েও নিষ্ঠুর ব্যবহার করে দাদা। সামান্য কারণে কথা বন্ধ করে থাকে। পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও মুখ তুলে তাকায় না, যেন কারো সঙ্গে কারো চেনা-পরিচয়টুকুও নেই।

কিন্তু প্রীতির সম্বন্ধ উপলক্ষ করে বৈদ্যনাথ আবার যেন বোনের কাছে এসেছেন। ঠিক আগের মতই অন্তরঙ্গ ধরনে কথাবার্তা শুরু করেছেন। এই ছেলেটির কথা বৈদ্যনাথ আগেও বাসন্তীকে দু-একদিন বলেছেন। আজও সেই প্রসঙ্গ তুলে ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র আর বাড়ি-ঘরের অবস্থার কথা বর্ণনা করে বাসন্তীকে জিজ্ঞেসা করলেন, 'বিপিনবাবু তো আমাকে অস্থির করে তুলল বাসি, তাঁকে কি বলি বল তো। আমার মুখে মেয়ের রূপের প্রশংসা শুনে তিনি তো রোজই প্রীতিকে দেখতে আসতে চান। একটি সুন্দরী বউ ঘরে নিতে তাঁর ভারি সাধ। মেয়ে দেখে যদি পছন্দ হয়—পছন্দ হবেই, প্রীতিকে যে দেখবে সে-ই পছন্দ করবে, তাহলে দেনা-পাওনার ব্যাপারে তেমন কিছু আটকাবে না, বিপিনবাবু সে ইঙ্গিতও দিলেন।'

বাসন্তী চালের ভিতর থেকে কাঁকরগুলি বেছে ফেলতে ফেলতে বললেন, ওসব কথা আমাকে বলা কেন দাদা। যাদের মেয়ে, যারা বিয়ে দেওয়ার কর্তা তাদেরই কোন গা নেই, গরজ নেই। ও সব শুনে আমি কি করব ?'

ভুবনময়ী কাছেই বসেছিলেন। তিনি রাগ করে ধমক দিয়ে উঠলেন, মুখ বিকৃত করে বললেন, 'আমি কি করব। ঢঙের কথা তুই আর বলিস নে বাসি, শুনলে আমার গা জ্বালা করে! তোদের ভাব চরিত্তির দেখলে তোদের সঙ্গে আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কেন তুই বা শুনবি না কেন ? তোর কি পেটের মেয়ে নয় ? সে সুখে থাকলে তুই সুখে থাকবি নে ? না কি কোন নিন্দামন্দ হলে, একজন এক কথা বলে বসলে তোর বুকে বাজবে না ? তবে ? অবনীকে তুই বলেছিলি ?'

বাসন্তী বললেন, 'বলেছিলাম।'

ভুবনময়ী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বলল ?'

বাসন্তী বললেন, 'নতুন আর কি বলবে। সেই একই কথা। আমার হাতে এখন টাকা নেই। মেয়ের বিয়ে কি করে দেব ?'

ভুবনময়ী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তার হাতে কবেই বা টাকা হল। মেয়ের বিয়ের কথা তুললেই তো তার হাতে টাকা থাকে না। এদিকে দান-ধ্যানের বেলায় তো টাকার

অভাব হয় না। অমুক বউদি, অমুক বন্ধুকে মাসের মাস সাহায্য তো লেগেই আছে। বাড়ির লোকে খেতে পাক আর না পাক, অসুখ-বিসুখে পরিবারের চিকিৎসা হোক আর না হোক তার পুণ্য বজায় থাকলেই হল। তাহলেই সংসারের লোক সব তরে যাবে। কিন্তু টাকা নেই বলে তো আর মেয়ের বয়স অপেক্ষা করে থাকবে না। এখনই তো বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে। এই ফাল্গুনে উনিশ গেল না?'

বাসন্তী বললেন, 'না মা, এই উনিশে পড়ল।'

ভুবনময়ী হাসলেন। তাঁর কাছেও মেয়ের বয়স চুরি করছে বাসন্তী। প্রীতির বয়স উনিশ নয়, ঠিক কুড়ি। বৈশ্বের ছেলে বিজু হল আষাঢ়ে, তার পরের ফাল্গুনে হল প্রীতি। প্রত্যেকটি নাতিনাতনীর বয়স ঠিক আছে ভুবনময়ীর। ঠিক আছে ওদের জন্মবার। বয়সের হিসেব ওদের মা-বাবার ভুল হতে পারে, কিন্তু তাঁর ভুল হয় না।

ভুবনময়ী বললেন, 'উনিশই হোক, কুড়িই হোক, বিয়ের বয়স তো আর বসে থাকছে না। তুই অবনীকে ভাল করে বল। এ সম্বন্ধ বিনা চেষ্টায় হাতছাড়া করা উচিত নয়। অবশ্য প্রজাপতির নির্বন্ধ যেখানে আছে সেখানে হবেই। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে বিধাতাকে নিয়ে। মানুষের হাতে সব নয়। তবু চেষ্টাচরিত্র বাপমাকে না করলে কি চলে? তুই বল অবনীকে।'

বাসন্তী বললেন, 'আমি বলে বলে হার মেনেছি মা। আমি বলতে গেলেই ঝগড়া লাগবে। রোজ একবার করে প্রীতিকে নিয়ে ঝগড়া হয়, আর একবার অতুলকে নিয়ে। জামাই তো তোমার খুব বাধ্য। তুমি দেখ না বলেকয়ে।'

ভুবনময়ীই বলবার ভার নিলেন। আফিসে যাওয়ার আগে অবনী যখন খেতে নামলেন নিচে, নিজের ঘর থেকে বাটিতে করে খানিকটা নিরামিষ তরকারি এনে জামাইয়ের পাতের সামনে এগিয়ে দিয়ে একপাশে একটু সরে বসলেন ভুবনময়ী।

অবনী মৃদু হেসে নিজের মনে খেয়ে যেতে লাগলেন।

ভুবনময়ী বললেন, 'কেমন হয়েছে রান্না?'

অবনীমোহন মুখ তুলে তাকালেন একবার শাশুড়ীর দিকে, পরে বললেন, 'ভাল।'

ভুবনময়ী বললেন, 'তবু ভাল যে তোমার মুখের একটু কথা শুনলুম। কিছু জিজ্ঞেস না করলে আজকাল আর কোন্ কথা বল। সপ্তাহের সাতদিনই যেন মৌনব্রত নিয়ে বসে আছ। দিনরাত এত কি ভাব বল দেখি।'

খেতে খেতে একটু হাসলেন অবনীমোহন, মৃদুস্বরে বললেন, 'কই কিছু ভাবি নে তো।'

ভুবনময়ী বললেন, 'আমার তো মনে হয় দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই তুমি কিছু না কিছু ভাবছ। আগে আগে অফিস থেকে ফিরে একবার করে আমাদের ঘরে যেতে,

কথাবার্তা বলতে। আজকাল আর সে সব কিছু নেই।'

একটু যেন নিঃশ্বাস ছাড়লেন ভুবনময়ী।

অবনীমোহন একটু কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি ব্যস্ত থাকেন—'

ভুবনময়ী বললেন, 'ব্যস্ত থাকলেই বা কি। মানুষ মানুষের খোঁজখবর নেয় না?' অবনীমোহন কোন জবাব দিলেন না।

ভুবনময়ী এবার আসল কথায় এলেন, 'বৈগু তো প্রীতির এক সম্বন্ধ এনে হাজির করেছে, শুনেছ নাকি কিছু?'

অবনীমোহন বললেন, 'শুনেছি।'

ভুবনময়ী বললেন, 'তাদের নাকি খুবই গরজ। আমি বলি কি, একটা দিনটিন ঠিক করো, তারা এসে দেখে যাক।'

অবনীমোহন বললেন, 'কিন্তু শুধু দেখে গেলেই তো হবে না। আমরা এদিকে তৈরী হতে পারছি কই। মৃগাঙ্কের আবার চাকরি গেল। সংসারের এই খরচ। চালিয়ে রাখাই কঠিন।'

ভুবনময়ী বললেন, 'কঠিন ছাড়া তোমার মুখে সহজ কথাটা কোন্‌দিন আর শুনলাম বাপু? কিন্তু সহজই হোক, কঠিনই হোক, সংসারে যা কর্তব্য তা তো করতেই হবে। আর মৃগাঙ্কের চাকরির কথা বলছ, ওর তো বছরের মধ্যে দুবার যায়। তার চাকরি-বাকরির সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্পর্ক কি। তারা কি কেউ কোন ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়, না ঘামাবে?'

অবনীমোহন ফের শাশুড়ীর দিকে তাকালেন। শ্বশুরবাড়ির কেউ তাঁর ভাইদের সম্বন্ধে কোনরকম আলোচনা সমালোচনা করুক, তা তিনি পছন্দ করেন না। আজকের আলোচনাও যে তাঁর মনঃপূত হচ্ছে না, সেকথা তিনি শুধু তাকাবার ভঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিলেন।

ভুবনময়ী জামাইয়ের ভঙ্গি দেখে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। এতকাল একসঙ্গে এক জায়গায় আছেন, তবু অবনীর এই পর পর ভাবটা গেল না। ওদের সংসারের কোন ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে অবনীর কাছ থেকে কোনদিন কোন্ উৎসাহ পাওয়া যায় না। অথচ এক জায়গায় থাকতে গেলেই কথা আসে। চোখের ওপর অন্যরকম ভাব-চরিত্র দেখলেই লোকে তা বলে। কিন্তু অবনী তা চায় না। বেশ না চায় না চাইল। নিজের পরিণাম নিজেই একদিন টের পাবে। নেহাতই মেয়েটা চোখের সামনে রয়েছে, তাই তার ভালোমন্দের কথা না ভেবে পারেন না ভুবনময়ী, নইলে কে যেত অন্যের সংসারের কথার মধ্যে থাকতে।

একটু চুপ করে থেকে ভুবনময়ী বললেন, 'সেকথা যাক, তোমার ভাই চাকরি করুক আর নাই করুক, তোমাদের সংসারের জন্যে কেউ ভাবুক আর নাই ভাবুক, তা আমার বলতে যাবার কি দরকার। তবে যেটুকু বলা কর্তব্য মনে করলাম বললাম। এখন তোমার যা ইচ্ছা, তাই কর।'

বলে বেশ একটু রাগ করেই উঠে গেলেন ভুবনময়ী। আস্তে আস্তে খাওয়া শেষ করে অবনীমোহনও উঠে পড়লেন। তাঁর মনে হল শাশুড়ীর সঙ্গে ব্যবহারে সৌজন্যের হানি ঘটেছে। মুখে কিছু বলেন নি বটে, কিন্তু ভঙ্গিতে রূঢ়তা ফুটে উঠেছে। একটু যেন লজ্জিত হলেন অবনীমোহন। মুখ ধুয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার আগে শাশুড়ীর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভুবনময়ী ফের রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অবনীমোহন একটুকাল দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'তা পাত্রপক্ষের কি রকম দাবি-দাওয়া সে কথা কিছু বললেন বৈগুবাবু।'

ভুবনময়ীর রাগ পড়ে নি। তিনি বললেন, 'কি জানি বাপু, বৈগু তো বাড়িতেই আছে, যা শুনবার তার কাছেই শোন গিয়ে।'

অবনীমোহন ফিরে যাচ্ছিলেন, ভুবনময়ী ফের কথা শুরু করলেন, শুনেছি তো দাবি-দাওয়া তাদের কিছু নেই। পণ-টন কিছু দিতে হবে না; তবে ছেলের বিয়েয় তো ঘরের টাকা কেউ খরচ করে না, বাড়ি-খরচটা মেয়েপক্ষকেই বহন করতে হয়।'

অবনীমোহন একটু হাসলেন, 'তারপর গয়নাগাটি, ভোজনপাত্র, যা নিয়ম আছে সবই—'

ভুবনময়ী বললেন, 'হ্যাঁ, নিয়মমত সবই করতে হবে। আর পাঁচজনে যা করে, তুমিও তাই করবে। এমন তো নয়, তুমি ছনিয়ায় প্রথম মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছ।'

অবনীমোহন আর দাঁড়ালেন না, তাঁর অফিসের বেলা হয়ে গেছে।

অফিসে গিয়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে খানিকক্ষণ কি চিন্তা করলেন। ধার নিয়ে নিয়ে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে জমানো টাকাটা তলায় এসে ঠেকেছে। আর সেখান থেকে তুলবার কিছু নেই। আড়াই হাজার টাকার একটি ইন্সিওরেন্সের পলিসি অবশ্য সামনের মাসে ম্যাচিওর করবে। কিন্তু সে টাকায় কি সব খরচ পোষাবে। তা ছাড়া ওই টাকার সবই যদি মেয়ের বিয়েয় খরচ করে বসেন, তাহলেই বা চলবে কি করে। অনেক দেনা ওই টাকায় শোধ করবার কথা ভেবেছেন অবনীমোহন। কিন্তু শোধ করা আর হয়ে উঠছে কই। বছরের পর বছর সুদসমেত ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। দেশের ভূ-সম্পত্তি যা আছে, তা ব্যবসায়ী মহাজনের কাছে বন্ধক পড়েছে। বাকি অংশের খাজনা অল্পস্বল্প যা আদায় হয়, তা সেখানকার জ্ঞাতিরাই ভোগ করেন। এখানকার ভরসা শুধু

চাকরি। অবনীমোহনের মাইনের অঙ্কটা শুনতে মন্দ শোনায় না। সব মিলিয়ে সাড়ে চারশ' পাচ্ছেন আজকাল। কিন্তু পেলে কি হবে। মাসের অর্ধেক কাটতে না কাটতে সব নিঃশেষ হয়ে যায়। নিজের হাতখরচ আর অন্য সব খরচ রেখে মৃগাঙ্ক যা দেয়, তাতে মাসের বাকি দিনগুলি কুলোতে চায় না। ভারি টানাটানি পড়ে, অশান্তি আর খিটিমিটির মাত্রা বেড়ে ওঠে। পরের মাসের মাইনে না পাওয়া পর্যন্ত সেই খিটিমিটির আর জের মেটে না, তবু এমনি করেই মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে। আর শিগগির যে এ অবস্থা পাল্টাবে, তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। নিজের মনেই চিন্তা করতে থাকেন অবনীমোহন। তবু এরই মধ্যে ছেলেদের আর মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থাটাও সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলতে হবে। সেগুলিও গার্হস্থ্য কর্তব্য। সংসারের এই আর্থিক অবস্থায় সে কর্তব্য যত অসাধ্য বলেই মনে হোক, সেগুলিও বাদ রাখলে চলবে না। ফেলে রাখতে অবনীমোহন চানও না; কিন্তু প্রত্যেক মাসে জমার তুলনায় খরচের অঙ্কটা ভারি হওয়ায় মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতেই সাহস পান নি অবনীমোহন। এমনি করে করে বছরের পর বছর কেটে গেছে। প্রীতির বয়সটা হঠাৎ যেন আবার নতুন করে হিসেব করলেন অবনীমোহন। বয়সটা ওর একটু বেশিই হয়েছে। নিজে যখন বিয়ে করেছিলেন স্ত্রীর বয়স ছিল চৌদ্দ। কিন্তু সে আমল আর নেই। এখন একটু বেশি বয়সেই বিয়ে হয় ছেলে-মেয়েদের। তবু অবনীমোহনের মতে সতের-আঠারোর মধ্যেই বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত, তার ওদিকে যাওয়াটা সঙ্গত নয়। কিন্তু সাধ্যের সঙ্গে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজের রুচি আর মতামতের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন কই অবনীমোহন। সংসারের আরও পাঁচজনের ভাবনা ভেবে আরও পাঁচরকম বিবেচনা করে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সাধ-আহ্লাদকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। একান্নবর্তী পরিবারের তাই রীতি। নিজের বাবার কাছে এই শিক্ষাই পেয়েছেন অবনী-মোহন, গাঁয়ের বাড়িতে তিনি ছিলেন আরও বড একটি পরিবারের কর্তা। সবাইকে শাসন যেমন করতেন, স্নেহও করতেন তেমনি। অবনীমোহনের মধ্যে তাঁর বাবা অভয়-চরণের সেই শৌর্য নেই, সেই প্রতাপ নেই, পৌরুষ আর কাঠিন্যের ভাগটাও কম হয়েছে। কিন্তু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই বলে পৈতৃক গুণের যেটুকু পাবার ভাইয়ের তুলনায় অবনীই বেশি পেয়েছেন। অবনীমোহন জানেন, বাপের অনেক কিছুই তিনি পান নি। বাবা যেতেই জমিদারি বিষয়সম্পত্তি যেমন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, তেমনি অনায়ত্ত রয়ে গেছে তাঁর খ্যাতি, যশ, ব্যক্তিত্ব। একজন তো আর একজনের সব কিছু পায় না, একজন তো আর একজনের সম্পূর্ণ প্রোটোটাইপ হতে পারে না, অবনীমোহনও পারেন নি। আগে আগে সেজন্য দুঃখ হত, এখন আর হয় না। আজকাল নিজের ক্ষমতার

সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিজের সাধ্যের সীমার মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। তাছাড়া সেই আগেকার আমল তো আর নেই। গাঁয়ের জমিদারি গেছে, দেশের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে প্রায় কোন সম্পর্কই আর নেই। এখন ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দা, এখন সব গৌরব, সব প্রভুত্ব এসে ঠেকেছে নিজেদের এই একান্নবর্তী সংসারের কর্তৃত্বে, আর অফিসের একটি ছোট ডিপার্টমেণ্টের কয়েকজন কেরানীর অধিনায়কত্বে। তবু অবনীমোহন পণ করেছেন এই ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে নিজের হৃদয়কে ছোট হতে দেবেন না, নিজের ধর্মকে খাট করবেন না। সুদিন দুর্দিনে এই একই লক্ষ্য আঁকড়ে রেখেছেন অবনীমোহন। ঘরের দেয়ালে টাঙানো অভয়চরণের বড় একখানা অয়েলপেন্টিং-এর নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতদিন মনে মনে প্রার্থনা করেছেন, 'বাবা, আমি আপনার মত হতে পারলাম না, কিন্তু আশীর্বাদ করুন যেন নিজের মত হতে পারি।'

অফিস থেকে ফিরে আজও একবার বাবার সেই প্রতিকৃতির দিকে তাকালেন অবনীমোহন, তারপর চাদরটা রেখে দিয়ে আলনার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খদ্দরের জামার বোতাম খুলতে লাগলেন।

একটু বাদে বাসন্তী এসে পাশে দাঁড়ালেন, বললেন, 'আজ যে বড় সকাল সকাল ফিরলে। হঠাৎ এমন সুমতি যে।'

পশ্চিমের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন অবনীমোহন। দিনের আলো প্রায় শেষ হয়েছে। কিন্তু একেবারে মিলিয়ে যায় নি। সামনের বাড়ির বারান্দায় সারি সারি সাজানো কয়েকটি ফুলের টব। প্রত্যেকটি টবে রঙ-বেরঙের বিদেশী সীজন ফ্লাওয়ার। একটি গাছ ফুলের ভারে একেবারে নুয়ে পড়েছে।

সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ অবনীমোহন বলে উঠলেন, 'সুরেনবাবুর সত্যি ফুলের খুব শখ আছে।'

বাসন্তী বললেন, 'আছেই তো। সবাই তো আর তোমার মত নয়। আমাদের ছাদেও তো দাদা কয়েকটা ফুলের টব এনেছেন। রজনীগন্ধাটা কদিন ধরে বেশ ফুটছে। লক্ষ্য করেছ ?'

অবনীমোহন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'করেছি।' তারপর হঠাৎ বললেন, 'শোন, প্রীতির বিয়েটা এবার দিয়েই দেওয়া যাক। বাড়িতে অনেক-দিন কোন আমোদ-আহ্লাদ হয় না। জীবনটা যেন একেবারে শুকনো হয়ে গেছে।'

বাসন্তী স্বামীর কাছে আরও একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'তোমার মুখে আমোদ-আহ্লাদের কথা। এ যে ভূতের মুখে রামনাম। সত্যি, তোমার তাহলে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার মত আছে ?'

শেষের কথাটায় ঠাট্টার সুর আর রইল না বাসন্তীর। তার কণ্ঠেও বেশ একটু আনন্দের আমেজ লাগল। বললেন, 'তুমি কিচ্ছু ভেব না, আমার গায়ের গয়না তো কিছু আছে। তাই ভেঙে নতুন গয়না ওকে গড়িয়ে দেব। আর নগদ টাকা সে একরকম করে কুলিয়ে নেওয়া যাবে। না হয় আরও কিছু ধার হবে তোমার। তার জন্যে মেয়েটা কি আইবুড়ো থাকবে নাকি চিরকাল? ওর হয়ে গেলে আবার পরেরটির কথা ভাবতে হবে না?'

স্বামীর হাত থেকে জামাটা নিয়ে আলনায় ঝুলিয়ে রাখলেন বাসন্তী, তারপর বললেন, 'তবু ভাল, এতদিন বাদে তোমার মুখ থেকে প্রীতির বিয়ের কথাটা বেরিয়েছে। এবার ওর বিয়েটা নিশ্চয়ই হবে। আমার মন বলছে হবে।'

বাসন্তীর মুখে হাসি ফুটল।

অবনীমোহন বললেন, 'দেখ, প্রীতির বিয়ের কথা আমার মুখ থেকে না বেরোলেও এর আগে আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছি একথা আমি কেন আগে বলব? ওর কাকা আছে, সে বলুক। আরে টাকার জোগাড় তো আমিই করব। কিন্তু সে এগিয়ে আসুক, সে আসুক, সে উদ্যোগী হোক! আমার মেয়ের বিয়ের কথা আমাকে মুখ ফুটে বলতে হবে কেন?'

বাসন্তী বললেন, 'হুঁ, সেইরকম ভাই-ভাগ্যই কিনা তোমার! সে তো কেবল আড্ডা আর বন্ধুবান্ধব নিয়েই আছে। সংসারের কোন খোঁজ রাখে, না ধার ধারে?'

অবনীমোহন বললেন, 'সংসারের সবাই কি একরকম হয়? তাছাড়া আমি মাথার ওপর আছি বলেই ওরকম বেপরোয়া হতে পেরেছে। না হলে কি পারত? মৃগাঙ্ককে তো এখনো ছেলেমানুষ বলেই মনে হয় আমার।'

বাসন্তী অবাক হয়ে বললেন, 'ছেলেমানুষ? চল্লিশ পার হয়ে গেছে না ঠাকুরপোর বয়স!

অবনীমোহন স্নেহার্দ্রস্বরে বললেন, 'পার হয়ে গেলে কি হবে, ওর ছেলে-মানুষী কোনদিন যাবে না। নিজের হবি আর হৈ-হল্লা নিয়েই ও আছে। থাকুক। দেখ, এক কাজ কর, আজ রাত্রে ওকে ডেকে পাঠাও। খাওয়া-দাওয়ার পর ওর সঙ্গে আলোচনা করি।'

বাসন্তী বললেন, 'কিসের আলোচনা?'

অবনীমোহন বললেন, 'প্রীতির বিয়ের।'

বাসন্তী বললেন, 'ও মা, এখনই ঘটা করে এত আলাপ-আলোচনার কি হয়েছে। বরপক্ষ এসে মেয়ে দেখে যাক, তাদের পছন্দ হোক, দাবি-দাওয়ার কথা শুনি, তারপরে ওর সঙ্গে আলোচনা করতে হয় করো।'

অবনীমোহন বললেন, 'উঁহু' পরে নয়, আগে থেকেই ওকে জানাতে হবে। সেইটাই উচিত।'

বাসন্তী একটু বিরক্তির সুরে বললেন, 'তোমার মুখে তো উচিত ছাড়া আর কথা নেই, যাও দয়া করে এবার হাত-মুখটা ধুয়ে এসে। সেইটাও কম উচিত নয়।' তোয়ালেটা স্বামীর দিকে এগিয়ে ধরলেন বাসন্তী।

সন্ধ্যার পর থেকে বার বার ভাই আর বড় ছেলের খোঁজ নিতে লাগলেন অবনীমোহন। না, তারা কেউ ফেরে নি, কখন ফিরবে, তারও ঠিক নেই।

বাসন্তী বললেন, 'এ তো একটা বাড়ি নয়, মেস হোটেলের চেয়েও বাড়া। যার যখন খুশি আসে, যার যখন ইচ্ছে খায়।'

অবনীমোহন বললেন, 'তুমি চুপ কর। নালিশ ছাড়া কি তোমার মুখে আর কোন কথা নেই?'

বাসন্তী বললেন, 'আমি কিছু বললেই তো তোমার গায়ে জ্বালা ধরে। কিন্তু সংসারে যা দিন-রাত দেখতে পাচ্ছি, তাই বলছি।'

অবনীমোহন ফের বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক, থাক।'

অবশ্য দেখতে তিনিও পাচ্ছেন। এক সংসারে একই বাড়িতে থেকেও দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটে, মৃগাঙ্কের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হয় না। কোন মাসে মাইনের টাকাটা নিজেই দিয়ে যায়, কোন মাসে চেয়ে নিতে হয়, এই পর্যন্ত। আর কোন খোঁজ-খবর সে রাখে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, ভাইয়ের সঙ্গে তিনি এক অন্নে আছেন বটে, কিন্তু একই চিন্তা-ভাবনায়, একই দায়িত্বে নেই, যা করবার সব অবনীকেই করতে হয়। কিন্তু এই একনায়কত্ব তো তিনি চান নি। সংসারের সবাই সমান উপার্জন করতে পারে না, তবু সংসারের জন্য মায়া-মমতা, দায়িত্ব-কর্তব্য সকলেরই সমান থাকা দরকার। না হলে শুধু এক হাঁড়িতে ভাত রেঁধে, এক সারিতে বসে খেলেই তো আর একান্নবর্তিতা হয় না। তাছাড়া সেই এক সারিতে বসে খাওয়াই বা হয় কই। দু ভাইয়ের অফিসের সময় এক নয়, দুজনের নাওয়া-খাওয়ার সময়ও তাই আলাদা। এমন কি, ছুটির দিনগুলিতেও একসঙ্গে খাওয়ার জো নেই। মৃগাঙ্ক অতিমাত্রায় সামাজিক, আড্ডাপ্রিয় মানুষ। ছুটির দিনে ওর হয়ত কোন বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ জুটে গেল, না-হয় ফিরল দুটো-আড়াইটেয়। এদিকে নাওয়া-খাওয়ার ব্যাপারে অবনী অত্যন্ত নিয়ম মেনে চলেন। অনিয়ম তাঁর শরীরে সয় না। কিন্তু মৃগাঙ্কের অনিয়মেই আনন্দ। নিয়মের বাড়াবাড়ি, কড়াকড়িতে যেন হাঁপিয়ে ওঠে সে। কিন্তু এ বৈষম্য নেহাতই বাইরের। অবনীমোহন অনুভব করতে থাকেন, ভাইয়ের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে নানা রকমের ব্যবধান ক্রমেই

বাড়ছে। মৃগাঙ্ক মনোযোগ দিয়ে কোন চাকরি-বাকরিই করল না। এই অমনোযোগের চাপ যে সম্পূর্ণ অবনীমোহনের ওপর গিয়েই পড়ে সেটুকু বোধও যেন ওর নেই। মাঝে মাঝে বেশ ভাল চাকরিই পায় মৃগাঙ্ক। অবনীমোহন আশা করতে থাকেন, বিশ-পঁচিশ টাকা হাত-খরচ রেখে এবার পুরো টাকাটাই সংসারে দেবে মৃগাঙ্ক। কিন্তু তা হয় না। অর্ধেকেরও বেশি টাকা সে নিজের জন্য খরচ করে। এত টাকা ওর কেন দরকার হয়, তা অবনীমোহন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করতে পারেন না। তিনি চুপ করে যান। কিন্তু স্ত্রী তো চুপ করে থাকবার মানুষ নয়, তাঁর অভিযোগ অনবরত চলে। বাসন্তী বলেন, 'এর বেশি টাকা কি করে দেবে ঠাকুরপো। বউয়ের ফাই-ফরমাসের খরচ আছে না? তাছাড়া শ্বশুরবাড়ির তরফের আত্মীয়-কুটুম্বের আপ্যায়নের জন্যেও তাকে আলাদা তবিল রাখতে হয়। আমদের সাধারণের আদরযত্নে তো ওদের মন ওঠে না।'

এসব বিবরণে মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যায় অবনীমোহনের। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতাকে মন থেকে তিনি ঝেড়ে ফেলেন। এসব অনুদারতার প্রশ্রয় তিনি দিতে পারেন না। যে বড় তাকে অনেক সহ্য করতে হয়, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। স্ত্রীকেও সেই কথা বলেন, সেই পরামর্শ দেন অবনীমোহন, 'তুমি বড়, তোমাকে সইতে হবে।'

অবনীমোহনের মনে হয় নিজের ভিতর যে ক্ষুদ্রতা আছে, স্বার্থপরতা আছে, স্ত্রী যেন তারই প্রতিমূর্তি। স্ত্রী পুরুষের সত্যি সত্যিই 'বেটার হাফ' নয়, ওটা পুরুষের মুখের সৌজন্যের বুলি। আসলে স্ত্রী অপকৃষ্ট অংশ। ভারি ছোট সঙ্কীর্ণ ওদের গণ্ডি। স্বামী আর সন্তানের বেড়া দিয়ে ঘেরা ওদের ছোট সংসার। পুরুষকেও সেই ছোট গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখতে চায়। ওদের চাওয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করতে নেই, অবনীমোহন তা করেন নি। এই তাঁর গর্ব, এই তাঁর আত্মপ্রসাদ। তিনি তো বোকা নন। মৃগাঙ্ক কি করে না করে, তা তিনি সব জানেন, সব টের পান। কিন্তু টের পেলেও ওকে তিনি টের পেতে দেবেন না। মানুষের ক্ষুদ্রতার সঙ্গে পাল্লা দিতে নেই, তার মহত্ত্বের সঙ্গেই তাঁর প্রতিযোগিতা।

খবর পেয়ে মৃগাঙ্ক এসে বলল, 'হঠাৎ ডেকেছেন যে?'

অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ, 'হঠাৎ-ই' ডেকেছি। ডেকে না পাঠালে তো আর দেখা-সাক্ষাৎ হবার যো নেই তোমাদের সঙ্গে। পাশাপাশি ঘরে দুজনে থাকি, তবু যেন কতদিন ধরে কথাবার্তা বন্ধ। যেন ঝগড়া করে, মামলা-মোকদ্দমা করে আলাদা হয়ে আছি।'

অবনীমোহনের ভাবপ্রবণতায় বেশ একটু লজ্জিত হল মৃগাঙ্ক। লজ্জা নিজের জন্যে নয়, দাদার জন্যে। মাসকয়েক বাদে বাদে দাদার এ ধরনের ভাবালুতার ঝোঁক চাপে।

বাড়ির প্রত্যেককে ডেকে ডেকে অযাচিত স্নেহ প্রকাশ করেন, আবেগরুদ্ধ গলায় অন্তরের ব্যাকুলতা জানান। তারপর বোধ হয় নিজেই লজ্জিত হন, সেই লজ্জায় আবার মাস-কয়েক চুপচাপ থাকেন। হ্যাঁ, পাশের ঘরেই তো থাকে মৃগাঙ্ক। উঠতে বসতে রোজ দেখা হয়, এক-আধবার কথাও যে না হয়, তা নয়। এর চেয়ে আর বেশি কি দরকার। এমন কোন্ বিষয়-সম্পত্তি আছে, যা নিয়ে রোজ মন্ত্রণা-সভা বসাতে হবে। দৈনন্দিন সাংসারিক হিসাব বাজার আর ছেলেমেয়েদের জল-খাবারের ব্যবস্থা তো বউদিই করেন, সে দপ্তরে কারো নাক ঢোকাবার জো নেই, কারো কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় না তাঁর। তবে আর কোন্ বিষয় নিয়ে দাদার সঙ্গে আলাপ করবে মৃগাঙ্ক। দুজনের মধ্যে তো সে সম্পর্ক নয় যে, দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ভদ্রতা জানাবে, নমস্কার করে বলবে, 'এই যে ভাল আছেন, ছেলেপুলে সব ভাল ? গরমটা বড্ড বেশি পড়েছে যেন।'

আসলে দাদা তো মোটেই সামাজিক হবেন না। অফিস আর বাড়ি ছাড়া দুনিয়ায় আর কোথাও যাবেন না, কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবেন না। অফিসে নিজের ডিপার্টমেণ্টের কয়েকজন কেরানী, আর বাড়িতে স্ত্রী, এ ছাড়া তৃতীয় কারো সঙ্গে ওঁর আলাপ নেই, অন্তরঙ্গতা নেই। এভাবে চললে দুনিয়া তো দুদিনেই একঘেয়ে হতে বাধ্য। মাসকয়েক বাদে বাদে ওঁর হয়তো একবার করে সেই একঘেয়েমিবোধটা আসে, আর তারজন্যেই ওইরকম ছটফট করেন। অবনীমোহনের কথার জবাবে মৃগাঙ্ক বলল, 'আপনি অন্য মুড-এ থাকেন, হয়তো কোন কিছু চিন্তা করেন, তাই কথা বলে ব্যাঘাত করি নে।'

অবনীমোহন একটু হাসলেন, 'তা তো ঠিকই। চিন্তা তো করিই। কিন্তু কি নিয়ে যে চিন্তা করি, তা কি কেউ ভাব ? একদিনও মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করো! কাব্য-সাহিত্য নয়, রাজনীতি নয়, পরমার্থ নয়, তোমাদের ভাত-ডাল, তেল-নুনের চিন্তাতেই আমার সারা দিনরাত কাটে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'অত চিন্তা করবার কি আছে ? অত চিন্তা আপনি কেন করতে যান ?'

অবনীমোহন বললেন, 'সাধ করে কি করি ? বাধ্য হয়েই করতে হয়। ভাল কথা, আর কোন চাকরি-বাকরির খোঁজ কি পেলি ?'

মৃগাঙ্ক এবার একটু গম্ভীরভাবে বলল, 'না, এখনো পাই নি। দু-একটা জায়গায় কথাবার্তা চলছে। দেখি কতদূর কি হয়।'

অবনীমোহন আর কিছু বললেন না। সংসার সম্বন্ধে অনবরত চিন্তা না করলে দুমাস বেকার থেকে একটি পয়সা না দিয়ে কি মৃগাঙ্ক এমন নিশ্চিন্ত থাকতে পারত ?

বাসন্তী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'নাও, ভূমিকা তো হল। এবার আসল কথাটা

বলে ফেল, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

অবনীমোহন বললেন, 'আমার আসল কথা আমি বলেছি, এবার তোমার যদি কিছু বলবার থাকে বলো।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'ব্যাপারটা কি ?'

বাসন্তী তখন সব খুলে বললেন। বৈদ্যনাথ প্রীতির যে সম্বন্ধ এনেছেন, তার খুঁটিনাটি বিবরণ দিলেন।

মৃগাঙ্ক বলল, 'বেশ তো। দেখতে চায় তারা এসে আগে দেখে যাক। আমরাও দেখি-শুনি, তারপর দুপক্ষের পছন্দ হলে কথাবার্তা চালানো যাবে।'

বাসন্তী স্বামীর দিকে তাকালেন, 'নাও, ঠাকুরপোর মত তো জানা গেল, এবার তারা এসে দেখে যাক।' তারপরে মৃগাঙ্কের দিকে চেয়ে বললেন, 'ওঁর ভাবনা ছিল তোমার মত হবে কি হবে না, তুমি ভাইঝির বিয়ে দিতে চাও কি না—উনি তো আবার তোমার মুখের কথা না শুনলে এক চুলও নড়ে বসবেন না, তাই ভাল করে মতামতটা তোমার দাদাকে জানিয়ে যাও ঠাকুরপো।'

মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়িয়ে পরিহাসের সুরে বলল, 'দাদাকে আর আলাদা করে জানাবার দরকার হবে না। যাঁকে জানাবার তাঁকে তো জানিয়েছি। নাও, এবার খেতেটেতে দাও গিয়ে।'

বলে মৃগাঙ্ক বেরিয়ে গেল।

বাসন্তী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নাও, হল তো ? ওঠ এবার।'

অবনীমোহন বললেন, 'হুঁ।'

মনে মনে ভাবলেন, হল আর কই। নিজের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে তিনি তো ভাইয়ের শুধু মুখের মতামতটাই শুনতে চান নি, অন্তরের আগ্রহটাও দেখতে চেয়েছিলেন। শুধু হোক বললেই তো আর মেয়ের বিয়ে হয় না। তার জন্যে যথেষ্ট টাকা-পয়সা দরকার। কিন্তু মৃগাঙ্ক সে আলোচনার ধার দিয়েও গেল না। ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেল। পাছে ও-সব কোন কথা ওঠে তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। কিন্তু অবনীমোহন তো ওর কাছে মেয়ের বিয়ের জন্যে আলাদা করে টাকা চান নি। তিনি জানেন মৃগাঙ্কের দেওয়ার শক্তি নেই, সে দিতে পারে না। মৃগাঙ্কের শক্তি-সামর্থ্যের কথা অজানা নেই অবনীমোহনের। কিন্তু সামর্থ্যই তো সব নয়। তার চেয়ে বড় হৃদয়। পরিবার সম্বন্ধে দরদ। সেই দরদের পরিচয় তো সে দিতে পারত। জিজ্ঞেস করতে পারত পরিবারের এরকম আর্থিক অবস্থায় মেয়ের বিয়ের খরচ কি করে চলবে। কি করে কোত্থেকে টাকা জোগাড় করবেন অবনীমোহন। তার জন্যে ওর আন্তরিক উদ্বেগ, চিন্তা-ভাবনা দেখলে খুশী

হতেন। কোথাও যে কোন পুঁজি নেই, তা তো সে জানে। না কি ভেবেছে গোপনে গোপনে তিনি বহু টাকা সঞ্চয় করেছেন? কোন অভাব-অনটনই তাঁর নেই? সেই বিরূপতা, সেই বিদ্বেষবোধ ফের এসে জমতে থাকে অবনীমোহনের মনে। বাসন্তী বলে, 'তুমিই ওকে নষ্ট করেছ। তুমিই প্রশ্রয় দিয়ে, অতিরিক্ত ভালমানুষি দেখিয়ে দেখিয়ে ওকে খারাপ করে ফেলেছ। এখন হায়-আপসোস করে আর কি হবে। যদি ভাল চাও তো এখনো নিজের বুঝ বুঝে চলো। এভাবে চললে একপাল ছেলেপুলে নিয়ে তোমাকে বুড়োবয়সে পথে দাঁড়াতে হবে, আমি বলে দিলুম।' তা দাঁড়াতে হয় হোক। তবু তিনি ছোট ভাইয়ের কাছে ছোট হতে পারবেন না। মুখ ফুটে বলতে পারবেন না, 'তোমার কাছে টাকা চাই। তোমার টাকা ছাড়া এ সংসার আমি চালিয়ে রাখতে পারব না।' না, একথা কিছুতেই বলবেন না তিনি। কেন বলতে হবে। সে কি নিজের চোখে সব দেখতে পাচ্ছে না? দেখেও যদি তার কর্তব্যবোধ না জাগে, মমত্ববোধ না জাগে, তবে কি শুধু মুখের বলায় তা জাগবে? বাসন্তী বলে, 'তুমি ওকে আদর দিয়ে নষ্ট করেছ, কোনদিন শাসন করো নি, দায়িত্ব, কর্তব্য বুঝিয়ে দাও নি, তার ফলেই এইরকম হয়েছে। ভাল চাও তো এখনো শক্ত করে চাপ দাও। দুটো নরমও বল, দুটো গরমও বল, দেখবে টাকা আপনি বেরোবে।'

কিন্তু অবনীমোহন জানেন তা বেরোবে না। বরং আচমকা চাপ দিতে গেলে সব ভেঙে যাবে, তাঁর সংসার একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। মৃগাঙ্কের স্ত্রী সুরমার মনোভাব তিনি যে না বোঝেন তা নয়। আধুনিক কালের কলেজে পড়া মেয়ে। চারদিকে স্বাতন্ত্র্যবোধের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কেবল শক্তিতে কুলিয়ে ওঠে না তাই। নইলে আরও পরিচয় পেতেন অবনীমোহন। সেই স্বাতন্ত্র্যের আরও উগ্র প্রকাশ দেখতে পেতেন। এই একান্নবর্তী পরিবারে থেকেও সুরমা যেন আলাদা। নিজের ঘরের মধ্যে সে ছোট এক সংসার রচনা করে নিয়েছে। বাড়ির কারো সঙ্গে বড একটা মেশে না। ঘরের মধ্যেই থাকে। একবার বইয়ের আলমারী খোলে আর একবার কাপড়ের আলমারী। দুটি আলমারীকে ঝাড়ে পোঁছে, সাজায় গুছায়, নিজের দুটি ছেলেমেয়ের আদর-যত্ন করে, তাদের জামা-জুতো পরিয়ে দেয়। রান্নাঘরের বড় উনুন থেকে বার বার চা খেতে অসুবিধে হয় বলে মৃগাঙ্ক ওকে একটা স্টোভ কিনে দিয়েছে। সেই স্টোভ যখন তখন জ্বলে উঠে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। সে স্টোভে শুধু চা-ই হয় না। মৃগাঙ্কের বন্ধুবান্ধব আসে, শালা-শালীরা আসে, তাদের হাসিগল্পের শব্দ নিজের ঘরে বসেই শুনতে পান অবনীমোহন। সবই তিনি টের পান। কিন্তু টের পেয়েও কিছু বলেন না অবনীমোহন। বলাটা সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, আত্মার হীনতার পরিচয়।' বাসন্তী অবশ্য বলতে ছাড়ে না।

এই নিয়ে দুই জায়ের মধ্যে মাঝে মাঝে কথান্তর, মনান্তর হয়। বাসন্তী জোরগলায় চেঁচিয়ে, স্বরমা আস্তে আস্তে দু-একটা কথা বলে। কিন্তু তার সেই মৃদু আর মিতভাষণে ধার কম থাকে না, জ্বালা কম থাকে না। তবু স্ত্রীকেই ধমক দেন অবনীমোহন। স্ত্রীকেই শাসন করেন। বলেন, 'ছি, ছি, ছি, এত ছোট তুমি, এত ছোট তোমার আত্মা।' সে ধিক্কার যেন নিজেকেই ধিক্কার। বাবার মত তাঁর তো দেশ আর সমাজের বড় কর্মক্ষেত্র নেই, শুধু একটি বাড়ি, একটি পরিবার। সেই পরিবারের মধ্যেও কি বড় হয়ে থাকতে পারবেন না অবনীমোহন ? শুধু বয়সে আর সম্পর্কে বড় হয়েই থাকবেন ? হৃদয়ের দিক থেকে বড় হতে পারবেন না ? ওরা যা করছে করুক, অবনীমোহন নিজের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হবেন না। যতক্ষণ সাধ্য আছে, যতক্ষণ শক্তি আছে, ততক্ষণ যুঝবেন। সংসারের জন্য প্রাণপাত করবেন সেও ভাল, কিন্তু নিজের পতন ঘটতে দেবেন না।

'মা !'

অরুণ এসে দোরের সামনে দাঁড়াল।

বাসন্তী নীচে নামতে যাচ্ছিলেন, ছেলেকে দেখে থেমে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই যে নান্তু, এতক্ষণে বুঝি তোর বাড়ি ফেরার সময় হল। হাঁরে, তুই যে অতুলকেও ছাড়িয়ে গেলি।'

এ অভিযোগের কোন জবাব না দিয়ে অরুণ বলল, 'তোমরা সব খেয়েদেয়ে নিয়েছ ?'

বাসন্তী বললেন, 'তোরা রাত দুপুর পর্যন্ত থাকবি বাইরে আর আমরা খেয়েদেয়ে নেব। তাই নিই নাকি কোনদিন ?'

অরুণ একটু কোমলস্বরে বলল, 'না না, বেশি রাত হয়ে গেলে তোমরা খেয়ে নিয়ো মা।'

বাসন্তী হেসে বললেন, 'হয়েছে, আর তোমার দরদে কাজ নেই। অত বেশি দরদ-টরদ দেখাস নে নান্তু, মরে যাব রে, মরে যাব।'

অরুণ মৃদু হেসে মুখ ফিরিয়ে তেতলার সিঁড়িতে পা দিয়েছে, বাসন্তী পিছন থেকে ডেকে বললেন, 'ও কি চললি যে, শোন।'

অরুণ ফিরে এসে ফের মার সামনে দাঁড়াল।

বাসন্তী বললেন, 'আজ না পয়লা তারিখ ? মাইনে পেয়েছিস তো ?'

অরুণ মৃদুস্বরে বলল, 'পেয়েছি।'

বাসন্তী হাত পাতলেন, 'দে। আমার তবিল একেবারে খালি। কালকের বাজারের পয়সাটি পর্যন্ত নেই।'

অরুণ নিঃশব্দে পকেট থেকে টাকা বের করে দিল।

বাসন্তী নোটগুলি হাতে নিয়ে বললেন, 'কম কম লাগছে যে, নেওয়ার সময় গুনে নিয়েছিলি তো?' বলে নিজেই নোটগুলি একখানা একখানা করে গুনতে আরম্ভ করলেন বাসন্তী।

অরুণ বলল, 'গুনে কি করবে মা। ওখানে একশ পঁচিশ টাকা আছে।'

বাসন্তী আর্তনাদের সুরে বললেন, 'মোটে একশ পঁচিশ? কেন, বাকি টাকা কি হল? গত মাসে তো একশ পঁচাশি দিয়েছিলি। বাকি সবই কি তোর হাত-খরচের জন্যে লাগবে?'

অরুণ মৃদুস্বরে বলল, 'না, সে জন্যে নয়, টাকাটা অন্য কাজে দরকার হয়েছে।'

বাসন্তী বললেন, 'কি কাজ শুনি?'

অরুণ বলল, 'আর একজনকে কয়েকদিনের জন্যে ধার দিয়েছি।'

বাসন্তী ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'কাকে?'

অরুণ বলল, 'তাও কি তোমার জানা দরকার?'

বাসন্তী বললেন, 'দরকার বলেই তো জিজ্ঞেস করছি।'

অরুণ বলল, 'বেশ, তাহলে শোন। আমার একটি বান্ধবীকে ধার দিতে হয়েছে। তার অত্যন্ত দরকার। বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে—'

বাসন্তী বাধা দিয়ে বললেন, 'বাড়িভাড়া তো আমারও বাকি।'

অরুণ বলল, 'তা দেওয়ার অনেক লোক আছে। কিন্তু তার আর কেউ নেই।'

বাসন্তী বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললেন, 'তাই বুঝি তুমি গিয়ে তার একমাত্র সহায়ক হয়েছ!'

অরুণ তীব্রস্বরে বলল, 'মা!'

তারপর স্থিরদৃষ্টিতে একটুকাল বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘরের ভিতর থেকে অবনীমোহন সব শুনতে পাচ্ছিলেন, এবার দোরের সামনে এসে দাঁড়ালেন, বললেন, 'কি হয়েছে? কাকে টাকা দিয়েছে নান্তু?'

বাসন্তী স্বামীর দিকে ফিরে তাকালেন, 'আঃ, তুমি আবার কেন এলে এর মধ্যে? তোমার আসবার কি দরকার?'

অবনীমোহন বললেন, 'আসার দরকার বলেই এসেছি।' এতদিন না এসে এসেই তো সংসারের এই হাল। কাকে টাকা দান করে এসেছ নান্তু?'

ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন অবনীমোহন।

খোঁচা খেয়ে অরুণ উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল, 'দান নয়, ধার। কাকে দিয়েছি তা মার কাছে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।'

এই বলে অরুণ ওপরে উঠে গেল।

খানিক বাদে প্রীতি এসে ওর ঘরের সামনে দাঁড়াল, 'দাদা, তোমার ভাত বাড়া হয়েছে। খাবে চল। ওঁরা সব বসে আছেন।'

অরুণ ঘরের ভিতর থেকে বলল, 'ওঁদের গিয়ে বল, আমি খেয়ে এসেছি।'

প্রীতি বলল, 'এই ঝগড়াঝাঁটির পর সে-কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? সবাই ভাববে তুমি রাগ করে খেলে না। তার চেয়ে চল, দুটি খেয়েই আসবে।'

অরুণ বিরক্ত হয়ে বলল, 'আঃ বললুম যে খেয়ে এসেছি।'

প্রীতি বলল, 'সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।'

অরুণ বলল, 'তার জন্যে তো আমি আর ভরাপেটে খেতে পারি নে।'

প্রীতি বলল, 'তাহলে সত্যিই তুমি খেয়ে এসেছ? কোত্থেকে খেয়ে এসেছ দাদা?'

অরুণ বলল, 'তা শুনে তোর কি দরকার?'

প্রীতি মুখ টিপে হাসল, 'না, আমার আর কিছু দরকার নেই। মা জিজ্ঞেস করলে কি বলব তাই বলে দাও।'

ওর হাসি দেখে অরুণও একটু হাসল, 'কিছু বলতে হবে না, তুই যা।'

প্রীতি বলল, 'সকলের সামনে বলব না। মা যদি খুব চেঁচামেচি করে তাহলে শুধু তাকে আড়ালে ডেকে বলব, কি বল?' বলে প্রীতি আর দাঁড়াল না।

অরুণ ভাবল কাজটা ভাল হল না। ও যদি সত্যই গিয়ে বলে করবীদের বাড়ি থেকে অরুণ খেয়ে এসেছে, তাহলে মার চেঁচামেচি বাড়বে ছাড়া কমবে না। সকলে আরও অনেক কিছু ভাববে, তার চেয়ে বরং অল্প করে একমুঠো খেয়ে আসা ভাল। রাত্রে তো সে এমনিতেই কম খায়। তাতে কেউ কিছু ভাববে না। রাগ করে মাঝে মাঝে অরুণ এর আগেও দু-এক রাত্রে খায় নি। কিন্তু আজ খেয়ে এসেও না খাওয়ার ভান করতে হচ্ছে।

একটু বাদে অরুণ নিচে নেমে গেল, তারপর অবনীরা দুই ভাই যেখানে খেতে বসেছিলেন, সেখানে গিয়ে একপাশে গম্ভীর মুখে পিঁড়ি পেতে বসল।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলে রাত্রে ফের এসে প্রীতি দেখা করল অরুণের সঙ্গে, বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে দাদা।'

অরুণ বিছানায় শুয়ে পড়ে একটা মাসিক কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল, বোনের দিকে চেয়ে বলল, 'কি কথা!'

প্রীতি একটু ইতস্ততঃ করে বলল, ওঁরা আমার সম্বন্ধ দেখতে শুরু করেছেন, তুমি ওঁদের বারণ করে দাও। আমি কিন্তু বিয়ে করব না।'

অরুণ হেসে বলল, 'ঈস, কি কঠিন প্রতিজ্ঞা! কিন্তু আমাদের দেশের, বিশেষ করে আমাদের বাড়ির, মেয়েরা কোনদিনই বিয়ে করে না, তাদের বিয়ে হয়, তারা বিয়েয় বসে।

তোর কোন ভয় নেই, আমরা চৌদোলা করে তোকে পিঁড়িতে বসিয়ে দেব। তোর একটুও পরিশ্রম হবে না।'

প্রীতি বলল, 'না, 'ঠাট্টা-তামাসার কথা নয়, আমি সত্যি বলছি। তেমারা যদি গোড়া থেকে আমার কথা না শোন, শেষে কিন্তু একটা মহা অনর্থ হবে। তুমি ওঁদের বলে দিয়ো যে আমার বিয়েতে মত নেই।'

অরুণ বলল, 'আচ্ছা, তা না হয় বললাম। কিন্তু অমতের কারণটা কি তাই বল তো।'

প্রীতি বলল, 'কারণ আবার কি। অমনিই। আমি অমনিই থাকব। চাকরি-বাকরি করব। সবারই যে বিয়ে করতে হবে, তার কোন মানে আছে ?

অরুণ বলল, ' তা নেই। কিন্তু চাকরি-বাকরি করে বয়স যখন বেড়ে যাবে তখন বর খুঁজে পাওয়াই ভার হয়ে উঠবে।'

প্রীতি বলল, 'আমার বর কাউকে খুজতে হবে না।'

অরুণ বলল, 'কেন, তুই কি নিজেই খুঁজে নিবি নাকি ? ভালোই তো।'

প্রীতি মুখ যেন আরক্ত হয়ে উঠল। মুখ নামিয়ে একটুকাল চুপ করে রইল প্রীতি। তারপর বিরক্তির ভঙ্গিতে বলল, 'বললাম যে আমি কোনদিন বিয়েই করব না, তার আবার বর খোঁজাখুঁজি কিসের। তুমি ওঁদের বুঝিয়ে বলো।'

অরুণ বলল, 'আচ্ছ বলব। যা এবার নিশ্চিন্তে ঘুমো গিয়ে যা।'

প্রীতির আর কোন কথা না বলে উঠে চলে এল।

অরুণ দোর ভেজিয়ে দিয়ে আলনায় ঝুলানো শার্টের পকেটে হাত ডুবিয়ে দিল সিগারেটের জন্য। সিগারেটের বাক্সের সঙ্গে আর একটি জিনিসে হাত লাগল। মুখ-ছেঁড়া একখানি খাম। চিঠিখানা জামা খুলবার সময় বুকপকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। অরুণ তুলে নিয়ে সেখানা ফের ঝুলপকেটে রেখে দিয়েছে। সিগারেট ধরিয়ে চিঠিখানা চোখের সামনে মেলে ধরল অরুণ। আজ সকালের ডাকে চিঠিখানা পেয়ে একবার পড়েছে, অফিসে গিয়ে পড়েছে আরও একবার, এই তৃতীয়বারেও যেন তা পুরনো হয় নি। হ্যাঁ, করবীই লিখেছে। এবার আর দেওরের জবানীতে নয়, নিজের জবানীতে নিজের হাতের অক্ষরেই চিঠি লিখেছে করবী। খুবই সাদা-মাঠা, বৈষয়িক চিঠি। তবু অরুণ যতবার পড়েছে ততবারই যেন তার মধ্যে বিষয়াতীতের স্বাদ পেয়েছে। করবী লিখেছে :

'মান্যবরেষু,

হঠাৎ বড দরকারে পড়ে চিঠিখানা আপনাকে লিখতে বাধ্য হচ্ছি। এ ধরনের চিঠি যাতে আপনাকে না লিখতে হয় তার জন্যে এই দুদিন ধরে অনেকবার অনেক রকমভাবে চেষ্টা করে দেখলাম। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠলাম না। এ চিঠি আমার

সেই অক্ষমতার কাহিনী, অসামর্থ্যের নিদর্শন। কিন্তু ঘুরিয়ে বলার বস্তু তো নয়, যতই ঘুরিয়ে বলি এর স্থূলতা তো কিছুতেই ঢেকে দিতে পারব না। তাই খুলেই বলি। সহজভাবে সোজা ভাষায় নিজের অভাবের কথাটা আপনাকে জানিয়ে ফেলি। চোখমুখ বুজে একবার বলে ফেলতে পারলে আর কোন চক্ষুলজ্জা থাকবে না। তখন যত লজ্জা আপনার, যত দায় আপনার, যত অসুবিধে আপনার। গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার দিতে পারেন? এই চার-পাঁচ দিনের জন্যে? ভারি ঠেকে পড়েছি। বাড়িওয়ালার কাছে আর হাতজোড় করতে চাই নে। তাই আপনার কাছেই হাত পাতলুম। ইতি—

করবী বসু।

রবিবার বিকেলে মেয়ে দেখার তারিখ ঠিক হল। ছুটির দিন পুরুষেরা সবাই বাড়ি থাকবে। ক'দিন ধরে দুটি পরিবারে মেয়েদের মধ্যে কেবল এই বিয়ের প্রসঙ্গের অলোচনাই চলতে লাগল।

বাসন্তী বললেন, 'মেয়ে বড় হলে তার গয়নাপত্র সবাই সুবিধেমত দু-একখানা করে গড়িয়ে রাখে। কিন্তু আমাদের বাড়ির ধরন-ধারনই আলাদা।'

কনকলতা আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তার জন্যে ভাবনা কি ঠাকুরঝি। টাকার ব্যবস্থা থাকলে কলকাতায় কি জিনিসের অভাব হয়। দু-ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক করে ফেলা যায়।'

বাসন্তী বললেন, 'টাকার জোগাড় থাকলে তো সে কথা বউদি। আমাদের মত সংসারে আগে থেকেই একটু একটু করে তৈরী হতে হয়। আমি কতদিন ধরে বলেছি, কিন্তু আমার কথা কি কেউ শোনে।'

কনকলতা মুচকি হেসে বললেন, 'ভদ্রলোককে তো দিনের মধ্যে পঁচিশবার ওঠাও আর পঁচিশবার বসাও। এতেও যদি কথা না শোনা হয়—'

বাসন্তী হেসে বললেন, 'বাইরে থেকে তোমরা ওই রকমই ভাব। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যা একখানা মানুষ তা যাকে ঘর-সংসার করতে হয় সে-ই বোঝে।'

বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বেশ একটা স্ফূর্তির ভাব দেখা গেল। প্রীতিদির বিয়েতে কে কোন্ কাজ করবে, কে কার কোন্ কোন্ বন্ধুর নিমন্ত্রণ করবে, মুখে মুখে তার তালিকা পর্যন্ত ঠিক হতে লাগল।

ভুবনময়ী বললেন, 'এখন পর্যন্ত কোথায় বিয়ে তার ঠিক নেই, তোদের একেবারে ফুলশয্যা তৈরী। আগে মেয়ে দেখে পছন্দ হোক, কথাবার্তা ঠিক হোক, তবে তো—এ বাড়ির মেয়েদের বিয়ে, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।'

সবাই কিছু না কিছু বলছে, হাসি ঠাট্টা আলাপ আলোচনা করছে, শুধু প্রীতিই নির্বাক। তার মুখ গম্ভীর। একটু হাসি নেই তার মুখে।

তার যে বিয়ে করার ইচ্ছে নেই, সে যে সারাজীবন কুমারী থাকবার সঙ্কল্প করেছে, একথা কেবল দাদাকেই নয়, মাকেও একবার জানিয়েছে প্রীতি। কিন্তু কেউ তার কথায় আমল দেয় নি। যেন ওর চেয়ে অদ্ভুত কথা, অসম্ভব প্রস্তাব আর কিছু নেই।

মেয়ের কথায় বাসন্তী ধমক দিয়ে বলেছেন, 'আবদার আর কি! বিয়ে করবি না, ঘরগৃহস্থালি করবি না, সারাজীবন বুঝি এইভাবেই যাবে ভেবেছিস?'

প্রীতি জবাব দিয়েছে, 'গেলই বা, সকলের জীবনই যে একভাবে কাটবে, তার কি মানে আছে।'

বাসন্তী বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'আর গুণ নেই ছার গুণ আছে। দুখানা কাজকর্ম ভাল করে শিখবে তার নামে দেখা নেই, যত সব লম্বা লম্ব বুলি। আমি তখনই বলেছিলাম, দাদার মেয়ের মত ওরও সময় থাকতে থাকতে বিয়ে দাও, ল্যাঠা চুকে যাক। তা আমার কথা তো কারো কানে গেল না, এখন হেন-তেন কত কথা শুনতে হবে।'

সেদিন সন্ধ্যার পর ছাদের কোণে বিজু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, প্রীতি এসে পাশে দাঁড়াল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'শুনছ তো সব?'

বিজু ফিরে তাকাল, 'কি সব?'

প্রীতি বলল, 'বাঃ, এই যে দেখা-শোনার কথা চলছে। রবিবার তারা সব দেখতে আসবে তুমি কি শোন নি?'

বিজু বলল, 'শুনেছি।'

প্রীতি বলল, 'কিন্তু তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় না তো যে শুনেছ। বেশ চুপচাপই তো বসে আছ দেখছি।'

বিজু প্রীতির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'চুপচাপ থাকব না তো কি, সারা বাড়ি ভরে চেঁচামেচি করে বেড়াব? তাতে কি লাভ হবে কিছু?'

না, হৈ-চৈ চেঁচামেচি করবার ছেলে বিজু নয়। চিরকালই শান্তশিষ্ট লাজুক, মুখচোরা স্বভাবের মানুষ। চেঁচামেচি করবার কারণ ঘটলেও সে চেঁচামেচি করে না, পাশ কাটিয়ে যায়। বৈদ্যনাথের স্বভাবের একেবারে বিপরীত ও। বিজু বাড়ি থাকলেও টের পাওয়া যায় না ও আছে। যতক্ষণ থাকে, ঘরের কোণে নিজের মনে বইপত্র নিয়ে কাটায়। বাড়ির সকলের সঙ্গে তার যেন আলাপও নেই। কদাচিৎ কারো সঙ্গে দু-একটা কথাবার্তা হয়। বাপ-মার সঙ্গেও তেমনি। বৈদ্যনাথের সামনে মুখ তুলে সে কথা পর্যন্ত বলে না। ভাল ছেলে বলে সকলের কাছেই সুনাম আছে বিজুর। কেবল প্রীতিই জানে, সবাই যা মনে করে, বিজু শুধু তাই নয়, ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে আরও একজন ভিন্ন ধরনের মানুষ, যে অস্থির চঞ্চল আর মোটেই ভাল ছেলে নয়। কিন্তু প্রীতিই কেবল তাকে চেনে,

আর কেউ তার কোন খোঁজখবর রাখে না। যদি বা টুনু রুণুরা এক আধবার কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারে, কোন কথা বলবার সাহস তাদের নেই। বিজুর সম্বন্ধে সেসব কথা কে বিশ্বাস করবে? এই ভালোমানুষির ছদ্মবেশের আড়ালে এতদিন ধরে বেশ লুকোচুরি চলছিল, কিন্তু আর বুঝি চলে না। এবার বুঝি সব ধরা পড়ে যায়। ধরা পড়লেই ভাল। প্রীতির এক এক সময় মনে হয়, তারা ধরা পড়ুক। যা হবার হয়ে যাক, তাহলে এই দম আটকানো ভাবটা তো শেষ হত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। বিজু এখন পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে চায়। ওর বোধ হয় ধারণা চিরকাল এভাবে লুকিয়ে থাকা যাবে, লুকিয়ে রাখা যাবে। শুধু বিজুরই বা কেন প্রীতিরও মনে হয় বাড়ির অনেকের মধ্যেই এই লুকোচুরি ভাবটা আছে। বিশেষ করে মা, মাসীমা, দিদিমা, এঁদের কথায় মাঝে মাঝে যেন এক আধবার তার আভাস মেলে। যেন মনে হয় ওঁরা কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছেন। কিন্তু ওঁরা কেউ তা প্রকাশ করতে চান না। প্রীতির এক সময় বুক কাঁপে। বুঝি ওঁরা কিছু স্পষ্ট করেই বলে ফেললেন। কিন্তু তা ওঁরা বলেন না, প্রীতি এতদিনে বুঝেছে তেমন করে বলবার ওঁদের সাহস নেই। তাদের মত ওঁরাও লুকোচুরির পক্ষপাতী। কিন্তু এবার তো আর লুকোচুরি নয়। এবার তো ওঁরা স্পষ্টই বিয়ের আয়েজন, করছেন। ওঁরা ওঁদের মন স্থির করে ফেলেছেন। এখনো কি চুপ করে থাকা যাবে? প্রীতি বললে, 'চেঁচামেচি করে কিছু লাভ নেই তা ঠিক। কিন্তু ওঁরা তো সব একদিকে। ওঁরা যদি জোর করেই সব ঠিকঠাক করে ফেলেন তখন কি করা যাবে?'

বিজু বলল, 'কিন্তু বোঠিক করবার ভার তো সব তোমার ওপর। তুমি যদি রাজী না থাক, তোমার যদি মনের জোর থাকে, কার সাধ্য জোর করে তোমার বিয়ে দেয়।'

প্রীতি বলল, 'তুমি পুরুষ ছেলে। তোমার পক্ষে জোর করে কিছু বলা সহজ। কিন্তু আমার জোর কি টিকবে? তুমি কি কেবল জোর করার কথা বলবে, কেবল উপদেশ আর পরামর্শ দেবে? তোমার কি আর কিছু করার নেই।'

বিজু বলল, 'আছে বই কি। যখন করবার তখন করব। আগে থেকে হৈ-চৈ করলে সব পণ্ড হবে। মেয়ে দেখে গেলেই আর সব হয়ে গেল না। তারপরও তো আরও কিছু সময় পাওয়া যাবে। তাছাড়া পরীক্ষা দিয়ে পাশ করাটাই শক্ত। ফেল তো ইচ্ছা করলেই করা যায়। ওরা যাতে অপছন্দ করে সেটুকু তো অন্তত করতে পারবে।'

ঠিক, এতক্ষণ তো একথা মনেই হয় নি প্রীতির। এই একটা ফাঁক আছে। এই একটা পথ পাওয়া গেছে এবার। বাড়ির সবাই যত অনুষ্ঠান আয়োজন করুক, ভিতরে ভিতরে সব পণ্ড করে দেওয়ার মত শক্তি আছে প্রীতির। পাত্রপক্ষ দেখে হয়তো তাকে অপছন্দ করবে না। কিন্তু সে বোকা সাজতে পারে, অতিরিক্ত ফাজিল সাজতে পারে, এমন আরো

অনেক কিছু করতে পারে, যার জন্যে ওরা অপছন্দ করে যাবে। তবু ভাল লাগে না, তবু সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতেই কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করে। এর চেয়ে যদি সোজা সরল কোন পথ থাকত। কিন্তু না, আর কোন পথ নেই। সহজভাবে কিছু করারই জো নেই আর।

রবিবার বিকেলে সাড়ে চারটেয় বিপিনবাবুরা আসবেন মেয়ে দেখতে। কিন্তু বৈদ্যনাথ সকাল থেকেই তার তোড়জোড় আরম্ভ করলেন। বাইরের বসবার ঘর ঝাড়া হয়েছে। ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করালেন। তক্তপোশের উপর ঢালা ফরাস পাতালেন। এক দুপুর বসে দেওয়ালের বড় ঘড়িটার সময় ঠিক করলেন। তেতালা থেকে একতালা পর্যন্ত ছুটোছুটি হাঁকডাক করে বাড়ির লোকজনকে তিনি প্রায় অস্থির করে তুললেন।

কনকলতা স্বামীর ব্যস্ততা দেখে বললেন, 'বাবারে বাবা, এর আগে আর কারো ভাগ্নীকে কেউ যেন কোনদিন দেখতে আসে নি। তুমিই যেন প্রথম দেখাচ্ছ। ভাব দেখে মনে হয়, কন্যাদায়টা যেন অবনীবাবুর নয়, তোমার।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'হুঁ, যাও যাও, কাজে যাও, ওকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর গিয়ে।'

কনকলতা বললেন, 'কেন, তুমি নিজে এসে সাজাও। সবই তো নিজের হাতে করছ, এটাই বা বাদ থাকে কেন। আমরা কি সাজতে সাজাতে জানি যে সাজাব।'

মুখ টিপে হাসলেন কনকলতা।

বৈদ্যনাথ বললেন, 'বাজে বোকো না, যা বলছি তাই কর গিয়ে। আর দেখ, আমাদের ঘরেই ওকে দেখাবার ব্যবস্থা কোরো, বেশ খোলামেলা আছে, ওই ঘরেই সুবিধে হবে।'

কনকলতা বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। গরজখানা যেন তোমারই বেশি দেখা যাচ্ছে। মেয়ের কাকার তো দেখাই নেই। বাপ একজন ঘরের মধ্যে ভোলানাথ হয়ে বসে আছেন। তোমার মত গরজ তো আর কারো দেখছিনে।'

বৈদ্যনাথ কোন জবাব দিলেন না, গরজ যে কেন এত বেশি তা কনকলতা কি বুঝবে। বুঝিয়ে তাকে দরকার নেই। যেমন করেই হোক মেয়েটাকে পার না করতে পারলে বিজুর পরীক্ষা-টরীক্ষা আর দেওয়া হবে না। দিলেও ফেল করবে। অথচ কোন দিন তাঁর ছেলে কোন একটি বিষয়ে ফেল করে নি। সব সাবজেক্টে ভাল মার্ক রেখে পাশ করে এসেছে। কোন দিন কেউ ওকে একটা পান সিগারেট পর্যন্ত খেতে দেখে নি। পাড়ার ডাক্তারবাবু প্রায়ই বলেন, 'বৈদ্যবাবু, আপনার ছেলেটি একটি রত্ন। পাড়ার যা সব সংসর্গ, তার ভিতরেও ছেলেদের আপনি যেভাবে ঠিক রেখেছেন, তাতে আপনার বাহাদুরী স্বীকার

করতে হয়, মশাই।'

হ্যাঁ, নিজের রীতিনীতি, রুচি, আদর্শ অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের তিনি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। অবনীর মত গা ছেড়ে দেন নি। যার যেমন খুশি, সে তেমন ভাবে চলুক সে নীতি বৈদ্যনাথের নয়। কিসে খুশী হওয়া উচিত, তা বলে দেওয়া দরকার, বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। ছেলেমেয়েদের সেইভাবেই বুঝিয়েছেন বৈদ্যনাথ। কোন বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেন নি, সিনেমা থিয়েটার শহরের আরও পাঁচরকমের হৈ-চৈ হুজুগ যাতে ওদের মনকে না টানে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। ঘরভরা জায়গা আছে, বাড়িভরা জায়গা আছে, পড়াশুনা কর, খেল, ছাদের ওপর ফুল আর শাকসব্জীর চাষ কর, অবসর মত ঘর সংসারের কাজে এখন থেকেই হাতেখড়ি দাও, কাজের অভাব কি। রুটিন বেঁধে চল। ছন্দছাড়া যেমন কবিতা হয় না, নিয়ম ছাড়া তেমনি জীবনকে গড়ে তোলা যায় না। প্রথম প্রথম এই নিয়ম মানায় কষ্ট হতে পারে, পরে দেখবে নিয়ম না মানলে আরও বেশি কষ্ট। এইভাবেই তিনি বুঝিয়েছেন ছেলেদের। খুব বেশি শাসন করতে হয় নি, কিন্তু শক্ত হতে হয়েছে। বিজু আর বিনু দুজনেই সাবমিসিভ্। দুজনেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। একটু হয়তো বেশি রকম ভয়ই করে। কিন্তু গুরুজনকে ভয় করা ভাল। ভয় ভেঙে গেলে কি হয়, তা তো তিনি চোখের ওপরই দেখতে পাচ্ছেন। যেমন তাঁর বড় ভাগ্নে, তেমন মেজটি। শিক্ষিত অশিক্ষিত দুই-ই সমান। একজন কথায় কথায় বাপের সঙ্গে তর্ক করে, আর একজন কথায় কথায় মাসল্ ফুলায়। অবনী যদি এখনো সমঝে না চলে, তাহলে বুড়ো বয়সে ওর কপালে আরও দুঃখ আছে। কিন্তু বিজু বিনু ওদের মত হয় নি।

তিনি যা চেয়েছেন, ছেলেরা প্রায় সেই রকমই হয়ে উঠেছে। বিজু ফোর্থ ইয়ারে পড়লে কি হবে, আজকালকার কলেজের ছেলেদের মত কোন বিলাস-ব্যসন নেই, রাজনীতির হুজগ নেই, বন্ধুবান্ধবের উৎপাত নেই। বৈদ্যনাথ ছেলেদের অনেকদিন উপদেশ দিয়েছেন পাঠ্যাবস্থায় বন্ধুত্ব-টন্ধুত্বও ভাল নয়, ওতেও পড়াশুনোর ক্ষতি করে। ছাত্র হবে যোগী। তার যোগাযোগ থাকবে শুধু বইয়ের সঙ্গে। জ্ঞানের সাধনা ব্রহ্মচারীর সাধনা, সংসারের মধ্যে থেকেও মনে করতে হবে সংসারের মধ্যে নেই।

বিজু এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছে। কিন্তু যত গোলমাল বাধিয়েছে বাসন্তীর ওই মেয়েটা। মেয়েটি যে খারাপ, ফাজিল-ফক্কড় কি আড্ডাবাজ প্রকৃতির, তা নয়। বরং নিরীহ শান্তশিষ্ট ধরনেরই। তাঁর ছেলের মত মেয়েটিও ভাল। কিন্তু বয়স বিশেষে অবস্থা বিশেষে একটি ভাল ছেলে আর একটি ভাল মেয়ের বেশি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ভাল নয়, তাদের রাসায়নিক ফল খারাপ। খুব চরম কিছু যদি নাও ঘটে, পড়াশুনো কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। বৈদ্যনাথ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন সেই ব্যাঘাত ঘটছে।

কিছুদিন যাবৎ বিজু পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কার গলার স্বর, পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে যেন উৎকর্ণ হয়ে থাকে ও। একটু বাদেই প্রীতি যখন আসে, ওর চোখমুখে এক অদ্ভুত আনন্দের আভাস জাগে। মেয়েটা ঘর ছেড়ে নড়তে চায় না, টুকটাক এটা ওটা করে। আর বিজু ততক্ষণ কেবল বইয়ের পাতা ওলটায়। সে সময় এক লাইনও যে ওর পড়া হয় না, তা বৈদ্যনাথের বুঝতে বাকি থাকে না। তা ছাড়া সকলের অসাক্ষাতে দেখা করার দিকে ওদের যে বেশ একটু ঝোঁক আছে, তা লক্ষ্য করেছেন বৈদ্যনাথ। কিন্তু হৈ-চৈ করে ব্যাপারটাকে অনর্থক ঘুলিয়ে তুললে ফল আরও খারাপ হবে। তার চেয়ে মেয়েটির যত তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, ততই ভাল। অবশ্য বৈদ্যনাথের ধারণা এখনো তেমন কিছু হয় নি। তাঁর ছেলে কোন রকম দুর্নীতি করতে পারে নি। তাঁর ছেলে কোন রকম দুর্নীতি করতে পারে না। সিগারেটটা পর্যন্ত খেতে যার সাহস নেই, তার ওসব দুর্বুদ্ধি মাথায় আসবে কোত্থেকে ? এসব স্নেহ-ভালবাসাই সম্ভব। কিন্তু স্নেহের বাড়াবাড়িকেও তো প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। তাও শেষ পর্যন্ত আসক্তিতে দাঁড়িয়ে যায়। আর ছাত্রজীবনের পক্ষে যে কোন আসক্তিই খারাপ। বোন তো বোন, একটা কুকুর একটা পাখী এমন কি একটা ফুটবলের ওপরও যদি বেশি অসক্তি এসে পড়ে, পড়াশুনা মাটি করে দেওয়ার পক্ষে তাই যথেষ্ট। এ অবস্থায় কর্তব্য কি ? বৈদ্যনাথ এ নিয়ে অনেক ভেবে দেখেছেন। যদি সম্ভব হত অন্য বাড়িতে চলে যেতেন। কিন্তু এখনকার দিনে ভাড়াটে বাড়ি সুলভ নয়। অবনীদেরও সরে যেতে বলা যায় না। ওরাই বা কোথায় যাবে। এর একমাত্র সমাধান মেয়েটিকে পার করা। চোখের আড়ালে গেলেই মনের আডালে যাবে। তাই নিজেই গরজ করে ভাগ্নীর বিয়ের চেষ্টা-চরিত্র করেছেন বৈদ্যনাথ। এর জন্যে যদি গাঁট থেকে দু একশ টাকা নেমে যায় সেও ভাল।

আসবার সময় কিন্তু বিপিনবাবু নিজে এলেন না। তাঁর এক জ্ঞাতি ভাই সুরেনবাবুর সঙ্গে ছেলে রণজিতকেই পাঠিয়ে দিলেন। বৈদ্যনাথ তাঁদের সযত্নে বৈঠকখানায় নিয়ে বসালেন। তারপর সুরেনবাবুর দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার দাদারই তো আসবার কথা ছিল। তিনি এলেন না যে ?'

সুরেনবাবু বললেন, 'তিনি একটা কাজে আটকা পড়ে গেলেন। আসতে পারেন নি বলে আপনাকে চিঠি দিয়েছেন একখানা।'

বলে পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে বৈদ্যনাথের হাতে দিলেন সুরেনবাবু। সহকর্মীর চিঠিখানা খুলে পড়লেন বৈদ্যনাথ। বৈষয়িক কাজের দোহাই দিয়ে বিপিনবাবুর ছেলেকেই পাঠিয়েছেন। এখনকার যা দিনকাল তার সঙ্গে তাল রেখে চলাই ভাল।

রণজিতের যদি পছন্দ হয়, পাকা দেখতে দেনা-পাওনার কথা বলতে বিপিনবাবুকে তো আসতে হবেই। আজ আসতে পারলেন না বলে বৈদ্যনাথ যেন ক্ষুণ্ণ না হন।

বৈদ্যনাথ মনে মনে ভাবলেন, ভদ্রলোক বেশ বিচক্ষণ বটে। কিন্তু তিনি হলে এ ধরনের আপসের মধ্যে যেতেন না। ছেলে কি ভাববে না ভাববে, সে কথা ভেবে নিজের আদর্শভ্রষ্ট হতেন না বৈদ্যনাথ। খানিক বাদে কনে দেখবার জন্য তিনি সুরেনবাবু আর রণজিতকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। রণজিতের বাবার সঙ্গে যে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা খুবই বন্ধুত্ব সে কথা নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে রণজিতকে বোঝাতে লাগলেন বৈদ্যনাথ। এই সময় টুনু এসে খবর দিল, 'মামা, একটু শুনুন তো, আপনাকে ওঁরা ভিতরে ডাকছেন একবার।'

বৈদ্যনাথ উঠে এলেন। এদিকের ঘরে বাড়ির বউ-ঝিরা প্রীতিকে ঘিরে ঘিরে দঙ্গল পাকিয়েছে। ট্রাঙ্ক থেকে বার করা শাড়ি শেমিজ, প্রসাধনের টুকিটাকি জিনিসগুলি রয়েছে এক ধারে। কিন্তু প্রীতি সেগুলি পরবেও না, যাবেও না ভদ্রলোকের সামনে। চাপা গলায় বাসন্তী, কনকলতা সবাই নিন্দা করছেন। শাসন করছেন ভুবনময়ী, 'ছি ছি ছি, এমন একগুঁয়ে আমার বাপের জন্মে দেখি নি। তুই কি মান-সম্মান কিছু রাখবি নে। ডেকে আন, ওর বাপকে ডেকে আন। যে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে মেয়েকে মাথায় তুলেছে, সে এসে যা করবার করুক এখন।'

বৈদ্যনাথ এসে মাকে মৃদু স্বরে ধমক দিলেন, 'তুমি চুপ কর তো। যাও সব সরে যাও। কি হয়েছে আমি দেখি।'

তাঁকে দেখে মেয়েরা সরে দাঁড়ালেন। বৈদ্যনাথ প্রীতির কাছে এসে বললেন, 'কি হয়েছে ?'

সবাই ভাবল বৈদ্যনাথ যা রগচটা মানুষ, তাতে হয়ত বকে ঝকে, গাল-মন্দ করে অস্থির করে তুলবেন। কিন্তু বৈদ্যমাথ সে পথ দিয়েই গেলেন না। স্নেহকোমল স্বরে প্রীতির পিঠে হাত রেখে বললেন, 'কি হয়েছে মা ? ছিঃ ওরকম করে নাকি। ভদ্রলোকেরা এসেছেন। ওঁরা কি ভাববেন বল তো, তোমার কিছু ভয় নেই। ওরা সবাই আমার পরিচিত। ওরা তোমাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখবেন না, দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করেই ছেড়ে দেবেন। তা ছাড়া আমি তো সব সময়ই তোমার কাছে থাকব। ওঁদের আমি নিমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছি। এখন যদি তুমি কথা না শোন, তাহলে আমাকে অপদস্থ হতে হবে। অফিসে গিয়ে পাঁচজনের কাছে আর মুখ দেখাতে পারব না। তাই কি তুমি চাও ? চল, লক্ষ্মী মা আমার, চল।'

প্রীতি ভেবেছিল অনেক কথা বলবে। কড়া কড়া, শক্ত শক্ত কথা। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন এসব আয়োজন করা হয়েছে, তার নিজের কি কোন একটা মতামত নেই ?

কিন্তু কোন কথাই তার মুখ থেকে বেরুল না। বৈদ্যনাথের এই করুণ আবেদন ওর মনকে অদ্ভুতভাবে স্পর্শ করল। ভাবল বিজুর পরামর্শ নেওয়া যাক! এখন থেকে হৈ-চৈ করে লাভ নেই, পরে যা করবার তারা তো করবেই। সে তো তাদের মনে মনে ঠিক করাই আছে। এখনকার মত অনর্থক হাঙ্গামা বাড়িয়ে কি হবে।

অবনীমোহন বাড়িতেই ছিলেন। কিন্তু ঘর থেকে এ পর্যন্ত বেরোন নি। একেবারে প্রত্যক্ষ বৈষয়িক ব্যাপারগুলির মধ্যে তিনি পারতপক্ষে এগুতে চান না। টাকা যা দরকার, তা তিনি জোগাড় করে দেবেন, উপদেশ পরামর্শ দেবেন, কিন্তু হাতে-কলমে যা-কিছু করবার বাসন্তী করুক কিংবা আর কাউকে দিয়ে করিয়ে নিক। বাস্তব কাজকে ভিতরে ভিতরে যেন অবনীমোহন একটু ভয় করেন। কোথায় যেন তাঁর একটা বীতস্পৃহা আছে। একেক সময় তাঁর মনে হয়, তিনি বড় বেমানান। আবার অন্য সময় মনে হয়, তিনি এসব খুঁটিনাটির ঊর্ধ্বে। এসব তুচ্ছতার মধ্যে যাওয়ার কথা তাঁর নয়। তবু প্রীতি অমত করছে শুনে একবার ভাবলেন, এ সময় তাঁর যাওয়া উচিত। মেয়েকে কিছু বলা উচিত। কিন্তু মন স্থির করবার আগেই দেখলেন, সব ঠিক হয়ে গেছে। সেজে-গুজে প্রীতি গিয়ে ঢুকেছে বৈদ্যনাথদের ঘরে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অবনীমোহন দৈনিক কাগজের পাতায় চোখ রাখলেন।

প্রীতি ভেবেছিল, ভদ্রলোকেরা শক্ত শক্ত সব প্রশ্ন করবেন। আর সে ইচ্ছা করে সেগুলির জবাব দেবে না, কিন্তু তেমন কিছু হল না। বৈদ্যনাথের নির্দেশে একটা টুল পেতে বসে প্রীতি মুখ নিচু করে রইল। অবশ্য আগন্তুকদের আড়চোখে একবার দেখেও নিল। যার সঙ্গে তার সম্বন্ধ এসেছে তাকেও দেখল। ফর্সা রঙ,ছিপছিপে চেহারা। দেখতে মোটামুটি ভালোই। স্বভাব যে খুব গম্ভীর তা নয়, কিন্তু একটা গাম্ভীর্যের ভান করে রয়েছে। চোখ দুটি চঞ্চল। বছর পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি হবে না। কাকাটির চেহারা অন্য রকম। ভাইপোর সঙ্গে তাঁর মিল নেই। বছর চল্লিশেক বয়স। রং খুবই কালো। মোটা বেঁটেখাট চেহারা। একটু দূরে দুজনে পাশাপাশি বসেছেন। কুদর্শন প্রৌঢ় কাকার পাশে ভাইপোটিকে হঠাৎ ভারি সুন্দর মনে হয়। অবশ্য যতটা সুন্দর দেখা যায়, আসলে ততটা সুন্দর নয়। খুঁৎ আছে চেহারায়। রঙ শ্যামবর্ণ হলেও বিজু এর চেয়ে অনেক সুপুরুষ, অনেক বেশি লাবণ্যময়।

সুরেনবাবুই প্রথমে কথা বললেন, 'আপনি ভাল হয়ে বসুন। কোন সঙ্কোচ করবেন না। সঙ্কোচের কি আছে?'

প্রীতি যেভাবে ছিল, সেইভাবেই বসে রইল।

সুরেনবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'কোন ক্লাস অবধি পড়েছেন আপদি ?

প্রীতি বলল, 'ফরটি-সিক্সে ম্যাট্রিক পাশ করেছি।'

স্থরেনবাবু বললেন, 'তারপর বুঝি আর—'

প্রীতি কিছু বলবার আগেই বৈদ্যনাথ বললেন, 'না, তারপর আর কলেজ-টলেজে আমরা দিই নি। কি হবে মশাই দিয়ে। পড়াশুনো কি হয় না হয়, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। মিছামিছি স্বাস্থ্য খোয়ানো, আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালী মেয়েদের যা শরীরের অবস্থা তার ওপর একরাশ বই চাপিয়ে ওদেরকে চিরকালের জন্যে একেবারে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। বুঝলেন স্থরেনবাবু, এ সব মোহ ছাড়া কিছু নয়। উচ্চ শিক্ষার মোহ। উচ্চ নিচ বুঝি নে, প্রকৃত শিক্ষা চাই। জীবনে গঠনের পক্ষে সংসারের সেবার পক্ষে যে শিক্ষা উপযোগী—'

রণজিতের ইঙ্গিতে স্থরেনবাবু বললেন, 'তা তো ঠিকই।'

তারপর তাড়াতাড়ি প্রীতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পড়াশুনা ছাড়া আর কি আপনার ভাল লাগে? ধরুন গান বাজনা।'

প্রীতি মৃদু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল, 'না, গান আমি জানি নে।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'একেবারে যে না জানে তা নয়, কিন্তু বড় শাই। প্রীতি, একখানা গান গেয়ে ওঁদের শোনাও না। লজ্জা কি। ওরে হারমনিয়মটা নিয়ে আয় তো এদিকে।'

স্থরেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, লজ্জার কি আছে।'

প্রীতি বলল, 'গান না জানায় লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু ভাল না জেনে গাইতে যাওয়াটা নিশ্চয় লজ্জাকর।'

কথাটা বলে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ বোধ করল প্রীতি। এতক্ষণে সে উদ্ধত হতে পেরেছে, নিজের অনিচ্ছাকে প্রকাশ করতে পেরেছে। যদি ওঁদের বুদ্ধি থাকে, ওঁরা বুঝে নিন যে, এসব ব্যাপারে প্রীতির মোটেই সম্মতি নেই।

কিন্তু ফল হল উল্টো! এতক্ষণ রণজিত যেন উদাসীনের মত ছিল। এবার সে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল এবং আর একটু উৎস্থক দৃষ্টিতে তাকাল প্রীতির দিকে। স্থরেনবাবু রণজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার তুমি যদি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও কর।'

রণজিত হেসে বলল, 'আপনার জিজ্ঞাসা কি সব শেষ হয়ে গেল সোনাকাকা?'

স্থরেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা কি আর জিজ্ঞেস করব। তোমরা আধুনিক ছেলে—'

রণজিত বলল, 'আধুনিক ছেলেরা জিজ্ঞাসাবাদের বেশি ধার ধারে না। তারা আলাপ করে। কিন্তু তেমন আলাপের স্থান কাল তো এটা নয়। ওঁকে এবার যেতে দিন।'

প্রীতি উঠে দাঁড়িয়েছিল। সুরেনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'একটু দাঁড়ান, এই কাগজটুকুতে ইংরেজী বাংলায় আপনার নাম ঠিকানাটা'—বলে পকেট থেকে একটুকরো কাগজ আর ফাউণ্টেন পেনটা প্রীতির দিকে তিনি এগিয়ে দিলেন।

রণজিত বলল, 'আঃ,আবার অত হাঙ্গামা করছেন কেন। ম্যাট্রিক পাশ করেছেন শুনলেন তো। নাম স্বাক্ষরটা নিশ্চয়ই করতে পারবেন।'

সুরেনবাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'তবু হাতের লেখাটা তো দেখা যাবে।'

রণজিত আরো নিচু গলায় বলল, 'হাতের লেখায় আর একজনকে কতটুকু দেখা যায়।'

কথাটা কানে গেল প্রীতির। দ্রুত হাতে তাড়াতাড়ি নাম সই করে কাগজখানা সুরেনবাবুকে ফিরিয়ে দিয়ে ওঁদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে সে চলে গেল।

খানিকবাদে চা জলযোগ শেষ করে সুরেনবাবুরা বিদায় নিলেন। সদর দরজার কাছে অবনীমোহনের সঙ্গেও পরিচয় আর নমস্কার বিনিময় হল। যাওয়ার সময় সুরেনবাবু বলে গেলেন, মতামত তাঁরা পরে জানাবেন।

বৈদ্যনাথ পরদিন অফিসে গিয়ে বিপিনবাবুর কথাবার্তার ধরনে বুঝতে পারলেন মেয়ে রণজিতের পছন্দ হয়েছে, অবশ্য পাত্রপক্ষের অনুকূল মনোভাবের কথা তিনি আগেই আন্দাজ করেছিলেন। এবার পরিষ্কার বিপিনবাবুর মুখ থেকেই শুনলেন। বৈদ্যনাথ বললেন, 'তাহলে চলুন একদিন তিনজনে বসে বিষয়টা একেবারে পাকাপাকি করে ফেলা যাক। শুভকাজে কালহরণ করতে নেই।'

শুভকাজটা তাড়তাড়ি সেরে ফেলায় বিপিনবাবুর গরজও কম নয়। এই ফাল্গুন মাসের মধ্যেই ছেলের বিয়ে দেওয়া তাঁর ইচ্ছা। চৈত্র মাসে বিয়ে-থা হয় না। বৈশাখ মাসেও বাধা আছে। বিপিনবাবুর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। চৈত্র-বৈশাখের যে কোন সময় হাসপাতালে আটকে পড়তে পারেন।

বৈদ্যনাথ খবরটা গিয়ে অবনী আর বাসন্তীকে জানালেন।

অবনীমোহন বললেন, 'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি সব যোগাড় করা সম্ভব হবে? সপ্তাহ দুই সময় পাওয়া যাবে মোটে।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'দু সপ্তাহ কম হল নাকি। তুমি আমার ওপর ভার দাও। দু দিনের মধ্যে আমি সব ঠিক করে দেব।'

বাসন্তী বললেন, 'দাদা ইচ্ছা করলে তা পারে। অণিমার বিয়ের সময়ও তো পনের বিশ দিনের মধ্যে দাদা সব গুছিয়ে ফেললো। তুমি আগে থেকেই একটু একটু করে তৈরী হচ্ছিলে দাদা, কিন্তু তোমার মত তো ওরা নয়। তাহলে আর ভাবনা ছিল কি?'

বৈদ্যনাথ উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'হবে হবে। তোর কিছু ভাবতে হবে না।'

বহুদিন পরে দাদার মুখ থেকে আশ্বাসের কথা শুনলেন বাসন্তী। আগেকার সেই আন্তরিক স্নেহের স্বাদ পেলেন। বিয়ের প্রসঙ্গকে উপলক্ষ করে দুই পরিবারে ফের আলোচনা মেলামেশা চলতে লাগল।

বিপিনবাবু একদিন এসে দেনা-পাওনার কথাও বলে গেলেন। বেশির ভাগ কথাই অফিসে বৈদ্যনাথের সঙ্গে হয়েছে। বাড়িতেও বৈদ্যনাথই কথাবার্তা চালালেন। মৃগাঙ্ক একবার এসে জরুরী কাজে বেরিয়ে গেল। অবনীমোহন সারাক্ষণ বসে রইলেন। কিন্তু কথা যা বলবার বললেন বৈদ্যনাথই। বিপিনবাবু বাড়ি-খরচ বাবদ আট শ' টাকা চেয়েছিলেন। বৈদ্যনাথ তাকে ছ'শতে নামিয়ে আনলেন। গয়না এবং অন্যান্য যৌতুকের পরিমাণও যুক্তিতর্কে, অনুরোধে, উপরোধে বিপিনবাবুকে অনেক কমে রাজী করালেন বৈদ্যনাথ। ঠিক একদিনে যে পারলেন তা নয়। অফিসে গিয়েও কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিপিনবাবুর সঙ্গে তিনি দেনা-পাওনার আলোচনাই করতে লাগলেন এবং অনুনয় বিনয় আর আদর্শবাদের বক্তৃতায় বিপিনবাবুর চড়া দরকে ক্রমেই একটু একটু করে নামিয়ে আনলেন। মেয়ে পক্ষের ওপর বেশি চাপ দেওয়া রণজিতের নিজের ইচ্ছা নয়। সে কথা সে বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে। বিপিনবাবু মনে মনে হাসলেন। আসলে মেয়ে বেশি রকম পছন্দ হয়ে গেছে বাবাজীর তাই এই অতিরিক্ত ঔদার্য। মেয়ে বিপিনবাবু নিজেও দেখেছেন। লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত চেহারাই বটে, সুন্দরীও। বিপিনবাবুর স্ত্রী শুনে বলেছেন, 'তা যদি হয়, তাহলে করে ফেল। টাকা পয়সা, গয়না-গাটি কখনো আসে, কখনো যায়। যাকে ঘরে আনবে সেই হল আসল।'

চারদিকের চাপে বিপিনবাবু নরম হলেন। দ্বিধা ত্যাগ করে শুভদিন দেখে কনেকে পাকা দেখার আশীর্বাদও করে গেলেন।

ফাল্গুন মাসের উনত্রিশ তারিখে দিন স্থির হয়ে গেল।

প্রীতি বিজুর পরামর্শে হৈ-চৈ না করে চুপ করেই ছিল। বিজু বলেছে, 'নিজেদের মতলব আগে থেকে ওদের জানতে দিয়ো না। আমরা যা করবার তা করবই। যেমন করে পারি এই চক্রব্যূহ থেকে দুজনে বেরিয়ে পড়ব।'

প্রীতি বলল, 'দেখ, ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না। ক্রমেই দিন ফুরিয়ে আসছে। ফাঁস শক্ত হচ্ছে। এর পর কি আর বেরুতে পারব। তার চেয়ে ওদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলে হয় না?'

বিজু বলল, 'কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দিলেই ওরা তা মানতে চাইবে কেন। এমনভাবে জানাতে হবে, যাতে ওরা বাধ্য হয়। ওরা দলে ভারি, বলে তো ওদের সঙ্গে পারব না।

কৌশলই আমাদের বল। আমি ভেবে দেখেছি প্রীতি, পালান ছাড়া আমাদের আর পর নেই।'

পালান! কথাটা ভাবতেই আশঙ্কায় উত্তেজনায় শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে চায় প্রীতির। কোথায় পালাবে? কি করে পালাবে? চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। তাদের তালাসে লোকজন ছুটবে। বাড়ির ছেলে-বুড়ো কারোরই আর কিছু টের পেতে বাকি থাকবে না। বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন সব বন্ধ হবে। দশজনের কাছে হেঁট হয়ে যাবে বাপ-মার মুখ। বিশেষ করে বাবার মুখের কথা ভাবলে ভারি কষ্ট হয় প্রীতির। কিন্তু এ ছাড়া কি আর কোন পথ নেই? এখনো কি ওঁদের বুঝিয়ে শুনিয়ে বিয়েটা বন্ধ করে দেওয়া যায় না? প্রীতি না হয় কোন দিন না-ই বিয়ে করল। সবারই যে বিয়ে করতে হবে তার কি মানে আছে?

বিয়ের আলাপ আলোচনায় উদ্যোগ আয়োজনে বাড়ির সবাই ব্যস্ত থাকায় তাদের সতর্ক দৃষ্টির পাহারা অনেক শিথিল হয়েছে। এমন কি, ভুবনময়ীও আর বেশি খিট খিট করেন না। প্রীতির ওপর বৈদ্যনাথের মেজাজ প্রসন্ন, ভাষা স্নেহকোমল। আহা, দুদিন বাদে তো মেয়েটি পরের ঘরে চলেই যাচ্ছে আর কেন ওকে মিছামিছি শাসন করা।

সেদিন বিজুর কলেজ ছুটি ছিল। সারা দুপুর ভরে দুজনে কি পরামর্শ করল তারপর প্রীতি বাসন্তীর কাছে গিয়ে বলল, 'মা, বিজুদার এক বন্ধুর স্টেশনারী দোকান আছে বউবাজার স্ট্রীটে, সেখান থেকে কিছু জিনিস কিনে নিয়ে আসি। কি বল, যাই?'

বাসন্তী বুঝতে পারলেন, জিনিস কেনার নামে দুজনে একটু বেরিয়ে আসতে চায়। আসুক। স্বাধীনভাবে ঘোরাঘোরি করার সুযোগ আর কদিনই বা পাবে। মেয়ের কথার জবাবে হেসে বললেন, 'আচ্ছা আয় গিয়ে। বেশি দেরি করিস নে যেন। কি গরজ! নিজের বিয়ের কেনাকাটা বুঝি নিজেই করতে হবে। আমরা যে এত করছি তাতে মন উঠছে না! জিনিস কিনবি তো টাকা পাবি কোথায়। টাকা আছে সঙ্গে?'

প্রীতির একবার ইচ্ছা হল কিছু টাকা চেয়ে নেয়, টাকার তো দরকার হবে। কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচ হল চাইতে। টাকার ব্যবস্থা যা করবার বিজুই করবে। বলল, 'আজ টাকার দরকার হবে না। আজ শুধু পছন্দ করে আসব। পরে একদিন গিয়ে কিনে আনলেই চলবে।'

বাসন্তী বললেন, 'আচ্ছা, তা হলে আয় ঘুরে। বেশি যেন দেরি করিস নে।' দু-এক মিনিট আগে পিছে দুজনে বেরিয়ে এল। ট্রাম-স্টপেজের কাছে দাঁড়িয়ে বিজু জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় যাবে?'

প্রীতি বলল, 'তোমার যেখানে ইচ্ছা। তোমার কোন এক বন্ধুর কথা বলেছিলে—'

বিজু বলল, 'না না, সে আজ নয়।'

প্রীতিও যেন একটু আশ্বস্ত হল। ক'দিন ধরেই বিজু বলছে ব্যাপারটা তার এক বন্ধুকে জানাবে। তার মতামত খুব উদার। এ বিষয়ে তার কাছ থেকে খানিকটা সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রীতি রাজী হয় নি। অদ্ভুত এক সঙ্কোচ বোধ করছে সে, করছে সে, ছি ছি, দুজনের কথা আবার অন্য কাউকে জানান কেন। সে কি মনে করবে। বিশেষ করে দুজনের সম্পর্কের কথা শুনলে সে নিশ্চয়ই মনে মনে হাসবে। তার চেয়ে একথা গোপন রাখাই ভাল। আর কাউকে জানিয়ে কাজ নেই।

বিজু বলল, 'তাকে এখন পর্যন্ত বলার সুযোগ পাই নি। চল এক জায়গায় বসে আলোচনা করি, এখন কি করা যায়।'

কেবল আলোচনা আর আলোচনা। ক'দিন ধরেই তো তারা আলোচনা করছে। কিন্তু কিছু ঠিক করে উঠতে পারছে কই। কাউকে সাহস করে, কাউকে বিশ্বাস করে বলতে পারছে না। পাড়ায় দু-চার জন বান্ধবী প্রীতিরও আছে, কিন্তু তাদের বিশ্বাস করবে এমন ভরসা কই। বিজুরও সেই অসুবিধে। একথা সে কাউকে বলতে পারে না। নিজের গোপন মন যার কাছে খুলে ধরতে পারে, তেমন মানুষ যেন দুনিয়ায় আর কেউ নেই। কলেজে সহপাঠী বন্ধু অনেক আছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তেমন নিবিড় নয়। তারা যদি হাসে, তারা যদি পরিহাস করে সব উড়িয়ে দেয়, কোন রকম সাহায্য করতে যদি এগিয়ে না আসে, তাহলে অনর্থক মুখ হাসিয়ে লাভ কি।

ইডেন গার্ডেনে ঢুকে এক জন-বিরল জায়গা খুঁজে ওরা ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি গা ঘেঁসে বসল, হাতের মধ্যে রাখল হাত। খানিকক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইল। একটু বাদে প্রীতি বলল, 'কই, কিছু ঠিক করলে না? এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল যে।'

বিজু বলল, 'হোক, সন্ধ্যা হোক, রাত হোক, কিছুকে আর ভয় করি নে। আমরা আর ফিরব না।'

প্রীতির বুকের ভিতর টিপ টিপ করে উঠল, 'যা, কি যে বল। ফিরব না তো থাকব কোথায়। এই ইডেন গার্ডেনে তো আর সারারাত কাটাতে দেবে না।'

বিজু বলল, সারারাত নয়, এখন থেকে সারা জীবনের কথা ভাবতে হবে আমাদের। সারা জীবনের প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলতে হবে। ধর আমরা যদি আজই পালাই।'

বিজুর এই অদ্ভুত কথায় প্রীতি একটু হাসল, 'আজই কি করে পালাব। আমরা কি সেভাবে তৈরী হয়ে এসেছি। টাকা পয়সা সঙ্গে নিয়ে এসেছি যে পালিয়ে যাব? এ তো আর ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা নয় যে, খানিকক্ষণ তার আড়ালে গিয়ে বসে রইলাম!'

কিছু করতে হলে, কোথাও সরে যেতে হলে টাকার দরকার বিজু তা ভেবে দেখেছে। কিন্তু সেই দরকারী টাকা কোথায় পাওয়া যাবে ভেবে কিছু কূলকিনারা পায় নি। কলেজের মাইনে আর সপ্তাহের হাত-খরচ বাবার কাছ থেকে বিজু পায়, আর বই কেনার সময় কিছু, কি পরীক্ষার ফীস দেওয়ার সময় কিছু বেশি টাকা তার হাতে আসে। এ ছাড়া টাকার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। টাকা সে কোথেকে জোগাড় করবে। এমন কোন বড়লোক বন্ধু নেই, যার কাছে ধার চাইবে সে। ধার চাইবার অভ্যাসই নেই। কোনদিনই সে চায় নি। একমাত্র পথ আছে, মায়ের গহনার বাক্স ভাঙা, কি দেরাজ থেকে সংসার খরচের টাকা চুরি করে পালানো। ছিঃ, তা সে পারবে না। অতটা হীন হতে পারবে না সে। অনেকবার নিজের মনে সে মহড়া দিয়েছে, অনেকবার ঘুরে ঘুরে গেছেও দেরাজের কাছে, মায়ের বড় ট্রাঙ্কের কাছ দিয়ে ঘোরাঘুরি করেছে, কিন্তু কিছুতেই তার বেশি এগোতে পারেনি। তাড়াতাড়ি সরে এসেছে। ছি ছি ছি মায়ের গয়না, বাবার টাকা সে কি করে চুরি করবে ?

এসব চিন্তা ভাবনার কিছুরই দরকার ছিল না, যদি প্রীতির বিয়েটা না হোত, যদি ওর বিয়েটা বন্ধ করা যেত। তাহলে তারা যেমন ছিল তেমনই থাকতে পারত। শুধু দিনান্তে একবার করে দেখা, দুটি একটি কথা বলা, এর বেশি কিছু তার কাম্য ছিল না। এতেই সে খুশী থাকতে পারত। কিন্তু এতেও যে বাধা পড়ছে। সে যে চাকরি-বাকরি জোগাড় করে প্রয়োজনমত টাকার ব্যবস্থা করবে তার সময় পর্যন্ত নেই। মাঝখানে মাত্র একটি সপ্তাহ আছে। এর মধ্যে সব চিরদিনের জন্য ঠিক হয়ে যাবে। আর তার কোন নড়চড় চলবে না, রদ-বদল হবে না। কিন্তু যেমন করে পারুক একে যে ঠেকাতেই হবে, বাধা না দিলে সব হারাবে বিজু, একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অসহায়ের মত বিজু বলল, 'তাহলে কি করা যায় বল তো ?'

প্রীতি বলল, 'এতদিনের মধ্যে কিছু যখন আর করা গেল না, তখন আর কিছু করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

বিজু বলল, 'তার মানে তোমার বিয়ে হয়ে যাবে ? তুমি তাহলে মন স্থির করে ফেলেছ ?'

প্রীতি অদ্ভুত একটু হাসল, 'তা খানিকটা করেছি বই কি।'

বিজু বলল, 'বিয়েতে তাহলে তোমার মত আছে ?'

প্রীতি বলল, 'আছে, কিন্তু তা ওই রণজিত-টনজিত কারও সঙ্গে নয়।'

বিজুর বুক টিপ টিপ করতে লাগল, বলল, 'তবে কার সঙ্গে ?'

প্রীতি বলল, 'যমের সঙ্গে। সে ছাড়া জীবনে দ্বিতীয় কোন পুরুষ আমাকে ছুঁতে পারবে না।'

বিজু নিজের মুঠির মধ্যে শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরল, 'এ সব তুমি কি বলছ?'

প্রীতি বলল, 'ঠিকই বলছি। আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি, এ ছাড়া আমার আর পথ নেই।'

বিজু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তা যদি হয় তাহলে আমারও সেই পথ।'

প্রীতি বলল, 'তা কেন। তুমি পুরুষ ছেলে। তুমি কোন্ দুঃখে মরতে যাবে!'

বিজু বলল, 'মানুষ কি কেবল দুঃখেই মরে? মরার মধ্যে কি সুখ নেই প্রীতি? একসঙ্গে মরার সুখ, একসঙ্গে পালানোর সুখ?'

প্রীতি বলল, 'তা আছে। তুমি তাহলে আসবে আমার সঙ্গে?'

বিজু বলল, 'নিশ্চয়ই, আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারব না। দুজনে এক সঙ্গে থাকব। কিন্তু একসঙ্গে বেঁচে থাকায় অনেক বাধা, অনেক হাঙ্গামা। একসঙ্গে মরায় তো তা নেই। আমরা একসঙ্গে মরব প্রীতি। মরে সবাইর ওপর শোধ নেব।'

আরও খানিকক্ষণ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে রইল দুজনে। সঙ্কল্পকে আরও দৃঢ় করে নিল। আব তাদের কোন ভয় নেই। আর কারো কোন শাসন কি রক্তচক্ষুকে তারা গ্রাহ্য করবে না। সবাইর ওপর তারা শোধ তুলতে পারবে। আশ্চর্য, এত সহজ পথ থাকতে কেন এতক্ষণ তারা পথ হাতড়ে মরছিল, ভেবে এত আকুল হচ্ছিল কেন। কত সহজ সরল পথ পড়ে রয়েছে। আর তাদের ভাবনা কি, এ পথে আর কারো বিশেষ কোন সাহায্য নিতে হবে না। তাদের এই মিলনে কোন ঠাকুর পুরোহিত লাগবে না, কারো অনুমোদন লাগবে না, আইন-কানুনের অনুকূলতার দরকার হবে না। যা করবার তারা নিজেরাই করবে। সমস্ত সমস্যার এই সহজ সমাধানে আসতে পেরে দুজনে ভারি তৃপ্তি বোধ করল, এতক্ষণ বাদে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে দুজনে। এখন মৃত্যুর উপায়টা শুধু বেছে নিতে হবে। সে এমন কিছু কঠিন হবে না। বেছে নেওয়ার এখনো ঢের সময় আছে। মাঝখানের এই কয়েকদিন তারা বাঁচবে, বেপরোয়াভাবে বাঁচবে।

দুজনে যখন বাড়ি ফিরল, তখন সন্ধ্যা উতরে বেশ খানিকটা রাত হয়েছে।

বাসন্তী মেয়ের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'এত দেরি করলি যে। বললাম না সকাল সকাল আসিস।'

প্রীতি কোন জবাব না দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল।

ভুবনময়ী বলতে লাগলেন, 'যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড। আজ বাদে কাল যে মেয়ের বিয়ে, সে নাকি এখন টৈ-টৈ করে সারা শহর ঘুরে বেড়ায়! ছি ছি ছি। লোকে দেখলেই— বরপক্ষও তো বেশি দূরে থাকে না। চেতলা তো এই শহরের মধ্যেই। যদি তাদের কারো চোখে পড়ে যায়, তাহলে এই ধিঙ্গিপনা দেখে তারা কি ভাববে। আস্কারা দিয়ে দিয়ে

ছেলেমেয়েদের সব মাথায় তুলে দিয়েছে। এখন বুঝুক মজা।'

নিজের অপছন্দমত কিছু একটা হলে শুধু যে একজনকেই দোষারোপ করেন ভুবনময়ী তা নয়, বাড়ির সমস্ত লোকের ঘাড়েই দোষ চাপিয়ে দেন। আগে আগে কেউ না কেউ এর জবাব দিত, কিন্তু এখন সকলেরই কানে সয়ে গেছে। ভুবনময়ী নিজের মনেই খানিকক্ষণ বক্ বক্ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে আপনিই এক সময় থেমে পড়েন।

মাঝখানে দিন তো বড় আর বেশি নেই। বিয়ের উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন বাসন্তী। অবনীমোহন টাকার জোগাড় করে দিয়েই খালাস। তাঁকে দিয়ে আর কোন কাজ হয় না। সব ব্যাপারে সহায় বৈদ্যনাথ। দুই ভাই-বোনে মিলেই যা ব্যবস্থা করবার সব করেন। জিনিসপত্রের ফর্দ, নিমন্ত্রিতদের তালিকা তৈরী করা হয়। আলোচনা আর পরামর্শের সময় অবনীমোহন উপস্থিত থাকেন, দু-একটা মন্তব্য, কি গ্রহণযোগ্য দু-একটি সদুপদেশ যে মাঝে মাঝে না দেন তা নয়, কিন্তু তার বেশি আর কোন সহায়তা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় না। দাদাকে সঙ্গে নিয়েই বাসন্তী কাপড়-চোপড় জিনিসপত্র পছন্দ করতে বেরোন, তাঁর পছন্দ অপছন্দের ওপরই অনেকখানি নির্ভর করেন। সত্যিই খুব কাজের লোক বৈদ্যনাথ। কাজে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পান। অফিসের খাটুনির পর এত যে ছুটোছুটি করছেন, তাতে যেন কোন ক্লান্তি নেই তাঁর।

শুধু স্বামী নয়, নিজের ছেলেমেয়ের কাছ থেকেও তেমন যেন সহযোগিতা পান না বাসন্তী। বাড়িতে এত কাজ, কিন্তু ওরা যেন মা আর মামার ওপর সব ভার চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। সবাই ফাঁকিবাজ। সবাই কাজকে, ঝক্কি-ঝামেলাকে ভয় করে—ওরা প্রত্যেকেই বাপের ধারা পেয়েছে।

সেদিন বড় ছেলেকে কাছে ডেকে বাসন্তী বললেন, 'তোরা কি ভাবলি বল তো, সবাই কি অতিথি এলি নাকি বাড়িতে?'

অরুণ হেসে বলল, 'এলামই বা। বিয়ে বাড়িতে অতিথি-কুটুম বুঝি আসে না? নিজেদের বাড়িতে মাঝে মাঝে কুটুম্ব হয়ে থাকতে মন্দ লাগে না মা। মনে করো আমি তোমার বাপের বাড়ির তরফের একজন কেউ। মেজো পিসে কি ছোট খুড়ো। খড়ম পায়ে হুঁকো হাতে সারা বাড়ি তদারক করে বেড়াচ্ছি।'

বাসন্তীও হাসলেন, 'বাঁদর ছেলের কথা শোন। আমার বাপের বাড়ির কেউ অমন ধারা নয়। তারা সবাই কাজের লোক।'

অরুণ বলল, 'আর আমরা বুঝি অকাজের? কাজের সময় আসুক, তখন দেখ কি রকম খাটতে পারি। এখন আর আমাদের করবার কি আছে। দুই দাদা বোনে মিলে কেবল তো বৈঠকের পর বৈঠক চলছে এখন। তার মধ্যে আর কেউ মাথা গলায় সাধ্য কি।'

বাসন্তী বললেন, 'হুঁ, মাথা গলাবার কত যেন গরজ তোমাদের। ভাল কথা, তোর বন্ধু-বান্ধব কাকে কাকে বলবি ঠিক করেছিস ?'

অরুণ বলল, 'কাউকেই বলব না।'

বাসন্তী বললেন, 'কেন ?'

অরুণ বলল, 'কেন আবার। নিজের বন্ধুদের নিজের বিয়েতে বলব। বরযাত্রী হয়ে অন্যের বাড়িতে খেয়ে আসবে। খরচটা পরের ওপর দিয়ে যাবে। এখন বলে ব্যয় বাড়িয়ে লাভ কি।'

বাসন্তী হেসে বললেন, 'খুব তো হিসেবী হয়েছিস দেখছি। তবু দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে কি বলতে হয় না ?'

অরুণ বলল, 'বন্ধুদের মধ্যে আমার সবাই ঘনিষ্ঠ, আবার কেউ ঘনিষ্ঠ নয়; সেদিক থেকে কাউকেই বলবার দরকার হবে না।'

বাসন্তী একটুকাল চুপ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আচ্ছা একটা কথা বলি, সেই মেয়েটিকে বলবি ? করবীই তো বুঝি নাম। তাকে একবার বললে হয় এই উপলক্ষে।'

অরুণ স্থির দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'মা!'

বাসন্তী বললেন, 'আচ্ছা অমন করছিস কেন। মানুষের বাড়িতে কি মানুষ আসে না ? আমার বড় দেখতে ইচ্ছা করে মেয়েটিকে। আহা, এই বয়সে কি দুঃখই না পেয়েছে মেয়েটি। বল না তাকে নান্তু।' বাসন্তীর গলায় অনুনয়ের স্বর ফুটে উঠল।

অরুণ বলল, 'তুমি সত্যি বলছ মা ? তাকে বললে তুমি খুশী হও ?'

বাসন্তী বললেন, 'বাঃ, খুশী হই বই কি! বলিস তাকে! আমার নাম করে বলিস, বুঝলি ?'

অরুণ যেতে যেতে বলল, 'আচ্ছা, ভেবে দেখি।'

মনে মনে ভাবল, বললেই কি সে আর আসবে, না তার পক্ষে আসা সম্ভব হবে। বিকেলের দিকে অতুলকেও পাকড়াও করলে বাসন্তী। এক বাণ্ডিল ছিটকাপড় নিয়ে সে ব্যস্তভাবে বেরোচ্ছিল, বাসন্তী আটকে ধরলেন। বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

অতুল সংক্ষেপে জবাব দিল, 'কাজে!'

বাসন্তী বললেন, 'কাজ যে কত, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছ। ব্যবসা না ছাই। কেবল আড্ডা আর আড্ডা। এ ছ' মাসের মধ্যে তো একটা পয়সা হাত উপুড় করে দিতে পারলি নে। কি করিস না করিস, তুই-ই জানিস।'

অতুল বলল, 'জানিই তো। এ তো চাকরি নয় মা। এর নাম বিজনেস। এতে অপেক্ষা করতে হয়, ধৈর্য ধরতে হয়। এতে টাকা ঢাললে তবে টাকা আসে।'

অতুলের ব্যবসার খোঁজ-খবর যে বাসন্তী একেবারে না রাখেন, তা নয়। গোবিন্দের সঙ্গে মিলে একটা ফুট-মেসিন কিনেছে অতুল। কেশববাবুদের বৈঠকখানায় সেটাকে বসিয়ে এক দর্জির দোকান খুলেছে সেখানে। রাতদিন প্রায় সেখানেই থাকে। কেবল খাওয়ার সময় আর শোওয়ার সময় আসে। টাকাটা বেশির ভাগ গোবিন্দের। খাটুনিটা অতুলের। ঘুরে ঘুরে অর্ডার নিয়ে আসে। বিক্রীর বন্দোবস্ত করে, আর ভিতরের বিধি-ব্যবস্থা করে কেশববাবুর স্বামীত্যাগিনী মেয়েটা। আসলে সেই সব চালায়। টাকা-পয়সা সব তার কাছেই থাকে। এই নিয়ে পাড়ায় যে মাঝে মাঝে কানা-ঘুষা না চলে তা নয়। কিন্তু অতুলের যেন তা নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই। এ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত করলে চটে উঠে বলে, 'কোন শালা বলেছে এ কথা? আমার সামনে এসে বলুক তো দেখব তার কত বড় বুকের পাটা!' তা ঠিক। সামনে কেউ কিছু বলতে পারে না। এমন কি, আড়াল-আবডাল থেকেও যদি কারো কোন আপত্তিকর মন্তব্য কানে যায়, দুই বন্ধু মিলে তাকে দারুণ শাসন করে। পাড়ায় সবাই ওদের ভয় করে চলে। গুণ্ডার দলের সঙ্গেও ওদের ভাব, থানা-পুলিসের সঙ্গেও ওদের অন্তরঙ্গতা। অতুল-গোবিন্দের দলকে সবাই খাতির করে।

নিজের বাড়িতে দোকান খোলায় কেশববাবু প্রথম প্রথম আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ সে আপত্তি কানে তোলে নি। বাপ বেশি বকাবকি করায় মাস দুই খরচ বন্ধ করে দিয়েছিল সংসারের। কেশববাবুকে বাধ্য হয়ে আপোস করতে হয়েছে।

রমাও উগ্রচণ্ডী স্বভাবের মেয়ে। কারো কানা-ঘুষায় সে কান দেয় না। নিজের মনে কাজ করে যায়। সংসারের কাজও করে, আবার ভাই আর বন্ধুতে মিলে যে দর্জির দোকান দিয়েছে, সাধ্যমত তারও সাহায্য করে। রাস্তায় চলতে ফিরতে মাঝে মাঝে দেখেছেন বাসন্তী। দেখলেই মনে হয়, একগুঁয়ে খাণ্ডারনী ধরনের মেয়ে। ওদের মনে রাগ আছে, হিংসা দ্বেষ আছে, কিন্তু অন্য কোন ময়লা নেই। তাছাড়া অতুলের চেয়ে বয়সেও তো রমা বড়। দিদির মত। তাই ওদের সম্বন্ধে কোন কানা-ঘুষাকে তেমন বিশ্বাস করেন না বাসন্তী। তেমন চিন্তা কি উদ্বেগ যেন হয় না। তাছাড়া চিন্তা-ভাবনা করে করবেনই বা কি। ছেলেমেয়ে একবার বড় হয়ে গেলে তো হাতের মুঠোর বাইরে চলে গেল। না পাওয়া যায় তাদের মনের খবর, না বোঝা যায় তাদের চালচলন। নইলে এই প্রীতির কথাই ধর না। বয়সের মেয়ে। বিয়ের কথায় কি রকম আনন্দ-আহ্লাদ হবে তা নয় মুখের কালি যেন ঘুচতেই চায় না। সেই যে গুম মেরে রয়েছে তো রয়েইছে।

অতুল চলে যাচ্ছিল, বাসন্তী তাকে ফের ডেকে বললেন, 'অন্য সময় কিছু না দিস নাই দিলি; কিন্তু প্রীতির বিয়েতে বার কর না দু' চারশ'। দেখি এতদিন ধরে কি ব্যবসা করেছিস।'

অতুল যেতে যেতে বললে, 'উহুঁ এখন নয় মা, পরে। এটিকে তোমরা নামাও, পরের দুটির বেলায় আমি আছি।' বলে অতুল বেরিয়ে গেল। বাসন্তী ওর ভঙ্গি দেখে মনে মনে হাসলেন। এই এক ছেলে। পারুক না পারুক, কারো কাছে ঘাড় নোয়াবে না। মাথা হেঁট করবে না কখনো। দেখতে দেখতে উনত্রিশে ফাল্গুন এসে গেল। বিয়ের উৎসবে সমস্ত বাড়ি মুখর হয়ে উঠেছে। গিজ গিজ করছে লোকজন। মেয়ে আর শিশুদের সংখ্যাই তার মধ্যে বেশি। আনব না আনব না করেও কুটুম্বস্বজন কম আনেন নি বাসন্তী। দাদার শাশুড়ী আর শালাবউকে আনিয়েছেন। জায়ের মার শরীর ভাল না থাকায় তিনি আসতে পারেন নি। তার দুই বউদি এসেছেন ছেলেপুলে নিয়ে। বেলেঘাটা থেকে ভুবনময়ীর খুড়তুতো বোন এসেছেন আর পাথুরিয়াঘাটা থেকে জেঠতুতো ভায়ের স্ত্রী। একদল কিশোরী মেয়ের কলোচ্ছ্বাসে সারা বাড়ি উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

ভুবনময়ী তাঁর স্থূল দেহ নিয়ে রান্নাঘর আর ভাঁড়ারঘরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন আর নানা কাজের খুঁৎ ধরছেন। বাসন্তীকে ডেকে বললেন, 'তরকারীগুলি কুটলিনে। এগুলি কি পড়েই থাকবে?'

বাসন্তী হেসে বললেন, 'কিছু পড়ে থাকবে না মা, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, তুমি বরং তোমার বেয়ানের সঙ্গে বসে খানিকক্ষণ গল্প-টল্প কর।'

ভুবনময়ী বললেন, 'হুঁ, গল্প করবারই সময় আমার। যেদিকে না দেখব, সেদিকেই তো গোলমাল।' বলে নিজেই তরকারী কুটতে বসে গেলেন ভুবনময়ী। বৈদ্যনাথের শাশুড়ীকে বললেন, 'আসুন বেয়ান, এখানে বসে গল্প করি।'

ফলে হেমবালাকেও একখানা বঁটি নিয়ে বসতে হয়।

কিন্তু বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারেন না ভুবনময়ী। খানিকবাদেই উঠে চলে আসেন রান্নাঘরে। এ ঘরের দেখাশোনার ভার নিয়েছেন কনকলতা। ভুবনময়ী গিয়ে বলেন, 'বউমা, অন্নর নাতি দুইটিকে এবার বসিয়ে দাও। ওরা শুকনো মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

অন্নপূর্ণা ভুবনময়ীর খুড়তুতো বোন।

কনকলতা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এই তো ছেলেমেয়েরা সবাই খেয়ে গেল, তখন যদি এসে বসত।'

ভুবনময়ী বললেন, 'এসে বসত! ওরা কি কখনও এ বাড়িতে এসেছে যে দলের সঙ্গে বসে যাবে। তোমারই উচিত ছিল ডাক-খোঁজ করে বসানো। আমার আপন বোন নেই। অন্ন আমার আপন বোনের চেয়েও বাড়া। ছেলে-বেলায় একসঙ্গে কত খেলেছি। দেখলে কেউ বলতে পারত না মায়ের পেটের বোন নয়।'

খানিকবাদে কলাপাতার ঠোঙায় করে কিছু ফুল নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকল বিজু।

আর কাউকে সামনে না পেয়ে নারায়ণ পুজোর জন্যে ভুবনময়ী বিজুকেই বলেছিলেন ফুল আনতে। নাতির হাত থেকে ফুলগুলি তুলে রাখতে রাখতে ভুবনময়ী বললেন, 'দাদা আমার লক্ষ্মী। যা বলছি তাই করছে।'

হেমবালার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'জানেন বেয়ান, এ ছেলেকে ঘরের কোণ থেকে অন্য সময় কেউ নড়াতে পারে না। বই নিয়ে পড়ে আছে তো আছেই। কিন্তু প্রীতির বিয়েতে আমার বিজুই সবচেয়ে বেশি খাটছে। আর যাদের নিজের বোনের বিয়ে তাদেরই পাত্তা নেই। প্রীতিকে বিজু ভারি ভালবাসে।'

হেমবালা বলছেন, 'বাসবে না কেন। ভালবাসারই যে সম্পর্ক।'

বিজু চলে যাচ্ছিল, কিন্তু ভুবনময়ী তার হাত ধরে টেনে বললেন, 'উঁহু গেলে হবে না। বসো এখানে, এই বুড়ীদের কাছে বসো। আরে তাতে লাভ আছে। রাঙা বউ যোগাড় করে দিলে আমরাই দেব। বাবা-মায়ে সহজে দেবে না। বেয়ান, আমার জন্যে একটি মেয়ে দেখে দিন। খুব যেন সুন্দরী হয় দেখতে। আসছে বোশেখ জৈষ্ঠেই একটি নাতবউ ঘরে আনা চাই আমার।'

হেমবালা বলেন, 'কি এত তাড়াতাড়ি। বিয়ের কি বয়স হয়েছে নাকি বিজুর।'

ভুবনময়ী বললেন, 'হয়েছে, বেয়ান হয়েছে। মুখচোরা মানুষ আর বর্ণচোরা আম এদের চেনা বড় শক্ত। বিজুর একটি বিয়ে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই।'

বিজু চমকে উঠে ভুবনময়ীর দিকে তাকাল। এ কথার মানে কি, ঠাকুরমা কি কিছু টের পেয়েছেন ? পেয়ে যদি থাকেন তো পেয়েছেন। তাতে বিজুর কিছু এসে যায় না।

ভুবনময়ী সান্ত্বনার ছলে বললেন, 'আহা, ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে খেলেছে বেড়িয়েছে। ছাড়াছাড়ির সময় মন খারাপ হয় না? নিশ্চয়ই হয়। এই যে আমার জেঠতুতো ভাই। এক-অন্নে ছিলাম আমরা ঠিক আপন ভাইবোনের মত। ব্যস, বিয়ের পরদিন, যখন শ্বশুরবাড়ি রওনা হলাম, দাদার দিকে তাকিয়ে আমি কাঁদি, আমার দিকে তাকিয়ে দাদা চোখের জল ছেড়ে দেয়। আর এখন! ন'মাসে ছ'মাসেও একবার দেখা হয় না। দুনিয়ার এই নিয়ম।'

বৈরাগ্যের ভঙ্গিতে একটু দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ভুবনময়ী। তারপর নাতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অবশ্য তোদের তা হবে না। আমাদের মত তো আর সাত সমুদ্দুর তের নদীর ব্যবধান থাকবে না। বিয়ের পর আমি শহরে শ্বশুর বাড়িতে চলে এলাম, দাদা রইল গাঁয়ে। টাকা-পয়সার জোর ছিল না। ইচ্ছে করলেও আসতে পারত না। কিন্তু এদের তো আর তা হবে না বেয়ান, এরা কত যাবে আসবে, খাবে দাবে! ভগ্নীপতি তো ইয়ার বন্ধুর মত। কি বলেন বেয়ান ?'

হেমবালা বললেন, 'তা তো ঠিকই।'

ভুবনময়ী বললেন, 'আশ্চর্য নিয়ম দুনিয়ার। নিজের ঘরের মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাতে হয়। পরের ঘরের মেয়েকে আনতে হয় আপন ঘরে।'

হেমবালা হেসে বললেন, 'তা তো হয়ই। কিন্তু আপনার যদি সেটা পছন্দ না হয় নাতনীকেই নাতবউ করে রাখুন না।'

ভুবনময়ী হেসে বললেন, 'সে নিয়ম যদি থাকত বেয়ান—'

বলেই থেমে গেলেন ভুবনময়ী। একটা যেন দীর্ঘশ্বাস চাপলেন।

বিজু আর দাঁড়াল না। উঠে চলে গেল নিজের ঘরে। সিঁড়ির মুখে দেখল একদল মেয়ের সঙ্গে অণিমা প্রীতিকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে।

বিজুকে দেখে অণিমা বলল, 'প্রীতি কয়েকদিন ধরে ভারি লক্ষ্মী হয়েছে দাদা। যে যা বলছে তাই শুনছে। আসলে আগের অনিচ্ছা আর একগুঁয়েমি ছিল লোক-দেখানো। ভিতরে ইচ্ছেটা পুরোপুরি।'

বিজু পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে মৃদু হেসে বলল, 'হুঁ।'

প্রীতির ইচ্ছা অনিচ্ছার খবর তার জানতে বাকি নেই। দুজনের মধ্যে বোঝাপাড়া হয়ে গেছে। বাইরের আচার অনুষ্ঠানে কেউ আর কোন অবাধ্যতা প্রকাশ করবে না। সকলের কথা শুনবে, সবাইকে মেনে চলবে। তারপর সেই চরম মুহূর্তে সব অমান্য করবে।

প্রথম দিনকয়েক ভারি ইতস্তত করেছে বিজু। বলেছে, 'থাক প্রীতি, দরকার নেই ওসব।'

প্রীতি বলেছে, 'তোমার দরকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। তুমি পুরুষ ছেলে। তোমার তো কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু যত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে আমাকে। যাকে ভালোবাসি নি ভালোবাসতে পারব না তার ঘর করতে হবে সারাজীবন। তার আদর সোহাগ সহ্য করতে হবে। আমি তা কল্পনাও করতে পারি নে। না না, আমি তা কিছুতেই পারব না। তুমি যদি আমাকে সাহায্য না কর আমি নিজের পথ নিজে দেখব। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব, আর না হয় গলায় দড়ি দেব। কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না!'

বিজু বলেছে, 'না না ওসব করতে যেয়ো না। যা করবার আমরা দুজনে মিলে করব। একসঙ্গে একই পথে—'

প্রীতির বিয়ে হয়ে যাবে, সে অন্য পুরুষের ঘর সংসার করবে, এ চিন্তা বিজুর কাছেও অসহ্য। প্রাণ থাকতে তা সে হতে দিতে পারবে না। জীবন্ত প্রীতিকে কেউ নিতে পারবে

না তার কাছ থেকে। ওর শবদেহ নেয় নিক্। বিজু তা দেখতে আসবে না। তারপর থেকে পরিত্রাণের নিশ্চিত উপায়কে মুঠোয় আনতে চেষ্টা করেছে বিজু। সাফল্য সহজে আসে নি। বার বার হাত কেঁপেছে, বুক কেঁপেছে। আর ব্যর্থ হয়ে বিজু ফিরে ফিরে এসেছে। যতবার বিফল হয়েছে প্রীতি তত তাকে উপহাস করেছে, নিষ্ঠুর বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছে, 'তোমার দ্বারা কিছু হবে না। তোমার ক্ষমতায় কুলোবে না। তুমি ওসব চেষ্টা ছেড়ে দাও। আমার পথ আমি নিজেই করব।'

কিন্তু বিজু চেষ্টা ছাড়ে নি। শেষ পর্যন্ত নিজেদের কলেজের লেবরেটরী থেকে সংগ্রহ করেছে সেই অমোঘ মরণাস্ত্র। এনে প্রীতিকে খবর দিয়েছে। প্রীতি সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে বলেছে, 'দাও, আমাকে দাও।'

বিজু জবাব দিয়েছে, 'এখন না, পরে। সময়মত দেব।'

সেই সময় এল সন্ধ্যার পর। বোনদের আর সমবয়সী প্রতিবেশিনীদের হাত এড়িয়ে হঠাৎ এক সময় উঠে এল প্রীতি, বলল, 'তোরা বোস, আমি আসছি এক্ষুণি।'

গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কের আড়ালে ছাদের কোণে ফের দেখা হল দুজনের। বাড়ি-ভরা লোক গিজ গিজ করছে। যে কোন মুহূর্তে যে কেউ দেখে ফেলতে পারে। তা ফেলুক। আজ আর ওদের ভয় নেই, আজ ওরা নিঃশঙ্ক। সমস্ত শঙ্কা, নিন্দা, শাসনের আজ ওরা ওপারে চলে যাবে।

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল। কনের সজ্জা এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। প্রীতির সারা মুখ ঘিরে চন্দনের ফোঁটা। সারা গায়ে একরাশ গয়না। কিন্তু পরনের শাড়িখানা বদলায় নি। কোরা, লালপেড়ে, হলুদের ছোপ লাগা আটপৌরে শাড়িখানা এখনো পরে আছে প্রীতি। কিন্তু এই বিচিত্র বেশে ওকে আরো অপরূপ দেখাচ্ছে। বিজুর মনে হল প্রীতির এমন রূপ সে আর কোনদিন দেখে নি।

বিজুর গায়ে একটা ছিটের হাফ সার্ট, কোঁকড়ানো চুলগুলি উস্কোখুস্কো। মুখের ভাব স্থির গম্ভীর।

প্রীতি মৃদুস্বরে বলল, 'কই দাও তাড়াতাড়ি। এর পর হয়ত আর সময় পাওয়া যাবে না। কেউ এসে পড়বে।'

বিজু পকেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো বেল ফুল তুলে প্রীতির হাতে দিয়ে বলল, 'আর কিছু নাই বা দিলাম।'

প্রীতি বলল, 'ছিঃ, এত ভয় তোমার। তুমি কেন পুরুষ হয়ে জন্মেছ। তুমি যদি না দাও, আমি সব কেড়ে নেব।'

বিজু অগত্যা ছোট একটা শিশি ওর হাতের মুঠোয় গুঁজে দিল।

প্রীতি বলল, 'বাকিটাও দাও আমাকে।'

বিজু বলল, 'না, ওই যথেষ্ট।'

প্রীতি কি বলতে যাচ্ছিল, ছাদের সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আড়াল থেকে সরে এল প্রীতি। পরমুহূর্তে কনকলতা এসে সামনে দাঁড়ালেন, বললেন, 'ওমা, প্রীতি তুই এখানে, আর সারা বাড়ি ভরে আমরা তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। চল নীচে চল। বরযাত্রীরা একদল এসে গেছে। বরও এসে পড়ল বলে।' তারপর ছেলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন, 'তুই এখানে কি করছিস, বিজু?'

বিজু বলল, 'কি আবার করব!'

কনকলতা বললেন,'কি আবার করব। কাজের বাড়ি। কত কাজ রয়েছে। উনি তোকে একটু আগেও ডাকাডাকি করছিলেন। আর তুই এখানে দাঁডিয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিস, আচ্ছা আক্কেল। গল্প করবার সময় পরে পাবি। এখন যা। কেন ডাকছেন শুনে আয়। নইলে উনি রাগারাগি করবেন।'

বিজু অদ্ভুত একটু হেসে বলল, 'যাই মা।' প্রীতিও বিজুর সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল। কনকলতা ওর দিকে তাকিয়ে মনে মনে একটা অদ্ভুত বিদ্বেষ বোধ করলেন। মেয়েটা যে বিজুর মাথা খাচ্ছে তা আর বুঝতে তাঁর বাকি নেই। একথা কাউকে বলাও যায় না, সওয়াও যায় না। এখন ভালোয় ভালোয় বিয়েটা চুকে গেলে জঞ্জাল যায়।

বিয়েটা নির্বিঘ্নেই চুকল। রাত ন'টার মধ্যে বরযাত্রীরা খেয়ে দেয়ে বিদায় নিয়ে গেল। তারপর পঞ্জিকার লগ্নের সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ির সময় মিলিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। প্রীতির মনে হতে লাগল, এর আর যেন শেষ নেই। কিন্তু ধৈর্য ধয়ে আর তাকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে মাত্র। তারপর সব শেষ হবে। এদের সব উৎপীড়ন অত্যাচারের ওপর ছেদ টেনে দেবে প্রীতি। শুভদৃষ্টির সময় ইচ্ছে করেই প্রীতি রণজিতের দিকে তাকাল না। লোকটি তার পক্ষে মূর্তিমান অশুভ। ওর সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময়ের জীবনে আর প্রয়োজন হবে না প্রীতির।

বাসরের ব্যবস্থা হল কনকলতার ঘরেই। তিনি নিজেই ভদ্রতা করে প্রস্তাবটি করলেন। বাসন্তী বললেন, 'তোমার অসুবিধে হবে বৌদি। এত বড় একটা ঘর এজন্যে আটকে রাখলে আর সব লোক শোবে কোথায়।'

কনকলতা বললেন, 'কেন, তোমার ঘরে শোবে, তোমার জায়ের ঘরে শোবে। বাড়ি ভরে এত জায়গা রয়েছে, ছাদ রয়েছে, শোয়ার অসুবিধে হবে কেন। আর যদি হয় তো হলই বা। এক রাত্রের তো ব্যাপার। আমার ঘরেই বাসরের ব্যবস্থা করে দাও ওদের। বেশ খোলামেলা আছে। এখানেই সুবিধে হবে। তোমার ঘর তো জিনিসপত্রে ঠাসা।'

কিশোরী কুমারীর দলে বাসর-ঘর ভরে গেল। দিদিমা ঠাকুরমা সম্পর্কিত কয়েকজন প্রৌঢ়াও এসে ঘরের মধ্যে ভিড় করলেন। বিপুল বপু টানতে টানতে একসময় দোরের পাশে এসে দাঁড়ালের ভুবনময়ী। তাঁর মুখে প্রসন্নতার হাসি।

অণিমা বলল, 'এসো ঠাকুরমা, ভিতরে এসো।'

ভুবনময়ী বললেন, 'ভিতরে আসবার বয়স কি আর আমাদের আছে। ভিতরে তোরা আছিস, তোরাই থাক। আমরা দোরের কাছে একটু দাঁড়াতে পারলেই যথেষ্ট।'

অণিমা বলল, 'তা ঠিক। দোরের ভিতর দিয়ে ঢুকতে পারলে তো ঢুকবে।'

অণিমার মামাতো বোনেরা ভাল রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়। খানিকক্ষণ অনুরোধ উপরোধের পর একজন একজন করে গলা খুলল। তাদের গান শেষ হলে অণিমা বলল, 'এবার আপনার একখানা হোক, রণজিতবাবু।'

রণজিত হেসে বলল, 'একখানা কেন, একশখানা শোনাতে রাজী আছি। কিন্তু তার আগে বিশেষ একখানা হোক। প্রথম দিন তো অনুরোধ করে ধমক শুনেছি, আজ যদি অন্য কিছু শুনতে পারি।' বলে মৃদু হেসে আড়চোখে প্রীতির দিকে তাকাল রণজিত। কিন্তু রাঙা চেলীপরা প্রীতির মুখে রঙ নেই, হাসি নেই। সে মুখ স্থির গম্ভীর, ভাবলেশহীন।

খানিকক্ষণ ধরে অণিমারা তাকে গান গাইবার অনুরোধ করল। কিন্তু প্রীতি কিছুতেই রাজী হল না। অণিমারা শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'এত লোকজনের মধ্যে ওর বোধ হয় গান শোনাবার ইচ্ছে নেই। যা শোনাবার একজনকেই শোনাবে। আপনার একখানা গান অন্তত আমরা শুনি। বাকি নিরানব্বইখানা আপনি স্ত্রীর জন্যে রাখুন।'

রণজিত বলল, 'আপনারা গান জানেন, কিন্তু গণিত জানেন না। একশ থেকে এক তুলে নিলে নিরানব্বই থাকে না, থাকে শূন্য। নিজের ভাগে যা পড়ে তা পড়ুক আর কারো ভাগে সে শূন্য না পড়লেই হল।'

রাত বারটার সময় ভুবনময়ী এসে তাড়া লাগালেন, 'তোরা ওঠ এবার। ওদের একটু ঘুমুতে দে।'

অণিমা ঠোঁট টিপে হাসল, 'ওরা বুঝি আজ ঘুমুবে। ঠাকুরমা তুমি সব ভুলে গেছ।'

ভুবনময়ী বললে, 'তা তো ভুলেইছি কিন্তু তোর যে সব মনে আছে, ধরন-ধারন দেখে তাই বা বুঝতে পারছি কই! ওদের রেহাই দে এখন। অনেক রাত হয়ে গেছে।'

আরো কিছুক্ষণ বাদে অণিমারা বিদায় নিল। রণজিত পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে একটা ধরাবার আগে বলল, 'তোমার কি কোন অসুবিধে হবে?'

প্রীতি সংক্ষেপে বলল, 'না।'

রণজিতের এই আনুষ্ঠানিক ভদ্রতায় মনে মনে হাসি পেল প্রীতির। যে সারা-জীবনের

জন্যে অসুবিধার সৃষ্টি করে রাখল, সে জিজ্ঞেস করছে সিগারেটের ধোঁয়ায় তার অসুবিধে হবে কিনা। আচ্ছা, এখন যদি সব ওকে খুলে বলে প্রীতি তাহলে কি হয়। আর খানিকক্ষণ বাদেই যখন সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন আর কি ভয় তার। এখন ইচ্ছা করলেই সব বলতে পারে প্রীতি। বলতে পারে এই বিয়ে মিথ্যে। এ বিয়েতে তার মত ছিল না। জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বাধ্য করা হয়েছে। পরিষ্কার বলতে পারে সে আর একজনকে ভালোবাসে। আর তার সেই প্রিয়জন, প্রিয়তম জন আছে এই বাড়িতেই। যদি বলে তাহলে কি হয়। নিশ্চয়ই লোকটি আর তাহলে এমন নিশ্চিন্তে বসে বসে সিগারেট টানতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে তাহলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠবে। হাত থেকে সিগারেট মাটিতে পড়ে যাবে। কিন্তু থাক, কি দরকার বলে। আহা, বেচারা, কত শখ করে বিয়ে করতে এসেছে। ওর এক রাত্রের বাদশাগিরি ভেঙে দিয়ে লাভ কি?

এই ঘরে বাসরশয্যা পাতায় ভালোই হয়েছে। কারণ এই শয্যায় তার শেষ শয্যা। আর এ ঘর বিজুর ঘর। আজ রাত্রে বিজু এ ঘরে নেই কিন্তু ওর স্মৃতিতে ঘর ভরে আছে, মন ভরে আছে প্রীতির। দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে ওর ফটো। আলনায় ওর জামা কাপড়। এক কোণে বইয়ের র‍্যাক। কাল ভোরে এরা সবাই থাকবে। শুধু তারা দুজনই থাকবে না! একসঙ্গে দুজনে মুছে যাবে। কোথায় যাবে কে জানে। কিন্তু যেখানেই যাক্ একসঙ্গে তো যেতে পাবে। ব্লাউজের ভিতরে বুকের কাছে ছোট একটি শিশির অস্তিত্ব অনুভব করল প্রীতি। যে বুক এখনো ধুক ধুক করছে, ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে, খানিক বাদেই তার শেষ হবে, সব যন্ত্রণার অবসান হবে একটু পরে। বিজুর কাছে শুনেছে এ জিনিসের গুণ। এই হাইড্র-সাইনিক এসিডে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি ঘটবে! পাশের লোকটি কিছু জানতেও পারবে না, অস্ফুট কোন আর্তনাদের শব্দ বেরোবে না। সেদিক থেকে কোন ভয় নেই। এখন লোকটি ঘুমিয়ে পড়লেই হয়।

কিন্তু রণজিতের ঘুমোবার কোন লক্ষণ নেই। স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করার জন্যে যেন ও উৎসুক হয়ে রয়েছে। বার বার নড়েচড়ে প্রীতির মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে। এবার শুধু অঙ্গভঙ্গি নয় কথাও বলল রণজিত, 'তোমার শরীর কি খুব খারাপ লাগছে?'

প্রীতি মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'হুঁ?'

রণজিত সহানুভূতির স্বরে বলল, 'শরীরেরই বা দোষ কি। বিয়ের নামে আচার নিয়মের যা অত্যাচার সহ্য করতে হয় কদিন ধরে। কিন্তু তুমি কি সত্যিই উপোস করে আছ নাকি? মুখ দেখে মনে হচ্ছে খুব খিদে পেয়েছে তোমার।'

প্রীতির এবার হাসি পেল, 'তাই নাকি?'

রণজিত বলল, 'তাছাড়া কি, যেভাবে ছটফট করছ খিদে ছাড়া কেউ তা করে না।'

রণজিত বলল, 'তা এক কাজ কর। তোমাদেরই তো বাড়ি-ঘর—কোথায় কি আছে না আছে নিশ্চয়ই জানো। বোনদের ডেকে যদি ব্যবস্থা করতে পার তো ভালোই, না হলে তো আপন হাত জগন্নাথ আছেই।'

রণজিতের কথার ভঙ্গিতে প্রীতি এবারও একটু হাসল, কিন্তু কোন জবাব দিল না।

রণজিত বলল, 'লজ্জা করে লাভ নেই। উঠে চলে যাও। এ ঘরে তো খাবার মত কিছু দেখছি নে। এক আমার পকেটে সিগারেট ছাড়া। কিন্তু তা কি তোমার রুচবে! অভ্যেস আছে?

প্রীতি হাসি চেপে বলল, 'না। তোমার ব্যস্ত হতে হবে না, আমার ক্ষিদে পায় নি।'

রণজিত বলল, 'তবে কি পেয়েছে?'

প্রীতি বলল, 'ঘুম—ভয়ঙ্কর ঘুম পেয়েছে।'

রণজিত বলল, 'একেবারে ভয়ঙ্কর ঘুম, বল কি?'

প্রীতির কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

রণজিতের মনে হল হয়ত মেয়েটি একটু বেশি লাজুক। একটু বেশি রকম আড়ষ্টতা আছে। সাহেবী ভদ্রতা করে যত বেশি এই আড়ষ্টতাকে প্রশ্রয় দেবে রণজিত তত ঠকবে, বন্ধুদের সুপরামর্শ তার মনে পড়ল। বরং এ ব্যাপারে একটু গ্রাম্য হওয়া ভাল। যেমন করেই হোক মেয়েটির অনিচ্ছা আর অসহযোগিতা তাকে ভাঙতেই হবে। পুরোহিতের ছাড়পত্র যখন হাতে আছে তখন আর ভাবনা কি।

রণজিত বলল, 'কিন্তু যত ভয়ঙ্কর ঘুমই হোক আজ রাত্রে একা তুমি ঘুমুতে পারবে না। আজকের নিয়ম তা নয়।'

প্রীতি বলল, 'আজকের নিয়মটা তাহলে কি?'

রণজিত বলল, 'দুজনে একসঙ্গে ঘুমুতে হয় আজ।'

একসঙ্গে ঘুমুতে হয়। একসঙ্গেই তো ঘুমুবে প্রীতি! চিরদিনের জন্যে ঘুমুবে সে ঘুম রণজিতের সঙ্গে। কিন্তু লোকটি যদি না ঘুমোয় তাহলে তো সেই মহাঘুমের ব্যবস্থা করা যাবে না। এদিকে রাত যে ক্রমেই বেশি হচ্ছে। রাত যে ভোরের দিকে চলেছে। প্রীতি বলল, 'বেশ তো, তুমি ঘুমোও না।'

রণজিত বলল, 'ঘুমটা তো মুখের কথায় আসে না, আসে চোখে! তার জন্যে সাধ্য-সাধনার দরকার হয়। চুলের মধ্যে কেউ একটু হাত বুলিয়ে দিলে আমি খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি। দাও না একটু।'

হঠাৎ এগিয়ে এসে রণজিত ওর হাত ধরল, 'তুমি অমন করছ কেন বল তো? এমন কেউ করে না। তোমার মনে কি কোন অশান্তি আছে? তোমার কি হয়েছে আমাকে

সত্যি করে বল।'

এই সুযোগ। এই মুহূর্তে প্রীতি বলতে পারে। বলতে পারে, আমাকে মুক্তি দাও। কিন্তু বলে কি কিছু লাভ হবে? তা ছাড়া কেন মিছামিছি অন্যের কাছে সে মুক্তিভিক্ষা করতে যাবে নিজের উপায় তো ওর নিজের কাছেই আছে। কিন্তু লোকটিকে আগে ঘুম পাড়ানো দরকার। নইলে সব ভেস্তে যাবে।

মন স্থির করে ফেলে প্রীতি। ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো নিবিয়ে দিল। এক কোণে ক্ষীণশিখায় নিবু নিবু ভাবে জ্বলতে লাগল পিতলের পিলসুজে মঙ্গলদীপ।

প্রীতি এগিয়ে এসে রণজিতের মাথার কাছে বসল, তারপর তার ঘন কালো চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ঘুমোও।'

রণজিত প্রথমে ওর হাতখানা নিজের মুঠির ভিতরে চেপে ধরল, তারপর জোর করে ওকে বুকের কাছে টেনে নিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ঘুমিয়ে পড়ল রণজিত। নানাভাবে প্রীতি পরীক্ষা করে দেখল, হ্যাঁ সত্যিই ঘুমিয়েছে। এবার তার নিজের ঘুমের ব্যবস্থা করতে হবে।

বুকের ভিতর থেকে সেই ছোট শিশিটা বের করল প্রীতি। এই একটু আগে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষ তাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরেছে, চুমু খেয়েছে জোর করে। লোকটি নির্লজ্জ বর্বর কিন্তু ভারি দুঃসাহসী। কোন দ্বিধা সংকোচের ধার ধারে না। প্রীতিকে মুখ বুজে সব মানতে হয়েছে। প্রীতি ইচ্ছা করে ওর সব অত্যাচার সহ্য করেছে শুধু পথের বাধা দূর করবে বলে, শুধু ওকে তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়াবে বলে। কিন্তু আশ্চর্য সাহস লোকটির, আশ্চর্য শক্তি। বিজুর যদি এরকম সাহস থাকত। তাহলে প্রীতিকে অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হত না। ভারি সুন্দর পৃথিবী, মধুর পৃথিবী। এখান থেকে কি সহজে কারো যেতে ইচ্ছা করে! কিন্তু ইচ্ছা না করলেও উপায় নেই। যেতেই হবে প্রীতিকে। শুধু যাওয়ার আগে আর একবার পৃথিবীকে প্রীতি দেখে নেবে। প্রীতি আস্তে আস্তে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। যতদূর চোখ যায় অন্ধকারে বাড়িগুলি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে ছড়ানো আকাশ। তাতে চাঁদ নেই, অসংখ্য তারা জ্বল জ্বল করছে। কি সুন্দর তারা। কি সুন্দর আকাশ। প্রীতি কোনদিন এ আকাশ আর দেখবে না। আচ্ছা, বিজু এখন কি করছে। সেও কি এমন দ্বিধা করছে, এমন করে সংশয়ে দুলছে। তারও কি কষ্ট হচ্ছে পৃথিবী ছেড়ে যেতে। নিশ্চয়ই তাই। বিজু যা দুর্বল, বিজু যা ভীরু তাতে কিছুতেই সে খেতে পারবে না, খেতে নিশ্চয়ই সে ভয় পাবে। ভয় যদি হয়, তাহলে তোমার খেয়ে আর কাজ নেই, তোমার মরে কাজ নেই বিজু। তুমিও তাহলে মরো না আমিও মরব না। কেন মরব, কোন্ দুঃখে মরব, কোন্ লজ্জায় মরব। বিয়ে

হয়েছে তো তাতে কি এসে গেল। আমরা কোথাও পালিয়ে যাব। এ বিয়ে আমরা স্বীকার করব না। আমরা নতুন করে বিয়ে করব, নতুন সংসার পাতব। তবু মরব না, মরব না।

প্রীতি ফিরে এল নিজের বিছানায়। শিশিটিকে রাখল বালিশের তলায়। নিশ্চয়ই খেতে পারে নি, বিজুও নিশ্চয়ই মন স্থির করতে পারে নি। তার আর বিজুর মন তো একই স্বরে বাঁধা। একই ভাব আর ভালোবাসায় ভরা। প্রীতি যা করছে, বিজুও নিশ্চয়ই তাই করছে। বিজু নিশ্চয়ই মরতে পারবে না, মরবে না। আর সে যদি না মরে প্রীতিই একা একা মরবে কেন। বোকার মত মরবে কেন। বেঁচে থাকায় যখন এত আনন্দ, এত সম্ভাবনা, এত যখন স্বাদবৈচিত্র্য জীবনের, তাহলে কেন সে মরবে, কেন তারা মরবে।

বালিশে হাতের তালুতে মাথা রেখে প্রীতি ভাবতে লাগল মরা ছাড়া নিশ্চয়ই উপায় আছে। সেই উপায়ের সন্ধান করতে হবে। ভোরে উঠেই সেই উপায়ের সন্ধান দিতে হবে বিজুকে। মত পরিবর্তন করতে পেরে হঠাৎ ভারি তৃপ্তিবোধ করল প্রীতি। সদ্য মৃত্যুর মুখ থেকে প্রীতি যেন ফিরে এসেছে। নতুন জন্ম, নতুন জীবন লাভ করেছে যেন প্রীতি। নিজেকে সে ধন্যবাদ দিল একটুর জন্যে সে সর্বনাশ করে বসে নি। রাত আর একটু কাটুক। ভোর ভোর সময় সে চলে যাবে বিজুর কাছে। গিয়ে বলবে, 'অনেক বোকামি হয়েছে, আর নয়। চল পালাই। তারপর যা হয় হবে, যে যা বলে বলবে। আমরা না খেয়ে মরব সেও ভাল, বিষ খেয়ে মরব না।'

রণজিতের হাতঘড়ির মৃদু শব্দ কানে আসছে। প্রীতি নিমেষ গুনতে লাগল কতক্ষণে রাত ভোর হবে।

দুর্বোধ্য একটা গোলমালের শব্দে প্রীতির ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে তখন রোদ এসে পড়েছে। বাড়ির সমস্ত লোকজন যেন ক্ষেপে গিয়ে হঠাৎ হৈ চৈ ছুটোছুটি আরম্ভ করেছে। ব্যাপার কি। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানায় উঠে বসল প্রীতি, নিজের মনেই বলল, 'হল কি।'

প্রথমে বৈদ্যনাথেরই চোখ পড়ল।

ভোরে উঠে ছাদের আলসের ওপর সারি সারি সাজানো ফুলের টবগুলিতে জল দিতে গিয়েছিলেন বৈদ্যনাথ। হঠাৎ চোখে পড়ল গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কের পিছনে কে যেন শুয়ে আছে। আরও দুপা এগিয়ে গেলেন তিনি। বিজুকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'হুঁ, যা ভেবেছিলাম তাই। তুমি ছাড়া এমন চমৎকার জায়গায় আর কে এসে শোবে। ওঠ, এই বিজু ওঠ।' আর একটু গলা চড়ালেন বৈদ্যনাথ। কিন্তু খালি একটা মাদুরের ওপর বিজু পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে তো আছেই। 'এত করে ডাকছি, তোর কি কানেই যাচ্ছে

না! কি আশ্চর্য, মরণ ঘুমে পেয়েছে নাকি তোকে?' অসহিষ্ণু বৈদ্যনাথ এবার ছেলের হাত ধরে টান দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, অবাধ্য ছেলে তবুও উঠে এল না, তবুও সাড়া দিল না। বৈদ্যনাথ ওকে একথা ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিতেই ও থপাস করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যনাথের সর্বাঙ্গ যেন ঘেমে উঠল। হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন থেকে গেল যেন। মুখ থেকে অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরোল, 'ওরে বিজু বুঝি সর্বনাশ করেছে রে। তোরা এদিকে আয়।'

মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাড়ির সমস্ত লোক এসে ছাদে জড়ো হল! চিৎকার চেঁচামেচিতে বাড়ি ভরে গেল।

ভুবনময়ী সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে পারলেন না। নিচে থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'ওরে কি হয়েছে তোরা আমাকে বল। আমাকে বল। আমাকে নিয়ে চল ওপরে।'

কিন্তু কেউ তাঁকে হাত ধরে ওপরে নিয়ে গেল না, কেউ তাঁকে স্পষ্ট করে কোন কথা বললও না।

তবু ব্যাপারটা মোটেই অস্পষ্ট রইল না। অরুণই গিয়ে পাড়ার ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, 'শেষ রাত্রে মৃত্যু হয়েছে।'

বিজুর গায়ে সেই ছিটের হাফ সার্ট। ঝুল পকেটে ছোট একটি শূন্য শিশি। আর বুক পকেটে এক টুকরো কাগজ। তাতে স্পষ্ট সুন্দর অক্ষরে লেখা 'আমার মৃত্যুর জন্য আমার দুর্বলতাই দায়ী।'

খানিক বাদে পুলিস এসে চিঠি আর শিশি দুই-ই দখল করল।

গোলমাল গণ্ডগোলের মধ্যে প্রীতি এসে একবার দাঁড়াল ছাদের কাছে। বাড়ির আর সব মেয়েদের মত বিজুর মৃতদেহ দেখে সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল না ওর শবদেহের ওপরে। শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। যেন শ্বেতপাথরের একখানি প্রতিমূর্তি। পরমুহূর্তেই প্রীতি তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। ঘরে গিয়ে বালিশের তলায় পাগলের মত কি যেন খুঁজতে লাগল প্রীতি। রণজিত যে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল তা সে লক্ষ্যই করে নি। ঘরে যে আর কেউ আছে তা সে প্রথম টের পেল রণজিতের কথা শুনে। সিগারেটের টুকরোটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রণজিত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'শিশিটা ওখানে নেই। আমি নর্দমায় ফেলে দিয়েছি।'

প্রীতি অস্ফুট স্বরে বলল, 'তুমি ফেলে দিয়েছ! কেন ফেললে?'

রণজিত ওর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'তাই তো ভাবছি, কেন ফেললাম।'

তারপর আর একটা সিগারেট ধরাল।

বাড়ি ভরে কান্নার রোল উঠেছে। সকলের কান্না ছাপিয়ে যাচ্ছে কনকলতার বিলাপ, 'সর্বনাশী রাক্ষুসী আমার ছেলেকে খেয়ে এখন সেজেগুজে শ্বশুরবাড়ি চলল। ভগবান তুমিই এর বিচার করো ভগবান'—কনকলতার বউদি এসে কাছে বসলেন, বললেন, 'ছি ছি ছি, চুপ কর ঠাকুরছি চুপ করো।' কিন্তু কনকলতা চুপ করলেন না, চুপ করতে পারলেন না।

নমো নমো করে বাসি বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ করা হল। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যে দু-একজন ছিলেন তাদের তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিলেদ বিপিনবাবু, নিজে জল স্পর্শ করলেন না। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমাদের যাত্রার আয়োজন করে দিন অবনীবাবু। আর বেশি বিলম্ব করা তো সঙ্গত হবে না।'

অবনীমোহন বললেন, 'না, আর বিলম্ব কি।'

একদিকে বিজুর শবযাত্রার আয়োজন চলতে লাগল। আর একদিকে প্রীতির শ্বশুরবাড়ি যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন করতে লাগলেন আত্মীয় কুটুম্বিনীরা।

থানার সঙ্গে জানাশোনা ছিল অবনী-বৈদ্যনাথের। ইনস্পেক্টরকে কিছু দক্ষিণান্ত করবার পর বিশেষ কিছু গোলমাল হল না। তা ছাড়া বিজুর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি তো রয়েইছে।

বিজুর শবদেহ নিয়ে শ্মশানযাত্রীরা আগে বেরিয়ে গেল। তার খানিক বাদে পুত্র, পুত্র-বধূকে নিয়ে বিপিনবাবু মোটরে উঠে বসলেন।

বাসন্তী চোখ মুছতে মুছতে রণজিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওর ভালোমন্দ ভবিষ্যতের সব ভার তোমার ওপর রইল বাবা, তুমি ওকে দেখো।'

রণজিত কোন কথা বলল না, শুধু মাথা নাড়ল। প্রীতির দেহে যেন প্রাণ নেই। ওর স্বাধীন কোন ইচ্ছা নেই। একটা নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো অন্য পাঁচজনের নির্দেশে ও চলাফেরা করছে। তাদের নির্দেশেই জমকালো শাড়ি গয়নায় সেজে সিঁথিতে সিন্দুর মেখে প্রীতি গাড়িতে উঠে বসল। একটু দূরে পাশাপাশি গম্ভীর মুখে বসে রয়েছে রণজিত আর তার বাবা। দুজনের মুখই গম্ভীর। দুজনের দেহই যেন পাথরে তৈরী। এরা কে? প্রীতি কি এদের চেনে? এদের কারো সঙ্গে কি তার কোন পরিচয় আছে? কিংবা কোনদিন কোন পরিচয় হবে?

ভাড়াটে ট্যাক্সি একটা অজানা অপরিচিত শহরের ভিতর দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে বেঁকে বেঁকে কোথায় চলেছে কে জানে। ড্রাইভারটাকে মনে হচ্ছে জহ্লাদের মত। শুধু একটি জহ্লাদ নয়, আরো দু-দুজন জহ্লাদ তার পাশে বসে রয়েছে। সবাই মিলে তাকে কি বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছে? নিক, তাই নিক। সে নিজে তো মরতে পারল'না, অন্য সবাই

তাকে মেরে ফেলুক। কিন্তু তা কি কেউ মারবে? তাকে কি মরতে দেবে? সারা জীবন ধরে সে তিলে তিলে দগ্ধ হবে তবু মরবে না, সবাই তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করবে তবু মারবে না। বিজুর মত সেও শ্মশানে চলেছে, বিজুর চিতা নিববে, কিন্তু তার চিতা জীবনে নিববে না। বিজু মরে বাঁচল আর সে সারা জীবন বেঁচে মরে থাকবে। বিজুর জন্যে শোক নয়, শোকের ক্ষমতা এই মুহূর্তে তার লোপ পেয়েছে। নিজের পরিণাম আর ভবিষ্যৎ ভেবেই আতঙ্কিত হয়ে উঠল প্রীতি। এ কোথায় চলেছে সে? কাদের কাছে, কাদের সংসারে চলেছে? তারা তার সব কলঙ্ক সব অপবাদের কথাই এতক্ষণে টের পেয়েছে। তাদের চোখে প্রীতির কোন দাম নেই, তাদের মনে প্রীতির জন্যে কোন ক্ষমা, কি সহানুভূতি নেই নিশ্চয়ই। তাহলে প্রীতি এদের সঙ্গে কোথায় চলেছে?

নিমতলা ঘাট থেকে বিজুর শেষ-কৃত্যের জন্য পুরুষেরা সবাই বেরিয়ে গেছেন। অরুণই শুধু শ্মশানে যায় নি। বাড়ি আগলাবার ভার তার ওপর। শোকার্ত মেয়েদের সান্ত্বনা দেওয়ার দায়িত্ব সবাই তার উপর দিয়ে গিয়েছিলেন। সে দায়িত্ব পালন করবার কিছুমাত্র চেষ্টা বৃথা। কোন মোহমুদ্গর আবৃত্তি করে মা, মাসীমা, দিদিমার এই সদ্যশোকের উপশম ঘটানো যাবে না। সময় ছাড়া এর আর কোন সান্ত্বনা নেই, বিস্মরণের আর কিছুমাত্র পথ নেই। সময়ই সব সারাবে, সব ভুলাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই অশ্রান্ত কান্না অনন্তকাল ধরে চলবে, এই অবিরল শোকাশ্রু কোনদিন শুকাবে না। অরুণের একবার ইচ্ছা হল বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও চলে যায়। মামীমার বিলাপ তার কাছে অসহ্য লাগছে। আর এ তো সহজ মৃত্যুর সহজ শোক প্রকাশ নয়। প্রত্যেকটি খেদোক্তির সঙ্গে বাসন্তী আর প্রীতিকে কুৎসিতভাবে জড়িয়ে দিচ্ছেন কনকলতা। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে অভিশাপ দিচ্ছেন। শান্ত নিরীহ বিজু বড় বীভৎসভাবে মরেছে, আর তার চেয়েও বীভৎসতর অবস্থায় রেখে গেছে সবাইকে। এভাবে মরল কেন বিজু? তার লেখা স্বীকৃতিটুকু অরুণের আর একবার মনে পড়ল। 'আমার মৃত্যুর জন্যে আমার দুর্বলতাই দায়ী।' এ দুর্বলতা কিসের? এ কি ওর মন স্থির করতে না পারার দৌর্বল্য, না কোন মেয়েকে ভালবাসাই শেষ পর্যন্ত দুর্বলতা বলে চিনে গেছে, স্বীকার করে গেছে বিজু? প্রেম কি তাহলে শুধু শক্তিমানের জন্যে? দুর্বল পুরুষকে কি তা শুধু দুর্বলতর করে? অস্তিত্ব পর্যন্ত মুছে নিয়ে তার শোধ নেয়? প্রেম সম্বন্ধে এই শিক্ষাই কি দিয়ে গেল বিজু? তার শেষ শিক্ষা?

আশ্চর্য! বিজু নামে একটি ছেলে এই বাড়িতে ছিল, তা কদাচিৎ অরুণের চোখে পড়েছে, তার অস্তিত্ব কদাচিৎ অরুণের অনুভূতিকে ছুঁয়ে গেছে। একটি লাজুক মুখচোরা ভাল ছেলে ঘরের কোণে আত্মগোপন করে থাকত, আর ইদানিং প্রীতির সঙ্গে

কথা বলত। এ ছাড়া অরুণের কাছে বিজুর অন্য কোন সত্তা ছিল না। এর চেয়ে তার কাছে বেশি অস্তিত্ববান ছিল না বিজু। শুধু অরুণের কাছেই বিজু ছিল ক্ষীণ অস্তিত্বের লোক। কিন্তু আজ মৃত্যুর আঘাতে সবাইকে চকিত করে দিয়েছে বিজু। বাড়ি ভরে পাড়া ভরে সকলের মুখেই আজ তার কথা। কেউ আর তাকে ভুলতে পারছে না। তার সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারছে না। সকলেই তার সম্বন্ধে উৎসুক আর কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। মরে গিয়ে হঠাৎ যেন অতিমাত্রায় বেঁচে উঠেছে। এতদিন বেঁচে থেকেই সে যেন মরে ছিল আর আজ মরে গিয়ে বেঁচেছে।

বিকেলের দিকে অরুণ নিচে নামল। বাড়িটা এতক্ষণে খানিকটা শান্ত হয়েছে। থেমে গেছে চীৎকার চেঁচামেচি। কনকলতা তাঁর নিজের ঘরে মেঝের ওপর মূর্ছিতার মত পড়ে আছেন। ছোট ছেলেমেয়েগুলি ঠিক যেন এক একটি মোমের পুতুলের মত। তাদের মুখে কথা নেই হাসি নেই কান্না নেই। অঙ্গভঙ্গিতে স্বাভাবিক চাঞ্চল্য নেই। মারাত্মক কিছু একটা যে ঘটেছে তা তারা সবাই বুঝতে পেরেছে, কিন্তু কী ঘটেছে সে সম্বন্ধে তাদের পরিষ্কার কোন ধারণা এখনো হয় নি। নীরজা আর তার বৌদি কোন রকমে ডাল ভাত নামিয়ে সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। বিবাহবাসরে যে সব আত্মীয় কুটুম্বেরা এসেছিলেন এই শ্মশানপুরী থেকে তাঁরা প্রায় সবাই আস্তে আস্তে সরে পড়েছেন। যাঁরা আছেন, তাঁদের অস্তিত্বও টের পাওয়ার জো নেই। বাড়িটা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যেন এক ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে।

দিদিমার ঘরের সামনে এসে একটু থেমে দাঁড়াল অরুণ। আশ্চর্য, রাধাকৃষ্ণের আসনের সামনে বসে গীতা পড়ছেন ভুবনময়ী। জলচৌকির ওপর রাধাকৃষ্ণের একখানা বাঁধানো পট। তার সামনে একখানা সুলভ সংস্করণের পকেট গীতা। সচন্দন তুলসী পড়ে তার ওপরের মলাটটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। সেই গীতাখানা আজ আবার তুলে নিয়েছেন ভুবনময়ী। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রথম কিছুদিন নিয়মিত পড়তেন। শেষের দিকে পাঠ আর হত না, গীতার উপর তুলসী দিয়ে কর্তব্য শেষ করতেন, আজ ফের পাঠে মন দিয়েছেন।

খানিকক্ষণ আগেই ভুবনময়ীর সবিলাপ উচ্চ কান্নার শব্দে সারা বাড়ী মুখর হয়ে উঠেছিল। দু-একজন আত্মীয়া আর প্রতিবেশিনী তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে ফিরে গেছেন। এখন নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছেন ভুবনময়ী। অরুণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। অল্প শিক্ষিতা অশুদ্ধ উচ্চারণে গীতা আবৃত্তি করে যাচ্ছেন :

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

কিন্তু জীর্ণ বাস তো ভুবনময়ীর নিজের। বিজুর দেহবাস তো জীর্ণ হয় নি, জীর্ণ ছিল না। তবু কেন সে তা ত্যাগ করে গেল? না কি ভিতরে ভিতরে নিজের জীর্ণতার কথা টের পেয়েছিল বিজু? জীর্ণ মন জীর্ণ দেহ তার অস্তিত্বকে অসহনীয় করে তুলেছিল? অরুণ আত্মাকেও বিশ্বাস করে না, আত্মার নবদেহ ধারণেও নয়। তবু গীতার এই কয়েকটি শ্লোক তার বেশ ভালো লাগে। শ্লোক কয়েকটি বেশ শ্রুতি-মধুর। ভারি কবিত্বপূর্ণ। কোন ধর্মে তার বিশ্বাস নেই, কিন্তু কাব্যধর্মে প্রীতি আছে।

শ্মশান থেকে বৈদ্যনাথরা ফিরলেন সন্ধ্যার পরে। সকলেরই ভিজে কাপড়, ভিজে গামছা। ভুবনময়ী এগিয়ে এসে ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'দাঁড়া, আগে ঘরে ঢুকিস নে। লোহা আর আগুন ছুঁয়ে নে। অবনী, অতুল সবাই একবার করে লোহা আর আগুন ছোঁও তোমরা।'

যে গেছে সে তো গেছেই। যারা আছে তাদের মঙ্গল বিধানের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভুবনময়ী।

একটু বাদে বৈদ্যনাথ শুকনো কাপড় পরে ঘরে ঢুকলেন, তারপর শোকার্তস্বরে ডাকলেন, 'মা'। এতক্ষণ সম্পূর্ণ অবিচল ছিলেন বৈদ্যনাথ। ভাগ্নীর বিয়ের অনুষ্ঠানের মত ছেলের শ্মশানকৃত্যেও নিজেই নেতৃত্ব নিয়েছেন। কারো কোন ভুল, ত্রুটি, শৈথিল্য ঘটলে তাকে তিরস্কার করেছেন। সবাই তাঁর দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হয়ে গেছেন। বৈদ্যনাথের চোখে জল আসে নি, গলার স্বর কিছুমাত্র বিকৃত হয় নি। কিন্তু মায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ তাঁর সব বাঁধ ভেঙে গেল। কোন লজ্জা নেই আর, সঙ্কোচ নেই, সশব্দে কেঁদে উঠলেন বৈদ্যনাথ, 'মা আমি যে আর থাকতে পারছি নে।' মেঝের ওপর বসে আর্তস্বরে ছেলেকে কাছে ডাকলেন ভুবনময়ী। এতক্ষণ নিজে কেঁদেছেন এবার ছেলের কান্না থামাতে হবে। মায়ের কোলের মধ্যে শিশুর মত মুখ গুঁজে প্রৌঢ় বৈদ্যনাথ ডুকরে কেঁদে উঠলেন, আমি যে আর থাকতে পারছি নে মা। কিছুতেই পারছিনে। আমার বুক যে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।'

ভুবনময়ী ছেলের পিঠে আলগোছে হাত বুলাতে লাগলেন, 'অমন করিস নে বাবা, অমন করিসনে।'

কত কাল, কত যুগ পরে নিজের ছেলের স্পর্শ যেন পেলেন ভুবনময়ী। তাঁর দুর্বিনীতি রূঢ়ভাষী কঠোর-স্বভাব ছেলে অসহায় শিশুর মত ফের তাঁর কোলে ফিরে এসেছে। বৈদ্যনাথের চুলে কিছু কিছু পাক ধরেছে। আর ভুবনময়ীর প্রায় সব চুল পেকে গেছে। ছেলের কাঁচা পাকা চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে ভুবনময়ী ফের মৃদুস্বরে বললেন, 'অমন'করিস নে।'

বৈদ্যনাথ কান্না মিশানো স্বরে বললেন, 'আমি তো ভেবেছিলাম মা, আমি অমন করব না। আমি তার জন্যে শোক করব না। সে আমার কুপুত্র। দুশ্চরিত্র, কাপুরুষ সে। সে আমার শোকের যোগ্য নয় মা। সে পৃথিবীর কারোরই শোকের যোগ্য নয়, তবু কেন আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে, তবু কেন আমি স্থির থাকতে পারছিনে। মনে হচ্ছে আমার সব শূন্য হয়ে গেছে, আমার সব শূন্য করে দিয়ে সে চলে গেছে।'

ভুবনময়ী আস্তে আস্তে বললেন, 'আবার সব ভরে উঠবে, তোর আবার সব ভরে উঠবে বাবা। তুই অমন করিসনে। তোর কোন দুঃখ থাকবে না। মনে আছে ছেলেবেলায় মেলা থেকে বড় একটা মাটির ঘোড়া তোকে কিনে দিয়েছিলাম। অসাবধানে হাত থেকে কি করে যেন সেটা ভেঙে গেল। মনে আছে তোর? সারাদিন তুই সেই ভাঙা ঘোড়া নিয়ে কাঁদলি। আছড়ে আছড়ে ভাঙলি আরও কত খেলনা, আরও কত কাজের জিনিস। সে দিনও ঠিক এই রকমই আমার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে তুই ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলি। কিন্তু সেই কান্না কি তোর মনে আছে? সেই মাটির ঘোড়ার দুঃখ কি তোর মনে আছে? এ মাটির ঘোড়ার দুঃখও একদিন যাবে। তুই মনকে শক্ত কর বাবা, বুককে শক্ত কর।'

দুই দিন বাদে কনকলতা শোকশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। স্বামীকে বললেন, 'আমি এ বাড়িতে একদণ্ডও আর থাকব না, অন্য বাড়ি দেখ। কুঁড়ে হোক, বস্তী হোক যেখানে নিয়ে যাও সেখানে যাব। কিন্তু এ বাড়িতে আর এক মুহূর্ত নয়।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'কেন, আমরা কেন যাব। আমি কোন অন্যায় করি নি। যারা করেছে তারা যাক। তারা এ বাড়ি ছেড়ে পালাক। আমি এক পাও এখান থেকে নড়ব না। আমি শোধ নেব তবে ছাড়ব।'

কনকলতা কাতর স্বরে বললেন, 'কি শোধ নেবে তুমি! কেবল আমার ওপর নিতে পারছ, আর কারো ওপর পারবে না।'

তারপর চোখের জল ছেড়ে দিলেন কনকলতা, 'ওগো তোমার শরীরে কি একটুও দয়ামায়া নেই? তুমি কি আমার মনের দিকে কোনদিনও তাকাবে না? চিরজীবন নিজের জেদ আর গোঁয়াতুর্মি নিয়েই থাকবে? এই খালি ঘরে, খালি বাড়িতে আমি যে আর এক মুহূর্তও থাকতে পারছি নে। আমার যে দম আটকে আসছে, বুক ভেঙে যাচ্ছে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে নিয়ে চল, আর কোথাও নিয়ে চল। আমি যে আর টিকতে পারছি নে।'

বলতে বলতে স্বামীর পায়ের কাছে সত্যিই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি! বৈদ্যনাথ স্ত্রীর হাত ধরে টেনে তুললেন। তার শোকশীর্ণ মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে কোমল স্বরে বললেন, 'আচ্ছা আমরা অন্য বাড়িতেই যাব।'

সপ্তাহখানেক পরে নতুন বাসা ঠিক হল কনকলতাদের। কেবল বাড়িই ছাড়লেন না বৈগুনাথ, পাড়াও ছাড়লেন। কালীঘাটে হরিশ চাটার্জি স্ট্রীটে দুখানা ঘর পাওয়া গেল। একতলা পুরনো বাড়ি। তার পিছনের দিকের দুখানা ঘর। ভাড়া পঞ্চাশ টাকা।

অবনীমোহন একবার বললেন, 'ধীরে সুস্থে ভালো বাড়ি দেখে উঠে গেলেই হত। ঘর তো শুনছি ভালো নয়, এদিকে ভাড়াও বেশি।'

বৈগুনাথ শুধু বললেন, 'হুঁ।'

তিনি যা করবেন তা করবেনই। কেউ নেই তাকে বাধা দেয়।

ভুবনময়ী বললেন, 'অত দূরে বাসা ঠিক করলি বৈগু। কাছে পিঠে কোথাও পেলি নি?'

বৈগুনাথ বললেন, 'কাছে পিঠে থাকবার ফল তো হাতে হাতে পেলাম। বেশ তোমার মন যদি যেতে না চায় মা, তুমি থাকো তোমার মেয়ের কাছে; আমি তাতে আপত্তি করব না।'

ভুবনময়ী আর কোন কথা বললেন না।

দোরের সামনে লরী এসে দাঁড়াল। বৈগুনাথ নিজের হাতে টেনে টেনে মাল বোঝাই করলেন। ছোট ছেলেমেয়েদেরও কেউ কেউ উঠল সেই লরীতে। আর একখানা ট্যাক্সিতে নিজেরা যাবেন। উঠে বসবার জন্যে স্ত্রীকে বার বার তাড়া দিতে লাগলেন। বাসন্তী এগিয়ে এসে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলরেন, 'সর্বনাশ তোমার একারই হয় নি বউদি, আমারও হয়েছে। বিজুও তো আমারই বাপের বংশের ছেলে। তবু তোমরা এমন করে চলে যাচ্ছ। মনে আছে এক সঙ্গে এ বাড়িতে ঢুকেছিলাম—'

কনকলতা ক্ষমাহীন কঠিন স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, এক যাত্রায় যে এমন পৃথক ফল হবে তা আর ভাবি নি।'

সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ ফিরে এলেন কনকলতা। কি মনে করে অবনীমোহনের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ স্বরে বললেন, 'আমরা যাচ্ছি অবনীবাবু।'

অবনীমোহন তক্তপোশ থেকে নেমে এসে দোরের সামনে কনকলতার মুখোমুখি দাঁড়ালেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'না গেলেই কি চলত না? মনে আছে এর আগেও কত ভালো ভালো বাড়ি আমি পেয়েছি। তবু যাই নি তুমিই যেতে দাও নি। মনে আছে সে কথা?

সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল কনকলতার। সেই প্রথম যৌবনের অতীত যেন কথা বলে উঠল। রূপ ধরে এসে দাঁড়াল অবনীমোহনের মধ্যে। হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়ে তাঁরা তখন পরস্পরের অনেক কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। মনে মনে দুজনেই তা জানতেন, দুজনেই তা

স্বীকার করতেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু করার সাহস তাঁদের ছিল না। সেই ভীরুতা তাঁদের সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। ওরাও তাঁদের মতই ভীরু, তাঁদের চেয়েও ভীরু।

কনকলতার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল, অস্ফুট স্বরে বললেন, 'আছে। এতদিনে তার প্রায়শ্চিত্ত হল।'

কনকলতা তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে ট্যাক্সিতে স্বামীর পাশে উঠে বসলেন।

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

শুধু বৈদ্যনাথ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন, আর সবাই তো রয়েছে, তবু সারা বাড়িটাই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় বাসন্তীর। কনকলতাদের ঘরের দিকে যেন আর তাকানো যায় না। ঘরখানা তেমনি ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। কেউ ঢোকে নি। এমন কি কোন ছেলেমেয়েও খেলাচ্ছলে সে ঘরের ভিতরে যায় নি। আর যায় নি ছাদে। অথচ ছাদ ছেলেপুলেদের এত প্রিয় জায়গা ছিল। সারাদিন তাদের ছাদ থেকে নামানো যেত না। একখানা কাপড় মেলবার জন্যে পর্যন্ত সেই ছাদে ওদের কাউকে পাঠান যায় না। বিজুর অশরীরী প্রেতাত্মা যেন সেই ছাদ ভরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সারা বাড়ি ভরে নড়ে বেড়াচ্ছে। ছেলেমেয়েদের দোষ দেবেন কি, বাসন্তীর নিজেরই মনে হয় যেন বিজুর ছায়া তিনি দেখতে পান। দু হাতে চোখ রগড়ে ফেলেন বাসন্তী। এসব কথা ছেলেমেয়েদের কাউকে বলা যাবে না। ওরা এমনিতেই দিনরাত ভয়ে ভয়ে বেড়াচ্ছে। ওকথা শুনলে আর রক্ষে থাকবে না।

ছেলেমেয়েদের না বললেও স্বামীকে না বলে পারেন না বাসন্তী। বলেন, 'দাদারা গেছেন না বেঁচেছে। এই অলুক্ষুণে বাড়ি আমাদেরও ছেড়ে দিতে হবে বুঝেছ? আমার আর কিছুতেই এখানে মন টিকছে না।'

অবনীমোহন মনে মনে ভাবলেন মন কারই বা টিকছে। কিন্তু স্ত্রীকে কথাটা বললেন না। বরং খানিকটা আশ্বাসই দিলেন অবনীমোহন, 'ও কিছু না। দু-চার দিন বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বাসন্তী বললেন, 'দু-চার দিন! কি জানি আমার তো মনে হয় দু-চার বছর এমন কি সারা জীবনেও দাদা কি মা আমার আর কোন খোঁজ নেবেন না, কোন সম্পর্ক রাখবেন না আমার সঙ্গে। বিজুর কথা কি ওরা কেউ জীবনে ভুলতে পারবেন?'

অবনীমোহন বললেন, 'জীবনে অনেক কথাই ভুলতে হয়। তুমি ভেব না। সময়ে সবই ঠিক হয়ে যাবে।'

একটু বাদেই তিনি অন্য কথা পাড়লেন, বললেন, 'শুভরাত্তির-টাত্তির গেল, প্রীতির শ্বশুর আমাদের একটা খবর পর্যন্ত দিলেন না, দেখলে কাণ্ড ?

অবনীমোহন গম্ভীর মুখে বললেন, 'খবর না দেওয়াটাই তো স্বাভাবিক।'

বাসন্তী বললেন, 'স্বাভাবিক না ছাই। এই কি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার ? ভাগ্যে যে কি আছে ভগবানই জানেন। যাকগে। তারা ভদ্রতা না করলেও আমরা তো আর না করে পারব না। শত হলেও মেয়ে তো অমাদেরই। আমি বলি কি দশ বর্জনে মেয়ে-জামাইকে নিমন্ত্রণ করবার জন্যে তুমিই যাও। বুঝিয়ে-সুজিয়ে দু-কথা বলতেও পারবে।'

অবনীমোহন তাতে রাজী হলেন না। বললেন, 'দশ বর্জন-টর্জন দিয়ে আর কাজ নেই। দিন কয়েক চুপচাপ থাক। তাদেরও চুপ করে থাকতে দাও।'

বাসন্তী বললেন, 'ও মা কথা শোন। আমরা খোঁজখবর না নিলে তারা কি ভাববে জানো, আমাদের নিজেদেরই কোন দোষ আছে। তারা খোঁজ নিক আর না নিক মেয়ে যখন আমাদের তখন আমাদেরই এগিয়ে গিয়ে তত্ত্বতালাস করতে হবে। তাছাড়া যেমন করেই হোক বিয়ে যখন হয়ে গেছে, শাস্ত্রের বিধি মানতে হবে না ?'

অবনীমোহন বললেন, 'বেশ মানতে হয় মানো। কিন্তু আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না।'

মৃগাঙ্কও সেই কথাই বলল। তার যাওয়ার সময় নেই। তা ছাড়া এসব ছেলে ছোকরাদেরই কাজ। জামাই মেয়েকে নিমন্ত্রণ করার জন্যে অরুণ কি অতুলকে পাঠিয়ে দিলেই তো হয়। দেওরের আচরণে অনেক কড়া কড়া কথাই মনে এল বাসন্তীর। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। সময় খারাপ পড়েছে, এখন একটু ধৈর্য ধরে থাকাই ভাল।

চিলে কোঠার ঘরে গিয়ে এবার বড় ছেলের স্মরণ নিলেন বাসন্তী, 'নান্তু, তোকে একটা কাজ করতে হবে বাবা।'

মেঝেয় বসে সামনে আয়না নিয়ে অরুণ সেফটি রেজরে দাড়ি কামাচ্ছিল, বাসন্তীর কথা শুনে বলল, 'কি কাজ মা ?'

কাজের ধরনটা খুলে জানালেন বাসন্তী।

অরুণ বলল, 'আর যাই কর মা, ও সব নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের মধ্যে আমাকে যেতে বল না। ওগুলি আমি পারি নে।'

বাসন্তী রাগ করে বললেন, 'বাঃ রে, তুই পারবিনে, তোর বাবা কাকারা কেউ পারবে না, তবে কি এসব কাজও আমি নিজে গিয়ে করব ? তাছাড়া শত হলেও নিজেরই তো বোন। বিয়ের পর তোরা যদি কোন খোঁজ-খবর না নিস লোকে ভাববে কি। আর মেয়েটাই বা কি মনে করবে। ভাববে আমার সব থাকতেও কেউ নেই। হ্যাঁরে,

তোরা কি সবাই একেবারে দয়ামায়া রহিত হয়েছিস, একটু দুঃখ হয় না তার জন্যে ?'

অরুণ বলল, 'দুঃখ হবে না কেন মা, হয়। কিন্তু যা সব ঘটে গেল তারপর ওর মুখের দিকে কি করে যে তাকাব তাই আমি ভাবতে পারি নে। কটা দিন যেতে দাও মা, তারপর আমি একদিন যাব।'

বাসন্তীর মনে হল এসব বাজে কথা। আসলে তাঁর মেয়েকে কেউ ভালবাসে না, সবাই ঘৃণা করে। তার আপনজনেরাই সব পর হয়ে গেছে। কিন্তু নান্তু তো তার নিজেরই দাদা। বোনের দিক থেকে সেও কি মুখ ফিরিয়ে থাকবে ? দোষ-ঘাট করলেও কি নিজের বাপ-ভাইর কাছ থেকে সে ক্ষমা পাবে না ? এরাই যদি তাকে ক্ষমা করতে না পারে, তার স্বামী-শ্বশুর কি করে ক্ষমা করবে। মেয়েটার ভাগ্যে না জানি কি দুর্গতিই আছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন বাসন্তী। নীচে নেমে তিনি রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, অতুল পিছন থেকে ডেকে বলল, 'কই মা, চায়ের পাট-টাট একেবারে শেষ করে ফেলেছ নাকি, না এক-আধ কাপ আছে আমার জন্যে ?'

বাসন্তী মুখ ফিরিয়ে ছেলেটার দিকে তাকালেন, 'কথা শোন ! তোর জন্যে চা করে না রাখি বল তো। আয়, ভিতরে আয়।'

অতুল রান্নাঘরের ভিতরে এসে নিজেই একখানা পিঁড়ি পেতে বসল। বাসন্তী ওর সামনে রুটি আর চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন।

অতুল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'ওঁরা চলে যাওয়ায় বাড়িটা একেবারেই যেন খালি হয়ে গেল, না মা ? দিদিমার জন্যে তোমার মনটা খুব পোড়ে, না ?'

ছেলের কথার ভঙ্গিতে বাসন্তী একটু হাসলেন, 'পুড়লেই বা আর কি করব বল।'

অতুল আশ্বাস দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, যাক কটা দিন। আমি বুড়িকে গিয়ে ফের নিয়ে আসব। তোমার দাদারও সাধ্য নেই যে আমাকে বাধা দেয়। দিদিমা তো শুধু তাঁরই মা নয় আমার মারও মা।'

বাসন্তী বললেন, 'দাদার সম্বন্ধে আর তুই অমন যা-তা বলিস নে অতুল। তার কথা ভাবলে আমার দুঃখে বুক ভেঙে যায়। আহা, অমন যোগ্য ছেলে—'

অতুল উত্তেজিত হয়ে বলল, 'থাম মা থাম। শুধু পড়াশুনো শিখলেই যোগ্য ছেলে হয় না। আমার মতে, ও ছিল চূড়ান্ত রকমের অযোগ্য। মামার জন্যে আমার দুঃখ হয়, কিন্তু বিজুর কথা ভাবলে এখনো আমার সমস্ত শরীর রাগে জ্বলে যায়। নেহাত মরে গিয়ে সামনে থেকে সরে গেছে। নাহলে হাতের কাছে পেলে আচ্ছা করে ওর ঘাড় ধরে একবার ঝাঁকুনি দিতাম। আচ্ছা, মরে ওর লাভটা কি হল ! কেলেঙ্কারি যা হবার, তা তো হলই। তার চেয়ে আমার কাছে যদি বলত, অতুলদা কাণ্ড তো একটা বাধিয়ে

বসেছি, এবার কি ব্যবস্থা করবে কর। তাহলে আমি আর গোবিন্দ মিলে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করতে পারতাম। গোপনে গোপনে এমন কত বিয়ে আমরা দিয়েছি।'

বাসন্তী বললেন, 'চুপ চুপ। কি যা-তা তুই বলছিস অতুল। তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? বিজু তোর কাছে সব খুলে বললে তুই ওদের বিয়ে দিয়ে দিতিস! এরকম বিয়ে কি হয়?'

অতুল বলল, 'যখন-তখন হয় না। কিন্তু দরকার পড়লে হতে দিতে হয় মা। তোমার কি মনে হয় না, মরে গিয়ে কেলেঙ্কারি করার চেয়ে ওদের বিয়ে করে কেলেঙ্কারি করা অনেক ভাল ছিল।'

গোঁয়ার ছেলের এই স্পষ্টবাদিতায় বাসন্তী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বললে, 'তোর কথাবার্তা সবই সৃষ্টিছাড়া অতুল। যাক, যা হবার তা তো হয়ে গেল, এবার এক কাজ কর। প্রীতির একটা খোঁজ নিয়ে আয়।'

অতুল বলল, 'এত লোক থাকতে আমাকে যে কাজে ডাকছ, ব্যাপারটা কি। আমি তো জানতাম, আমি তোমাদের সব কাজের বাইরে।'

বাসন্তী এবার ছেলের কাছে দুঃখের কথা সব খুলে বললেন। এত লোক আর কই। প্রীতিকে আনবার জন্যে জনে জনে সবাইকেই তিনি সেধেছেন। কিন্তু কেউ একটু গা পর্যন্ত করে নি। আচ্ছা দোষ-ঘাট কি কারো হয় না? তাই বলে বাড়ির একটা লোকও মেয়েটার একটা তত্ত্ব নিতে যাবে না? এই-বা কোন ধারা বিচার?'

অতুল বলল, 'বেশ যদি বল আমি যেতে পারি।'

বাসন্তী খুশী হয়ে বললেন, 'যাবি? সত্যি বলছিস! তাহলে তো খুবই ভাল হয়।' তারপর একটু চিন্তা করে বললেন, 'কিন্তু তোমাকে কোনো জায়গায় পাঠাতে আমার ভয়ও করে বাপু।'

অতুল বলল, 'ভয়! কিসের ভয় মা?'

বিপিনবাবু সন্ধ্যার আগেই অফিস থেকে ফিরে এলেন। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে অতুলকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'আপনি—'

অতুল আত্মপরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি রণজিতবাবুদের নিতে এসেছি, মা বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন।'

বিপিনবাবু একটু হাসলেন, 'দিয়েছেন বুঝি? কিন্তু রণজিত তো যাওয়ার সময় করে উঠতে পারবে না।'

অতুল বলল, 'কেন, সময় না পাওয়ার কি আছে। আজ গিয়ে কালই তো চলে

আসতে পারেন।'

বিপিনবাবু বললেন, 'বেশ তো আপনি বলে দেখুন। ও এক্ষুণি এসে পড়বে।'

খানিকবাদে রণজিতও অফিস থেকে ফিরল। বিপিনবাবু অতুলের পরিচয় দিয়ে বললেন,'ছেলেটি তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে রণজিত। তুমি ওর সঙ্গে আলাপ করো।'

অতুল বলল, 'তাহলে আর বেশী দেরি করে লাভ কি রণজিতবাবু? আপনি তৈরি হয়ে নিন্। প্রীতিকেও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে বলুন।'

রণজিত অতুলের দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল, 'দেখুন বেশি কথাবার্তা বাড়িয়ে লাভ নেই, আমাদের কারো পক্ষেই যাওয়া সম্ভব হবে না। আমার মনে হয় আপনাদের নিজেদেরই তা বুঝতে পারা উচিত ছিল।'

অতুল বলল, 'কেন, যাওয়াটা অসম্ভব কিসে?'

রণজিত বলল, 'আপনারা সব জেনেও যদি না জানার ভান করেন, তাহলে আর উপায় কি। কিন্তু এ সব নোংরা ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবার সতিই আমার ইচ্ছে ছিল না।'

অতুল মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলল, 'সে ইচ্ছে আমারও নেই। কিন্তু যে দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তার কথা ভুলে যাওয়াই আমাদের সকলের পক্ষে ভাল। এখন যদি ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া যায়—'

রণজিত বলল, 'স্বাভাবিকভাবে নেওয়ার ইচ্ছা থাকলেই কি সব সময় নেওয়া সম্ভব হয়?'

অতুল বলল, 'আপনি ইচ্ছে করলেই তা সম্ভব করে তুলতে পারেন।'

রণজিত একটু হাসল, 'দেখুন আপনি বয়সে আমার চেয়ে ছোটই হবেন। ওসব উপদেশ দেওয়া যত সহজ, নিজে মানা তত সহজ নয়। কিন্তু আমরা মানতে—মানিয়ে নিতেই চেষ্টা করছি। দোহাই আপনাদের—এর মধ্যে আপনারা আর মাথা গলাতে আসবেন না। তাতে সকলের ক্ষতি।'

অতুল ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করতে লাগল। রণজিতের কথার কোন যোগ্য উত্তর দিতে না পেরে ও রূঢ় স্বরে বলল, 'বেশ প্রীতিকে ডেকে দিন। আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করে চলে যাই। না কি দেখা করার অনুমতিও দেবেন না আপনারা?'

রণজিত বলল, 'আপনি মিছামিছি রাগ করছেন। আসুন আমার সঙ্গে।'

অতুল রণজিতের পিছনে পিছনে তাদের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

অতুলদেরই দেওয়া যৌতুকপত্রে সে ঘর সাজানো। পূর্বদিকে দেওয়াল ঘেঁষে ডবল

বেডের খাটখানা পাতা হয়েছে। একধারে ড্রেসিং টেবিলে মেয়েদের প্রসাধনের টুকিটাকি সরঞ্জাম। তার সামনের চেয়ারখানা দেখিয়ে রণজিত বলল, 'আসুন।'

অতুল চেয়ারে বসে পড়ল। একজন দীর্ঘ বলিষ্ঠ পুরুষের ছায়া পডল আয়নায়। মনে মনে এক ধরনের আত্মপ্রসাদ বোধ করল অতুল।

খানিক বাদে প্রীতি এসে ঘরে ঢুকল। ওর সিঁথির সিঁদুর যত উজ্জ্বল, মুখখানা তত উজ্জ্বল নয়, অতুলের মনে হল যেন ও অনেকদিন রোগে ভুগে উঠেছে। সমস্ত চেহারায় কিসের এক ক্লান্তির ছাপ। দুই চোখে একটা দুর্বোধ্য ভয়ার্ততা। প্রীতি অতুলের দিকে চোখ তুলে তাকাল না। এইটু দূরে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

ওর অসহায় ভঙ্গি দেখে হঠাৎ বোনের ওপর ভারি মমত্ব বোধ করল অতুল। কোমল স্নেহার্দ্র স্বরে বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন, বোস ওখানে। কেমন আছিস।'

প্রীতি কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

রণজিত ভাবল, তার সামনে প্রীতি কোন কথা বলতে চায় না। একটু ইতস্তত করে অতুলের দিকে তাকিয়ে রণজিত বলল, 'আপনারা ততক্ষণ আলাপ করুন অতুলবাবু, আমি সিগারেট নিয়ে আসছি।'

ঘর থেকে পরক্ষণেই বেরিয়ে গেল রণজিত।

কিন্তু প্রীতি তেমন চুপ করেই রইল।

অতুল বলল, 'কি ব্যাপার। একেবারে বোবা বনে গেলি নাকি? কথা বলছিস না যে?'

প্রীতি মৃদু স্বরে বলল, 'কি বলব?'

অতুল বলল, 'কেমন আছিস তাই বলবি।'

প্রীতি বলল, 'ভালোই আছি।'

অতুল প্রীতির দিকে তাকাল, 'ভাল আছিস! কিন্তু চেহারা দেখে তো তেমন ভাল মনে হচ্ছে না।'

প্রীতি অদ্ভুত একটু হাসল, 'চেহারা দেখেই বুঝি সব বোঝা যায়?'

অতুল বলল, 'বোঝা যায় না? দেখ দেখি আমার চেহারা। কেউ বলতে পারবে আমি খারাপ আছি। শোন, আমি তোদের নিতে এসেছিলাম। কিন্তু এঁরা বলছেন, তোদের নাকি যাওয়া সম্ভব নয়। তুই একটু ভাল করে বুঝিয়ে বল না তোর শ্বশুর শাশুড়ীকে!'

প্রীতি বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমি বলব! তোমার বলাতেই হল না ছোড়দা আর আমার বলায় হবে। আমি বললে ওঁরা শুনবেন?'

অতুল বলল, 'শুনবেন না কেন? তুই এ বাড়ির বউ তোর একটা জোর নেই?

তোর একটা দাবি নেই ? তেমন করে বলতে পারলে তোর সাধ-আহ্লাদ ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা শুনবেন না ? বল না গিয়ে।'

প্রীতি তেমনি মৃদুস্বরে বলল, 'না ছোড়দা আমি তা পারব না। সেই শূন্য বাড়িতে গিয়ে আর কি হবে। তার চেয়ে এই বেশ আছি।'

শূন্য বাড়ি কথাটা কেমন লাগল অতুলের। প্রীতির দিকে তাকাতে গিয়ে দেখে সেও লজ্জায় মুখ নীচু করে রয়েছে। বাপ মা ভাই বোন সবাই থাকতেও একমাত্র বিজু নেই বলে সত্যিই কি সে বাড়ি প্রীতির কাছে শূন্য হয়ে গেছে ? এতই যদি বিজুকে ভালোবাসত প্রীতি, সে কেন স্বামীর ঘর করতে রাজী হল ! কেন এই বিয়ে অস্বীকার করল না ! কেন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে এল না। আশ্চর্য মেয়েদের মন আর তাদের ভীরু অসহায় ভালোবাসা। প্রীতির পাশাপাশি আর একটা মেয়ের মুখ মনে পড়ল অতুলের। সে ভীরু নয়। সে আলাদা জাতের, কিন্তু তার মনে কি ভালোবাসা আছে ? সংসারে ভীরু ছাড়া কি কেউ ভালোবাসতে পারবে না !

অতুল বলল, 'প্রীতি তুই আমার সঙ্গে চল। তুই যদি ইচ্ছা করে না যাস আমি তোকে জোর করেই নিয়ে যাব।'

প্রীতি এবার অতুলের দিকে মুখ তুলে তাকাল, তারপর একটু অদ্ভুত হেসে বলল, 'জোর করতে হবে না ছোড়দা। যাওয়ার দিন যদি আসে আমি নিজেই যাব। আর কারো কাছে নয় তোমার কাছে গিয়েই সবার আগে দাঁড়াব ছোড়দা। তখন কিন্তু দূর দূর করে তাড়িয়ে দিও না।'

অতুল বলল, 'তার মানে ?'

প্রীতির মুখ একটু যেন আরক্ত হয়ে উঠল, 'মানে কিছু নেই।' বলে সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অতুল মুহূর্তকাল স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওর ছেলেপুলে হবে না তো ! সেই কথা টের পেয়েই কি ও স্বেচ্ছায় এই অপমান, এই গ্লানি মাথা পেতে নিয়েছে ? নিজের সঙ্গে সকলের সঙ্গে এখন লুকোচুরি করছে। কিন্তু এ সব করেও কি প্রীতি নিজেকে বাঁচাতে পারবে ? না কি এখন আর সে নিজে বাঁচতে চায় না, ছলে বলে কৌশলে আর একজনকে বাঁচিয়ে রাখা, নিরাপদে রাখাই তার একমাত্র লক্ষ্য !

অতুল আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। মনে মনে ভাবল হয়ত এসব তার মিথ্যে আশঙ্কা। এর মূলে কোন সত্য নেই। কিন্তু যদি সত্যও হয়, আর প্রীতি যদি এখানে না টিকতে পেরে তার আশ্রয় নেয়, অতুল বোনকে কিছুতেই ফেলে দেবে না, তাকে নিয়ে আলাদা বাসা করে থাকলেও থাকবে।

রণজিত অতুলকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। বাসে উঠবার আগে তার দিকে তাকিয়ে অতুল রুক্ষস্বরে বলল, 'আপনারা যে অভদ্র ব্যবহার করলেন তা আমার চিরদিন মনে থাকবে।'

রণজিত একটু হাসল, 'অভদ্র ব্যবহার! আর আপনারা নিজেরাই বুঝি খুব ভদ্র ব্যবহার করেছেন?'

অতুল বলল, 'নিশ্চয়ই। অনেক গুণে ভদ্র। আজ আমি যাচ্ছি। কিন্তু ফের আমি একদিন খোঁজ নিতে আসব। যদি দেখি ও কষ্ট পাচ্ছে, ওর কোন অসুবিধে হচ্ছে, আপনারা ওকে যেতে দিন আর না যেতে দিন ও নিজে যেতে চাক আর না চাক ওকে জোর করে নিয়ে যাব। আমরা সবাই যদি খেতে পাই ও-ও খাবে। আমি অত ঘোর-প্যাঁচ বুঝি নে। আমি সোজা কথার মানুষ, সোজা পথের মানুষ। স্পষ্টই বলে দিলাম আপনাকে।'

রণজিত বলল, 'আর একদিন কেন, আজই নিয়ে যান না!'

কিন্তু বাস ততক্ষণ ছেড়ে দিয়েছে। কথাটা কানে গেল না অতুলের।

বাড়িতে এসে মার কাছে ঘটনাটা সবিস্তারে জানালে অতুল। বাসন্তী সব শুনে বললেন, 'আমি জানতাম। মেয়েটাকে ওরা আস্তে আস্তে মেরে ফেলবে। তাই ওদের মতলব।'

অতুল প্রতিবাদ করে বলল, 'কি যে বল। মেরে ফেলা অতই সহজ কিনা। আমি রণজিতকে বেশ করে শাসিয়ে দিয়ে এসেছি। প্রীতিকে যদি কষ্ট দেয়, যদি খারাপ ব্যবহার করে আমরা সহজে ছাড়ব না। যদি বনিবনাও হয় ভালই, না হয় প্রীতিকে আমি বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসব। তুমি কিছু ভেব না, আমি যদি খেতে পাই ওরও দু মুঠো জুটবে।'

বাসন্তী একটু হাসলেন, 'তোর তো সবই কেবল মুখের বড়াই। রোজগার করে তো কত ভরে দিচ্ছিস। তাছাড়া দু মুঠো খেতে পারাটাই তো মেয়েদের সব নয়। শুধু খাওয়া-পরার দুঃখ সারলেই তো তাদের সব দুঃখ সারে না।'

অতুল বলল, 'দুঃখ মনে করলেই দুঃখ, আবার না মনে করলেই দুঃখ নয়।' বনিবনাও না হলেও যে মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে পড়ে থাকতে হবে, সব রকম অপমান, নির্যাতন সহ্য করতে হবে তার কি মানে আছে। তেমন হলে রমা—রমাদি যা করেছে তাই করাই ভাল।

বাসন্তী ছেলের দিকে তাকালেন, 'ভাল! রমা যা করেছে তাই তুই সমর্থন করিস? নিজের ঘর-গৃহস্থালী ছেড়ে এসে এইভাবে—'

অতুল বলল, 'ঘর-গৃহস্থালী যদি সবারই ধাতে না পোষায় তাহলেও কি তা করতেই

হবে? সংসারে কি আর কোন কাজকর্ম নেই?'

বাসন্তী বললেন, 'আর কি কাজ আছে? কাজের মধ্যে তো পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া।'

অতুল বলল, 'মোটেই নয়। আড্ডা দেওয়ার সময় তার নেই। গোবিন্দের সংসারের সমস্ত ভারই তো তার হাতে। যেটুকু অবসর পায় মেসিনের সামনে গিয়ে বসে। না জেনে না শুনে মানুষের উপর দোষারোপ করা, তার নামে নিন্দা রটানো তোমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে মা।'

বাসন্তী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বেশ, আমাদেরই অভ্যাস খারাপ, স্বভাব খারাপ, কেবল রমার মত ভাল মেয়েই দুনিয়ায় নেই, হল তো? কিন্তু তোমাকে পুনঃ পুনঃ বারণ করছি বাপু, অত ভাল মেয়ের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করতে যেও না। অন্য কাজকর্ম জোটে ভাল, না জোটে তুমি বাড়ি বসে থেক! সেও আমার সইবে। কিন্তু ওই সংসর্গে মিশে তোমার আর দরকার নেই। তোমরা সবাই যদি একই রকম হও, একই ধারায় চল, তাহলে সংসারের যে কি উপায় হবে আমি তাই ভাবি।'

অতুল বলল, 'তোমার এত ভাবনা চিন্তার কি হয়েছে আমি তো কিছু বুঝতে পারছি নে।'

বাসন্তী বললেন, 'না তা তো ঠিকই। তোমাদের ভবিষ্যতের ভাবনা আমি ভাবব না ভাববে এসে পাড়ার লোকে। তোমরা সবাই মিলে সংসারখানাকে যা করে তুলেছ তাতে আর এক মুহূর্তও এখানে আমার থাকতে ইচ্ছে করে না। একেক সময় ভাবি, যেদিকে দুই চোখ যায় চলে যাই।'

রাতের খাবারের জন্য রুটি বেলতে বেলতে কথা বলছিলেন বাসন্তী। দু'দিন আগে বাপের অসুখের খবর পেয়ে জা সুরমা দমদম চলে গেছে। সংসারের কাজকর্ম একাই করতে হচ্ছে বাসন্তীকে। শরীরটা ভাল না। মনেও নানা কারণে শান্তি নেই। মার কথার ভঙ্গিতে মনটা যেন কেমন করে উঠল অতুলের। ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখল মার মুখের দিকে। কপালে নীল নীল দুটি রগ জেগে উঠেছে। চোয়ালের হাড়গুলো স্পষ্ট।

অতুল বলল, 'মা, তোমার শরীর দিনের পর দিন এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন বল তো। কি হয়েছে তোমার? দাঁড়াও, কালই আমি ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসব।'

বাসন্তী একটু হাসলেন, 'ডাক্তার কবরেজ এসে আমার কি করবে শুনি?'

অতুল বলল, 'কি আবার করবে। ডাক্তারেরা যা করে তাই করবে। চিকিৎসা করবে। ওষুধ দেবে।'

বাসন্তী বললেন, 'শত ওষুধ পথ্যেও আমার কিছু হবে না। হাজার ডাক্তার আমার রোগ সারাতে পারবে না অতুল।'

অতুল বলল, 'বেশ, ডাক্তারদের ওপর তোমার বিশ্বাস না থাকে, কবরেজ দেখাও। ভাল ভাল কবরেজও আছে শহরে।'

বাসন্তী ফের একটু হাসলেন, 'ডাক্তারও নয়, কবরেজও নয়। তাদের কারোরই সাধ্য নেই। তারা কেউ আমার রোগ সারাতে পারবে না। আমার সব অসুখ সারাতে পারিস কেবল তোরা, পারিস কেবল তুই।'

অতুল বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমি পারি ?'

বাসন্তী বললেন, 'পারিসই তো, তুই যদি আমার কথা শুনিস, ভালোভাবে চলিস, দশজন যদি তোকে ভাল বলে, দেখবি দুদিনে আমার শরীর ভাল হয়ে গেছে। কোন রকম অশান্তি নেই।'

অতুল বাসন্তীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'এত অল্পেই যদি তোমার সব অশান্তি দূর হয় মা তাই করব। কিন্তু দশজনের ধার আমি ধারি নে। আমি কি করলে, কি ভাবে চললে তোমার ভালো লাগে তাই বল। দেখি চেষ্টা করে পারি কি না।'

ভালোত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে একটু যেন মুশকিলে পড়লেন বাসন্তী। খানিক বাদে বললেন, 'না পারবার কি আছে। আমি তো তোকে বি. এ. এম. এ. পাশ করতেও বলছি নে, জজ ম্যাজিস্ট্রেট হতেও বলছি নে। অত বড়লোক হবার সাধ আমার নেই। সাধ্যমত কাজকর্ম জোগাড় করে নিলি, পাঁচ আনিস পাঁচ খেলি, দশ পারিস দশ, ভাই-বোনদের মানুষ করলি, পাড়াপড়শীকে আপদে-বিপদে দেখলি, ভাল লোকের সংসর্গে রইলি, দশজনে ভাল বলল, এই তো আমি বুঝি বাপু।'

অতুল হেসে বলল, 'ফের দশজন ?'

বাসন্তীও হাসলেন, 'বাঃ দশজন ছাড়া চলে নাকি সংসারে ? তোমাদের যদি দশজনে ভাল বলে তাহলেই তো আমার সুখ।'

অতুল বলল, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু সেই দশজনের মধ্যে কজন সত্যি সত্যি ভাল তা বুঝি খোঁজ নিয়ে দেখবে না ? যারা নিজেরা ভাল নয়, ভিতরে ভিতরে জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী, বদমাস, তারা ভাল বলুক আর না বলুক আমার কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমি সাদা জামা-পরা ভদ্রলোক সাজলেই যদি তোমার অসুখ সারে, বেশ তাই হব, তাই সাজব।'

বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর আড় হয়ে শুয়ে পড়ল অতুল। এতক্ষণে বেশ যেন একটু ক্লান্তি লাগছে। সত্যি, অনর্থক সময় নষ্ট করছে। দিনের পর দিন যাচ্ছে অথচ

কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। সঙ্গী-সাথীরা সবাই কাজকর্ম জুটিয়ে নিয়েছে। সেই শুধু বেকার। বেকার ছাড়া কি? কাটা-কাপড়ের ব্যবসায়ে বিশেষ কিছুই থাকে না। নিজের হাত-খরচটা বাদে কিছুই পায় না অতুল। এদিক থেকে গোবিন্দ বেশ সেয়ানা। বলে, 'রোস রোস। অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন। কারবারটা দাঁড়াক। তারপর যা দরকার নিস্।'

কিন্তু এভাবে তো সত্যি দিন কাটবে না। নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতেই হবে। কলকারখানায় যেখানেই হোক কিছু একটা জুটিয়ে নিতেই হবে অতুলকে। আর সে অনর্থক সময় নষ্ট করবে না।

'অতুল বাড়ি আছিস্, অতুল!'

বাইরে গোবিন্দের গলা শোনা গেল। অতুল একটু বিস্মিত হল। গোবিন্দ সাধারণত তাদের বাড়ি পর্যন্ত আসে না। ক্লাবে কিংবা চায়ের দোকানেই দেখা সাক্ষাৎ সেরে নেয়। ব্যাপার কি! আজকে এত গরজ কিসের ওর?

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আছি। কিন্তু শরীরটা তেমন ভাল নেই গোবিন্দ। আজ যা। কাল সব হিসেবপত্র বুঝিয়ে দেব।'

গোবিন্দ বলল, 'হিসেবপত্রের জন্য নয়। অন্য কথা আছে।'

অতুল বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি কথা—বলেই ফেল না।'

গোবিন্দ বলল, 'এতকাল বাদে জামাইবাবু ফের এসে চড়াও হয়েছেন। এসেই হৈ-হল্লা করে বাড়ি একেবারে মাথায় করে তুলেছেন। বেরিয়ে আয়, সব বলছি।'

এ কথা শুনে অতুল তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। জামাটা গায়ে দিয়ে বেরুতে বেরুতে বলল, 'চল।'

গোবিন্দদের বাড়ির সামনে আসতেই ভিতর থেকে একটা গোলমালের শব্দ শোনা গেল। কে যেন তারস্বরে বলছে, 'বেশ সহজে না যেতে চায়, আমি পুলিশ দিয়ে নেওয়াব। এখানে বসে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে বৃন্দাবন-লীলা চালাবে আমি বেঁচে থাকতে তা সহ্য করব না।'

আর একজন চাপা গলায় তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে, 'আঃ থাম হীরেন, থাম। এসব কি যা তা বলছ তুমি। লোকে শুনে কি বলবে।'

হীরেন জবাব দিল, 'লোকের দেখবার-শোনবার কিছু বাকি আছে নাকি? ও যাবে কি না, ওকে আপনারা পাঠাবেন কি না স্পষ্ট বলে দিন।

'আঃ শোন।'

বাইরের বসবার ঘরে বসে কথাবার্তা হচ্ছিল। কেশববাবু জামাইকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন, গোবিন্দ আর অতুল এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে রমার স্বামা

হীরেন তাদের দিকে ফিরে তাকাল, ব্যঙ্গ করে একটু হেসে বলল, 'এটি আবার কে? গোবিন্দ কি আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে গুণ্ডা নিয়ে এল সঙ্গে করে?'

গোবিন্দ বলল, 'গুণ্ডা হবে কেন। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু অতুল। ভয় তো আপনিই দেখাচ্ছেন জামাইবাবু, চেঁচিয়ে সারা বাড়ি মাথায় করে নিয়েছেন, বাইরে পাড়ার লোক জমে যাচ্ছে।'

হীরেন বলল, 'জমবেই তো। লোক জমাবার কাণ্ড করলে লোক জমবে না? আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই নে। তোমার দিদিকে বলো—এই মুহূর্তে তৈরি হয়ে নিক। আমি আজই ওকে নিয়ে যাব। এক মুহূর্তও এখানে আমি ওকে রাখতে চাই নে।'

গোবিন্দ বলল, 'পাঁচ বছর তাকে এখানে ফেলে রাখতে পারলেন, আর পাঁচ মিনিট আপনার সইবে না? বেশ তো দিদিকে বুঝিয়ে বলুন, সে যদি যেতে চায়, আমাদের আপত্তি করবার কি আছে।'

'সে যাবে না তার ঘাড় যাবে।' বলে তক্তপোষ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হীরেন, তারপর স্ত্রীর সঙ্গে আরও একবার বোঝা-পড়া করবার জন্যে দোতলার ঘরে চলে গেল।

'এ কি কাণ্ড বল তো, রাতদুপুরের সময় এ কি কেলেঙ্কারি!' বলতে বলতে কেশববাবু গেলেন তার পিছনে পিছনে।

অতুল বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাপার কি গোবিন্দ?'

গোবিন্দ বিরক্ত হয়ে বলল, 'কেন মিছামিছি ন্যাকামি করছিস অতুল। ব্যাপার কি তুই জানিস নে? ব্যাপার তো চোখের ওপর দেখলিই।'

ব্যাপার অবশ্য অতুল জানে। কিছু গোবিন্দের কাছ থেকে শুনেছে, কিছু কিছু রমাও বলেছে তাকে। সিনেমা ডিরেক্টর শচীরঞ্জন চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর থেকে দেখতে দেখতে হীরেনের ভাগ্য খুলে গিয়েছিল। অভিনেতা হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়েছিল হীরেনের। নতুন নতুন কোম্পানী তার সঙ্গে কনট্রাক্ট করবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শচীরঞ্জন তাকে ছাড়েন না। বলেছেন, 'আমি তোমাকে সব দিক থেকে পুষিয়ে দেব। আর কোথাও তোমাকে যেতে হবে না।'

পুষিয়ে যাচ্ছিলও। শুধু অভিনেতা নয়, শচীরঞ্জন তাকে প্রধান সহকারীও করে নিয়েছিলেন। উৎসবে ব্যসনে পেশায় নেশায় হীরেন হয়ে উঠেছিল শচীরঞ্জনের সব চেয়ে অন্তরঙ্গ। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই চাকা ঘুরে গেল। পর পর দু-তিনখানা ছবিতে মার খেলেন শচীরঞ্জন। জনপ্রিয়তা হারালেন। পুনরাবৃত্তির অপবাদ রটল তার নামে। হীরেনের ভাগ্যও একই চাকায় বাঁধা। অন্য দু-একটি কোম্পানীর সঙ্গে কনট্রাক্ট হল। কিন্তু গোটা দুই ছবি শেষ পর্যন্ত হতে হতে হল না। মাঝপথে আটকে গেল। যে ছবিতে

পুরোপুরি অভিনয়ের সুযোগ পেল হীরেন, তাতে যশও পেল না, অর্থও নয়। হতাশ হয়ে হীরেন বন্ধুর কাছেই ফিরে এল। শচীরঞ্জন তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'সবুর কর, আমরা ফের ছবি করছি।'

কিন্তু পানপাত্র সামনে নিয়ে দুজনের মধ্যে বছরের পর বছর জল্পনা-কল্পনাই চলতে লাগল, ছবি আর হল না। এদিকে পুঁজি নিঃশেষ হয়ে এল, বেশবাস জীর্ণ। মহাজনদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগল। ভাগ্যলক্ষ্মীর মত হীরেনের অঙ্কলক্ষ্মী যশস্বিনী শমিতা দেবীও চঞ্চলা হয়ে উঠলেন। অন্যান্য ডিরেক্টর বন্ধুদের সঙ্গে তার আনাগোনা শুধু কানেই শুনল না, হীরেন চোখেও প্রত্যক্ষ করল।

হীরেন এসে স্মরণ নিল শচীরঞ্জনের, বলল, 'আর তো পারা যাচ্ছে না দাদা, যাতে সব ভোলা যায় তেমন কিছু একটা পথ বাৎলে দাও তো।'

শচীরঞ্জন হেসে বললেন, 'মকার ছাড়া মুক্তি কোথায় ?'

হীরেন বলল, 'মকারের তো কিছু আর বাকি রইল না। পঞ্চ মকার তো কবে পার হয়ে গেছি।'

শচীরঞ্জন বললেন, 'তাতে কি হয়েছে। পাঁচেই তো আর সমস্ত মকার শেষ হয়ে যায় নি। এবার তোমাকে ষষ্ঠ মকারে দীক্ষা দিচ্ছি।'

হীরেন বলল, 'সেটি কি ?'

শচীরঞ্জন বললেন, 'মর্ফিয়া।'

হীরেন দিন দুই একটু ইতস্তত করল, তৃতীয় দিনে স্বেচ্ছায় এসে অংশীদার হল শচীরঞ্জনের। প্রতিদিন সূচের ফোঁড়ে দুজনের বন্ধুত্ব গাঁথা হতে লাগল। অন্তরঙ্গতা আরও ঘনিষ্ঠতায় গিয়ে পৌঁছল। একজনের চোখে আর একজনের প্রতিবিম্ব, একজনের কণ্ঠে আর একজনের প্রতিধ্বনি।

কিন্তু বড় ব্যয়সাপেক্ষ এই যৌথ-যাত্রা। তার কিছু অংশ তো হীরেনকে বহন করতে হয়। শচীরঞ্জন একা পেরে উঠবেন কেন। তিনিও তো বেকার। হীরেন অবিবেচক নয়। কিন্তু হাত পাতবার আর জায়গা নেই। ব্যাঙ্কের সামান্য পুঁজি বহুদিন পূর্বে শেষ হয়েছে। বাড়িতে নগদ একটি কপর্দক নেই। দামী আসবাবপত্র যা ছিল, খিড়কি দোর দিয়ে চলে গেল পুরনো বাজারে। ঘড়ি-আংটি পেন সোনার বোতাম পর্যন্ত অদৃশ্য! বন্ধুবান্ধবের দরজা বন্ধ। হাতড়ে হাতড়ে যখন কোন পথই আর মিলছে না, তখন শচীরঞ্জনই একদিন বললেন, 'আরে তুমি না একবার বিয়ে করেছিলে ?'

হীরেন বলল, 'সে তো পূর্বজন্মে।'

শচীরঞ্জন বললেন, 'তাতে কি, হিন্দু স্ত্রী জন্ম-জন্মান্তরের চাকায় বাঁধা। এদেশের

দাম্পত্য সম্পর্ক বিদেশের মত ঠুনকো জিনিস নয়। যাই কিছু হোক, তা ভাঙে না মচকায়ও না, পোড়েও না, প্রায় অবিনশ্বর আত্মার মত। তুমি নির্ভয়ে যাও, বউমার একটু খোঁজখবর নিয়ে এস।'

হীরেন নির্ভয়েই এল, কিন্তু ভয় পেয়ে গেল রমা।

হীরেন বলল, 'অমন আঁৎকে উঠলে যে?'

রমা বলল, 'তোমাকে দেখে। এ কি, তুমি না তোমার ভূত?'

হীরেন একটু হাসল, 'চেহারাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। তা কি করব বল। ঘরের লক্ষ্মী রাগ করে এসে বাপের বাড়ি থাকলে নারায়ণের স্বাস্থ্য এই রকমই দেখায়। তুমি ফিরে চল, দেখবে দুদিনেই দিব্যি কন্দর্পকান্তি বেরিয়েছে।'

রমা বলল, 'না।'

হীরেন বলল, 'না মানে! আমি তোমার ভূত হতে পারি, কিন্তু তুমি আমার ভবিষ্যৎ। এই কথাটা বলবার জন্যেই আমি আজ এসেছি রমা, তোমাকে আমি ফিরিয়ে নিতে এসেছি।'

রমা বলল, 'অসম্ভব। তুমি যা করেছ, তারপর আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি যাব না।'

স্ত্রীর ঔদ্ধত্যে হঠাৎ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল হীরেনের। বলল, 'যেতে তোমাকে হবেই। যেতে তুমি আইনত বাধ্য।'

রমা বলল, 'বেশ, সেই আইন-আদালতই কর গিয়ে। আমি যাব না।'

কিছুক্ষণ বাদানুবাদ চলল। রমার মা কল্যাণী এসে বললেন, 'এতদিন পরে এসেছ, একটু বিশ্রাম কর বাবা। জলটল খাও। ওসব কথা পরে হবে। তোমার সাথে না গিয়ে যাবে কোথায়, আজ না যায়, দুদিন পরে যাবে।'

কিন্তু দুদিন পরে নয়, আজই স্ত্রীকে নিয়ে যাবে হীরেন। সে অনেক সহ্য করেছে-এক মুহূর্তও সহ্য করতে আর রাজী নয়। তাদের জানতে আর কিছু বাকি নেই। এ পাড়ায় তার অন্য জানাশোনা লোক অনেক আছে। তাদের কাছে সব খবরই পেয়েছে হীরেন। রমার কাণ্ডকারখানার সব কথাই তার কানে গেছে। ঘরের মধ্যে রূপের হাট বসিয়েছে। পাড়ার বোকাটে ছোকরাদের মধ্যে খদ্দেরের অভাব নেই।

রমা বলল, 'মজা মন্দ নয়। নিজে কত গঙ্গাজলে ধোয়া সাধুপুরুষ। তুমি আবার আমার দোষ ধরতে এসেছ। বেশ, তেমন হয়ে থাকলে হয়েছে। তুমি যার স্বামী, হাটবাজার ছাড়া তার জায়গা কোথায়?'

অফিস ছুটির পর কেশববাবু বাড়ি এলেন। একটু বাদে এল গোবিন্দ। সবাই মিলে

হীরেনকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু হীরেন নাছোড়বান্দা। রমাকে সে নিয়ে যাবেই। সে তার বিবাহিতা স্ত্রী। তার ওপর তার ন্যায্য অধিকার আছে।

রমা বলল, কক্ষনো সে যাবে না। তার ওপর হীরেনের দরদ তো কত। তার আসল মতলব সে টের পেয়েছে। স্ত্রীর জন্যে মোটেই তার মাথাব্যথা নেই। তার বাক্সের গয়নাগুলির ওপরই তার লোভ। কিন্তু এ গয়না সে প্রাণ থাকতেও হাতছাড়া করবে না। হীরেনের সাধ্য থাকে মামলা-মোকদ্দমা করে নিক।

গোবিন্দ অনুনয় করে বলেছিল, 'জামাইবাবু, আজ আপনি যান। আমরা ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজী করে কাল বরং পাঠিয়ে দেব।'

হীরেন জবাব দিয়েছিল, 'তোমরা যা পাঠাবে তা আমার জানা আছে। সবাই একই ভাগের কারবারে কারবারী। তা কি আমি টের পাই নে?'

এই সময় গোবিন্দ গিয়ে খবর দিয়েছিল অতুলকে। বিপদে আপদে অতুল তার সহায়। তার শক্তি-সামর্থ্যের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে গোবিন্দ।

দোতলায় আরও জোর চেঁচামেচি শুনে গোবিন্দ বলল, 'আবার কি হল চল তো দেখে আসি।'

অতুল বলল, 'তুই যা। তোদের এসব ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে আমি গিয়ে কি করব। যত দেখছি, তত আমার মাথা গরম হচ্ছে, আমি ফিরে যাই।—বলে অতুল দরজা দিয়ে বেরুতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ওপর থেকে কল্যাণীর চীৎকার শোনা গেল, 'তোরা দেখ এসে মেয়েটাকে মেরে ফেলল। মাতাল বদমাস কোথাকার। এত বড় সাহস, তুমি আমার মেয়ের গায়ে হাত তোল?'

অতুলের আর সহ্য হল না। দু-তিন লাফে সবগুলি সিঁড়ি ডিঙিয়ে ও রমার ঘরে গিয়ে ঢুকল। শক্ত করে স্ত্রীর হাত চেপে ধরেছে হীরেন, বলছে, 'যেতে তুমি বাধ্য, আমি যদি জোর করে তোমাকে নিয়ে যাই, কারো সাধ্য নেই তোমাকে আটকায়—'

'হারামজাদা, শুয়ার, তোমার আটকানো আমি বের করছি। মাতলামির আর জায়গা পাও নি।' বলে পলকের মধ্যে হীরেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল অতুল, ঘাড়ে হাত দিয়ে বলল, 'বেরোও, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।'

মুহূর্তের জন্য ঘাবড়ে গেল হীরেন। এমন আচমকা আক্রমণ সে আশঙ্কা করে নি। তারপর কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'বটে! কে বাবা তুমি। ওসমান না জগৎসিংহ, ঠিক ঠাওর করতে পারছি নে। কে তুমি? গোবিন্দের নতুন ভগ্নীপতি বুঝি?'

অতুল ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ। বেরোয় বলছি! বেরিয়ে কথা বল।'

হীরেন বলল, 'আচ্ছা, বেরোচ্ছি। কিন্তু এক মাঘে শীত যায় না, কথাটা মনে রেখো বাপ।'

বলতে বলতে হীরেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল কাণ্ডটা। কিছুক্ষণের জন্যে কারো মুখে কোন কথা সরল না।

একটু বাদে অতুলের দিকে তাকিয়ে রমা তীব্র স্বরে বলে উঠল, 'তুমি কেন এসেছ এর মধ্যে, তোমাকে কে আসতে বলেছে, কে ডেকেছে তোমাকে ?'

অতুল বিস্মিত দৃষ্টিতে রমার দিকে তাকাল, 'কে আবার ডাকবে ? আমি নিজেই এসেছি।'

রমা বলল, 'নিজেই এসেছ। বলতে লজ্জা করে না ?'

অতুল বলল, 'না এলে ওই গুণ্ডাটার হাতে তোমার রক্ষা থাকত নাকি ?'

রমা বলল, 'ঈস, কত বড় রক্ষাকর্তা এসেছেন আমার, কত বড় উদ্ধারকর্তা একজন। আমাকে উদ্ধার করতে কাউকে আসতে হবে না। নিজের উদ্ধারের পথ আমি নিজেই জানি।'

অতুলের মুখ দিয়ে হঠাৎ কোন কথা বেরুল না। রমার এই অদ্ভুত আচরণ তাকে স্তম্ভিত করেছে। স্বামীর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে বলে কোথায় কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে রমা, তা নয়, উল্টে কড়া কড়া শুনিয়ে দিচ্ছে।

কেশববাবু বললেন, 'যাকগে, কেলেঙ্কারী যা হবার খুবই হয়েছে। এবার তুমি বাড়ি যাও অতুল। শত হলেও সে জামাই। একদিন না একদিন রমাকে স্বামীর ঘর করতেই হবে। হীরেনকে অমন করে অপমান করা তোমার উচিত হয় নি। যা বলবার আমরা বলতাম, যা করবার আমরা করতাম—তুমি কেন এলে এর মধ্যে ?'

অতুল সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আমার ঘাট হয়েছে, আমি মাপ চাইছি মেসোমশাই। আর কোনদিন আসব না, জামাই-মেয়ে যদি খুনোখুনি হয়ে মরে তবুও না। স্বামী হলে তার সাত খুন মাপ, একথা আমার বোঝা উচিত ছিল।'

গোবিন্দ পিছনে-পিছনে অনেকদূর পর্যন্ত এল, বলল, 'কিছু মনে করিস নে ভাই, কিন্তু তোরও দোষ আছে। জামাইবাবু লোক ভাল নয়, সে তো সবাই জানে। কিন্তু তুইও বড় গোঁয়ার। হঠাৎ অমন করে ঘাড় ধরে বসলি কেন ? মুখে দু-চার কথা বললেই হত। যাক, যা হবার হয়েছে। মামলা-মোকদ্দমার পাল্লায় না পড়তে হয় তাই ভাবছি।' বলে একটা বিড়ি বার করে গোবিন্দ অতুলের হাতে দিল।

বিড়িটা ওর হাত থেকে নিয়ে, অতুল দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'খবরদার, আর কোন কথা বলতে আসিস নে গোবিন্দ। ঢের হয়েছে। তোদের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক

এখানেই শেষ। আর নয়।' বলে জোরে হাঁটতে লাগল অতুল।

গোবিন্দ পিছন থেকে ডেকে বলল, 'আরে শোন, ও অতুল শুনে যা। তুই ক্ষেপে গেলি নাকি?'

অতুল মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ক্ষেপেই গেছি। তোর ভগ্নীপতির ঘাড়ে কেবল অল্প একটু হাত বুলিয়েছি, কিন্তু তুই শালা যদি বেশী বাড়াবাড়ি করিস, তোর ঘাড় মটকে দিয়ে তবে ছাড়ব। যা সরে যা।' বলে অন্ধকার গলিটার মধ্যে অতুল দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল।

সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে করবী এগিয়ে গিয়ে দোর খুলে দিল, 'আপনি?'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ, কেন, অন্য কারো কি আসার কথা ছিল?'

করবী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'না, তা ছিল না। কিন্তু আপনি আসবেন তাও তো আশা করতে পারি নি। আমরা ভেবেছিলাম আপনি এ পথ ভুলে গেছেন!'

অরুণ পাল্টা অভিযোগ করে বলল, 'আপনারাও যে খুব মনে রেখেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় নি।'

করবী ত্রুটি স্বীকার করে বলল, 'সত্যি অনেকদিন ভেবেছি আপনার খোঁজ খবর নিই, চিঠি লিখি। কিন্তু লিখি লিখি করেও লিখে উঠতে পারি নি। বড় অশান্তির মধ্যে আছি।'

অরুণ একটু উদ্বেগের স্বরে বলল, 'কিসের অশান্তি?'

করবী বলল, 'ভিতরে আসুন। বলছি।' দুজনে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকল, সন্ধ্যা এখনো হয় নি। কিন্তু একতলার ঘরে এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। সুইচ টিপে আলোটা জেলে দিল করবী। একটি চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

অরুণ বলল, 'ওঁরা সব কোথায়? দিলীপ, পিপলু, আপনার শাশুড়ী? কারো অসুখ-বিসুখ হয় নি তো?'

করবী বলল, 'না, সবাই সুস্থই আছে। পিপলুকে নিয়ে দিলীপ গেছে পার্কে। মা রান্নাঘরে। তারপর আপনার খবর কি বলুন। এতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবার মত কি হয়েছিল আপনার?'

অরুণ একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'এর মধ্যে আমাদের বাড়িতে দুটি বড় বড় ঘটনা ঘটে গেল। বোনের বিয়ে আর আমার এক মামাত ভাইয়ের মৃত্যু। মনটা তাই নিয়ে কিছুদিন বড় উদ্‌ভ্রান্ত ছিল।'

করবী অরুণকে প্রথম থেকেই নিজের পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে নিয়ে এসেছে, কিন্তু অরুণ এতদিন পর্যন্ত তাদের পরিবারের কারো কথা করবীর কাছে উল্লেখ করে নি। করবীর মাঝে মাঝে কৌতূহল হলেও তা সে চেষ্টা করে চেপে রেখেছে। আজ অরুণ নিজে

থেকেই পারিবারিক প্রসঙ্গ তোলায় করবী খানিকটা তৃপ্তি বোধ করল। ওর পারিবারিক গণ্ডিতে যেন আরও ঘনিষ্ঠ করে পাওয়া গেছে অরুণকে।

দুর্ঘটনার সংবাদে সহানুভূতি জানিয়ে করবী বলল, 'সে কি ! কি করে মারা গেলেন ? কত বয়স হয়েছিল তাঁর ? আপনার ছোট ছিলেন না বড় ।'

অরুণ বলল, 'ছোটই ছিল। অনেক ছোট ।'

করবী বলল, 'আহা, কি হয়ে মারা গেলেন ?'

অরুণ একটু ইতস্তত করল। আসল কথাটা গোপন করে মিথ্যে একটা অসুখ-বিসুখের নাম করবে কি না। কিন্তু কি দরকার। করবী যদি সত্যি ঘটনাই জানে তাহলেই কি বা ক্ষতি। এর আগে দু-একজন সহকর্মীর কাছেও সত্য গোপন করে নি। করবীর কাছেই বা করতে যাবে কেন। অরুণ বলল, 'কোন অসুখ-বিসুখ নয়। সে সুইসাইড করেছে ।'

করবী অস্ফুট স্বরে বলল, 'সে কি ।'

অরুণ কোন জবাব দিল না।

করবী একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, কেন তিনি এমন করতে গেলেন ? এত অল্প বয়সে জীবন তাঁর কাছে এমন কি দুঃসহ হয়ে উঠেছিল যে—'

অরুণ বলল, 'কেন করল তা জানা যায় নি। যেটুকু জানা গেছে তা আপনাকে পরে আর একদিন বলব, আজ নয় ।'

করবী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'মাপ করবেন, আমি হয়তো অসঙ্গত কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলেছি—'

অরুণ বলল, 'একদিন আপনাকে সবই বলব। আপনি হয়তো সবই জানতে পারবেন। কিন্তু আজ—'

ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির ধরনে করবী যেন একটু লজ্জাবোধ করল। বলল, 'একদিন যে বলতেই হবে তার কি মানে আছে। ফ্যামিলি সিক্রেট সকলেরই কিছু না কিছু থাকে। বাইরের লোককে তা কোনদিন বলা যায় না, বলা উচিত নয়—'

অরুণ বাধা দিয়ে বলল, 'না না, আপনাকে আমি মোটেই তেমনভাবে বাইরের লোক বলে মনে করি নে ।'

পিপলুকে নিয়ে দিলীপ এসে ঘরে ঢুকল। অরুণের শেষ কথাটা তার কানে গিয়েছিল।

দিলীপকে দেখে অরুণই আগে কথা বলল, 'এই যে দিলীপ কেমন আছ ?'

দিলীপ একটু গম্ভীর স্বরে বলল, 'ভাল। আপনি ভাল আছেন তো ? অনেকদিন আসেন না এদিকে ।'

অরুণ বলল, 'সময় পেয়ে উঠি নি। তারপর তোমার পড়াশুনা কেমন চলছে ?'

দিলীপ সংক্ষেপে জবাব দিয়ে বলল, 'ভালো।'

তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অরুণ এবার পিপলুকে কাছে টানতে চেষ্টা করল, 'এই যে পিপলু এসো, এসো। তুমি কি ভুলে গেলে নাকি আমাদের?'

কিন্তু পিপলু কিছুতেই কাছে ঘেঁসতে চাইল না। অরুণের হাত এড়িয়ে সে মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়াল।

করবী সস্নেহে ধমক দিল ছেলেকে, 'ছিঃ অমন করে নাকি। কাকাবাবু হয় না? কাছে যেতে হয় না ডাকলে? তুমি যে নতুন কবিতাটা শিখেছ সেটা ওকে শুনিয়ে দাও তো। কি যেন, হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে—বল না।'

পিপলু বলল, 'কাকুর কাছে বলব। আমি কাকুর কাছে যাই মা।' বলে একদৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অরুণ হেসে বলল, 'হে মোর চিত্ত আবৃত্তি করলে কি হবে, আপনার ছেলে ভারি সঙ্কীর্ণচিত্ত হয়ে উঠেছে।'

করবী বলল, 'আহা, ওর দোষ কি। আপনি আসবেন না, খোঁজখবর নেবেন না, লোকে বুঝি আপনাকে অমনি মনে রাখবে।

অরুণ করবীর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'তা ঠিক, অমনি অমনি মনে রাখা যায় না।'

এই সহজ স্বীকৃতির সবটুকুই যে সহজ নয় তা করবীর বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু বুঝতে পেরেও একথার কোন জবাব দিল না করবী।

'কে বউমা?'

বলতে বলতে নিভাননী এসে দোরের সামনে দাঁড়ালেন। এক হাতে খানিকটা ময়দা লেগে রয়েছে। রাত্রের জন্যে রুটি তৈরি করছিলেন। অরুণকে দেখে বললেন, 'তুমি! অনেকদিন এদিকে আসনি। ভাবলাম ব্যাপার কি, অসুখ-বিসুখই হোল না কি। বউমাকে বললাম একটা খোঁজ নাও। কিন্তু খোঁজ নেবে কি, মনে কারো শান্তি নেই। ওর চাকরিটা গেছে। কেবল একটা টিউশানি সম্বল।'

অরুণ বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি। স্কুলের চাকরিটা গেল কি করে?'

করবী একথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'আপনি বসুন। আমি আসছি।'

খবরটা বিস্তারিত নিভাননী বললেন। স্কুলের আর্থিক অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না। কমিটি তাই তিনজন টিচারকে ছাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যারা নতুন ঢুকেছে, যাদের চাকরি এখনও স্থায়ী হয় নি, তাদেরই আগে বিদায় নিতে হয়েছে।

নিভাননী বললেন, 'এখন কি করে যে, এতগুলি মুখের গ্রাস জুটবে তাই ভাবছি। চাকরিবাকরির যা বাজার—ওর তো চেষ্টার বিরাম নেই। এখানে দরখাস্ত ওখানে দরখাস্ত করেই চলেছে। কিন্তু কিছুই তো হয়ে উঠছে না। এদিকে এত বাড়িভাড়া টানাও শক্ত। আমাদের জন্যে ছোট-খাট একটা বাসা দেখে দাও অরুণ। একখানা ঘর আর রান্নার জায়গা হলেই চলবে। কি করা যায়, যখন যেমন অবস্থা তখন সেইভাবে চলতে হবে তো।'

অরুণ আশ্বাস দিয়ে বলল, 'অত অধীর হচ্ছেন কেন। দেখা যাক না। চেষ্টা চরিত্র করলে চাকরি যে একেবারে জুটবেই না এমনও তো কোন কথা নেই।'

চায়ের কাপ হাতে করবী এসে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে নিভাননী থেমে গেলেন। আলোচনাটা বাইরে থেকেই করবীর কানে গিয়েছিল, তবু সে কোন কথা বলল না। একটু বাদে নিভাননীই উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'যাই ওদিককার কাজকর্ম রয়েছে। তুমি ঘরের ছেলের মত অরুণ। তোমাকে আর বেশি কি বলব।'

অরুণ বলল, 'আপনি কিছু ভাববেন না। আমরা তো আছি। আমাদের সাধ্য কম। কিন্তু চেষ্টা তো করতে পারব।'

নিভাননী ঘর থেকে চলে গেলে করবী বলল, 'আপনার কাছে ঋণীই রয়ে গেলাম। ইচ্ছে ছিল এই মাসে টাকাটা শোধ করব কিন্তু—'

অরুণ বিষয়টাকে হাল্কা করে দেওয়ার জন্যে তরল স্বরে বলল, 'চাকরিটি তাহলে সত্যিই খুইয়েছেন ?'

করবীও একটু হাসল, 'হ্যাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নাই। নতুন কিছু একটা জুটবে কিনা তাই নিয়েই সংশয়।'

অরুণ আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ঘাবড়াচ্ছেন কেন, অত ভাবনার কি আছে। ব্যবস্থা কিছু না কিছু হয়েই যাবে।'

শুধু মুখের ভরসা দিল না অরুণ। করবীর চাকরির জন্যে নিজেও নতুন উদ্যমে চেষ্টা-চরিত্র শুরু করল। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে করবীর হয়ে নিজেই দরখাস্তের খসড়া লিখে দিল। অফিসের টাইপিস্টকে দিয়ে টাইপ করিয়ে আনল সে দরখাস্ত। শুধু স্বাক্ষর ছাড়া করবীর আর কিছুই করবার রইল না।

নিভাননী একদিন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন, 'তুমি আর জন্মে নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেউ ছিলে।'

অরুণ বলল, 'আর এ জন্মে বুঝি কেউ নয় ?'

নিভাননী বললেন, বাঃ আমি কি তাই বলছি।'

অরুণ ভাবে করবীর শাশুড়ীকে মাসীমা কিংবা এই ধরনের কোন আত্মীয় সম্বোধন করবে। কিন্তু ডাকতে গিয়েও পারে না। মুখে আটকে যায়।

খোঁজখবর চেষ্টাচরিত্র চলতে লাগল। কয়েক জায়গা থেকে ইণ্টারভিউও পেল করবী। কিন্তু চাকরি জুটবার লক্ষণ দেখা গেল না। আরও একটা টিউশানি জুটল। কিন্তু শুধু টিউশানির টাকায় তো সংসার চলে না। অরুণ মাইনে পেয়ে পঞ্চাশটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিল।

করবী বলল, 'এ কি ?'

অরুণ বলল, 'ধার।'

করবী বলল, 'কিন্তু আগের ঋণই তো শোধ দেওয়া হয় নি।'

অরুণ বলল, 'তাতে কি হয়েছে। পরে সুবিধে মত এক সময় দেবেন।'

করবী মনে মনে সঙ্কোচ বোধ করে, অরুণের কাছ থেকে ক্রমাগত ধার নিতে মন সরে না। কিন্তু সংসারের প্রয়োজনে না নিয়েই বা পারে কই।

একদিন করবী বলল, 'দেখুন, মাঝে মাঝে মনে হয় আমি ভারি স্বার্থপর।'

অরুণ বলল, 'কেন ?'

করবী বলল, 'আপনার কাছ থেকে একটানা কেবল নিয়েই চলেছি। কিছুই দিচ্ছি নে, কিছু দিতে পারছি নে।'

অরুণ বলল, 'একেবারেই যে কিছু দিচ্ছেন না তা কি করে বলি।'

করবী একবার অরুণের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। আজকাল এ ধরনের কথাবার্তা মাঝে মাঝে অরুণ বলে। করবী ভাবে তার প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় এসব কথার প্রতিবাদ করলে তা আরও অশোভন শোনাবে। তার চেয়ে চুপ করে থাকা ভাল। সত্যি সত্যিই সে কি দিচ্ছে অরুণকে। করবীর চাকরী-বাকরী সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই অরুণ অফিস ফেরত মাঝে মাঝে আসে। দুজনের মধ্যে তাই নিয়ে আলোচনা চলে। তারপর অরুণ বিদায় নেয়। করবী তাকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে। বাস, মাত্র এইটুকু। খানিকক্ষণের সান্নিধ্য, খানিকক্ষণের আলাপ আলোচনা ছাড়া কিছুই নয়। তবু অরুণের এই নিত্য যাতায়াত করবীর শাশুড়ী দেওরের যে ভাল লাগে না তারা মুখ ফুটে কিছু না বললেও করবীর বুঝতে বাকি থাকে না। নেহাতই অরুণের কাছ থেকে নানারূপ সাহায্য তাদের নিতে হয়, তাই নিভাননী স্পষ্ট কিছু বলেন না। কিন্তু অরুণের সঙ্গে বেশীক্ষণ তাকে কথা বলতে দেখলে নিভাননী নানা ছলে বারবার করবীকে ডেকে পাঠান। যে কাজটা দুদণ্ড পরে করলেও চলে, সে কাজটা তখন তখনই করিয়ে নেন। কিংবা পিপলুকে নামিয়ে দিয়ে যান কোলের কাছে।

ছেলের উপযুক্ত আদর যত্ন হচ্ছে না বলে খোঁটাও দেন মাঝে মাঝে। শাশুড়ীর কাছ থেকে এই অদাক্ষিণ্যের পরিচয় পেয়ে করবীর মন তার ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে। কেন সঙ্কীর্ণতা? তার কি নিজের বন্ধু বলে কেউ থাকতে নেই? তার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলে, কথা বললেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? অরুণ তো কেবল করবীরই বন্ধু নয়, সারা পরিবারেরই হিতৈষী। কিন্তু শুধু নিভাননীই নয় দিলীপও অরুণকে যেন তেমন পছন্দ করে না। অরুণকে দেখলেই সে মুখ গম্ভীর করে অন্য ঘরে চলে যায়। অমনিতে বউদির খুবই ভক্ত, ফাইফরমায়েস খাটে, সাংসারিক কাজকর্মে সাহায্য করে। কিন্তু অরুণ এলেই যেন প্রকৃতি বদলে যায় দিলীপের, রোজই চাকরির কথা মনে হয়। বলে, 'পড়াশুনো আর ভাল লাগছে না বউদি। সংসার চলে না, অন্যের কাছ থেকে ধার দেনা করতে হয়, এ অবস্থায় পড়া মানে বাবুগিরি। তাই না বউদি?'

করবী ধমক দেয়, 'অত বড় বড় কথা না বলে নিজের পড়াশুনোটা মন দিয়ে কর তো, যাতে সত্যিকারের কাজ হবে তাই কর।'

দিলীপ আর কোন কথা বলে না।

শেষ পর্যন্ত এবারও চাকরি জুটে গেল করবীর। তার কাকার বন্ধু শৈলেন সেন ইনকাম ট্যাক্স-এর অফিসার। অনেকদিন আগেই সেখানে একটা দরখাস্ত দিয়ে রেখেছিল করবী, ইণ্টারভিউ হয়ে গিয়েছিল। মিঃ সেন ভরসা দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার নাম enlist করা রইল, দেখা যাক কতদূর কি করা যায়।' অবশ্য তাঁর বলবার ভঙ্গি দেখে করবী মোটেই আশ্বস্ত হয় নি, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে নিয়োগ-পত্রটা সেখান থেকেই এল। লোয়ার গ্রেড ক্লার্কের চাকরি। ভাতাশুদ্ধ মাইনে শ'দেড়েক টাকা। স্কুল মাস্টারী করে করবী যা পেত তার তিন গুণ। শুনে নিভাননী খুবই উল্লসিত হয়ে উঠলেন, বললেন, 'যাক্‌ এতদিনে ভগবান বোধ হয় মুখ তুলে চাইলেন। কি ভাবনাই যে হয়েছিল তা আর বলবার নয়। দিলু, যা কিছু বাতাসা নিয়ে আয়। হরির লুঠ দেব।'

করবী হেসে বলল, 'মাইনেটা পেয়ে নি, তারপরেই না হয় হরির লুঠ দেবেন মা, এখনই কি।'

কিন্তু নিভাননী সে কথা শুনলেন না। দিলীপকে দোকানে পাঠিয়ে দিলেন। হরির লুঠ দেওয়ার উৎসাহ দিলীপেরও কম নয়। বইপত্র রেখে সে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। নিভাননী বললেন, 'বাঁচা গেল বাবা। এবার দু'মাস কষ্ট করে থেকেও পরের দেনাপত্রগুলি আগে শোধ করে দাও। মানসম্মানটা আগে। দেখি এখন আমাকে কে কি বলতে সাহস পায়।'

পরের কথাটা যে কার উদ্দেশ্যে বলা তা করবীর বুঝতে বাকি রইল না। অরুণ পর

তো বটেই। তবু কথাগুলি কি অত স্পষ্ট করে না বললে পারতেন না নিভাননী ? বিপদে আপদে এতদিন অরুণ যে তাদের সাহায্য করল সেকথা কি সঙ্গে সঙ্গে তাদের পক্ষে ভুলে যাওয়া সঙ্গত হয়েছে ?

করবী বলল, 'কেন, এতদিনই বা আপনাকে কে কি বলেছেন ?'

নিভাননী বললেন, 'না, বলবে আবার কি। নিজেরা সমঝে চলতে পারলে কার সাধ্য কি বলতে পারে। তবে জানোই তো ও বাড়ির বাঁড়ুয্যে গিন্নী কি ধরনের মানুষ। কেবল ঠেস দিয়ে কথা। অরুণ আমাদের কে হয়, রোজ রোজ কি দরকারে আসে এই সব কথা প্রায়ই খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞেস করেন।'

করবী বলল, 'আপনি বাঁড়ুয্যে গিন্নীর কাছে আর না গেলেই পারেন। এরপর কখনো আর যাবেন না।'

নিভাননী একটু হাসলেন, 'তা না হয় না গেলাম। কিন্তু পাশের বাড়ির দত্তদের মেজো বউও বললেন—বাড়ির কর্তাদের মধ্যেও নাকি এসব নিয়ে কথা উঠেছে।'

করবী ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'কি কথা ?'

নিভাননী বলল, 'সে যাকগে। ওসব কথায় আমাদের কিছু এসে যায় না। নিজেরা বুঝেসুঝে চললে, কার সাধ্য কি বলতে পারে। বোঝ তো বউমা আমাদের মাথার ওপর পুরুষ অভিভাবক নেই। থাকার মধ্যে এক দিলীপ। সে তো নাবালক, ছেলেমানুষ। সংসারের কর্তা বললেও তুমি, কর্ত্রী বললেও তুমি। তোমার ওপরই মান সম্মান সব নির্ভর করছে।'

করবী গম্ভীরভাবে বলল, 'বেশ তো। অরুণবাবুকে এরপর থেকে নিষেধ করে দেব আর যেন তিনি এ বাড়িতে না আসেন। তাঁকে তো আর আমাদের দরকার নেই।'

শেষ কথাটায় বেশ একটু শ্লেষ ফুটে উঠল করবীর গলায়।

নিভাননী বললেন, 'ছিঃ আমি সে কথা বলছি নে। নিষেধ কেন করতে যাবে। অরুণের মত ছেলে হয় না। তার চাল-চলন স্বভাবচরিত্র এত সুন্দর যে, কেউ তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারবে না। তার সম্বন্ধে একটুও আমার আপত্তি নেই। শুধু নিজেদের একটু সমঝে চলা। পরেশ থাকতেও তো তার বন্ধুদের সঙ্গে সমানভাবে মিশেছ, কত চিঠিপত্র লিখেছ, আমি কি আপত্তি করেছি ? কেন করব ? যখন যেমন দিনকাল তখন সেভাবে চলতে হবে। তা ছাড়া সে নিজেই যখন এসব পছন্দ করত, আমি কেন বাধা দিতে যাব। কিন্তু এখন তো আর সেদিন নেই, এখন যে আমাদের কপাল একেবারে পুড়ে গেছে বউমা।' গলা আর্দ্র হয়ে উঠল নিভাননীর, চোখ দুটো ছল ছল করতে লাগল।

সন্ধ্যার পর অরুণ আজও এল খোঁজ নিতে। নিভাননীই এগিয়ে এসে সুখবরটা দিলেন, 'বউমার তো চাকরি হয়ে গেছে অরুণ, আজই জয়েন করেছে।'

অরুণ খুশী হয়ে বলল, 'তাই নাকি। ভালোই তো।' করবীর দিকে তাকিয়ে তরল-কণ্ঠে বলল, 'এত বড় খবরটা চেপে রেখেছেন কেন? খাইয়ে দিন, তারপর অফিসের আবহাওয়াটা কেমন লাগল বলুন।'

কিন্তু করবী আজ ও ধরনের আলাপে মোটেই যোগ দিল না। চা-ও করে আনল না, দু-এক মিনিট বাদেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না অরুণবাবু, শরীরটা ভাল লাগছে না, মাথা ধরেছে। আমি যাচ্ছি।'

অরুণ হেসে বলল, 'বলেন কি, প্রথম দিনই মাথা ধরল। ঘাবড়াবেন না, প্রথমদিন মাথা অমন এক-আধটু ধরেই, তারপর দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যায়। মাথা বলে যে ঘাড়ের ওপর কিছু আছে, তা টেরও পাওয়া যায় না।'

কিন্তু করবী আজ হাসল না। এসব লঘু পরিহাসের কোন জবাব দিল না। গম্ভীর শুকনো মুখে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

নিভাননী একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর অরুণকে বললেন, তুমি বসো। আমি চা করে আনছি।'

কিন্তু অরুণ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না না, চা আজ থাক। চা আমি একটু আগেই খেয়ে এসেছি।' বলে গম্ভীর মুখে অরুণও বেরিয়ে গেল।

নিভাননী মনে মনে ভাবলেন, একটুতেই রাগ হয়েছে বাছাদের। তা হোক গিয়ে। রাগ না লক্ষ্মী।

পাঁচটার পরে করবী সবে অফিসের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, চোখে পড়ল, একটু দূরে অরুণ তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সহকর্মী দুটি মেয়ে সঙ্গে ছিল। করবী তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অরুণের সামনে এসে দাঁড়াল, 'কি ব্যাপার, আপনি যে এখানে!'

অরুণ বলল, 'আপনার মাথাধরার খবর নিতে এলাম। মাথাটা কি আজ ছাড়ল, না ধরাই আছে! যদি না ছেড়ে থাকে চলুন এক কাপ চা খাই, মাথা ধরায় চা বেশ ভাল ওষুধ।'

করবী হেসে বলল, 'আর যদি ছেড়ে গিয়ে থাকে।'

অরুণ বলল, 'তা হলেও আমরা চা খেতে পারি। মাথাধরার পরেও চা-টা বেশ উপভোগ্য।'

করবী বলল, 'ধরলেও চা না ধরলেও চা। আপনার উচিত ছিল কোন চা কোম্পানীর প্রচার সচিবের পদ নেওয়া।'

অরুণ বলল, 'এই দেখুন, আমি যে কোন সচিবপদের যোগ্য একথা আপনি ছাড়া আর কারো মুখ থেকে শুনলুম না। এরপর থেকে আপনাকে নতুন নামে ডাকা উচিত। চারু-ভাষিণী না প্রিয়ংবদা—বলুন কোন্‌টা আপনার পছন্দ ?'

করবী হেসে বলল, 'কোনটাই নয়, ওর সবই তো পুরনো।'

অরুণ বলল, 'না আপনি বড়ই নেতিবাদিনী। নাম পুরনো হতে পারে কিন্তু প্রয়োগ তো নতুন, নাম্নী তো নতুনা।'

ট্রাম বাসে দারুণ ভিড়। উঠতে গেলে ঠেলাঠেলি করতে হবে। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এসপ্লানেডে এসে পৌঁছল। এখান থেকে পথ আলাদা। একজনের দক্ষিণে আর একজনের বামে।

অরুণ বলল, 'সত্যিই চা খাবেন না ?'

করবী বলল, 'চলুন। এবারও যদি না করি আপনি ফের একটা অপবাদ দেবেন।'

দুজনে চৌরঙ্গীর মোড়ের একটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকল। দোতলায় উঠে পশ্চিমদিকের জানালা ঘেঁষে একটি টেবিলে বসল মুখোমুখি। বয় এসে দাঁড়াতেই অরুণ বলল, 'দুটো ভেজিটেবল চপ আর চা।'

দুজনেরই আর একদিনের চা খাওয়ার কাহিনী মনে পড়ল। করবী বলল, 'কিন্তু আপতি তো মাংসের কিছু নিলেই পারতেন।'

অরুণ বলল, 'এক যাত্রায় পৃথক ফল কি হয়। আপনি তো নিরামিষ ছাড়া কিছু খাবেন না।'

করবী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তা নাই বা খেলাম। খাওয়াতে তো পারি। জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই পৃথক ফলকে মেনে নিতে হয়।'

অরুণ বলল, 'কিন্তু যদি না মানা যায় তাতেই বা কি ক্ষতি।'

করবী এবার কোন জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে চামচ দিয়ে এক টুকরো চপ ভেঙে নিল।

অরুণ করবীর দিকে তাকাল। কুমারীর সিঁথির মতই ওর সিঁথি সাদা। পরনে চওড়া কালো পেড়ে সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি। হাতে দুগাছি চুড়ি। গলায় চিক্ চিক্ করছে সরু একছড়া হার। মানিয়েছে। মনেই হয় না করবীর বিয়ে হয়েছিল, সে বিধবা। ওর বয়সে অনেক মেয়েই তো এখনকার দিনে অবিবাহিতা থাকে। সারা জীবনের জন্যে ভবিষ্যতের দ্বার করবীর কাছেই কি রুদ্ধ হয়ে গেল ? সে দ্বার কি নতুন করে খুলে দেওয়া যায় না ?

করবী বলল, 'ওকি ডেকে এনে আপনি যে হাত উঁচু করে বসে রইলেন। খাচ্ছেন

না কিছু ? কি দেখছেন চেয়ে চেয়ে, রাস্তার লোকজন ?'

অরুণ বলল, 'না লোকজন নয়, দেখুন কি চমৎকার রঙ হয়েছে আকাশের। এমন রঙ তো রোজই হয়, কিন্তু রোজই এমন করে চৌরঙ্গীতে কাটানোর সময় হয় না। চার দেয়াল ঘেরা অফিস ঘরে ফাইলের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকি।'

করবী বলল, 'আপনার বুঝি খুব আফসোস হয় ?'

অরুণ বলল, 'কেন, আপনার হয় না ?'

করবী মাথা নেড়ে বলল, উঁহু। রোজ বিকেলে আকাশের নীচে দাঁড়ালেই কি তার রঙ আপনার চোখে ধরা পড়ত ? আর রোজ যদি জোর করে নিয়ম বেঁধে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন সে দেখাও হত অভ্যাসের দেখা। তার চেয়ে এই অনভ্যাসের দেখা ভাল।'

অরুণ বলল, 'মানে আপনি বলতে চান, অনেকদিনের না দেখার আফসোসে দু-একদিনের দেখার আকাশে বেশি করে রঙ ধরে।'

করবী হেসে বলল, 'না ওভাবে আমি বলতে চাই নে। কারণ হাজার চেষ্টা করলেও আপনাদের মত কবিত্ব আমি করতে পারব না। আপনিও বুঝি কবিতা লিখতেন ?'

বলেই করবীর মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। অনেকদিন বাদে মনে পড়ল, স্বামী পরেশের কথা। সে কবিতা লিখত।

অরুণ করবীর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করল কিন্তু কারণ কিছুই বুঝতে পারল না। বলল, 'কি হল আপনার ?'

করবী বলল, 'না কিছুই হয় নি। ভাল কথা, ওঁর সেই বইটা কি বিক্রি-টিক্রি হচ্ছে ? অনেকদিন কোন খোঁজ নেওয়া হয় না।'

এবার অরুণ বুঝতে পারল। কবিতা লেখার প্রসঙ্গে স্বামীর কথা করবীর মনে পড়েছে। তেমন যেন প্রসন্ন হল না অরুণ। বলল, 'বাঃ খোঁজ নিচ্ছি বই কি। কিন্তু জানেনই তো কবিতার বইয়ের বিক্রি তেমন বেশি নয়। আমার সেই পাবলিশার বন্ধু চেষ্টার কোন ক্রটি করছে না। চলুন না একদিন তার ওখানে ?'

করবী বলল, 'আমি ? আমি গিয়ে কি করব ?'

অরুণ বলল, 'কেন, খোঁজখবর নিয়ে আসবেন।'

করবী একটু হাসল, 'আপনি রাগ করে বলছেন। খোঁজখবর নেওয়ার ভার তো আপনার ওপর। আমি কি আপনার চেয়ে বেশি খোঁজ নিতে পারব ?'

অরুণ লজ্জিত হয়ে বলল, 'তা নয়। তবু আপনি মাঝে মাঝে গেলে ভাল লাগে। বিনয়ও বলেছিল একদিন আলাপ করার কথা।'

করবী বলল, 'বেশ তো যাব একদিন।'

অরুণ বলল, 'একদিন না, কালই চলুন। কাব্য সাহিত্যের ওপর পরেশবাবুর তো কিছু প্রবন্ধও রয়েছে। সেগুলি নিয়েও তো একটা বই হতে পারে।'

করবী উৎসাহিত হয়ে বলল, 'তা তো পারেই। কিন্তু কে ছাপবে বলুন, আমার নিজের তো আর সামর্থ্য নেই।'

অরুণ বলল, 'ওই বিনয়ই ছাপবে। ও প্রবন্ধের বই মাঝে মাঝে বের করে। আমার তো মনে হয় পরেশবাবুর লেখা ওর ভাল লাগবে। আমাদের উচিত লেখাগুলি এখনই বুক ফর্মে ধরে রাখা। না হলে পরে হয়তো হারিয়ে যাবে। তাহলে কালই চলুন, কেমন? ছুটির পর কাল আপনার সঙ্গে ঠিক এই সময় আমি দেখা করব। তারপর দুজনে মিলে—'

দুজনে মিলে কথাটার মধ্যে যেন একটু উৎসাহ প্রকাশ পেল অরুণের।

করবী একবার তার দিকে তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল।

অরুণের মনে হল, আকাশের রঙের ছোপ করবীর মুখে এসেও লেগেছে।

একটু বাদে করবী বলল, 'চলুন, এবার ওঠা যাক্।'

অরুণ বলল, 'চলুন।'

ট্রামে করে বাসায় ফিরতে ফিরতে সেই দুজনে মিলে কথাটা করবীর কানে বাজতে লাগল। যেন বই ছাপার ব্যাপারটা উপলক্ষ। আসল কথা এই দুজনে মেলা। অরুণ কি তাহলে এই উদ্দেশ্য নিয়েই রোজ আসে, তার সঙ্গে দেখা করে? তার লক্ষ্য আর কিছু নয়, শুধু দুজনের মিলন? কিন্তু ছি, এসব কি ভাবছে করবী? অরুণের মত অমন হিতৈষী বন্ধুর সম্বন্ধে এসব মনে করাও অশোভন, অসঙ্গত। অরুণ তো তার কম উপকার করে নি। পরিচয় হওয়ার পর থেকে নানা আপদে বিপদে তাকে সাহায্য করেছে। এমন কি, তারই আগ্রহে উৎসাহে পরেশের কবিতার বই ছাপা হয়ে বেরোতে পেরেছে। অরুণের কাছে চিরজীবনের জন্যে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত করবীর।

অবশ্য একথা ঠিক, করবীর সান্নিধ্য তাকে আনন্দ দেয়। অরুণ তার সঙ্গে কথা বলতে, আলাপ করতে, এক সঙ্গে বেড়াতে ভালবাসে। তাতে দোষ কি, অরুণ যদি বন্ধু না হয়ে করবীর বাপের বাড়ি কি শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে কোন আত্মীয়ই হত তাহলে তো মেলামেশায় কোন দোষ থাকত না। সত্যি, এমন সদালাপী সুহৃদ করবীর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও নেই। নানা চিন্তা ভাবনায়, বিষাদ নৈরাশ্যে মন যখন ভেঙে পড়ে, অরুণ এলে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও সে কথা ভুলে যায় করবী। মনে যেন নতুন উৎসাহ আসে করবীর, কাজে নতুন

উদ্দীপনা। একথা তো অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু স্বীকার করতেই বা দোষ কি, স্বীকার করতেই বা ভয় কি। আত্মীয় না হোক্, আত্মীয়ের মত, বন্ধু না হয় তার রইলই।

ট্রাম-স্টপেজে নেমে মোড়ের দোকান থেকে দুটি কমলালেবু কিনল করবী। বাসায় এসে দেখল ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

করবী শাশুড়ীকে বলল, 'পিপলু যে আজ এত সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে?'

নিভাননী বললেন, 'সকাল সকাল কই। এই সময়ই তো ঘুমোয়। একটু আগে মার কাছে যাব, মার কাছে যাব বলে কি কান্না। তোমার যে এত দেরি হল।'

করবী হঠাৎ বলে ফেলল, 'অফিসে কাজের চাপ ছিল।'

পরক্ষণেই মনে মনে ভাবল, ছি ছি এমন একটা মিথ্যে কথা কেন সে বলতে গেল। তার মনে যদি কোন ভয়ই না থাকবে তাহলে সে সত্য গোপন করতে গেল কেন। করবী নিজের মনকে যুক্তি দেখাল, ভয় তো করবীর নয়, ভয় নিভাননীর। তিনি পাছে ভয় পান, তিনি পাছে অনর্থক উদ্বেগ বোধ করেন সেইজন্যেই কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলেছে করবী, আর কোন কারণে নয়।

ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত ছেলের কপালে আলগোছে চুমো খেল করবী, কমলা দুটো রেখে দিল পাশে। তারপর স্বামীর ফটোর দিকে তাকাল। অনেকদিন আগের একটা মালা শুকিয়ে রয়েছে ফ্রেমের ওপর। ছি ছি ছি কতদিন ধরে নতুন মালা দেওয়া হয় না ওঁর ফটোয়। কি করে দেবে। এতদিন ফুলের দিকে লক্ষ্য ছিল নাকি করবীর। পয়সা ছিল নাকি ফুল কিনবার। কিন্তু চার পয়সায় ফুলও কি কিনতে পারত না। ফুল তিনি কত ভালোবাসতেন। কতদিন একসঙ্গে ফুল কিনে দুজনে মিলে বাড়ি ফিরেছে।

দুজনে মিলে! আর একজনের কথা মনে পড়ল করবীর, আর একজনের মুখ মনে পড়ল। কিন্তু জোরে জোরে মাথা নেড়ে মন থেকে তার চিন্তা যেন ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল করবী। না, এখন আর কেউ নয়, কোন আত্মীয় নয়, এখন শুধু সে আর স্বামী। নাই বা রইল সে কাছে, নাই বা রইল ঘরে। করবীর মন থেকে তো কেউ তাকে সরিয়ে নিতে পারবে না! মনের মধ্যে তো সে চির-অক্ষয়, চির-জীবন্ত। কালই আসবার পথে ফুলের মালা কিনে আনবে করবী, আনবে রজনীগন্ধার তোড়া। রজনীগন্ধা ভারি ভালোবাসত পরেশ। ফুলদানীটা কোনদিনই খালি থাকত না।

রাত্রে জলখাবার খেয়ে ঘরে বসে স্বামীর পুরনো লেখাগুলি খুলে নিয়ে বসল করবী। এর থেকে বেছে বেছে কয়েকটা প্রবন্ধ নিয়ে বেশ একখানা বই করা যাবে। অরুণ নিজেই যখন উপযাচক হয়ে বলেছে, এ সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়।

একটু বাদে নিভাননী এসে দোরের কাছে দাঁড়ালেন, 'এত রাত জেগে কি করছ। সারাদিন খেটে খুটে এসেছ, যাও এখন শুয়ে ঘুমোও গিয়ে। ওগুলি আবার কি বের করেছ?'

করবী বলল, 'ওঁর লেখা, ভেবেছি একটা প্রবন্ধের বই বার করব।'

নিভাননী ঘরে ঢুকে পুত্রবধূর পাশে বসলেন। একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ঘরের টাকা খরচ করে বই ছেপে আর কি হবে বউমা? বিক্রী যখন হয় না।'

করবী শাশুড়ির দিকে তাকাল, 'বিক্রি হওয়াটাই বুঝি সব? আজ বিক্রি না হয় দুদিন পরে হবে। ওঁর লেখার কদর একদিন লোকে করবেই।' তাছাড়া অরুণবাবু বললেন, ঘরের টাকা খরচ করতে হবে না মা। ওঁর সেই পাবলিশার বন্ধুই নিজের খরচে এ বই ছেপে বের করতে পারেন।

নিভাননী একটু যেন চমকে উঠলেন, 'অরুণ! অরুণের সঙ্গে তোমার আবার কোথায় দেখা হল। সে তো আজ এখানে আসে নি।'

করবী একটু অপ্রতিভ হল। কিন্তু এবার আর মিথ্যে কথা বলতে চেষ্টা করল না। অরুণের সঙ্গে তার যদি দেখা হয়ে থাকে, কথা হয়ে থাকে, স্বামীর বইয়ের প্রসঙ্গেই হয়েছে।

করবী বলল, 'না এখানে নয়, ছুটির পর আমাদের অফিসের কাছেই তিনি এসেছিলেন। তখন এই বইয়ের কথা উঠল।'

নিভাননী বললেন, 'ও, কিন্তু একটু আগে তো তুমি এসব কথা কিছু বললে না বউমা। তখন যে বললে অফিসের কাজে—'

করবী রুক্ষস্বরে বলল, 'হ্যাঁ অফিসের কাজও ছিল, আবার এ কাজও ছিল। সব সময় সব কথা মানুষের মনে থাকে নাকি। আপনি যদি কথায় কথায় এমন কৈফিয়ত তলব করেন, অবিশ্বাস করেন তাহলে তো ঘরের বারই হওয়া যায় না।'

নিভাননী আহত হয়ে বললেন, 'ছিঃ এসব তুমি কি বলছ বউমা। এর মধ্যে কৈফিয়ত তলবেরই বা কি আছে, অবিশ্বাসেরই বা কি আছে। তুমি আমাকে এত বড় একটা কথা বললে। আমি কোন কথা বললেই তুমি আজকাল অমন কর। নিতান্তই পোড়াকপাল। নইলে শেষে কিনা বউয়ের রোজগারের ভরসায় থাকতে হয়। মানুষের সব যায়, কিন্তু পেটের জ্বালা যে যায় না।'

নিভাননীর গলা ধরে উঠল, চোখ দুটো ছল ছল করতে লাগল।

করবী বিব্রত বোধ করে বলল, 'আমাকে মাপ করুন মা। আমি ওসব ভেবে বলি

নি। আমি কি আপনার পর যে, আপনি ওসব কথা তুলছেন? আপনার যদি আর একটি রোজগেরে ছেলে থাকত, আমার মত আর একটি মেয়ে থাকত, তাহলে সেও কি চাকরি করত না? তার টাকা কি আপনি না নিয়ে পারতেন? এখন বাধ্য হয়েই আমাকে কাজে বেরোতে হচ্ছে। দুদিন পরে দিলীপ যখন উপযুক্ত হবে, পিপলু যখন বড় হবে, যখন রোজগার করবে, তখন তো আর এত কষ্ট করতে হবে না। ওরাই তো আমাদের আশা ভরসা। যান শুয়ে বিশ্রাম করুণ গিয়ে।'

অনেক রাত্রে করবীর ঘরে আলো জ্বলতে দেখে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। 'ও কি বউমা, এত রাত অবধি জেগে জেগে করছ কি? শরীর খারাপ করবে যে।'

কোন জবাব না পেয়ে নিভাননী ফের এসে করবীর ঘরে ঢুকলেন। তক্তপোশের ওপর করবী বিভোরে ঘুমুচ্ছে। আর পরেশের লেখা প্রবন্ধের ফাইলটা তার হাত থেকে খসে পড়ে লুটোচ্ছে মাটিতে।

নিভাননী মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে কি দেখলেন। তারপর ফের একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ছেলের লেখাগুলি কুড়িয়ে তুলে রাখলেন টেবিলের ওপর। তারপর সুইচটা অফ্ করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমন্ত নাতিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন।

পরদিন অফিসে গিয়ে করবী স্থির করল অরুণের সঙ্গে আজ আর সে পাবলিশারের দোকানে যাবে না। তাকে বলবে অরুণ নিজেই আগে যাক, প্রবন্ধের বইটি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলুক, তারপর তিনি যদি বই ছাপতে রাজী হন, তখন একদিন না হয় করবী অরুণকে সঙ্গে নিয়ে তার পাবলিশার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করবে। আজ করবী সকাল সকাল বাড়ি ফিরবে। স্বামীর ফটোতে দেওয়ার জন্য ফুলের মালা কিনবে, আসবার সময় পিপলু লজেন্সের বায়না ধরেছিল, লজেন্স কিনে নিয়ে যাবে তার জন্যে। আজ আর সে অন্য কোথাও বেরোবে না।

পাঁচটার আগে আগেই অফিস থেকে বেরোল করবী। দু-চার পা এগুতেই দেখল রাস্তা পার হয়ে অরুণও এদিকে আসছে। করবী কিছু বলবার আগেই অরুণ বলল, 'আপনি অপেক্ষা করে থাকবেন তাই খবরটা দিতে এলাম। আজ আমাদের বিনয়ের ওখানে যাওয়া হবে না।'

করবীও না যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেছিল। কিন্তু সে কথা গোপন করে কৌতূহলের ভঙ্গিতে বলল, 'কেন বলুন তো। হঠাৎ আপনার মত বদলাবার কি কারণ ঘটল। বিনয়বাবুর ওখানে গিয়ে কোন সুবিধে হবে না মনে করছেন বুঝি?'

মৃদু হাসল করবী।

কিন্তু অরুণ হাসল না। ওর মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর।

অরুণ বলল, 'না তা নয়, বিনয়ের সঙ্গে যোগাযোগের কোন সুযোগই করে উঠতে পারি নি। সকাল থেকেই মনটা বড় উদ্বিগ্ন রয়েছে।'

করবী বলল, 'কেন বলুন তো ?'

অরুণ বলল, 'আমার ভাই আছে আর, জি, কর হাসপাতালে। তাকে দেখতে যেতে হবে।'

করবী বলল, 'কি হয়েছে আপনার ভাইয়ের ?'

অরুণ একটু ইতস্তত করে বলল, 'কাল রাত্রে দত্তবাগানের কাছে গুণ্ডার ছুরিতে সে আহত হয়েছে। রাস্তার লোক ধরাধরি করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে। আমি সোজা সেখানেই যাব।'

করবী আঁৎকে উঠে বলল, 'কি সাংঘাতিক ব্যাপার। এখন অবস্থা কেমন ?'

অরুণ বলল, 'ঠিক করে বলা যায় না। যতদূর শুনেচি আঘাতটা মারাত্মকই, ডান দিকের কাঁধের একটু নীচে লেগেছে।'

ট্রাম লাইন পর্যন্ত করবী অরুণকে এগিয়ে দিতে এল।

অরুণ ট্রামে উঠতে গিয়ে হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা এক কাজ করুণ না। আপনিও আমার সঙ্গে আসুন, তারপর যদি ওকে একটু ভাল দেখি ফেরার পথে পাবলিশারের দোকান হয়ে আসা যাবে।'

করবী বলল, 'পাবলিশারের দোকান-টোকান আজ থাক অরুণবাবু। ভাই সুস্থ হয়ে উঠুন তারপর ওসব দেখা যাবে। চলুন আপনাকে বরং এগিয়েই দিয়ে আসি। আপনি যেমন নার্ভাস হয়ে পড়েছেন—'

অরুণ বলল, 'না না নার্ভাস হব কেন। নার্ভাস হই নি। তবে—'

তবু করবী তার সঙ্গে আসায় অরুণ খুশীই হল। অতুলের সঙ্গে করবীর পরিচয় নেই। কদাচিৎ দু একবার অরুণের মুখে সে অতুলের নাম শুনে থাকবে, কিন্তু অরুণের উদ্বেগে যে করবীও উদ্বিগ্ন হয়েছে সহানুভূতির ছোঁয়া লেগেছে তার মনে তা বুঝতে পেরে অরুণ তৃপ্তি বোধ করল। বেলগেছিয়াগামী ট্রামে লেডিজ সিট মার্কা একটা বেঞ্চে দুজনে বসল পাশাপাশি।

করবী বলল, 'আপনার এই ভাইয়ের কথা এর আগে আমাকে কখনো বলেন নি। কার কথাই বা বলেছেন !'

অরুণ বলল, 'না কারো কথাই বলি নি। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে আমার

সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ নয়। সব চেয়ে দূরের সম্পর্ক আমার আপন ভাই অতুলের সঙ্গে। আমাদের দুজনের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা রুচি প্রকৃতিতে কিছুমাত্র মিল নেই। আমি ভাবতাম সেইজন্যে বুঝি স্নেহ সহানুভূতির অভাব আছে। ভেবেছি ওর বিপদে আমার কিছু এসে যায় না।'

করবী বলল, 'তাই কি আর হয়। শত হলেও আপন ভাই তো তিনি আপনার। দেখুন একজনের সম্বন্ধে আর একজনের স্নেহ ভালোবাসা মনের কোথায় যে লুকিয়ে থাকে তা অনেক সময় টের পাওয়া যায় না। কিন্তু হঠাৎ এক এক সময় তা জানান দেয়।'

অরুণ বলল, 'একথা জানা আর এমন কি। এ ধরনের সাধারণ অভিজ্ঞতা সকলের জীবনেই দু-একবার হয়!'

যেতে যেতে অতুলের আরও অনেক কাহিনী করবীর কাছে বলতে লাগল অরুণ। একমাত্র পড়াশুনোতেই ওর ভয়, তা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে ভয় কাকে বলে ও জানে না। ওর দুঃসাহসের অন্ত নেই। দাঙ্গার সময় ভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেকে ওর হাতে জখম হয়েছে, আবার বস্তীর অনেক বিপদাপন্ন নারী আর শিশুকে ও আশ্রয়ও দিয়েছে। পাড়াপড়শীর শাসন তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপ করে নি। তখনকার দিনের অনেক লাঠি ছোরার আঘাতের দাগ লক্ষ্য করলে ওর গায়ে এখনো হয়ত দু- একটা মেলে। আর একবার দুর্ধর্ষ এক খুনি ডাকাতের পিস্তলসুদ্ধ হাত ও চেপে ধরেছিল। থানা থেকে পঁচিশ টাকা পুরস্কার দিতে এসেছিল ওকে। সে পুরস্কার ও নেয় নি। বলেছিল, 'ও টাকা আপনাদের জমাদারদেরই ভাগ করে দিন গিয়ে। আমার ওতে দরকার নেই। আমি যা করেছি পুরস্কারের লোভে করিনি।'

করবী জিজ্ঞেস করল, কিন্তু এই দুর্ঘটনা ঘটল কি করে? কারো সঙ্গে কি ওঁর কোন শত্রুতা ছিল?

এমন চরম শত্রু যে ওর কে তা অরুণ ভাল করে জানে না তবে মেজাজ তো অতুলের ভাল নয়। অনেকের সঙ্গেই ওর রাগারাগি চটাচটি দিনের মধ্যে বহুবার হয়ে থাকে। দু-চারবার চড় ঘুষির বিনিময়ও যে না হয় তা নয়। কিন্তু ওকে খুন করে ফেলতে চেষ্টা করবে এমন মারাত্মক শত্রু যে কে তা অনুমান করা শক্ত! খানিকটা দূরের একটা বিড়ির দোকানের ছোকরার মুখ থেকে ঘটনার কিছু কিছু জানা গেছে। রাত সাড়ে দশটা এগারটায় দ্রুত সাইকেল চালিয়ে আসছিল অতুল। হঠাৎ দুজন কালো জোয়ান মত লোক ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে সাইকেল থামিয়ে দিয়ে বলল, 'লোকের গায়ের ওপর দিয়ে সাইকেল চালাও, ইয়ার্কি পেয়েছ নাকি?'

অতুল বিস্মিত হয়ে বলেছিল, 'তোমরা বা কোথায় ছিলে আমি বা কোথায়? সাইকেল কি বাতাসে তোমাদের গায়ে গিয়ে উড়ে পড়ল! আমার সাইকেল ছেড়ে দাও। যেতে দাও আমাকে।'

বলে সামনের লোকটিকে একটি ধাক্কা দিয়েছিল অতুল। আর সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোকই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, 'এত বড় আস্পর্দা! আমাদের গায়ে হাত তুলিস তুই?'

আর্ত চীৎকারে বিড়ির দোকানের ছোকরাটি যখন ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল, তখন সেই দুজন লোক সরে পড়েছে। আর রক্তাক্ত সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ঝোপের ধারে পড়ে আছে অতুল। চীৎকার চেঁচামেচি শুনে আশে পাশের অনেকেই তখন সেখানে গিয়ে ভিড় জমিয়েছিল। কিন্তু আততায়ীদের কোন সন্ধান মেলেনি। পুলিসে ডায়ারী করা হয়েছে। খোঁজ খবর নিয়ে যতদূর জানা গেছে লোক দুটি ভাড়াটে গুণ্ডা। অতুলের সঙ্গে তাদের নিজেদের কোন শত্রুতা ছিল না। টাকার বিনিময়ে তারা অন্যের শত্রুতার শোধ নিয়েছে। হাসপাতালের সামনে ট্রাম এসে থামল। কম্পাউণ্ডের ভিতর ঢুকে এগিয়ে করবী হঠাৎ থেমে দাঁড়াল, 'আপনি গিয়ে দেখে আসুন আপনার ভাইকে, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।'

অরুণ বলল, 'না না, আপনিও চলুন।' করবী ইতস্তত করে বলল, 'তার চেয়ে আমি বরং এখানে অপেক্ষাই করি। আপনাদের বাড়ির অন্য সব আত্মীয়-স্বজনও নিশ্চয়ই এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই। তাঁরা হঠাৎ আমাকে দেখলে কি মনে করবেন!'

অরুণ একটু ইতস্তত করল। তাই তো। একথা সে ভাবেনি। কিন্তু পরমুহূর্তে সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'তাতে কি হয়েছে। পরিচয় নেই, পরিচয় হবে। ওদের সঙ্গে আপনাকে পরিচিত করাবার দায়িত্ব আমার! আর যদি ততখানি ভরসা আমার ওপর আপনার না থাকে নিজের পরিচয় কি আপনি নিজেই দিতে পারবেন না? আসুন আপনি।'

দোতলায় সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের একটি রুমে গিয়ে দুজনে ঢুকল। করবীর অনুমান সত্যিই। অরুণের বাবা মা কাকা কাকীমা সবাই এসে অতুলের বেডের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অতুল সারা বিছানা জুড়ে পড়ে রয়েছে। খানিকটা জ্ঞান ফিরে এসেছে আজ। জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে ভুল বকছে।

অরুণরা ঘরে ঢুকতেই বাসন্তী তাদের দিকে তাকালেন। এ মেয়েটি আবার কে! সেই করবী। মেয়েটির রূপ আছে বটে। কিন্তু রূপ যেমন আছে

তেমন তো ওর নিজের ঘর সংসার আছে, ছেলে আছে। এত সব থাকতেও তাঁর ছেলের পিছু নিয়েছে কেন। রূপ থাকলে কি মানুষের আর কোন বিচার বিবেচনা থাকতে নেই ?

ছেলের দিকে চেয়ে বাসন্তী বললেন, 'এতক্ষণে ছুটি হল তোর ?'

বাসন্তীর হয়ে অবনীমোহনই জবাব দিলেন, 'বিপদের আশঙ্কা একেবারে কাটে নি। তবে সকালের চেয়ে অনেকটা ভাল।'

তিনিও একবার করবীর দিকে চেয়ে দেখলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। নিজের ভাইয়ের যখন জীবন-মৃত্যুর আশঙ্কা সে সময়ে বান্ধবী ছাড়া অরুণের চলল না। ছেলের এই নির্লজ্জতায় অবনীমোহনও মনে মনে অপ্রসন্ন হলেন।

অরুণ বুঝতে পারল করবীকে সবাই ওঁরা চিনেছেন। অন্তত মনে মনে আন্দাজ করে নিয়েছেন। করবী তাদের বাড়িতে না গেলেও, একটি সুন্দরী তরুণী বিধবার সঙ্গে অরুণের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তাকে বিপদে-আপদে সাহায্য করে, একথা পরিবারের কারোরই আর জানতে বাকি নেই। তবু প্রকাশ্যভাবে সকলের সঙ্গে করবীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু বলি বলি করেও অরুণ যেন হঠাৎ কিছু বলে উঠতে পারল না। এই সময় হাসপাতালের ঘণ্টা পড়ল। আর পাঁচ মিনিট রোগীর কাছে তার আত্মীয়-স্বজনেরা থাকতে পারে।

'চল বড়দি, আর কেন এবার ওঠা যাক।'

'অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ? আরও তো মিনিট পাঁচেক সময় আছে।'

গোবিন্দ আর রমা। অতুলের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ওরাও এসেছে। অতুলের আত্মীয়দের কাছ থেকে একটু দূরে বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে রোগীর যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। এতক্ষণে ওদের অস্তিত্ব যেন ভুলে ছিলেন বাসন্তী। এবার রমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফের চোখ ফিরিয়ে নিলেন। করবীও তার এই প্রায় সমবয়সী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখল। মেয়েটি স্থির দৃষ্টিতে অতুলের দিকে চেয়ে রয়েছে। খয়েরী রঙের একখানা সস্তা শাড়ি পরনে। সিঁথিতে সিঁদুরের অস্পষ্ট আভাস দেখে সধবা বলেই চেনা যায়। কে এই মেয়েটি ? অতুলদের সঙ্গে এর সম্পর্কই বা কি ? করবীর মনে মনে একটু কৌতূহল না হয়ে পারল না। আর একবার ঘণ্টা বাজল। বাসন্তী টুলটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দরজার দিকে পা বাড়ালেন সবাই। করবী এবারও লক্ষ্য করল বেরুবার আগে সেই মেয়েটি অতুলের দিকে আর একটু এগিয়ে গেল। আর একবার নির্নিমেষে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখল। তারপর আস্তে আস্তে চলে বেরিয়ে এল।

বাইরে নেমে করবী বাসন্তীকে দেখিয়ে বলল, 'উনিই বুঝি আপনার মা ?'

অরুণ লজ্জিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ। চলুন এবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'

করবী বলল, 'থাক না। ওঁরা হয়ত বিব্রত বোধ করবেন। আর সবচেয়ে বেশি বিব্রত হবেন আপনি।'

অরুণের আত্মসম্মানে খোঁচা লাগল এবার। বলল, 'বাঃ, বিব্রত হওয়ার কি আছে।'

দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বাসন্তীর মনোযোগ আকর্ষণ করল অরুণ, 'মা, ইনিই করবী, করবী বসু। এঁর কথা অনেকবার তোমাকে বলেছি।'

করবী নিচু হয়ে প্রণাম করতে যেতেই বাসন্তী তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে ফেললেন, 'হ্যাঁ, আপনার কথা অরুণ কয়েকদিন বলেছে।'

করবী বলল, 'আপনি বলছেন কেন মা? আমি তো আপনার মেয়ের বয়সী। আমাকে তুমিই বলবেন। অরুণবাবু আমার কথা সব আপনাদের বলেছেন, কিন্তু আপনাদের কথা সব গোপন করে গেছেন। আমি তাই নিজেই এলাম আলাপ করতে।'

খুব তো বিনয় আছে মেয়েটির, আর কথা বলবার ভঙ্গিটি তো ভারি সুন্দর। গলায় স্বরটুকু তো বেশ মিষ্টি, খানিকক্ষণ আগের বাসন্তীর অপ্রসন্নতা যেন অনেকটা প্রশমিত হয়ে এল, আর ভারি চমৎকার সুগঠিত ছোট ছোট যুঁই ফুলের মত দাঁতের সার। হাসলে সুন্দর মানায়। বাসন্তী করবীর কথার জবাবে বললেন, 'গোপন তো করবেই। বাড়ির বাইরে গেলে আমাদের কারো কথা ওর মনে থাকে নাকি!'

করবী বলল, 'আসল কথা নয়, ওঁর ধারণা নিজেদের বাড়িঘরের কথা বাড়ির বাইরের কাউকেই বলতে নেই।'

একে একে অন্য সকলের সঙ্গেও করবীর পরিচয় করিয়ে দিলেন বাসন্তী। তারপর অতুলের কথায় ফিরে গিয়ে বললেন, 'বড় অশান্তিতে আছি মা। ডাক্তার আজ ভরসা দিয়ে গেছেন তাই তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারছি। এই ছেলে নিয়ে মহা জ্বালা হয়েছে আমার। এই সব অপঘাতেই একদিন ও শেষ হবে।'

করবী বলল, 'কি যে বলেন। পুরুষ ছেলের বিপদ আপদ এমন ঘটেই।'

অতুলের সম্বন্ধে করবীর পুরুষ ছেলে বিশেষণ প্রয়োগটা অরুণ লক্ষ্য না করে পারল না।

শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত হেঁটে এসে একই ট্রাম ধরল সবাই। রমারাও আসছিল পিছনে পিছনে। একই বেঞ্চে করবী তার পাশে গিয়ে বসল। বলল, 'কই, আপনার

সঙ্গে তো পরিচয় হল না ?'

'আমার নাম রমা।'

করবী বলল, 'রমা চন্দ ? আপনি কি ওঁদের আত্মীয় ?'

রমার মুখ একটু আরক্ত দেখাল। 'আজ্ঞে না। রমা চ্যাটার্জি। সম্পূর্ণ অনাত্মীয়। আমার ভাই অতুলের সহপাঠী বন্ধু। তাই দেখতে এসেছিলাম।'

করবী বলল, 'ও।'

মনে মনে ভাবল, কিন্তু যেভাবে তুমি দেখলে তা তো শুধু ভাইয়ের বন্ধুকে দেখা নয়। মীর্জাপুরে এসে বাসন্তীরা সবাই নামলেন। করবীকেও নেমে তাঁদের বাসাটা দেখে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু করবী রাজী হল না। বলল, 'আজ থাক। আর একদিন আসব।'

অরুণ বলল, আর একদিন কেন। আজই চলুন না। ফেরবার সময় বরং এগিয়ে দিয়ে আসা যাবে।'

করবী মৃদু হেসে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

তারপর বাসন্তীর দিকে সবিনয়ে বলল, 'আর একদিন আসব। আজ রাত হয়ে যাচ্ছে। কালও অফিস থেকে ফিরতে দেরি হওয়ায় ছেলে বড় কান্নাকাটি করেছিল। আজ তাকে বলে এসেছি তাড়াতাড়ি ফিরব। না দেখলে আজও হয়ত ওর ঠাকুরমাকে বিরক্ত করবে।'

ছেলের ওপর করবীর এত দরদ দেখে নিজের ছেলের সম্বন্ধে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন বাসন্তী। তাহলে মেয়েটির সম্বন্ধে তিনি যে ভেবেছিলেন তা সে নয়। করবীর দিকে তাকিয়ে এবার তিনি সস্নেহে বললেন, 'তাহলে আর তোমাকে দেরি করতে বলব না। কিন্তু কথা দিয়ে যাও ছেলেকে নিয়ে আর একদিন আসবে।'

করবী স্মিতমুখে সম্মতি জানাল, 'আচ্ছা আসব।'

করবীদের সংসারে এবার খানিকটা শান্তি আর স্বাচ্ছন্দ্য আসবার কথা।

চাকরির দিক থেকে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে করবী। মাইনে যা পাবে তাতে সংসার খরচা মোটামুটি চলে যাবে। দেনাদায়গুলিও ধীরে ধীরে মিটিয়ে দিতে পারবে। এখন কোনরকম অশান্তি থাকার কথা নয়। তবু অশান্তির যেন আর অন্ত ছিল না। শাশুড়ীর আর দেওরের সঙ্গে সামান্য কারণ নিয়ে খিটিমিটি লাগা যেন নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মনান্তর নিয়ে খুব জোর গলায় ঝগড়া হয় না। তবু মনের অমিলটা বোঝা যায়। কেউ যে কারো ওপর প্রসন্ন নয়, নেহাতই বাধ্য হয়ে এক বাড়ীতে রয়েছে, তা টের পেতে কারো আর বাকি নেই। করবী লক্ষ্য করেছে নিভাননী তার

সঙ্গে প্রায় কথাই আর আজকাল বলতে চান না। দিলীপের মারফতই কাজকর্ম সারেন। এমন কি ফিরতে একটু দেরি হলে দিলীপই এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, 'বউদি, এত রাত করলে কেন?' কোনদিন করবী জবাব দেয়, 'দরকার ছিল।' কোনদিন বা বলে, 'তুমি ছেলেমানুষ, তোমার এত কথায় কাজ কি। যাও, পড়াশুনো কর গিয়ে।' কিন্তু ছেলেমানুষ সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় না। খানিকক্ষণ উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে করবীর মুখের দিকে, তারপর দ্রুত পায়ে তার সামনে থেকে সরে যায়।

মাঝে মাঝে ভারি দুঃসহ লাগে, অত্যন্ত নীরস মনে হয় জীবন। স্নেহ নেই, প্রীতি নেই, মায়া নেই, কেবল কর্তব্য আর কর্তব্য। ভেবে আতঙ্ক হয় এই শুষ্ক কর্তব্যের বোঝা সারা জীবন করবী বয়ে বেড়াবে কি করে। একথা মনে হওয়ায় দৈনন্দিন অফিসের কাজকেও একঘেয়ে লাগে করবীর।

সমস্ত মনটা উন্মুখ হয়ে থাকে ছুটির জন্যে। ছুটির পরে প্রায় রোজই এসে অরুণ তার জন্যে অপেক্ষা করে। এই দেখা সাক্ষাত যেন নিয়মিত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের। কিন্তু এ অভ্যাসে ক্লান্তি নেই। তা ছাড়া রোজ ঠিক এক জায়গায় তারা যায় না, এক ধরনের আলাপ করে না। গল্প করতে করতে গঙ্গার ঘাটগুলি তারা পরিক্রমা করে। কোনদিন বা কোন একটা রেষ্টুরেণ্টে ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়ে দেয়। যেদিন অরুণ কোন কারণে আসতে পারে না, কিংবা শাশুড়ী দেবরের খোঁটার ভয়ে করবী নিজেই অরুণকে না জানিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যায়, সেদিন করবীর নিজেরই শেষ পর্যন্ত খারাপ লাগে। কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়, সেই ফাঁক ভরে তুলবার জন্যে দু-এক দিনের বেশি দূরে সরে থাকতে পারে না। একদিন যদি দূরে থাকে পরদিন নিজেই যেচে গিয়ে খোঁজ নেয়। এই এগুনো-পিছুনো ভাবটা অরুণের মধ্যেও যে আছে, তা করবীর বুঝতে বাকি নেই। অরুণের মনের ভাবও ধরা পড়ে গেল তার কাছে। কখনো বই, কখনো ফুলের তোড়া, কখনো টুকিটাকি জিনিসপত্রও তাকে আজকাল দেয় অরুণ। দিতে সাহস করে। করবী ভাবে ওকে ধমকে দেবে, কিন্তু জোর পায় না। গঞ্জনাটা কখন যে মৃদু গুঞ্জনে নেমে আসে, করবী টেরও পায় না। টের যে একেবারে পায় না তা নয়। টের পেতে ভয় পায়। আর ভয় পেয়ে যত দূরে যেতে চায়, ততই যেন কাছে এগিয়ে আসে।

নিজের মনের দশা বুঝতে পেয়ে বহুবার করবী নিজেকে নিজে ধিক্কার দেয়, শাসন করে। ছি ছি ছি, এসব কেন! অরুণের সঙ্গলাভের জন্য কেন এই স্পৃহা, কেন এই কাঙালপনা। তার ছেলে আছে, তার ওপর নির্ভর করে তার নাবালক দেওর আর বৃদ্ধা

শাশুড়ী, তার কি এসব সাজে? ব্যক্তিগত সুখ তার জন্যে নয়। করবী শুধু তার সংসারের জন্যে আছে, সংসারের জন্যেই থাকবে! অফিস থেকে ফিরে এসে বাড়িতেই থাকে। ছুটির দিনটা বাড়িতেই একবার থেকে দুবার করে গুছায়, ছেলেকে আদর করে, দেওরের পড়াশোনার খোঁজ নেয়, শাশুড়ীর প্রিয় নিরামিষ তরকারী-গুলি তৈরী করতে বসে, কিন্তু নিজের বুঝতে বাকী থাকে না, সে মনকে আঁখি ঠারছে। এ জীবন নয়, জীবনের খোলস—সংসার নয়, সংসার সংসার খেলা, অভিনয়। সত্যি-কারের জীবন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, তার দিকে বার বার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু তার হাত ধরতে যে কাঁপে, ধরতে যে বুক কাঁপে করবীর, লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়। এই দ্বিধা, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত থেকে বাঁচাবে কে? এই যে মুহূর্তে মুহূর্তে মরা, এর হাত থেকে কে তাকে রক্ষা করবে?

সেদিন শনিবার। সকাল সকাল অফিস ছুটি হয়ে গেছে। অন্য দিনের মত আজও অরুণ এসে দাঁড়াল। কিন্তু করবী আজ মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করেছে। আজ আর সময় নষ্ট করবে না, সোজা চলে যাবে বাড়িতে। শুধু আজ নয় রোজ। অরুণের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, কথাবার্তার মাত্রা কমিয়ে আনতে আনতে ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেবে। পাড়ার লোকের কানাঘুষার ভয়ে নয়, বাড়ির লোকের অসন্তুটির ভয়ে নয়, শুধু নিজে বাঁচবার জন্যে। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে করবীকে।

অরুণ বলল, 'ব্যাপার কি, আজ এত তাড়াতাড়ি পালাচ্ছেন কোথায়?

করবী বলল, 'কাজ আছে বাড়িতে।'

অরুণ বলল, 'কাজ তো রোজই থাকে। কিন্তু আজ যে আরও কথা আছে। কাজের চেয়ে তা নেহাৎ কম জরুরী নয়।'

করবী বলল, 'কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার সব কথাই অজরুরী। একদিনের কথা আর একদিন বললে কোন ক্ষতি হয় না।'

অরুণ গাম্ভীর্যের ভান করে বলল, 'কিন্তু আজকের বক্তব্য ভিন্ন রকম। আজকের কথা আজই বলতে হবে, বাসি করলে চলবে না।'

করবী অপরূপ ভ্রূভঙ্গী করে বলল, 'শুনে যেন ভয় লাগছে।'

গভর্ণমেণ্ট প্লেস দিয়ে দুজনে পুবমুখী হেঁটে চলছিল। একখানা গাড়ি প্রায় গা ঘেঁষে গেল করবীর। অরুণ হাত ধরে তাকে খানিকটা নিজের দিকে টেনে এনে বলল, 'ব্যাপার কি! ভয় এড়াবার জন্যে গাড়ি চাপা পড়তে চান নাকি?"

করবী বলল, 'তা অত সহজ নয়।'

করবীর হাতখানা তখনো অরুণের মুঠির মধ্যে। আস্তে আস্তে করবী হাত ছাড়িয়ে

নিল। মনে মনে ভাবল, এবার সব ছাড়তে হবে। নইলে দিনের পর দিন যেভাবে জড়িয়ে পড়ছে, তাতে কোনদিন আর মুক্তি মিলবে না। কিন্তু মুক্তিই যে তার একমাত্র কাম্য, সেকথা করবী জোর করে ভাবতে পারে কই, জোর করে বলতে পারে কই।

একটু বাদে করবী বলল, 'আপনার জরুরী কথাটা এবার বলুন। শুনে নিয়ে ট্রামে উঠি।'

অরুণ বলল, 'উঁহু, অত তাড়াতাড়ি আজ আপনি ট্রামে উঠতে পারবেন না। নিজের জন্মদিনে এমন করে ফাঁকি দেবেন ভাবছেন বুঝি?'

জন্মদিন! এতক্ষণে করবীর মনে পড়ল! মাসখানেক আগে কথায় কথায় বয়সের হিসাব ওঠায় নিজের জন্মদিনের কথাটা অরুণকে বলেছিল করবী। অরুণ যে তা মনে করে বসে আছে, তা ভেবে শুধু অবাকই লাগল না, আনন্দও লাগল। বাবা মা বেঁচে থাকতে খুব ছেলেবেলায় জন্মদিন পালন করা হত। তাঁরা মারা যাওয়ার পর ও পর্ব উঠে গেছে। বিয়ের পরে স্বামীর জন্মদিন আর বিবাহবার্ষিক পালন করত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে সব অনুষ্ঠানও শেষ হয়েছে। নিজের জন্মদিনের কথাটা ভুলেই গিয়েছিল করবী। অরুণের প্রশ্নের জবাবে হেসে বলল, 'তা আমার মত মহারানীর জন্মদিনটা কি ভাবে যাপন করবেন শুনি? আমার কাছে দু-কাপ চায়ের দাম আছে। যদি খান তো খাওয়াতে পারি।'

অরুণ মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, অত অল্পে আজ ফাঁকি দিতে পারবেন না, শুধু চা নয়।'

করবী বলল, 'তাহলে চলুন আমাদের বাড়িতে। ক্ষুদকুঁড়ো যা আছে তার ভাগ পাবেন।'

অরুণ বলল, 'আপনার বিনয়ের তুলনা নেই। কিন্তু আপনাদের বাড়িতেও আজ আর যাব না। তার চেয়ে চলুন শহরের বাইরে কোথাও ঘুরে আসি। এই ইট, কাঠ, লোহা-লক্কড়ের খাঁচার মধ্যে বন্দী থাকতে থাকতে প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। চলুন বেরোই। কাছাকাছি কোন গ্রামে গিয়ে চোখ মেলে বসে থাকব! তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন আর কিছু দেখা যাবে না, তখন ফের উঠে বসব গাড়িতে।'

করবীর মন উল্লসিত হয়ে উঠল। কথাটা মন্দ নয়। অন্য দিনের মত রেস্টুরেন্ট কিংবা গঙ্গার ঘাটে বসে গল্প করার চেয়ে অরুণের প্রস্তাবে নতুনত্ব আছে। সত্যি অনেকদিন শহরের বাইরে যায় নাই। অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস করতে করতে জীবন যেন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে।

তবু করবী একটু ইতস্তত করতে লাগল, 'ঠিক সময়ে ফেরা যাবে তো?'

অরুণ বলল, 'ফেরা যাবে বইকি।'

করবী বলল, 'রাত হবে না তো বেশি?'

অরুণ বলল, 'রাত হয়তো হবে, কিন্তু বেশি হবে না।'

যাব কি না করতে করতে আরও কিছুক্ষণ ইতস্তত করল করবী।

চা খেতে খেতে সময় কাটল আরও খানিকটা। তারপর দুজনে হাওড়া স্টেশনের বাস ধরল।

টিকিট কেটে ভিড় ঠেলে একখানি মধ্যম শ্রেণীর কামরায় করবীকে নিয়ে উঠে বসল অরুণ।

করবী বলল, 'কোথাকার টিকিট কাটলেন?'

অরুণ মৃদুস্বরে জবাব দিল, 'ভয় পাবেন না—টিকিট দুখানা নিরুদ্দেশের নয়, দূরদেশেরও নয়, নেহাতই কাছাকাছি কোন এক গ্রাম দেশের।'

স্টেশনের নাম মণিরামপুর। ছোট্ট গ্রামের স্টেশন। তবু লোকজন নেহাত কম নামল না। করবীকে ইতস্তত করতে দেখে অরুণ বলল, 'কি করবেন, হাঁটবেন? না ওয়েটিংরুমে চুপচাপ বসে থাকবেন?'

করবী বলল, 'চুপচাপ বসেই থাকব, কিন্তু ওয়েটিংরুমে নয়।'

অরুণ খুশী হয়ে বলল, 'আমারও সেই কথা। তাহলে চলুন এই মাঠটা পার হওয়া যাক।'

মাঠ পার হয়ে গ্রাম। গ্রামের কোল দিয়ে আবার মাঠ। দুজনকে যেন চলার নেশায় পেয়েছে।

অবশেষে করবী এক সময় পিছনের দিকে তাকাল, 'ঈস, কতদূর এসে পড়েছি। চলুন এবার ফেরা যাক।'

অরুণ বলল, 'এই মাইল দুই আড়াই হেঁটে আপনার যা অবস্থা হয়েছে, তাতে এক্ষুণি ফিরতে হলে আপনাকে কাঁধে নিয়ে ফিরতে হবে। তার চেয়ে চলুন এই যে একটা পুকুরঘাটের মত দেখা যাচ্ছে, ওখানে খানিকক্ষণ বসে জিরিয়ে নিই।'

করবীকে রাজী হতে হল।

পুকুরটা প্রায় শুকনো। পুরনো ভাঙা সিঁড়িগুলির ফাটল দিয়ে ঘাস গজিয়েছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে খানিকটা জায়গা ঝেড়ে অরুণ বলল, 'বসুন।'

ধারে কাছে আর কোন জনমানব নেই। শুধু নিজের হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছে না করবী। সামনের দিকটা ঘন বাঁশঝাড়ে আচ্ছন্ন। তার ওপর সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকার নেমেছে।

অরুণ বলল, 'সেই জরুরী কথাটা বলি বলি করে কিছুতেই বলা হচ্ছে না। কিন্তু আর না বললেই নয়।'

করবী জানে, আজ সেই চরম কথা ওর না শুনে উপায় নেই। বলবার সমস্ত সুযোগ আর সাহস দিনে দিনে সেই দিয়েছে অরুণকে। আজ বাধা দিলে শুনবে কেন?

তবু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল করবী। বলল, 'এতদিনই যদি না বললে চলে থাকে, আজও চলবে। কোন কথার দরকার নেই অরুণবাবু। চলুন আমরা ফিরি। বেশি দেরি করলে আজ আর বোধ হয় ফিরতে পারব না।'

অরুণ কোন কথা খুঁজে পেল না। কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে একটি জিনিস খুঁজে পেল। ছোট একটি লেডীজ সেফার্স তুলে নিয়ে করবীর হাতে পেনটা গুঁজে দিল অরুণ —বলল, 'নিন জন্মদিনের উপহার।'

করবী বলল, 'এ আবার কি। এ দিয়ে কি হবে। এতে তো আমার কোন দরকার নেই।'

অরুণ বলল, একথার জবাবে বলতে ইচ্ছে হয়—

তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন,
নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন।

কি ভাগ্য যে, গানে আর কবিতায় আপনি বলে কোন কথা নেই। সব কেবল তুমি আর তুমি। কিন্তু করবী, আমরা কি আমাদের গদ্য থেকেও এই সম্বোধনের দূরত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারি নে? আরও কি কাছাকাছি আসতে পারি নে আমরা?'

করবী ওর হাতের মুঠো থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল না, নিতে পারল না। কি যেন বলতে গেল, কিন্তু মুখ থেকে কথা বেরুল না। এই অনিবার্য পরিনতির কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া যেন আর কোন উপায় নেই।

খানিকক্ষণ বাদে করবী ফের বলল, 'এবার ওঠা যাক।'

স্টেশনে এসে শোনা গেল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গাড়ি নেই। দুজনে ওয়েটিংরুমে চুপচাপ বসে রইল। পাশাপাশি থেকেও কেউ কোন কথা বলল না। আর যেন কিছু বলবার নেই, আর যেন কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

কলকাতায় ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে বারটা বেজে গেল। ট্রাম বাস সব বন্ধ। অরুণ হাওড়া স্টেশন থেকেই একটা ট্যাক্সি নিল।

করবী বলল, 'আমি একাই যাব। আমি একাই যেতে পারব।'

অরুণ বলল, 'অসম্ভব। এত রাত্রে তোমাকে একা যেতে দিতে পারি না।'

করবী বলল, 'কিন্তু দুজনে যাওয়ার পরিণাম—'

অরুণ বলল, 'যে পরিণামই হোক, তা আমরা দুজনেই ভোগ করব।'

ট্যাক্সি এসে করবীদের বাড়ির সামনে থামল। কড়া নাড়তে নিভাননী এসে দোর খুলে দিলেন। দিলীপ ঘুমায় নি। নিজের ঘরে বসে বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল।

কিন্তু বইতে মন ছিল না। গাড়ির শব্দে সে-ও দোরের কাছে এসে দাঁড়াল।

করবী বেরিয়ে এসে নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকল।

নিভাননী তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একেবারে না ফিরলেই তো হত।' এ কথার কেউ কোন জবাব দিতে চেষ্টা করল না।

অরুণ বলল, 'বিশেষ একটা দরকারী কাজে—'

নিভাননী বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক, কৈফিয়তের আর কোন দরকার নেই।'

বেলা সাড়ে তিনটা বাজতে না বাজতেই রমা বেরুবার উদ্যোগ করছিল। তার মা কল্যাণী বাধা দিয়ে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস।'

রমা সংক্ষেপে জবাব দিল, 'হাসপাতালে।'

কল্যাণী বললেন, 'অতুলকে দেখতে ?' রমা এবার কোন জবাব দিল না। কল্যাণী বললেন, 'এখন তো শুনেছি সেরে উঠেছে। দু-একদিনের মধ্যেই ওরা ছেড়ে দেবে। এখন তোর রোজ রোজ যাওয়ার কি দরকার ?'

রমা বলল, 'গেলামই বা। তাতেই বা কি।'

কল্যাণী রূঢ় কণ্ঠে বললেন, 'তাতেই বা কি। তুই এখন আর ছেলেমানুষ ন'স রমা। ভাল মন্দ বুঝবার তোর যথেষ্ট বয়স হয়েছে।'

রমা অদ্ভুত একটু হাসল, 'তা তো হয়েইছে। কিন্তু তোমরা তা বুঝতে চাইছ কই।'

কল্যাণী খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, 'বুঝতে পারব না কেন বাপু, খুবই বুঝতে পারছি। আমি তো আর তোমার পেটে হয় নি, তুমি আমার পেটে হয়েছ। সারা পাড়া ভরে ঢি-ঢি পড়ে গেছে। তোর জন্যেই নাকি ছোরা খেয়েছে অতুল। ছি ছি ছি।'

মুহূর্তের জন্য রমার মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল। মার চোখ থেকে চোখ নামিয়ে নিল। পরক্ষণেই সোজাসুজি তাকাল তাঁর দিকে। দৃঢ় স্পষ্ট স্বরে বলল, 'তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে তো ওকে আমার দেখতে যাওয়াই উচিত মা।'

কল্যাণী বললেন, 'যাওয়াই উচিত ? কথাটা বলতে তোর লজ্জা করল না ?'

রমা বলল, 'না। কেন লজ্জা করবে ? লজ্জা যে ওকে পিছন থেকে ছোরা মেরেছে

তার। যে নিজে ওর সঙ্গে গায়ের জোরে পারে নি, রাতের অন্ধকারে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে, লজ্জায় মরতে হয় সে মরুক। আমার কিসের লজ্জা!'

কল্যাণী বললেন, 'তোর লজ্জা না থাকতে পারে কিন্তু আমরা যে মুখ দেখাতে পারছিনে। আমার তো আরও পাঁচটি ছেলে-মেয়ে আছে। তাদের বিয়ে-থা দিতে হবে, তাদের ভবিষ্যৎ দেখতে হবে। কেবল তোর খামখেয়ালি নিয়ে থাকলেই তো আমার চলবে না।'

রমা বলল, 'চলতে বলে কে তোমাকে?'

তারপর খাবারের পুঁটুলি হাতে সোজা বেরিয়ে এল।

কল্যাণী পেছন থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে বললেন, 'ভাল হবে না রমা, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। অফিস থেকে আসুক আজ বাড়িতে, তারপর তোর তেজ যদি আমি না ভাঙি কালী মুখুজ্জের মেয়ে নই আমি।'

রমা ভ্রূক্ষেপ করল না। মোড়ের চায়ের দোকান থেকে পাড়ার একটি বকাটে ছোকরা মন্তব্য করল, 'এই যে হাসপাতাল যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। যাই বলিস ভাই এমন ছোরা খেয়েও লাভ আছে।'

রমা ওদের দিকে না তাকিয়ে হন হন করে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

ওদের কথায় কান দিয়ে তার জবাব দিলে ওদের প্রশ্রয়ই দেওয়া হবে। হাসপাতালে যখন এসে পৌঁছল, রোগীদের আত্মীয়-স্বজন দু-একজন করে আসতে শুরু করেছে। অতুলদের বাড়ি থেকে এখনও কেউ আসে নি। তারা আজকাল পাঁচটার আগে কেউ আসে না। তারা আসতে না আসতেই রমা চলে যায়। অতুলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কথা বলবার জন্যে বেছে বেছে এই সময়টুকুই রমা ঠিক করেছে। অতুলের দু-পাশের দুটি বেড খালি হয়ে গেছে। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত জনবিরল। একটা টুল টেনে নিয়ে রমা বসল অতুলের বিছানার কাছে।

অতুল দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ এত দেরি করলে কেন?'

রমা বলল, 'বাঃ দেবি কোথায়! এই তো সবে চারটে দশ।'

অতুল বলল, 'দশ মিনিটই বা কেন দেরি করবে? এই দশটা মিনিটই তো লোকসান।'

রমা বলল, 'তুমি তো সেরে উঠেছ। এখন একেবারে না এলেই বা কি।'

অতুল বলল, 'তাই নাকি! তাহলে তুমি যাতে রোজ আসতে পার তার জন্যে সারাজীবন আমাকে একটা না একটা অসুখ বানিয়ে শুয়ে থাকতে হয়। তুমি কি কেবল চিরকাল আমাকে বিছানায় শোয়া দেখতেই চাও? আমি সুখে আছি, সুস্থ আছি, হেঁটে

চলে কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছি তা বুঝি তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না রমা ?'

অতুল হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানি চেপে ধরল। রমা এদিক ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ছিঃ ছাড়। তোমার অসুখ সারল, কিন্তু প্রলাপ বকুনিটা সারল না।'

অতুল বলল, 'প্রলাপ ? একে তুমি প্রলাপ বলছ ?'

রমা বলল, 'প্রলাপ ছাড়া কি !'

অতুল বলল, 'মোটেই প্রলাপ নয়। এই আমার সত্যিকারের অন্তরের কথা ; এ আমি হাজার লোকের সামনেও বলতে পারি।'

কিন্তু একজন নার্স এদিকে এগিয়ে আসতেই অতুল তাড়াতাড়ি চুপ করল, রমাও টুলটা একটু সরিয়ে বসল। নার্স মুখ টিপে হেসে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। রমা এবার খাবারের কৌটোটা খুলতে যাচ্ছিল ; কার পায়ের শব্দে মুখ তুলল, তার ছোট ভাই গোবিন্দ।

দুজনের দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে গোবিন্দ বলল, 'এই যে অতুল, আজ কেমন আছিস ?'

অতুল বলল, 'শুনছি তো পরশু দিনই ছেড়ে দেবে। ছেড়ে দিলেই এখন বাঁচি। আর কাঁহাতক শুয়ে থাকা যায় ?'

গোবিন্দ বলল, 'তা ঠিক। বিশেষ করে তোর মত লোকের শুয়ে থাকা তো শক্তই।'

তারপর রমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বড়দি কতক্ষণ এসেছ ?'

রমা বলল, 'এই খানিকক্ষণ হল। তুই যে আজ সকাল সকালই চলে এলি ? অফিস ছুটি হয়ে গেল ?'

গোবিন্দ বলল, 'ছুটি কি আর হয়েছে ? ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এলাম ঘণ্টাখানেক আগে। কিন্তু এসেও কি শান্তি আছে। বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই—' বলতে বলতে গোবিন্দ হঠাৎ থেমে গেল।

রমা বলল, 'সঙ্গে সঙ্গে কি ?'

গোবিন্দ বলল, 'না কিছু না ! দিদি আজ তুমি আর দেরি কোরো না। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও। বাড়িতে দরকার আছে।'

রমা গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি যদি বলি এখানেও আমার দরকার রয়েছে !'

গোবিন্দ বলল, 'বললেই তো হবে না। এখানকার দরকারের জন্যে তো আমিই রইলাম। অতুলের বাড়ি থেকে যতক্ষণ কেউ না আসে আমি এখানে বসব। ওর সঙ্গে গল্প-টল্প করব। আর খাওয়া হয়ে গেলে কৌটটাও আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে

পারব। তার জন্যে তোমার থাকবার দরকার হবে না। পিণ্টু মিণ্টু দুজনেরই জর। মা'র একা একা সব দিক সামলাতে কষ্ট হচ্ছে। তুমি এবার চলে যাও দিদি।'

রমা বলল, 'মা'র কষ্টের জন্যে তোমার কত ভাবনা। আমার বুঝতে আর কিছু বাকি নেই।'

গোবিন্দ বলল, 'বুঝতে যদি পেরে থাক তাহলে তোমার এক্ষুণি চলে যাওয়া উচিত বড়দি। আমি ছোট ভাই হয়ে বলছি তুমি আর একটুও দেরি করো না।'

রমা খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপর টুল ছেড়ে উঠে তীরের মত বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রমার পরিত্যক্ত টুলটায় গোবিন্দ এসে বসল। অতুলের ঘন চুলের মধ্যে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'আজ তোকে গোটাকয়েক কথা বলব অতুল। বল রাগ করবি নে?'

অতুল গোবিন্দের দিকে তাকাল, 'রাগের কথা হলে নিশ্চয়ই রাগ করব।'

গোবিন্দ বলল, 'না, তাহলেও করতে পারবি নে। তুই আমার ছেলেবেলার বন্ধু। সুখ-দুঃখের সাথী। তোকে যেমন ভালবাসি তেমন পৃথিবীতে আমি কাউকে ভালবাসি নে। তোর গা ছুঁয়ে বলছি, কোন মেয়েকেও না। বন্ধুর সঙ্গে কোন মেয়ের ভালবাসার তুলনা হয়?'

অতুল আস্তে আস্তে বলল, 'তা হয় না। তুই কি বলবি বল?'

গোবিন্দ তবুও ভূমিকা করে চলল। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে যত দুঃসাহসিক কাজ করেছে তার উল্লেখ করল। পরীক্ষার সময় অতুলের নকল করার সাহায্য করতে গিয়ে ধরা পড়ে মার খেয়েছে, নিজের শখের কলম বিক্রী করে অতুলের জরিমানার টাকা জুগিয়েছে, বন্ধুর জন্যে ছোট বড় এমনি নানা স্বার্থত্যাগের কাহিনী আজ নিজের মুখে বর্ণনা করতে লাগল গোবিন্দ। অবশ্য অতুলও তার জন্যে কম করে নি। সে তার শারীরিক শক্তি দিয়ে বন্ধুকে রক্ষা করেছে। গোবিন্দের বিন্দুমাত্র অপমানও সহ্য করে নি। নিজের বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বন্ধুর মান রক্ষার জন্যে বড়লোকের পাহারাওয়ালাকে ঠেঙিয়েছে, থানা পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, কাউকে পরোয়া করে নি। অতুলের সেই সব কীর্তিকাহিনীর কথাও গোবিন্দ উল্লেখ করতে ভুলল না। 'সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই আমাদের বলতেন মাণিকজোড়। তোর মনে আছে অতুল?'

অতুল বলল, 'আছে।'

গোবিন্দ বলল, 'তিনি অবশ্য ঠাট্টা করেই বলতেন। কিন্তু আমরা সেটাকে ঠাট্টা ভাবি নি। আমরা তাকে সত্য করে তুলছি। কত জনের কত গভীর বন্ধুত্ব ভেঙে

যেতে দেখলাম, কিন্তু আমাদের জোড় আজও ঠিক আছে। সেই জোড় তুই ভেঙে দিস নে অতুল। আমার কথা শোন। আমার বড়দিকে তুই ছেড়ে দে। তার বদলে তুই যাকে চাস আমি তাকেই দেব। আমার সবচেয়ে ভালবাসার মেয়েকেও তোকে এনে দেব অতুল, কিন্তু আমার বড়দির দিকে তুই কুনজর দিস নে ভাই। তা আমি সহ্য করতে পারব না।'

অতুল বলল, 'কি যা তা বাজে কথা বলছিস গোবিন্দ, তুই থাম। চুপ কর।'

গোবিন্দ বলল, 'না তুই আমাকে কথা দে, তবেই থামব। দেখ, কেউ আমরা সাধু পুরুষ নই। মেয়েমানুষের ওপর আমাদের সবারই লোভ আছে, কিন্তু তাই বলে বন্ধুর বোন, বন্ধুর বউ আমরা বাদ দিয়ে চলি। বন্ধুর ঘর নষ্ট করি নে। তুইও তা করতে যাস নে অতুল। তোর নামে আর বড়দির নামে পাড়া ভরে কুৎসা রটবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। ওর একবার বিয়ে হয়ে গেছে। ওকে তো তুই আর বিয়ে করতে পারবি নে। স্বামীর সঙ্গে ওর আজ বনিবনা হচ্ছে না, কিন্তু দুদিন পরে হতেও তো পারে। সেই পথে তুই কাঁটা দিস নে অতুল, তুই আমার বড়দিকে ছেড়ে দিস, দোহাই—'

অতুল স্থির দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুই এবার যা গোবিন্দ। আমার বাড়ির সবাই এখনই এসে পড়বে।'

গোবিন্দ বলল, 'যাচ্ছি। কিন্তু তুই আমাকে কথা দে।'

অতুল বলল, 'দিলুম। আমি তোদের সবাইকেই ছেড়ে দেব গোবিন্দ। কাউকে ধরে রাখব না, কাউকে আটকে রাখব না। আমি তোদের সকলের চোখের আড়ালে গিয়ে থাকব।'

অপমানে আর অভিমানে অতুলের গলা বুজে এল। গভীর ক্লান্তিতে চোখ বুজল অতুল।

গোবিন্দ উঠে আসবার আগে আর একবার ওর কপালে সস্নেহে হাত রেখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'তুই যতই আড়ালে যাস অতুল আমার চোখ কিছুতেই এড়াতে পারবি নে। আমি তোকে খুঁজে বার করবই।'

দিন দুই পরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল অতুল। এই দুদিনের মধ্যে রমা আর আসে নি। কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে লাগল অতুলের। বেরিয়ে অনেক লোকজন। আর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এসেও সেই শূন্যতা যেন আর ভরতে চাইল না কিছুতেই। অতুল বুঝতে পারল রমার ইচ্ছা থাকলেও আর আসতে পারছে না! ছোট বড় সবাই মিলে তাকে আটকে রেখেছে। তার আর বেরুবার জো নেই। কিন্তু অতুল গিয়ে কি দেখা করতে পারে না তার সঙ্গে? না। গোবিন্দ যেসব কথা বলেছে আর ওদের

বাড়িমুখো হতে পারে না অতুল। মান-সম্মান বিসর্জন দিতে পারে না।

বাসন্তী ছেলের দাড়িভরা মুখে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ঈস! কি চেহারাই না হয়ে গেছে। এখন আর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দরকার নেই। হৈ-হৈ না করে দিন কয়েক বিশ্রাম কর। সময় মত নেয়ে খেয়ে শরীরটাকে শুধরে নে।'

কিন্তু শরীর শোধরানো পর্যন্ত সবুর হল না অতুলের। দু-তিন দিন পরেই চাকরির চেষ্টায় বেরোল। রমা আর গোবিন্দের সঙ্গে সেই যৌথ ব্যবস্থা তো আর চলবে না। অতুলকে কিছু না কিছু করে খেতেই হবে।

কিন্তু চাকরি চাইলেই তো আর চাকরি পাওয়া যায় না। দিনকয়েক ঘোরাঘুরির পর অতুলেব মনে হল কলকাতায় তার কোন সুবিধে হবে না। তা ছাড়া কলকাতায় সে থাকতেও চায় না। এ শহরের যেখানেই থাকুক তার মন পড়ে থাকবে রমাদের ওখানে। ঘুরে ঘুরে অতুলের পা দুটো তাদের বাড়ির দিকেই এগুতে থাকবে। এরই মধ্যে কবার মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছে। গোবিন্দ যা বলেছে তারপর ওদের ওখানে কিছুতেই আর যাওয়া চলে না অতুলের, আর কোন সম্পর্ক রাখা চলে না ওদের সঙ্গে। সম্পর্ক অতুল রাখতেও চায় না। না ওদের সঙ্গে, না কলকাতার সঙ্গে। শহরতলী দিয়েই অতুল চাকরি খুঁজে বেড়াতে লাগল।

এর মধ্যে একদিন শিয়ালদহ স্টেশনে দেখা হয়ে গেল পুরনো বন্ধু শ্রীপদ দাস-এর সঙ্গে। গায়ে হাফসার্ট, হাতে একটা ফাইবারের সুটকেস নিয়ে সে কোথায় চলেছে হন হন করে। অতুলের সঙ্গে দেখা হতেই থমকে দাঁড়াল, 'এই যে, তারপর খবর কি তোর। কোথায় আছিস, কি করছিস?'

অতুল বলল, 'কোথাও নেই, কিছুই করছি নে।'

'বাপের হোটেলেই আছিল তাহলে?'

অতুল বলল, 'তাই বা থাকতে পারছি কই। সে হোটেলের দোরও বন্ধ হল বলে। একটা চাকরি-বাকরি জোগাড় করে দে না ভাই।'

শ্রীপদ একটু চিন্তা করে বলল, 'তা দিতে পারি। কিন্তু আমরা যা করছি তা কি তুই করতে পারবি? কাজ করবি চটকলে? কলকাতা ছেড়ে যাবি নৈহাটির মত জায়গায়?

অতুল বলল, 'কেন যাব না! তুই যদি সঙ্গে নিস, সুবিধে সুযোগ করে দিতে পারিস, নিশ্চয়ই যাব।'

শ্রীপদ বলল, 'তাহলে চল আমার সঙ্গে, আজই ঠিকঠাক করে আসবি। দেখে-টেকে যদি পছন্দ হয়—'

রাত বারটা বেজে গেল, অতুলের দেখা নেই। বাসন্তী উদ্বিগ্ন হয়ে বার বার ঘর বার

করছেন, আশঙ্কা করছেন নিশ্চয়ই আবার কোন একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে তাঁর ছেলে। এই সময় অতুল ফিরে এল।

অবনীমোহন গম্ভীরভাবে ছেলের দিকে তাকালেন, কোন কথা বললেন না। বাসন্তী বললেন, 'আমি ভেবে মরি আবার তুই কোথায় কি ঘটিয়ে বসলি। তুই কোথায় গিয়েছিলি অতুল ?'

অতুল বলল, 'একটা চাকরি জোগাড় করে এলাম মা।'

বাসন্তী বললেন, 'কি কাজ ?'

অতুল বললে, 'সে তোমার শুনে কাজ নেই মা, কুলীমজুরের কাজ।'

বাসন্তী বললেন, 'কোথায় ?'

অতুল বলল, 'কলকাতার বাইরে। সপ্তাহে একদিন এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব।'

বাসন্তী খানিকটা অভিমানের সঙ্গে বললেন, 'অমন হতচ্ছাড়া চাকরি কি তোর না নিলেই চলত না!'

অতুল হেসে বলল, 'না মা, চলত না। আমি তো একা নই, আমার মত আরও হাজার হাজার লোক এই হতচ্ছাড়া কাজে নেমেছে। এর চেয়ে ভাল কাজ যখন জুটবে তখন এটা ছেড়ে দেব। কিন্তু যতদিন না জোটে ততদিন বসে থেকে লাভ কি ?'

সোমবার কাজে যোগ দিতে হবে। রবিবার সকাল থেকেই তার উত্যোগ আয়োজন চলতে লাগল। বাসন্তী ছেলের বিছানা বাক্স গুছিয়ে দিতে দিতে বার বার বলতে লাগলেন, 'এখনও তুই ভাল করে ভেবে দেখ অতুল। আমি বলি নাই বা গেলি।'

অতুল বলল, 'তুমি অমন করো না মা। তাহলে সত্যিই আর যেতে পারব না।'

অতুল সবই ঘুরে-টুরে দেখে এসেছে। বস্তীর মধ্যে শ্রীপদদের ঘরের পাশে একখানা খালি ঘরও পাওয়া গেছে। অতুল সেখানে গিয়েই উঠতে পারবে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা প্রথমে শ্রীপদদের ওখানেই হবে। সে তার বউ ছেলে নিয়ে থাকে। কোন অসুবিধে হবে না। আর মাইনেপত্র পেলে হোটেলেও স্বাধীনভাবে অতুল ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। সবরকম বন্দোবস্তই আছে। এখন আসা না আসা অতুলের ইচ্ছা। শ্রীপদর স্ত্রী রাধা বলেছিল, 'ঈস, আমি থাকতে হোটেলে খেতে যাবে কেন ঠাকুরপো। আপনি চলে আসুন ঠাকুরপো। আপনার কোন কষ্ট হবে না।'

কষ্ট না হওয়ার কথাই বটে। নোংরা কুলী-বস্তী। খোলার চাল আর মাটির দেয়াল-ঘেরা ছোট আর একটি খুপরি। তবু রাধার আশ্বাসটুকু ভারী ভালো লেগেছে অতুলের। কথা দিয়ে এসেছে সে যাবেই।

ভোরবেলায় কড়া নাড়ার শব্দে করবীই এসে দোর খুলে দিল। তারপর আগন্তুককে দেখে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বলল, 'দাদা, তুমি? তুমি কি করে এলে!'

হিরণ্ময় বলল, 'উড়ে আসি নি। গাড়িতে গড়িয়ে গড়িয়েই এসেছি। অবশ্য উড়ে আসবারই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বড্ড খরচ। সে যাক। তারপরে তোর খবর কি। কেমন আছিস? পিপলু ভাল তো?'

করবী বলল, 'হ্যাঁ ভাল। কিন্তু তোমার ব্যাপার তো বুঝতে পারলাম না দাদা, চিঠি নেই পত্তর নেই হঠাৎ এমন করে—'

হিরণ্ময় বলল, 'চিঠিপত্র দিয়ে এলে তো তুই সাবধান হয়েই যেতে পারতিস। কোন বে-আইনি কাজ করছিস কি না তাই তদন্ত করবার জন্যে এসেছি, বুঝলি?'

তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'তোর শাশুড়ী জরুরী চিঠি দিয়েছিলেন। তুই নাকি কুল মান কিছু আর রাখলি নে। ব্যাপার কি?'

করবী মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে বলল, 'ও এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। এসো ভিতরে এসো।'

হিরণ্ময় বলল, 'ভিতরে যে যেতে বলছিস, আমি কিন্তু বিপক্ষের গোয়েন্দা, তা যেন মনে থাকে।'

করবী গম্ভীরভাবে বলল, 'এসো, তোমার স্বপক্ষের লোকও তো এখানে আছে,।' ভিতরে এসে নিভাননীর সঙ্গে কুশল প্রশ্ন বিনিময় করল হিরণ্ময়, 'কেমন আছেন মাঐমা, সব ভাল তো?'

নিভাননী বললেন, 'এই একরকম আছি বাবা। ভগবান যেমন রাখবেন তেমনিই তো থাকব। বউমাকে নিয়ে এলে না? তাকে কোথায় রেখে এলে?'

নিজেই গরজ করে হাত মুখ ধোয়ার জল দিলেন, চা জলখাবার করে দিলেন নিভাননী। তারপর হিরণ্ময়কে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'নিতান্ত বিপদে পড়েই তোমাকে ওসব কথা লিখতে হয়েছে হিরণ্ময়। লিখতে আমার বুক ফেটে গেছে। নিজের ঘরের কলঙ্কের কথা কি অমন করে লেখা যায়? শত হলেও তো আমার

নিজেরই ছেলের বউ। কিন্তু ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তোমাকে সব কথা জানিয়েছি বাবা। তুমি কিছুদিনের জন্যে দিল্লীতে তোমার কাছে নিয়ে রাখ। ছেলের বউয়ের চাকরিতে আমি খেতে চাই নে। আমার কপালে যা আছে, তাই হবে। তুমি ওকে কিছুদিনের জন্যে ওই ছোকরার চোখের আড়ালে নিয়ে যাও। কলকাতায় থাকলে ওকে আর রক্ষা করতে পারব না হিরণ্ময়। কিন্তু রক্ষা যে করতেই হবে। ও তো একা নয়, ওর সঙ্গে যে আমার পিপলুর ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে।'

হিরণ্ময় গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি ভেবে দেখছি মাঐমা।'

নিভাননী বললেন, 'হ্যাঁ ভেবে দেখ। ওর বাঁচবার পথ বের কর। তুমি যা বলবে আমি তাতেই রাজী হব।'

বলে নিভাননী অরুণ আর করবীর এই কয়েক মাসের ঘনিষ্ঠতার কাহিনী, সেদিন শেষরাত্রে বাইরে থেকে মোটরে করে ফিরে আসার বিবরণ সব খুঁটে খুঁটে বলতে লাগলেন। শেষে বললেন, 'ও এখন আমার শাসনের সম্পূর্ণ বাইরে চলে গেছে হিরণ্ময়। এখন দেখ তোমার শাসনে কোন কাজ হয় কি না। তুমি তো ওর দাদা। বাপের বাড়ির দিক থেকে একমাত্র গার্জিয়ান। ওর যাতে ভাল হয় তা তোমারও তো দেখা কর্তব্য।'

হিরণ্ময় চিন্তিতভাবে বলল, 'কর্তব্য বই কি মাঐমা। সেইজন্যেই তো এলাম।'

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে হিরণ্ময় করবীকে বলল, 'চল একটা মিড্‌ডে স্ট্রল দিয়ে আসি। মেঘলা দিন আছে। বেড়াতে মন্দ লাগবে না।'

করবী আপত্তি করল না। 'সে বুঝতে পারল হিরণ্ময় নির্জনে তাকে কিছু বলতে চায়। সব কথা করবীরও শুনে নেওয়া দরকার। তারপর তারও বলবার কথা আছে।

হাঁটতে হাঁটতে তারা দুজনে কিছুদূরের একটা পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসল। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর করবীই আগে জিজ্ঞাসা করল, 'উনি তোমাকে কি কি লিখেছেন? চিঠিটা আছে তোমার কাছে?'

হিরণ্ময় বলল, 'না চিঠিটা পড়েই আমি ছিঁড়ে ফেলেছি। প্রথম ঠিক সহ্য করতে পারি নি।'

করবী বলল, 'নিশ্চয়ই খুব বানিয়ে বানিয়ে—'

হিরণ্ময় বলল, 'বানানো কথা সে চিঠিতে ছিল বই কি। কিন্তু আসল কথাটা বানানো নয়, সেটা সত্যি।'

করবীর মুখখানা আরক্ত দেখাল, 'তাই তোমাদের বিশ্বাস। বেশ যদি সত্যি—'

হিরণ্ময় বলল, 'তাহলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

করবী বলল, 'কি ব্যবস্থা করবে তোমরা ? কি শাস্তি দেবে শুনি ?' হিরণ্ময়ের দিকে এবার সোজাসুজি মুখ তুলে তাকাল করবী।

হিরণ্ময় বোনের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল। তারপর সস্নেহে আশ্বাসের স্বরে বলল, 'আমি এই চাই করবী। শেষ পর্যন্ত তোর এই সাহস, মনের এই জোর বজায় থাকুক আমি তাই চাই। দেখ, তোর শাশুড়ীর চিঠি পেয়ে প্রথমে মনের অবস্থা ভারি খারাপ হয়ে পড়েছিল। ভারি আঘাত পেয়েছিলাম! সারারাত দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় নি। ছি ছি আমার বোন করবী এমন কেলেঙ্কারির মধ্যে গেল! সংযম, শিক্ষা, সংস্কৃতি কিছুর মূল্যই সে দিল না ?

করবী বাধা দিয়ে বলল, 'শোন, তুমি যা ভেবেছ—'

হিরণ্ময় বলল, 'আমাকে শেষ করতে দে। হ্যাঁ, তুই ঠিকই বলছিস। আমি তখন যা ভেবেছিলাম তা ভুল, তারপরে যা ভেবেছি তাই সত্যি। ভোরে উঠতেই আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের সুষমার সঙ্গে দেখা। সে হেসে বলল, দাদা, আজ যে এত সকাল সকাল উঠেছেন, আপনারা তো দুজনে পাল্লা দিয়ে ঘুমোন। দেখুন গিয়ে আপনার প্রতিবেশীর এখনো কেমন নাক ডাকছে। অল্পদিন হল সুষমারা এসেছে। কিন্তু এর মধ্যে দাদা বউদি পাতিয়ে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে নিয়েছে। সুষমা আর তার স্বামী প্রফুল্ল আমাদের ব্রিজ খেলার, সিনেমা দেখার সঙ্গী। সুষমার গলায় আমি তোর গলাই শুনতে পেলাম। তার মুখে কল্পনা করলাম তোর মুখের প্রসন্নতা। সুষমাও ঠিক তোর মত। সেও বিধবা হওয়ার পর ফের বিয়ে করেছে। বেশ সুখে শান্তিতে আছে ওরা।'

করবী শিউরে উঠে বলল, 'দাদা, কি বলছ তুমি!'

হিরণ্ময় বলল, 'ঠিক বলছি। ওরা যা পেরেছে তোরাই বা পারবি নে কেন। এই তো স্বাভাবিক। জীবনের দাবিই তো তাই। সে দাবি যদি সোজাপথে না মেটে, তা গলিঘুঁজির বাঁকা পথ নেবে। কিন্তু তোকে আমি সোজা স্বাভাবিক পথ নিতেই বলব, বোন। যাতে সেই পথে চলতে পারিস তার সাহায্য করব। আমি সেইজন্যেই এসেছি।'

করবী ফের অস্ফুটস্বরে বলল, 'দাদা, তুমি কি বলছ ?

হিরণ্ময় বলল, 'এ কেবল আমারই বলবার কথা নয়, তোরও মনের কথা। কি বলিস, ঠিক ঠিক বলি নি ?'

করবী আস্তে আস্তে বলল, 'দাদা, আমি তো ঠিক ওই ধরনে ভাবি নি।'

হিরণ্ময় বলল, 'ভাববার ওই একমাত্র ধরন করবী। আর কোন ধরনে মর্যাদা নেই, সম্মান নেই, সমস্যার সমাধান নেই।'

করবী বলল, 'কিন্তু তুমি যা বলছ তা কি সম্ভব? পিপলুর সমস্যা আছে। তার ঠাকুরমা, তার কাকা এদের ওপর কর্তব্য আছে।'

হিরণ্ময় বলল, 'তা তো আছেই, সে কর্তব্যকে তো আমি অবহেলা করতে বলি নে। আমি সব দিক ভেবে দেখেছি। অরুণের কাছ থেকে এটুকু ঔদার্য নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে, পিপলুকে সে সহ্য করবে।'

করবী বলল, 'তা হয়ত করবেন। পিপপুকে তিনি ভালোই বাসেন।'

হিরণ্ময় বলল, তবে আর কি। বাকী রইলেন পিপলুর ঠাকুরমা আর কাকা। যতদিন তাঁদের অন্য আর্থিক সংস্থান না হয়, যতদিন দিলীপ উপার্জন-ক্ষম না হতে পারে, ততদিন তুই ওঁদের সাহায্য করবি। তোর মাইনের সব টাকাটা ওঁদের দিবি। দুঃস্থ মা-বাপকে মেয়ে যেমন দেয়। আর অরুণ যা রোজগার করবে, সেই টাকায় তোদের সংসার চলবে।'

করবী একটু হাসল, 'দাদা, তুমি অঙ্কের ছাত্র ছিলে। কিন্তু জীবনটা তো আগাগোড়া অঙ্কের খাতা নয়। তুমি যত সহজে হিসেব করলে ব্যাপারটা কি তত সহজ? এসব ঘটনার পরে ওঁরা আমার কাছ থেকে টাকা নেবেন কেন? অথচ ওঁরা কষ্ট পাবেন, অর্থাভাবে দিলীপের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। তাই বা আমি কি করে সইব। না দাদা, এ সমস্যার কোন সমাধান নেই।'

হিরণ্ময় বলল, 'কিন্তু সমাধান যে করতেই হবে বোন। দোটানায় পড়ে সারা জীবন তুই কেবল ক্ষতবিক্ষত হবি আমি তা হতে দিতে পারি নে। প্রথম প্রথম এক আধটু অসুবিধে তো হবেই। কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখে নিস।'

করবী বলল, 'তুমি একে অসুবিধে বলছ দাদা—অকর্তব্য বলছ না?'

হিরণ্ময় বলল, 'না, অকর্তব্য নয়, জীবনকে অস্বীকার করাই অকর্তব্য। অঙ্ক কষতে ভুল করাটাই অকর্তব্য, তোর শাশুড়ী যদি যুক্তি না মেনে চলেন—তাঁর পক্ষ থেকেই কর্তব্যের ত্রুটি ঘটবে। তাঁব দুঃখ কেউ এড়াতে পারবে না। কিন্তু তুই ইচ্ছে করে নিজের জীবনে দুঃখ ডেকে আনিস নে। প্রবঞ্চনা মাত্রেই খারাপ। কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা সবচেয়ে ক্ষতিকর। কারণ তা বিবেকের ছদ্মবেশ পরে আসে। সারা জীবন তাকে চেনা যায় না, চেনার সাহস হয় না।'

আশ্চর্য, দাদার মুখে এ যেন নিজের চিন্তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছে করবী। যে গোপন চিন্তার অস্ফুট উচ্চারণও তার সাহসে কুলোয় নি, হিরণ্ময় তা তারস্বরে বলেছে।

যে গোপন দ্বন্দ্বের করবী কোন মীমাংসায় আসতে পারে নি, গাণিতিক হিরণ্ময় কয়েক মিনিটের মধ্যে অঙ্ক কষে তার বিশুদ্ধ ফল নির্ণয় করেছে। তবে কি এই নিশ্চিত পরিণামের কাছে আত্মসমর্পন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই করবীর? যুক্তি ছাড়া আর কোন পথ নেই?

হিরণ্ময় বলল, 'কি ভাবছিস?'

করবী কাতর স্বরে বলল, 'আমি কিছুই ভাবতে পারছি নে দাদা। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।'

'ঠিক করে দিয়ে যাব। তোর সব জট খুলে দিয়ে যাব করবী। আমার উপর তুই নির্ভর কর বোন। তোর কোন ভয় নেই।'

কিন্তু হাতে যে আর সময়ও নেই হিরণ্ময়ের। আর একটি দিন মাত্র কলকাতায় সে থাকবে। কালকের দিনটি অন্য কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে।

করবীর জন্যে আজকের দিনটি ছাড়া সে সময় দিতে পারবে না। তাতে কোন অসুবিধে নেই, ঝড়ের বেগে ঝোঁকের মাথায় কাজ সারাই স্বভাব হিরণ্ময়ের। এই পদ্ধতিই তার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। অফিসের সাতদিনের জমানো কাজ সে একদিন রাত বারোটা পর্যন্ত খেটে শেষ করে দিয়ে যায়। করবীর ফাইলই বা সে আজকের মধ্যে ক্লিয়ার করতে পারবে না কেন? রাত বারোটার এখনো অনেক দেরি।

তাই বাসায় ফিরে এলে নিভাননী যখন তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল? বুঝিয়ে সুজিয়ে সব বলতে পারলে? নিজের দোষ ও স্বীকার করল? তোমার উপদেশ ও শুনল তো?'

হিরণ্ময় এই সুযোগ ছাড়ল না, অতি সহজভাবে বলল, 'ওকে এমন উপদেশ দিয়েছি যে, না শুনে ওর জো নেই মাঐমা। আমি বলেছি এসব চলবে না। এসব বেয়াড়া চালচলন আমাদের সকলের পক্ষেই অসম্মানকর। তার চেয়ে অরুণকে তুমি বিয়ে কর।'

নিভাননী খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'তুমি তাই বলেছ? তুমি ওকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে বলেছ?'

হিরণ্ময় বলল, 'হ্যাঁ, আপনি যদি ভাল করে ভেবে দেখেন আপনিও তাই বলবেন। এক্ষেত্রে বিয়েটাই সবচেয়ে সম্মানের, সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।'

নিভাননী জ্বালাভরা কণ্ঠে বললেন, 'ভিতরে ভিতরে তুমি তাহলে এই মতলব করেই এসেছ? তোমার বিধবা বোনের তুমি ফের বিয়ে দেবে!'

হিরণ্ময় অনুত্তেজিত, শান্ত স্বরে বলল, 'ও কেবল আমার বিধবা বোনই নয়, ওর যাতে মঙ্গল হয় তা আপনারও করা উচিত। দেখুন স্মৃতিকে সম্বল করে যারা থাকতে

পারে, তারা থাকুক। শতকরা নিরানব্বই জন ভিতরে ভিতরে পারে না। তাদের পারতে আমরা বাধ্য করি। কিন্তু করবী যখন আর একজনকে ভালোবেসেছে, আর একজনকে ভালোবাসার সুযোগ জীবনে যখন এসেছে, তখন কেন ওকে আমরা মিছামিছি যোগিনী সাজিয়ে রাখব। ত্যাগের নামে সংযমের নামে বঞ্চিত হতে বাধ্য করব। তার চেয়ে ও আর এক সংসার গড়ে তুলুক, আরো ছেলেমেয়ে হোক, ও নিজে সুখী হোক, দশজনকে সুখী করে তুলুক।'

নিভাননী বললেন, 'করবীরও বুঝি সেই মত ?'

হিরণ্ময় বলল, 'হ্যাঁ। ওর মনে এখনো যেটুকু দ্বিধা আছে আমরা বুঝিয়ে বললে সেটুকু আর থাকবে না। আপনি যদি অনুমতি দেন—'

নিভাননী অদ্ভুত একটু হাসলেন, 'অনুমতি আমি দেব না তো কে দেবে !'

হিরণ্ময় বলল, 'হ্যাঁ, আপনিই দেবেন। আমি জানি আপনিও লেখাপড়া শিখেছেন, শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে—'

নিভাননী বললেন, 'থাক থাক, তোমাকে আর বক্তৃতা দিতে হবে না। বিধবা বোনের বেলায় এমন কথা সবাই বলতে পারে, এমন উদার সবাই হতে পারে। বিয়ে দেওয়া বোন পরের ঘর থেকে পরের ঘরে যাবে। তার ওপর আর মমতা কিসের। কিন্তু এ যদি তোমার বিধবা ভাইয়ের বউ হত, পারতে তুমি এত সহজে তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে ? পারতে তুমি সব মমত্ব, সব স্বত্ব ছেড়ে দিতে ?'

পাশের ঘর থেকে দিলীপ এসে দোরের সামনে দাঁড়াল, 'মা, তুমি কাকে কি বলছ ? ওঁরা যখন ভিতরে ভিতরে সব ঠিক করেই ফেলেছেন, ছেড়ে দাও ওঁদের, এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে দাও।'

নিভাননী বললেন, 'তা তো দেবই। এ কথা শোনার পর এ বাড়িতে তো ওকে আর থাকতে দেবই না। ও যাক। এক্ষুনি চলে যাক। কিন্তু পিপলু আমার, পিপলু আমার পরেশের। ওকে আমি কাউকে দেব না।'

পিপলু ঠাকুরমার পায়ের কাছে বসে নিজের মনে মামার আনা মোটরগাড়ি চালাচ্ছিল, নিভাননী তাকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। জোর করে এখুনি যেন কেউ পিপলুকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পিপলু বিব্রতভাবে বলল, 'ছাড় ঠাকুরমা, ছাড়। আমার গাড়ি থেমে গেল যে।'

হিরণ্ময় নিভাননীর কথার জবাবে বলল, 'পিপলু যেমন আপনার পরেশের, তেমনি আমার বোনেরও। শিশুকে তার মার কোল থেকে আপনি কেড়ে রাখতে পারেন না। ও তার মার কোলেই থাকবে, শুধু মাঝে মাঝে এসে ঠাকুরমার কোলের ভাগ দিয়ে যাবে।'

বলে হিরণ্ময় উঠে দাঁড়াল।

করবী তাকে ডেকে নিয়ে বলল, 'দাদা, তুমি এ কি করলে। আমি তো এসব চাই নি। যেভাবে চলছিল আমি তো সেইভাবেই চলতে পারতাম।'

হিরণ্ময় ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'সেভাবে চলাটাই অন্যায়। সেভাবে চলাটা না চলার সামিল। এ যুগে তা একেবারে অচল। চাস নি মানে চাইতে সাহস পাস নি। কিন্তু সাহস তোকে পেতেই হবে। সব বাধাবিঘ্নে সাহস নিয়ে দাঁড়াতে হবে তোকে। যে বন্ধন শিথিল হয়ে এসেছে, যে বন্ধন আপনিই একদিন খসে পড়বে, তা ছিঁড়ে ফেলার সাহস মনে তোকে আনতেই হবে। চল আজই আমরা অরুণের খোঁজ নিয়ে আসি।'

করবী আরক্ত হয়ে বলল, 'ছিঃ আমি তা পারব না।'

হিরণ্ময় বলল, 'কেন পারতে দোষ কি। বেশ, না যেতে পারিস কিছু একটা লিখে দে।'

করবী বলল, 'তোমার হাত দিয়ে তাকে চিঠি পাঠাব?'

হিরণ্ময় বলল, 'পাঠালিই বা। তাতে দোষ কি। তোর ভয় নেই, আমি সেই চিঠি খুলে পড়ব না।'

হিরণ্ময়ের পীড়াপীড়িতে অবশেষে এক টুকরো কাগজে লিখে দিল করবী। সম্বোধন করল না, স্বাক্ষর করল না, ঠিকানা তারিখ দিল না। শুধু লিখল, 'এত তাড়াতাড়ির দরকার ছিল না। আমরা আরও দেরি করতে পারতাম। কিন্তু আজ যা ঘটল, তাতে আর দেরি করবার জো নেই। দাদার মুখেই সব শুনবে। তোমার জবাবের অপেক্ষায় রইলাম।

হিরণ্ময়ের হাত থেকে খামখানা নিয়ে তার মুখটা ছিঁড়ে ফেলল অরুণ। তারপর সেই টুকরো চিঠিটা বার দুই পড়ে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এর মানে কি?'

হিরণ্ময় বলল, 'মানে কি তুমি নিজেই বুঝতে পারছ না? বেশ না বুঝতে পার তো বুঝিয়ে দিচ্ছি। খুঁজে খুঁজে তোমার এই চিলেকোঠা পর্যন্ত যখন উঠে আসতে পেরেছি, তখন মানেটুকু বুঝিয়ে বলাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হবে না।' হিরণ্ময় এরপর আনুপূর্বিক সব খুলে বলল। তার প্রাথমিক বিদ্বেষ, তারপর সমস্যা সমাধানের জন্য অসাধারণ তৎপরতা কিছুই গোপন করল না। শেষে বলল, দেখ অফিসেও কাজের পাল্লা দিয়ে তুমি আমার সঙ্গে পার নি, এক্ষেত্রেও পারবে না। ঘটক সেজে আমি যদি একটা ধাক্কা না দিতাম, মন জানাজানির পালা শেষ হতে যুগ-যুগান্তরই কেটে যেত। পাড়াপড়শীর চোখ রাঙানি আর কান মলা খেতে খেতে অস্থির হয়ে উঠতে। আমি তার হাত থেকে

তোমাদের বাঁচালাম। আমার কাছে তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এ কথা স্বীকার কর কি না?'

অরুণ বলল, 'করি।'

হিরণ্ময় বলল, 'বাস, তা হলেই হল। আমার কাজ আমি সেরে গেলাম বাকিটুকু ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কিংবা কালীঘাটের পুরুতের। তোমাদের যাকে পছন্দ। মিষ্টি মুখটা দিল্লীতে গিয়েই করিও। কলকাতার কোন খাবার আমার পেটে সয় না। এবার উঠি।'

অরুণ বলল, 'সে কি! চা-টা না খেয়েই?'

হিরণ্ময় বলল, 'বেশ যদি এক কাপ খাওয়াতে চাও, খাওয়াতে পার। কিন্তু চা-টা আর না। পেটটা ভাল যাচ্ছে না।'

চা খাবার খেয়ে হিরণ্ময় খানিক বাদে বিদায় নিল। ট্রাম লাইন পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে এল অরুণ। হিরণ্ময় বলল, 'কালই চলে যাচ্ছি।'

অরুণ বলল, 'কালই?'

হিরণ্ময় বলল, 'হ্যাঁ। তাতে কি, গান্ধর্ব বিয়েতে অভিভাবকদের অনুপস্থিতিই বাঞ্ছনীয়। ব্যবস্থাটা করে ফেলতে বেশি দেরি করো না, কারণ করবীর ওখানকার অবস্থা তো বললামই। আমি জানি অনেক সমস্যা আছে, তোমার দিক থেকেও অনেক বাধা আছে। কিন্তু একটা একটা করে জট খুলবার যদি চেষ্টা করো, জীবনের জটিলতার আর শেষ হবে না। যেখানে গিটের সংখ্যা বেশি, জটের সংখ্যা বেশি, সেখানে নির্মম হয়ে মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হয়। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই অরুণ।' হিরণ্ময় বিদায় নিল।

অরুণ অনেক রাত অবধি শহরের পার্কে পথে ঘুরে বেড়াল। সত্যিই এই চরম পথ ছাড়া আর কোন পথ নেই। ভালোই হল, এ ভালোই হল। এত তাড়াতাড়ি সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এতদিন অরুণ মনে মনে ভেবেছে সরাসরি কথাটা করবীকে বলবে। কিন্তু বলতে বলতে বলা হয় নি। এবার করবী নিজেই বলেছে। মুখে না হোক, কলমের মুখে। একই কথা। দাদার সাহায্য অবশ্য করবীকে নিতে হয়েছে।

কিন্তু নিয়েছে তো করবী নিজেই। একই কথা। কিছুদিন ধরে এই কল্পনাই তো মনে মনে করে আসছে। বাস্তব রূপ নেবে তা সে ধারণাই করতে পারে নি। করবী রাজি হয়েছে। ওর মনে আর কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। ওর দাদার সানন্দ সম্মতি পাওয়া গেছে। এখনো অবশ্য বাধা আসবে। বাধা আসবে অরুণের বাবা মার কাছ থেকে। বাধা আসবে করবীর শাশুড়ী দেওরের কাছ থেকে। কিন্তু নিজেদের মনের যদি জোর

থাকে, নিজের সঙ্কল্প যদি দৃঢ় হয়, তাহলে এসব বাইরের বাধাকে সহজেই অতিক্রম করে যেতে পারবে অরুণ। প্রথম প্রথম দুঃখ দুর্ভোগ তো কিছু হবেই। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনেরা আঘাত পাবেন। কিন্তু সে আঘাতের দাগ মিলিয়ে যেতে দেরি হবে না মিলন ঘটাতে পারলে। তার পরিচিত দু' একজন বন্ধুর ক্ষেত্রেও এমন হয়েছে। ছেলের অসবর্ণ বিয়েতে প্রথম মা বাবা রাজী হন নি। বিরোধিতা করেছেন, ত্যাজ্য পুত্র করবেন বলে শাসন করেছেন, তারপর দু-এক বছর বাদে সব আবার ঠিক হয়ে গেছে। তাদের মা বাবা মেনে নিয়েছেন, ছেলে বউকে ঘরে তুলে নিয়েছেন। প্রথম প্রথম হয়ত মা বাবা রাজী হবেন না, কিন্তু দু-এক বছর সহ্য করে থাকতে পারলেই অরুণ করবীকে এই বাড়িতেই নিয়ে আসতে পারবে। কিংবা অন্য বাড়িতে থাকলেও বাবা মার অনুমোদন পেতে বাধা হবে না। কিন্তু যদি কোনদিন বাবা মা তাকে ক্ষমা করতে না পারেন, যদি চিরজীবনের জন্য যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন—তাহলে ? তাই বরং সম্ভব। ক্ষমা না করাই সম্ভব। সহ্য করতে না পারাই সম্ভব। করবী বিধবা। তা ছাড়া তার একটি ছেলেও আছে। তাঁদের পক্ষে এই বিসদৃশ বিয়েকে মেনে নেওয়া কঠিন। মেনে নিতে তাঁরা পারবেন না। সুতরাং বিয়ে করতে হলে এসব ঝুঁকি অরুণকে ঘাড়ে নিতেই হবে। বাপ মা ভাই বোনেদের সঙ্গে চিরদিনের বিচ্ছেদ, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কচ্ছেদকে মেনে নিতে হবে অরুণকে। তা হলই বা। করবীকে নিয়ে সে আলাদা বাসা করে থাকবে। সে আর করবী। না, শুধু সে আর করবী নয়। মাঝখানে আরও একজনকে স্থান দিতে হবে। পিপলু। করবী শাশুড়ী দেওরের মায়া কাটিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু পিপলুকে ছেড়ে আসতে পারবে না। ছেড়ে আসতে দেওয়া উচিত হবে না অরুণের। না না, সেটা অত্যন্ত অসঙ্গত হবে। নিষ্ঠুরতা হবে না করবীর উপর ? করবী মুখে হয়ত কিছু বলবে না, কিন্তু মনে দুঃখ পাবে। ছেলেকে চোখের সামনে না দেখলে ঘর সংসারের কাজে ওর মন লাগবে না। না, পিপলুকে নিজেদের কাছেই এনে রাখতে হবে। কারণ পিপলু করবীরই ছেলে। আশ্চর্য, করবীরই ছেলে কিন্তু অরুণের কেউ না। লোকজন বন্ধু-বান্ধব কেউ এলে অরুণ কি পরিচয় দেবে পিপলুর ? না মিথ্যে কথা সে বলতে পারবে না। অন্যের ছেলের পিতৃত্ব সে কেন নিতে যাবে ? বলবে আমার স্ত্রীর আগের পক্ষের—। স্ত্রীর আগের পক্ষের। ভারি অদ্ভুত, ভারি হাস্যকর কথাটা। না, ওভাবে বলা যাবে না। ঘুরিয়ে অন্য ভাষায় বলতে হবে। কিন্তু—

ছি ছি এসব কি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অরুণ ভেবে মরছে। করবীর চিঠির জবাব দিতে হবে অরুণকে। করবী তার প্রতীক্ষায় রয়েছে। *একটি দীর্ঘ চিঠি* রচনার জন্যে অরুণ দ্রুত পায়ে বাসার দিকে চলল। আজ আর কোন কুণ্ঠা সঙ্কোচের কারণ নেই। করবীর

সঙ্গে তার সম্পর্ক আজ অবারিত। করবীকে আজ যা খুশি লেখা যায়। চিঠির পাতায় মনের সব কথা করবীর উদ্দেশ্যে অরুণ আজ সমস্ত রাতটি নিবেদন করবে।

সন্ধ্যার পর অতুল মন স্থির করে ফেলল। কাল সকালেই সে কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার আগে রমার সঙ্গে সে একবার দেখা করে যাবে। শুধু একটিবারের জন্যে চোখের দেখা দেখে গেলে গোবিন্দ কিছু বলতে পারবে না। যদি বলেই তার কথা সহ্য করবে না অতুল। সে তো ছেড়েই যাচ্ছে, সে তো চলেই যাচ্ছে ; কিন্তু যাওয়ার আগে অন্তত রমাকে না দেখে সে যেতে পারবে না, যাবে না। ক'দিন ধরে সে রমাদের বাসার কাছাকাছি গিয়ে ফিরে এসেছে, ভিতরে ঢোকে নি। কিন্তু আজ নিজের ভীরুতাকে সে নিজেই ধিক্কার দিল। কেন অত ভয় কিসের, এত পরোয়া সে করবে কাকে। সদর দরজা খোলাই ছিল। অতুল আজ আর ইতস্তত না করে সোজা ভিতরে চলে গেল। বৈঠকখানা ঘরে কেউ নেই। সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠতে যাচ্ছে, কেশববাবু সামনে পড়লেন। তিনি নীচে নামছেন। অতুলকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন, ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'তুমি আবার এ বাড়িতে কেন ? তুমি কি চাও ?'

এই অভদ্র আচরণে অতুলের মেজাজ গরম হয়ে উঠল। অপমানের শোধ নেওয়ার জন্যেই সে মরিয়া হয়ে বলল, 'আমি কাল বাইরে চলে যাচ্ছি। রমার সঙ্গে দেখা করে যাব। ওর সঙ্গে দরকার আছে আমার।'

কেশববাবুর দুটো কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল, 'রমার সঙ্গে! পাজী বদমাস কোথাকার! তুমি আমার সামনে আমার মেয়ের নাম ধরে ডাকতে সাহস পাও! এত বড় স্পর্ধা তোমার ? বেরোও, বেরোও বলছি।'

রমা এসে পিছনে দাঁড়াল, 'কি হয়েছে বাবা ? তুমি অমন করছ কেন ?'

কেশববাবু গর্জে উঠলেন, 'অমন করছ কেন ? নেকী কোথাকার যেন কিছু জানেন না। তোর আস্কারা না পেলে ও ফের আসতে পারে এ বাড়িতে ? তোর সায় না থাকলে—'

রমা ফের বলল, 'বাবা ?'

কেশববাবু বলে চললেন, 'পাড়ায় আমার আর মুখ দেখাবার জো রইল না। ছি ছি ছি। অফিসে পর্যন্ত তোদের কেচ্ছা কেলেঙ্কারি গিয়ে পৌঁছেচে। লোকে আমাকে দেখলেই মুখ টিপে হাসে। গা টেপাটেপি করে। তোর এত বড় সাহস! আমার বাড়িতে থেকে, আমারই চোখের ওপর—'

কল্যাণী ব্যস্ত হয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, 'তোমরা শুরু করলে কি, এ্যাঁ।

কি হল তোমাদের। আমি তো মহা জ্বালায় পড়লাম তোমাদের নিয়ে। গোবিন্দই বা গেল কোথায়, সেই অফিস থেকে এসেই আড্ডা দিতে বেরিয়েছে, আর ফেরবার নাম নেই।'

কেশববাবু স্ত্রীর কথার কোন জবাব না দিয়ে ফের অতুলের দিকে তাকালেন, 'তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ! বেরোও এক্ষুনি—বেরিয়ে যাও। সোজা কথায় যদি না বেরোও আমি ঘাড় ধরে বের করে দেব। যাও এখান থেকে।'

রমা দৃঢ়স্বরে বলল, 'না, ও যাবে না। ওকে এমন করে অপমান করবার অধিকার নেই বাবা।'

কেশববাবু বললেন, 'অধিকার নেই! আমার বাড়িতে চড়াও হয়ে এসে ও আমার জামাইয়ের গায়ে হাত তুলবে, আমাকে অপমান করবে, আর ওকে বের করে দেওয়ার আমার অধিকার নেই? অধিকার আছে কি না আছে দেখবি? দেখাব?'

রমা বলল, 'না বাবা, যথেষ্ট হয়েছে। যথেষ্ট দেখলাম। আর আমার কিছু দেখে কাজ নেই।'

বলে কেশববাবুর পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল রমা।

কেশববাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ওকি তুই যাচ্ছিস কোথায়?'

রমা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'যেখানে আমার জন্যে তোমার কোন অপমান নিন্দা গ্লানি সহ্য করতে হবে না আমি সেখানে গিয়ে থাকব। আমি তোমার চোখের আড়াল হয়ে থাকব বাবা। দেখি, পৃথিবীতে আমার আর কোথাও কোন জায়গা আছে কিনা।'

কেশববাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'যাবি তো যা। ভারি তো বড়াই করছিস, যাওয়ার মধ্যে আছে তো এক শ্বশুরবাড়ি। সেখানে কত আদর, কত যত্নই পাবি। নেমকহারাম মেয়ে কোথাকার। যা, গিয়ে মজা দেখ গিয়ে একবার। মাতাল স্বামী মুগুর নিয়ে বসে আছে—।'

একথার কোন জবাব না দিয়ে রমা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে একা গিয়ে দাঁড়াল বড় রাস্তার সামনে। হাতে একটা কাপড়ের পুঁটুলি। আঁচলে বাঁধা দুখানা দশটাকার নোট, ও একেবারে তৈরী হয়ে এসেছে।

রাস্তার মোড়ে এসে রমা থমকে দাঁড়াল। যাবে কোথায়! সত্যি কোথায় আছে তার যাওয়ার জায়গা। রাস্তা দিয়ে ট্রাম বাস রিক্সা ট্যাক্সির স্রোত চলেছে। কত লোক আসছে যাচ্ছে। প্রত্যেকেরই গন্তব্যের ঠিক আছে। শুধু রমারই নেই। নেই কোন ঠিকানা। যা সব ঘটে গেছে তাতে শ্বশুরবাড়ি আর যাওয়ার জো নেই। সেই অপমানের অন্ন কিছুতেই রমার মুখে উঠবে না। তা ছাড়া সেখানে সে যাবে কার কাছে! স্বামীর

কাছে ? সেই মাতাল বদমাস স্বার্থপর পুরুষটিকে রমা আর স্বামী বলে স্বীকার করে না। তার সঙ্গে রমার সম্পর্ক অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। বাবার কাছেও আর থাকা চলে না। তিনি তো স্পষ্টই বলে দিলেন রমার জন্যে তাঁর লাঞ্ছনা আর অপমানের শেষ নেই। পাড়ায় তিনি মুখ দেখাতে পারেন না। এসব শুনেও সে কি করে সেখানে থাকে। শুধু খাওয়া পরাটাই কি সব। মান-মর্যাদা সুখ-শান্তি বলে কি কিছু নেই।

দূর সম্পর্কের দু-একঘর আত্মীয়, বন্ধু শ্রেণীর দু-চারটি পরিচিতা মেয়ের মুখ মনে এল রমার। তাদের ঠিকানা সে জানে। কিন্তু তারা এখন স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর-সংসার করছে। তাদের ওখানে এখন হঠাৎ গিয়ে ওঠা কি ঠিক হবে ? তারাই কি রমাকে স্থান দেবে ? আর আছে শহরের নানা ধরনের নানা শ্রেণীর মহিলা-আশ্রম। আত্মীয় স্বজনহীন আশ্রয়হীন মেয়েদের সেখানে স্থান হয় রমা শুনেছে। কিন্তু কোথায় সে সব আশ্রম আছে, যারা সে সব চালায় তারা কি প্রকৃতির মানুষ কিছুই রমা জানে না। তা ছাড়া নিজেকে এমন নিঃস্ব নিরুপায় বলে ঘোষণা করতেও তার সম্মানে বাধল। না, রমা তেমনভাবে কোথাও যাবে না, কারো আশ্রয় নেবে না, স্বাধীনভাবে সে একা থাকবে। নিজের খাওয়া-পরার সমস্যার সমাধান সে নিজে করবে। রমা আর কারো দ্বারস্থ হবে না, কারো সাহায্য চাইবে না। সবাইকে দেখাবে সে একা থাকতে পারে কি না।

'রমা !'

চমকে উঠে রমা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল, 'কে ?'

অতুল কোন জবাব দিল না, নিঃশব্দে আরও কাছে সরে এল।

রমা বলল, 'তুমি আমার নাম ধরে ডাকছ !'

অতুল বলল, 'সেটা বড় কথা নয়। তুমি যদি পছন্দ না করো নাম ধরে ডাকব না! তুমিই ডেকো এতদিন যেমন ডাকছিলে। নামের কথা নয়, আজ আমি অন্য কথা বলতে এসেছি।'

অতুলের বলবার ভঙ্গি দেখে একটু যেন কেঁপে উঠল রমা, দুরু দুরু করতে লাগল বুক। আস্তে আস্তে বলল, 'অন্য কথা, কি কথা আর বাকী আছে তোমার ?'

অতুল বলল, 'সবই বাকি। তুমি ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছ ঠিকই করেছ, ওখানে থাকা আর তোমার মানায় না। এবার তুমি আমার সঙ্গে চল।'

রমা অস্ফুটস্বরে বলল, 'তোমার সঙ্গে! কোথায় !'

অতুল বলল, 'নৈহাটিতে আমার সেই চাকরির জায়গায় !'

রমা বলল, 'সেখানে গিয়ে আমি কি করব !'

জনকয়েক'লোক বার বার কৌতূহলী হয়ে তাদের দিকে তাকাচ্ছে।

এতক্ষণে তা খেয়াল হল অতুলের।

এটা মনের কথা বলবার মত নিভৃত নিরালা জায়গা নয়, কলকাতার রাস্তা। জনারণ্য। অরণ্য, কিন্তু প্রত্যেকটি গাছপালার চোখ আছে, কান আছে; মুখ আছে, জিভ আছে। হাতের ইশারায় একটা খালি ট্যাক্সিকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিল অতুল। তারপর নিজেই গাড়ির দরজা খুলে রমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওঠো।'

রমা তেমনি মৃদুস্বরে বলল, 'কিন্তু এর পরিণাম—'

অতুল বাধা দিয়ে বলল, 'পরিণামের কথা আমি জানি। আমি তার জন্যে তৈরী। তুমিও তো তৈরী হয়েই এসেছ। চল আর দেরি করো না। গাড়িতে বাকি সব বলব।'

আর কোন প্রতিবাদ না করে রমা গাড়িতে উঠে বসল। অতুল তার পাশে গিয়ে বসে ড্রাইভারকে বলল, 'শিয়ালদ' স্টেশন।'

ট্যাক্সি ছুটে চলল।

রমা যে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে সত্যি সত্যি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, একথা যেন কেশববাবু বিশ্বাস করতেই পারছিলেন না। মেয়ের আচরণে তিনি খানিকক্ষণ বিহ্বল স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। একটু বাদে স্ত্রীর কথায় তাঁর চমক ভাঙল, 'ওকি, চুপচাপ বসে আছ যে। দেখ, এত রাত্রে মেয়েটি কোথায় গেল।'

কেশববাবু বললেন, 'যাক্, যে চুলোয় ওর খুশি। আমার কি! অমন মেয়ের আমি মুখ দর্শন করতে চাই নে।'

কল্যাণী বললেন, 'তা তো চাও না; কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়, সে খেয়াল আছে?'

কেশববাবু বললেন, 'শ্বশুরবাড়ির নাম করে গেল যে, সেখানে এক দণ্ডও টিকতে যদি পারে। আমি তোমাকে বলে দিলাম।'

কল্যাণী বললেন, 'বয়ে গেছে ওর সেখানে যেতে। অতুলটা সঙ্গে সঙ্গে গেল লক্ষ্য করলে না? নিশ্চয়ই ওরা কোথাও—'

কেশববাবু বললেন, 'এঁ্যা, বলছ কি তুমি। ওদের এত বড় সাহস হবে, এত স্পর্ধা? আমাদের চোখের ওপর দিয়ে—'

ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু কাছে-ধারে তাদের কোন চিহ্নও দেখতে পেলেন না।

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর কেশববাবু বাসায় ফিরে এলেন। ততক্ষণে গোবিন্দও ফিরে এসেছে।

কেশববাবু ছেলেকে বললেন, 'তুই শিগ্‌গির শ্যামবাজার যা। গিয়ে দেখে আয় রমা

সেখানে গেছে কিনা।'

গোবিন্দ বলল, 'আপনি যেতে বলেন যেতে পারি। কিন্তু গিয়ে আর কোন লাভ হবে না বাবা।'

কল্যাণী অস্ফুটস্বরে বললেন, 'সর্বনাশী, এই তোর মনে ছিল?'

পাঁচ বছরের মেয়ে পিণ্টু বলল, 'বড়দি কোথায় গেল বাবা। আমাকে নিয়ে গেল না যে।'

কেশববাবু বজ্রনাদে তাকে ধমকে উঠলেন, 'চুপ।'

অনেক রাত পর্যন্ত চিঠির জবাব ঠিক করে লিখে উঠতে পারল না অরুণ। যত বার শুরু করল, ততবারই কতকগুলি 'কিন্তু' মনের কোণে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। নতুন করে লিখবার আয়োজন করছে, বাসন্তী এসে দোরের কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ শুকনো, পা কাঁপছে।—'নান্তু।'

সাদা প্যাডটা লুকিয়ে ফেলে অরুণ তাড়াতাড়ি সামনের দিকে তাকাল,'কি হয়েছে মা?'

বাসন্তী বললেন, 'বাইরে আয়, শোন। নীচে গোবিন্দরা সব কি বলছে শোন।'

অরুণ বলল, 'কি বলছে?'

বাসন্তী গলা নামিয়ে বললেন, 'ওদের নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।'

অরুণ বলল, 'ওদের মানে কাদের?'

বাসন্তী বললেন, 'অতুল আর রমাকে।'

খুঁজে লাভ নেই তবু মার সান্ত্বনার জন্যে পারিবারিক কর্তব্য হিসেবে গোবিন্দদের দলের সঙ্গে ভাইকে খুঁজতে বেরোল অরুণ। সম্ভাব্য সব জায়গায় একবার করে খোঁজ নিয়ে এল। রাত কাটল। পরের দিন সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা কেটে গেল, অতুলদের কোন সন্ধান মিলল না। গোবিন্দ অবশ্য বেশিক্ষণ অরুণের সঙ্গে সহযোগিতা করল না। অতুলের নামে থানায় গিয়ে ডায়েরী করে এল। সে কথা অরুণকে জানিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখি কতদিন লুকিয়ে থাকতে পারে। আমি শেষ পর্যন্ত লড়ব। আমি ওকে কিছুতেই ছাড়ব না। এতদিনের বন্ধু হয়ে ও যখন আমার সঙ্গে এমন চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারল, আমিও এর শোধ নেব, আপনাকে স্পষ্ট বলে দিলুম।'

বাইরে থেকে অবনীমোহনের কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। অন্য দিনের মতই অফিসে গেলেন, অফিস থেকে ফিরে এলেন। বাড়ির ভিতরের বাইরের নানারকম আলোচনা সমালোচনা, শ্লেষ, ব্যঙ্গোক্তি কিছুই যেন তাঁর কানে গেল না। সকালের দিকে

কেশববাবু উত্তেজিতভাবে অতুলের আচরণ নিয়ে অভিযোগ করতে এসেছিলেন, অবনীমোহন তাঁকে বলে দিয়েছেন, 'আপনার মেয়ে তো নাবালিকা নয়। সে বুঝে শুনে স্বেচ্ছায় ওর সঙ্গে গেছে। এতে আপনারও কিছু করবার নেই, আমারও কিছু করবার নেই। আপনি এবার বাড়ি যান।'

কেশববাবু গাল দিতে দিতে বলেছেন, 'এমন বাপ না হলে কি অমন দুশ্চরিত্র কুপুত্র জন্মায় ?'

অবনীমোহন মৃদু হেসে এই তিরস্কার সহ্য করেছেন, কোন জবাব দেন নি।

কিন্তু ওই হাসির আড়ালে যে অত্যন্ত মর্মান্তিক দুঃখই তিনি গোপন করেছেন তা অরুণের বুঝতে বাকি থাকে নি। তাঁর কাছে না গিয়ে সঙ্গে কথা না বলেও অরুণ যেন বাবার সঙ্গে এক গম্ভীর নৈকট্য বোধ করল। নতুন করে নিবিড় একাত্মতা বোধ করল মার সঙ্গে।

রাত্রে ঘরে এসে মনে পড়ল করবীর চিঠির জবাব দেওয়া হয় নি। কাটাকুটি ভরা পাতাটি ছিঁড়ে ফেলে প্যাডের নতুন পাতায় অরুণ ফের জবাব লিখতে বসল—

করবী,

তোমার চিঠির জবাব দিতে পুরো একটা দিন দেরি হয়ে গেল। এই চব্বিশ ঘণ্টা তোমার যে মিনিট গুনে গুনে কেটেছে, তা আমি জানি। আমারও তাই কাটবার কথা ছিল। কিন্তু একটি পারিবারিক ঘটনায় ঘড়ির দিকে তাকাবার আর সময় পাই নি। অতুল রমাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। অনুসন্ধান বৃথা জেনেও মার মুখের দিকে তাকিয়ে তার জন্যে ছুটোছুটি না করে পারি নি। আমার মুখে কথাটা শুনতে ভারি অদ্ভুত লাগছে, না করবী ? আমারও মা আছে, আর আমিও তাঁর দিকে তাকাই। সত্যি, ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে হয়েছে আমাদের পরিবারে বড় বেশি মানুষ, বড় বেশি ভিড়। হাঁটতে গেলে গায়ে গা ঠেকে, মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়, সেই স্পর্শানুভূতি আমার কাছে কোনদিনই সুখকর মনে হয় নি, আমি তাই সব সময় ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেছি। আমার চিলেকোঠাকে গোটা বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছি। আমার চিন্তা, আমার ভাবনা, আমার স্বাতন্ত্র্যের দেয়ালে চারদিক ঘিরে ভেবেছি আমি একক। আমি সকলের চেয়ে আলাদা, ওদের কারো সঙ্গেই আমার কোন যোগ নেই। কি করে থাকবে ! শিক্ষা-দীক্ষা রুচি-প্রবৃত্তি সব কিছুতে ওদের সঙ্গে আমার অমিল ! আমি রক্তের সম্বন্ধ মানি নে, ভাবের সম্বন্ধ মানি।

এতদিন আমি তাই ভেবেছি। তুমি যখন মাঝে মাঝে আমাদের পরিবারের লোকজনের কথা জিজ্ঞেস করেছ, আমি তার জবাব ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছি। পরিবারের কারো

সম্বন্ধেই আমার কোন ঔৎসুক্য ছিল না, এমন কি মার সম্বন্ধেও নয়। মা তো ছোট ভাই বোনেদের মা, আমার কি। দেড় বছর দু-বছর অন্তর অন্তর আমার এক একটি করে ভাইবোনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর মার সঙ্গে আমার ব্যবধান বেড়ে গেছে। মার স্ফীতোদরের দিকে আমি চোখ তুলে তাকাতে পারি নি। আমার লজ্জা হয়েছে, ঘৃণা হয়েছে, অদ্ভুত বিদ্বেষে আমার মন ভরে উঠেছে। দরিদ্রের সংসারে আবার এক অংশীদার এল। আর সব কিছুর জন্যে দায়ী আমার বাবাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি নি। তাঁর ওপর আমার আক্রোশ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে।

এই তো আমার পরিবার। আর এই তো তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। কিন্তু কাল রাত্রে ছোট একটি ঘটনায় সব কিছুই যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। কালও ঠিক এমনিভাবে তোমার কাছে চিঠি লিখতে বসেছি, মা এসে আমার চিলেকোঠার চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলেন 'নান্তু!' আমি চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকালাম। তাঁর ঠোঁট দুটি শুকনো। মুখখানা বিবর্ণ, চোয়াল আর কণ্ঠাস্থি জেগে উঠেছে। একতলা থেকে তিনতলার এই ছাদে উঠে আসতে মা হাঁপিয়ে পড়েছেন। শুধু তাঁর শীর্ণ দেহটিকেই তো টেনে আনতে হয় নি, আর একটি ভারও তাঁকে বয়ে আনতে হয়েছে। তিনি ন' মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এর আগের সন্তান হওয়ার সময় মা প্রায় মর-মর হয়েছিলেন। তখনই আমাদের পারিবারিক ডাক্তার বলেছিলেন, 'এবারও বাঁচান গেল, কিন্তু এর পরও যদি এমন হয়, কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না।' ওঁকে রক্ষা করবার জন্যে গোড়া থেকেই আমাদের সেই ডাক্তার বন্ধু অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরামর্শ নিতে বাবা যদি বা নিমরাজী হলেন মা কিছুতেই রাজী হন নি। আমরাই তো তাঁর সব সুসন্তানের নমুনা। তবু নিজের প্রাণের আশঙ্কা সত্ত্বেও একটি সম্ভাবনাকেও তিনি স্বেচ্ছায় নষ্ট হতে দেবেন না। আমি জানি এই অশিক্ষা এই অযৌক্তিক সংস্কার হয়ত তাঁকে রেহাই দেবে না, হয়ত চরম শোধ নিয়ে ছাড়বে। কারোরই কিছু আর করবার থাকবে না। কিন্তু এখনই বা কি করতে পারি বল।

মা ডাকলেন, 'নান্তু'!

আমি তাঁর দিকে তাকালাম। যেন ঝড়ের ঝাপ্‌টায় ছিন্নপক্ষ এক মুমূর্ষু বিহঙ্গী আমার সামনে এসে আর্ত চীৎকারে আছড়ে পড়েছে। বললুম, 'কি হয়েছে মা?'

'অতুলরা পালিয়ে গেছে।'

মা আর কিছু বলতে পারলেন না, শুধু মুহূর্তকাল আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর নিষ্প্রভ, নিষ্পলক, নিষ্প্রাণ দৃষ্টির বর্ণনা আমি দিতে পারব না করবী, আমার সে ভাষা নেই। আমি শুধু অনুভব করলুম অনেক দেশ অনেক দেশান্তর পার হয়ে বহু যুগ যুগান্তরের

শেষে মা আমার কাছে এলেন। আমি তাঁকে কাছে পেলুম, আমি তাঁকে কাছে পেলুম করবী।

আশ্চর্য! এই আমার প্রথম প্রেমপত্র, কে জানে হয়ত শেষও। আর আমার প্রিয়ার কাছে লিখছি আমার মার কথা। হ্যাঁ লিখছি আমার আজ মনে হচ্ছে কি জানো, যে মাকে passionately ভালোবাসতে পারে না সে আর কোন মেয়েকেও পারে না। কোন মেয়েকে তীব্রভাবে ভালোবাসতে হলে গানের ধুয়োর মত বার বার মার কাছে ফিরে আসতে হয়। বার বার মার কাছ থেকে ভালোবাসার দীক্ষা নিতে হয়।

তাছাড়া আমি তো শুধু আমার প্রিয়ার কাছেই চিঠি লিখছি নে করবী। আমি যে আর একজনের মার কাছে লিখছি। আমি পিপলুর মার কাছে লিখছি আমার মার কথা। আমি নিজের কথা ভাবতে গিয়ে পিপলুর কথা ভাবছি। আমি নিজের মাকে দেখতে পেয়ে পিপলুর মাকে দেখতে পাচ্ছি।

দেখতে পাচ্ছি তো বললুম কিন্তু পুরোপুরি পেয়েছি কি, পুরোপুরিই পেয়েছি কি? আমি আমার করবীর সঙ্গে পিপলুর মাকে এক করে মিশিয়ে নিতে পেরেছি কি? না করবী, তা আমি পারি নি। তা করতে গিয়ে আমি রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছি। আমি আমার অক্ষমতার কথা গোপন করব না করবী। আমার সমস্ত দৈন্য, সমস্ত হীনতা, সকল লজ্জা, সকল কলঙ্ক তোমার কাছে আমি অবারিত করব। তুমি আমাকে দেখ, তুমি আমাকে জানো, তারপর তুমি আমাকে নাও, তুমি তোমাকে দাও, তার আগে নয় করবী, তার আগে নয়। জানো করবী, এখনও তোমার মৃত স্বামীকে আমি ঈর্ষা করি, তোমার জীবন্ত পুত্রকে ঈর্ষা করি, আর এই দুই ঈর্ষার কাঁটার মাঝখানে আমার ভালোবাসার ফুল। ফুল, কিন্তু তার পরাগের পরতে পরতে সংশয় আর বিদ্বেষের কীট। আমরা ঘর বাঁধলে কি হবে করবী, সেই কীট যে সমস্ত বাঁধন টুকরো টুকরো করে কাটবে।

পিপলুকে বাদ দিয়ে এমন কি তোমার শাশুড়ী আর দেওরকে বাদ দিয়ে আমি তো তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাব না। অথচ সবাইকে নিতে পারি, তত বড় জায়গা আমার কই! তত বড় ঘর তো আমার তৈরী হয় নি করবী। আর যতদিন সেই ঘর না হচ্ছে ততদিন গৃহস্থ হই কি করে? আমি ভেবে দেখেছি করবী, তুমিও তা পার না। নহ মাতা নহ কন্যা হয়ে তুমি কিছুতেই আমার কাছে পূর্ণভাবে আসতে পার না, কিন্তু আধখানা আসায় কি আশা মেটে? নারীকে চাইতে গিয়ে পরীকে চাই। কিন্তু পরী তো পরিপূর্ণ নয়।

করবী, এ কি জ্বালা, পূর্ণকে নিতে পারি নে পূর্ণকে ছাড়তেও কষ্ট। আমার আর

একটা মন বলছে কি জানো, আমি ঠকলুম, আমি ঠকলুম, আমি হারালুম, আমি সব হারালুম। আমি কেন অতুলের মত হলুম না। আমি কেন ওর মত তোমাকে তোমার স্বজন সংসার থেকে ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে গেলুম না। এ কি আমার বাহুর জোরের অভাব, না হৃদয়ের জোরের। কিন্তু যতই চেষ্টা করি, আমি কিছুতেই তা পারব না। কিছুতেই অতুল হতে পারব না। এই দ্বিধা,সংশয়, এই দৌর্বল্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই বোধ হয় বিজু বিষ খেয়ে মরেছিল। কিন্তু আমার পক্ষে তাও সম্ভব নয় করবী, সে সাধ্যও আমার নেই। আমি আক্ষেপ করে মরব, আফসোস করে মরব, কিন্তু বিষ খেয়ে মরতে পারব না। আমি নিজেকে চিনেছি করবী। আমি বিজুর মত মৃত নই, আমি অতুলের মত জীবিত নই, আমি জীবন্মৃত।

কিন্তু জীবন্মৃতের জন্যেই তো অমৃতের প্রয়োজন, করবী। সে অমৃত আমার হাতের কাছে এসেছিল, কিন্তু হাত পেতে নিতে পারলুম না, হাত পেতে রইলুম। হাত বাড়িয়ে থাকব। ইতি।

অরুণ

শেষ

দেহ মন

'এসো আলাপ করিয়ে দিই, ইনি শ্রীমতী রুবি রায়। আমাদের পাশের ঘরের প্রতিবেশিনী। বোম্বাইয়ের মস্ত বড় একটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মস্ত বড় এজেণ্ট, তুমি যাকে যমের মত ভয় কর। নাও ভাই রুবি, নতুন একটি পার্টি তোমাকে জুটিয়ে দিলাম। এখন আমার কপাল আর তোমার হাতযশ।'

আড়চোখে স্বামীকে একবার দেখে নিয়ে উমা বন্ধুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

রুবি নমস্কারের জন্যে দু'খানা হাত জোড় করে লীলায়িত ভঙ্গিতে নিজের চিবুক পর্যন্ত তুলল, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'পরিচয়টা একতরফা হোল। কারণ স্বামীর নাম উমা মুখে আনে না, মনে মনে জপ করে। কিন্তু ও না বললেও আপনার নাম আমি শুনেছি বিভাসবাবু। আপনি যে এই ইণ্টালী অঞ্চলে রীতিমত একজন নামকরা লোক তাও শুনতে বাকি নেই।'

বিভাস প্রতি নমস্কার করে নীরবে স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর বান্ধবীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে কি দেখল। নমস্কারের জন্যে যে হাত দুখানা রুবি তুলেছে তার আঙুলগুলিকে চাঁপার কলির সঙ্গেই হয়ত তুলনা করা যেত, কিন্তু প্রত্যেকটি নখের বিজাতীয় খয়েরী পালিশ বিভাসের চোখকে পীড়িত করল। সুন্দর পাতলা ঠোঁট দুটিতে যে হাসিটুকু এখনও লেগে রয়েছে তাও বিভাসের অপরূপ মনে হতে পারত, কিন্তু রুবির ঠোঁটে শুধু হাসিই নেই, সেই সঙ্গে চড়া রঙের লিপস্টিকও রয়েছে। ঈষৎ লম্বাটে ধরনের মুখের ডৌলটির স্বাভাবিক রঙ আর সৌন্দর্য পাউডারের অতি স্পষ্ট প্রলেপে ব্যাহত। আয়ত-সুন্দর কালো চোখ দুটিতে এই বেলা দশটার সময় সুর্মা টানবার কোন প্রয়োজন ছিল বলে বিভাসের মনে হোল না। বাঁ হাতের মণিবন্ধে একটু কালো ফিতায় একটি ক্ষুদ্রাকার ঘড়ি ছাড়া আর কোন বন্ধন নেই, কিন্তু কানে আর গলায় আভরণ আছে। তার প্রগাঢ় রক্তচ্ছটা প্রবালের নয়, প্ল্যাস্টিকের। পরনেও চড়া রঙের জর্জেট। কাঁচুলীর অতিরিক্ত কারসাজি ছাড়া বাংলাদেশের চব্বিশ পঁচিশ বছরের মেয়ের বক্ষচূড় অমন উত্তুঙ্গ রাখা সম্ভব নয়।

বিভাস ভ্রূ কুঞ্চিত করে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রুবির কথার জবাবে গম্ভীর ভাবে বলল, 'এপাড়ায় মাস ছয়েক আছি। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ আমার নাম ধাম জানবেন সেই তো স্বাভাবিক। তার জন্যে নামকরা লোক হবার প্রয়োজন হয় না। নামকরা লোক আমি নইও।' বিভাসের ভ্রূ-ভঙ্গি রুবির চোখ এড়ায়নি। প্রথম আলাপেই তার বিরূপ

ভাবভঙ্গি রুবির মনকেও অসহিষ্ণু করে তুলেছে। কিন্তু মনের উত্তাপকে বাইরে প্রকাশ করতে না দিয়ে এবারও সে মৃদু হাসল, 'কেন যে এতদিন আপনি নাম করেননি—তাই ভেবে অবাক হচ্ছি।'

বিভাস এবার বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন, অবাক হবার কি আছে?'

রুবি বলল, 'কিছু আছে বইকি। নেতৃত্বের প্রত্যেকটি লক্ষণ আপনার চোখ মুখ থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।' রুবির ঠোঁটের চাপা হাসিতে শ্লেষ আর ব্যঙ্গ অপরিস্ফুট ছিল না।

কিন্তু বিভাস সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে শান্ত গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'সে লক্ষণগুলি কি?'

রুবি বলল, 'ওমা তাও জানেন না! কেন উমা কোনদিন বলেনি আপনাকে?'

'না, আপনিই বলুন শুনি?'

'আপাতত অফিসের সময় বয়ে যাচ্ছে।' রুবি বলল, 'আচ্ছা পরে এসে শোনাব। উমা আমি ভাই এবার বেরিয়ে পড়ি। এই ছিঁচকাঁদুনে বৃষ্টি আজ আর থামবে বলে মনে হচ্ছে না!'

জানলা দিয়ে বাইরের বৃষ্টির দিকে একটু তাকিয়ে উমা চোখ ফিরিয়ে আনল, 'কিন্তু কি করে বেরুবে! এই না বললে তোমার ছাতাটা ভাঙা?'

রুবি বলল, 'তা হোক। যেটুকু আছে তাতেই বেশ কাজ চলে যাবে।'

রুবি বেরুবার উপক্রম করল।

উমা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি তো ভারি স্বার্থপর রুবি। তোমার তবু একটা ছাতা আছে। কিন্তু ওর যে তাও নেই। উনি কি করে বেরুবেন! এত করে বলি হয় একটা ছাতা, না হয় রেইন কোট-টোট কিছু একটা কিনে নাও। ট্রাম লাইন থেকে এত দূরে যখন বাসা; আর যত রাজ্যের বৃষ্টি—সব যেন এবার কলকাতার সহরে এসে পড়েছে।'

রুবি হেসে বলল, 'তা তো ঠিকই। আষাঢ় মাসের বৃষ্টিরই যত দোষ। কিন্তু স্বার্থপর আমি কতখানি পরার্থপর হতে পারি বলতো? এক ভাঙা ছাতার তলায় দু'জনে না হয় ভিজতে ভিজতে যেতে পারতাম। কিন্তু ঝগড়া করতে করতে তো আর যেতে পারি না। তাতে দু'জনেই লেট হব। তার চেয়ে বিভাসবাবুকে আজ ঘরেই আটকে রাখ, সেই ভালো।'

রুবি আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল। উমা জানলা দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ বাড়িয়ে বলল, 'তার চেয়ে এক কাজ কর না—মোড় থেকে একটা রিক্সা ডেকে আন, দুজনেই একসঙ্গে যেতে পারবে।'

রুবি যেতে যেতে বলল, 'আচ্ছা, রিক্সা যদি পথে চোখে পড়ে, পাঠিয়ে দেব।'

খানিক বাদে রুবি চোখের আড়ালে চলে গেলে উমা বলল, 'কেমন, কি রকম মেয়ে একখানা দেখলে তো? তোমাকে একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়ে চলে গেল। একটি কথাও বলতে পারলে না! তুমি পার কেবল আমার সঙ্গে।'

বিভাস গম্ভীর ভাবে বলল, 'হুঁ।'

স্বামীর ওপর এবার একটু যেন মায়া হোল উমার, বলল, 'অবশ্য তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। তুমি কেন, কেউ পারে না ওর সঙ্গে। ওর কীর্তিকলাপ যদি শোন তুমি, থ' হয়ে যাবে। ও তো মেয়ে নয়, পুরুষের বাবা।'

বন্ধুগর্বে একটু দীপ্ত দেখাল উমাকে।

বিভাস স্ত্রীর দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, 'দেখ তোমাকে একটা কথা বলি। মেয়েদের সঙ্গে যতো ইচ্ছা মেশো, পুরুষের সঙ্গেও যত খুসি মেশো, কিন্তু যে মেয়ে পুরুষের বাবা, তার সঙ্গে তোমার মিশে মোটেই দরকার নেই। মেয়েটি আসলে ইঁচড়ে পাকা।'

উমা এবার প্রতিবাদ করে বলল, 'আহাহা, ওর মধ্যে ইঁচড় আবার কোথায়! এখনো বিয়ে করেনি বলে মুখের অমন কচি কচি ভাবটুকু আছে। কিন্তু তাহলে হবে কি, বয়সে আমার চেয়ে ও দু'এক বছরের বড় ছাড়া ছোট হবে না। ইঁচড় নয়—একেবারে গোলগাল পাকা কাঁঠাল। তবে সারা গায়ে কাঁটা। আদর করে যে কেউ একটু গায়ে হাত বুলাবে তার জো নেই। যত মুস্কিল সেইখানে।'

বিভাস ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ থাম। সঙ্গের মাহাত্ম্য এরই মধ্যে ফলতে সুরু করল দেখছি। খবরদার কাঁঠালের আঠা যেন গায়ে আর বেশি না জড়ায়।'

উমা হেসে বলল, 'আচ্ছা। আমার গায়ে আঠা জড়িয়ে আর কত ক্ষতি হবে। তেল সাবানে ঘষে ঘষে আঠা তুলে ফেলবার লোক তো রয়েইছে। আমার আর ভয় কি।'

দোরের সামনে ঠুন ঠুন করে একটা রিক্সাওয়ালা এসে দাঁড়াল, 'বাবু!'

উমা বলল, 'ওই দেখ, তুমি তো রুবির কত নিন্দা করলে। আর ও তোমার জন্যে সত্যিসত্যিই একটা রিক্সা পাঠিয়ে দিয়েছে। দেখ কিরকম ভদ্র।'

বিভাস ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'আবার মিছামিছি একটা রিক্সা আনালে কেন বলতো, অনর্থক আনা চারেক পয়সা খরচ হবে। বৃষ্টি কমে এসেছিল, এইটুকু পথ তো হেঁটেই যাওয়া যেত।'

পাশের ঘরে বিভাসের দেড় বছরের ছেলে বাবলু কেঁদে উঠল।

'তোমার ছেলেকে এবার নাও উমা। কিছু খাওয়াও টাওয়াও এবার। পেটে কিছু

না থাকলে কি আর চোখে ঘুম আসে। বলতে বলতে ছেলে কোলে নিয়ে উমার পিসি-শাশুড়ী সুরবালা এসে ঢুকলেন। চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি তাঁর পরনে। বয়স পঞ্চান্ন পেরিয়ে গেছে, পাক ধরেছে চুলে। আর সেই পাকা চুলের সিঁথির মধ্যে সিঁদুরের প্রশস্ত রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হাতে শুধু দু'গাছি মোটা শাঁখা। আর কোথাও কোন আভরণ নেই। পানের রসে ঠোঁট দুটি লাল। ভারি সুন্দর মানিয়েছে। একটু আগে দেখা রুবির রক্তবর্ণ ঠোঁটের কথা মনে পড়ল বিভাসের। সে রঙের চেয়ে পিসীমার ঠোঁটের রঙ অনেক সুন্দর, অনেক স্বাভাবিক। যত বয়স বাড়ছে ততই যেন বেশি সুন্দরী, আর স্নেহশীলা হয়ে উঠছেন পিসীমা। দীর্ঘশ্বাস চেপে বিভাস রিক্সায় গিয়ে উঠল। উমা পিসি-শাশুড়ীর কাছ থেকে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে একটু আড়ালে চলে গেল।

সুরবালা দোরের পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'ও বিভু, সামনের ঢাকনিটা ফেলে নে না? জলের ছাঁট লাগে না গায়ে?'

বিভাস মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, 'না পিসীমা, মোটেই ছাঁট লাগে না। তুমি যাও ভিতরে।'

সুরবালা আবার বললেন, 'বাদল বৃষ্টির দিন, সকাল সকাল ফিরে এসো। কালকের মত রাত কোরো না যেন বাপু।'

বিভাস স্মিত মুখে বলল, 'না পিসীমা রাত হবে না, তাড়াতাড়িই ফিরব।'

গলি ছাড়িয়ে রিক্সা মিডল রোডে পড়ল। আর চিলড্রেনস্ পার্কের ঠিক কোনটায় এসে বিভাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রুবির। ছোট ভাঙা ছাতাটা কোনরকমে মেলে ধরে প্রায় ভিজতে ভিজতে রুবি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। সামান্য ইতস্ততঃ করল বিভাস। তারপর রিক্সাওয়ালাকে একটু থামতে বলে রুবিকে লক্ষ্য করে বলল, 'ভিজে লাভ কি? রিক্সায় আসুন।'

রুবি একবার চমকে উঠল—তারপর বিভাসের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'ধন্যবাদ।'

কিন্তু রিক্সায় উঠল না।

সার্কুলার রোডের মোড়ে রুবির চেয়ে দু'তিন মিনিট আগেই অবশ্য এসে পৌঁছুল বিভাস। কিন্তু অত্যন্ত ভিড় থাকায় প্রথম ট্রামটা ধরতে পারল না। পরের ট্রামে ভিড় একটু কম। উঠতে গিয়ে দেখে তার আগেই রুবি এসে হাতল ধরেছে।

বসবার জায়গা নেই। একটি লেডিজ সীট মার্কা বেঞ্চে দু'জন ভদ্রলোক বসেছিলেন। রুবিকে দেখে তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। রুবি জানলার দিকটায় বসে বিভাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বসুন।'

বিভাস মাথায় ওপরকার রডটা হাত বাড়িয়ে ধরতে ধরতে বলল, 'ধন্যবাদ।'

রুবি মুখ মুচকে একটু হাসল, তারপর যে দু'জন ভদ্রলোক আসনচ্যুত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কমবয়সী আরোহীটির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে পরম সৌজন্যে বলল, 'দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি! আপনি বসুন এসে।'

যুবকটি কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে রুবির পাশে গিয়ে বসল। তার সঙ্গী প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঈর্ষা-কুটিল দৃষ্টিতে সেদিকে একটু তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। এমনকি মুহূর্তের জন্যে রুবির মুখও একটু যেমন আরক্ত হয়ে উঠল।

শম্ভুবাবু লেনের পুরনো একতলা বাড়িটায় উমারা আজ মাস পাঁচ ছয় ধরে রয়েছে। দক্ষিণ দিকে দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে মাত্র দিন চারেক হোল উঠে এসেছে রুবিরা। ঠিক রুবিরা বলা যায় না, শুধু রুবিই আছে। প্রথমে ওর সঙ্গে সাতাশ আটাশ বছরের মোটাসোটা সাধারণ দর্শন আরও একটি যুবক এসেছিল। ওদের আলাপ-আলোচনা থেকে উমা টের পেয়েছিল ছেলেটি রুবির দাদা কিন্তু ভাই-বোনের ভিতর যতখানি স্নেহ আর সৌহৃদ্য সাধারণত থাকে, এদের ভিতরে যে তা নেই, তাও অনুমান করতে উমার দেরি হয়নি।

সকাল থেকেই দু'জনের মধ্যে কথায় কথায় খিটিমিটি সুরু হয়েছিল। সন্ধ্যার পর সেই খিটিমিটি দাঁড়াল ঝগড়ায়—আর রাঁধতে রাঁধতে উমা নিজের জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। অবশ্য উৎকর্ণ হবার প্রয়োজন ছিল না। ওরা যত জোরে কথা বলছিল, পর্দাফেলা জানলার কাছে এসে না দাঁড়ালেও তা উমার কানে যেত।

রুবির দাদার গলা শোনা গেল, 'তোর বৌদিকে নিয়ে এখানে আমি উঠতে রাজি আছি, কিন্তু আমার কথামত তোকে চলতে হবে। তুই যে যা খুসি তাই করে বেড়াবি—'

রুবি বাধা দিয়ে বলল, 'আমি তোমার আর বৌদির খুসি অনুযায়ীই চলব, কিন্তু বাসা খরচ টু-থার্ড তোমাকে দিতে হবে আর বাড়িতেও নিয়মিত টাকা পাঠাতে হবে, রাজি আছ?'

রুবির দাদা বলল, 'আর তোর টাকা বুঝি সিনেমা থিয়েটার দেখে ফুর্তি করে ওড়াবি?'

রুবি বলল, 'না সিনেমা থিয়েটারও যদি তোমরা দেখাও তা হলেই দেখব। তোমাদের অনুমতি ছাড়া বাড়ি থেকে আমি আর পা বাড়াব না।। চাকরিবাকরি সব ছেড়ে দেব। বউদির সঙ্গে কেবল রাঁধব আর চুল বাঁধব।'

রুবির দাদা বলল, 'তা তুই মরে গেলেও পারবিনে। চাকরি ছাড়লেও স্বভাব ছাড়বি কি করে।'

রুবি বলল, 'তা ঠিক, স্বভাব যখন ছাড়তে পারব না তখন চাকরিটাও নাই ছাড়লাম। কিন্তু তাই বলে সেবারের মত সমস্ত খরচ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে তুমি যে হাত উঁচু করে বসে থাকবে তা হবে না। এ সম্বন্ধে গোড়া থেকেই একটা কথাবার্তা বলে নাও দাদা।'

রুবির দাদা উত্তেজিত ভাবে বলল, 'না কোন কথা নয়। তোর সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। কেবল টাকার খোঁটা, কেবল টাকার খোঁটা। না, তোর সঙ্গে এক বাসায় আমার থাকা হবে না। নিরঞ্জন রায় কারো কাছ থেকে অমন খোঁটা শুনবার লোক নয়। তার চেয়ে আমি যেভাবে আছি সেই ভালো। দূরে দূরে থাকাই উচিত। চোখের সামনে তুই যে যা খুসি করবি, বয়ে যাবি, তা আমি সইতে পারব না।'

রুবি বলল, 'সেই ভালো, তোমার স্বার্থপরতাও দিন রাত মুখ বুজে সয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

নিরঞ্জন এবার উঠে দাঁড়াল, 'স্বার্থপর ? বেশ। সেই কথাই ঠিক। তোর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে, তোকে যা খুসি তাই করতে দিয়ে আমি অমন পরার্থপর হতে চাইনে। আমি চললুম।'

রুবি বলল, 'সেকি, খেয়ে যাবে না ? আমি তোমার চাল নিয়েছি যে।'

'তোর বন্ধুবান্ধবদের তো অভাব নেই। তাদের কাউকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াস।'

বলে নিরঞ্জন দোর খুলে বেরিয়ে গেল।

পরদিন উমা গিয়ে রুবির সঙ্গে আলাপ করল, 'আপনার দাদা বউদির আসবার কথা ছিল, ওঁরা এলেন না ?'

রুবি বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছিল, একটু হেসে বলল, 'না, তাঁরা আর আসবেন না এখানে।'

উমা বলল, 'সেকি, আপনি একাই থাকবেন নাকি ?'

রুবি তেমনি হেসে বলল, 'একা আর কই। আপনারা তো রয়েছেন।'

উমা বলল, 'তাতো আছিই, তবু ভয় করবে না আপনার ?'

রুবি বলল, 'না। আপনাদের ভয় না করলেই বাঁচি। মোটেই ঘাবড়াবেন না। যত একা ভেবেছেন আমাকে, ততখানি একা আমি নই। দু'একদিন বাদেই দেখবেন আমার অগণিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসে নিত্য দু'বেলা খোঁজখবর নিচ্ছে। একা থাকতে চাইলেই কি একা থাকা যায় নাকি, না, একা থাকতে দেয় কেউ ?'

উমা বলল, 'আপনি কি একা থাকতেই ভালোবাসেন নাকি ? তাহলে তো আমারও আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা চলে না। হয়তো এসে আপনাকে বিরক্তই করলাম।' চলে যেতে উদ্যত হোল উমা।

সঙ্গে সঙ্গে রুবি হেসে তার হাত টেনে ধরল। 'তুমি তো আচ্ছা মেয়ে যা হোক। আমার চেয়েও এককাঠি বাড়া। বোসো বোসো।'

বলে জোর করে উমাকে রুবি নিজের তক্তপোষে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। এত সহজে ছাড়ছি না। এই দেখ তুমি বলে ফেললাম। সমবয়সীদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের বেশি আপনি আপনি করা আমার ধাতে পোষায় না।'

উমা হেসে বলল, 'পোষাতে যে হবেই, এমন তো মাথার দিব্যি দেওয়া নেই, তুমিই ভালো।'

রুবিও হাসল, 'আমিতো ভালই। তুমিও ভালো।'

উমা বলল, 'আপ ভালো তো জগৎ ভালো।'

রুবি হেসে মাথা নাড়ল, 'উঁহু, জগৎটাকে যত সোজা মনে করছ, তত সোজা নয় ভাই। কিন্তু তার জন্য আফশোষও আমার নেই। বরং সোজা হলেই দুঃখ হোত। সহজ কোন কিছু আমার পছন্দ হয় না। এই অষ্টাবক্র মুনিই বরং ভালো। এর বাঁকে বাঁকে রস।'

উমা মুহূর্তকাল অবাক হয়ে রুবির দিকে তাকিয়ে রইল। সেই বিচিত্র রঙ আর রসের জীবন্ত প্রতিমূর্তি যেন তার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তারপর থেকে এই অসামান্যা মেয়েটির কথা উমা স্বামীকে অনেক বার বলেছে। আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছে বান্ধবীর সঙ্গে। কিন্তু বিভাসের কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। উমার অত উৎসাহ উদ্দীপনাকে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে বিভাস বলেছে, 'তোমার এই অসামান্যা-দের সাক্ষাৎ আজকাল পথে ঘাটে মেলে। উনি যে কোন্ কোন্ দিক থেকে অসামান্যা তা আমার বুঝতে বাকি নেই। বাইরে যাদের অত চটক—'

উমা বাধা দিয়ে হেসে বলেছে, 'আচ্ছা তুমি কি! দুনিয়ার সকলেই তোমার মত সাধাসিধে ভাবে থাকবে, সাজসজ্জা করবে না, পোষাক-আশাক পরবে না, তাই কি তুমি চাও নাকি ?'

বিভাস জবাব দিয়েছিল, 'চাইলেই যে হয় না, তা জানি। কিন্তু আর কারো ওপর জোর না থাক, তোমার ওপর তো আছে। সেই দাবির জোরে তোমাকে আমি নিজের পছন্দমত করে গড়ে তুলব।'

উমা বলেছিল, 'গড়ে তুলতে এখনও বাকি আছে নাকি ?'

বিভাস বলেছিল, 'তা আছে বই কি ! গড়ে তোলার কাজ তো একদিনের নয়, প্রতি-দিনের ।'

উমা আর কোন জবাব দেয়নি । কথাটা ঠিক । বিয়ের পর এই পাঁচ বছর ধরে বিভাস উমাকে সম্পূর্ণ নিজের পছন্দমত করে গড়ে তোলবারই চেষ্টা করেছে । কোন কোন বিষয়ে স্ত্রীকে উপদেশ নির্দেশ দেওয়া বিভাসের দৈনিক রুটিনের অঙ্গ । এই পাঁচ বছরের মধ্যে তার একটি দিনও ব্যতিক্রম হয়েছে বলে উমার মনে পড়ে না ।

বিয়ের দিনকয়েক বাদে দূর সম্পর্কের এক ননদের রসিকতায় উমা বুঝি খুব জোরে হেসে উঠেছিল । খানিক বাদেই বিভাস তাকে আড়ালে ডেকে বলেছিল, 'দেখ, অত জোর করে হেস না, বেশি উচ্চহাসি মেয়েদের পক্ষে শোভন নয় ।'

উমা একটুকাল অপ্রতিভ হয়ে থেকে ফের হেসে ফেলেছিল, 'আচ্ছা তুমি কি থিয়ে-টারের মাস্টার, আর আমি অভিনেত্রী যে আমি কি-ভাবে হাসব, কি-ভাবে কাশব, সব তোমায় বলে দিতে হবে ?'

কিন্তু উমার তারল্য বিভাসকে গলাতে পারেনি । সে গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ, বলে দেওয়া দরকার । আমি কি পছন্দ করি না করি, কি ভালোবাসি না বাসি, তা তোমার জেনে রাখা ভালো ।'

এই পাঁচ বছরে বিভাসের রুচি-অরুচি, পছন্দ-অপছন্দের কথা উমা ভালোভাবেই জেনেছে । প্রথম দিন হেসেছিল, কিন্তু সবদিন হাসতে পারেনি । মান অভিমান ঝগড়া-ঝাঁটি অনেক হয়েছে তারপর । রাগ করে বাবা মার কাছে গিয়ে কয়েকবার নালিশ পর্যন্ত করেছে উমা । কিন্তু মা সহানুভূতি জানালেও উমার বাবা রাজমোহনবাবু মেয়েকে বারবার ধমকই দিয়েছেন, বলেছেন, 'আমি তো বিভাসের কিছু অন্যায় দেখিনে । ও যা বলে ঠিকই বলে । অতিরিক্ত চাপল্য আর বিলাসিতা কি মেয়েদের ভালো ? ওসব দিকে ঝুঁকলে, বাইরের হৈ চৈ রঙ-ঢঙের দিকে বেশি নজর দিলে, জীবনের আসল জিনিসে ঘাটতি পড়বেই । বিভাসের মত এমন সৎ, আদর্শ চরিত্রের ছেলে একালে দুর্লভ ।'

একালে দুর্লভ । উমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয় । এমনকি একালের মানুষ বলেই যেন চেনা যায় না বিভাসকে । বাবার সঙ্গে তো তার মিল হবেই । কারণ বিভাসের বয়স-টাই শুধু তিরিশের এপারে—কিন্তু চালচলন-আদবকায়দা সব যেন ষাট বছরের বুড়ো মানুষের সঙ্গে বাঁধা । জীবন থেকে আড়ম্বর বাদ দাও, অশন-বসনের জন্য অত আয়োজন কোরো না । বাইরের এসব স্থূল বস্তুকে বেশি মূল্য দিলে, জীবনে যা যথার্থ মূল্যবান, তাকে দেওয়ার মত কিছু থাকবে না । অভাব অভাব কোরো না, অভাব যদি

দূর করতে চাও—অভাববোধকে জয় কর। এই সব বড বড় কথা বিভাসের মুখে। কেবল কথা বলেই যদি ক্ষান্ত থাকত, তাহলে উমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিভাস শুধু কথা বলেই নিবৃত্ত থাকে না, সংসারের খাওয়া-পরায় সখ-আহ্লাদ আমোদ-প্রমোদে সমস্ত ছোট ছোট ব্যাপারেও তার সেই বড় বড় কথাগুলিকে খাটাতে চেষ্টা করে। সেখানেই হয় বিপদ, সেখানেই সুরু হয় মতবিরোধ আর মনোমালিন্য। সংসারের দৈনন্দিন হাটবাজারের ছোট ছোট থলিতে অমন বড় বড ভাব আর আদর্শ ধরবে কেন। ধরেও না। মাঝে মাঝে ছিঁড়ে যায়, ফেটে যায়। রাগে দুঃখে ফেটে পড়ে উমা। 'যদি তোমার নিজের মতই সব সময় বহাল রাখতে চাও, তাহলে একা একাই সংসার কর। আমার আর থেকে কাজ কি!'

তবু না থাকলে চলে না। তবু যথারীতি সংসার চলতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয় উমাকে। একটু একটু করে বিভাসের পছন্দমতই নিজেকে আর সংসারকে গড়ে নিতে হয়।

কিন্তু বেশে বাসে আড়ম্বরহীনতার পক্ষপাতী হলেও বিভাস যে কৃপণ, তা নয়। ওর অন্তঃকরণকে ক্ষুদ্র বলা চলে না, বরং অনেক আত্মীয়-স্বজনের চেয়েই মহৎ, সেকথা উমা মনে মনে স্বীকার করে। ছোট বোন রমার বিয়েতে নিজের ইচ্ছেমত কান-ঝুমকো উপহার দিতে না পেরে উমা যে দুঃখ আর লজ্জা পেয়েছিলো, তার তুলনা হয় না। কিন্তু সেই ভগ্নীপতি শীতাংশুই যখন একে মিথ্যে জটিল মামলায় পড়ল—জেল হয় হয় এমন অবস্থা, তখন ব্যারিস্টার জোগার করে টাকা ধারের ব্যবস্থা করে যে উপকার বিভাস শীতাংশুর করেছিল, তাও তাব নিজের কোন আত্মীয়স্বজন করতে পারেনি। শীতাংশু অনেক দিন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেছে। বলেছে, 'ভায়রার কাছ থেকে যা পেলাম, তা আমার ভাইরাও করেনি।'

শুধু তাই নয়, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যে-কেউ যখন এসে সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে, বিভাসকে পারতপক্ষে না করতে দেখা যায়নি। কোন না কোন ভাবে প্রত্যেকেরই উপহার করেছে। দূরসম্পর্কের এক ভাইপো আর ভাগ্নীজামাই এমন মাস যায় না বিভাসকে এসে বিরক্ত না করে। বিভাস উমার সামনে খুব রাগ করে আচ্ছা করে ধমকে দেয় তাদের। কিন্তু নিজেদের সংসারী খরচের টাকা থেকে দশ হোক্ পনের হোক্ সাধ্যমত যে ধারও দেয়, তা উমার টের পেতে বাকি থাকে না। ফলে মাসের শেষের দিকে টানাটানি পড়ে। উমার শাড়ি কি টুকিটাকি সখের জিনিস কেনা বন্ধ থাকে। অবশ্য কেবল যে উমার শাড়িটাই ঘাটতি পড়ে তা নয়, বিভাসকেও ছেঁড়া জুতো পায়ে চলতে দেখা যায়। কাঁধের কাছে ভিতরের গেঞ্জি বেরিয়ে পড়ে।

স্বামীর সম্বন্ধে তেমন আপত্তি কি অভিযোগের কারণ নেই উমার। মাসতুতো পিসতুতো বহু ভগ্নীপতির চেয়েই পতিভাগ্য তার ভালো। একথা সেও স্বীকার করে। তবু মনের খুঁৎখুঁতি যেন একেবারে মরতে চায় না। মনে হয় কি একটা বড় জিনিস থেকে বিভাস যেন তাকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

সে জিনিস যে কি তা স্পষ্ট করে উমার চোখে পড়ল রুবিকে দেখে। উমার নতুন করে মনে পড়ল এ সংসারে সোহাগ আছে কিন্তু স্বাধীনতা নেই। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে, ছেলেকে নাওয়ানো, ঘুম পাড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে উমা প্রায়ই যায় রুবির ঘরে। গিয়ে চেয়ে চেয়ে ওকে দেখে। ওর সাজসজ্জা, চালচলন যত অদ্ভুত লাগে, তত লোভনীয় আকর্ষণীয় মনে হয়।

সকালে অনেক বেলায়—প্রায় আটটার সময় ঘুম থেকে ওঠে রুবি। বেশ দ্রুত হাত মুখ ধুয়ে নেয়, স্টোভ ধরায়, চা খায়। রান্না চাপায় কুকারে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে যেমন তেমন করে খাওয়া শেষ করে। কিন্তু অশন দ্রুত শেষ হলেও বসন, ভূষণ আর প্রসাধন যেন ওর শেষ হতে চায় না। উমা ঘড়ি ধরে দেখেছে পুরো দুটি ঘণ্টা ওর সাজসজ্জায় যায়।

উমা একদিন বলল, 'এত সাজিস কার জন্যে বল তো?'

সপ্তাহ যেতে না যেতেই তুমি থেকে ওরা তুইতে নেমেছে। সম্বোধনের শেষ সিঁড়িতে রুবিই টেনে নামিয়েছে উমাকে।

উমার কথার জবাবে আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখে পাউডারের পাফ বুলোতে বুলোতে রুবি একটু হাসল, 'কার জন্যে নয়, কাদের জন্যে বল। তোর এক—আমার অনেক। তুই একেশ্বরবাদী—আমি ঘোরতর পৌত্তলিক, আমার তেত্রিশ কোটি দেবতা। পথে-ঘাটে, বাসে-ট্রামে, অফিসে-আদালতে, কোথাও তাদের অভাব নেই। তবে তাদের চোখগুলি সব যেন কুমারের আঁকা। তাতে পলক নেই।'

উমা বলল, 'নিষ্পলক চোখগুলির আর দোষ কি, তুই যদি এমন করে উর্বশী সেজে বেরোস—'

রুবি হাসল, 'মুনিগণ ধ্যান ভেঙে তপস্যার ফল পদে দেবে না কেন? তবে একজন তপস্বীর কিন্তু আজও মন টলেনি। তিনি ভ্রূ কুঁচকেই রয়েছেন।'

উমা হেসে বলল, 'সেই কুঁচকানো ভ্রূ যদি সোজা করতে পারিস, তবেই বুঝব বাহাদুরী।'

রুবি বলল, 'দরকার নেই ভাই আর বাহাদুরী দেখিয়ে। শেষে বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটবে।'

উমা বলল, 'না রে না। অত সহজে বিচ্ছেদ ঘটবার মত বন্ধুত্ব আমাদের নয়। তেমন ঠুনকো মন নয় আমার। আসল কথা স্বীকার করছিসনে কেন। তুই হেরে গেছিস ওর কাছে। ভালো কথা, সেই ইন্‌সিওরেন্সেরই বা কি হোল ? এত লজ্জা, এত সংকোচ তোর যে একবার মুখ ফুটে ওকে বলতেও পারলিনে।'

রুবি বলল, 'বলব। সময় আসুক তখন ঠিক হাজার দশেক টাকার ইন্‌সিওরেন্স বিভাসবাবুকে দিয়ে করিয়ে নেব দেখবি। আগে থেকে অত অধীর হলে কি চলে। বড় মাছ গাঁথতে হলে তাকে অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে তবে টেনে তুলতে হয়।'

উমা হেসে বলল, 'খুব বড় মাছ ঠাউরেছিস বুঝি ? তবু ভালো।'

জবাবে রুবিও একটু হাসল, কিন্তু আর কিছু বলল না।

সেদিন বেলা নটায় স্নান করতে যাওয়ার আগে দাড়ি কামাবার জন্যে দেওয়ালে টাঙানো বড় আয়নাখানা আনতে গিয়ে হঠাৎ বিভাসের চোখে পড়ল জায়গাটা খালি, আয়না নেই।

বিভাস বিরক্ত হয়ে বলল, 'আয়নাটা আবার কি হোল ?'

উমা রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'রুবি নিয়েছে। ওর বড় আয়নাটা পড়ে ভেঙে গিয়েছে কিনা।'

বিভাস বলল, 'তাতো গেছে। কিন্তু তোমরাই বা আক্কেলখানা কি, আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে নিশ্চয়ই জানো। অথচ ঠিক এই সময়েই কাজের জিনিসটা আর একজনকে দিয়ে রাখলে। ও আয়না আজ আর পেয়েছি !'

একটু বাদেই আয়নাখানা হাতে নিয়ে রুবি এসে উমার রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াল, 'উমা, এই নাও তোমার আয়না।'

উমা বলল, 'সেকি, এরই মধ্যে কাজ হয়ে গেল ?'

রুবি সংক্ষেপে বলল, 'হ্যাঁ।' তারপর আর দাঁড়াল না।

বিভাস এবার একটু অপ্রস্তুত হোল। স্ত্রীকে ডেকে চুপিচুপি বলল, 'কি ব্যাপার, শুনতে পেয়েছে নাকি ?'

উমা গম্ভীর মুখে বলল, 'পেয়েছে বৈকি। পাশাপাশি ঘর। তুমি তো আর আস্তে কথা বলনি। আর রুবিও কালা নয়।'

বিভাস বলল, 'হুঁ।'

তারপর আয়না সামনে রেখে বিভাস গালে সাবান ঘষতে লাগল। দরকারের সময় হাতের কাছে আয়নাটা না পেয়ে বিভাসের মন বিরক্ত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে

সেই বিরক্তি প্রতিবেশিনী জানতে পারুক এ তার ইচ্ছে ছিল না। শিষ্টাচারের ত্রুটি ঘটে গেল। অথচ সারল্য, অকাপট্য যদি আচারের আদর্শ হয়, বিভাস মনে মনে ভাবল, তাহলে তো সে অন্যায় করেনি। মনের বিদ্বেষকে ক্রোধকে সে যথাযথভাবেই প্রকাশ করেছে। আর রুবি যে তা জেনেছে, শুনতে পেয়েছে তাও সঙ্গতই হয়েছে। তাহলে সদাচারের সঙ্গে সুনীতির প্রভেদ অনেকখানি। সভ্যতা শিষ্টাচারের মুখোস মাত্র, যথার্থ শিষ্টতা নয়। বিভাস মাথা নাড়ল, উঁহু, এও ঠিক হোল না। সভ্যতা আর সদাচার ভিন্নার্থবোধক হতে পারে না। তার আসল ত্রুটি ঘটেছে অসহিষ্ণুতায়,—হাতের কাছে জিনিসটি না পেয়েই তার মন যে ধৈর্যহীন হয়ে উঠেছে, একবারও বিচার করতে চায়নি, বিবেচনা করে দেখতে চায়নি যে সে জিনিসে আর কারো প্রয়োজন হতে পারে কিনা। সেই প্রয়োজনের কাছে নিজের প্রয়োজনকে একটু স্থগিত রাখবার মত ত্যাগ স্বীকার করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে তার মন ভেবে দেখতে রাজি হয়নি। তাই তার অশোভন আচরণের মূলে রয়েছে অশোভন ভাব, অসহিষ্ণুতা, আর কিছু পরিমাণে অনুদারতা। নীতির দিক থেকে সেখানেই তার ত্রুটি ঘটেছে। তবু এই নৈতিক বিচ্যুতিকে বাক্-সংযমের সাহায্যে যদি প্রচ্ছন্ন রাখতে পারত বিভাস, তাহলে কি তার শিষ্টাচার বজায় থাকত না? কিছুক্ষণের মত থাকত—কিন্তু কখনো না কখনো মনের সেই বিদ্বেষ প্রকাশ পেতই। দোষটা জিভের নয়—দোষটা মনের, দোষটা মুখের।

শিশিতে তেল ভরবার জন্যে ঘরে এসে উমা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওকি, কেটে ফেললে নাকি?'

বিভাস ফের অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'আঃ থাম। অত চেঁচাবার কিছু হয়নি। একটা ব্রণ ছিল, তাতে একটু লেগেছে। ফিটকিরির টুকরোটা দাও তো হাত বাড়িয়ে।'

শনিবার। একটু সকাল সকালই ফিরে এল বিভাস। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পেল না। সদর দরজা জুড়ে জন তিনেক কুলি দাঁড়িয়ে। তাদের মাথায় নানা ধরনের ফার্নিচার। ড্রেসিং টেবিল, তিন চারখানা চেয়ার, সোফা, খুলে রাখা খাটের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

কোন রকমে পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে বিভাস ডাকল, 'পিসীমা, পিসীমা!'

সুরবালা বাবলুকে কোলে নিয়ে পাশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন। উমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'তাঁকে কেন ডাকছ? তিনি বাসায় নেই।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু সদর দরজায় এসব কি ব্যাপার ?'

উমা মুচকি হেসে বলল, 'জিনিসগুলি রাখলাম।'

বিভাস বলল, 'তামাসা রাখ। ব্যাপার কি ?'

উমা তেমনি হেসে বলল, 'তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই। রুবি ওগুলি ওয়েলেসলী স্ট্রীট থেকে ভাড়া করে এনেছে, ঘর সাজাবে বলে।'

বিভাস গম্ভীরভাবে বলল, 'ও।'

তারপর নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'সবদিক থেকে একেবারে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কায়দা। এসব জিনিস ভাড়া করে আনবার কি মানে হয়! তাতে কি খরচ কম পড়ে নাকি ? সামর্থ্য থাকে একেবারে কিনে নেওয়া ভালো, আর তা যদি সাধ্যে না কুলোয় এসব জিনিস ব্যবহার না করলেও চলে।'

উমা একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে এনে বলল, 'আঃ চুপ কর। রুবি সদরে তার জিনিসগুলি বুঝে নিতে এসেছে। সব কানে যাচ্ছে তার। আর তোমার কি মাথা খারাপ হোল ? সবাই কি তোমার পছন্দ মত চলবে ?'

বিভাস বলল, 'তা না চলতে পারে। কিন্তু অপছন্দ হলে আমার বলবারও অধিকার আছে।'

উমা বলল, 'না তা নেই। অন্তত শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে তুমি পার না। সেটা অভদ্রতা। যার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা থাকে, তার চালচলনের খুঁটিনাটি নিয়ে সমালোচনা করা যায়। কিন্তু যার সঙ্গে তোমার বলতে গেলে আলাপ নেই—সে কি করল না-করল—ছিঃ।'

বিভাস বলল, 'ছিঃ নয়। বিলাসিতা, আড়ম্বরপ্রিয়তাকে আমি যদি খারাপ বলে মনে করি, আমাকে তা বলতেই হবে। আত্মীয়ই হোক অনাত্মীয়ই হোক বিরূপ সমালোচনা করতেই হবে আমাকে। এখানে মুখ বুজে থাকাটা নাগরিকতা হতে পারে, কিন্তু সুনীতি নয়। তাছাড়া চুপ করে থেকে লাভ কি ? বরং সমালোচনায় কিছু ফল হলেও হতে পারে।'

কিন্তু রুবির বেলায় যে কোন ফল হবে তেমন লক্ষণ দেখা গেল না। সে কুলিদের সঙ্গে হেসে মিষ্টি কথা বলে তাদের আরো ঘণ্টাখানেক বেশি খাটিয়ে সুন্দর করে ঘর সাজিয়ে নিল। দোরে জানলায় ঝুলিয়ে দিল রঙীন পর্দা। নিজেদের ঘরগুলির তুলনায় রুবির ঘর দু'খানিকে স্বর্গ বলে মনে হোল উমার।

খানিক বাদে উমা স্বামীকে বলল, 'তুমি কি এমনি বাউণ্ডুলের মত ঘর-সংসার চালাবে ঠিক করেছ নাকি ? দেশ থেকেও জিনিসপত্রগুলি আনলে না, এখানেও যে প্রাণ ধরে একটা কেনার ব্যবস্থা করবে, তাও তোমার লক্ষ্য নেই। মেঝেয় শুয়ে শুয়ে গা ব্যথা হয়ে

গেল। এর চেয়ে একেবারে গাছতলায় গিয়ে থাকলেই হয়। বিছানা বালিশের পর্যন্ত দরকার হয় না তাহলে।'

বিভাস জমা খরচের খাতা থেকে চোখ তুলে মৃদু হেসে বলল, 'আমি ঠিক ওই আশঙ্কাই করেছিলাম। কলিঙ্গা থেকে আমাদেরও খাট আলমারি ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি ভাড়া করে আনতে হবে, এইতো ?'

উমা স্বামীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হবেই তো। সংসারে এসব জিনিসের কি দরকার হয় না বলতে চাও ?'

বিভাস শান্তভাবে বলে, 'হবে না কেন, দরকার হয়। কিন্তু ইচ্ছে থাকলে তো সব প্রয়োজন একসঙ্গে মেটানো যায় না। আয় বুঝে সব ব্যবস্থা করতে হয়। দুটি চাকরিতে সবশুদ্ধ শ' আড়াই টাকা তো পাই। তাতে ওসব কি করে হবে বল তো ?'

উমা বলল, 'ইচ্ছে থাকলেই হয়। এত টাকা এত দিকে যায়—'

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ, এই দিক নির্ণয়ই আসল কথা। খাট-পালঙ্কে শোয়ার চেয়ে, বড় আয়নায় মুখ দেখার চেয়ে দুটি দুঃস্থ আত্মীয়ের ছেলের পড়ার খরচ জোগানো আমার কাছে বেশি দরকারী বলে মনে হয়। দু' বাক্স সাবান বেশি কেনার চেয়ে মাসে অন্তত একখানা ভালো বই কিনতে পারলে আমি বেশি আনন্দ পাই। আমি ভেবেছিলাম তুমিও তাই পাবে। তোমারও তাই পাওয়া উচিত।'

বিভাস স্ত্রীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল।

উমা কোন জবাব দিল না। কিন্তু মন ওর হঠাৎ বিদ্বেষে ভরে উঠল। কেবল উচিত আর উচিত। শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কেবল এই কোরো, আর এই কোরো না, শুধু শাসন আর অনুশাসন। কী হয় এই শাসন না মানলে। রুবিও তো মানেনি, তাতে কি কিছু ক্ষতি হয়েছে ওর ? বরং ও তো বেশ সুখেই আছে। আর সংসারে সুখে থাকতে পারাটাই সব চেয়ে বড় কথা। নিজের পছন্দ মত সাধ আহ্লাদ করা, চলা ফেরাতেই আনন্দ। রুবির আর কিছু না থাক, জীবনে সেই আনন্দ আছে। উমা মনে মনে ভাবল, আর তার এত থেকেও কিছু নেই।

রুবি কেবল ওর শুধু হাত ধরে নয়, হৃদয় মন ধরে যেন টান দিল। ও যা করে সব ভালো, ও যা ভাবে, ও যা বলে সব অভিনব। উমা যা হতে চেয়েছে অথচ হতে পারেনি, রুবি যেন তাই। ও উমার সেই দ্বিতীয় কল্পিত সত্তা। রুবি উমার সেই পরম কাঙ্ক্ষিত রূপ। ওর সঙ্গে উমা অভিন্ন অভেদ।

রুবি ওকে বলেছে, 'কোন সংকোচ করিসনে ভাই। আমার ঘরের একটা চাবি তোর কাছে রইল। যখন দরকার হয় আসিস, যখন যা লাগে—ব্যবহার করিস।'

বন্ধুর ঘর হলেও অতখানি অবাধ স্বাধীনতা নিতে উমার কেমন বাধ-বাধ ঠেকল। রুবি না থাকলে সে বড় একটা যায় না। তবে ও যখন ঘরে থাকে উমা সময় পেলেই ওর কাছে গিয়ে বসে, গল্প-টল্প করে। কিন্তু দু'চার দিন বাদে সেই গল্পেও বাধা পড়ল। রুবিকে আর একা পাওয়া যায় না। সকালে যতটুকু সময় সে ঘরে থাকে, তার ঘরের কড়া নাড়ার বিরাম থাকে না। রোজ দু'চার জন করে আগন্তুক আসবেই! রুবি তাদের নিজের বসবার ঘরে নিয়ে যায়। খুব অন্তরঙ্গ কেউ হলে তাকে ভিতরের ঘরেও আনে। তারা চা সিগারেট খায়, নানা বৈষয়িক কথাবার্তা বলে। কিছু কিছু 'অবৈষয়িক' কথাও যে আলাপে সংলাপে না থাকে তা নয়। বরং মনে হয় বিষয়ের চেয়ে বিষয়াতীতের দিকেই ঝোঁক ওদের বেশি। উমা ফাঁকে ফাঁকে আড়ালে এসে দাঁড়ায়, আর চেয়ে দেখে নিত্য নতুন মানুষ, নিত্য নতুন রহস্য। আগন্তুকদের অধিকাংশই সুবেশ সুপুরুষ, সাদালাপী, তরুণ যুবক। দু'চারজন প্রৌঢ়ও যে না আসেন তা নয়। বেশে বাসে তাঁদের যেন আরো বেশি মনোযোগ দেখা যায়। রুবির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার ইচ্ছে তাঁদের উদগ্রতর বলে মনে হয়। কিন্তু রুবি যে বেশির ভাগ শুধু রঙ্গই করে, তা আগন্তুকেরা না বুঝলেও উমার বুঝতে বাকি থাকে না।

উমা একদিন বলল, 'আচ্ছা, রাজ্য ভরে লোকের সঙ্গে তোর এত আলাপ, এত খাতির হোল কি করে?'

রুবি বলল, 'ব্যবসার খাতিরে খাতির রাখতে হয়। তাছাড়া খাতির রাখবার আমার দরকার না থাকলেই যে ওদের দরকার ফুরোয় তা তো নয়। এ পর্যন্ত গোটা দশ-বার অফিসে কাজ করেছি। সে সব কাজ ছেড়ে দিলেও পুরনো সহকর্মীরা ছাড়তে চায় কই।'

রুবির এই ভঙ্গি, এই দেমাক উমার সব সময় সহ্য হয় না। যেন রুবির কাউকে দরকার নেই, কাউকেই ও চায় না, শুধু পৃথিবীশুদ্ধ সমস্ত পুরুষ নিজেদের গরজেই ওর পায়ের তলায় লুটিয়ে থাকতে চায়। এমনি একটি অহঙ্কার রুবির মনে সব সময় আছে। ওর মনে কি আছে ওই জানে। কিন্তু মুখে ওর বড়াইর অন্ত নেই। সমস্ত পুরুষ হ্যাংলা। তাদের লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, দূর দূর করলেও তারা রুবির পিছনে পিছনে ঘুর ঘুর করে। কিন্তু উমা লক্ষ্য করে দেখেছে এই নিরাসক্তিটা রুবির ভান। কেউ এলে ও যেমন খুশি হয়, যে-ভাবে উল্লসিত হয়ে ওঠে, কোনদিন কেউ না এলে ও তেমনি ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে থাকে, তাতেই বোঝা যায় পুরুষ মানুষ ছাড়া ওর এক মুহূর্ত চলে না। এসব ব্যাপারে রুবিকে বড় অহঙ্কারী মনে হয় উমার। না হয় ওর রূপ আছে, বি. এ. পাশ করা বিদ্যা আছে, চোখে মুখে বুদ্ধির আর কথায় চাতুর্যের ছাপ আছে, তবু কথায় কথায় পুরুষের নিন্দা ও আত্মস্তুতি উমার বড় খারাপ লাগে। আঘাত লাগে আত্মাভিমানে। রুবির মত

অত রূপ তার না থাক, তাকে কুশ্রীও কেউ বলতে পারবে না। বি. এ. পাশ না করলেও কলেজে বছর দুই অন্তত পড়েছে, পড়াশুনার চর্চাটা স্বামীর জন্মে এখনও কিছু কিছু রাখতেও হয়েছে, সুতরাং একেবারে নিরক্ষরা নির্বোধ সেও তো নয় যে রুবি তাকে যা বোঝাবে তাই বুঝবে। সে তো দেখেছে অন্তত একটি পুরুষও হ্যাংলা নয়, সে কারো পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়েনি, উমাকেই বরং তার পায়ের নিচে আসন নিতে হয়েছে। তাই রুবি যখন অমন মিথ্যে বড়াই করে, উমা মাঝে মাঝে প্রতিবাদ না করে পারে না।

এ ধরনের আলোচনা উঠতে উমা সেদিন বলল, 'দেখ রুবি, তুই মুখে যাই বলিস, যত নিন্দাই পুরুষের করিস, তুই আসতে দিস বলেই ওরা আসে। আসলে আসতে না দিয়ে তুই পারিসনে।'

রুবি জবাব দিল, 'কথাটা ঠিকই ধরেছিস। প্রেমিক ছাড়া আমার চলে কিন্তু পুরুষ ছাড়া আমার চলে না। কি করে চলবে? এদেশে বেশির ভাগ কাজকর্ম চালাবার ভারই যে পুরুষের। রিক্সায় চড়ব—গোঁফওয়ালা রিক্সাওয়ালা ছুটে আসবে, মোট টানাব—সে মুটে হতভাগাটার পুরুষেরই চেহারা। এমনি মুচি, মুদ্দফরাস থেকে সুরু করে দেশের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর গদি পর্যন্ত পুরুষে আটকে রেখেছে। ওদের বাদ দিলে কাজকর্ম সব বন্ধ করতে হয়। তাই কালো নয়ন আর হেরব না বলে মান করে বসে থাকতে পারিনে। ওদের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই হয়। আর ওরা মনে করে সব দৃষ্টিই শুভদৃষ্টি।'

উমা একটু হাসল, 'পরে অবশ্য শনির দৃষ্টি বলে বুঝতে বাকি থাকে না।'

রুবি বলল, 'হ্যাঁ একরকম তাই। যে ব্যবহার আমি পুরুষদের কাছে পেয়েছি আর পাচ্ছি, তাতে ওদের সঙ্গে একটিমাত্র সম্পর্কই আমার আছে। সে সম্পর্ক আর যাই হোক ভালবাসার নয়।'

উমা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? কি এমন খারাপ ব্যবহার তুই ওদের কাছ থেকে পেয়েছিস যে—'

রুবি জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'সে আর একদিন শুনিস।'

উমা বলল, 'আচ্ছা আর একদিনই বলিস না হয়। কিন্তু এ বাড়িতে যে আর একজন পুরুষ মানুষ রয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধে তোর মতামতটা আজই বলে ফেল।'

রুবি একটু হাসল, 'আমার মতামত শুনে তুই খুশি হবিনে।'

'তবু শুনি।'

রুবি তেমনি হেসে বলল, 'আমার কাছে যেসব তৃতীয় শ্রেণীর পুরুষেরা আসে, তাদের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তোর পরম পুরুষটির কোন পার্থক্য নেই,—আসলে সব সমান।'

স্বামীর সম্বন্ধে উমার অনেক রকম আপত্তি অভিযোগ আছে, কিন্তু এ অপবাদ সে সহ্য করল না, তীব্র প্রতিবাদ করে বলল, 'কিছুতেই না, আমি বাজি রাখতে পারি—'

রুবি বাধা দিয়ে বলল, 'খবরবার! আমার মত জুয়াড়ীর সঙ্গে বাজী রাখতে আসিসনে। সর্বস্ব নিয়ে টান পড়বে।'

রুবির ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে বাবলুকে কাজল পরাচ্ছিল উমা, কাজললতাটা রেখে দিয়ে ছেলের মুখে চুমু খেতে খেতে হেসে বলল, 'অত সহজ নয় রুবি, অত সহজ নয়।'

আর উমার সেই মাতৃস্নেহ, তার গভীর আত্মপ্রত্যয়ে রুবির বুকের ভিতরটায় হঠাৎ যেন বড় জ্বালা করে উঠল, মুখে হাসি লেগে থাকলেও সে জ্বালা চোখের ভিতর থেকে ফুটে বেরুল—কিন্তু উমার তা চোখে পড়ল না, বাবলুর ছোট থুতনিতে তখনো সে ঠোঁট লাগিয়ে রেখেছিল।

রবিবার সকালে বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলচ্ছে বিভাস, দোরের কাছে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন, 'দেখুন, এইটাই তো সাতাত্তর নম্বর?'

কাগজ থেকে মুখ তুলে বিভাস বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কাকে চাই আপনার?'

ভদ্রলোক বললেন, 'রেবা আছে? কোন্ ঘরে থাকে ও?'

বিভাস বলল, 'রেবা বলে তো কেউ থাকে না এখানে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'থাকে না? অথচ আমাকে তো সাতাত্তর নম্বর শম্ভুবাবু লেনের কথাই লিখেছিল। ফের কি কোন হস্টেলে-টস্টেলে গিয়ে উঠল না কি? রেবা রায় নেই এখানে? কবে উঠে গেল?'

বিভাস বলল, 'আপনি কি রুবি রায়ের কথা বলছেন? রুবি রায় বলে একজন মেয়ে অবশ্য আছেন এখানে।'

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই রেবাই রুবি। আমার রাখা নাম মেয়ের পছন্দ হয়নি। খুশিমত বাঁকিয়ে চুরিয়ে নিয়েছে।'

বিভাস মনে মনে ভাবল, কেবল কি নামটাকেই বাঁকিয়েছে। তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কি ওঁর কোন—'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ওর বাবা। আমার নাম প্রিয়গোপাল রায়।'

বিভাস বলল, 'আসুন, বসুন এখানে এসে। আমি দেখছি তিনি আছেন কিনা।'

প্রিয়গোপাল এসে বিভাসের পাশে তক্তপোষে বসলেন। আধময়লা ধুতি পাঞ্জাবী পরা পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর বয়সের এক প্রৌঢ়। প্রিয়দর্শন না হলেও তাঁকে বিভাসের ভালই

লাগল। হ্যাঁ, ভদ্রলোককে বরং বাবা বলেই মনে হয়, রুবি রায়ের বাবা বলে চেনা যায় না।

বিভাস সুরবালাকে ডেকে বলল, 'পিসীমা, শোন।'

সুরবালা ভিতর থেকে দোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। 'ইনি রুবির বাবা। এঁকে তাঁর ঘরটা দেখিয়ে দাও।'

সুরবালা বললেন, 'ঘর দেখিয়ে দিয়ে হবে কি। সে তো এইমাত্র সেজেগুজে কোথায় বেরিয়ে গেল। উমার কাছে তো একটা চাবি রেখে যায়। দেখি ওকে জিজ্ঞেস করে।'

খবর শুনে রান্না রেখে উমাও কৌতূহলী হয়ে চলে এল এ-ঘরে। তারপর পরম পরিচিতের ভঙ্গিতে বলল, 'আসুন, ঘর খুলে দিই। রুবি একটু বেরিয়েছে। খানিক বাদেই ফিরবে।'

বিভাস বলল, 'বেশ তো, তখনই উনি যাবেন। একা একা ওঘরে গিয়ে ওঁর বসে থেকে তো লাভ নেই। তুমি বরং একটু চা টা কর।'

উমা হেসে বলল, 'তাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে? শুধু চা টা নয়। রুবিকে আজ খেতে বলেছি। মেশোমশাইরও আজ আমাদের ঘরে নিমন্ত্রণ।'

প্রিয়গোপালবাবু অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে বললেন, 'আবার ওসব ঝামেলা কেন।'

সুরবালা আর উমা ভিতরের দিকে চলে গেলে বিভাস স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই প্রিয়গোপালের সঙ্গে আলাপ সুরু করল। রুবির বাবা মা, ভাই বোন যে ভদ্রেশ্বরে থাকেন, তা উমার কাছে বিভাস এর আগেই শুনেছিল। এবার রুবির বাবার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে সে যেন অনেকখানি আশ্বস্ত হোল। এই মেয়েটির পূর্ণ পারিবারিক পরিচয় বিভাসের যেন একান্তই দরকার।

কিন্তু বিভাসের জানবার আগ্রহ যত বেশি, প্রিয়গোপালবাবুর বলবার উৎসাহ তেমন দেখা গেল না। মনে হোল তিনিও অনেক কথা চেপে যেতে চান।

বিভাস জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা এখানে কেউ কেউ চলে আসেন না কেন?'

প্রিয়গোপালবাবু সংক্ষেপে বললেন, 'তাতে অসুবিধে আছে।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু একটি মেয়ের পক্ষে একা একা এমনভাবে থাকায়ও তো অসুবিধে কম নেই।'

প্রিয়গোপালবাবু বললেন, 'কিন্তু ও এইটাই সুবিধের মনে করে।'

বিভাস বলল, 'ওঁর মনে করাটাই কি সব সময় ঠিক?'

প্রিয়গোপালবাবু বললেন, 'ওর বয়স হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। নিজের সুবিধে ওরই তো ভালো বুঝবার কথা। যাতে অসুবিধে হতে পারে, তা ও করতে যাবে কেন?'

বিভাস চুপ করে রইল। বাইরের বেশে-বাসে, চালচলনে যত বিভিন্নতাই থাকুক মতামতে পিতাপুত্রীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, তা বিভাসের বুঝতে বাকি রইল না। এরপর প্রিয়গোপালবাবু বিভাসের কাছ থেকে কাগজের একটা সীট চেয়ে নিলেন। বিভাস গোটা কাগজটাই ওঁর হাতে তুলে দিল।

প্রিয়গোপালবাবু চায়ে চুমুক দিয়েছেন, রুবিকে দেখা গেল দরজায়, 'এই যে, তুমি কখন এলে ?'

প্রিয়গোপালবাবু মেয়ের দিকে তাকালেন, 'এই খানিকক্ষণ !'

রুবি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এসো, ঘরে এসো।'

প্রিয়গোপালবাবু বললেন, 'এতক্ষণ বসে বসে বিভাসবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলাম। ওর সঙ্গে কি আলাপ নেই তোর ?'

রুবি বলল, 'কী যে বল ! আলাপ থাকবে না কেন। এখানে ওঁর অভিভাবকত্বেই তো রয়েছি।'

বিভাস ঘাড় ফিরিয়ে রুবির দিকে তাকাল। যে শ্লেষের সুরটুকু কানে লেগেছিল, চোখে তার কিছুই ধরা পড়ল না। রুবির মুখ আজ অপ্রসাধিত। পাউডারের সূক্ষ্ম প্রলেপটুকুও তাতে নেই। স্নিগ্ধ স্বাভাবিক গৌরবর্ণই তাকে শ্রীমণ্ডিত করেছে। ফিকে নীল রঙের শাড়ি পরনে। সেদিনের মত চুলের রাশ জালবদ্ধ নয়। এলো খোঁপায় বিনম্র ভঙ্গিতে ঘাড়ের কাছে নুয়ে রয়েছে। বিভাসের চোখ নিজের অনিচ্ছাতেও প্রসন্নতায় ভরে উঠল।

বিভাসকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে রুবি ফের একটু হাসল, 'অবশ্য আমার মত ওয়ার্ড নিয়ে ওঁর ঝক্কিঝামেলার অন্ত নেই বাবা !'

প্রিয়গোপালবাবুও হাসলেন, 'তাকি আর আমার জানতে বাকি আছে। তোমার অভিভাবকগিরি করা কি সোজা ? দু'দিন যেতে না যেতে অভিভাবককেই তোর ওয়ার্ড হয়ে থাকতে হয়। কই, ঘর কোন্ দিকে ?'

মেয়ের পিছনে পিছনে প্রিয়গোপালবাবু বেরিয়ে গেলেন। বিভাস এবার যেন ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারল। তাহলে প্রিয়গোপালবাবুই প্রশ্রয় দিয়েছেন রুবিকে। মেয়ের এই ধরনের জীবনযাত্রায় তাঁর সমর্থন রয়েছে। কিন্তু বাবা কি কেবল স্নেহ-দুর্বল হয়েই থাকবেন ? তিনি সন্তানের যথার্থ শ্রেয়ের দিকে তাকাবেন না ? সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত করে দিলেই কি তাঁর কর্তব্য শেষ হোল ? অভিভাবকত্ব থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন ? বিভাস অন্তত তা মনে করে না। সন্তানের যেমন বয়স বাড়ে, বিদ্যা বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে, বাপও কি তেমনি আ-মৃত্যু বাড়তে থাকেন না ? অন্তত বাড়তে

চেষ্টা করবেন না? তিনি কেবল বৃদ্ধই হবেন, তাঁর আর কিছু বৃদ্ধি পাবে না? সেই বর্ধিত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা সন্তানের সমৃদ্ধির কাজে তাঁকে আজীবন নিযুক্ত রাখতে হবে। অভিভাবকত্বের রূপ বদলাবে, ধমক আর শাসনের দিন শেষ হবে,কিন্তু তাই বলে সন্তানের হাতে তিনি খেলার পুতুল বনে যাবেন না, প্রচুর বিজ্ঞতা অভিজ্ঞতার প্রতীক হয়েই থাকবেন।

বিভাস বেরুতে যাচ্ছিল, হঠাৎ রুবির চড়া উত্তেজিত গলা কানে গেল, 'তুমি কি ভাব বলতো। আমার ঘরে কি টাকার গাছ গজিয়েছে?' কিন্তু বিভাস তাতে কান পাতল না। গায়ে পাঞ্জাবি চড়িয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। সুরবালাকে ডেকে বলে গেল, 'আমি একটু ঢাকুরিয়ায় চললুম। নির্মল নাকি ফের টাইফয়েডে পড়েছে। যাই, খোঁজ নিয়ে আসি। যদি ফিরতে একটু দেরী হয়, খেয়ো নিয়ো পিসীমা। আমার জন্য বসে থেক না।'

সুরবালা বললেন, 'এত বেলায় বেরুবি। বিকেলে গেলেই তো হোত। বেশি দেরি করিসনে যেন।'

বিভাসের ফিরতে বেলা একটা বেজে গেল। অসুস্থ বন্ধু কিছুতেই ছাড়তে চায় না। তা ছাড়া ডাক্তার এসে কি বলেন, তা জেনে আসার জন্যে বিভাসের নিজেরও অপেক্ষা করবার দরকার ছিল।

'প্রিয়গোপালবাবু খেয়ে নিয়েছেন তো?'

তেল মাখতে মাখতে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল বিভাস।

'হ্যাঁ, তিনি খেয়েদেয়ে চলেও গেছেন। তোমার তো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এক ভদ্রলোককে খেতে বলে সেই যে বেরুলে—'

বিভাস একটু হেসে বলল,'মেশোমশাইকে আদর আপ্যায়ন করার জন্যে তাঁর শ্যালিকা কন্যাই তো উপস্থিত ছিলেন। আমার আর কি দরকার।'

উমা বলল, 'আহা!'

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে এসে উমা অবশ্য স্বামীকে আরো অনেক কথা বলল। রুবি আর তার বাবার কাহিনী। বিভাসের কাছে প্রিয়গোপালবাবু খুব গম্ভীর আর স্বল্পভাষী হয়ে থাকলে কি হবে, খেতে খেতে উমার কাছে তিনি নিজেদের অনেক গল্পই করেছেন।

ওঁদের আসল বাড়ী কুমিল্লায়। সেখান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে বছর দেড়েক হোল ভদ্রেশ্বরে বাসা বেঁধেছেন। সবাইকে নিয়ে এখনো সহরে এসে ওঠেননি। এখানে বহু

খরচ। সেখানে বৃহৎ পরিবার। না, দাঙ্গায় তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু সর্বনাশ হয়েছে ব্যবসায়ে। বিশ বছর চাকরি করেছেন বিদেশী মার্চেণ্ট অফিসে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে কয়েক হাজার টাকা জমেছিল। পূর্বতন সহকর্মী এবং অত্যন্ত এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে চালানী কারবারে নেমেছিলেন। বন্ধু তাঁকে পথে নামিয়েছে। সব বুঝেও প্রিয়গোপাল কিছুই করতে পারেননি। কারণ বন্ধুর ফাঁকির মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। বড় ছেলে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। তার ধারণা বাপের খামখেয়ালী আর মূর্খতার জন্যেই তারা নিঃস্ব হোল। পারতপক্ষে সে সংসারের তেমন একটা খোঁজখবর নেয় না। নেওয়ার সাধ্যও বিশেষ নেই। একমাত্র রুবিই এখন ভরসা। খরচপত্র ওই বেশির ভাগ দেয়। 'কিন্তু ওর ভাগ্যও—' মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রিয়গোপালবাবু হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন। রুবি তাকে প্রায় ধমক দিয়ে বলেছিল, 'ভাগ্য ভাগ্য কোরো না বাবা। ভাগ্য আমি মানিনে। ভাগ্যকে হাতের মুঠোয় আমি আমার খুশিমত নিয়ে চলি।' প্রিয়গোপালবাবু শান্তভাবে বলেছিলেন, 'তাইতো চলেছিস। আমি কি আজকাল আর কিছু বলি? তোর খুশিতেই খুশি থাকি।'

প্রিয়গোপালের নিরীহতার যথার্থ রূপ এবার যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিভাসের চোখে। আজকাল মেয়েকে আর কিছু বলেন না, বরং নীরবে তার ইচ্ছামত চলতেই বলেন। তিনি যা পারেননি, রুবি যদি কোন রকমে তা পারে, এই প্রতিকূল পৃথিবীর সমস্ত প্রতারণা আর প্রবঞ্চনার কিছুমাত্র প্রতিশোধ যদি নিতে পারে তাঁর মেয়ে, ভিতরে ভিতরে তিনি খুশিই হবেন। চরম এক হিংস্র জিঘাংসাকে নিরীহ নৈষ্কর্ম্যের আবরণে যেন ঢেকে রেখেছেন প্রিয়গোপাল। আর তাঁর সেই হননের তীব্র ইচ্ছা রুবির মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ হত্যা যে আত্মহত্যা। ভিতরে ভিতরে বড় বেদনা বোধ করল বিভাস। প্রতিশোধেই কি সংসারের সব শোধ হয়?

উমা বলল, 'ঘা খেয়ে ভদ্রলোক যেন খানিকটা সিনিক হয়ে গেছেন। কথাবার্তায় মাঝে মাঝে ধরা পড়ে।'

প্রিয়গোপালের মুখখানা ফের চোখের সামনে ভেসে উঠল। যেন আগুনে পোড়া চেহারা। দগ্ধভাগ্যের অবিকল প্রতিচ্ছবি।

উমা বলল, 'বাপ আর মেয়ের সম্বন্ধও খুব ভালো বলে মনে হোল না।'

বিভাস গম্ভীরভাবে বলল, 'হওয়ার তো কথা নয়।'

উমা বলল, 'প্রিয়গোপালবাবু টাকার জন্য এসেছিলেন। বললেন—বাড়িতে অসুখ-বিসুখ। রুবি বলল—সুখই হোক আর অসুখই হোক মাসের শেষে টাকা আমি কোথায় পাব।'

প্রিয়গোপালবাবু বলেছিলেন, 'আচ্ছা ব্যাঙ্কে তো তোর অ্যাকাউন্ট আছে। তার থেকে তুলেই দিস। আজ তো রবিবার। আমি বরং আজ এখানে থেকে কাল টাকা নিয়ে—'

রুবি জবাব দিয়েছিল, 'তোলবার মত টাকা ব্যাঙ্কে নেই। তোমরা কি ভাব আমাকে বলো তো। আমি যা দিতে পারি, তাতো মাসের প্রথমেই পাঠিয়ে দিয়েছি। আর আমার দেওয়ার সাধ্য নেই।'

'শ'খানেক টাকা, অন্তত গোটা পঞ্চাশ ষাটও দিতে পারবিনে?'

রুবি স্পষ্ট জবাব দিয়েছিল, 'না। তোমরা যে কি ভাব—'

প্রিয়গোপালবাবু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, 'তুইও যে কি ভাবিস, তা আমি জানি। এরপর ফের যদি তোর কাছে হাত পাতি আমার নাম ফিরিয়ে রাখিস। এ যাবৎ যা নিয়েছি তার পাই ফার্দিং পর্যন্ত হিসাব আছে আমার কাছে। পৈতৃক ভিটে বিক্রী করেও যদি তোর শোধ দিতে হয়…'

রুবি বলল, 'তোমার পাকিস্তানের পৈতৃক ভিটে শিগগির বিক্রী হওয়ার আশা নেই বাবা। শোধ করে কাজও নেই। তুমি একটু বোসো। দেখি বাক্স দেরাজ হাতড়ে কিছু পাই নাকি।'

'তুই অমন করে মুখ ভেঙচিয়ে ভিক্ষে দিবি আর আমি তাই নেব? আমাকে কি তুই এতই ছোট মনে করিস?'

'না তা মোটেই করিনে। কিন্তু আমার ভাইবোনগুলি তো ছোটই। ওদের মনে করেই দিচ্ছি।'

প্রিয়গোপালবাবু কিছু নিয়ে তবে উঠলেন।

বিভাস এ কাহিনী শুনে চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না।

কিন্তু উমা যদি সবটুকু বলত, কিছু না কিছু মন্তব্য বিভাস না করে পারতো না।

বাপকে ঘরে বসিয়ে রেখে রুবি উমার কাছে চলে এসেছিল, 'আমাদের কথাবার্তা তোর তো প্রায় সবই কানে গেছে, না উমা?'

'না ভাই, আমি নিজের মনে কাজ করছিলাম।'

রুবি বলল, 'আহা, শোনাও তো একটা কাজ। কিন্তু এতই যখন শুনলি, আমার আরও একটা কথা তোকে শুনতে হবে উমা।'

'কি?'

'শ'খানেক টাকা দে তো। কাল সন্ধ্যার সময় ফেরৎ পাবি।'

উমা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'অবাক করলি যে! অত টাকা কোথায় পাব!'

রুবি বলল, 'খুব পাবি। গয়না গড়াবি বলে টাকা বাক্সে তুলে রেখেছিস। তোর যেমন কান আছে, আমার তেমনি চোখ। ভালোয় ভালোয় যদি না দিস বাক্স ভাঙব, জানিস তো আমি সব পারি।'

উমা বাক্সের চাবি ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'ভাঙার দরকার কি, বাক্স খুলেই নে।'

রুবি এবার অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'না ভাই, তুই দে হাতে করে। তোর কোন ভয় নেই। কাল নিশ্চয়ই ফেরৎ পাবি।'

এরপর উমা উঠে গিয়ে একশ টাকার নোটখানা বন্ধুর হাতে তুলে দিয়েছিল, 'টাকাটা আমার বাবার।'

রুবি হেসে বলেছিল, 'ভালোই তো। তোর বাবার টাকা আমার বাবার কাজে লাগল।'

পরদিন সন্ধ্যা উৎরে গেল। রুবির ঘরে ফেরার নাম নেই। উমা বার বার তাকাতে লাগল বাইরের দিকে। অবশ্য ঠিক সন্ধ্যার পর রুবি কদাচিৎ ঘরে ফেরে। বেলা দশটার বেরোয় আর ফেরেও সেই রাত নটা দশটায়। উমা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এত রাত অবধি তুই বাইরে বাইরে কি করিস বল তো?'

রুবি জবাব দিয়েছিল, 'তুই ঘরে বসে যা করিস ঠিক তাই। গেরস্থালী।'

এর আগে রুবি তাকে বলেছে লাইফ ইন্সিওরেন্সের কাজে বছর খানেক ধরে তার সুবিধে হচ্ছে না। তা ছাড়া দোরে দোরে লোককে এমন তোষামোদ করে বেড়ান ধাতেও পোষাচ্ছে না তার। তাই রুবি ফের চাকরি নিয়েছে। বেন্টিক স্ট্রীটের এক প্ল্যাস্টিক কোম্পানীর অফিসে কাজ। কিন্তু একাজও খুব বেশিদিন রাখতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। উমা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন?'

রুবি হেসে বলেছিল, 'সেক্রেটারী বড় বেশি নোট পাঠাচ্ছেন। বেশি ঘন ঘন ডাক পড়ছে তাঁর ঘরে। এরপর অফিসিয়াল পত্রালাপ শেষ করে তাঁর বিশেষ ধরনের চিঠির জবাব দেওয়ার কি আর সময় পাব? তাও যদি বা পাই, এক অফিসে দু'চার মাসের বেশি কাজ করতে আমার ভালো লাগে না। বড় একঘেঁয়ে লাগে। তাই আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখি। চাকরি করি একটা, কিন্তু উমেদারী করি অনেকগুলির।'

হয়তো সেই উমেদারীর জন্যই এত রাত হয় ফিরতে। উমাকে আরও কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন রেখে রুবি রাত দশটা নাগাদ বাড়ি এল। ছেলেকে খাওয়ানো শেষ করে উমা রুবির ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রুবি তখন কাপড় ছাড়ছে। উমাকে দেখে বলল, 'এই যে আয়। শাড়ি বদলে আমিই যেতাম তোর ওখানে।' টেবিলের ওপর রাখা শান্তিনিকেতনী ছোট ব্যাগটা খুলে একশ টাকার একখানা নোট উমার সামনে বাড়িয়ে ধরল রুবি, 'এই নে।'

উমা ভদ্রতা করে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি কি ছিল।'

রুবি একটু হাসল, 'ছিল না বুঝি? কিন্তু তাড়াতাড়ি না করলে রাত্রে কি ঘুমুতে পারতিস?'

উমা রাগ করে বলল, 'তুই তাই বুঝি ভেবেছিস?'

রুবি বলল, 'নারে না। আমি কিছু ভাবিনে। ভাবা-টাবা আমার ধাতে নেই।'

উমা বলল, 'কিন্তু টাকাটা পেলি কোথায়? ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনলি তো?'

রুবি ততক্ষণে তার পুরানো আটপৌরে শাড়িটি পরে নিয়েছে। উমার কথার জবাবে বলল, 'ক্ষেপেছিস? তখনই তো বললাম আমার ব্যাঙ্কে এ্যাকাউণ্ট নেই—ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট আছে। আমার টাকা তার পকেটে থাকে।'

উমা এবার চেয়ারটায় বসে পড়ে বলল, 'কার পকেট থেকে তুললি বল তো, সুধীর তালুকদার? সেই যে ছোকরামত সুন্দরপানা ছেলেটি?'

রুবি ও-পাশের চেয়ারটায় বসে হেসে বলল, 'হ্যাঁ—সেই। ঠিক ধরেছিস। ওকে তোর মনে ধরেছে, না?'

উমা ধমক দিয়ে বলল, 'যাঃ কি যে বলিস। কিন্তু তুই না বলেছিলি সুধীরবাবুর বাসার অবস্থা ভালো নয়। একটা ছোট ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অফিসে মাত্র শ' দেড়েক টাকা মাইনে পান। বাড়িতে অনেক পোষ্য। তিনি তোকে একশ টাকা দিতে পারলেন?'

রুবি বলল, 'দিতে কি আর পারলেন! আমাকে নিতে হোল। ক'দিন ধরে দেখছিলি তো? ভারি বিরক্ত করত। এলে আর নড়তে চাইত না। কেবল একথা সেকথা। অমুক সিনেমায় ভালো বই হচ্ছে চল দেখে আসি, আমার বন্ধু এক স্টুডিও খুলেছে চল তোমার একটা ফোটো তুলবে। আজ অফিস থেকে ওকে ফোনে ডেকে বললুম, আজ আমার হাতে সময় আছে সুধীর, যাবে নাকি কোন সিনেমা-টিনেমায়। সুধীর একপায়ে খাড়া।'

উমা রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল, বলল, 'তারপর?'

রুবি উঠে গিয়ে তোয়ালে আর সাবান তুলে নিতে নিতে বলল, 'তারপর আর কি। ফোটো তুললাম, রেস্টুরেণ্টে খেলাম, সিনেমা দেখলাম। তারপর ওর কানে কানে প্রণয়গুঞ্জনে বললাম—সুধীর, মাইনে নিশ্চয়ই পেয়েছ। মাসের শেষ

তারিখেই তো তোমাদের মাইনে হয়। আমাকে একশটি টাকা দাও তো, ধার শোধ করতে হবে!'

উমা শিউরে উঠে বলল, 'ছি ছি ছি। তুই এমন করে একটি গরীবের ছেলের মাথায় বাড়ি দিলি।'

রুবি একটু হাসল, 'ছেলে গরীবের হলে হবে কি, ধরেছে যে ঘোড়ারোগে। তাই একটু চিকিৎসা করতে হোলো। যারা বড় বেশি বিরক্ত করতে আসে, এমনি করে তাদের গালে দু' একটা চডচাপড় দিই। মাথায় বাড়ি একে বলে না। তোর ভয় নেই, সুধীরের টাকা আমি মারব না। তোর ধার যেমন শোধ দিলাম, ওর ধারও তেমনি করে শোধ দেব। কিন্তু এবার তুই ঘরে যা। বিভাসবাবুকে আর বিরহ-অনলে দগ্ধ করিসনে।'

ফের একটু হেসে তোয়ালে হাতে নিয়ে রুবি বাথরুমে ঢুকল।

খেতে বসে একদিন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বিভাস যেন চমকে উঠল। তারপর গম্ভীর-ভাবে বলল, 'ওকি!'

হাতায় করে খানিকটা নিরামিষ তরকারী স্বামীর পাতে ঢেলে দিতে দিতে উমা বলল, 'কি আবার?'

বিভাস বলল, 'বাঁ হাতের ওই নখ দুটিতে কি হয়েছে তাই জিজ্ঞেস করছি।'

উমা লজ্জিত হয়ে আঁচলের তলায় হাতখানিকে লুকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'রুবি জোর করে একটু নেইলপলিশ লাগিয়ে দিয়েছে। আজকাল কিছুই তোমার চোখ এড়ায় না দেখছি।'

বিভাস বলল, 'না, তা এড়ায় না, বরং নখদর্পণে অনেক কিছুই আজ চোখে পড়ল। দেখ, হাজার দিন বলেছি এসব আমি পছন্দ করিনে। তবু তুমি তাই করবে?'

উমা বলল, 'এতে পছন্দ অপছন্দের কি আছে। আমি তো আর নখে ঠোঁটে রঙ মেখে কোথাও বেড়াতে বেরুচ্ছি না। ঘরের মধ্যেই রয়েছি। তাতেও তোমার জাত গেল? এমন মানুষ যদি দুনিয়ায় দুটি থাকে।'

'হুঁ।' বলে বিভাস গম্ভীরভাবে তাড়াতাড়ি খাওয়া সারতে লাগল। এসব তুচ্ছ বিষয় লক্ষ্য না করলেও চলে। কিন্তু তুচ্ছ বলে এগুলিকে একেবারে উড়িয়ে দিতেই বা কি করে পারে বিভাস? তার সবরকম উপদেশ-নির্দেশ উমা কান পেতে শোনে, কিন্তু বিভাস যখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, সে গিয়ে যোগ দেয় রুবির সঙ্গে। তার সংস্পর্শ থেকে বিভাস কিছুতেই স্ত্রীকে ছাড়িয়ে আনতে পারছে না। রুবির চালচলন আচার-আচরণের প্রভাব পড়েছে উমার ওপর। ওদের সৌখ্য এমন ঘনিষ্ঠতায় গিয়ে পৌঁছেছে যে মাঝে মাঝে দু'জনের মধ্যে শাড়ি গয়নার পর্যন্ত বিনিময় হয়। একেক দিন উমার শাড়ি

আর অলঙ্কার পরে রুবি বাইরে বেরোয়। উমার উৎসাহ আর উল্লাস দেখে মনে হয় যেন সে নিজেই বেরুচ্ছে। কিন্তু সেদিন ভারি অপ্রস্তুত হয়েছিল বিভাস। অফিস থেকে ফিরে এসে দেখে তার ঘরে জানলার শিক ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রুবি। ঘরে আবছা অন্ধকার। আলো জ্বালা হয়নি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিভাস বলেছিল, 'উমা গেল কোথায়? আপনি কি ওর জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

জবাব এসেছিল, 'না। উমাকে আমার দরকার নেই। আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি বিভাসবাবু।'

বলে মুখ ফিরিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠেছিল উমা, 'খুব নিরাশ হলে, না?'

উমার পরনে রুবির সেই চড়া লাল রঙের শাড়ি, সেই কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখবার ধরন, এমন কি তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত উমা নকল করেছে।

মুখ লাল করে বিভাস বলেছিল, 'দেখ, এ ধরনের বাজে ঠাট্টা ইয়ার্কি আমি মোটেই পছন্দ করিনে। ফের তুমি ওর শাড়ি আর প্লাস্টিকের জিনিসগুলি পরেছ?'

উমা বলেছিল, 'এক্ষুনি ছেড়ে রাখছি। আর পরব না।'

কিন্তু প্রতিশ্রুতি উমা রাখতে পারেনি। আজ আবার নখে পালিশ লাগিয়ে এসেছে। বিভাস অপ্রসন্ন মুখে খাওয়া সেরে উঠে পড়ল। উমাকে আর প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

স্বামীর নির্দেশে দিন কয়েক উমা একটু নিরস্ত রইল। কিন্তু কদিন বাদেই অফিস থেকে ফিরে এসে বিভাস দেখল, উমা বাড়িতে নেই। বাবলুর কান্না সুরবালা কিছুতেই থামাতে পারছেন না। বিভাস জিজ্ঞেস করলে, 'উমা গেল কোথায় পিসীমা?'

সুরবালা বিরস মুখে বললেন, 'কি জানি বাপু, সেজেগুজে ওই ফক্কড় মেয়েটার সঙ্গে সেই যে দুপুরে বেরিয়েছে আর ফেরবার নাম নেই। এই ছেলে আমি এখন রাখি কি করে?'

বিভাস মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলল, 'বেরোতে দিলে কেন তুমি? কেন নিষেধ করলে না?'

সুরবালা বললেন, 'আহাহা, আমাকে একেবারে জুড়িয়ে দিলি তুই। তোর নিষেধই যেন কত শোনে, তা' আবার আমার নিষেধ মানবে। সেই রকম বউই তুমি বিয়ে করে এনেছ কিনা। সাথিটিও জুটেছে বেশ? একে মা মনসা তাতে ধোঁয়ার গন্ধ।'

বিভাস আর কোন কথা না বলে অফিসের জামা-কাপড় ছাড়তে লাগল।

সন্ধ্যার পর রুবির সঙ্গে উমা ঘরে ফিরল। বেশেবাসে প্রসাধনে উমার ওপর তার

বন্ধুর প্রভাব সুস্পষ্ট। বিভাস কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

উমা বলল, 'সিনেমায়। রুবি কিছুতেই ছাড়ল না।'

বিভাস বলল, 'হুঁ। কি ছবি দেখে এলে?'

উমা তরল স্বরে বলল, 'রুবির ইচ্ছে ছিল ইংরেজী ছবি দেখার, আমার ইচ্ছে ছিল বাঙলা। মাঝামাঝি রফা হল। নিউ সিনেমায় 'সুরত' দেখলাম শেষ পর্যন্ত। একেবারে বাজে। তবে যাই বলো, গানগুলি কিন্তু বেশ ভালো।'

'সুরত'-এ যে শ্লীলতার অভাব আছে সে খবরটা এর আগেই বিভাসের কানে গিয়েছিল।

একটু চুপ করে থেকে বিভাস বলল, 'ওর সঙ্গে যখন বেরিয়েছ তখনই বুঝেছি, ওসব ছাড়া দেখবার মত ছবি তুমি খুঁজে পাবে না। কিন্তু উমা, তুমি কি ভেবেছ বলতো?'

বিভাসের গলার আওয়াজ চড়া।

উমা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কি আর ভাবব।'

বিভাস বলল, 'তুমি ভেবেছ ওকে যা মানায় তা তোমাকেও মানাবে? তোমারও স্বামী নেই, সন্তান নেই, সংসার নেই, যা খুসি তাই করে বেড়ালেই হোল, যেখানে খুসি গেলেই হোল, তাই না? কিন্তু তা চলবে না। আমি বলে দিচ্ছি মোটেই চলবে না তা। আমার এ সংসারে থাকতে হলে আমি যা বলব তাই তোমাকে শুনতে হবে। তা যদি না পোষায় দরজা খোলা আছে, তুমি যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পার।'

সুরবালা এসে মাঝখানে দাঁড়ালেন, 'আঃ, তুই কি ক্ষেপে গেলি না কি বিভু! অত চেঁচামেচি করছিস কেন? বেশ, তুই পছন্দ না করিস সেকথা বুঝিয়ে বলে দিলেই তো হয়। আর তোমাকেও বলি উমা, আর কিছু না হোক, ছেলেটির দিকে তো একটু তাকাতে হয়। সেই তোমরা বেরুবার পর থেকে যে ট্যাঁ ট্যাঁ সুরু করেছে, সাধ্যি কি থামাই। অসুখ-বিসুখের পরে কোলের ছেলে মার এমন ন্যাওটাই হয়। আগে তো দিন রাত আমার কাছে পড়ে থাকত। কিন্তু—'

'থাক থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এবার দিন আমার কাছে।' বলে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ছেলেকে সুরবালার কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে উমা বেরুতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে বিভাস ওর কাঁধ চেপে ধরল। মুঠি তো নয় থাবা। আওয়াজ তো নয়, সিংহনাদ।

'এই, দাঁড়াও।'

উমা স্বামীর দিকে ফিরে তাকিয়ে মুহূর্তকাল নিশ্চল হয়ে রইল। বাবলু সভয়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'বাবা মালে মা, বাবা মালে।'

সুরবালা তাড়াতাড়ি বাবলুকে ফের নিজের কোলে তুলে নিয়ে ভাইপোকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ছি ছি, কালে কালে তুই কি হলি বিভাস, ছিঃ, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।'

বিভাস বলল, 'না ছাড়ব না। ও আমাকে অপমান করে করুক কিন্তু তোমাকে অপমান করতে যায় কোন্ সাহসে ?'

সুরবালা বললেন, 'তোর সাহসই বা কম কিসে! আমার সামনেই—ছি ছি ছি, ছাড় শিগগির, ছাড়!'

অবশ্য পিসীমার বলবার আগেই স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে বিভাস সরে দাঁড়িয়েছিল।

'চুপ করে আছে কেন, জবাব দিক আমার কথার।' বিভাস ফের গর্জে উঠল।

উমাও ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'কি জবাব চাও তুমি শুনি ?'

'আঃ আচ্ছা পাগলদের পাল্লায় পড়েছি। ওদিকে উনুন যে জ্বলে গেল। চল ওঘরে চল।'

বলতে বলতে উমাকে একরকম জোর করেই বাইরে নিয়ে গেলেন সুরবালা, দাম্পত্য কলহটা আর বেশি দূর গড়াতে পারল না।

রাত এগারটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত যথারীতি মানভঞ্জনের পালা চলল। তারপর স্বামীর রোমশ বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল উমা, 'আমি ভাবতেই পারিনি যে তুমি, তোমার মত লোক—'

সত্যি, তার মত লোকের এমন করা উচিত হয়নি, একথা কেবল মুখ নয় মনে মনেও স্বীকার করল বিভাস। লজ্জিত হোল, অনুতপ্ত হোল। উমা ঘুমিয়ে পড়বার পরেও বিভাস অনেকক্ষণ জেগে রইল বিছানায়। না, এ পথ নয়, এ পদ্ধতি নয়। উমার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের নতুন উপায় খুঁজতে হবে বিভাসকে। আশ্চর্য, তার এতদিনের শিক্ষা, এতদিনের পরামর্শের কোন স্থায়ী প্রভাবই পড়ল না উমার ওপর! রুবির মত চটুল স্বভাবের বিসদৃশ রুচির অতি সাধারণ একটি মেয়ে দু'দিনের আলাপে ওকে জয় করে নিল। মাধ্যাকর্ষণের মত, মানুষের মনেরও কি স্বাভাবিক আকর্ষণ নীচতার দিকে, হীনতার দিকে ? সেই মারাত্মক টানকে কি কিছুতেই রোধ করা যায় না ? কিন্তু বিভাস এত সহজে হার মানবে না, এত অল্পে হাল ছাড়বে না। শুধু এই হাস্যকর শুচিবায়ুতার পথ তাকে ছাড়তে হবে।

উমার ওপর যদি রুবির প্রভাব পড়ে থাকে, তার নিজের প্রভাব ফেলতে হবে রুবির ওপর। ওকে এড়িয়ে গেলে চলবে না, ওকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। উমার কাছে বার বার প্রমাণ করতে হবে রুবির পথটা আসল পথ নয়, মতটা মূলতঃ ভ্রান্ত। কোন সারবান বস্তু ওতে নেই, কেবল কথার ফেনা ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

পরদিন স্ত্রীকে বিভাস বলল, 'তোমার বন্ধুকে আজ বিকেলে চা খেতে বল না। আমি সকাল সকাল ফিরব।'

উমা একটু হেসে বলল, 'কালকের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি। কিন্তু তার আর দরকার নেই। আমি ঠিক করেছি ওর সংস্পর্শে আর যাব না। তাছাড়া ওর নিজেরও তো একটা মান-সম্মান বোধ আছে।'

বিভাস বলল, 'আচ্ছা, আমি নিজে গিয়ে যদি বলি, তাহলে তো সেই বোধটা অটুট থাকবে।'

উমা বলল, 'তার কি দরকার? চা তো আমাদের ঘরে ও না খেয়েছে তা নয়, আজ এমন ঘটা করবার কি হোল?'

বিভাস বলল, 'ঘটার আবার কি আছে। এতদিন তুমি বলেছ, আজ না হয় আমি বললাম।'

চায়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে রুবি একটু বিস্ময়ের ভঙ্গি করে বলল, 'ব্যাপার কি? আজ কি তোদের কারো জন্মদিন নাকি?'

উমা মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

'তবে বুঝি বিবাহ-বার্ষিকী? তাহলে বল একটা কিছু প্রেজেণ্ট ট্রেজেণ্ট নিয়ে আসি।'

উমা বলল, 'না। তাও নয়। অমনিই তোর প্রতিবেশীমশাইর সুন্দরী পড়শীর সঙ্গে চা খাবার শখ হয়েছে।'

রুবি একটু হাসল, 'ও শখ! কিন্তু সখি, তুই এ শখকে প্রশ্রয় দিস কোন্ সাহসে!

উমা হেসে বলল, 'রঙ্গ রাখ। তুই সিনেমা থিয়েটারে গেলে নাম করতে পারতিস। সকাল সকাল ফিরিস কিন্তু। আজ আবার সেই রাত দুপুর করিসনে।'

'আচ্ছা দেখা যাক।'

রুবি কথা রাখল। ঠিক সন্ধ্যার একটু আগেই ফিরে এল ঘরে। অফিসের বেশবাস বদলে, হাতমুখ ধুয়ে উমাদের দরজায় দাঁড়াল, 'আমার একটু দেরি হয়ে গেল। তোমাদের হয়তো অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি উমা।'

বিভাস উঠে দাঁড়িয়ে শিষ্টাচারের ভঙ্গিতে বলল, 'না না না, আসুন।'

রুবি উমার পাশের চেয়ারে বসতে বসতে বিভাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের যে বসিয়ে রাখিনি তা প্রমাণ করবার জন্য আপনি দাঁড়িয়ে নাই বা রইলেন।'

বিভাস লক্ষ্য করল, রুবির কথার ভঙ্গিতে ঠিক আগের মত চপলতা থাকলেও

পোষাকে সেই পারিপাট্য নেই। খয়েরী রঙের সাধারণ একখানা তাঁতের শাড়ি ওর পরনে। সেই প্ল্যাস্টিকের গয়নাগুলিও খুলে রেখে এসেছে।

হাতে শুধু সরু সরু দুগাছি চুড়ি। মেকআপহীন মুখ। উমার পাশে আজ ওকে চমৎকার মানিয়েছে।

বিভাস তার চেয়ারটা টেবিলের দিকে আর একটু টেনে আনতে আনতে হেসে বলল, 'দাঁড়িয়েছিলাম বলেই তো আপনি অমন ঘুরিয়ে কথা বলবার সুযোগ পেলেন।'

রুবি বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না। আপনি বসে থাকলেও আমার সুযোগের কোন অভাব হবে না। কিন্তু উমা, তুমি যে আজ এত চুপচাপ রয়েছো। ও, এই জন্তেই কোন কথা নেই। ঈস, বিপুল আয়োজন করে বসেছ দেখছি।'

লুচির সঙ্গে ডিমের তৈরী হালুয়া প্লেটে করে রুবির দিকে এগিয়ে দিতে দিতে উমা বলল, 'বিপুল আর কি।'

খেতে খেতে রুবি বলল, 'বাঃ বেশ হয়েছে তো।'

বিভাস বলল, 'ডিমের প্রিপারেশন ওর হাতে ভালোই হয়।'

রুবি হেসে বলল, 'ইস্ স্ত্রীর প্রশংসায় অমনিই পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। উমার হাতে কিসের প্রিপারেশনটা খারাপ হয়, সাহস করে বলুন তো শুনি।'

বিভাস বলল, 'কেন, আমাকে কি খুব ভীরু বলে মনে হয় আপনার?'

'ভীরু বইকি। ধর্মভীরু।' রুবি মুখ টিপে হাসল, 'কেমন, ঠিক বলিনি?'

বিভাস বলল, 'না, পুরোপুরি ঠিক বলেননি। এ ভীরুতা যে আসলে ভয় নয়, সাহস —একথা বললে ঠিক হোত।'

রুবি চায়ের কাপটা সামনে টেনে নিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'হোত না। ভীরুতা চিরদিনই ভীরুতা। তাকে কোনদিনই সাহস বলা যায় না। এমন কি ধর্মভয়কেও নয়। ধর্মভয়ের মধ্যে শুধু ভয়টুকুই আছে, ধর্ম নেই।'

বিভাস হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। বেশ একটু বিস্মিত আর গম্ভীর দেখাল তাকে। এতদিন এই মেয়েটির চটুল ভঙ্গিই শুধু সে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু প্রয়োজন হলে ও যে দৃঢ় স্পষ্ট ভাষায় গভীর ভাবকেও প্রকাশ করতে পারে, তার পরিচয় বিভাস যেন এই প্রথম পেল। আর পেয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠল।

বিভাস বলল, 'কিন্তু আপনি যাকে ভয় বলছেন, সে তো মানুষের নিজেরই সৃষ্টি—'

রুবি বলল, 'অনাসৃষ্টি বলুন। তাতে পুরুষেরা কাপুরুষ হয়েছে।'

উমা বলল, 'আর মেয়েরা?'

রুবি বলল, 'মনুষ্যত্ব বর্জিত মেয়েমানুষ। কিন্তু বিভাসবাবু, চায়ের কাপে আমরা

মিছামিছি ঝড় তুলছি কেন। দেখুন তো, এরই মধ্যে কেমন ঝোড়ো কাকের মত চেহারা হয়ে গেছে উমার। আরও খানিকটা খাবার টাবার দিয়ে ওঁর মুখটা বন্ধ করে দাও ভাই। না হলে আজ আর রক্ষে থাকবে না। বক্তৃতা বর্ষণে সব ভাসিয়ে দেবেন।'

পরের সপ্তাহে পাল্টা নিমন্ত্রণ করল রুবি।

বিভাস বলল, 'এত তাড়াতাড়ি কেন?'

রুবি বলল, 'তাড়াতাড়ি আর কই। বরং বেশ দেরি হয়ে গেছে, অনেকদিন আগেই বলা উচিত ছিল। বলবও ভেবেছিলাম। কিন্তু সাহস পাইনি।'

'কেন। এত ভয় কিসের আপনার?'

রুবি বলল, 'ভয় ছিল পাছে আপনি 'না' করে বসেন। বর্ণহিন্দুদের কাছে সব জাতই তো আর জলচল নয়।'

'আজ সে ভয় ভাঙল কিসে?'

রুবি বলল, 'উমার আশ্বাসে। তাছাড়া চায়ের গরম জলে তো কোন ভয় নেই। ওতে সব বীজাণুই মরে। একেবারে গঙ্গা জলের মত পবিত্র। কারো হাতেই ওর জাত যায় না।'

উমা বলল, 'নিমন্ত্রণ রাখতে রাজী আছি। কিন্তু একটা সর্ত, আজ আর তর্ক করতে পারবিনে।'

রুবি বলল, 'বাঃ যত দোষ পরের ঘাড়ে। তর্ক বুঝি সেদিন আমি তুলেছিলাম? আর নিজের স্বামীটি একেবারে নিরপরাধ, না? বেশ, তর্ক আমরা করব না কিন্তু সেও একটি সর্তে। তোকে গান শোনাতে হবে।'

উমা বলল, 'শোনাবার মত গান আমি জানি নাকি যে শোনাব। তার চেয়ে আমরা তোর সেতার শুনব, সেই ভালো!' স্বামীর দিকে ফিরে তাকাল উমা, 'জানো ও চমৎকার সেতার বাজায়।'

বিভাস বলল, 'না, জানবার সুযোগ এতদিন হয়নি।'

রুবি একটু হাসল, 'যখন জানবেন তখন বুঝতে পারবেন সেটা সুযোগ নয়, দুর্যোগ। চলুন এবার।'

চেয়ার টেবিলে সুন্দর করে সাজানো ঘর। জানলায় দরজায় রঙীন পর্দা! একপাশে বইয়ের র‍্যাকে কিছু বই, দেয়ালে টাঙানো সেতার।

চায়ের পর অনেক অনুরোধেও উমাকে গাওয়ানো গেল না। উমা বলল, 'না ভাই, গলা কিরকম ভাঙা দেখছিসনে। তার চেয়ে তুই বরং বাজা।'

রুবি বলল, 'গায়িকাদের এই এক সুবিধে। কথায় কথায় তারা গলার দোহাই দিতে

পারে। তোর যদি গলা ভেঙে থাকে আমার তাহলে আঙুল মচকে গেছে। বিভাসবাবু, আপনি বক্তৃতা করুন, তাই ভালো।'

বিভাস বলল, 'উহু, আজকে আর মুড নেই। আজ আপনার সেতারই হোক।'

রুবি বলল, 'কি করে হবে। বহুদিন অভ্যেস নেই। ওর ওপর কি রকম ধুলো জমেছে একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন।'

'বেশ তো ধুলো ঝেড়ে নিন।'

'তা না হয় ঝাড়লুম। কিন্তু কেবল ধুলোই তো নয়, জড়িয়ে গেছে সরু মোটা তারে। তার কি হবে ?'

বিভাস চোখ তুলে রুবির দিকে তাকাল। এ যেন আর কারো সুর, আর কারো মুখের কথা।

একটু চুপ করে থেকে বিভাস বলল, 'জড়িয়ে গেছে বলেই যদি বুঝতে পেরে থাকেন, তাহলে ছাড়াতেও দেরি লাগবে না।'

রুবি অদ্ভুত একটু হাসল, 'কিন্তু ছাড়াতে গেলে ব্যথা লাগবে। আমি আপনাদের ওসব ব্যথা বেদনার মধ্যে নেই।' বলে সেতারটা পেড়ে নিল রুবি।

বাজানো শুরু হতেই বিভাস বলল, 'সুরটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।'

রুবি মুখ তুলল, 'তুমি যখন বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা। উমার বড় প্রিয় গান। ওতো গাইল না, ওর হয়ে আমি বাজাচ্ছি। কিন্তু তাতে কি আপনার মন ভরবে ?'

বাজানো শেষ হওয়ার পর সেতারটা ফের দেয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রাখল রুবি, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'কেমন লাগল ?'

বিভাস আন্তরিক প্রশংসা জানিয়ে বলল, 'খুব ভাল। নিষ্ঠা থাকলে আপনি—'

রুবি হাসিমুখে বলল, 'নামকরা সেতারী হতে পারতাম—তাই না ?'

বিভাস বলল, 'ঠাট্টা নয়। আপনার মধ্যে যদি কিছুর অভাব থাকে সে এই নিষ্ঠার। অথচ জীবনে একনিষ্ঠ হতে না পারলে—'

রুবি তেমনি স্মিতমুখে বলল. 'অনেকনিষ্ঠ হতে হয়। তাই বা মন্দ কি। জীবনে সেও তো এক রকমের হওয়া। দেখুন বিভাসবাবু, নিষ্ঠা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দ্বিতীয়ভাগের ওইসব শক্ত শক্ত কথাগুলি আমার মধ্যে পাবেন না। যে জীবনটা আমার ভাগে পড়েছে, তাকে আমি সহজ সরল প্রথমভাগে ধরে রেখেছি। একেবারে কর, খল, ইট. ঈশ, বড় জোর জল পড়ে, পাতা নড়ে। তার বেশি নয়।'

বিভাস স্থির দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল রুবির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তার বেশি নয় ?

আপনি বললেই আমি বিশ্বাস করব? আকাশ ছেয়ে মেঘ জমে না? ঝড় ওঠে না? সে ঝড়ে একমাত্র সম্বল ওই দ্বিতীয় ভাগ। না হলে প্রথম ভাগের একটি পাতাও আস্ত থাকবে না। ছিঁড়ে উড়ে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

উমা বিস্মিত হয়ে স্বামীর দিকে তাকাল। বিভাসের মুখে এমন রূপকের ভাষা এর আগে সে শোনেনি। স্বামীর এমন দীপ্ত রূপও শিগ্‌গির দেখেছে বলে তার মনে পড়ল না।

রুবি অপলকে বিভাসের দিকে একটু কাল তাকিয়ে কি দেখল। তারপর মিলিয়ে যাওয়া হাসির দেখা মিলল ফের ওর ঠোঁটে।

ঠিক আগের মতই তরল কণ্ঠ শোনা গেল ওর, 'গেলই বা নিশ্চিহ্ন হয়ে। তাতে আপনার অত ভাবনা কিসের বিভাসবাবু? আপনার শুভঙ্করীখানা ঠিক থাকলেই তো হোল।' আঙুল দিয়ে উমাকে দেখিয়ে দিল রুবি।

বিভাসের মুখ আরক্ত দেখাল, 'তাই বা ঠিক থাকতে আপনি দিচ্ছেন কোথায়! আপনার রকম সকম দেখে মনে হয়, আপনি ওকে বখাবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছেন।'

রুবি এবার কঠিন দৃষ্টিতে বিভাসের দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'তাই নাকি? হবেও বা। আমার কিরকম একটা অভ্যেস হয়ে গেছে জানেন, কাউকে বখাতে না পারলে হাত নিসপিস করে। হাতের কাছে আছেন তো আপনারা দু'জন। আপনি আর আপনার স্ত্রী। ভেবে দেখলাম, আপনাকে বখানোর চেয়ে আপনার স্ত্রীকে বখানো অনেক নিরাপদ। বেশ, উমার বেলায় যদি আপনার আপত্তি থাকে কাল থেকে পিসীমার দিকেই ঝুঁকব।' বলে রুবি হেসে উঠল। উমাও না হেসে পারল না।

আর দুঃসহ নির্বাক ক্রোধে বিভাসের চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

একটু বাদে বিভাস কি বলতে যাচ্ছিল, বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠল। ভারি গলাও শোনা গেল, 'মিস্ রায় আছেন?'

পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে রুবি মিষ্টি কণ্ঠে বলল, 'এই যে মিঃ চ্যাটার্জী। আমি ভাবলাম, আপনি বুঝি আজ এলেনই না। সেই চারটার পর থেকে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি, আর এই আপনার সময় হোল। একটু দাঁড়ান, আসছি।'

তারপর উমা আর বিভাসের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে রুবি বলল, 'লাইফ ইন্সিওরেন্সের পার্টি, সেদিন কিছুতেই রাজী হননি। আজ দেখি নিজেই ঠিকানা খুঁজে গরজ করে এসে পড়েছেন।'

বিভাস আর উমা দু'জনেই উঠে দাঁড়াল।

উমা বলল, 'শহর শুদ্ধ লোকের লাইফ-ইন্সিওরেন্স করাচ্ছিস, আর ওকে বুঝি তোর চোখে পড়ে না ?'

রুবি হেসে বলল, 'আমার চেয়ে তোর গরজ দেখি বেশি। চোখে ঠিকই পড়েছে। শুধু সবুরে মেওয়া ফলবে সেই আশায় আছি।'

ওরা দু'জন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বাইরের আগন্তুক ঘরে ঢুকলেন। বিভাসের কানে রুবির কলকণ্ঠ ভেসে এল, 'বাঃ, স্যুটটি তো আপনাকে চমৎকার মানিয়েছে মিঃ চ্যাটার্জী।'

বিভাসের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। একটু বাদে শোবার ঘর থেকে একখানা বই নিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে বসল বিভাস। দিনের আলো আর নেই। সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। কিন্তু বই খুলতে না খুলতেই জুতার শব্দে চমকে উঠে বাইরের দিকে তাকাল। কালো স্যুট পরা ফর্সা চেহারার চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়সের একজন স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ়ের পিছনে পিছনে রুবি বেরিয়ে যাচ্ছে। ওর হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পরনে গোলাপী রঙের সিল্ক। যেতে যেতে একবার বিভাসের দিকে তাকালো রুবি, তারপর হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল।

ভিতরটায় হঠাৎ যেন জ্বালা করে উঠল বিভাসের। বইয়ে মন বসল না। একটু বাদে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। এই স্পর্ধা, এই ঔদ্ধত্যকে কিছুতেই সে সহ্য করবে না। রুবিকে যদি এ বাড়িতে থাকতে হয়, তার চালচলন, আচার-আচরণ বদলাতে হবে। শোধরাতে হবে ওকে। বিভাস ওকে শোধরাতে বাধ্য করবে। এ পর্যন্ত অনেককে শুধরেছে বিভাস। দু'জন পাঁড়মাতাল বন্ধুকে মদ ছাড়িয়ে বন্ধুপত্নীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। দূর সম্পর্কের গৃহত্যাগিনী এক আত্মীয়-কন্যাকে ফের গৃহস্থ করেছে। সেদিন তাদের ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল বিভাস। ভিন্ন জায়গায় বসিয়ে মল্লিকা নিজের হাতে ওকে পরিবেশন করেছিল। সেই কৃতজ্ঞতানন্দ স্মিত মুখ বিভাসের আজও যেন চোখে লেগে রয়েছে।

রুবি অবশ্য অত সহজ নয়। কিন্তু দরকার হলে বিভাসও শক্ত হতে জানে। নাছোড়বান্দা সেই কি কম ?

দিন কয়েক একটু যেন অন্যমনস্ক দেখাল বিভাসকে। সেই টি-পার্টির পর রুবির সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু তার ধরন-ধারণ ঠিক তেমনি চলেছে। তার ঘরে আগন্তুকদের যাতায়াতের বিরাম নেই। তার নিজের ঢুকবার বেরুবার সময়েরও স্থিরতা নেই কিছু। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সে বিভাসকে চ্যালেঞ্জ করে চলেছে।

উমা একদিন বলল 'কি ব্যাপার, তুমি এত গম্ভীর হয়ে যে !'

বিভাস বলল, 'ভাবছি তোমার বন্ধুটিকে এখানে আর বেশিদিন রাখা চলবে না। বাড়িঅলাকে বিষয়টা জানাতে হবে।'

উমা বলল, 'ওরে বাবা! এতখানি রাগ কি ভালো?'

বিভাস বলল, 'না হাসির কথা নয়। সত্যি এবার একটা স্টেপ নেওয়া দরকার। জানো ওর জন্যে পাড়ায় এ-বাড়ির সুনাম নষ্ট হতে চলেছে।'

উমা বলল, 'কি যে বল। আসলে ওর দেখানেপনাটাই সব। বাড়াবাড়িকে ও বড় বেশি ভালোবাসে।'

বিভাস বলল, কিন্তু তারও তো একটা সীমা থাকা চাই।'

উমা বলল, 'বেশ তো। সাধ্য থাকে কথাটা ওকে বুঝিয়ে বল না। বললেও তো কয়েকদিন।'

বিভাস বলল, 'আর একদিন ভালো করে বলা দরকার হয়ে পড়েছে।'

উমা হাসল, 'তাহলে বল। কিন্তু একদিন বললেই কি দরকার মিটবে?'

বিভাস একথার কোন জবাব না দিয়ে শুধু ভ্রূ কোঁচকালো।

একদিন অফিসের প্রবীণ এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট ভুবনবাবু বললেন, 'বাড়িতে কি অসুখবিসুখ আছে নাকি বিভাসবাবু?'

বিভাস বিস্মিত হয়ে বলল, 'না! কেন বলুন তো?'

ভুবনবাবু বললেন, 'আপনাকে কিছুদিন যাবৎ যেন বড় চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

বিভাস হাসল, 'তাহলে আমার মুখের আদলেরই দোষ। চিন্তা না করলেও তাতে চিন্তার ছাপ পড়ে।'

কিন্তু চিন্তা যে বিভাস একেবারে না করছিল, তা নয়। শুধু রুবির কেন, নিজের ধরন-ধারণও তাকে এতদিনে বিস্মিত করে তুলেছে। তার অফিস আছে, সংসার আছে, দু' একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিবিড়। কিন্তু এত ভিড়ের মধ্যেও কেন যখন তখন মনে রুবির মুখের ছায়া পড়ে। এর কারণ? তাছাড়া রুবির সঙ্গে বিভাসের তো কোন মিল নেই। আদর্শে অমিল, রুচিতে অমিল, জীবন সম্বন্ধে, দৃষ্টিভঙ্গিতে অমিল। কিন্তু অমিত্রতা বিভাসের অসহনীয়। সে দেখেছে কোন বন্ধুর সঙ্গে বেশিদিন মনোমালিন্য পুষে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কথান্তর হয়, মতান্তর হয়, তারপর বিভাস নিজেই যায় মিটমাট করতে। অনেকের সঙ্গেই তার মেলে না। বোধহয় সেইজন্যেই মিলের জন্য তার এত আগ্রহ। বাইরের আপাতদৃষ্ট গম্ভময় কড়া পছন্দ-অপছন্দওয়ালা মানুষের মধ্যে এমন মিত্রাক্ষর ছন্দপ্রিয়তা কি করে থাকে, বিভাস তো ভেবে পায় না। তার এই গোপন মনের খবর কেউ জানে না। উমাও নয়।

জানবার জন্যে সে কি কোনদিন চেষ্টা করেছে? উমা কি কোনদিন ভেবে দেখেছে তার এই কঠিন উপদেশ-নির্দেশের অন্তরালে অন্তরের কোমলতা ফল্গুর মত লুকিয়ে থাকতে পারে? উমা কেবল তার বাইরের সাত্ত্বিকতা দেখেই সঙ্কুচিত হয়ে রয়েছে, সত্তাকে অনুভব করবার চেষ্টা করেনি। আর রুবি? বিভাস বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল। ফের ও মেয়েটির প্রসঙ্গ কেন? রুবি কোনদিনই তাকে বুঝতে পারবে না। কিন্তু কেউ বুঝতে পারলে যেন ভালো হয়, বুঝতে চাইলে যেন ভালো লাগে।

বিভাস মনে মনে ঠিক করল এ মনোবৃত্তিকে কিছুতেই সে প্রশ্রয় দেবে না। কে জানে এ হয়তো প্রবৃত্তিরই ছদ্মরূপ। রুবিকে এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। ওর রুচি বুদ্ধি নিয়ে ও থাক। সংসারে বিভাসের আরো অনেক কাজ আছে, আছে আরো অনেক দায়-দায়িত্ব।

পদ্মপুকুর পল্লীমঙ্গল সমিতির সঙ্গে বিভাসের বহুদিনের যোগাযোগ। ওপাড়া ছেড়ে এলেও প্রাক্তন পড়শীদের বিভাস ছাড়তে পারেনি। এখনও সমিতির আয়ব্যয়ের হিসাব আর কোষাগার রক্ষার ভার বিভাসের ওপর। পাকা হিসেবী বলে সভ্যরা তাকে সমীহ করে। অফিসের পর আজ ইচ্ছা করেই সেখানে খোঁজ নিতে গেল বিভাস। সভাপতি কি সম্পাদকের দেখা মিলল না। কিন্তু সহকারী সম্পাদক ধরা পড়ে গেলেন। অনেক চাঁদা বাকি, বহু ডোনেশন আদায় করা হয়নি। এ নিয়ে সহকারীর সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা করল বিভাস, পরের সপ্তাহেই সদস্যদের একটি সাধারণ সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করল। কাজ সেরে উঠতে উঠতে সাড়ে নটা বাজল। বাস থেকে নিজেদের রাস্তার মোড়ে যখন নামল, তখন দশটা পাঁচ। আর ঠিক সেই সময় তার পাশ দিয়ে একটি মোটর বেরিয়ে গেল। গাড়িতে যিনি রথী, তিনিই সারথি। কালো মোটাসোটা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। বিভাসের চোখ এড়া'ল না সুভদ্রাবেশিনী যে-মেয়েটি তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে রয়েছে সে রুবি রায়।

একটু বাদেই আরোহিনীকে মিডল রোডের মাঝপথে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটি ফিরে চলল। কাঁচের উপর 'ডকটর' ছাপ মারা এগাড়ি বিভাস এর আগেও ক'দিন তাদের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে।

পার্কটা ছাড়াতেই চোখে পড়ল রুবি খুব আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে। বিভাস কোন কথা না বলে ওকে ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করতেই রুবি হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনার যে এত রাত হোল ফিরতে?'

বিভাস বলল, 'কাজ ছিল।'

তারপর নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল।

পথ প্রায় নির্জন, দু' একটা বিড়ির দোকান ছাড়া আর সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে।

তাকে গাড়িতে করে কে লিফট দিয়ে গেল, বিভাস যে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করল না তাতে রুবি আশ্বস্ত হোল। কিন্তু তাই বলে বিভাস কোন কথাই বলবে না, রুবির মত মেয়ের পাশাপাশি চলেও তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে, তা রুবি সহ্য করে কেমন করে? তাকে দেখে লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা যেকোন রকমের বিকারই পুরুষের আসুক না, তা সে বুঝতে পারে,—কিন্তু কারো নির্বিকার ঔদাসীন্য সে সইতে পারে না।

রুবি বলল, 'তাহলে অনেক রাত অবধি আপনারও মাঝে মাঝে কাজ থাকে? আমি তো ভেবেছিলাম উমার চিরন্তন সান্ধ্য-আইন আপনার ওপর জারী করা আছে।'

বিভাস একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কাজকর্ম থাকলে আমার ফিরতে একেকদিন এমন রাত হয়। সেজন্য কারও কোন সান্ধ্য-আইন জারী হয়নি। কিন্তু আপনার ওপর জারী হলে ভালো হোত।'

বিভাসের কথার ভঙ্গিতে রুবি একটু যেন থমকে গেল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলল, 'তাই নাকি? করে দেখুন না জারী।'

বিভাস রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'জারী করবার দায়িত্ব আমার নয়। দায়িত্ব আপনার। আপনার চলাফেরা নিয়ে পাড়ায় কথা উঠেছে। রাস্তার বিড়িঅলা পর্যন্ত আপনাকে দেখে হাসে, আড়ালে-আবডালে নানারকম কথা বলে।'

রুবি বলল, 'বললই বা। বিড়িঅলা হলেও ওরা তো দাড়ি গোঁফঅলা পুরুষ মানুষই। আমাকে দেখে কিছু না কিছু রিয়্যাকসন ওদের হবেই, যেমন আপনার হচ্ছে।'

বিভাস বলল, 'ঠাট্টা নয়। এরপর থেকে আপনার সমঝে চলা দরকার।'

'সমঝে না চলার কি দেখলেন?'

'এত রাত্রে আপনার মত একজন অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে আর একটি অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে মোটরে করে বেড়ানোটা খুব রুচিসম্মত নয়। আমাদের নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালী পাড়ায় তা দৃষ্টিকটু লাগে।'

ফের একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল রুবি। বিভাস যে তার মুখের ওপর এসব কথা এমনভাবে বলতে পারবে—তা সে আশা করেনি। একটু বাদে ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'আপনার যত রাগ মোটর গাড়ি বলে। রিক্সা হলে বুঝি আর দুঃখ ছিল না? সুরেনবাবু আমাদেরই কোম্পানীর ডাক্তার। রাত হয়েছে বলে গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এতটা পথ কিছুতেই রিক্সা করে আসা যেত না, আপনি যাই বলতে চান না কেন!'

বিভাস বলল, 'আমি কিছুই বলতে চাইনে। কিন্তু এখন নিজেকে সামলে না নিলে আপনি বড় মুস্কিলে পড়বেন।'

সদরে কড়া নাড়তেই উমা এসে দোর খুলে দিল। দু'জনকে একসঙ্গে দেখে সে যে একটু বিস্মিত হয়েছে—তা তার মুখের ভাবে গোপন রইল না।

রুবি বলল, 'কি, চমকে গেলি নাকি? ভয় নেই, দু'জনে মিলে এতক্ষণ পার্কে বসে গল্প করিনি। রাস্তার মোড়ে দেখা। সেখান থেকে ঝগড়া করতে করতে ফিরছি।'

দিন দুয়েক বাদে বাড়িঅলা শ্রীবিলাস দত্ত বিভাসের খোঁজ নিতে এলেন।

'কি খবর মুখুজ্যে মশাই? এক পাড়ায় থাকি অথচ দেখা সাক্ষাৎ হয়ে ওঠে না। আর মশাই দিন কাল যা পড়েছে। তারপর সব ভালো তো?'

বিভাস বলল, 'এই চলছে একরকম। বসুন শ্রীবিলাসবাবু।'

বাইরের ঘরের তক্তপোষে ভালো হয়ে বসে একথা ওকথার পর শ্রীবিলাসবাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'ইয়ে, আপনার সঙ্গে একটা কথার জন্যে এসেছি। এই বাড়িতে দু'খানা ঘর নিয়ে আর একটি মেয়ে যে থাকে, তার চালচলন স্বভাবচরিত্র কি রকম মনে হয় আপনার?'

বিভাস একটুকাল আরক্ত হয়ে থেকে বলল, 'একটি ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ের সম্বন্ধে এসব প্রশ্ন ওঠেই না।'

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'তাতো বটেই, তাতো বটেই। তবে পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে কিনা তাই। ঘর দু'খানা ভাড়া নেওয়ার সময় উনি বললেন—ওঁর পুরুষ অভিভাবক সঙ্গে থাকবেন, এখন দেখছি তাঁরা কেউ আসছেন না, অথচ নানারকম লোকজন বাড়িতে আসছে যাচ্ছে।'

বিভাস বলল, 'মিস রায় একটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এজেণ্ট। সেই কানেকশনে কেউ কেউ আসেন। তা ছাড়া ওঁর আত্মীয়স্বজন আছেন।'

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'তাতো ঠিকই। তবে আমি ভাবছিলাম ওঁর তো দু'খানা ঘরের দরকার হয় না। মিছামিছি এত ভাড়াই বা উনি কেন টানেন। স্বচ্ছন্দে উনি মেয়েদের কোন হোস্টেল-টস্টেলে গিয়ে থাকতে পারেন। এদিকে আমাকে আর এক ভদ্রলোক এসে ধরেছেন। স্ত্রী পুত্র নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছেন তিনি। তাঁর দু'খানা ঘরের দরকার। তাই ভাবছিলাম আপনার পক্ষেও সুবিধে হোত। বেশ ভদ্রলোক প্রতিবেশী পেতেন। আপনাকে কোনরকম অসুবিধে ভোগ করতে হোত না। এ ধরনের টেনাণ্ট কি আর আমাদের মত গৃহস্থ বাড়িতে মানায় মশাই?'

একটু অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে হাসলেন শ্রীবিলাসবাবু।

বিভাস গম্ভীরভাবে বলল, 'গৃহস্থ বাড়ির অনুপযোগী বেমানান কিছু মিস রায় করেননি। তিনি যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিতা, ভদ্রঘরের মেয়ে। আমার তো মনে হয় তাঁর সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে হলে শিষ্টাচার ও শোভনতা মেনেই তা করা উচিত।'

শ্রীবিলাসবাবু বিভাসের মুখের দিকে তাকালেন, 'অবশ্য আপনি যদি সার্টিফাই করেন তাহলে তো কোন কথাই থাকে না। আমি একটু অন্যরকম শুনেছিলাম কিনা। কিন্তু আপনি যখন বলছেন—আচ্ছা, ওঠা যাক আজকের মত।'

শ্রীবিলাসবাবু বেরিয়ে গেলেন। আর বিভাস অন্যমনস্কের মত সেখানেই বসে রইল।

উমার মেসিনে একটা ব্লাউজ সেলাই করে নেওয়ার জন্যে ওদের ঘরে ঢুকছিল রুবি, উমা একটু আগে বাথরুমে গেছে—তার ধারা-স্নানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু মেসিনের কাছে বসবার আগেই বাইরের ঘর থেকে বিভাস আর শ্রীবিলাসবাবুর মৃদু কথাবার্তার আওয়াজ তার কানে এল। নারীসুলভ কৌতূহলে আস্তে আস্তে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল রুবি। সব শুনল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এল নিজের ঘরে। ব্লাউজ সেলাইয়ে আর মন বসল না।

ঘরে গিয়ে ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে দিল রুবি। শ্রীবিলাস দত্ত যখন তার বিরুদ্ধে অশোভন ইঙ্গিত করছিল, তার সামনে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক চাপড়ে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার তীব্র ইচ্ছা জাগছিল রুবির। কিন্তু যাওয়ার দরকার হোল না। বিনা চড়-চাপড়েই বিভাস শ্রীবিলাস দত্তের মুখ বন্ধ করে দিল। শ্রীবিলাস যেন বিভাসকেই অপমান করেছে, তার মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছিল রুবির। এমন মুখের দেখা যেন অনেককাল বাদে মিলল, যেন এই প্রথম মিলল। নিজের ওপর অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার নিজে না করে যদি কারো হাতে তুলে দেওয়া যায়, যদি আর কেউ স্বেচ্ছায় তুলে নেয় সে ভার—আশ্চর্য, আজও দেখতে ভালোই লাগে, ভাবতেও ভালোই লাগে।

কিন্তু তাইতো এসব কি ভাবছে রুবি। বিভাস যা করেছে যে-কোন সাধারণ ভদ্রলোকও তাই করত। এতো নিতান্তই শিষ্টাচার আর সৌজন্য। তাতে এত ভাবালুতার কি আছে। রুবির জন্য সৌজন্য দেখাবার লোকের অভাব আছে নাকি? মনে হয় বিভাস যেন তবু আলাদা। সেসব লোকের চেয়ে বিভাস স্বতন্ত্র। রুবি নিজের মনেই হাসল। কি স্বাতন্ত্র্য আছে ওর মধ্যে? কোন্ বৈশিষ্ট্য রুবি ওর মধ্যে আবিষ্কার করল! নিতান্তই সাধারণ কেরানী গৃহস্থ। হাতে নীতিধর্মের গতানুগতিক ধ্বজা। রুবি

একটু যদি বাঁকা চোখে তাকায় ও ধ্বজা হেলে পড়বে, ঢলে পড়বে। রুবি অমন অনেক ধ্বজাধারীকে দেখেছে। সব পুরুষ সমান, সব পুরুষ সামান্য। আশ্চর্য, একথা জেনেও রুবি ওদের বাদ দিয়ে চলতে পারে না, দু'হাতে ওদের দূরে তাড়িয়ে দিতে পারে না। হাতে-কলমে পৃথিবীর প্রত্যেকটি পুরুষের সামান্যতা প্রমাণের ভার কে যেন ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। সে দায় থেকে ওর রেহাই নেই। বড় একঘেয়ে দায়িত্ব। এতে আর যেন কোন বৈচিত্র্য নেই. কৌতুক নেই, রস নেই, রঙ নেই। বরং মাঝে মাঝে রঙের ছাপ পড়ে—যখন একজনের অপমানে আর একজনের মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে, যখন একজনের জন্যে আর একজনের মনে মমতার ছোঁয়া লাগে। মনে হয় সে যেন পুরুষের প্রথম ছোঁয়া, ঊষালগ্নে সোনার কাঠি দিয়ে সূর্য যেমন করে পৃথিবীকে ছোঁয়।

কথাটা কি একটা কবিতায় পড়েছিল রুবি। তার ছন্দটুকু মনে নেই, গন্ধটুকু আছে।

'কিন্তু আমি অসূর্যম্পশ্যা।'

রুবি নিজের মনে হেসে উঠল। গা ঝাড়া দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

...দিন কয়েক একটু যেন ভাবান্তর দেখা গেল রুবির। লোকজনের ভিড় ভেঙে দিয়ে ও যেন নিবিড়তা খুঁজছে। আজকাল ঠিক সন্ধ্যের পরেই ঘরে ফেরে। কোনদিন বইপত্র নাড়াচাড়া করে, কোনদিন সেতার নিয়ে বসে।

উমা একদিন স্বামীকে বলল, 'শেষ পর্যন্ত তুমিই জিতলে বলে মনে হচ্ছে। দেখেছ কিরকম শান্ত লক্ষ্মী মেয়েটি বনে গেছে রুবি। তোমার শাসনের ফল।' বলে উমা একটু হাসল।

বিভাস স্ত্রীকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'শাসন নয়. স্নেহ। শাসনে কিছু হয় না, আমি এতদিন ভুল করেছি উমা।'

স্বামীর একান্ত সান্নিধ্যে থেকে উমা হেসে বলল, 'সর্বনাশ! তুমি ওকেও এমন করে স্নেহ জানিয়ে আসনি তো?'

বিভাস বলল, 'ছিঃ।'

সেদিন রুবির বিরুদ্ধে শ্রীবিলাস দত্তের অভিযোগের অমন তীব্র প্রতিবাদ করে বিভাস নিজেই বিস্মিত হয়েছিল। রুবির চালচলন একটু যে বিসদৃশ—তাতো অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু বাইরের কারো কাছে সেকথা স্বীকার করতে বিভাসের যেন আত্মমর্যাদায় বাধল। রুবির মর্যাদার সঙ্গে তার মর্যাদা সেই মুহূর্তে অভিন্ন হয়ে গেল। এ ধরনের ঐক্যবোধ যেন অপ্রত্যাশিত, অননুভূত। তবু দু'একবার সংশয়ের খোঁচা লাগল বিভাসের মনে। এতে ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হোল নাতো? কিন্তু রুবির রূপান্তর দেখে বিভাসের মন ফের উল্লসিত হয়ে উঠল। তার এই মমত্ববোধের ফল যেন

হাতে হাতে মিলেছে। আপাতদৃষ্ট এত অনৈক্যের মধ্যেও সেই অন্তর্নিহিত ঐক্যতান মিলিয়ে যায়নি। সেতারের তারে তারে তার সুর ধ্বনিত হচ্ছে। তা ক্ষণিক, তা ক্ষীণ, কিন্তু সংবেদনহীন নয়।

সেদিন সন্ধ্যার পর অফিস থেকে ফিরে এসে বিভাস সংসারী জমাখরচের খাতা নিয়ে বসেছিল, উমা এসে স্বামীর পিঠ ঘেঁষে দাঁড়াল, 'কেবল হিসেব আর হিসেব। তোমার এই জমা খরচের খাতা দেখলেই আমার ভয় হয়। মনে হয় দিনের পর দিন তোমার রসকস সব শুকিয়ে যাচ্ছে।'

বিভাস মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হুঁ। এমাসেও আড়াইশ ছাড়িয়ে গেল। মাসের পর মাস খরচ বেড়েই যাচ্ছে।'

উমা বলল, 'শোন কথা। খরচ লোকের দিন দিন বাড়ে ছাড়া কমে না-কি! রুবি ঠিকই বলে। স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং যত পারা যায় বাড়ানই ভালো। তাতে লোকের শক্তি বাড়ে।'

বিভাস ফের খাতার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'তোমার দীক্ষা-গুরুটি ভালোই জুটেছে দেখছি।'

উমা বলল 'তা জুটুক আর না জুটুক দয়া করে তোমার হিসেবের খাতাটা এখন রাখ তো। একটা বেহিসেবী দিন এগিয়ে আসছে, সেদিকে খেয়াল আছে? ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাও দেখি।'

মাথা উঁচু করে বিভাস সামনের ক্যালেণ্ডারখানার দিকে তাকাল। ১৩ই অগ্রহায়ণ তারিখটির চারিদিকে একটি গোলাকার রেখা।

উমা বলল, 'দেখেছ?'

বিভাস মৃদু হেসে বলল, 'দেখলাম।'

উমা বলল, 'তোমার নিশ্চয়ই মনে ছিল না।'

'থাকবে না কেন।'

উমা বলল, 'শোন, এবার কিন্তু দিনটি অন্যরকম করে কাটাতে হবে। অন্যান্য বছরের মত ফাঁকি দিলে চলবে না।'

বিভাস মুখ গম্ভীর করে বলল, 'ফাঁকি? অন্যান্য বছর কি এই দিন ফাঁকি দিয়েছি নাকি তোমাকে?'

উমা হেসে ফেলল, 'তা এক রকম ফাঁকিই তো। কোন বছর বা একখানা বই, কোন বছর বা একখানা শাড়ি, এ ছাড়া বিয়ের দিনটিতে তুমি কবে কি করেছ শুনি?

কিন্তু এবার আর তা হলে চলবে না। এবার তো পাঁচ বছর পূর্ণ হবে আমাদের। একটু নতুন ধরনের ব্যবস্থা করা চাই এবার, বুঝেছ ?'

বিভাস বলল, 'কি ব্যবস্থা ? জুয়েলারের দোকানে ছুটতে হবে, এই তো ?'

এবার উমার মুখভার করবার পালা, 'আহা কত গয়নাগাটি যেন গড়িয়ে দিয়েছ আমাকে। কথায় কথায় কেবল গয়নার খোঁটা। তোমাদের ধারণা মেয়েরা শাড়ি-গয়নার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না, না ?'

এই ধমকের জবাবে বিভাস নিরুত্তর হয়ে রইল। একটু বাদে উমা বলল, 'না, ভয় নেই। জুয়েলারের দোকানে ছুটতে হবে না তোমাকে। ভেবেছি, এবার এই উপলক্ষে তোমার দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবকে বলব।'

বিভাস বলল, 'কেবল আমার বন্ধু-বান্ধব ?'

উমা বলল, 'তা ছাড়া আর কি। আমার কোন আলাদা বন্ধু-বান্ধব আছে না কি ? শোন, আমি হিসেব করে দেখেছি, সবশুদ্ধ জন দশেকের বেশি হবে না। টাকা পঁচিশেক খরচ করলেই হবে। কি অত হয়ত লাগবে না। সন্ধ্যার পর একটু চা জলখাবারের আয়োজন করতে হবে—সেই সঙ্গে গানবাজনার ব্যবস্থাও করা যাবে না হয়। তোমার বন্ধু কিরণবাবু রবীন্দ্রসঙ্গীত তো বেশ ভালোই গা'ন। তাঁকে বলবো। আর আমাদের রুবিকে বলব সেতার বাজাতে। কেমন হবে বল তো ?'

বিভাস নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলল, 'ভালোই হবে। এসব আইডিয়াও কি তোমার রুবিরই দেওয়া না কি ?'

উমা অসহিষ্ণু স্বরে বলল, 'দিনরাত কেবল রুবি আর রুবি ! কেন, রুবির আইডিয়া কেন হবে ? আমার কি মগজ বলে কোন পদার্থ নেই ? তা ছাড়া, ও এসব আইডিয়া কোথায় পাবে ? ওর কি বিয়ে-থা হয়েছে যে ম্যারেজ অ্যানিভার্সারীর ও মর্ম বুঝবে ?'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বিভাস একটু হাসল, 'না হয় তোমার অরিজিন্যালিটিই স্বীকার করলাম। কিন্তু সব মৌলিকতাই কি ভালো ?'

উমা হতাশার ভঙ্গি করে বলল, 'নাও, এবার তুমি রাত ভোর করতে পারবে। পদে পদে যদি ভালো আর মন্দের বিচার শুনতে হয়, তাহলে আর সংসার করা যায় না। বছরে একটা দিন বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে সেটা খারাপ হোল কিসে ? রাজ্যশুদ্ধ মানুষই তো ডাকে।'

বিভাস বলল,'তা ডাকে। ডাকা নিয়ে তো আমার আপত্তি নয়, ডাকার উপলক্ষ নিয়ে আপত্তি। নিজেদের বিবাহ-বার্ষিকী, নিজেদের ছেলের জন্মদিন—এসব ব্যক্তিগত উৎসব-অনুষ্ঠান নিজেরা গোপনে গোপনে সারাই ভালো, এসব ব্যাপারে নিজেকে জাহির করতে

আমার লজ্জা করে। বন্ধুদের যদি ডাকতে হয়, অন্য কোন উপলক্ষে ডাকব, কি বিনা উপলক্ষে ডাকব। কোন উপলক্ষে ডাকলেই একটা লৌকিকতার প্রশ্ন ওঠে।'

উমা বলল, 'উঠলই বা, তাতে দোষটা কিসের। তাঁরা আমাদের এখানে এসে লৌকিকতা করবেন, আমরা তাঁদের বাড়িতে গিয়ে লৌকিকতা করব, এই তো নিয়ম। এ ধরনের সামাজিকতা সেকালের মানুষেও করত, একালের মানুষেও করে। কেবল তোমার মত সৃষ্টিছাড়া মানুষ যারা—'

উমা আর কথা শেষ করল না। রাগ করে অন্য ঘরে চলে গেল।

বিষয়টা নিয়ে তারপর নিজের মনেই খানিকক্ষণ তর্ক করল বিভাস। তা ঠিক। উৎসব-অনুষ্ঠান সেকালেও ছিল, একালেও আছে। কিন্তু ধরনটা বদলে বদলে বড় ব্যক্তিঘেঁষা হয়ে যাচ্ছে। আগেকার উৎসব অনুষ্ঠান ছিল জাতীয় উৎসব। একই পূজা-পার্বণ সকলের বাড়িতে হোত। একই দিনে প্রত্যেকের বাড়িতে ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠত। আত্মীয়-স্বজনকে এই সব বড় বড় পূজা-পার্বণ উপলক্ষেই লোকে বাড়িতে ডাকত, আদর আপ্যায়ন করত। এমনকি বিয়ে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশনও ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না। এদের একটা পারিবারিক চেহারা ছিল। বলা হোত বৃহৎ ব্যাপার। বিয়েতে বন্ধুদের বলা যায়, কিন্তু বিবাহ-বার্ষিকী তো একান্ত করে একটি বিশেষ দম্পতির। সেই প্রথম বাসরঘরের স্মৃতি নিজেরা ঘরে বসে উদ্‌যাপন করাই ভালো। ঘরে ঘরে সে খবর পাঠিয়ে লাভ কি।

পরদিনও এই নিয়ে বিতর্ক উঠল।

উমা কিছুতেই বুঝ মানবে না। সে বলল, 'ভয় নেই, খরচটা আমার নিজের তবিল থেকেই দেব। তোমার এক পয়সাও ব্যয় করতে হবে না।'

এই দাম্পত্য কলহে রুবিও এসে ফোড়ন কাটল, 'নিন, কৃপণ-শিরোমণি এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেন তো। এবার কোমরে কাপড় বেঁধে লুচি পোলাও-এর ব্যবস্থা করুন। সত্যি এ কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়। কেবল সব সময় নিজের মতামতটাই স্ত্রীর ঘাড়ে চাপাবেন, স্ত্রীর মতামত সাধ-আহ্লাদটা একেবারেই গ্রাহ্য করবেন না, এ কী জবরদস্তি! বিয়েটা নিজের কর্তৃত্বে করেছিলেন, বিয়ের বার্ষিকীতে এক বছর না হয় স্ত্রীর কর্ত্রীত্বই বজায় রইল, তাতেও হিংসে?'

বিভাস বলল, 'বেশ, করুন আপনাদের যা খুশি।'

রুবি উমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'দেখলি তো ওকালতি করে কেমন জিতিয়ে দিলাম, ফীস হিসাবে দুটো মিষ্টি আমাকে কিন্তু মনে করে বেশি দিস। আর মেনুটা আমাকে তৈরী করতে দিবি, কৃপণের সিন্দুক এবার ভাঙব।'

বলে অপূর্ব ভ্রূভঙ্গি করে বিভাসের দিকে তাকাল রুবি। বিভাস তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল। ওর হাসবার আর তাকাবার ভঙ্গির মধ্যে কোথায় যেন একটু শালীনতার অভাব আছে। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের মনকে ধমক দিল বিভাস। ছিঃ, একজনের সহজ সাধারণ পরিহাসের মধ্যেও সে দোষ দেখতে পায়—একি শুচিবায়ুতায় ধরল তাকে, 'যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' এ তো তাই। দোষ ধরার প্রবৃত্তির মধ্যেও দোষ কম নেই, যেখানে ক্রটি নেই সেখানে চোখের দোষেও ক্রটি ধরা পড়তে পারে।

কিছু একটা কথা বলবার জন্যে মুখ তুলে বিভাস দেখল রুবি চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত উমার প্রোগ্রামই বহাল রইল। কিন্তু আগের মত তেমন উৎসাহ যেন আর নেই। যদি গোড়াতে হাসিমুখে উমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যেত বিভাস, তার আনন্দ থাকত আলাদা। কিন্তু এই নিয়ে দু'দিন ধরে তর্ক-বিতর্ক করে নীতিকথা আউড়ে মনটাকে খিঁচড়ে দিয়ে তবে সম্মতি দিল বিভাস। শুধু তাই নয়, নিজেদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে রুবিকে পর্যন্ত এসে মধ্যস্থতা করতে হোল। সে অবশ্য হাসিঠাট্টাই করে গেল। কিন্তু সত্যিই তো। উমার কথায় তো সহজে রাজী হয়নি বিভাস, রুবির তামাসার চোটে মত দিতে বাধ্য হয়েছে। আসল জিনিসের চেয়ে কারো কারো কাছে তামাসার শক্তিটাই তাহলে বড়।

কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন উমার মনের আবহাওয়া একেবারে বদলে গেল। অনেকদিন পরে নিজের পছন্দমত বিবাহ-বার্ষিকীর আয়োজন করতে পেরেছে। কেবল বিভাসের দশ-বার জন বন্ধুই নয়, নিজের পুরনো সহপাঠিনী সুলতা আর মাসতুতো বোন অঞ্জলিকেও নিমন্ত্রণ করেছে উমা, স্বামীদের তারা সঙ্গে নিয়ে আসবে। বিভাসের বন্ধুদেরও সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। উত্তরপাড়ায় গিয়ে বাবা, মাকেও বলবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেমন যেন একটু বাধো বাধো লেগেছে। এই বন্ধুদের ভিড়ে বাবা মা হয়তো স্বস্তি বোধ করবেন না। ওঁদের আলাদাভাবে আর একদিন বলাই ঠিক হবে।

উদ্যোগ আয়োজন ক'দিন ধরেই চলছিল। আটা, চিনি, ঘি সপ্তাহখানেক আগেই জোগাড় করে রেখেছে উমা। রেশনের বাজারে এসব বন্দোবস্ত আগে না করলে চলে না। দু'তিন দিন ধরে ঘর ক'খানাকে ঝেড়ে-পুঁছে সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক করেছে। বসবার জন্যে তক্তপোষে মাদুরের ওপর ফর্সা চাদর পাতবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাইরের ঘরে নিজেদের খানতিনেক চেয়ার সাজাতে উমার মনে পড়ল রুবির ঘরে তো আরও ইজিচেয়ার আছে, সেগুলি নিয়ে এলে কেমন হয়। উমা আশা করছিল রুবি নিজে থেকেই বলবে, কিন্তু ও বলল না। এসব দিকে ওর খেয়াল কম।

সকাল সকাল স্নান সেরে রুবি যথারীতি প্রসাধন সুরু করেছিল। উমা ওর পাশে গয়ে দাঁড়াল, 'ব্যাপার কি, আজও এত তাড়া কিসের তোর ?'

রুবি হেসে মুখ ফিরাল, 'তাড়াটা কেবল বুঝি তোদেরই থাকতে হবে ?'

উমা মুখ ভার করে বলল, 'তোকে অত করে বললাম আজকে বেরোস না অফিসে, ছুটি নে। তা কানেই তুললিনে আমার কথা !'

রুবি তেমনি হেসে বলল, 'আমি ভাই কানে তুলেছিলাম। কিন্তু অফিসে যিনি ছুটি দেওয়ার মালিক, তিনি কথাটায় মোটেই কান দিলেন না। বললেন সখীর বিবাহ-বার্ষিকীতে অফিসে ছুটি দেওয়ার নিয়ম নেই। তাছাড়া ব্যাপারটা তো রাত্রে! দিনে তো কেবল উদ্যোগ-পর্ব।'

উমা বলল, 'বাঃ উদ্যোগ-পর্বে বুঝি তুই একেবারেই থাকবিনে ? কাজে এগিয়ে দিয়ে এখন বুঝি নিজে পিছিয়ে যেতে চাইছিস ? এসব করবে- টরবে কে ?'

রুবি ঠোঁটে লিপস্টিক দিতে দিতে বলল, 'নিজেই খুব করতে পারবি, অন্য লোকের দরকার কি, তুই ভেবেছিস বুঝি কোমরে আঁচল জড়িয়ে আমি গিয়ে রাঁধতে বসব ? রান্নাবান্না সব ভুলে গেছি। তাছাড়া ওসব ছাই আমার ভালও লাগে না।'

উমা গম্ভীর মুখে বলল, 'তোর যে কি ভালো লাগে তা জানি। ভয় নেই, বাড়িতে থাকলেও আমি তোকে রাঁধতে বলতাম না। যাক, দয়া করে একটু সকাল সকাল ফিরিস, তাহলেই হবে। আর ভালো কথা—'

রুবি বলল, 'থামলি কেন, ভালো কথা বলতে এত ইতস্তত করা তো ভালো নয়।'

উমা বলল, 'তোর সোফা আর ইজিচেয়ার দু'খানা আমাকে একবেলার জন্যে একটু দিতে হবে।'

রুবির মুখ এবার গম্ভীর হোল, 'কেন, তুই তো শুনেছিলাম ফরাসের ব্যবস্থা করেছিস। আমার এসব দিয়ে কি হবে ? জানিস তো ভাড়া করা হালকা জিনিস—'

উমা বলল, 'থাক থাক, তোর কিচ্ছু দিতে হবে না, আমারই ভুল হয়েছে। মাফ করিস ভাই।' দ্রুত ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এল উমা।

সত্যি উমারই দোষ। সে কেন গেল রুবির কাছে জিনিস চাইতে ? উমা কি জানে না কোন কিছু দেওয়ার বেলায় রুবির অনুদারতার সীমা নেই। পারতপক্ষে নিজের ব্যবহারের কোন জিনিস সে আর কাউকে দিতে চায় না। যদি বা দেয় মুখের এমন ভঙ্গি করে যেন পাঁজরের হাড় খুলে দিচ্ছে।

সুরবালার কাছে বলায় তিনিও রাগ করলেন, 'তুমিও যেমন। জিনিস চাওয়ার

আর লোক পেলে না। বাড়িতে সবই তো পড়ে রয়েছে। চেয়ার টেবিল খাট আলমারী—কোন্‌টার অভাব আছে শুনি। তোমাদের যদি ভোগে না আসে তো—'

বৈঠকখানার বাজার থেকে থলিতে করে মাংস আর আলু পেঁয়াজ নিয়ে বিভাস এসে বাড়ির ভিতরে ঢুকল, শাশুড়ী বউয়ের আলাপ কানে যেতেই সে বলল, 'এত উত্তেজনা কিসের পিসিমা? হয়েছে কি?'

সুরবালা বললে, 'কি আবার হবে। সব কথায় তোর থাকবার কি দরকার বাপু।'

উমা বলল, 'তাই দেখুন।'

কিন্তু একটু বাদেই রুবি এসে সামনে দাঁড়াল, 'বিভাসবাবু, আপনাকে তো একবার ও-ঘরে যেতে হয়।'

বিভাস বলল, 'কেন বলুন তো?'

রুবি বলল, 'উমা ফার্নিচারগুলি আনার কথা বলছিল। কিন্তু ওর হাতে আমার জিনিসগুলি ছেড়ে দেওয়ার ভরসা হয়নি। টানাটানিতে ওর নিজেরও হাত পা ভাঙত, চেয়ারের হাতলগুলিও আস্ত থাকত না। যা লক্ষ্মী শান্ত বউ আপনার। আসুন তো তাড়াতাড়ি।'

উমা রান্নাঘরের ভিতর থেকে জবাব দিল, 'দরকার নেই, আমাদের বিনা ফার্নিচারেই কাজ চলে যাবে। অচেনা কেউ তো আসছে না, সবই তো চেনাশোনা বন্ধুবান্ধব।'

রুবি বলল, 'আর আমি বুঝি বন্ধুও নই, বান্ধবও নই। অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম কোথাকার। আসুন বিভাসবাবু, এমন দিনে পড়শীর সঙ্গে ঝগড়া করবেন না।'

বিভাস একটুকাল বিমূঢ় হয়ে থেকে রুবির পিছনে পিছনে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর খানিক বাদে, ওর ঘরের আসবাবপত্রে বিভাসের ড্রয়িং রুম সজ্জিত হয়ে উঠল।

উমা বলল, 'ব্যাপার কি, তুই অফিসে গেলিনে আজ?'

রুবি বলল, 'ভালো কথা মনে করিয়ে দিলি। যান তো বিভাসবাবু, আমার অফিসে একটা ফোন করে দিয়ে আসুন। বলবেন, আপনার next door neighbour রুবি রায় আজ একেবারে মরমর, উত্থানশক্তি রহিত। কাল পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকে অফিসে যাবে।'

বিভাস বলল, 'দেখুন মিছামিছি কামাই করা কি ঠিক হবে?'

রুবি মুখ টিপে হাসল, 'ও, আপনি তো আবার সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। তা ইতিগজটজ একটা কিছু করে আসতে পারবেন না? না হয় প্রতিবেশিনীর জন্যে একটুকাল নরক ভোগই করবেন। থাক থাক। আপনাকে আর বিব্রত হতে হবে না! সে ব্যবস্থা না হয় আমিই করছি।'

পাশের পূর্ণিমা প্রেস থেকে রুবি নিজেই ফোন করে অফিসে খবর দিয়ে এল।

রুবি বলল, 'নিজের মুখে নিজের মরার খবর তো আর দিতে পারলাম না, সেক্রেটারী ভূতের ভয়ে আঁৎকে উঠতেন। তোর মরমর অবস্থার কথাটাই জানিয়ে এলাম। কি উদ্যোগ আয়োজন করলি এবার দেখাতো।'

দেখাবে কি, রুবির কাণ্ড দেখে উমা নিজেই অবাক হয়ে গেল। সাজসজ্জা ছেড়ে আটপৌড়ে শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে সত্যিই কাজে লেগে গেছে।

ওর কাজের ধরনধারণ দেখে স্বরবালা পর্যন্ত প্রশংসা করলেন, 'তুমি তো বাপু সবই জানো। ইচ্ছা করলে সবই পার। এবার উড়্‌নচণ্ডীর স্বভাবটা ছেড়ে বিয়ে টিয়ে কর। ছেলে পুলে হোক। গেরস্থ ঘরের মেয়ের কি কেবল চাকরি বাকরি করলে সুখ হয়!'

পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে একটুকাল চুপ করে রইল রুবি, তারপর বলল, 'সকলের ভাগ্যে কি আর একরকম সুখ হয় পিসীমা? বিয়ে তো আপনিও করেছিলেন। সইল কি?'

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে স্বরবালা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন, 'আমি বুড়ো মানুষ, আমার কথা ছেড়ে দাও। যতদিন পেরেছি সোয়ামীর ঘর সংসার করেছি। সুখ শান্তি যতদিন ভাগ্যে ছিল হোল। তারপর সতীন এসে যখন স্বামীকে একেবারে পর করে দিলে, মান মর্যাদা নিয়ে যখন কিছুতেই আর সেখানে বাস করতে পারলাম না, চলে এলাম দাদার কাছে। তিনি কোলে তুলে দিলেন বিভুকে। ওকে পেয়ে সব ভুললাম।'

রুবি বলল, 'ভুললেন তা ঠিক, কিন্তু ভোলাটাই কি সবচেয়ে বড়? আচ্ছা, পিসীমা পাকা চুলে এখনো যখন আপনি সিঁদুর পরেন, স্বামীর কথা কি আপনার মনে পড়ে? সত্যিই সেই স্বামীর মঙ্গল কামনা করেন? নাকি এও একটা অভ্যাস মাত্র? যেমন আমি ঠোঁঠে রঙ মাখি ভালো দেখায় বলে, ঠিক সেই কারণে আপনিও তেমনি সিঁথিতে সিঁদুর মাখেন। তাই না পিসীমা?'

স্বরবালা রুষ্ট হয়ে বললেন, 'তুমি চুপ কর বাপু। তোমার কথাবার্তার ঢং আমার ভালো লাগছে না। তোমার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছু বুঝতেও পারছি না।'

চোখের ইশারায় উমা রুবিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আজকের দিনে ওসব আলোচনা থাক রুবি।'

রুবি অদ্ভুত একটু হাসল, 'আচ্ছা থাক।'

সন্ধ্যার পর বিভাসের বন্ধুরা একে একে হাজির হোল। ঠিক একে একে নয়, জোড়ায় জোড়ায়। দু'জন প্রফেসর, জনতিনেক সাংবাদিক, সরকারী অফিসের নিচের ধাপের

দু'তিনজন কেরানী, বিভাসের পাবলিসিটি অফিসের দু'জন সহকর্মী। এরা প্রায় সবাই সস্ত্রীক এসেছে। স্বামীদের চেহারায় নিম্ন মধ্যবিত্তের ছাপ, স্ত্রীদের সাজসজ্জায় উচ্চ-মধ্যবিত্তের স্বপ্ন। উমার মাসতুতো বোন আসতে পারেনি, সহপাঠিনী সুলতা এসেছে তার স্বামীকে নিয়ে।

সুলতা এসেই বলল, 'না এলে তুই রাগ করবি তাই আসা। না হলে আসার মত অবস্থা আমার নয়। রোগা ছেলেটাকে শাশুড়ীর কাছে কোনরকমে গছিয়ে এসেছি। আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিস ভাই।'

উমা বলল, 'এসেই ফেরার তাগিদ দিচ্ছিস। সুস্থ হয়ে বোস তো খানিকক্ষণ।'

কিন্তু ফেরার তাগিদ কেবল সুলতারই নয়, বিভাসের অন্যান্য বন্ধুপত্নীরাও সেকথা তুলল। তারাও ছেলেপুলে রেখে এসেছে। দূরে দূরের পথ সব ফিরতে হবে। কারো বাগবাজার, কারো বা টালিগঞ্জ।

ঘরসংসার দেখাবার জন্যে মেয়েদের ভিতরে নিয়ে গেল উমা। বসবার ঘরে পুরুষ বন্ধুরা ছোটখাট আড্ডা জমাল।

প্রফেসর বন্ধু অরুণ দত্ত বলল, 'যাক, এতদিনে বিভাস সামাজিক হতে শিখলে। এ যুগের আদব-কায়দাটা রপ্ত করতে পারলে তাহলে!'

বিভাস কৈফিয়তের সুরে বলল, 'রপ্ত করবার আর কি আছে। এই উপলক্ষে সবাই এক জায়গায় হওয়া—'

অরুণ বলল, 'তা অত কিন্তু-কিন্তু করছ কেন? তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা মহা অন্যায় করে ফেলেছ।'

সাংবাদিক নিরুপম সেন বলল, 'অন্যায় করেছে কি না-করেছে বাড়ি গিয়ে টের পাবে। যখন প্রত্যেকের ঘরে এমন একটি বিবাহবার্ষিকী করবার বায়না উঠবে তখন বুঝবে মজা। না হে, রেওয়াজটা খুব ভালো হোল না হে বিভাস। দাও এবার সিগারেট্ টিগারেট দাও। বাঃ, ঘরখানাকে তো রাতারাতি ড্রয়িংরুম বানিয়ে ফেলেছ দেখছি। এত সব কবে কিনলে?'

বিভাস বলল, 'সব কেনা নয়।'

নিরুপম বলল, 'থাক থাক। সব প্রশ্নের জবাব দিতে হয় না। বাঃ, গান বাজনার আয়োজনও রয়েছে দেখছি। তাহলে আমরা শুকনো গলায় মিছামিছি বক বক করছি কেন।'

হারমোনিয়ম, বাঁয়াতবলা, দেয়ালে ঠেস-দেয়া একটি সেতারও ছিল একপাশে।

নিরুপমকে বলতে হোল না, চেয়ার ছেড়ে তক্তপোষের ফরাসের ওপর গিয়ে উঠে বসল। হারমোনিয়মটা টেনে নিল কোলের কাছে।

যারা গীতরসিক নয়, যাদের ফেরার তাড়া আছে, তারা একটু বিব্রত বোধ করল। কিন্তু সোৎসাহে এগিয়েও এল কয়েকজন।

বিভাসের সহকর্মী সুরেন চক্রবর্তী এ বাড়িতে মাঝে মাঝে আসে যায়। সে বলল, 'বউদি কি সেতারও প্র্যাকটিস করছেন না কি ?'

বিভাস মাথা নেড়ে বলল, 'না, ওটা ওর নয়।'

সুরেন হেসে বলল, 'তবে কি বিভাসদা নিজেই সুরু করলেন ? তবু ভালো।'

বিভাস বলল, 'এত দেরিতে ও সব সুরু করা যায় না। সেতারও আর একজনের। আমার একজন প্রতিবেশিনীর।'

নিরুপম মুচকি হেসে বলল, 'বটে! তাহলে ডাক। তাঁকে নেপথ্যবাসিনী করে রেখেছ কেন ? যন্ত্র তো আর আপনি বাজবে না। হৃদয়যন্ত্র হয়ত নেপথ্য থেকেও বাজান যায়, কিন্তু তারযন্ত্রে আঙুলের স্পর্শ চাই।'

নিরুপমদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোল না। একটু বাদেই রুবি আর অন্যান্য বান্ধবীদের নিয়ে উমা হাজির হোল।

রুবিকে সামনে রেখে উমা বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিই—'

কিন্তু উমা কোন কথা বলবার আগেই নিরুপম বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, 'আরে, মিসেস চন্দ, আপনি এ বাড়িতে থাকেন নাকি ?'

মুহূর্তকাল ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা থমথম করতে লাগল। পাউডারের প্রলেপ সত্ত্বেও ফ্যাকাশে হয়ে গেল রুবির মুখ! মনে হোল তার সর্বাঙ্গ যেন একটু একটু কাঁপছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই শক্ত হয়ে দাঁড়াল রুবি, বেশ পরিষ্কার স্বরে বলল, 'আমি মিসেস চন্দ নই নিরুপমবাবু, আমার নাম রুবি রায়।'

কিন্তু নিরুপম সহজে ছাড়ল না, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'তাই নাকি ? রায়টা বুঝি আপনার পৈতৃক পদবী ? কিন্তু কি করে আপনি পিতৃকুলে ফিরে গেলেন বলুন তো। আপনাদের তো ডাইভোর্স হয়নি। সিঁদুর মুছলেই বুঝি—'

অরুণ মৃদুস্বরে বলল, 'আঃ, কি করছ নিরুপম, থামো। তোমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান হোল না ?'

রুবি বলল, 'হ্যাঁ, সিঁদুর মুছলেই সব হয়। যেখানে ডাইভোর্সের সহজ কোন ব্যবস্থা নেই, সেখানে সিঁদুর মুছেই সব মুছে ফেলতে হয়।'

বলে রুবি ফিরে যেতে উদ্যত হোল।

উমা শুষ্কস্বরে বলল, 'ওকি যাচ্ছ কোথায় রুবি ? বোস এসে, তোমার বাজনা শোনাব বলেই তো ওঁদের ডেকে আনলাম।'

রুবি বলল, 'না উমা, শরীরটা ভালো লাগছে না। আমি যাই, আমার বাজনার চেয়ে অনেক ভালো জিনিস ওঁরা এখানে শুনতে পাবেন।'

বলে একসঙ্গে সকলের উদ্দেশে ছোট একটি নমস্কার জানিয়ে রুবি দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফের খানিকক্ষণ চুপচাপ রইল সকলে।

একটুবাদে অরুণ বলল, 'সত্যি, এ তোমার ভারি অন্যায় হোল নিরুপম। তোমার চিরদিনের বদভ্যাস। স্থান কাল থাকে না। একজন ভদ্রমহিলার past নিয়ে—'

একটু আগে যা ঘটে গেল তাতে সকলেই কৌতুহলী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রত্যেকেই অরুণের কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'সত্যি ব্যাপারটা খুবই খারাপ হয়েছে।'

নিরুপমের বন্ধু হৃষিকেশ নন্দী কাছে এসে ফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'ঘটনাটা কি হে?'

কিন্তু নিরুপম দুই ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট গুঁজে চুপ করে রইল।

একটু বাদে বিভাস বলল, 'তারপর তোমাদের গানটান চলুক। সুরেন, তুমিই আগে আরম্ভ করে দাও।'

কিন্তু সুরেন হাত জোড় করল, 'না বিভাসদা।'

উমা বলল, 'সে কি, আপনাদের গানবাজনা শুনব বলেই—'

সুরেন বলল, 'বরং আপনি গান—আমরা শুনি।'

কিন্তু উমারও ইচ্ছা করল না গিয়ে বসতে। অথচ গান গাইবার উৎসাহ তারই তো আজ সব চেয়ে বেশি ছিল।

যারা গান জানে—নিরুপমের স্ত্রী সুরুচি, বিভাসের আর একজন বন্ধু প্রভাত হালদারের স্ত্রী বিনীতা—প্রত্যেককেই অনুরোধ করা হোল। কিন্তু কারো গলা খারাপ, কারো শরীর ভালো নেই। কেউ গিয়ে বসল না গাইতে।

শেষে অরুণ বলল, 'রাত সাড়ে আটটা বাজল।'

ইঙ্গিত বুঝে বিভাস বলল, 'উমা, তাহলে এঁদের বসিয়ে দাও।'

পুরুষদের আর মেয়েদের আলাদা আলাদা ঘরে খাবারের ব্যবস্থা হোল। সুরবালা মেয়েদের পরিবেশন করতে লাগলেন। বিভাসের বন্ধুদের পরিবেশন করতে এল উমা।

নিরুপম এক ফাঁকে বলল, 'বাঃ, মাংসটা তো চমৎকার হয়েছে বউদি, রান্নার হাত ক্রমেই খুলছে আপনার।'

উমা শুকনো স্বরে বলল, 'ওটা রুবির রান্না।'

নিরুপম আর কোন কথা বলল না।

হৃষিকেশ বলল, 'বাঘের গলায় হাড় ফুটল নাকি নিরুপম ?'

নিরুপম বলল, 'হ্যাঁ ফুটেছে। এসো তুমি টেনে তুলবে। তোমরা ভাবছ আমি একটা ইতর, অভদ্র। ইচ্ছা করে একটি মেয়েকে দশজন অপরিচিত লোকের সামনে অপমান করেছি। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। আমি নিজেকে কিছুতেই চেক করতে পারলাম না ঋষি। ওকে দেখে উৎপলের মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কি জলি ছেলেই না ছিল উৎপল। কিন্তু এখন দেখলে চিনতে পারবে না, একেবারে যেন নিবে গেছে।'

অরুণ বলল, 'উৎপল কে ?'

'উৎপল চন্দ। আমাদের সঙ্গে পড়ত।'

বিভাস এক কোণে বন্ধুদের সঙ্গে খেতে বসেছিল—এবার মুখ তুলে বলল, 'নিরুপম, আজ ও সব আলোচনা থাক।'

সুরেন এক ফাঁকে বলল, 'দোষটা কার আপনি জানেন ?'

নিরুপম জবাব দিল, 'নিশ্চয়, না জানলে আমি কোন কথাই তুলতাম না। উনি যে কী ধরনের বস্তু তা ওঁর হাল আমলের চালচলনের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়।'

রুবির আচরণ সম্বন্ধে এ ধরনের সমালোচনা বিভাস নিজেও এর আগে অনেকদিন করেছে। কিন্তু আজ অন্যের মুখে তার প্রতিধ্বনি ওর ভালো লাগল না। কেবলই মনে হতে লাগল রুবি শত হলেও মেয়ে। এক ঘর অপরিচিত লোকের সামনে তার নৈতিক চরিত্রের আলোচনায় মোটেই রুচিবোধের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে না।

অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে বিভাস আরো একবার তাকাল নিরুপমের দিকে।

নিরুপম একটু হেসে বলল, 'সরি ; এ প্রসঙ্গ এখনই বন্ধ করুন সুরেনবাবু। আমাদের হোস্ট-এর বড় দুঃখ লাগছে।'

বিভাস প্রতিবাদ করে বলল, 'দুঃখ নয় লজ্জা। তোমার আচরণটা ক্রমেই লজ্জাকর হয়ে উঠছে নিরুপম।'

অরুণ বিষয়টাকে নৈর্ব্যক্তিক আলোচনায় নিয়ে গেল, 'কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের একটা সহজ পথ থাকা উচিত একথা মানতেই হবে।'

নিরুপম বলল, 'পথটা সহজ থাকে থাক। কিন্তু কারণগুলি কি খুব সহজ থাকা ভালো ? তাহলে ছোটখাট ঝগড়া লাগলে স্ত্রী বাপের বাড়ি না গিয়ে সোজা উকিলের বাড়িতে হাজির হতেন। খরচার কথাটা একবার ভেবে দেখ, অসুখ বিসুখে ডাক্তারি খরচটাই ভালো করে জোটে না, তারপর উকিলের খরচটা যদি এমন করে লেগে থাকত, ব্যাপারটা কি সুখের হ'ত ?

নিরুপমের কথার ভঙ্গিতে অনেকেই হেসে উঠল।

বিভাস বলল, 'কিন্তু যাই বল, ডাইভোর্সের প্রভিসন সব বিয়েতেই থাকা দরকার।'

ঠিক সেই সময় সন্দেশের থালা হাতে নিয়ে উমা এসে ঘরে ঢুকল।

নিরুপম বলল, 'বউদি শুনে রাখুন কথাটা।'

বন্ধুরা বিদায় নেওয়ার পর উমা একবার রুবির খোঁজ নিতে গেল। ভিতর থেকে দোর বন্ধ। উমা ডেকে বলল, 'রুবি খাবে এসো।'

বার দুই ডাকাডাকির পর রুবি সাড়া দিয়ে বলল, 'আমি খাব না উমা, তোমরা খেয়ে নাও গিয়ে।'

সুরবালাও এসে বাইরে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ সাধাসাধি করলেন। বললেন, 'রাত্রে উপোস দিতে নেই। যা হোক কিছু একটু মুখে দাও এসে।'

কিন্তু রুবির মুখে সেই এক কথা, 'না পিসীমা, আমি কিছু খাব না।'

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে উমা ঘরে এলে বিভাস বলল, 'ও বুঝি কিছুই খেল না?'

উমা স্বামীর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমরা তো ঘণ্টা-খানেক সাধাসাধি করেও খাওয়াতে পারলাম না, দেখ তুমি গিয়ে পার নাকি।'

বিভাস একথার কোন জবাব দিল না।

ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বাবলু কেঁদে উঠল। পিঠ চাপড়ে তাকে ফের ঘুম পাড়াল উমা। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল, 'যাক, তোমার মনের ইচ্ছেই আজ পূর্ণ হয়েছে। আমি যা করতে চাইলাম তা হোল না।'

বিভাস বলল, 'এসব তুমি কি বলছ উমা, যা ঘটে গেল তাতে আমিই কি খুশি হয়েছি!'

উমা বলল, 'হু!'

একপাশে বন্ধুদের দেওয়া উপহারগুলি পড়েছিল। অনেকগুলি রজনীগন্ধার তোড়া, দু'খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী, এক ভলিউমে শেলী আর কীটস, এক বন্ধুর দেওয়া শিব-পার্বতীর ছোট যুগল মূর্তি।

কিন্তু উমার মনে হতে লাগল সব ব্যর্থ, সব আজ ব্যর্থ হয়ে গেছে।

টেবিলের ওপর ছোট একটি ফটোর স্ট্যাণ্ডে দু'জনের একখানি বাঁধানো ফটো। তার পাশে ঠিক ওই আকারের বাঁধানো আর একটি স্ট্যাণ্ড, তাতে ফটো নেই, রবীন্দ্রনাথের

কয়েকটি পংক্তি। সাদা কাপড়ের ওপর পেনসিল দিয়ে প্রথম লিখে দিয়েছিল বিভাস। উমা সেই রেখা নীল সুতোয় ঢেকেছে। চারপাশে লতানো বর্ডার, উমা পংক্তি ক'টির দিকে তাকাল—

'জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদ বিহীন,
জীবনের প্রতি রাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্যে তোমার।'

বিভাসের কয়েকটি প্রিয় লাইন। প্রত্যেক বিবাহ-বার্ষিকীর রাত্রে বিভাস এই লাইন ক'টি আবৃত্তি করেছে। শুধু এবার ছাড়া।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে উমা হঠাৎ বলে উঠল, 'বেছে বেছে আজকের দিনটিতেই তুমি বিবাহবিচ্ছেদের আলোচনা করছিলে, তার পক্ষে কথা বলছিলে। খুব ভালো।' অদ্ভুত একটু হাসল উমা—তারপর হাত বাড়িয়ে আলোর স্যুইচ অফ করে দিল।

পাশে শুয়ে স্ত্রীকে কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করতে করতে বিভাস বলল, 'শোন, তুমি অনর্থক মন খারাপ করছ। আলোচনাটা উঠল বলেই—'

উমা বাধা দিয়ে বলল, 'থাক।'

বিভাস বলল, 'তুমি মিছামিছি—। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, নিরুপম কাজটা খুব খারাপ করেছে?'

উমা পাশ ফিরে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'মোটেই না। খুব ভালো করেছে, খুব ভালো কাজ করেছে। সকলের সামনে ওকে এক্সপোজ্ করাই উচিত।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'গোড়াতেই আমি সন্দেহ করেছিলাম, এরকমই একটা কিছু স্ক্যাণ্ডাল করে ও বেড়িয়েছে।

কৌতূহলটা যথাসাধ্য চাপা রেখে বিভাস বলল, 'কিসে তোমার সন্দেহ হোল?'

উমা বলল, 'কয়েকদিন আগে ওর ট্রাঙ্কের মধ্যে ওড়নাসুদ্ধ একখানা বেনারসী দেখলাম। ও জিনিস মেয়েরা বিয়েতেই পায়। আর একদিন দেখলাম চমৎকার ডিজাইনের রূপোর একটি সিঁদুর কৌটো, তার মধ্যে সিঁদুর আর নেই। কিন্তু সিঁদুর যে ছিল তা বোঝা যায়। বললাম, এ কৌটো তুই কোথায় পেলি রে? রুবি বলল, ও আমার মার কৌটো। দেখতে সুন্দর বলে নিয়ে এলাম। আর ওই ওড়নাসুদ্ধ বেনারসী? এও কি তোর মার নাকি? রুবি বলল, না। ওসব আমার একজন প্রেমিকের। বউয়ের বাক্স থেকে চুরি করে এনে দিয়েছে।'

বিভাস বলল, 'ওসব আলোচনায় আর কাজ নেই উমা।'

একটু চুপ করে থেকে উমা ফের বলল, 'তোমার সহানুভূতি যে ওর ওপর পড়েছে, তা আমি টের পেয়েছি।'

বিভাস বলল, 'পড়াই তো স্বাভাবিক, যে কারণেই হোক ওর জীবনটা তো দুঃখের।'

উমা বলল, 'আহাহা। নিরুপমবাবু তো স্পষ্টই বললেন, ওর মূল ও নিজে। ঘর থেকে বেরিয়ে-আসা পরের বউয়ের ওপর দরদ দেখানো খুব সুবিধে। কিন্তু তোমার নিজের বউ যদি হ'ত—'

বিরক্ত হয়ে বিভাস এবার পাশ ফিরল।

উমার মনে হোল এমন ব্যর্থ, অভিশপ্ত রাত এর আগে আর আসেনি। কেন এমন হ'ল? কে দায়ী এর জন্য? বার বার করে কেবল একজন অপরাধিনীর নামই উমার মনে পড়তে লাগল।

পরদিন ঠিক অভ্যাসমত বেলা আটটায় ঘুম থেকে উঠল রুবি। হাত মুখ ধুয়ে এসে সবে চা করতে বসেছে, উমা এসে দোরের সামনে দাঁড়াল, 'এই যে উঠেছ। আমি দু'দুবার এসে ঘুরে গেছি।'

রুবি বলল, 'কেন?'

উমা বলল, 'ফার্নিচারগুলি রেখে যাব।'

রুবি একটু হেসে বলল, 'ও। সেইজন্যে রাত্রে বুঝি তোর ঘুম হয়নি? কিন্তু এত তাড়াহুড়ো না করলেও পারতিস, জিনিসগুলি আর দু'এক ঘণ্টা রাখলেও একদিনের চেয়ে বেশি ভাড়া নিতাম না।'

উমা পরিহাসে যোগ না দিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'না ভাই, ভেঙেচুরে যাবে। তোরও তো কেনা জিনিস নয়।'

রুবি বলল, 'বেশ তাহলে রেখে যা।'

এরপর উমা স্বামীকে গিয়ে বলল, 'ওর জিনিসগুলি রেখে এস।'

বিভাস বলল, 'এখনই কি, দেওয়া যাবে পরে।'

উমা প্রতিবাদ করে বলল, 'আবার পরের দরকার কি? ওর জিনিস তাড়াতাড়ি দিয়ে আসাই ভালো, ঘর পরিষ্কার করে ফেল।'

বিভাস আর কোন কথা না বলে রুবির ফার্নিচারগুলি ফেরত দিয়ে এল। তারপর চলে আসবার সময় এক ফাঁকে বলল, 'কালকের ঘটনার জন্যে আমি ভারি দুঃখিত রুবি দেবী।'

রুবি একটু হাসল, 'এবং লজ্জিত-ও কথাটুকু বাদ দিলেন কেন বিভাসবাবু? আচ্ছা,

কথাগুলি আপনারা ইংরেজীতে বললেই তো পারেন ! বাঙলায় ওর ভাষায় অনুবাদ হয়, ভঙ্গির অনুবাদ হয় না। অথচ জিনিসটা তো ভঙ্গি-সর্বস্বই।'

বিভাস চুপ করে একটুকাল রুবির দিকে তাকিয়ে রইল। ও যে আঘাত পেয়েছে, তা ওর মুখের ভাবে গোপন রইল না।

একটু বাদে বিভাস হাসল, 'বুঝতে পারছি আপনি ফর্ম্যালিটির নিন্দা করছেন! কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করতে গেলে আমাদের ফর্মের এমনকি ফর্ম্যালিটির সাহায্যও নিতে হয়। আপনি ভঙ্গি-সর্বস্বতার কথা বললেন। কিন্তু সর্বস্বও যখন আমরা দিই, তখনো ভাষা আর ভঙ্গির মধ্যে দিয়েই দিই।'

রুবি হেসে উঠল, 'সর্বনাশ ! একেবারে সর্বস্বর কথা পেড়ে বসলেন। আস্তে আস্তে। উমা হয়তো ধারেকাছেই আড়ি পেতে রয়েছে। কি শুনতে কি শুনে ফেলবে। আর রক্ষে থাকবে না।'

লজ্জায় ক্রোধে এক মুহূর্তে আরক্ত হয়ে রইল বিভাস। তারপর দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রসাধনের উপকরণ নিয়ে রুবি আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর নিজের মনে খানিক হাসল। বেশ হয়েছে। আচ্ছা প্রতিশোধ নিতে পেরেছে রুবি। যেমন ঘটা করে ভালোমানুষিতা দেখাতে এসেছিল, তেমনি রুবি তার শোধ নিয়েছে। কিন্তু মানুষটি হয়তো আসলে ভালোমানুষই। কালকে বন্ধুর আচরণের জন্য হয়তো সত্যিই লজ্জিত হয়েছে। ওর কথাবার্তার ধরনে তেমনি মনে হচ্ছিল। তা যদি হয় মানুষটি খুবই আঘাত পেয়েছে, খুবই দুঃখ পেয়েছে। রুবির কথার জবাব দিতে না পেরে কি রকম চুপ করে রইল, কি করুণ মুখ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাক। গেলে আর রুবি কি করতে পারে। লোকটি ঠাট্টা করতে জানে না, ঠাট্টা সইতে জানে না। অথচ জীবনটা একটা ঠাট্টা ছাড়া আর কি। একটু সূক্ষ্ম, তামাসা। বিভাসের মত যাদের রসবোধ কম, তারা বুঝতে পারে না। তাই দুঃখ পায়। কিন্তু জীবনটাকে তামাসা বলে বুঝতে পারলেও কি দুঃখ কিছু কমে ?

মুখে পাউডারের পাফ বুলাতে সুরু করল রুবি। কিংবা বিভাসের আঘাতের কথাটা হয়তো রুবির নেহাৎই কল্পনা। একটু লোক-দেখানো শিষ্টাচার জানাতে এসেছিল, রুবি এক টানে সেই ভদ্রতার মুখোস খুলে ফেলেছে। ঠিকই করেছে। কাল সবান্ধবে লুচি মাংস খেতে খেতে রুবির অতীত জীবনের কত সত্য মিথ্যে গল্প বিভাস চাটনির মত রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করেছে ! রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে তাই নিয়ে রসালাপ করেছে। তারপর এসেছে ভদ্রতার ভড়ং করতে। মানুষ চিনতে বাকি আছে নাকি রুবির !

বেরুবার আগে সন্তর্পণে জানালাগুলি বন্ধ করল রুবি। দরজায় তালাটা বন্ধ করে দুবার করে টেনে দেখল। অন্যদিন যাওয়ার সময় উমাকে বলে যায়, 'ঘর দোর রইল গিন্নী, একটু লক্ষ্য রেখ।' কিন্তু আজ উমা মুখ ভার করে রয়েছে। হয়তো ডাকলে ভালো করে কথা বলবে না। রুবিরই বা কি এমন দায় পড়েছে সেধে কথা বলবার।

ট্রামে দারুণ ভিড়। একটা লেডীজ সীট মার্কা বেঞ্চ দু'জন পুরুষে দখল করে রয়েছে। রুবি পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেই কণ্ডাকটরের তাড়ায় ভদ্রলোক দু'জন উঠে পড়লেন। রুবি বেঞ্চের একপাশে বসল। অন্যদিন এমন অবস্থায় আসনচ্যুত সহযাত্রীকে পাশে বসবার অনুমতি দেয় রুবি। কিন্তু আজ চিত্তের সেই প্রসন্নতা নেই। যে দাঁড়িয়ে রয়েছে—সে দাঁড়িয়ে থাক, কষ্ট পাক। রুবিরও কি কষ্ট পেতে হয় না, অসুবিধা ভোগ করতে হয় না?

উমা আর বিভাসের কাছে কাল আবার তার আর এক পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হোল। রুবি বিবাহিতা সে তথ্য জেনে গেল ওরা। জানুক। তাতে কি এমন ক্ষতি হবে রুবির। কুমারীর বেশে থাকলেও সে যে কৌমার্যের রীতিনীতি মেনে চলছে না, এমন সন্দেহ ওরা তো আগেই করেছে। এখন দিনকয়েক ওদের উৎসুক আর কৌতূহল চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে হবে রুবিকে—তার বেশি কিছু নয়। প্রথম প্রথম রুবি ভারি ঘাবড়ে যেত। আজকাল সেই চিত্ত-দৌর্বল্য গেছে। কিন্তু একেবারে যায় কই! কাল নিরুপম সেন যখন একঘর অপরিচিত লোকের সামনে মিসেস চন্দ বলে ডেকে উঠল, রুবি তো সম্পূর্ণ অকম্পিত, অবিচলিত থাকতে পারেনি। সে তো সত্যিই ভয় পেয়েছিল। অথচ ভয়ের কি আছে! এই চার পাঁচ বছরের মধ্যে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কারোরই সেকথা জানতে বাকি নেই। তবু একজন নতুন লোক যখন কথাটা জানতে পারে, আশ্চর্য, রুবির আজও যেন কেমন সঙ্কোচ হয়, এক ধরনের লজ্জাবোধ জাগে। অথচ এতে কোন লজ্জা সঙ্কোচের কারণ আছে বলে রুবি আজকাল আর স্বীকার করে না। কিন্তু লোকাচার, গতানুগতিক নীতি-ধর্মের চাপ দিয়ে তাকে প্রকারান্তরে এসব স্বীকার করিয়ে নেয়। রুবিকে মিথ্যাচারে বাধ্য করে।

নিরুপম সেন বিভাসকে সব বলেছে। অথচ নিরুপম কতটুকুই বা জানে? ভেতরের কতটুকু খবরই বা ও রাখে? কিন্তু যা জানে তা-ই বা কম কিসে? রুবি স্বেচ্ছায় স্বামী ত্যাগ করে চলে এসেছে, তার নামে কলঙ্ক রটনার পক্ষে এই তথ্যটুকুই তো যথেষ্ট। তারপর মুখে মুখে কত গল্প, কত কাহিনী যে শাখায়-পত্রে পল্লবিত হয়েছে, তার আর ঠিক নেই। রুবি মাঝে মাঝে শোনে আর হাসে। কিন্তু সব সময় হাসতে পারে না। একটি গল্প তো সত্যিই আর গল্প নয়, আর অনেক গল্পই সে গল্পকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

অফিসে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে হলঘরের কেরাণীকুল একবার নড়ে-চড়ে ফের স্থির হয়ে গেল। রুবি মনে মনে একটু হাসল। সহকর্মীদের ওপর তার প্রভাব জেনারেল ম্যানেজারের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আড়ালে তার বেশভূষা থেকে সুরু করে চালচলন স্বভাব-চরিত্রের যত নিন্দাই করুক, রুবির অস্তিত্ব ওদের অস্থির করে। তার সম্বন্ধে কোন পুরুষের উদাসীন থাকবার সাধ্য নেই, তাকে অবজ্ঞা করবার দুঃসাহস নেই কারো।

হিলতোলা জুতোর শব্দে সমস্ত ঘরটাকে মুখরিত করে রুবি নিজের ছোট্ট কামরাটুকুতে গিয়ে বসল। সামনের টেবিলে টাইপরাইটার। 'জরুরী' চিহ্নিত ফিতেবাঁধা কয়েকটা ফাইল। কালকের এ্যারিয়ার জমে রয়েছে। দেখে বিরক্তিতে মন ভরে গেল রুবির। ভালো লাগে না। এসব কাজ তার মোটেই ভালো লাগে না। নিজের বিদ্যেবুদ্ধির ব্যক্তিত্বের পক্ষে অমর্যাদাকর বলে মনে হয় এ ধরনের কেরাণীগিরিকে। দেড়শো টাকা মাইনের সর্টহ্যাণ্ডে অন্যের নির্দেশের নোট নেওয়া আর চিঠিপত্র টাইপ করার জন্যই কি সে জন্মেছে নাকি! দিব্যেন্দু নন্দী মাঝে মাঝে বলে, 'তোমার যা রূপ, তোমার যা প্রতিভা, তাতে রাণীর মত তুমি সাম্রাজ্য শাসন করতে পারতে। তা না হয়ে হ'লে কিনা দেড়শ টাকার কেরাণী। ছাড়, ছাড়, সময় থাকতে ওসব ছেড়ে দাও।'

দিব্যেন্দুর বলবার ভঙ্গির মধ্যে অবশ্য একটা তামাসার সুর থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্য না হোক, দেশী গভর্ণমেন্টের অধীনে একটু ভালো মাইনের সরকারী চাকরির চেষ্টা করলে রুবি নিশ্চয়ই পায়। কিন্তু কেমন যেন উৎসাহ হয় না। সেই এ্যাটেনড্যানসের কড়াকড়ি নিয়মকানুনের বাধ্যতা কল্পনা করেও রুবি শিউরে ওঠে। তার চেয়ে এই ভালো। টাকার জন্যে তো তার চাকরির দরকার নেই, টাকা রোজগারের তার আরো অনেক পথ আছে। অফিসে আসে সে কোনরকমে সময় কাটাবার জন্যে। সারাদিনের শূন্যতা ভুলে থাকবার জন্যে। কাজ না করে সারা দুপুর কিছুদিন টৈ টৈ করে ঘুরে ঘুরেও সে দেখেছে। কোনদিন সিনেমায় গিয়ে ম্যাটিনি শো'য়ে মার্কিন প্রণয়-চিত্র দেখেছে, কোনদিন বা নিজের প্রণয়াকাঙ্খীর সঙ্গে ফ্লার্ট করেছে, কোনদিন বা নিজের ঘরে দোর বন্ধ করে বই পড়েছে, ঘুমিয়েছে। কিন্তু দু'সপ্তাহ বাদে তাও ভালো লাগেনি, জীবন-যাত্রার সব পদ্ধতিই বড় তাড়াতাড়ি পুরনো হয়ে যায়। রুবি ফের বেরিয়েছে চাকরির চেষ্টায়। যেমন তেমন করে আশ্রয় নিয়েছে চারদেয়াল ঘেরা অফিস ঘরে। এই ভালো। কাজ করতে এসে কাজ না করা। যারা কাজ করে, তাদের মনে হিংসা জাগিয়ে তোলা। যারা তার কাছ থেকে কাজ বুঝে নিতে চায়, তাদের ফাঁকি দেওয়া। এতেও কি মজা কম?

সেক্রেটারী সুবিনয় গুপ্তর খাস বেয়ারা অমূল্য এসে ঘরে ঢুকল, 'গুপ্ত সাহেব সেলাম জানিয়েছেন, মিস রায়।'

রুবি একটু চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল, তারপর বলল, 'ও, গুপ্ত সাহেব? যেয়ো না শোন।'

অমূল্য চলে যাচ্ছিল, রুবির ডাক শুনে ফিরে দাঁড়াল। সতের আঠার বছর বয়স হয়েছে অমূল্যের। ঠোঁটের ওপর কচি গোঁফের রেখা। বেশ লম্বা ছিপছিপে চেহারা। টানাটানা নাক চোখ। পরনে খাকি প্যাণ্ট। গায়ে ফর্সা টুইলের হাফ সার্ট বেশ মানিয়েছে ওকে।

রুবি বলল, 'শোন। এই চিঠিটা পোস্ট করে এসো তো, খুব জরুরী।'

বলে একটা পোস্টকার্ডের চিঠি অমূল্যের দিকে এগিয়ে দিল রুবি।

অমূল্য একটু ইতস্তত করল, 'গুপ্ত সাহেব যদি—'

রুবি একটু হাসল, 'রাগ করেন এইত? না রাগ করবেন না। আর যদি করেনই, আমার জন্যে তাঁর একটু রাগ তুমি সহ্য করতে পারবে না? যাও, এক্ষুনি দিয়ে এসো চিঠিটা।'

অমূল্যর আঙুল ছুঁয়ে রুবি পোস্টকার্ডটা ওর হাতে তুলে দিয়ে ফের একটু হাসল।

চাপা একটা লজ্জায় আর আনন্দে অমূল্যর মুখের রঙ যেন বদলে গেল। রুবির দিকে আর একবার তাকিয়ে চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রুবি মনে মনে হাসল। মিঃ গুপ্তর খাস বেয়ারা অমূল্য। অফিসের অন্য কোন কেরাণী তাকে দিয়ে কোন কাজ করাতে পারে না। তার অহঙ্কারের অন্ত নেই। সে সেক্রেটারীর খাস বেয়ারা। থার্ডক্লাশ পর্যন্ত পড়েছে, আর বংশে কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে। তাছাড়া অফিসের সময়ে আর কারো ফরমায়েস খাটা বা বাইরে যাওয়ার নিয়ম নেই তার। সেক্রেটারীর কড়া নিষেধ। কিন্তু সেক্রেটারীও জানেন না, তার বেয়ারাও জানে না সব বিধি ভাঙবার জন্যেই রুবি এখানে এসেছে। তার অসীম প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় না—বাঘে গরুতে সমান বিক্রমে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নামে। শুধু একটু হাসি, একটু কথা, একটু তাকানো, একটু ছোঁয়া। চোদ্দ থেকে চুয়াত্তর বছর পর্যন্ত সব বয়সী পুরুষের পক্ষে এই এক মুষ্টিযোগ। শুধু মাত্রাজ্ঞান থাকা চাই। একেবারে নিক্তির ওজনে মেপে দিতে হয়। প্রয়োজনের চাইতে এক রত্তি বেশি দিলে চলে না।

খানিক বাদে সেক্রেটারীর ঘর থেকে ফের ডাক এল। এবার আর দেরি না করে উঠে গেল রুবি।

সেক্রেটারী ঘাড় নীচু করে কি লিখছিলেন, লিখতেই লাগলেন। স্যুটপরা মোটা-

রোটা ফর্সাপানা ভদ্রলোক। মাথায় টাকের আভাস দেখা দিয়েছে, কোমরের নিচে ভুঁড়ির। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো থাকায় কিছু কম দেখায়।

রুবি বলল, 'আপনি ডেকেছিলেন ?'

সেক্রেটারী যেন এইমাত্র লক্ষ্য করলেন, 'ও আপনি এসেছেন ? বসুন।'

সেক্রেটারীর স্বর অপ্রসন্ন।

রুবি ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরো কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। অপরাধের ভারে মাথাটা আরো একটু আনত করল রুবি। চোখ তুলে একটু তাকালেই যাতে নতুন ঢঙে বাঁধা খোঁপাটা সেক্রেটারীর চোখে পড়ে। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে বিনয় আনল, একটু বা ত্রাস্ততা। অসাবধানে বুকের আঁচল ঠিক পরিমাণ মতই স্খলিত হোল।

সেক্রেটারী যে আড় চোখে তাকিয়েছেন, তা না দেখেও রুবির টের পেতে বাকি রইল না।

'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।' সেক্রেটারী আর একবার বললেন।

গলায় অপ্রসন্নতা এখনো আছে, কিন্তু মাত্রা কম।

রুবি এবার সামনের চেয়ারে বসে পড়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'কাল নিশ্চয়ই আপনার খুব অসুবিধা হয়েছে। কিছুতেই আসতে পারলাম না।'

সেক্রেটারী গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমার অসুবিধা বলে কথা নয়। অফিসের কাজ খুব সাফার করেছে। আপনি জানেন কিরকম কাজের চাপ আজকাল, লোকজন যথেষ্ট নেই। বিনা নোটিশে এভাবে এ্যাবসেন্ট হলে কাজকর্মের এত অসুবিধা হয়। তা ছাড়া চাকরির গোড়া থেকেই আপনি ইরেগুলার। এমন করলে—। নিন ডিক্টেশন নিন একটা।'

হিসেবটা একটু গরমিল হওয়ায় মনে মনে ক্ষুব্ধ হোল রুবি। মাঝে মাঝে এ ধরনের রুক্ষ প্রকৃতির নীরস বৈষয়িক মানুষের সঙ্গেও কারবার করতে হয়। তাদের চামড়া মোটা। ভোঁতা। অল্প স্বল্প সূক্ষ্ম আবেদন তাদের স্পর্শ করে না, বেশি ঘুষ না পেলে মন ওঠে না এদের। কিন্তু দেড়শ' টাকার চাকরির জন্যে রুবির নিক্তিতে এর চেয়ে বেশি কিছু উঠবে না। তার চেয়ে চাকরি বদলাবে সেই ভালো। এত কথা শুনে, এত কৈফিয়ৎ দিয়ে চাকরি করা ধাতে নেই রুবির।

ডিক্টেশন দেওয়া শেষ করে সেক্রেটারী বললেন, 'টাইপ করে এক্ষুনি আমাকে দেখাবেন।'

রুবি নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছিল, সেক্রেটারীর যেন একটু অনুকম্পা হোল, বললেন, 'ড্র্যাফটিং কেমন হয়েছে ?'

রুবি বলল, 'বেশ ভালো, আপনার বৈষয়িক চিঠিগুলিতেও বেশ একটু লিটারারি ফ্লেভার আছে মিঃ গুপ্ত।'

সেক্রেটারী খুশি হয়ে বললেন, 'কি করব বলুন। ওটুকু কিছুতেই এড়াতে পারিনে। ইংরেজীটা খুব যত্ন করেই শিখেছিলাম মিস রায়। ভাবিনি মার্চেন্ট অফিসের ফাইলের মধ্যেই সব বিদ্যা বন্দী হয়ে থাকবে।'

রুবি এবার হেসে বলল, 'তাই কি থাকে মিঃ গুপ্ত। গুণ যদি থাকে, তা কিছুতেই চাপা থাকে না। আমি আরো কয়েকদিন বলব ভেবেছি আপনাকে, বলি বলি করে বলা হয়নি। পাছে আপনি কিছু মনে করেন।'

সেক্রেটারী বললেন, 'না না, মনে করবার কি আছে। বলুন না।' মিঃ গুপ্তর কণ্ঠে প্রসন্ন মাধুর্য।

রুবি বলল, 'স্কটিশে ডাডলি নামে আমাদের একজন প্রফেসর ছিলেন। চমৎকার পড়াতেন। বিলাতী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন আরো চমৎকার। আপনার ইংরেজীতে অনেকটা তাঁর গলা আমি শুনি, তাঁর উচ্চারণ-ভঙ্গি। কেবল পণ্ডিতই নন, সাহিত্যিক বলেও খ্যাতি ছিল প্রফেসর ডাডলির।'

সেক্রেটারী বিনীত ভঙ্গিতে হাসলেন, 'কি যে বলেন, ওঁদের সঙ্গে আমার তুলনা সাজে না। তবে ইংরেজীটা খুব যত্ন করেই আমাদের শিখতে হয়েছিল।'

রুবি স্মিতমুখে বলল, 'যত্ন আপনার সব জিনিসের ওপরই আছে মিঃ গুপ্ত। আপনি যদি তা নাও বলেন, এমনকি উল্টো করেও বলেন তবু তা বুঝতে দেরি হয় না।' বলে একটু কটাক্ষ হেনে রুবি সেক্রেটারীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এবার বুঝুক লোকটা, এবার মরুক জ্বলে পুড়ে। রুবি জানে ওষুধ ধরবেই, কারো পক্ষে একটু দেরি হয়তো হয়। কিন্তু তাই বলে ওষুধের ক্রিয়া কম হয় না। 'অল্প যৌন আবেদনের বশ তুমি না হতে পার, সামান্য একটু তোষামোদ আর খোসামোদের হাত তুমি এড়াবে কি করে। তোমার ইংরেজীর লাইনে লাইনেও যদি ইডিয়মের ভুল থাকে তবু ভালো লিখেছ বললে তুমি শিশুর মতো খুসি হবে। আর সেই রন্ধ্রপথে শনি হয়ে আমি ঢুকব।'

রুবি নিজের মনে আত্মপ্রসাদে হাসল। যত শক্ত, যত আঁট-সাট মানুষই হোক, প্রত্যেকেরই এমনি দু'টি একটি রন্ধ্র আছে। একটু ভালো করে তাকালে দেখা যায়, সে ছিদ্র দু'টি একটি নয়—অগুনতি। কোন পুরুষের মুখের দিকে তাকাবামাত্রই রুবি বুঝতে পারে কার কোথায় দুর্বলতা। সে হাঁ করবার আগেই কী বলবে, তা রুবি টের পেয়ে যায়। দুটি চোখ তো নয়, দুটি অনুবীক্ষণ যন্ত্র। কিন্তু সব সময় যন্ত্র বয়ে বেড়াবার যন্ত্রণাও কি

কম। এর চেয়ে ঠিক আগের মত সেই দুটি চোখই যদি শুধু থাকত, যাতে সব সরল দেখায়, সব সুন্দর দেখায়, পৃথিবীর যা কিছু দেখে তাতেই খুশি হয়, তৃপ্ত হয় যে দু'টি চোখ।

লেখাটা টাইপে চড়িয়ে রুবির মনে হোল একি করল সে! ক'দিন ধরেই ঠিক করেছে, এ চাকরি সে ছেড়ে দেবে। তবু কেন লোকটিকে অনর্থক খোসামোদ করতে গেল। নাকি, এ তার একরকমের অভ্যাস হয়ে গেছে। যে রুবি গতানুগতিকতার ধার ধারে না, এক কথা দু'বার বলে না, এক ভাবনা দু'বার ভাবে না, এক পুরুষের সঙ্গে দু'মাসের বেশি বন্ধুত্ব রাখে না, তাকেও অভ্যাসের বাঁধন মানতে হয়, অভ্যাসের দাসত্ব স্বীকার করতে হয়, এ কি বিড়ম্বনা!

অফিস থেকে বেরুতেই দেখা হোল দিব্যেন্দু নন্দীর সঙ্গে, সে কাছেই অপেক্ষা করছিল। কোন সঙ্কেত স্থানে প্রতীক্ষা করতে আজ আর ভরসা হয়নি। কাল রুবি ওকে ফাঁকি দিয়েছে। কথা দিয়ে কথা রাখেনি, দেখা করেনি।

রুবি খানিকটা পথ এগিয়ে এসে বলল, 'ব্যাপার কি, আজ যে একেবারে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছ!'

দিব্যেন্দু বলল, 'হুঁ, কাল যে এলে না। কি হয়েছিল তোমার?'

রুবি বলল, 'আর বোল না, কাল মাথা ধরায় পুরো শয্যাশায়ী ছিলাম।'

দিব্যেন্দু বলল, 'শয্যাশায়িনী তো রোজই থাক।'

রুবি বলল, 'শুধু তুমি সেই শয্যায় থাকতে পার না, তাই বুঝি আফশোষ?'

এই সন্ধ্যার আবহাওয়াতেও দিব্যেন্দুর মুখের রঙ বদলানো ধরা পড়ল। আঠাশ ঊনত্রিশ বছরের দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ। ছাই রঙের স্যুট ওকে চমৎকার মানিয়েছে!

দিব্যেন্দু বলল, 'তোমার মুখে আজকাল আর কিছু আটকায় না রুবি।'

'যেন তোমার মুখেই সব আটকায়!'

দিব্যেন্দু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ঝগড়া করবার আগে এসো এক কাপ করে চা খেয়ে নি।'

মোড়েই হোটেল আর রেস্তরাঁর একটি দোতলা বাড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে রুবি একটু থমকে দাঁড়াল। কাল বিভাসের বাড়িতে দেখা একটি চেনা মুখ। সুরেন হালদারও একটু থেমে দাঁড়িয়েছিল, তারপর বন্ধুদের সঙ্গে দ্রুতবেগে নেমে গেল।

দিব্যেন্দু ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'কি হোল?'

রুবি ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কি আবার হবে চল।'

কাটা দরজা ঠেলে ছোট কেবিনের মধ্যে মুখোমুখি বসল দু'জনে। উর্দিপরা বেয়ারা

এসে সামনে দাঁড়াল। মেন্থ দেখে বেছে বেছে মাংসের খাবারগুলি ফরমায়েস করে দিব্যেন্দু রুবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এত ক্লান্ত দেখছি যে, মুখ যে বড্ড শুকনো শুকনো!

রুবি বলল, 'সারাদিন চাকরি করে এলাম। তোমার মত তো আর নয়।'

দিব্যেন্দু বলল, 'তা ঠিক। কিন্তু ওসব বাজে চাকরি কেন কর বলতো? কি যে খেয়াল তোমার। মিছামিছি শরীর নষ্ট।'

রুবি কাঁটায় খণ্ডিত কাটলেটের টুকরো বিঁধতে বিঁধতে বলল, 'আমার শরীরের জন্য তোমার তো খুব ভাবনা দেখছি।'

দিব্যেন্দু বলল, 'বাঃ, ভাবনা নেই? তোমাদের শরীরের জন্যেই তো আমাদের শরীর পাত। যাক্, ক'টা দিন সবুর কর। দিল্লী থেকে ঘুরে এসে আমি নিজেই এবার একটা অফিস করছি। তোমাকে সেখানে নিয়ে নেব।'

রুবি মৃদু হেসে বলল, 'যাক, একটা চাকরির চিন্তা থেকে বাঁচলাম। তোমার সে অফিসে বুঝি আমার আর কোন খাটুনি থাকবে না?'

দিব্যেন্দু বলল, 'মোটেই না। শুধু সেজেগুজে বসে থাকবে। ইন্‌স্‌পিরেশন জোগাবে।'

বোন প্লেটে চর্বিত হাড়ের টুকরো ঢেলে রেখে দিব্যেন্দু বলল, 'আচ্ছা এক কাজ কর না রুবি; আমাদের বিজনেসের একটা শেয়ার নাও না কেন। হাজার পাঁচেক টাকা দিলেই আপাতত হবে। এই সামান্য টাকার জন্যে একটা কাজ আটকে রয়েছে।'

রুবি কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'তুমি অসামান্য পুরুষ। এই সামান্য টাকার জন্যে তোমার কাজ আটকে থাকবে, বল কি?'

'তাহলে দেবে না তুমি টাকাটা?'

রুবি নিচু হয়ে চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়াল একটু, তারপর ফের মুখ তুলল, 'অত টাকা কোথায় পাব আমি!'

'বাঃ, আমার মত কত বন্ধুবান্ধব তোমার। টাকার তোমার অভাব কি?'

রুবি বলল, 'আমার মত বান্ধবী তোমারও তো কম নেই, তাতে কি টাকার সুরাহা হয়?'

দিব্যেন্দু চা শেষ করে সিগারেট ধরাল। নিঃশব্দে ধূমপান করল কিছুক্ষণ। তারপর বলল,' 'এখনকার মত এই হাজার পাঁচেকের ব্যবস্থা করতে পারলে মাসখানেকের মধ্যে পুরো পঁচিশ হাজার ঘুরে আসত। সত্যি, অন্তত ধার হিসাবেও কি তুমি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পার না?'

রুবি বলল, 'যদি পারতাম তাহলে কি সামান্ত মাইনের চাকরি করতাম! কিন্তু বিষয়টা কি, সেই পারমিট টারমিটের ব্যাপার নাকি?'

দিব্যেন্দু বলল, 'হুঁ।'

কয়েকটি লৌহ ব্যবসায়ীকে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে বরাদ্দের অতিরিক্ত লোহা আর ইস্পাত ক্রয়ের ব্যবস্থার ভার নিয়েছে দিব্যেন্দু আর তার কয়েকজন বন্ধু। সে খবর মাঝে মাঝে রুবি শোনে। কারবারে ঝুঁকি আছে, নানারকম খরচপত্র আছে। লাভের বখরা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মনান্তরের আশঙ্কা আছে। কিন্তু যখন আসে, তখন মোটা টাকাই আসে। তখন বেশ উল্লসিত, জীবন্ত মনে হয় দিব্যেন্দুকে। কিন্তু আবার আসে ভাঁটার টান। তখন যার তার কাছে দিব্যেন্দু হাত পাতে।

রুবি একদিন বলেছিল, 'এসব ব্ল্যাক-মার্কেটিং ছেড়ে দিয়ে চাকরি কর না কেন? এম. এ. পাশ করেছ, বিদ্যাবুদ্ধি আছে।'

দিব্যেন্দু হেসে বলেছিল, 'বটে! একেবারে ধর্মপত্নীর মত উপদেশ দিচ্ছ যে! বিদ্যা-বুদ্ধি থাকলেই বুঝি আজকাল চাকরি জোটে মনে করো? হেঁটে হেঁটে ক'জোড়া জুতোর সুখতলা ক্ষয় করেছি জানো? কত অফিসের ম্যানেজার, জেনারেল ম্যানেজারের কাছ থেকে নির্বাচনের অযোগ্যতার সার্টিফিকেট নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। কত মুরুব্বির শুকনো উপদেশ যে কুড়োতে হয়েছে, তার হিসেব নেই। কিন্তু এখন চাকা ঘুরে গেছে রুবি। বিজনেস উপলক্ষে বড় বড় অফিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এখনো দেখাসাক্ষাৎ হয়। হ্যাণ্ডসেকের সময় আমার কবজীর জোর তাদের চেয়ে বেশি ছাড়া কম হয় না।' আর একদিন দিব্যেন্দু বলেছিল, 'অত কালো কালো করছ কেন? সমস্ত দেশ জুড়ে ওই একটি রঙের বাজারই শুধু আছে। আর সব রঙ কাঁচা। আঙুলের ঘসা লাগলে উঠে যায়।'

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে বিল মিটিয়ে দিল দিব্যেন্দু। সিগারেটের টুকরোটি ফেলে দেওয়ার আগে তার থেকে আর একটি নতুন সিগারেট ধরিয়ে নিল।

রুবি বলল, 'চল, এবার ওঠা যাক।'

দিব্যেন্দু বলল, 'সে কি, এখনই উঠব কি! সবে তো সন্ধ্যা।'

রুবি বলল, 'চল, আজ আর ভাল লাগছে না।'

দিব্যেন্দু বলল, 'টাকা চেয়েছি বলে মন খারাপ হয়ে গেছে বুঝি? কিন্তু আমি এতক্ষণ ঠাট্টা করছিলাম রুবি। মন বুঝে দেখছিলাম তোমার। সত্যিই তোমার কাছে টাকা চাইব, আমার কি এমনই মাথা খারাপ হয়ে গেছে? টাকার চেয়ে অনেক দামী জিনিস তোমার আছে। তারই ছিঁটে ফোঁটা—'

রুবি বলল, 'ওসব কথা থাক দিব্যেন্দু, ভালো লাগছে না। বড্ড ক্লান্তি লাগছে আজ।'

দিব্যেন্দু বলল, 'ক্লান্তি যাতে দূর হয়, তার ব্যবস্থা তো করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তুমি মাথা নাড়লে। আচ্ছা দাঁড়াও—' বলে দিব্যেন্দু বেয়ারাটিকে ইশারায় আর একবার ডাকল।

রুবি বাধা দিয়ে বলল, 'না না, আজ থাকগে দিব্যেন্দু।'

'থাকবে কেন, তুমি কি ভেবেছ আমি একেবারে ফকির হয়ে গেছি, রেষ্টুরেণ্টের বিল মেটাতে পারব না? বেশি নয়, মাত্র একটু ঠোঁট ভেজানো।'

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে দিব্যেন্দু বলল, 'খেয়ে দেখ, একেবারে খাঁটি পর্তুগাল থেকে আমদানী। এ-জিনিস সব জায়গায় পাবে না। তারপর কালকের অভিসারের বিবরণ এবার ফলাও করে বল তো শুনি। সঙ্কোচ করো না। আমার মধ্যে ষড় রিপুর প্রথম পাঁচটির প্রভাবই যা একটু-আধটু আছে, কিন্তু সর্বশেষটি একেবারে অনুপস্থিত। ঈর্ষার নাম-গন্ধও পাবে না আমার মধ্যে। কাল কোথায় গিয়েছিলে?'

রুবি বলল, 'যাব আর কোথায়। বাড়িতেই ছিলাম। এক ম্যারেজ এ্যানিভার্সারির নিমন্ত্রণ ছিল।'

দিব্যেন্দু বলল, 'কার ম্যারেজ এ্যানিভার্সারি?'

রুবি বলল, 'আমার প্রতিবেশী। পাশের ঘরের ভাড়াটে বিভাসবাবুর।'

দিব্যেন্দু একটু ভ্রূকুঞ্চিত করল, 'বিভাসবাবু? জীবটি কে হে? ও, এবার মনে পড়েছে। সেই হাঁড়িমুখো ভদ্রলোক?'

রুবি একটু হাসল, 'হাঁড়িমুখো, তবে ভদ্রলোক।'

দিব্যেন্দু বলল, 'হুঁ! কিসের নিমন্ত্রণ? ম্যারেজ এ্যানিভার্সারি? মানে বিয়ের বছরকি? বেশ, বেশ, আজকাল বিয়ে আর বিয়ের বছরকির ওপর তোমার বিশ্বাস ফের ফিরে আসতে সুরু করেছে নাকি?'

রুবি বলল, 'না, তা আসেনি। বিয়েতে বিশ্বাস না করলেও বিয়ের নিমন্ত্রণে আর পোলাও মাংসে বিশ্বাস করতে তো ক্ষতি নেই। ওগুলি তো খুব solid, একেবারে প্রত্যক্ষ বস্তু।'

দিব্যেন্দু বলল, 'তাই বল। মাংসে মিষ্টিতে খুব করে পেট ভরে আর বুঝি নড়তে চড়তে পারনি।'

রুবি গম্ভীর মুখে বলল, 'হুঁ।'

কালকের অপমানের জ্বালাটা যেন নতুন করে অনুভব করে অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল, এবার বেরোই।'

দিব্যেন্দুও উঠে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ রুবির নরম সুন্দর হাতখানা নিজের মুঠির

মধ্যে নিয়ে বলল, 'কিন্তু এখনই চলে যাবে রুবি ? তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে। পাশের ঘর থেকে একটু রেষ্ট নিয়ে গেলে পারতে না ?'

দিব্যেন্দুর জ্বল জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল রুবি, বললে, 'না দিব্যেন্দু।'

সামনে লম্বা করিডর। দু'পাশের ঘরগুলি থেকে টুং টাং শব্দ আসছে। একটি মেয়ের খিলখিল হাসি। সিঁড়ি দিয়ে কয়েকজন লোক উঠে আসছে। জন দুই লোক প্রমত্ত পদক্ষেপে নেমে গেল।

রুবি বলল, 'বড় গরম লাগছে। চল বেরোই।'

অনুগত বন্ধুর মত দিব্যেন্দু বললে, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। চল একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়িয়ে আসি।'

একটু এগিয়েই ট্যাকসী স্ট্যাণ্ড। হাতের ইশারায় একজন শিখ ড্রাইভারকে ডেকে নিল দিব্যেন্দু।

রুবি বলল, 'আবার গাড়ি কেন ! আমি বাসেই ফিরে যাব।'

দিব্যেন্দু মনে মনে বিরক্ত হয়ে ভাবল, 'মেয়েটা কি রাতভর কেবল দর বাড়াবে !'

কিন্তু এসব ব্যাপারে ধৈর্য হারালে সব হারাতে হয়। মিষ্টি হেসে দিব্যেন্দু বলল, 'যাবেই তো, তোমাকে কতক্ষণ আর আমি ধরে রাখতে পারব ! চল পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ঘণ্টা দেড়েক বাদে দিব্যেন্দু রুবিকে গলির মুখে নামিয়ে দিয়ে গেল।

কড়া নাড়ার শব্দে বিভাসই এগিয়ে গেল সদরের হুড়কো খুলতে। উমা খেতে বসেছে। সুরবালা খাওয়াতে বসেছেন বাবলুকে।

বিভাসকে সামনে দেখে একটু যেন চমকে গেল, একটু যেন অপ্রস্তুত হ'ল রুবি। হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'এই যে, ঘুমোননি এখনো ?'

বিভাস বলল, 'না'।

রুবি আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিভাস সেদিকে কান না দিয়ে সশব্দে দরজার হুড়কো বন্ধ করে দিল।

রুবি মনে মনে একটু হাসল—রাগ। রাগ হ'ল তো বয়েই গেল।

ঘরে এসে লাইট জেলে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল রুবি। গলায় চিক চিক করছে নতুন এক ছড়া হার। দিব্যেন্দুর কাছ থেকে সে শুধু হাতে ফিরে আসেনি। এই নিয়ে চার ছড়া হার হ'ল তার। চার জনের উপহার। একজন লোক চার বছর আগে

তার বাপের দেওয়া সমস্ত অলঙ্কার কেড়ে রেখেছিল। সে অলঙ্কার চতুর্গুণ হয়ে আজ ফিরে এসেছে। গয়নার জন্তে আর কোন আফশোষ নেই, আর কোন ক্ষোভ নেই রুবির।

শাড়ি বদলাল রুবি, গয়নাগুলি খুলে রেখে দিল বাক্সে। আঁটসাট কাঁচুলি খুলে ফেলে সহজ ভাবে নিঃশ্বাস নিল্। আলো নিভিয়ে দিয়ে শরীরটাকে কোনরকমে এলিয়ে দিল বিছানায়।

গয়নার জন্য আর কোন ক্ষোভ নেই, আফশোষ নেই। কিন্তু গয়নায় কোন লোভ নেই একথা কি বলতে পারে রুবি? এই লোভের দুর্বলতার সুযোগই তো আজ নিল দিব্যেন্দু। এতদিন শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছে। কিছুতেই ধরা দেয়নি রুবি। কেবল খেলিয়েছে কেবল খেলিয়েছে! কিন্তু আজ সব খেলায় হার মানতে হ'ল। ফিরে আসবার সময় দিব্যেন্দু পরিশ্রান্ত রুবির দিকে তাকিয়ে মুখ মুচকে হেসেছিল। সে হাসির মানে রুবি জানে। 'এই তো তোমার দাম। এই তো তোমার সমস্ত ছলাকলার পরিণতি! শুধু একমুঠো সোনা—বড় জোর কয়েক মুঠো।'

কিন্তু তাই কি? তার চেয়ে বেশি মূল্য কি রুবির নেই? সোনা দিয়ে কতটুকু পেয়েছে দিব্যেন্দু? কয়েক মিনিটের দেহ সম্ভোগ। তার চেয়ে কি বেশি কিছুর খোঁজ পেয়েছে?

পরমুহূর্তে নিজের মনে হেসে উঠল রুবি। বেশি কিছুর! দেহের চেয়ে আবার বেশি কি আছে। মন? মন আবার কি। ওসব সেকেলে মনস্তাত্ত্বিকদের কথা। একালের মনস্তত্ত্বে মনের অস্তিত্ব নেই, মনকে সে মানে না, স্বীকার করে না। শুধু দেহ আর দেহজাত কতকগুলি অভ্যাস। এই মাত্র।

দিব্যেন্দুও তাই বলেছিল, 'দেখ রুবি, হৃদয় মনের মোহ আমার নেই। I am all flesh. আর তুমিও তাই। তাতে লজ্জা কি। দেহকে দেহ বলে স্বীকার করতে লজ্জা করব কেন। বরং গর্ব করব। দেহকে চিনেছি বলে দেহকে স্বীকার করতে পেরেছি বলে গর্ব। সবাই তা পারে না, ভয় পায়। আর সেই অস্বীকারের বিকার সারা জীবন ধরে বয়ে বেড়ায়।'

রুবি বলেছিল, 'শুধু দেহ, শুধু রক্ত আর মাংস?'

দিব্যেন্দু বলেছিল, 'হ্যাঁ, রক্ত আর মাংস। কথা দুটি হৃদয় মনের মত শ্রুতিমধুর নয়, কিন্তু আসলে মধুর। সমস্ত মাধুর্য এই রক্ত-মাংসের দেহের মাধ্যমে আমরা পাই, দেহের ভিতর দিয়ে আমরা দেই। এই যে তোমাকে আমি ছুঁয়েছি, মনে হচ্ছে যেন সমস্ত বিশ্বের আনন্দকে আমি স্পর্শ করেছি। এর চেয়ে বড় সত্য আর কি আছে, আনন্দের চেয়েও বড়?'

রুবি বলেছিল, 'কিন্তু কালই তো আর একজনকে ছোঁবে, আর একজনকে দেখবে।'

দিব্যেন্দু জবাব দিয়েছিল, 'তা দেখলামই বা। সেও তো সুন্দরকেই ছোঁওয়া, সুন্দরকেই দেখা। অভ্যাসের পুরানো ঘোমটার সুন্দর তার মুখ লুকোয়। আমি পর্দানশীনার সেই ঘোমটা ধরে টানা-টানি করতে যাইনে। নতুনের মধ্যে বিচিত্রের মধ্যে সুন্দরতরকে দেখি।'

চমৎকার কথা বলে দিব্যেন্দু! কিন্তু একেক সময় মনে হয়, শুধু কথা, শুধুই কথা। হোক কথা। কথার অতীত কিছু নেই। যদি কিছু থাকে, তাকেও কথা দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। আজই সকালে আর একজন বলেছিল। আর বলেছিল, 'আমি বড় দুঃখিত।' ভারি অদ্ভুত কথা। 'আমি বড় দুঃখিত।' কেন দুঃখ, কিসের দুঃখ তা জানি না, তবু দুঃখ পাই। এত সুখ, এত সম্ভোগ দেহ দিয়ে দেহের অণু পরমাণু দিয়ে এত আশ্চর্য আনন্দের আহরণ, তবু দুঃখ সব হরণ করে নেয়।

আকাশে মেঘ ছিল। গুমট গরম ছিল ঘরের মধ্যে, এতক্ষণে বৃষ্টি নামতে সুরু করেছে, অঘ্রাণের অকাল বর্ষণ।

কিছুদিন বিভাস রুবির সঙ্গে আর কোন কথা বলতে গেল না। স্ত্রীর কাছেও ওর কোন প্রসঙ্গ তুলল না। অফিস, সংসার আর নিজের পড়াশুনো নিয়েই নিজেকে মগ্ন করতে চেষ্টা করল! একদিন বিভাসের অফিসে বেড়াতে গেল নিরুপম। একথা সেকথার পর সে জিজ্ঞাসা করতে ভুলল না, 'তারপর, খবর কি? তোমার প্রতিবেশিনীটি আছেন কেমন?'

'ভালো।'

'ভাল না থাকার তো কথা নয়। রাত্রের চৌরঙ্গী যাঁর একচেটে, তিনি খারাপ থাকবেন কোন্ দুঃখে! কিন্তু তোমার ভাগ্যে শুধু দৌবারিকগিরি, না কি আরো কিছু জুটল?'

বিভাস ধমকের ভঙ্গিতে বললে, 'কি যত সব বাজে কথা সুরু করেছ, ও ছাড়া আর কোন কথা নেই?'

নিরুপম একটু জিভ কাটার ভঙ্গি করে বললে, 'শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু, কার সামনে কি বলছি।'

চা সিগারেট খেয়ে নিরুপম খানিক বাদেই বিদায় নিল। বিভাস ভাবল রুবির অতীত জীবন সম্বন্ধে নিরুপমকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে হ'ত! কেনই বা স্বামীর ঘর ছেড়ে এল রুবি, কেনই বা এ ধরনের জীবন যাপনে ওর ঝোঁক গেল। কিন্তু নিরুপম যখন ইচ্ছা

করে মুখ খুলল না, তখন ওর কাছে রুবির সম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রকাশ করতে আত্মমর্যাদায় বাধল বিভাসের। ওদের বিচ্ছেদের কারণ জেনে আর কী লাভ। হয়ত স্বামীর দোষ ছিল, হয়ত স্ত্রীর, কিংবা হয়ত দু'জনেরই, কিন্তু সবচেয়ে বেশি দোষ দেশের বিধি-নিষেধের। যদি স্বাভাবিক বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকত, যদি কোন অগৌরব না থাকত তার মধ্যে, তাহলে রুবি হয়ত ফের আর কাউকে বিয়ে করত, ঘর বাঁধত। কেবল এক ফোঁটা হাসি, আর একটু আড়চোখে চাওয়া নয়, দেশকে সমাজকে আরও অনেক বেশি সে দিতে পারত। একটি সুন্দরী শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে। এই নিরক্ষর দরিদ্র দেশের কত বড় সম্পদ। কিন্তু সে সম্পদ কোন কাজে লাগছে না। অযথা অপচয়ে ক্ষয় হচ্ছে। ভারি দুঃখ লাগে বিভাসের, একটা অননুভূত সহানুভূতিতে মন ভরে ওঠে।

কিন্তু সহানুভূতি জাগা তো বিভাসের পক্ষে ঠিক স্বাভাবিক নয়। রুবির বেশবাস থেকে সুরু করে ওর রুচি রীতি মতামত জীবনাদর্শ কোনকিছুর সঙ্গেই বিভাসের তিলমাত্র মিল নেই। এর আগে এসব বিষয়ে সে ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তা। কড়া পছন্দ-অপছন্দঅলা মানুষ। কিন্তু রুবির সম্বন্ধে তার এই সহনশীলতা এল কোত্থেকে ? বিভাস মনে মনে ভাবে, উমাকে শোধরাতে গিয়ে যে বিফলতা এসেছে, তার থেকেই এই শিক্ষা সে পেয়েছে। অসহিষ্ণুতায় কোন লাভ নেই, শল্য চিকিৎসাই সবসময় একমাত্র চিকিৎসা নয়। কিন্তু বিভাসের সহনশীলতা নিয়ে এরই মধ্যে পাড়ায় কথা উঠেছে। দু' একজন কৌতূহলী প্রতিবেশী বিভাসকে ডেকে বলেছেন, 'আরে মশাই, আপনার বাড়িতে ওই যে একটি মেয়ে থাকে, তার চালচলন যেন একটু কেমন-কেমন মনে হয়। আপনি বলেই সহ্য করছেন। অন্য কেউ হলে—। গৃহস্থ বাড়ির মধ্যে এসব কি ব্যাপার বলুন তো ?'

বিভাস গৃহস্থ বাড়ির মর্যাদা রাখবার জন্য একটু আধটু সত্য গোপন করেছে, 'না না, আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। একটু মিশুক প্রকৃতির মেয়ে—'

প্রতিবেশী বাধা দিয়ে বলেছেন, 'মিশুক প্রকৃতির বলে কি রাত দশটা পর্যন্ত লোকজনের সঙ্গে মিশে বেড়াবেন ?'

বিভাস বলেছে, 'সব দিনই যে অত রাত করে ফেরেন তা তো নয়। কোন কোনদিন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে যান, কি অন্য কোন কাজ-কর্ম থাকে, তাই রাত হয়।'

কাউকে বা বিরক্ত হয়ে বলেছে, 'কি জানি মশাই। ভাড়াটে বাড়ি। এক বাড়িতে পাঁচরকমের ভাড়াটে থাকে। কে কার খবর রাখে বলুন। আত্মীয় নয়, কুটুম্ব নয়, জানাশোনার গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না। ওর চালচলন ধরনধারণে আমার কি এসে যায়। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।'

বিভাস একটু নির্লিপ্ত থাকার ফলে উমা রুবির সঙ্গে ফের ভাব জমাতে উৎসাহ পেল। একদিন ফিকে হলুদ রঙের এক পীস কাপড় নিয়ে গিয়ে বলল, 'দেখ তো রুবি, রঙটা পছন্দ হয় নাকি! ব্লাউস করব।'

রুবি বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিল, বলল, 'আমার পছন্দ কি আরেক জনের পছন্দের সঙ্গে মিলবে? রঙটা তাকে দিয়েই বাছাই করে নিস।'

উমা হেসে বলল, 'ব্লাউস তো আর সে পরবে না, আমিই পরব। তার পছন্দ-অপছন্দে কি এসে যায়?'

রুবি হাসল, 'খুব যে স্বাধীন ভর্তৃকা হয়েছিস। কিন্তু বেশবাসের ব্যাপারে ওদের পছন্দ অপছন্দে যে কিছু এসে যায় না, তা বলি কি করে? আপ্‌রুচি খানা পর রুচি পরনা। মেয়েদের বেলায় সেই পর হ'ল পুরুষ। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরপুরুষ।'

উমা আরক্ত হয়ে বলল, 'তুই তো সব কথা ওই একই দিকে টেনে নিস।'

রুবি বলল, 'বোস, বসে কথা বল। নাকি, এ বিছানায় বসলে জাত যাবে?'

উমা ওর বিছানার পাশে বসতে বসতে বলল, 'জাত যেতে বাকি আছে নাকি কিছু? পুরুষই হোক আর পরপুরুষই হোক, কারো পছন্দেই আমরা চলিনে। পোষাক-আসাকটা আমরা নিজেদের পছন্দ মতই করি। আমি তো অন্তত নিজের চোখে যা ভালো লাগে, তা ছাড়া অন্য কিছু পরি না। তা শাড়িই বলিস আর গয়নাই বলিস।'

রুবি বলল, 'কিন্তু নিজের চোখ কখন যে অন্যের চোখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নেয়, তা নিজেও টের পাসনে। আমাদের সাজসজ্জাটা পুরুষের চোখের দিকে তাকিয়েই। একথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। লজ্জা হয় যখন ওদের রুচির কথা ভাবি।'

উমা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ওদের রুচির দোষ কিসে দেখলি?'

রুবি বলল, 'দোষ নেই? পুরুষের মনের ধারণা ওরা খুব সুরুচি আর সূক্ষ্মরুচির লোক। কিন্তু আসলে যে তা নয়, তা আমাদের বেশবাসের দিকে তাকালেই ধরা পড়ে। দেখিস নে আমাদের রঙচঙে জবরজঙ্গ পোষাক না পরিয়ে, অলঙ্কারের নামে কতকগুলি ধাতুখণ্ড আমাদের গায়ে না জড়িয়ে ওদের সৌন্দর্যবোধ তৃপ্ত হয় না? আমরা কিন্তু পুরুষের কাছে দাবী করি নে তোমরা রঙীন ধুতী পর, একরাশ চুল রাখ মাথায়, সারা গায়ে সোনা-দানা পরে বেড়াও। আমাদের রুচি যে কত সুন্দর, কত সরল আর অনাড়ম্বর তার প্রমাণ পুরুষের পোষাক।'

উমা হেসে বলল, 'মন্দ নয়। এত লোক থাকতে শেষ পর্যন্ত তুই কিনা অনাড়ম্বর পোষাকের হয়ে ওকালতি সুরু করলি—চুল থেকে নখ পর্যন্ত যার আড়ম্বরের শেষ নেই। আসলে পুরুষদের দোষ দেওয়ার কোন ছুতো পেলে তুই ছাড়তে চাসনে।'

বাবুলকে কোলে নিয়ে সুরবালা এসে ঘরে ঢুকলেন, 'নাও বাপু রাখ, তোমার ছেলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কোমর ভেঙে গেল।'

অপ্রসন্ন মুখে ছেলেকে নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল উমা।

সুরবালা যেতে যেতে বললেন, 'গল্প পেলে তো আর উঠতে চাও না। ওদিকে কাজকর্ম যে সব পড়ে রয়েছে।'

উমা বলল, 'কিছুই পড়ে থাকবে না পিসীমা, আমি এক্ষুনি আসছি, আপনি এগোন।'

সুরবালা বেরিয়ে গেলে উমা নিচু গলায় বলল, 'বাবারে বাবা, যদি একটু বসে থাকতে দেখল আর রক্ষে নেই। হয় ছেলে নাও, না হয় এটা কর, সেটা কর। এ যেন আমার নিজের সংসার নয়, পরের সংসারে চাকরি। সুবিধে পেলেই যেন কাজ চুরি করব।'

রুবি একটু হাসল, 'আসল কথাটা তা নয়। তোর স্বামী আর তোর শাশুড়ীর সব সময় ভয়, পাছে তোকে বখিয়ে দিই। সেই রাত্রের পর থেকে তোর পিসশাশুড়ী তো আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলেন না।'

উমা বলল, 'তুর, তা কেন। ওঁর স্বভাবই ওই রকম। বলে বলে কাজ করাতে ভারি ভালোবাসেন। সেই আসা অবধি দেখছি।'

এরপর একটু থেমে উমা বলল, 'আচ্ছা, রুবি, একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করব। কিছু মনে করবি না তো?'

রুবি উমার দিকে তাকাল, 'মনে যদিই বা করি মনে মনে করব, মুখে কিছুই বলব না। তুই কি বলবি বল।'

উমা একটু ইতস্তত করে বলল, 'আচ্ছা, সেদিন নিরুপমবাবু যা বলেছিলেন, তা কি সত্যি?'

রুবি বলল, 'হুঁ।'

'তোর বিয়ে হয়েছিল?'

'হয়েছিল বই কি। কেবল কি বিয়ে? বিয়ে, বাসি বিয়ে, শুভরাত্তির, দশবর্জন কিছুই বাদ ছিল না।'

'এতদিন বলিসনি কেন?'

'বলবার সুযোগ হয়নি, তুই জিজ্ঞেস করিসনি তাই।'

উমা বলল, 'কিন্তু আজ যদি জিজ্ঞেস করি সব বলবি? কেন ছেড়ে এলি, কেন তোদের ছাড়াছাড়ি হ'ল?'

রুবি বলল, 'কেন, সেকথা তোদের নিরুপমবাবু সেদিন বলেননি?'

উমা বলল, 'নিরুপমবাবু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু উনি বলতে দিলেন না। বললেন, ওসব আলোচনা থাক।'

রুবি উমার দিকে একটু তাকিয়ে রইল। কথাটা সত্য কি মিথ্যা বুঝতে চাইল হয়তো।

একটু বাদে রুবি বলল, 'তাহলে তো তোকে বড় নিরাশ হতে হয়েছে। তা এক কাজ কর। নিরুপমবাবুকে নেমন্তন্ন কর আর একদিন। বিভাসবাবু যখন থাকবেন না বেছে বেছে তেমন একটা সময় ঠিক করে নিস। তার মুখেই সব শুনবি।'

উমা বলল, 'না তোর মুখ থেকেই সব শুনতে চাই।'

রুবি একটু হাসল, 'আমার মুখ থেকে। কিন্তু আমি যে সত্যি কথা বলব তার কি মানে আছে?'

উমা বলল, 'তুই কি ইচ্ছা করে আমার কাছে মিথ্যে কথা বলবি? সঙ্কোচ হবে না?'

রুবি বলল, 'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী বটে। স্বামীর কাছ থেকে শুনে শুনে খুব বুঝি মুখস্থ করেছিস? মিথ্যে বলতে সঙ্কোচ! সংসারে সত্যটাই বরং ছোট, সঙ্কুচিত। মিথ্যেটাকে যত টানা যায়, তত বাড়ে। ওর প্রসারের শেষ নেই। আমার জিভটা গল্প লেখকের কলমের মত। মিথ্যে বলতে তার লজ্জা নেই, মনোহর করে বলতে পারলেই হোল। কিন্তু এবার তুই ওঠ। বাইরের এক ভদ্রলোক এক্ষুনি এসে পড়বেন।'

উমা বলল, 'কে তিনি? সেই ডাক্তারবাবু নাকি?'

রুবি বলল, 'না, ডাক্তার কম্পাউণ্ডার কেউ নয়। এক সিনেমা কোম্পানীর ডিরেক্টর। তার ছবিতে নায়িকার সতীন হিসাবে আমাকে মানায় কিনা দেখতে আসবেন। আমি বলেছি, দেখুন, ভালো করে বাজিয়ে নিন। সতী না সাজতে পারি, কিন্তু সতীন সাজতে খুব পারব। কি বলিস?'

উমা বলল, 'তুই সিনেমাতেও নামবি নাকি?'

রুবি বলল, 'দেখি, কথাবার্তা তো চলছে।'

একটু বাদে উমা ফের এসে আড়াল থেকে দেখে গেল রুবির ঘরে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সত্যিই একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক চুরুট টানতে টানতে আলাপ করছেন। তার মুখোমুখি আর একটা চেয়ারে লীলায়িত ভঙ্গিতে রুবি বসে। একটু কান পাততেই উমা বুঝতে পারল আলাপ আলোচনাটা সিনেমা সংক্রান্তই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা-গুলি উমার আরো কিছুক্ষণ শুনবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ছেলেকে খাওয়ানোর দোহাই দিয়ে ফের সুরবালা তাকে ডেকে নিলেন।

দিনকয়েক বাদে উমা আর একদিন সকালে চা খেতে বলল রুবিকে।

রুবি বলল, 'ব্যাপার কি, এত অনুরাগ তো ভালো নয়। অতিভক্তিকে যেন কিসের লক্ষণ বলা হয় বিভাসবাবু?'

বিভাস খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে রুবির দিকে একটু তাকাল, কোন কথা বলল না।

কিন্তু কাউকে কথা না বলাতে পারলে যেন রুবির তৃপ্তি নেই। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রুবি বলল, 'ভালো কথা মনে পড়ল, ক দিন ধরেই আপনাকে জিজ্ঞেস করব করব ভেবেছি, এখানকার লোকাল গার্জেন তো বলতে গেলে আপনিই। আপনার মতামতটা নেওয়া উচিত। শুনেছেন বোধহয় একটা সিনেমা কোম্পানীর সঙ্গে আমার কনট্রাক্ট প্রায় হব হব করছে।'

বিভাস বলল, 'শুনলুম।'

রুবি বলল, 'শুনেছেন তো? শুনবেন নিশ্চয়ই জানি। স্বামী স্ত্রীর দু'জনের চারটে কান যে কেন থাকে তা আমি ভেবে পাইনে। দুটো কান থাকলেই তো দিব্যি কাজ চলে যায়। যাকগে। আপনার মতামতটা কি?'

বিভাস কাগজ সরিয়ে রেখে নিজের কাপটা সামনে টেনে নিয়ে বলল, 'বেশ তো, নামুন না।'

রুবি বলল, 'আপনার আপত্তি নেই তাহলে?'

বিভাস বলল, 'না, আপনি সিনেমায় নামবেন, তাতে আপত্তির কি আছে!'

রুবি ভেবেছিল বিভাস সিনেমার বিরুদ্ধে একরাশ হিতোপদেশ দেবে। তা না শুনে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হ'ল।

রুবি বলল, 'ও, আমি নামব বলেই আপত্তি নেই, উমা নামতে চাইলে আপত্তি করতেন বুঝি?'

বিভাস রুবির দিকে তাকাল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না, তাও করতাম না। ওর যদি পার্টস থাকত, যদি বুঝতাম অভিনয়-শিল্পের ভিতর দিয়ে ও আত্মপ্রকাশ করতে চায়, তাহলে নিশ্চয়ই আমি ওকে তাতে সাহায্য করতাম!'

রুবি ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'ফের সেই শক্ত শক্ত কথা। আত্মপ্রকাশ!'

বিভাস একটু হাসল, 'আত্মপ্রকাশ তো শক্ত বটেই।'

রুবি বলল, 'আত্মপ্রকাশ-ট্রকাশ কিছু বুঝিনে। আমার টাকার দরকার। টাকা চাই, তাই সিনেমায় কাজ করতে চাই।'

বিভাস একটু আহত ভাবে বলল, 'শুধু টাকার জন্যে?'

রুবি বলল, 'নিশ্চয়ই। আপনি যে সারাদিন অফিসে কেরাণীগিরি করেন, তা কিসের জন্যে শুনি? টাকার জন্যে নয়? তার মধ্যে কত পার্সেন্ট আত্মপ্রকাশ আছে বলুন তো?'

বিভাস বলল, 'কিছু পার্সেন্ট আছে বই কি। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে নিজেকে আমরা আরো বেশি করে এক্সপ্রেস করতে চাই।'

রুবি বলল, 'মিথ্যে কথা। সমস্ত শিল্প-সাহিত্যের মূলেও ওই একই অর্থ আর যশ। আপনি যাকে এক্সপ্রেসন বলেছেন, আমি তাকে বলি একজিবিসন। আত্মপ্রকাশ নয়, আত্মপ্রদর্শন।'

বিভাস চুপ করে রইল। এর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। প্রতিবেশিনী হয়েও এ মেয়েটি একেবারে বিপরীত মেরুবাসিনী। কিছুতেই কাছাকাছি হবার সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু মেয়েটি কি সত্যিই নিজের বক্তব্যে বিশ্বাস করে? নাকি অন্যের বিশ্বাসকে ভাঙবার দিকে ওর ঝোঁক বেশি। ও যেন পণ করেছে সংসারে যা কিছু শুভ, যা কিছু ভালো বলে অখ্যাত, তাকেই ও ভেঙে টুকরো টুকরো করবে। ওর কোন উক্তি, কোন যুক্তিই বিভাসের মনের মত নয়, কিন্তু বলবার ভঙ্গিটি বড় সুন্দর। ও যখন উত্তেজিত হয়, বেশ দেখায়। বড় মনোহর ওর এই রুদ্রাণী রূপ।

রুবি বলল, 'ব্যাপার কি, চুপ করে রইলেন যে? না, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করেও সুখ নেই। আচ্ছা উমা, এমন স্বামী নিয়ে কি করে ঘর করিস বলতো? তোদের বুঝি ঝগড়াঝাঁটি কিছু চলে না? একেবারে অবিচ্ছিন্ন যে মিলন সে তো বিরহের মতই। মাঝে মাঝে দাম্পত্য কলহ না হলে—'

উমা হেসে বলল, 'যা বলেছিস। তোর সঙ্গে পরামর্শ করে এবার একটা বড় রকমের কলহ-টলহের তোড়জোড় করতে হবে।'

'মাজী, কাপড়া।' দোরের কাছে উড়ে ধোপা নীলমণি এসে দাঁড়িয়েছে। রুবির কথার জবাবে একটু হেসে উমা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ধোপার খাতাটা হাতে নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তোমাকে নিয়ে আর পারব না বাপু। পরশু না কাপড় দেওয়ার কথা ছিল। ফি সপ্তাহেই তুমি যদি এমন দেরি কর, আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

খাতা খুলে কাপড়ের হিসাব মেলাতে বসল উমা।

গম্ভীর হয়ে বিভাস জবাব দিল, 'কিন্তু সবরকম দাম্পত্য কলহই কি ভালো?'

চোখাচোখি তাকাল দু'জনে। একটু আরক্ত হ'ল রুবির মুখ। বিভাস কি বলতে চায়, কি জানতে চায়, তা সে বুঝতে পেরেছে।

একটু চুপ করে থেকে রুবি বলল, 'কলহ যখন হয়, তখন ভালো মন্দের অত চুলচেরা হিসেব করে হয় না। যাকগে, আমাদের যা আলোচনা হচ্ছিল—তাহলে সিনেমার

কনট্রাক্টটা করে ফেলি, কি বলুন? আপনার ভাষায় যদি আত্মপ্রকাশটা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়, যশ অর্থ দুইই হবে।'

বিভাস কোন জবাব দিল না।

রুবি যেন নিজের মনেই বললে, 'দেখি দিনকয়েক ঘোরাঘুরি করে যদি ভালো লাগে, তাহলে থাকব, না হলে চলে এলেই হবে।'

বিভাস মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, তাহলে তো কিছুই হবে না। যশই চান, আর অর্থ ই চান, আপনাকে লেগে থাকতে হবে।'

রুবি বলল, 'ওইটে পারব না। লেগে থাকা-টাকা আমার স্বভাবের মধ্যে নেই। পৃথিবীর সব জিনিস দেখে বেড়াব, সব জিনিস চেখে বেড়াব, এই আমার ইচ্ছে। পেশা বদলাব পোশাক বদলাব আর রোজ রোজ নিজেকে বদলাব। নিত্য নতুন জগৎ, নিত্য নতুন জন্ম এক জন্মে—হাজার জন্মের স্বাদ নিয়ে তবে মরব।'

বিভাস একটু হাসল, 'বদলানো কি অত সহজ? শুধু কি মুখের কথায় অমন করে জন্মান্তর গ্রহণ সম্ভব হয়? যে বৈচিত্র্যের কথা বললেন, তার স্বাদ কতক্ষণ থাকে? যতক্ষণ জিভের ওপর কথাটুকু থাকে ততক্ষণ; তারপর ফের সব বিস্বাদ হয়ে যায়।'

রুবি অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'দেখুন অমন করে ভয় দেখাবেন না। পুলিশী আর মাস্টারী ছাড়া কি আপনি আর কিছু করতে জানেন না? আর্টিস্টের মত কথা বলুন তো? আর্টিস্ট হন দেখি।'

বিভাস রুবির দিকে তাকাল, 'আমি তো আর্টিস্ট নই। আর্টিস্টের মত কথা আমার মুখ থেকে কি করে বেরুবে বলুন। আর্টিস্ট কি ঠিক হতে চাইলেই হওয়া যায়। আমি তো পারলাম না। সুর বলুন, রঙ বলুন, ভাষা বলুন—নিজেকে প্রকাশ করবার মত কোন মিডিয়মই তো আমার নেই।'

রুবি বিস্মিত হয়ে বিভাসের মুখের দিকে তাকাল। এ তো ঠিক মাস্টারের ধমক নয়। এ যেন অবলম্বনহীন কোন বন্দী মূক শিল্পীরই আত্মবিলাপ। এ বিলাপ জাতশিল্পীরও। মাধ্যম ঠিক পেয়েও পাওয়া যায় না, মুঠির ভিতরে এসেও সে বার বার পালায়, বার বার ছেড়ে যায়।

রুবি একটু চুপ করে রইল। তারপর ফের হালকা সুরে বলল, 'বাঁচা গেল আপনি আর্টিস্ট হননি। নিজেও বেঁচেছেন, পাড়া-পড়শীদেরও বাঁচিয়েছেন।'

বিভাস বলল, 'কি রকম?'

রুবি বলল, 'দেখুন আর্ট-এর ওপর আপনার যেমন শ্রদ্ধা আছে, আমার তেমন নেই। এই সব ছোটখাট মেজ সেজ আর্টিস্টদের ওপর তো নেইই। আমার কি মনে হয়

জানেন ? সাধারণ একজন আর্টিস্ট হওয়ার চাইতে সাধারণ একজন সৎ গৃহস্থ হওয়া অনেক ভাল। তার মধ্যে আর কিছু না হোক সুস্থ আত্মস্থ একজন ভদ্রলোককে পাওয়া যায়। সাধারণ আর্টিস্টদের মধ্যে যা মেলে না।'

রুবির মুখে সুস্থ আত্মস্থতার কথা শুনে বিভাস একটু বিস্মিত হল। বলল, 'তা মিলবে না কেন ?'

রুবি যেন নিজের মনেই বলল, 'মিলল তো না।'

বিভাস চুপ করে রইল। অপ্রীতিকর কোন পূর্বঅভিজ্ঞতা যেন রুবির মুখে ছায়া ফেলেছে।

একটু বাদে রুবি ফের মুখ তুলল, 'মেলে না। এই সাধারণ আর্টিস্টের মত এমন অসাধারণ দাম্ভিক হিংসুটে ছোট নীচ প্রকৃতির মানুষ আমি আর দেখিনি। একটু লিখতে পারেন, একটু আঁকতে পারেন, একটু গাইতে পারেন, তবে আর কি ; তাই নিয়ে আত্মপ্রসাদের সীমা নেই, সীমা নেই অহঙ্কারের। একটু সুরে, একটু রঙে, কি কলমের একটু আঁচড়ে যেন জীবনের সব দোষ ঢাকা পড়ে যায়, সব দুর্বলতা, সব অক্ষমতা চাপা পড়ে।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু—'

রুবি তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু তা ঠিক চাপা পড়ে না বিভাসবাবু, অনেক আর্টিস্ট আবার তা চাপতে চানও না। সেই কলঙ্কই যেন সব, সেই অসম্পূর্ণতাই যেন তাঁদের অহঙ্কার, তাঁদের অলঙ্কার। তার ওপরই তাঁরা রঙ মাখান, তাই নিয়েই তাঁরা ছন্দ গাঁথেন। আশ্চর্য !

আর্টিস্টদের নিন্দায় বিভাস মনে মনে একটু খুশি না হয়ে পারল না। সেই সঙ্গে একথাও অনুভব করল, রুবির ব্যবহারিক জীবনের যত অমিতাচারই থাক, সুস্থ সম্পূর্ণতার একটা অস্পষ্ট আদর্শ প্রচ্ছন্নভাবে ওর মনের মধ্যে আছে। আর তার সঙ্গে মিল আছে বিভাসের। সেই তিল প্রমাণ মিলের কল্পনা তার সমস্ত মনকে রঞ্জিত করে তুলল।

এবার বিভাস একটু তরল স্বরে বলল, 'অথচ এত সব জেনেও আপনি আমাকে আর্টিস্ট হতে বলছিলেন ?'

রুবি ভ্রূভঙ্গি করে বলল, 'বলছিলাম নাকি ? ওমা কখন বললাম ! কই মনে পড়ছে না তো ? এই আমার মস্ত দোষ। এক মুহূর্তে যা বলি, পরের মুহূর্তে তা মনে রাখতে পারিনে।'

বিভাস বলল, 'আর সেইজন্যেই বার বার নিজের কথা contradict করেন।'

রুবি বলল, 'করি নাকি ? তা করলামই বা। নিজেকে repeat করার চেয়ে নিজেকে contradict করা ঢের মজার। It is more interesting।'

ধোপার কাপড় মিলিয়ে, ডেয়ারীর সাইকেল-আরোহী ছোকরার কাছ থেকে দুধ রেখে, আরো টুক-টাক দু' একটা ঘরের কাজ সেরে উমা দু'তুবার এসে ঘুরে গেছে। রুবির সঙ্গে বিভাসের আলোচনার শেষই হয় না মোটে। এবার বাজারের পুরনো থলিটা হাতে করে সোজা স্বামীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে উমা রুষ্টভাষায় বলল, 'ছুটির দিন বলে শুধু কি গল্প করলেই পেট ভরবে? বাজার-টাজার করতে হবে না আজ?'

হঠাৎ রসভঙ্গ হওয়ায় বিভাস প্রথমে একটু অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল। তারপর তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে হেসে বলল, 'করতে তো হবেই। কি কি আনতে হবে বল?'

উমা রুবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন, আমি বলব কেন? এতক্ষণ ধরে যে এত কথা বলল সে বলতে পারে না?'

রুবি হেসে বলল, 'খুব যে ভয় দেখাচ্ছিস। পারব না কেন। সে বুঝি আর ঘর সংসার করে খায় না। কি কি আনতে হবে আমার কাছে শুনুন বিভাসবাবু। তরকারী, পান আর মাছ, মাছটা যেন খুব বড় আর তাজা হয়।'

বিভাস বলল, 'তা হবে, সেই সঙ্গে আপনার নিমন্ত্রণটাও হয়ে যাক।'

বিভাসের গলায় উল্লাস ফুটে উঠল। কিন্তু রুবি আড়চোখে দেখল উমার মুখে গাম্ভীর্য থমথম করছে। কিসের যেন একটা ছায়া পড়ল রুবির মুখে। বিভাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিমন্ত্রণ থাক বিভাসবাবু। কারো নিমন্ত্রণ আমার সয় না।'

কাউকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রুবি উমাদের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

প্রবীণ পরিচালক প্রমথ দত্ত কিছুদিন রুবির সঙ্গে আলাপ করলেন, চা খেলেন। নিজের নির্জন ফ্ল্যাটে একদিন সন্ধ্যাবেলার চা-খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে সিনেমা-শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে রুবির সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনাও করলেন। তারপর বললেন, 'দেখুন, আমার হাতে তো এখন কোন ছবি নেই। পার্টি আসছে আর পিছিয়ে যাচ্ছে। এ-লাইনে capital এত shy হয়েছে যে বলবার নয়। ইস্ট পাকিস্তানের মার্কেট বন্ধ হবার পর থেকে ইণ্ডাস্ট্রিটা একেবারে গেছে।'

বেশ সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম। মেঝের ওপর গালিচা পাতা। নানা ধরনের চেয়ার সোফা কৌচে সাজানো। দেয়ালে খ্যাতনামা বিদেশী ডিরেক্টার আর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ফটো।

রুবি বলল, 'কিন্তু এ ইণ্ডাষ্ট্রিকে যেতে দিলে তো চলবে না। একে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

প্রমথবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আলবাৎ রাখতে হবে। জানেন এতদিন শুধু কাগজের ওপর সাহিত্য চর্চা চলেছে। কিন্তু এই প্রায় নিরক্ষর দেশে সেই আক্ষরিক সাহিত্য, সেই আক্ষরিক সংস্কৃত ক'জন লোকের কাছে পৌঁছল? এখন থেকে we shall write on celluloid; এই সিনেমাই হবে সত্যিকারের লোক-শিল্প, লোক-সাহিত্য। ওকি, আপনি বেছে বেছে ওই শক্ত চেয়ারটার ওপর বসেছেন কেন! এই সোফাটা নিন না।'

প্রমথবাবু তাঁর সবচেয়ে কাছের আসনটা দেখিয়ে দিলেন।

রুবি সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল না; বলল, 'এই বেশ আছি, আপনি বলুন।'

প্রমথবাবুরমুখে একটু যেন কাঠিন্যের ছাপ লাগল। অপমানের ছোঁয়াচ লাগল মনে। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে স্মিতমুখে বললেন, 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম—'

রুবি বলল, 'বলছিলেন লোক-সাহিত্যের কথা। কিন্তু লোককে আপনারা দিচ্ছেন কি? সস্তা সেন্টিমেণ্ট আর সেক্স এ্যাপীল—'

প্রমথবাবু বললেন, 'এই ধরতাই বুলিগুলি আপনারও জানা আছে দেখছি। কিন্তু আপনাকে যদি একজন ডিরেক্টরের আসনে বসিয়ে দেওয়া যায়, দেখবেন আপনিও এই সব দিচ্ছেন। এ বড় vicious circle। প্রডিউসারের পয়সাটা যাতে ঘরে আসে, সে-ব্যবস্থা ছবির মধ্যে আপনাকে রাখতেই হবে। না হলে এখানে আপনি টিকতেই পারবেন না। You will be kicked out.—কোন সুযোগই পাবেন না আপনি, তখন কোথায় থাকবে আপনার উন্নতি, প্রগতি আর শিক্ষা-সংস্কৃতি। একটু একটু করে দেশের রুচি বদলাতে হবে। কেবল দিলেই তো হবে না, তাদের নিতেও শেখান চাই। তিল থেকে রাতারাতি তাল গাছ বেরুবে না।'

রুবি বলল, 'আচ্ছা আপনার কি মনে হয় না, এই সস্তা সিনেমা-শিল্প মানুষের শিল্প-বোধকে নামিয়ে আনছে, উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের আদর কমে যাচ্ছে এর জন্যে। আগেকার সাধারণ লেখাপড়া জানা আমাদের মা ঠাকুরমারাও ঘরে বসে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা উপভোগ করতেন। এখন মা ঠাকুরমা তো দূরের কথা, বাপ-দাদা ভাই-বোনেদের মধ্যেই বা ক'জন বঙ্কিমচন্দ্র পড়েন? একটা অতি বাজে জোলো সিনেমা-সংস্করণ দেখে দুধের সাধ সবাই মিলে ঘোলে মিটিয়ে আসেন।'

প্রমথবাবুকে একটু যেন অসহিষ্ণু দেখাল, সুন্দর সৌখীন এ্যাসট্রের মধ্যে চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'আমাদের দেশের ভাল সাহিত্যের যদি ভাল রিপ্রেজেণ্টেশন

না হয়ে থাকে, সে-দোষ তো আর সিনেমা-শিল্পের নয়। যাঁরা ভালো করে করতে পারলেন না সে দোষ তাঁদের। দেখুন এর মধ্যে অনেক element আছে। প্রচুর টাকা চাই, সময় চাই, experiment করবার সুযোগ চাই, ব্যাপারটা তো একজনের নয়, এ একটা group art। আমার একজন সাহিত্যিক বন্ধুকেও সেদিন এই কথাই বলছিলাম। কেবল সাহিত্য আর সাহিত্য। আরে art-এর form হিসাবে সাহিত্য কি চিরকাল ছিল, না চিরকাল থাকবার বর নিয়েই সে এসেছে? মানুষের যেদিন অক্ষরজ্ঞান ছিল না, তখনও মানুষ কাঠ কুঁদে, পাথর কুঁদে মূর্তি গড়েছে; গুহা-গহ্বরের দেয়ালে ছবি এঁকেছে, তখন সেই সব formই ছিল প্রধান।'

রুবি বলল, 'সে তো অতি আদিকালের কথা।'

প্রমথবাবু বললেন, 'উত্তরকালেও যে তাই হবে না কে বলতে পারে। হয়ত অক্ষর-শিল্প, ভাষা-শিল্প কালে কালে অপ্রধান এমনকি obsolete হয়ে যাবে। যদি অন্য কোন শিল্প তাকে replace করে, তাতে আক্ষেপের কি আছে?'

রাত হয়ে যাচ্ছিল, রুবি ব্যক্তিগত কথায় ফিরে এল। 'মক্ষীরাণী' নামে যে আপনি একটা নতুন ছবি করছেন, তাতে আমাকে নেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। সেটার—'

প্রমথবাবু বললেন, 'না, ও ছবিতে সুবিধে হোল না। casting সব শেষ হয়ে গেছে। পরের ছবিতে বরং আপনাকে একটা চান্স দিতে চেষ্টা করব। অবশ্য ততদিন যদি আপনার আগ্রহ আর উৎসাহ বজায় থাকে তবেই। আসবেন মাঝে মাঝে।'

প্রমথবাবু বিদায় নমস্কার জানালেন।

বেরিয়ে এসে রুবির অনুশোচনা হতে লাগল। এমন করে চান্সটা হাত ছাড়া হবে সে আশঙ্কা করেনি। আগে যদি জানত গোড়া থেকে না হয় পরিচালকের আর একটু মনস্তুষ্টির চেষ্টা করত। সিনেমার পক্ষ সমর্থন করে কথা বলত। হোল না। রুবির জায়গায় যে চান্স পেল সেও রুবির মত নতুন। হয়ত রুবির চেয়ে একটু কমবয়সী। মুখখানা কাঁচা কাঁচা। কিন্তু কাজ বাগাবার পক্ষে খুবই পাকা। প্রতিযোগিতায় হেরে গেল রুবি। এই পরাজয়ের দুঃখ তাকে স্থির থাকতে দিল না।

খোঁজ খবর নিতে নিতে আরো একটা সোর্স বেরিয়ে পড়ল। সদ্যমুক্ত 'মায়ামৃগ' ছবিতে যে প্রতিনায়কের ভূমিকায় নেমে যশস্বী হয়েছে, সেই সুবিমল মুখুয্যে রুবির চেনা। স্কটিশে পড়েছে একই সঙ্গে। ঠিকানা যোগাড় করে তাকে চিঠি লিখল রুবি। সুবিমল পরিচয় স্বীকার করে জানাল, 'স্টুডিওতে এসো। আমার আর একটা ছবির স্যুটিং হচ্ছে। ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আরো অনেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হবে। এতদিন চুপচাপ কি করছিলে, সিনেমাই তো তোমার লাইন।'

উৎসাহিত হয়ে পরদিনই রুবি টালিগঞ্জের ট্রাম ধরল।

সুবিমলের চেহারায় বিশেষ কোন বদল হয়নি। লম্বা ছিপছিপে শরীর। ফর্সা রঙ। ব্যাক ব্রাস করা চুল। চোখ মুখের চাতুর্য আরো যেন বেড়েছে।

সুবিমল রুবিকে আপ্যায়ন করে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'বয়সটাকে একটা দিনও বাড়তে দাওনি দেখছি।'

রুবি বলল, 'আমিও তো সেই কথাই বলছিলাম।'

প্রৌঢ় ডিরেক্টরও রুবির সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হলেন, বললেন, 'এ লাইন তো আপনাদের জন্যই। আপনারা শিক্ষিত ভদ্র ঘরের মেয়েরা যত এখানে বেশি করে আসবেন, তত এখানকার atmosphere বদলাবে।'

সুবিমল বলল, 'মিস রায়কে এই ছবিতে একটা চান্স দিতে হবে মিঃ মল্লিক।'

মিঃ মল্লিক টেকো মাথা চুলকে বললেন, 'এই ছবিতে? কিন্তু সে বড় শক্ত ব্যাপার সুবিমলবাবু। আচ্ছা দেখি প্রডিউসারকে বলে টলে।'

সুবিমলের প্রভাব যথেষ্টই আছে দেখা গেল। সে শুধু ছবির একজন প্রধান অভিনেতা নয়, মিঃ মল্লিকের প্রিয় সহকারীও। একদিন তাঁর গাড়িতে করে সুবিমল আর রুবি গঙ্গার তীর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বেড়িয়ে এল। চা খেল আউটরাম ঘাটের কাফেতে।

দিন কয়েক আলাপ পরিচয়ের পরে কনট্রাক্ট জুটল একটা। টাকা কম। পার্টও খুব ছোট। নিম্ন-মধ্যবিত্ত দরিদ্র কেরাণীর ঘরের সাধ্বী স্ত্রী। গুটি দুই ছেলেমেয়ের লালন-পালন, স্বামীর সঙ্গে দৈনন্দিন মিলন-কলহের চিত্র।

রুবি ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'বেছে বেছে এই পার্ট দিলে আমাকে?'

সুবিমল হেসে বলল, 'তাতে কি, উর্বশীরাই গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকায় ওস্তাদ বেশি, তা ছাড়া তোমার একেবারে অভিজ্ঞতা না আছে তাতো নয়। বিয়ে-টিয়ের মত কি যেন একটা ঘটেছিল তোমার।'

আশ্চর্য, খবরটা কি সবাই জানে! খবরটা কি কেউ ভোলেনি?

রুবি সংক্ষেপে বলল, 'সেটা অঘটন।'

পরম উৎসাহে কাজে লেগে গেল রুবি। যেদিন স্যুটিং বন্ধ থাকে, সুবিমলের বাড়িতে যায় রিহার্সেলের জন্য। রাত হয়ে গেলে সে ওকে পৌঁছে দিয়ে যায়।

বিভাসের ঘরে আর আলোচনার বৈঠক বসে না। কারবর সময় নেই। উমা একদিন ঠাট্টা করে বলল, 'খাল কেটে কুমীর ঘরে আনলে, তুমিই তো পরামর্শ দিয়েছিলে সিনেমায় ঢোকার। অবশ্য তুমি নিষেধ করলেও যে খুব বেশি সুবিধে হোত তা নয়।'

বিভাস গম্ভীর হয়ে বলল, 'হুঁ।'

রুবি কিন্তু উমার সঙ্গে ফের মেলামেশা স্থরু করল। অবসর মত এসে এসে ওর ঘর-গৃহস্থালী দেখে। আদর করে কোলে নেয় বাবলুকে। খাওয়ায়, কাজল পরায় চোখে।

উমা অবাক হয়ে বলল, 'ব্যাপার কি, আমার বাবলুর কপালে যে এত স্থখ। ওদিকে বাবলুর বাবা যে মুখভার করে মনের দুঃখে বনে বনে ফিরছে। একটু ফিরেও দেখতে নেই বুঝি।'

রুবি বলল, 'ওরে বাবা, ফিরে দেখলে তুই আমার চোখ কানা করে ফেলবিনে? আমি ঘরকন্না আর মাতৃস্নেহের রিহার্সেল দিচ্ছি উমা। দেখ তো হচ্ছে নাকি?' উমাকে নিজের ভূমিকার ধরনটি বুঝিয়ে বলল।

উমা হেসে বলল, 'ও, রিহার্সেল, তাই বল! তা ছেলে নিয়েই শুধু ঘরকন্না হয় না। ছেলের বাবার সঙ্গেও তো এক-আধটু রিহার্সেল দিতে হয়।'

রুবি মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, ভালো মানুষ দেখিয়ে দিলে! রিহার্সেল দেওয়ার যোগ্য লোকই বটে। হয়তো অভিনয়টাকেই কিছু একটা 'সত্যি' ভেবে বসবেন। আর বাবলুর মা আসবে লাঠি নিয়ে, তার চেয়ে বাবলু সোনাই আমার ভালো।' বলে আদর করে বাবলুর ঠোঁটে চুমু খেল। কিন্তু এ-যেন অভিনয়ের মহড়া বলে মনে হয় না। অদ্ভুত স্বাদ শিশুর তুলতুলে দুটি ঠোঁটের।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। বাবলুকে কোলে নিয়েই রুবি নিজের ঘরে ঢুকল। তারপর খিল খুলে দিল।

ডাক্তার দে। কালো মোটাসোটা ভদ্রলোক। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

'ছেলেটি কার?'

লজ্জিত হয়ে বাবলুকে তাড়াতাড়ি কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে রুবি বলল, 'পাশের ঘরের। এস, ভিতরে এস।'

ডাক্তার দে বললেন, 'সত্যি আসব?'

রুবি বলল, 'বাঃ এতদূর এসেছ কি বাইরে থেকে চলে যাবার জন্যে?'

ডাক্তার দে বললেন, 'এখন চলে গেলেই বুঝি ভালো হয়?'

রুবি বলল, 'তা কেন হবে? এসো, বসে বিশ্রাম করো।'

ডাক্তার দে ঘরে ঢুকে ঈজিচেয়ারটায় বসলেন। এই চেয়ারে এর আগেও অনেক দিন বসেছেন। কিন্তু আজকের আসনটা মোটেই স্থখাসন নয়।

রুবি বলল, 'অত উসখুস করছ কেন? চেয়ারে ছারপোকা আছে নাকি?'

ডাক্তার দে বললেন, 'ছারপোকা আছে, চেয়ারে নয়—তোমার জিভে।'

রুবি গম্ভীর মুখে বলল, 'আমার পোকা আমাকেই কুঁড়ে খাবে, তোমার তাতে কি।'

ডাক্তার দে বললেন, 'আজ এই কথা বলছ। কিন্তু ছারপোকার চেয়েও বড় পোকার উপসর্গ যখন ঘটেছিল, তখন আমারই কাছে ছুটে গিয়েছিলে—সে উপকারের কথা তুমি ভুলে গেছ ?'

রুবির চোখ জ্বলে উঠল, 'উপকার ? বিনা ভিজিটে উপকার করেছ তুমি ? দু'বছর ধরে তার শোধ নাওনি ?'

রুবির রুদ্রমূর্তি দেখে ডাক্তার দে একটু নরম হলেন, বললেন, 'একেবারে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করেছ যে ?'

রুবি শান্তভাবে জবাব দিল, 'কি করব বল, সময় হয়ে ওঠে না। একটা সিনেমায় কাজ করছি। তাই নিয়ে খুব ব্যস্ত।'

ডাক্তার দে বললেন, 'তা জানি। সেদিন দেখলাম ফর্সামত সুন্দরপানা একটি ছেলের সঙ্গে গাড়িতে করে ঘুরছ। ওইটিই বুঝি তোমার latest co-actor ?'

রুবি বলল, 'গাড়িতে নিয়ে ঘুরবার সুন্দরপানা ছেলের তো অভাব নেই। তুমি কোনটির কথা বলছ কি করে বুঝব ?'

ডাক্তার দে বললেন, 'বুঝেছ ঠিকই। সুন্দরপানা ছেলের অভাব নেই তা সত্যি। তোমার এখান থেকেই আরো ক'টিকে আমি নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে দেখেছি। তাদের কেবল মুখই রাঙা নয়, চোখও রাঙা। কিন্তু রাঙা রাঙা ছেলেরা একেক সময় বড় কুৎসিৎ কাজ করে বসে রুবি। এই আজকের কাগজেই দেখলাম ক্রা স্কুল স্ট্রীটে একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে খুন হয়েছে।'

রুবি মুহূর্তকাল ডাক্তার দে'র দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর অদ্ভুত হেসে বলল, 'তা খুন হলেও আমাকে তুমি বাঁচিয়ে তুলতে পারবে। যে ধন্বন্তরী ডাক্তার তুমি। সাধারণ সর্দিকাশিতে তাই তো তোমাকে আজকাল ডাকিনে। তোমার জন্যে সেই মারাত্মক দিনের প্রতীক্ষায় আছি। একটু বোসো, চা করে আনি।'

কিন্তু ডাক্তার দে মুখ কালো করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'না, চা আজ থাক। খুন হলে সত্যিই কিছু আর করতে পারব না। তবে যত ওঁছা ডাক্তারই হই, জখম-টখম হলে খবর দিয়ো, আসব। ভয় নেই, তোমার কাছ থেকে ভিজিট নেওয়ার প্রবৃত্তি আমার গেছে।'

ডাক্তার দে খোলা দোর দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

বালিশ বুকে চেপে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রুবি।

কেবল ঝগড়া, কেবল কলহ। কারো সঙ্গেই বনিবনা হচ্ছে না। পৃথিবী ভরে

কেবল শত্রু বাড়ছে। দিল্লী যাওয়ার আগে দিব্যেন্দুও ঝগড়া করে গেছে।' আজ ডাক্তারও গেল। অথচ অনেক অসুখ-বিসুখে ডাক্তার রুবিকে দেখেছে। ওষুধ পথ্য জুগিয়েছে। শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছে। সেই উপকারী বন্ধুকেও আজ বলতে হোল 'যাও'। ডাক্তারের এই উৎকট নগ্ন ঈর্ষা, আর এই অপমানকর কথাবার্তা রুবি কি করে সহ্য করবে? মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে গেল। যেন মৃত্যুকে সে ভয় করে। কাউকে ভয় করে না রুবি। মৃত্যুকেও না।

পুরুষদের এই পরস্পরের ঈর্ষার কথা ভেবে রুবি এর আগে ভারি মজা পেত। দুটি পুরুষ যখন তাকে উপলক্ষ করে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে, তখন যেন নিজের মূল্য বাড়ে, গৌরব বাড়ে। রুবির জন্য বন্ধুত্ব ভেঙেছে, শ্যালক ভগ্নীপতির মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে। দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে রুবি, মরুক ওরা। দাঁত আর নখের ব্যবহারে পশুর চেয়েও হিংস্র হয়ে উঠুক ওরা। কিন্তু আজকাল বড় ক্লান্তি লাগে। পুরুষদের এই কাড়াকাড়ি মারামারিটাও যেন বড় একঘেঁয়ে হয়ে গেছে। রুবির মনের সেই কৌতুকবোধ আর নেই। কৌতুকচ্ছটার মধ্যে দূষিত রক্তের ছিটে লাগে। আর ভালো লাগে না। আর ভালো লাগে না রুবির। সব ফের একঘেঁয়ে আর গতানুগতিক হয়ে যাচ্ছে। নতুন জগৎ, নতুন জন্ম, সে কোথায়?

পরদিন রুবির দাদা নিরঞ্জন এল সকালে। বলল, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। তোর খোঁজ নিতে এলাম।'

রুবি বলল, 'বোসো, বউদি ভালো আছে?'

নিরঞ্জন একটা চেয়ার টেনে গম্ভীর মুখে বলল, 'না ভালো কই। অসুখ-বিসুখে ভুগছে। খোঁজখবর তো আর নিবিনে।'

রুবি বলল, 'খোঁজখবর তোমরাই যেন কত নাও।'

খোঁচা খেয়ে নিরঞ্জন রেগে উঠল, 'খোঁজ নেওয়ার কি মুখ রেখেছিস যে নেব? আবার নাকি কোন একটা সিনেমায় নামছিস?'

রুবি একটু হাসল, 'এসব খবর তো খুব রাখছ। যদি নেমে থাকি তাতে দোষ কি?'

নিরঞ্জন বলল, 'না, তোর কিছুতেই দোষ নেই।'

রুবি বলল, 'নেইই তো, কত ভদ্রঘরের মেয়ে এতে কাজ করছে না আজকাল? এই বেকার-সমস্যার দেশে আয়ের একটা নতুন এভেনিউ যদি খুলে যায়, সে কি ভালো নয়?'

নিরঞ্জন বলল, 'হুঁ, কত ভালো যে শেষ পর্যন্ত থাকে তা জানতে আর বাকি নেই। যাক্ কথাটা তাহলে সত্যি?'

রুবি বলল, 'হুঁ।'

নিরঞ্জন বলল, 'মা বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না। তাঁর কাছে তো মেয়ের কোন দোষও নেই, কোনও অপরাধও নেই। লোকে কেবল তাঁর মেয়ের বিরুদ্ধে বানিয়ে বানিয়ে বলে। কিন্তু সিনেমার কথাটা অন্তত বানানো নয়।'

রুবি বলল, 'না, সত্যি।'

নিরঞ্জন ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে বলল, 'শুনে খুশি হলাম। ছবি released হলে একটা complimentary card পাঠাস। গিয়ে দেখে আসব।'

কিন্তু ছবি released হবার তর সইল না। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে এক কাণ্ড ঘটে গেল। অন্যদিনের মত আজও বিকেলে স্টুডিওর ড্রেসিং রুমে নিজের সিল্কের শাড়িটা বদলে নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের বউয়ের উপযুক্ত আটপৌরে আধময়লা একখানা পুরনো শাড়ি পরেছে, হাতে শাঁখা আর সিঁথিতে সিঁদুর পরে স্টুডিওর তৈরী স্বামীর ঘরে ঢুকবার জন্য সবে পা বাড়িয়েছে, সুবিমল এসে বলল, 'থাক, আর দরকার নেই, শাড়ি পালটে নাও রুবি, আজ স্যুটিং বন্ধ।'

রুবি বিস্মিত হয়ে বলল, 'সেকি, অন্য আর্টিস্টরা সব এসে গেছেন, আজ নাকি তোমাদের দুটো সট্‌ নেওয়া হবে; স্যুটিং বন্ধ মানে?'

সুবিমল গম্ভীর মুখে বলল, 'এসো, বলছি।'

তারপর সুবিমল যা বলল সে বড় নৈরাশ্যকর ব্যাপার। এ ছবির স্যুটিং যে শুধু আজই বন্ধ রইল তা নয়, কোনদিন যে আবার সুরু হবে তেমন আশাও কম। তিনজন অংশীদার মিলে নতুন কোম্পানী খুলেছিলেন। একজন টাকা দিয়েছেন। সর্তমত আর দু'জন দিচ্ছেন না, কেবলই গড়িমসি করছিলেন। এই নিয়ে অংশীদারদের মধ্যে ক'দিন থেকেই মনোমালিন্য চলছিল—আজ চূড়ান্ত বিরোধের ফলে একেবারে যবনিকা পড়ল। ডিরেক্টর মল্লিক যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন মিটমাটের। কিন্তু কাজ হয়নি। একজন অংশীদারের কোন পাত্তাই নেই। আর একজন অসুস্থতার অজুহাতে ঘরের বার হচ্ছেন না। এদিকে কোম্পানীর ব্যাঙ্ক ব্যালান্‌স একেবারে শূন্যে এসে ঠেকেছে। মিঃ মল্লিক তবু আজকের স্যুটিংটা শেষ করবার জন্য প্রডিউসারকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি চটে গিয়ে বলেছেন, 'না মশাই, আর একটি পয়সাও ব্যয় করবার শক্তি নেই আমার।'

আজ আর গাড়ি কি ট্যাকসীর ব্যবস্থাও হোল না। ট্রামেই উঠতে হোল সুবিমলের সঙ্গে।

ওর পাশে বসে হতাশ ভঙ্গিতে রুবি বলল, 'তাহলে এ-ছবির আর কোন আশাই নেই?'

সুবিমল সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'বলা শক্ত। যদি আর কারো কাছে বেচে দেওয়া যায়, যদি নতুন কোন ফাইন্যানসিয়ার জোটে। সবই সুদূর সম্ভাবনা। এখনকার মত তো সাত বাঁও জলের নিচে পড়ল।'

ধর্মতলার মোড়ে নামল দু'জনে।

সুবিমল রুবির মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি যে একেবারে মুষড়ে পড়লে দেখছি। চল একটু চা খেয়ে চাঙা হয়ে নেবে।'

রুবি বলল, 'না, এখন আর খাব না। কিছু ভালো লাগছে না সুবিমল।'

সুবিমল বলল, 'ভালো কি আমারই লাগছে? এই ছবিটার ওপর কত নির্ভর করেছিলাম আমি জানো? এই কন্‌ট্রাক্টের দোহাই পেড়ে পেড়ে কত যে ধার করেছি শুনলে তুমি শিউরে উঠবে। তোমার আর কি। দু'তিন দিনের স্যুটিংএ ক'টা টাকাই বা পেতে, আমার যা হোল—'

রুবি বলল, 'তা ঠিকই। আমি এবার যাই।'

সুবিমল বলল, 'যাবে মানে? একটু চা-টা না খেয়ে কি যাওয়া যায় নাকি? আরে লোকসান তো সবারই হোল। সেই লোকসান ভুলে থাকবার জন্যেও তো কিছু একটা চাই। চল একটু ঠোঁট ভিজিয়ে নেবে। এর পর কবে আবার দেখা সাক্ষাৎ হবে, কে কোথায় ছিটকে পড়ব—'

রুবি ক্লান্ত, একটু বা বিরক্ত হয়ে বলল, 'না সুবিমল। আজ আর কিছু ভালো লাগছে না আমার।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল রুবি।

সুবিমল একটুকাল রুবির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'হুঁ, আচ্ছা যাও। কিন্তু যদি উন্নতির আশা থাকে নগদ বিদায়ের দিকেই শুধু চোখ রেখ না। ভবিষ্যৎ বলেও একটা জিনিস আছে। তা ছাড়া চা-টা তোমার আমার কাছে এমন কিছু নতুন পানীয় নয়। ওটা ভালো লাগলেও খেতে হয়, না লাগলেও খেতে হয়, এই দস্তুর।'

রুবি বলল, 'তোমার অনুরোধটা রাখতে পারলাম না, কিন্তু উপদেশটা মনে থাকবে সুবিমল। আচ্ছা, আজ চলি।'

চলন্ত বাসটা থামিয়ে রুবি হাতল ধরবার জন্য হাত বাড়াল।

পৌষের মাঝামাঝি থেকেই সহরে ব্যাপকভাবে বসন্ত সুরু হয়েছিল। সমস্ত মাঘ মাসটায় তার প্রকোপ আর প্রসার দুই-ই বাড়ল। বিভাসদের বাড়িটা এ পর্যন্ত বাদ ছিল। কিন্তু এবার আর রেহাই পেল না। প্রথমে সুরবালাকে নিয়ে সুরু

হোল। বিভাস তাঁকে আলাদা ঘরে মশারীর আড়ালে সতর্কভাবে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে বলল, 'খবরদার পিসীমা, নড়া চড়া করে অনুগ্রহটা আর বেশি ছড়িয়ো না।'

সুরবালা বললেন, 'না রে না। আমি রাতদিন মাকে ডাকছি, মা আমাকে তুমি এক টান দিয়ে নিয়ে যাও, কিন্তু ওদের যেন কারো কিছু না হয়।'

বিভাস মশারীর বাইরে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বলল. 'তুমি ভয় পেলে নাকি পিসীমা? এতে টানাটানির কিছু নেই। সাধারণ চিকেন পক্স্। দিন কয়েক শুইয়ে রাখবে মাত্র। কোন ভয় নেই তোমার।'

সুরবালা বললেন, 'আমার আবার ভয় কিসের রে! তোদের সামনে যদি চোখ বুজতে পারি সে তো আমার—'

কিন্তু ওঁর গলার স্বর শুনেই বিভাস আর উমা দু'জনে বুঝতে পারল ভয় পেয়েছেন তিনি। পাড়ায় স্মল পক্সে কালও একটি লোক মারা গেছে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে স্ত্রীকে প্রায় মিনিট পনের উপদেশ দিয়ে বিভাস অফিসে চলে গেল।

পিসীমার জন্যে ফল টল নিয়ে একটু সকাল সকাল ফিরে এসে দেখল, উমা নড়ে চড়ে বিকেলের কাজ সারছে বটে কিন্তু ওর চোখ-মুখের অবস্থা মোটেই ভালো না। কেমন যেন ছলছল করছে।

বিভাস একটু উদ্বিগ্ন ভাবে স্ত্রীকে কাছে ডেকে বলল, 'তোমার রকম সকম তো সুবিধে মনে হচ্ছে না, এসো দেখি এদিকে।'

উমা একটু এগুলো, কিন্তু একেবারে কাছে গেল না। মৃদু হেসে বলল, 'থাক, তোমার আর ছুঁয়ে দরকার নেই। তারপর গলায় একটু স্বর মেশাল, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু ওইখানে থাকো। আমারও দুটি একটি বেরিয়েছে।'

বিভাস ধমকের সুরে বলল, 'বেরিয়েছে তো, ওইগুলি নিয়ে ফের হাঁটা চলা করছ কেন? যাও এক্ষুনি শুয়ে পড়। একটা কাণ্ড না বাধিয়ে তুমি ছাড়বে না!'

স্বামীর আন্তরিক উদ্বেগে উমা ভারি খুশি হলো। অন্য সময় যতই রূঢ় আর উদাসীন ব্যবহার করুক না, উমার সামান্য একটু অসুখ-বিসুখ হলেই বিভাস একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে! সেই অস্থিরতাটুকু মনে মনে খুব উপভোগ করে উমা। বেশ লাগে নিজের জন্য আর একজনের ব্যাকুলতা।

বিভাসের কথার জবাবে উমা বলল, 'শুয়ে পড়লে কাজ-কর্ম কে করবে শুনি। পিসীমাকে পথ্য দিতে হবে না! বাবলুকে খাওয়াতে হবে না? তা' ছাড়া রান্নাবান্না না করলে তুমিই বা খাবে কি রাত্রে? যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে

পারছি ততক্ষণ তো করি, তারপর না হয় তোমার ডাক্তারী উপদেশ শুয়ে শুয়ে শুনবো।'

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা উমার পক্ষে বেশিক্ষণ সম্ভব হোল না। একদিকে স্বামীর ধমক, আর একদিকে জ্বরের প্রকোপ দুইয়ের মাত্রাই সমান ভাবে বেড়ে চলল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিছানা নিতে বাধ্য হোল উমা।

সুরবালা বললেন, 'যা ভয় করেছিলাম। এখন তোর ভাত জল চলবে কি করে? শ্বশুরকে একটা খবর দে। বেয়ানকে পাঠাক দিন কয়েকের জন্যে।'

উমা মশারীর ভিতর থেকে বলল, 'মা কি করে আসবে! এই তো তার মাস। কবে না কবে হাসপাতালে যায় তার ঠিক নেই। তোমাকে ফোন করে খবর নিতে বলেছিলাম। করেছিলে?'

বিভাস বলল, 'না ফোন করবার আমার সময় হয়নি। তোমাদের ভাবনা নেই, আমি যতক্ষণ না পড়ছি, কারো পথ্য বন্ধ হবে না।'

উমা অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'তুমি জোগাবে পথ্য জল। তা'লেই হয়েছে।'

স্ত্রীর সঙ্গে বাজি রেখে রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে গেল বিভাস। কিন্তু বাজি রাখা যত সহজ কাজে হাত দেওয়া তত সহজ নয়। ফিরে এসে অপটুর মত দু'-একটা প্রশ্ন করতেই উমা বলল, 'শোন, এক কাজ কর। আমাদের ঠিকে ঝিটিকে ডেকে নিয়ে এসো। ঠিকানা দিচ্ছি। বেশি দূরে নয়। সে এসে আজকের মত তোমার ডাল ভাতের ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবে। তারপর কালকের ব্যবস্থা কাল।'

বিভাস বলল, 'হুঁ, এই রাত্রে আবার যাব ঝি খুঁজতে! তার চেয়ে নিজে যা পারি তাই করব।'

নতুন উদ্যমে ফের রান্নাঘরে গেল বিভাস। উনানে কয়লা সাজাল। সকালের গোটা খবরের কাগজটা আর আধ বোতল কেরোসিন তেল শেষ হোল কিন্তু উনান আর ধরে না। এদিকে ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

উনান ধরাবার তৃতীয়বার উদ্যোগ করছে বিভাস, সদর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। বিরক্ত হয়ে কয়লা মাখা হাতে বিভাস দরজার হুড়কো খুলে দিল।

রুবি। কালো রঙের একখানা শাড়ি সর্বাঙ্গে সাপের খোলসের মত জড়ানো। গালে মুখে পাউডারের সেই অতি স্পষ্ট প্রলেপ।

অন্যদিন দোর খুলে দিলে রুবি দু'-একটা কথা বলে, কি সৌজন্য দেখিয়ে মৃদু একটু হাসে, কিন্তু আজ তার মুখ গম্ভীর, আজ সে বড়ই অন্যমনস্ক। এই খানিকক্ষণ আগে সুবিমলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছে সে। এত পরিশ্রম, এত ঘোরাঘুরি সব বৃথা

হোল। অর্ধপথে বন্ধ হোল সুটিং। টাকার অঙ্ক অবশ্য বেশি নয়। কিন্তু রুবি কি শুধু টাকাটারই হিসাব করেছিল? পর্দায় নিজের মুখ কেমন দেখায়, নিজের গলা কেমন শোনায়, কেমন লাগে নিজের অঙ্গভঙ্গি, তা দেখবার—দশজনকে তা দেখাবারও কি প্রত্যাশা ছিল না? কিন্তু সব নষ্ট হোল। একটার পর একটা কেবল আশাভঙ্গ, কেবল নৈরাশ্য। প্রতিকূল ভাগ্যের পরিহাস! শেষ পর্যন্ত কি ভাগ্যকেও বিশ্বাস করবে নাকি রুবি! না কাউকে বিশ্বাস নেই, কিছুতে বিশ্বাস নেই। অবিশ্বাস আর অবহেলা এই তার অমোঘ অস্ত্র।

কোনদিকে না তাকিয়ে রুবি সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। এই অশিষ্ট স্বার্থপর মেয়েটির দিকে একবার রুষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে বিভাস ফের এসে বসল উনানের সামনে।

রুবিরও ক্ষুধা পেয়েছে। ক্ষুধার চেয়ে তৃষ্ণা বেশি। সুবিমলের চায়ের অফারটা রিফিউজ না করলেই ভালো ছিল। কি আর এমন হ'ত। এখন স্টোভ জেলে চা করবে কে। অনিচ্ছা, আলস্য আর ক্লান্তি যেন একসঙ্গে জড়ো হয়েছে। কিন্তু যেমন করেই হোক একটু চা খেতেই হবে। কেটলীতে জল ভরে উমার উনানে গরম করতে এল রুবি।

কিন্তু বিভাসের উনান তখনো ধরেনি।

রুবি এবার অবাক হয়ে বলল, 'একি আপনি যে! উমা কই?'

বিভাস নীরসকণ্ঠে বলল, 'তার পক্স্ হয়েছে।'

রুবি বিরক্ত হয়ে বলল, 'সর্বনাশ, তারও পক্স্? রোগটা কি আপনারা বাড়ি ভরে ছড়াবেন বলে চক্রান্ত করেছেন নাকি?'

বিভাস গম্ভীরভাবে বলল, 'হুঁ, ইচ্ছাটা সেইরকমই আমাদের।'

রুবি বলল, 'সেইরকম ছাড়া কি। টিকা-ঠিকা নিয়েছিলেন?'

বিভাস বলল, 'নেওয়া হয়েছিল বলেই তো জানি।'

রুবি বলল, 'আমি তো দু'দুবার নিয়েছি। কিন্তু আপনাদের জ্বালায় রক্ষে পাব বলে মনে হয় না। কালই বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে। সরুন, আমার চায়ের জল গরম করে নি।'

বিভাস রুক্ষ স্বরে বলল, 'নিজের স্টোভ জেলে গরম করুন গিয়ে। আমার উনান এখনো ধরেনি।'

রুবি একটু দাঁড়িয়ে থেকে অবস্থাটা বুঝে মৃদু হেসে বলল, 'আপনার উনান আজ সারা রাতেও জ্বলবে বলে মনে হচ্ছে না, সরুন, আমি জেলে দিচ্ছি।'

আটপৌরে আধময়লা শাড়ি পরে রুবি এসে বিভাসের রান্নাঘরে ঢুকল। হাঁপ ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল বিভাস।

খানিকবাদে রুবি উমার খোঁজ নিতে এসে কোথায় কি আছে না-আছে কে কি খাবে সব খোঁজ নিয়ে জেনে গেল।

রুবি বিভাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'উঁহু, অমন চুপচাপ বসে বসে শুধু বই পড়লে হবে না। রান্নার জোগান দিন এসে। ভালো লোককে পাঠিয়েছিলি উমা। সময়মত না এসে পড়লে ঘরদোর জ্বালিয়ে দিত। পুড়ে মরতিস।'

উমা বলল, 'তোর কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু তুই যে এ রাতে ফিরবি ভরসা ছিল না। সিনেমা সিনেমা করে যা অস্থির হয়ে উঠেছিস তুই। ভালো কথা, তোর স্যুটিং-এর কি হোল।'

রুবি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কি আবার হবে। স্যুটিং চলছে। ক'দিন হয়তো বন্ধ থাকবে। ভালো করে রিহার্সেল দিয়ে নিতে হবে আবার।'

উমা বলল, 'হ্যাঁ, রিহার্সেলটা ভালো করে দিয়ে নেওয়াই উচিত। বিনা রিহার্সেলে অভিনয়-টভিনয় যা হচ্ছে আজকাল।'

ঘণ্টা দুই বাদে রান্নাঘরে ডাক পড়ল বিভাসের। ঠাঁই করে ভাত বেড়েছে রুবি। পাতের সামনে দু'-তিনটি ডাল-তরকারীর বাটি সাজানো।

রুবি বলল, 'কই রান্না কেমন হয়েছে, বললেন না তো।'

বিভাস বলল, 'সে-কথা, মুখে বলতে গেলে ফর্ম্যাল হবে না কি? আপনি তো ফর্ম্যালিটি পছন্দ করেন না।'

রুবি হেসে বলল, 'আপনি বুঝি সেদিনের কথা মনে করে রেখেছেন। আশ্চর্য আপনার স্মরণশক্তি। ফর্ম্যালিটি পছন্দ করিনে, কিন্তু কেউ আমার রান্নার প্রশংসা করলে খুব পছন্দ করি। সে প্রশংসা যদি ফর্ম্যাল প্রশংসা হয় তবুও। আসলে উমার তুলনায় আমার রান্নাটা এতই খারাপ যে ফর্ম্যালিও তাকে প্রশংসা করা যায় না, কি বলুন?'

বিভাস রুবির দিকে তাকাল, 'কারো সঙ্গে তুলনা আমার মনে হয়নি।'

'কেন, আমি কি তুলনার এতই অযোগ্য?'

'আপনি অতুলনীয় এমনও তো হতে পারে।'

রুবির মুখ এবার আরক্ত দেখাল। এ ধরনের ফ্লার্টিংএ সে অভ্যস্ত। কিন্তু বিভাসের গলায় অভ্যস্ততার যেন আভাস মাত্র নেই।

খাওয়ার পর রুবির হাত থেকে পানের খিলি নিয়ে বিভাস ঘরে এসে সিগারেট ধরাল।

খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকিয়ে রোগীদের আর একবার খোঁজখবর নিয়ে রুবি নিজের

ঘরে এসে খিল দিল, নিবিয়ে দিল আলো। ঘর অন্ধকার। কিন্তু আকাশে এক চিলতে চাঁদ এখনো আছে। শিকের ফাঁকে ফাঁকে গুটিকতক তারা। জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে পাশ ফিরল রুবি। রিহার্সেল। রিহার্সেলই বটে। এক স্টুডিও থেকে আর এক স্টুডিও। কিন্তু এ ছবি কি শেষপর্যন্ত উঠবে? শেষ হবে সুটিং? না কি সুবিমলদের ছবির মতই অংশীদারী গোলমাল সুরু হবে। তারপর কোথায় এর শেষ, কোথায় এর পরিণতি। কিন্তু কি আবোলতাবোল যা তা ভাবছে রুবি। কালই তাকে এখান থেকে কিছুদিনের জন্য পালাতে হবে। চিকেন পক্স্ বড় ছোঁয়াচে। আর বড় ভোগায়। রুবির ভুগলে চলবে না। সে শুয়ে থাকলে তাকে কে দেখবে। স্ত্রীর পথ্যের জন্য বিভাস খুব উদ্বেগ প্রকাশ করছিল। মশারির তলা দিয়ে হাত গলিয়ে জ্বর পরীক্ষা করছিল বারে বারে। নিজে তেমন সেবা-শুশ্রূষা হয়তো জানে না। কিন্তু ওর চিন্তা ভাবনাটা আন্তরিক। মন্দ লাগে না কেউ যদি সত্যিই অমন উদ্বিগ্ন হয়, চিন্তিত হয়, কেউ যদি সত্যিই কারো জন্যে ভেবে মরে। কিন্তু কি যা তা ভাবছে রুবি। তার চেয়ে ঘুমোন ভাল। সত্যিই ঘুমোবার চেষ্টা করল রুবি। কিন্তু তার আগে আর একবার মনে পড়ল, 'কারো সঙ্গে তুলনা আমার মনে হয়নি। আপনি অতুলনীয়।'

অতুলনীয়! কথাটিতে আতিশয্য ছাড়া আর কিছুই নেই, তবু শুনতে বেশ লাগে। আর যা দেখতে ভালো লাগে, শুনতে ভালো লাগে, তাই ভালো, তাই সত্যি। তা ছাড়া এক হিসাবে কথাটা তো ঠিকই, কারো সঙ্গে কি কারো তুলনা হয়?

রুবি আবার পাশ ফিরল। আজ কি তার ঘুম আসবে না?

কড়া নাড়ার শব্দে পরদিন ঘুম ভাঙল রুবির। এত সকালে উঠবার ওর অভ্যাস নেই। রাত্রে ঘুম আসে বেশ দেরি করে, সকালে আটটার আগে সেই ঘুমের আবেশ কাটতে চায় না। ঘুম ভাঙবার পরেও চুপ করে পড়ে থাকতে ভালো লাগে। সর্বাঙ্গ লেপে ঢেকে বড় মধুর এই আলস্য যাপন। এতে যে বাধা দেয় সে পরম শত্রু।

লেপের ভিতর থেকেই রুক্ষ গলায় রুবি সাড়া দিল, 'কে?'

বিভাস বলল, 'আমি।'

'কি ব্যাপার?'

রুবির গলা তখনো অপ্রসন্ন।

বিভাস বলল, 'দেখুন, বেলা সাড়ে ছটা বেজে গেল, এখনো ঝি এল না। ওর আবার কি হয়েছে, কে জানে? এদিকে বাবলু কাঁদতে সুরু করেছে।'

রুবি জবাব দিল, 'ঝি আসেনি, আমি তার কি করব। আমাকে কি ঝি ডেকে

আনতে বলেন নাকি, না এই সাত সকালে উঠে আপনার এক রাশ বাসন মাজতে বসি তাই ইচ্ছে আপনাদের ? আচ্ছা ফ্যাসাদ হয়েছে যা হোক !'

বিভাস জবাব দিল, 'না, আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমারই ভুল হয়ে গেছে। অন্যায় হয়ে গেছে, মাফ করবেন।'

ভোরের আলস্য-মধুর আচ্ছন্নতা যে কড়া নেড়ে ভাঙে তার অপরাধের কোন মার্জনা নেই। আর একবার পাশ ফিরে চোখ বুজবার চেষ্টা করল রুবি। কিন্তু ভালো লাগল না। অসময়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর শুয়ে থাকাও বড় বিরক্তিকর। লেপটা ঠেলে ফেলে নেমে পড়ল তক্তপোষ থেকে।

হাত মুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে রুবি দেখল কলের কাছে বিভাস নিজেই বাসন মাজতে বসেছে।

একটুকাল দাঁড়িয়ে থেকে রুবি বলল, 'একি অন্যায় জেদ আপনার! ঝিটাকে ডেকে আনতে পারলেন না ?'

বিভাস কোন জবাব না দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগল।

রুবি আরো চটে উঠে বলল, 'ভদ্রতা বলেও তো একটা জিনিস আছে। কথা জিজ্ঞেস করলে কি তার জবাব দিতে নেই ?'

এবার ভদ্রতার দাবী পূরণ করে বিভাস জানাল যে ঝিকে সে সত্যিই খুঁজতে বেরিয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে খবর পেয়েছে তার ছেলেরও পক্স্। অবস্থা খারাপ। সে কাজে আসতে পারবে না।

রুবি বলল, 'তা সে নাই বা এল। কলকাতা সহরে কি আর ঝি চাকর নেই ? তাদের একটাকে ধরে আনতে পারলেন না ? না, তাতে পয়সা বেশি লাগবে ? উমা যে আপনাকে কৃপণ-কৃপণ করে তা মিথ্যে নয়। বেশ, সখ হয়েছে, বসে বসে বাসন মাজুন।'

বলে রুবি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু একটু বাদেই ফের এল বেরিয়ে, বলল, 'যান, উনান ধরান গিয়ে আপনি। এসব আমি দেখছি।'

বিভাস নড়ল না, বলল, 'আপনি যান, আপনার তো এসব অভ্যেস নেই।'

রুবি বলল, 'আমার অভ্যেস নেই, আপনার বুঝি খুব আছে। নিন, সরুন।' তারপর একটু হেসে বলল, 'আরও অনেক কাজ তো পড়ে আছে ? যান সেগুলি করুন গিয়ে। এক কাজ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে লাভ কি। কেউ দেখলে ভাববে কাজটা ছল, কাড়াকাড়িটাই আসল উদ্দেশ্য।' বলে বিভাসের একেবারে গা ঘেঁষে বসে পড়ল রুবি। ফলে বিভাসকে উঠে দাঁড়াতে হোল।

কিন্তু সৌজন্য শিষ্টাচার এক কথা। আর হাতে কলমে কাজ আর এক জিনিস।

বহুকাল পরের বাসন মাজে না রুবি। কেমন যেন একটু 'ঘেন্না ঘেন্না' করতে লাগল। নিজের জন্যে অবশ্য আলাদা ঝি নেই ওর। উমাদের ঝি কুমুদিনাই ওর কাজকর্ম করে দেয়। কাজ তো রুবির বেশি নয়। খান দুই চীনে মাটির প্লেট, একটা গ্লাস কি বাটি। তার জন্যেই পাঁচ টাকা করে নেয় কুমুদিনী। টাকা দিতে চড় চড় করে রুবির গা। তবু দিতে হয়। কিন্তু উমার কাছ থেকে কুমুদিনী বেশি টাকা নিলেও রুবিরই সে বাধ্য বেশি। একটু পাউডার দুটো চুলের কাঁটা কি পুরনো একটা রঙীন ব্লাউস দিয়ে কুমুদিনীকে সে বশ করে ফেলেছে। তাছাড়া অল্প বয়সী এই বিধবা ঝিটির সঙ্গে রঙ্গ রস করতে পারে রুবি। ফলে পাঁচ টাকায় সে পনের টাকার কাজ উশুল করে নেয়। উমা তা দেখে হিংসায় মরে। আজ কিন্তু উমাই জিতেছে। গোটা কয়েক চিকেন্ পক্স্ উঠেছে কি না উঠেছে, সে গিয়ে বিছানা নিয়েছে। আর এই শীতের মধ্যে তার এঁটো বাসন মাজতে হচ্ছে রুবিকে। শুধু আঙুলগুলি নয়, নিজের মূর্খতার জন্য মনটাও জলে যেতে লাগল রুবির। বিভাসের সংসারের এঁটো বাসন না হয় বিভাসই মাজত। পাড়াপড়শী হিসাবে একটু মৌখিক ভদ্রতা করে একটু দুঃখ জানিয়েই তো কাজ সারতে পারত। কেন সত্যি সত্যি সে বোকার মত একরাশ বাসন মাজতে বসল। নিজের আঙুলগুলির দিকে আজ আর রুবি তাকাতে পারবে না। রুবির আঙুলে তার অনেক বন্ধুর যে আংটি পরাতে সাধ হয়েছে, সে তো আর সাধে নয়—আঙুলগুলি সত্যিই সুন্দর বলে, আঙুলগুলিকে সত্যিই যত্ন করে রেখেছে বলে। দেহ আর দেহের সৌন্দর্য। একে পরম যত্নে পরম সাবধানে ধরে রাখতে হয়। একটু অমনোযোগী হলেই পুরুষের মনে ভাঁটা পড়বে! নিজের দেহ সম্বন্ধে অন্যমনস্ক নয় রুবি। সারা দিনরাত সে দেহের পরিচর্যা করে। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে সজ্ঞান দৃষ্টি রাখে। শোয়ার আগে হাতে মুখে হলুদ মেখে শোয়। তাতে নাকি রঙ মসৃণ আর চামড়া নরম থাকে। কিন্তু এত যত্ন করে রাখা দু'খানি করপল্লব ছাই-মাটিতে কি কুশ্রী হয়েছে দেখতে! ভারি খারাপ লাগতে লাগল রুবির। এর কি দরকার ছিল! এতখানি বাড়াবাড়ি না করলেও তো হোত।

কিন্তু হাত ধুয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই রুবি দেখল কেটলীতে করে গরম চা—আর এক ঠোঙা সিঙ্গাড়া নিয়ে এসে ঢুকেছে বিভাস, 'ওসব থাক। তাড়াতাড়ি আসুন চা খেয়ে নিন।'

সামান্য একটি কি দুটি কথা। কিন্তু অদ্ভুত কৃতজ্ঞতা আর দরদ যেন ওর গলায়। সে কথা যেন স্নিগ্ধ স্পর্শের মত। সর্বাঙ্গে তাকে অনুভব করা যায়। এতক্ষণের আঙুলের জ্বালা মনের জ্বালা কোথায় গেল রুবির। বিভাসের দিকে চেয়ে বলল, 'ওগুলি আবার কেন আনতে গেলেন।' বলতে যাচ্ছিল, 'বাইরের ওসব তেলে ভাজা সিঙ্গাড়া খাবে কে।'

কিন্তু তা না বলে বলল, 'চা দোকান থেকে আনতে গেলেন কেন? বাড়িতে কি করতে পারতাম না? না কি আপনার বউ ছাড়া চা আর কেউ করতে পারে না ভেবেছেন?'

বিভাস বলল, 'বেশ তো, ধীরে সুস্থে চা আবার করবেন ভালো করে। এখনকার মত এক কাপ খেয়ে নিন।'

হাত মুখ ধুয়ে উমা মশারির বাইরে এসে বসেছিল, ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'খুব তো চা খাওয়া খাওয়ি করছ। এদিকে ছেলেটা যে কেঁদে মরছে। ওকে একটু দুধটুধ গরম করে দিতে হবে না?'

এবার লজ্জিত হওয়ার পালা বিভাসের। সত্যি শিশু আর রোগীদের জন্যে এখনও কোন ব্যবস্থা হয়নি।

কিন্তু বিভাস কিছু বলবার আগে রুবি বলল, 'বাবলুর জন্যে ভাবিসনে। ওকে আমি এক্ষুনি ওভালটিন করে দিচ্ছি।'

উমা কোন জবাব দিল না। ভাবনা তো বাবলুর জন্যে নয়, ভাবনা বাবলুর বাবার জন্যেই।

বেলা দশটায় খাওয়া-দাওয়া সেরে বিভাস অফিসে বেরুবার উদ্যোগ করছে, রুবি বলল, 'ওকি, রোগীদের ফেলে আপনি বেরুচ্ছেন যে! আপনার সংসার কে দেখবে? আমাকেও তো বেরুতে হবে।'

বিভাস অপ্রস্তুত হোল। এতক্ষণ সংসার রুবিই দেখছিল। রোগীদের পথ্য দেওয়া, বাবলুকে নাওয়ানো খাওয়ানো, বিভাসের অফিসের রান্না সবই শেষ করেছে রুবি। অন্যদিন এর অনেক আগেই রুবি অফিসে চলে যায়। যেদিন সময় থাকে সেদিন রাঁধে, যেদিন সময় পায় না, ইচ্ছে করে না, হোটেল থেকে খেয়ে নেয়। রোজ রোজ রান্নার ঝামেলা বড় একঘেয়ে, তাতে খাওয়ার আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়। রুবি একবেলা বরং না খেয়ে থাকতে রাজী আছে যদি রান্নার দায় থেকে বাঁচে। কিন্তু আজ ওর রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছিল না যে ও অফিসে যাবে। বিভাসও স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করেনি।

কিন্তু রুবিই ব্যাপারটা স্পষ্ট করে তোলায় বিভাস একটু ইতস্তত করে বলল, 'আজ আমার বড় জরুরী কাজ ছিল অফিসে। আজই অবশ্য কোয়ারেনণ্টাইন লীভ নিয়ে আসব। আজকের দিনটা যদি আপনি কোনরকমে চালিয়ে নিতে পারতেন—।'

রুবি বলল, 'বাঃ মজা মন্দ নয়। রোগ হবে আপনার বাড়ির, আর অফিস কামাই করব বুঝি আমি? যদি ছুটি মঞ্জুর না হয়, যদি মাইনে কাটা যায়, তার ক্ষতিপূরণ দিতে পারবেন?' বলে বিভাসের দিকে তাকাল।

বিভাসও তাকাল ওর দিকে। কিন্তু কোন জবাব দিল না। একটু বাদে রুবি বলল, 'আচ্ছা যান আপনি। তবে তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু। অফিসে না গেলেও বিকালে আমাকে অবশ্যই একটু বেরুতে হবে।'

বিভাসের মুখ একটু গম্ভীর হোল। বিকালে বেরুতে হবে। সে বেরুবার মানে বিভাস জানে। এতক্ষণের স্বাচ্ছন্দ্য এতক্ষণের ঘনিষ্ঠতা সব যেন ওর কাছে অত্যন্ত বিস্বাদ লাগল, একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ তো আপনি ইচ্ছে করলে এখনো বেরুতে পারেন। উমাদের জন্যে ভাববেন না। ওরা বেশ একা থাকতে পারবে।'

রুবিও রুক্ষ গলায় জবাব দিল, 'পারলেই ভালো।'

দুপুরের পর সত্যিই ভারি হাঁসফাঁস করতে লাগল রুবির মন। ভালো লাগে না, মোটেই ভালো লাগে না। রোগীর সেবা আর এই নিরামিষ ঘর-গৃহস্থালী তার জন্য নয়। এতে আরাম আছে কিন্তু উত্তেজনা নেই, বৈচিত্র্য নেই, এর চেয়ে অফিস যেন ভালো ছিল। সেখানে দেখা যেত পুরুষের অনেকগুলি উন্মুখ মুখ। এই নিঃসঙ্গতা দুঃসহ। অদ্ভুত এই মন আর অদ্ভুত তার আসক্তি। পুরুষের লোভ, স্পর্শ-সুখের জন্য তার কাঙালপণা রুবির বেশির ভাগ সময়ই বড় বিরক্তিকর লাগে। কিন্তু ওদের সান্নিধ্য ছাড়াও যেন থাকবার জো নেই, টিঁকবার জো নেই। একটা নেশার মত, অভ্যাসের মত। সুবিমল ঠিকই বলেছে। 'ভালো লাগলেও খেতে হয়, না লাগলেও খেতে হয় এই দস্তুর।' বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘরে তালা চাবি দিয়ে ঢুকল পূর্ণিমা প্রেসে। প্রেস ম্যানেজার পরম সৌজন্যে উঠে দাঁড়ালেন, 'কি চাই বলুন?' রুবি হেসে বলল, 'একটা ফোন করতে চাই।'

ম্যানেজার যেন একটু নিরাশ হলেন। মাত্র এই সামান্য প্রার্থনা। স্মিত মুখে বললেন, 'বেশ তো করুন।' রুবি ফের একটু হাসল, 'কিছু মনে করবেন না, ফোনটা একটু প্রাইভেট।' ম্যানেজার বললেন, 'আচ্ছা আপনি পাশের ঘরে যান তাহলে। ও ঘরেও ফোন আছে। কোন লোক নেই।'

কার সঙ্গে বিবাদটা আগে মিটানো যায়। রুবি মনে মনে ভাবল। প্রথমে মনে করল সুবিমলের কথা। কিন্তু স্টুডিয়োর কাজ তো বন্ধ। সেখানে ওকে কি আর পাওয়া যাবে। আর কে—আর কে। কল্মৈ দেবায়। ডাক্তার সেদিন বড় চটে গেছে। তাকেই ডাকা যাক। বড় উপকারী বন্ধু।

ফোনে পাওয়া গেল ডাক্তারকে।

'হ্যালো ডাক্তার। আমি রুবি।'

ফোনের ওপার থেকে নীরস গম্ভীর গলা শোনা গেল, 'ও! কি ব্যাপার।'

রুবি বলল, 'তুমি যা অনুমান করেছিলে ঠিক তাই। খুন হয়ে গেছি! শিগগির এস, বুকে ছোরা পিঠে গুলি। তুলে না ফেললে, এক মিনিটও আর বাঁচব না। এসো শিগগির।'

'ইয়ার্কি দিচ্ছ?'

'সর্বনাশ! ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর কি ইয়ার্কির সম্পর্ক নাকি?'

'ফোন ছেড়ে দিচ্ছি রুবি। আমার কাজ আছে।'

'না না না। লক্ষীটি ছেড় না। ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পড়েছি। বাড়ি ভরে পকস। নিজেরও কেমন জ্বর জ্বর লাগছে। বড় ভয় হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি পার একবার এসো।'

'আচ্ছা দেখব চেষ্টা করে।'

...ঘণ্টা দেড়েক বাদেই দেখা গেল ডাক্তারের চেষ্টা সফল হয়েছে। রুবিদের গলিতে এসে দাঁড়িয়েছে ডাক্তারের গাড়ি।

রুবির ঘরে ঢুকে ডাক্তার দে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন, 'সত্যিই জ্বর হয়েছে নাকি? দাও তো থার্মোমিটারটা।'

ডাক্তার দে অন্যান্য বারের মত নিজে রুবির বগলে থার্মোমিটার লাগালেন না। দূর থেকে থার্মোমিটার বাড়িয়ে ধরলেন।

রুবি সেটা লক্ষ্য করল। মনে মনে হেসে আরও একটু এগিয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়াল ডাক্তারের। এ অভিমান কতক্ষণের। দেহের সামান্য উত্তাপে গলে জল হয়ে যাবে।

রুবি বলল, 'রেখে দাও তোমার থার্মোমিটার। আমার জ্বরের মাত্রা কাঁচের থার্মোমিটারে ওঠে না, তা কি জানো না? বরং নাড়ী ধরে দেখ। তাতে হয়ত খানিকটা টের পাবে।' রুবির চোখে আর ঠোঁটে অভ্যস্ত হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল।।

কিন্তু আজ কি হয়েছে ডাক্তারের। রুবির নাড়ী পরীক্ষা করবার মোটেই আজ তাঁর উৎসাহ দেখা গেল না। বললেন, 'নাড়ী দেখবার দরকার নেই রুবি। তুমি ভালোই আছ। অমনিতেই বুঝতে পারছি।'

রুবি বলল, 'বুঝতে তো তুমি আগেও পারতে। তবু তো নাড়ী না দেখলে চলত না। আজ তোমার কি হয়েছে বল তো।'

ডাক্তার দে রুবির দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'কিছু যদি হয়ে থাকে তা শেষও হয়েছে। ডাক্তার হয়েও এতদিন তোমার কাছে আমি রোগীর

মত ছিলাম রুবি। তুমি ইচ্ছা মত আমাকে চালিয়েছ, ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছ। কিন্তু সব রোগেরই একটা duration থাকে। সেটা শেষ হলে—'

রুবি বলল, 'এসব কি বলছ তুমি। সেদিনকার তামাসাটা আজও বুঝি ভুলতে পারোনি ?'

ডাক্তার দে বললেন, 'না পারিনি। তামাসাটা শুধু সেদিনের তো নয়, তামাসাটা চিরদিনেরই। তুমি আজও ফোনে ছোরা আর গুলির কথা তুলে হাসছিলে। সেই ছোরা আর গুলি আমার বুকে পিঠে যে কতদিন কতবার বিঁধেছে তার ঠিক নেই। যে মৃত্যুর ভয় আমি তোমাকে দেখিয়েছিলাম, সেই মৃত্যুতে আমি নিজে হাজার বার মরেছি। কিন্তু সব যন্ত্রণার সব দুঃখেরই শেষ আছে রুবি। আর যাই হোক, নিজের রোগ যখন একবার চিনতে পেরেছি, চিকিৎসাটাও হয়ত করতে পারব।'

রুবি জবাব দিল না। ডাক্তারের এই স্তব্ধ গম্ভীর রূপ এর আগে সে আর দেখেনি। কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে থাকতে থাকতে রুবিরও সব কিছুর মূলে রোগের বীজ সন্ধান করবার অভ্যেস হয়ে গেছে। ঈর্ষা, ডাক্তারের এই বিষাদ-করুণ স্তব্ধতার মূলেও আছে ঈর্ষা। আশ্চর্য এই ঈর্ষার রূপ। তা যেমন আগুনের মত জ্বালায় তেমনি বরফের মত শক্ত আর ঠাণ্ডা করে ফেলে। কিন্তু রুবির হৃদয়ও তো বরফ হয়ে গেছে। তা কি ডাক্তার জানে না! সে হৃদয়ও সামান্য দুঃখে গলে না, সামান্য স্পর্শে জ্বলে না। হৃদয়! হৃদয় বলে যে কিছু নেই তা কি এই ডাক্তারেরাই তাকে শেখায়নি। এই ডাক্তারই কি একদিন তার বিপদের সুযোগ নেয়নি। বিপদ থেকে মুক্ত করেও মুক্তি দিতে অস্বীকার করেছে। অথচ সেই বিপদকে সম্পদে পরিণত করবার শক্তি এই ডাক্তারেরই সেদিন ছিল। মুখ ফুটে অবশ্য রুবি সেদিন তা চায়নি, চাইতে সাহস পায়নি। উল্টোটার জন্যই পীড়াপীড়ি করেছে। কিন্তু ডাক্তার কি সেদিন আর কিছুর দিকে তাকিয়েছিল ? তার সেই লজ্জা আর ভয়ের আড়ালে আর কিছু আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিল ? তা যখন করেনি, তখন ডাক্তারই বা এমন হাহাকার করে কেন ? কেন যা পায় তাই নিয়ে খুশি হয় না, তাই নিয়ে তৃপ্ত থাকে না ?

ব্যাগ থেকে গোটা কয়েক ট্যাবলেট বার করলেন ডাক্তার দে। বললেন, 'Pox-এর Preventive-এর কথা বলছিলে। এইগুলি ব্যবহার কোরো। হয় তো উপকার হবে। আর অসুখ-বিসুখে যখন দরকার হয় ডেকো। কোন সঙ্কোচ কোরো না।' কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন।

রুবি আর একবার ডাক্তারের হাত ধরতে গেল, 'শোন, বোসো।'

কিন্তু ডাক্তার দে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'না রুবি, জরুরী কেস আছে হাতে।

আজ চলি।' বলে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। রুবি মনে মনে ভাবল আশ্চর্য এই পুরুষ! এদের স্পৃহাটা বোঝা যায় কিন্তু বীতস্পৃহা বোঝা বড় শক্ত।

হঠাৎ মনে পড়ল উমাদের একবার দেখালে হোত। উমা তাড়াতাড়ি সেরে না উঠলে বিভাসের সংসার নিয়ে রুবির বিড়ম্বনার শেষ হবে না। রুবি আর দেরী না করে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ডাক্তারকে ধরবার জন্য। কিন্তু খানিক এগুতে না এগুতেই ডাক্তার দে স্টার্ট দিলেন গাড়িতে আর বিভাস এসে বাড়ির ভিতরে ঢুকল। তার হাতে ছোট বড় গোটা কয়েক ঠোঙা। মুখ গম্ভীর, ভ্রূ কুঞ্চিত।

রুবি বিভাসের সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঘরে ঢুকল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'এই যে কথা রেখেছেন। সকাল সকালই ফিরে এসেছেন দেখছি।'

বিভাস ঠোঙাগুলি টেবিলের উপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'হুঁ।'

রুবি বলল, 'আপনি তো চলে গেলেন, এদিকে রোগীদের চটফটানির জ্বালায় আমি অস্থির। আপনার মত নেচারের উপর নির্ভর করে থাকবার সাহস নেই। তাই ডাক্তার দে-কে একবার ডাকলুম। তিনি বললেন ভয়ের কোন কারণ নেই।'

উমা মশারির ভিতর থেকে বলল, 'ডাক্তার দে এসেছিলেন নাকি রুবি?'

রুবি কোন কথা বলবার আগেই বিভাস তার দিকে তাকিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলল, 'আপনার আর কিছু বলবার দরকার নেই মিস রায়, যা বলবেন তাইতো মিথ্যে বলবেন। মিথ্যাচারকে আমরা ঘৃণা করি, বড় ঘৃণা করি।'

উমা মশারির ভিতর থেকে তার বসন্তের গুটি ওঠা মুখ বার করে বিস্মিত ভঙ্গিতে বলল, 'হঠাৎ কি হল তোমার, কি হয়েছে রে রুবি?'

একটু কাল স্তব্ধ হয়ে থেকে রুবি বলল, 'কিছু হয়নি।' তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অপমানে ওর সমস্ত অন্তর জ্বলে যাচ্ছে।

উমা এবার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল,'কি হয়েছে? কি বলছিল ও?'

বিভাস সামান্য চুপ করে থেকে বলল, 'বলছিল তোমাদের চিকিৎসার জন্যেই ডাক্তার দে-কে ও ডেকে এনেছে।'

উমা শুনে বলল, 'ওমা তাই নাকি! কিন্তু তুমিই বা অমন করে রেগে উঠলে কেন, মুখের ওপর কি কেউ কাউকে মিথ্যেবাদী বলে, না বলতে হয়?'

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ, বলা দরকার। সত্য মিথ্যা বুঝবার ক্ষমতা যে কারো কারো আছে সেকথা ওকে বুঝিয়ে দেওয়া ভালো।'

উমা বলল, 'সত্যি, একেবারে চোখে মুখে মিথ্যে কথা বলে। অতটা আবার ভালো নয়।'

বিভাস বলল, 'যাক্, কেমন আছ বলো। পিসীমা কেমন আছেন।' হঠাৎ ওর খেয়াল হ'ল দু'দিনের মধ্যে সুরবালার আর কোন খোঁজই নেয়নি।

লজ্জিত হয়ে বিভাস সুরবালার ঘরে গিয়ে মশারি খানিকটা উঁচু করে বলল, 'কেমন আছ পিসীমা?'

রোগের প্রথম উগ্রমূর্তিটা কমে গিয়েছিল সুরবালার। কিন্তু দুর্বলতা যায়নি। বললেন, আমি ভালোই আছি। তুই আবার এ-ঘরে এলি কেন বিভু?'

বিভাস হেসে বলল, 'এখন এ-ঘর ও-ঘর সব সমান হয়ে গেছে পিসীমা।'

সুরবালা বলল, 'হুঁ, উমা কেমন আছে?'

'ভালোই আছে। ওর খুব বেশি ওঠেনি। দু'চার দিনের মধ্যেই বোধহয় সেরে উঠবে।'

সুরবালা বললেন, 'তাই বুঝি ভেবেছ? কাজকর্ম করে খেতে অন্তত একটি মাস। এক কাজ কর, বেয়ান তো আসতে পারবেন না শুনলুম। বেলেঘাটা থেকে তোর বউদিকে নিয়ে আয় গিয়ে। খুব দূরের তো নয়, আপন মাসতুতো ভাইয়ের তো স্ত্রী, যাতায়াত খোঁজখবর নেই বলেই এমন পরপর ভাব হয়েছে। তাই যা, আহা ছেলেটার কত কষ্ট হচ্ছে।'

বিভাস বলল, 'কাউকেই আনতে হবে না পিসীমা, অফিস থেকে আমি ছুটি নিয়ে এসেছি। সবারই দেখাশুনো করতে পারব, কাল থেকে ঝিও আসবে। খবর নিয়েছিলাম।'

পাশের ঘর থেকে উমা ডেকে বলল, 'এদিকে এসো, রুবি তোমার জন্যে চা করে নিয়ে এসেছে।'

বিভাস বলল, চায়ের আর দরকার নেই আমার।'

কিন্তু পরক্ষণেই উঠে এল।

শুধু বিভাসের জন্যই নয়, উমা আর সুরবালার জন্যও এক কাপ করে চা নিয়ে এসেছে। উমা হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিল। বিভাস নিল না।

রুবি বিভাসের সঙ্গে কোন কথা না বলে উমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আজ রাত্রে কি খাবি? কাল তো দুধ-সাবু খেয়েছিলি, আজ লুচি করে দিই।'

উমা খুশি হয়ে বলল, 'দে। সাবু আমি কোনদিন খেতে পারিনে বাপু।' তারপর স্বামীর দিকে ফিরে তাকাল উমা, একটু হেসে বলল, 'ও কি, তোমার চা'টা যে জল হয়ে গেল। কাপটা নাও, রুবির কথার মধ্যেই না হয় একটু-আধটু ভেজাল আছে। তাই বলে চায়ে তো আর ভেজাল দিয়ে আনেনি।'

এরপর যেন স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষার্থে চায়ের কাপটা তুলে নিল বিভাস।

রাগে রুবির গা জ্বলে যাচ্ছিল। মুখের ওপর এমন করে তাকে অপমান করতে কেউ কখনো সাহস পায়নি। খানিকক্ষণ আগে ডাক্তারও তো যা নয় তাই বলে গেছে। তবু তার সঙ্গে অনেকদিনের সম্পর্ক, অনেকদিনের জানাশোনা। তার মান অভিমানের হেতু বোঝা যায়। কিন্তু বিভাস তাকে অপমান করতে আসে কোন্ সাহসে ? এর শোধ রুবিকে নিতেই হবে, এর শোধ না নিয়ে সে পারবে না। রুবি একবার ভাবল, বিভাসের ঘর-সংসার সব ফেলে রেখে এখনই বেরিয়ে পড়ে। বেরিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প-গুজব করে আসে। দু' দু'জন রোগী আর বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে বিভাস কি করে, একবার দেখে। কিন্তু ট্রাঙ্ক থেকে শাড়ী বের করেও পরতে ইচ্ছা করল না রুবির, বেরুতে গিয়েও বেরুতে পারল না। মনটা জ্বলে যাচ্ছে। না, ওর চোখের আড়ালে গেলে চলবে না,—চোখের সামনে থেকেই ওর অপমানের শোধ নিতে হবে। সবাইকে আঘাত করবার, সবাইকে অপমান করবার কৌশল তো ঠিক একরকমের নয়। বিভাসকে কোন্ অস্ত্রে বিঁধতে হবে তা রুবি বুঝে নিয়েছে।

তাই অন্য দিনের মত রুবি আজ সাজসজ্জা করে বেরিয়ে গেল না। পরিমিত রকমের সান্ধ্য-প্রসাধন অবশ্য করল। চুল বাঁধল, স্নিগ্ধ ধানী রঙের শাড়ী পরল, মুখে আলতো করে বুলাল পাউডারের পাফ, তারপর ঘুরে ঘুরে উমার সংসারের কাজ-কর্ম করতে লাগল। এটা ওটা উপলক্ষ্য করে বারবার আসতে লাগল সুরবালার ঘরে, উমার ঘরে। তাদের সঙ্গেই কথাবার্তা বলতে লাগল। বিভাস বলে যে কেউ আছে, বিভাস বলে যে কাউকে রুবি চেনে তার হাবভাবে তা বোঝা গেল না।

বিভাস এক ফাঁকে বলল, 'আপনার অত কষ্ট করে দরকার নেই, কাজ থাকে আপনি ঘুরে আসুন না। আমি যেমন করে হোক ব্যবস্থা করে নেব।'

কিন্তু রুবি বধির, রুবি মূক।

রাত নটায় বিভাসের খাওয়ার ডাক পড়ল। রুবি নিজে ডাকল না, উমাকে খবর দিয়ে গেল।

রান্নাবান্না সবই কালকের মত, তবু কালকের সেই মাধুর্য আর নেই। আজ আর রুবি হেসে জিজ্ঞেস করল না—কেমন হয়েছে রান্না, বিনয় করল না নিজের অদক্ষতা নিয়ে। নিঃশব্দে পরিবেশন করে যেতে লাগল।

বিভাস একবার ভাবল নিজের তখনকার আচরণের জন্য একটু আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু কোন কথা বলবার সুযোগই পেল না। অবস্থা বিপাকে এই মেয়েটির

সেবা-পরিচর্যা যে তাকে গ্রহণ করতে হচ্ছে, তার জন্য বিভাসের নিজেরও ভারি খারাপ লাগছিল। সাধারণ গার্হস্থ কাজে নিজের অপটুতা অনভ্যস্ততার জন্য নিজের ওপর এবার বিরক্ত হ'ল বিভাস। কাল ভোরে উঠেই বেলেঘাটায় গিয়ে বউদিকে নিয়ে আসবে, মনে মনে সে ঠিক করে ফেলল। খেয়ে-দেয়ে মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে চলে আসছে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চোখ ফেরাল। রান্নাঘরে শিকল টানার শব্দ। তারপর আরও একটু বৃহত্তর শব্দ হ'ল। খিল পড়ল রুবির ঘরে।

বিভাস একটুকাল স্থির হয়ে থেকে রুবির রুদ্ধ দ্বারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত করে বলল, 'ওকি, আপনি না খেয়েই শুতে গেলেন যে।'

একটু চুপ করে থেকে রুবি ঘরের ভিতর থেকে জবাব দিল, 'আমি খাব না, আমার ক্ষিদে নেই।'

বিভাস মনে মনে একটু হাসল। যত রাগ, যত মান অভিমান মেয়েদের খাওয়ার ওপর। এ ব্যাপারে সব মেয়েই সমান। ঝগড়া করে উমাও মাঝে মাঝে এমন না খেয়ে থেকেছে। অনেক রাত্রে বিভাস সেধে খাইয়েছে তাকে।

বিভাস বলল, 'এবার আর একটা মিথ্যে কথা বললেন। ক্ষিদে খুবই আছে, আসুন।'

রুবি জবাব না দেওয়ায় বিভাস দোরের কড়া ধরে নাড়ল। ভিতর থেকে দোরের কাছে এসে দাঁড়াল রুবি, একটু রুক্ষস্বরে বলল, 'কড়া নাড়ছেন কেন?'

'দোর খুলুন।'

'কেন, এ ঘরে আপনার কি কোন দরকার আছে?'

'আছে।'

রুবি দোর খুলে ভিতরে চলে গেল।

বিভাস একটু ইতস্ততঃ করল। সেই বিবাহ-বার্ষিকীর নিমন্ত্রণের দিনও না খেয়ে ছিল। আজও নিজের হাতে সব করে কেটে রেঁধে বেড়ে রুবি নিজে উপোস করে থাকবে একথা ভাবতে বিভাসের ভালো লাগল না। আর একবার অনুরোধ করবার জন্যে বিভাস রুবির ঘরে গিয়ে ঢুকল।

রুবি বিছানায় শুয়ে পড়েনি, ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একখানা বই হাতে নিয়ে রয়েছে। শেডের আড়ালে আলো জলছে টেবিলের ওপর। রুবির বেশবাস একটু শিথিল, একটু বা অসম্বৃত। উর্ধ্বমুখী সুপুষ্ট সুন্দর স্তনযুগল মৃদু নিঃশ্বাসে স্পন্দিত হচ্ছে।

বিভাস হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো। একবার ভাবল ফিরে যায় কিন্তু দু'জনের পক্ষেই সেটা লজ্জাকর হবে ভেবে গেল না। ওকে দেখে রুবি তাড়াতাড়ি উঠে বসবার ভঙ্গি করে

বলল, 'এই যে। এঘরে সত্যিই আপনার দরকার আছে, তা আমি ভাবিনি, বসুন।' সামনের আর একটা সোফা দেখিয়ে দিল রুবি।

বিভাস বলল, 'না বসব না, আপনিই বরং উঠে আসুন, খাবেন চলুন।'

রুবি বলল, 'না বিভাসবাবু, আমি খাব না।'

বিভাস বলল, 'কেন, না খাওয়ার কি হয়েছে ?'

রুবি বলল, 'কি আবার হবে। ঘৃণা লজ্জাটা শুধু আপনারই একচেটে নয় বিভাসবাবু, ও জিনিস আরো অনেকের শরীরেই আছে। আপনি যান, বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু আপনি যদি না খান সত্যিই আমি আজ বিশ্রাম করতে পারব না।'

রুবি চমকে উঠল। এমন স্পষ্ট ভাষায়, এমন সত্য ভাষায় বিভাস কি করে কথা বলতে পারে। একি শিষ্টাচার, শুধু সৌজন্য ? ওর বলবার ভঙ্গিতে তা তো মনে হয় না। একজনের অনশনের আশঙ্কায় আরেকজনের উদ্বেগ আর বেদনাবোধই ওর ভাষায় ভঙ্গিতে ব্যক্ত। কিন্তু তা কি করে সম্ভব। বিকেলবেলায় বিভাসের সেই ঘৃণায় আবিল চোখ, বিদ্বেষবিকৃত কণ্ঠ তাও তো ভুলবার নয়। তবু সেই একই অসত্যভাষিণী, মিথ্যাচারিণীর ওপর বিভাসের এই দরদ আর মমতার হেতুটা কি ? রুবির রূপ, তার মুহূর্তকাল পূর্বের লীলায়িত দেহভঙ্গি ? কেন যেন রুবির এই মুহূর্তে তা ভাবতে ইচ্ছা করল না। তার চেয়ে ভাবতে ভালো লাগল, তার চেয়ে দেখতে ভালো লাগল সামনে দাঁড়ান সহানুভূতিতে কোমল একখানি বেদনাপ্লুত মুখ। রুবির মনে হ'ল এমন মুখের সঙ্গে মুখোমুখি যেন জীবনে এই প্রথম। একজনের ব্যথিত দৃষ্টির সঙ্গে যেন এই প্রথম শুভদৃষ্টি।

রুবি বলল, 'সত্যি বলছেন আমি না খেলে আপনি ঘুমুতে পারবেন না।'

বলেই একটু যেন লজ্জাবোধ করল রুবি। ও-কথার সত্যতা কি অমন স্পষ্ট ভাষায় যাচাই করা চলে।

বিভাস বলল, 'সত্যি বলছি।' তারপর একটু থেমে বলল, 'একটু আগে আপনি বলছিলেন ঘৃণা সকলের দেহেই আছে। কথাটা ঠিক। আমার ঘৃণা নিয়ে আমি মাঝে মাঝে বড় বিব্রত বোধ করি। ঘৃণা তো কাউকে সত্যিই শাস্তি দেয় না, দেহকে অসুস্থ করে, মনের ভারসাম্য নষ্ট করে তাকে অস্বস্তিতে ভরে দেয়। আমরা ভাবি যাকে ঘৃণা করলাম, তাকে বুঝি দূরে ঠেলে রাখতে পারলাম। কিন্তু তা ভুল, পরম ভুল।'

একটু চুপ করে থেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রুবি, 'চলুন, যাই ও-ঘরে। আপনি যখন ছাড়বেনই না।'

রান্নাঘরে এসে রুবি বলল, 'আপনার পালাবার দরকার নেই। অন্ত কারো সামনে

খাওয়া আমার অভ্যাস আছে। বরং একা একা খেতেই খুব খারাপ লাগে। ওই টুলটা টেনে বসুন। খেতে খেতে তর্ক করি।'

বিভাস তবু একটু ইতস্তত করছে দেখে রুবি বলল, 'বাঃ, এতক্ষণ আপনাকে এত রেঁধে বেড়ে খাওয়ালুম, আর আমাকে একটু জলটা নুনটা এগিয়ে দেবেন না বুঝি। সত্যি সত্যি আপনাকে জলের ঘটি এগিয়ে দিতে বলব না। তাতে যে পুরুষের মানহানি হয় সে জ্ঞান আমার আছে। আপনারা ভারি স্বার্থপর, শুধু সেবা নিতেই জানেন, সেবা করতে গেলে জাত যায় আপনাদের।'

বিভাস টুলের ওপর বসে পড়ে বলল, 'কেবল কি তাই। ওসব কাজ নিয়ে আমর কাড়াকাড়ি করলে, কেবল আমাদের জাত নয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ভাতও মারা যায় যে।'

থালায় ভাত তরকারি বেড়ে নিয়ে খেতে বসল রুবি। একটু বাদে বলল, 'হুঁ, আপনাদের তো এই এক দোহাই আছে, আমরা রাতদিন আপনাদের সেবা না করলে আমাদের ভাত মারা যায়, হৃদয়ের কোমলতা নষ্ট হয়—আরো যেন কি কি, বলুন না। আসলে আপনারা হৃদয়বাদী নন, সুবিধাবাদী।'

বিভাস একটুকাল চুপ করে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, 'সুবিধাবাদ তো বটেই, কিন্তু সে নারী-পুরুষ দু'জনের জন্যেই। কাজের এই বিভাগ ছাড়া, পারস্পরিক দান প্রতিদান ছাড়া দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না।'

রুবি বিভাসের দিকে চোখ তুলে তাকাল, 'দাম্পত্য-জীবন? দাম্পত্য জীবন ছাড়া আর বুঝি কোন জীবনের কথা আপনি ভাবতে পারেন না?'

বিভাস একটু যেন থমকে গেল। কী ভেবে কথাটা বলল রুবি! ওর জিজ্ঞাস্যটা কি!

বিভাস বলল, 'সমাজ-জীবনের কথা ভাবতে হলে দাম্পত্য-জীবনের কথা ভাবতেই হয়। কারণ দাম্পত্য-জীবনই সমাজ-জীবনের ভিত্তি।'

রুবি একটু হাসল, 'ভিত্তি। কিন্তু বড় নড়বড়ে ভিত্তি বিভাসবাবু। সবসময় টলমল করে। সবসময় একটা না একটা ঠেক্‌না দিয়ে রাখতে হয়। হয় পুলিস না হয় পুরোহিত, কিংবা দুইই।'

বিভাস বলল, 'তা হোক। ক্রমে ক্রমে পাহারার প্রয়োজন একদিন শেষ হবে, তাছাড়া ভালো জিনিস দরকারী জিনিস একেবারে না রাখতে পারার চেয়ে পাহারা দিয়ে রাখলেই বা ক্ষতি কি।'

রুবি একটু উত্তেজিতভাবে বলল, 'ক্ষতি নিশ্চয়ই আছে। যা মানুষের প্রকৃতির

বিরুদ্ধে, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, কল্যাণের নামে তা জোর করে কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ায় ক্ষতি নেই? সে ক্ষতির বোঝা বাইরে থেকে চোখে পড়ে না, ভিতরে সারা জীবন তার বিকৃতি বয়ে বেড়াতে হয়।'

বিভাস হঠাৎ বলে ফেলল, 'শুধু ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বল করে অমন জেনারালাইজ করা কি ভালো?'

রুবি স্থির দৃষ্টিতে বিভাসের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'ভালো মন্দ জানিনে, সবাই তাই করে বিভাসবাবু। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়েই সবাই জীবনটাকে যাচাই করে বুঝে নিতে চায়। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবনের আপনি কি জেনেছেন শুনি?'

বিভাস রুবির দিকে তাকাল, 'না, কিছুই এখনো জানিনি। কিন্তু জানবার ইচ্ছে আছে।'

রুবি পরিহাসের ভঙ্গিতে বলল, 'সত্যি? আমি ভেবেছিলাম আপনি একেবারে পাথর দিয়ে গড়া। কোন ইচ্ছা-টিচ্ছা আপনার মধ্যে নেই। এখন দেখছি সবই একটু একটু আছে। আমার অতীত-জীবন সম্বন্ধে আপনারও কৌতূহল আছে তাহলে?'

বিভাস শান্তভাবে বলল, 'আছে। কিন্তু অন্যের মুখের শোনা কথায় সে কৌতূহল আমি মেটাব না। যা শোনবার, আপনার কাছ থেকেই শুনব।'

রুবি একটুকাল চুপ করে রইল। ঠিক এমন স্পষ্ট ভাষায় অথচ এত আন্তরিক আগ্রহের সঙ্গে এর আগে কেউ যেন তার জীবন-কাহিনী জিজ্ঞাসা করেনি। অন্যের এ-ধরনের প্রশ্নে অশোভন কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু জানবার আগে থেকেই ব্যাপারটাকে সে যে উপভোগ করছে, তা তার কথার ভঙ্গিতে চাপা থাকেনি। কিন্তু বিভাসের ধরন-ধারণ যেন আলাদা। রুবির জীবন-বৃত্তান্ত জানবার তার যেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য শুধু কৌতূহল নিবৃত্তিতেই বুঝি শেষ হবে না।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার এঁটো থালা হাতে রুবি উঠে দাঁড়াল। তারপর বিভাসের দিকে মৃদু হেসে বলল, 'বেশ তো শুনবেন। কিন্তু সে যে এক মহাভারত। আর মহাভারতের কথা অমৃত সমান। সে পুণ্যকাহিনী এঁটো মুখে বলা উচিত হবে না। তার চেয়ে আমি মুখটুকু ধুয়ে একটু হরতকি মুখে দিয়ে আসি, আর আপনি ততক্ষণ দূর্বা হাতে ব্রতকথা শুনবার জন্যে আমার ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। যান, বসুন গিয়ে আমার ঘরে। আমি এক্ষুণি আসছি।'

রুবির বলবার ভঙ্গিতে আধা অনুনয়, আধা আদেশ। বিভাস এক মুহূর্ত কি একটু ভাবল। এত রাত্রে রুবির ঘরে বসে গল্প করা ঠিক রীতি আর রুচিসম্মত হবে কিনা।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজের শঙ্কা আর সংকোচের কথা ভেবে নিজেই হাসল। নিজেকে সে জানে। নিজের উপর তার আস্থার অভাব নেই। বরং প্রসঙ্গ যখন উঠেছে, সুযোগটা নেওয়াই ভালো। শোনাই যাক রুবির অতীত কাহিনী। সব কথা হয়তো সত্য বলবে না রুবি। ক'জনই বা বলতে পারে। তবু সত্য আর মিথ্যার ভেজাল থেকে মোটামুটি তথ্যটা বিভাস ছেঁকে তুলতে পারবে।

রুবির ঘরে এসে বিভাস ইজিচেয়ারটায় বসল। টেবিলে শেডে ঢাকা নরম নীল আলো জলছে। একখানা বই টেবিলের ওপর থেকে বিভাস তুলে নিতে যাচ্ছিল, রুবি এসে ঘরে ঢুকল, 'ওকি, আবার বই কেন ?'

বিভাস বলল, 'বইটা আলাপের ভূমিকা। মুখবন্ধ।'

রুবি সামনের শোফাটায় বসে পড়ে বলল, 'মুখ তো আপনি আগেও বন্ধ করে রয়েছেন, পরেও থাকবেন। বই দিয়ে এখন মুখ ঢাকছেন, পরে চোখ ঢাকবেন। দরকার কি, তার চেয়ে আলোটা'—বলেই রুবি একটু হাসল, 'ভয় নেই নিবিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করছিনে, একটু সরিয়ে রাখতে চাইছি। আপনার আপত্তি নেই তো ?'

বিভাস বলল, 'আপত্তি কিসের।'

রুবি উঠে গিয়ে সত্যিই আলোটা সরিয়ে রাখল। তারপর এসে বসল নিজের জায়গায়, মুখোমুখি। কিন্তু ভাল করে মুখ দেখা যায় না। মাঝখানে আবছা অন্ধকারের পাতলা পর্দা।

মিনিট কয়েক চুপচাপ কাটল। তারপর বিভাস বলল, 'এবার বলুন।'

রুবি বলল, 'ভাবছি সত্যি বলব না মিথ্যে বলব। ভয়ে না নির্ভয়ে।'

বিভাস বলল, 'সত্যি যদি বলতে পারেন নির্ভয়ে বলুন, আর মিথ্যে বললে ধরা পড়বার ভয় থেকেই যাবে।'

রুবি বলল, 'দেখুন সত্যিকথা শুধু নির্ভয়ে বলতে পারলেই হয় না, নির্ভয়ে শুনতে পারে এমন লোকও থাকা চাই। আমি তো এ পর্যন্ত তেমন শ্রোতা পেলাম না। সেই ভীরু দুর্বল শ্রোতাদের জন্যেই আমি মিথ্যাবাদিনী, মিথ্যাচারিণী। আপনি আমাকে একটু আগে যা বলে গাল দিয়েছিলেন। কিন্তু এই মিথ্যাচারে আমাকে বাধ্য করেছে কে ? আপনাদের মিথ্যে সমাজ।'

বিভাস বলল, 'দেখুন, নিজের দোষ পরের ওপর চাপাতে যাওয়াতেও কম মিথ্যাচার নেই। সমাজ তো আপনাকে আমাকে নিয়েই। আমরা নিজেরা যদি পদে পদে মিথ্যে কথা বলি আমাদের সমাজ কি করে সত্যবাদীর সমাজ হবে ? কিন্তু আজ আর আপনার সঙ্গে তর্ক করব না, আপনার কথা শুনব।'

'কোত্থেকে বলব বলুন তো?'

বিভাস বলল, 'যেখান থেকে আপনার সুবিধে হয়। একেবারে গোড়া থেকেই সুরু করুন।'

রুবি একটু হাসল, 'ও বাবা, আপনার সখ তো কম নয়। গোড়া থেকে সুরু করলে রাত যে শেষ হয়ে যাবে, সে খেয়াল আছে? আর সে কি একটি দুটি রাত। সহস্র আরব্য রজনী। না বিভাসবাবু, গোড়া থেকে না, মাঝখান থেকেই শুনুন। গোড়ার কথা আমার মন থেকে সব মুছে গেছে, কেবল কুলেই কালি দিইনি, সে স্মৃতির ওপরেও দোয়াত উপুড় করে ধরেছি।'

...রুবি বলতে সুরু করল:

যতদূর মনে পড়ছে ঠাকুরমা আমার এগার বছর বয়স থেকে বাবাকে বিয়ের জন্যে তাগিদ দিচ্ছিলেন। বছর দু'তিন বাদে ঠাকুমা মারা গেলেন তো মা ধরলেন সেই বুলি।'

আবছা অন্ধকারে রুবির মৃদুকণ্ঠ শোনা যেতে লাগল, একটু একটু করে একটি মেয়ের অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত উদ্ঘাটিত হচ্ছে। কিন্তু সে-মেয়েটি যেন ঠিক রুবি নয়। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বাসনা-বেদনার সঙ্গে এই মুহূর্তের যে রুবি তার যেন কোন যোগ নেই। রুবি একজন বন্ধুর কাছে শুধু আরেক বন্ধুর জীবন-কাহিনী বলে যাচ্ছে। তাছাড়া আর কোন দায় নেই তার।

মা মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, 'মেয়ের বিয়ে দাও।' কিন্তু বাবা সেকথা কানে তুললেন না। নিজে শিক্ষিতা স্ত্রী পাননি, সেজন্যে ক্ষোভ রয়েছে মনে। তাঁর সাধ মেয়েকে বিদুষী করে সেই ক্ষোভ দূর করবেন। বাবার সমর্থনে রুবি স্কুলের বেড়া ডিঙিয়ে কলেজে এসে ঢুকল। তারা যে মফঃস্বল সহরে ছিল সেখানে মেয়েদের পড়বার কোন কলেজ নেই। তাই রুবিকে কলকাতায় পাঠাতে হ'ল উচ্চ শিক্ষার জন্যে।

মা বললেন, 'পড়তে হয় বাড়িতে বসে পড় না, কত মেয়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বছর বছর পাস করছে আর তোর একেবারে কলেজ না হলে চলবে না এমন কি কথা।'

কিন্তু কলেজে না পড়লে কি পড়ে আনন্দ আছে। রুবির কতদিনের কল্পনা, কতদিনের স্বপ্ন সহরের বড় কলেজে সে পড়বে। নামকরা প্রফেসারদের লেকচার শুনবো—কত বন্ধু-বান্ধব কত আমোদ আহ্লাদ। সে এক আলাদা জীবন, সে জীবনের কথা তাদের সহরেরই কয়েকজন পরিচিতা মেয়ের মুখে শুনেছে রুবি, তার চেয়েও বেশি করে পড়েছে গল্প উপন্যাসে।

রুবি প্রিয়গোপালকে ধরে পড়ল, 'না বাবা, আমি কলেজেই পড়ব।'

প্রিয়গোপাল মেয়ের আবাদার না রেখে পারলেন না। অবস্থা তখন স্বচ্ছল। মন প্রসন্ন। তিনি সম্মতি দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা পড়।'

তারপর নিজেই মেয়েকে সঙ্গে করে এনে কলকাতায় একটি অভিজাত কলেজে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন। প্রিয়গোপালের বড় এক খুড়তুতো ভাই আছেন বউবাজারে। প্রথমে ভেবেছিলেন তাঁর বাসাতেই রাখবেন রুবিকে, কিন্তু কৃষ্ণগোপাল রাজি হলেন না। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া তিনি পছন্দ করেন না। তাঁর নিজের মেয়েদের পনের পেরুতে না পেরুতেই বিয়ে দিয়েছেন। প্রিয়গোপাল তাঁর উপদেশ শুনে চলেননি বলে তাঁর উপর প্রসন্ন ছিলেন না দাদা। রুবির জন্য শেষ পর্যন্ত তাই হোস্টেলের ব্যবস্থাই করতে হ'ল প্রিয়গোপালকে। রুবি বেঁচে গেল। সেও তাই চেয়েছিল। জ্যেঠামশাইয়ের বাসায় থাকতে তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। এর আগে দু'একবার কলকাতায় বেড়াতে এসে তাঁর বাসায় কয়েকদিন থেকে গেছে। তাদের চালচলন আদবকায়দা জ্যেঠামশাই কি জ্যেঠাইমা কেউ পছন্দ করতেন না। দিদিরাও ঠাট্টা করে বলত, 'তোরা তো সব মেমসাহেব।'

হোস্টেলে এসে ভারি ভালো লাগল রুবির। একখানি ঘরের অর্ধাংশ একেবারে তার। খাট টেবিল চেয়ার বইয়ের র‍্যাক আলনা নিয়ে ছোটখাট একটি নিজস্ব রাজ্য। সে রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করে এমন সাহস কারো নেই। আর একটি মেয়ে অবশ্য ছিল মায়া ব্যানার্জী। রুবির সহকর্মিনী আর সহপাঠিনী। কিন্তু কোনদিক থেকেই সমকক্ষ নয়। তার গায়ের রঙ ময়লা, শান্ত নিরীহ চেহারা, মুখচোরা স্বভাব। অল্পদিনের মধ্যেই সে রুবির একান্ত অনুগত আর অনুবর্তিনী হয়ে পড়ল। শুধু মায়া কেন, হোস্টেলের আরো অনেক মেয়ে কলেজের সহপাঠী আর সহপাঠিনীর দল রুবির শ্রেষ্ঠতা কেউ স্বীকার না করে পারল না। শুধু রূপে নয় কথা-বার্তায় চাল-চলনে রুবির অনন্যতা প্রায় সকলেরই চোখে পড়ল। শুধু ছেলেরাই বা কেন, তরুণ অধ্যাপকরাও ক্রমে রুবির পক্ষপাতী হয়ে উঠতে লাগলেন। ও লাইবেরীতে গেলে সেখানে পাঠানুরাগীদের ভিড় জমে যায়, ডিবেটিং ক্লাবে মূক ছাত্র বাগ্মী হয়ে ওঠে। কলেজ ম্যাগাজিনে সহ-সম্পাদিকার পদ রুবির প্রতি বছর বাঁধা। অন্যান্য সম্পাদকরা রুবির সঙ্গে কাজের পরামর্শ করতে এসে হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলে। কথা ভুলে মুখের দিকে চুপ করে চেয়ে থাকে। তাদের মনোভাব বুঝতে রুবির দেরি হয় না। কিন্তু কাউকে সামান্য প্রশ্রয়ও দেয় না রুবি। সে জানে এখন ওসব নয়, আগে পড়াশুনো শেষ হোক—তারপরে। তারপরে যে কি হবে স্পষ্ট করে ভাবতে চায় না রুবি। তাকে অস্পষ্ট রাখতেই ভালো লাগে। সে কে! সে কিরকম তাকি এক কথায় বলা যায়। সে ছেলেবেলায় পড়া রূপকথার রাজপুত্রের মত। প্রথম

তারুণ্যের প্রিয় নভেলগুলির সব কটি নায়কের মত। আশেপাশে যারা ঘুরে বেড়ায়, রুবির সামান্য অনুগ্রহ লাভের যারা চেষ্টা করে, তাদের কারো সঙ্গেই তার মনের সেই কল্পপুরুষের তুলনা হয় না।

ফোর্থ ইয়ারে উঠেই মায়ার বিয়ে হয়ে গেল। তারপর এল রুবির পালা। রুবি প্রথমে খুবই আপত্তি করল, 'আমি এখনই বিয়ে করব না। আরো আমি পড়ব বাবা।' কিন্তু প্রিয়গোপাল এবার আর মেয়ের কথায় সায় দিলেন না, বললেন, 'বিয়ে করবার একটা বয়স আছে। সে-বয়স পেরিয়ে গেলে বিয়ের আর কোন মানে হয় না। তাছাড়া আমি তোমার সব কথা শুনি, সব আবদার রাখি কিন্তু আমার একটি কথাও কি তোমার শুনতে নেই ?'

শাসন নয় আদেশ-উপদেশ নয় বাবার কণ্ঠে অনুনয়ের সুর। রুবি একেবারে অনড় থাকতে পারল না। মা বললেন, 'ও বিয়ে করবে না ওর ঘাড়ে করবে। কেবল ওকে নিয়ে থাকলেই চলবে নাকি ? আমার আর ছেলেমেয়েরা কি ভেসে এসেছে ? রেখা বড় হয়ে উঠছে না ? তারও তো এবার বিয়ের চেষ্টা করতে হবে। ও যদি বিয়ে না করে, রেখার বিয়েই আগে দিয়ে দাও।'

রেখা রুবির ছোট বোন। তাকে বিয়ে দেবার প্রস্তাবটা রুবির মনঃপুত হ'ল না। বিয়ে সে করবে না একথা তো বলেনি। উপযুক্ত সময় আর পাত্র পেলেই করবে।

ইতিমধ্যে রুবির সমবয়সীদের প্রায় সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের ঘর-সংসার মাঝে মাঝে দেখেছে রুবি, বরদের সঙ্গে আলাপ করেছে। কারো কারো ছেলেমেয়েও হয়েছে। তাদের ধরন-ধারণ দেখলে মনে হয় তারা যেন একেকটি রহস্যরাজ্যের রাণী! রুবির এত বিদ্যাবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। দেখে শুনে রুবির মনও টলে উঠল। রেখাকে জানাল বিয়েতে তার অমত নেই।

অমত তো নেই, কিন্তু উপযুক্ত পাত্র মেলে কই। পাত্র যদি বা মেলে তাদের পণ-যৌতুকের দাবীর সঙ্গে প্রিয়গোপালের সামর্থ্যের মিল হয়না। প্রথমে নজর খুব উঁচুই ছিল তাঁর। আই. সি. এস., বি. সি. এস., বিলাতফেরৎ ডাক্তার আর ইঞ্জিনীয়ারের দিকেই তিনি হাত বাড়িয়ে ছিলেন। আশা ছিল তাঁর মেয়ের যখন রূপও আছে, বিদ্যাও আছে তখন আর ভাবনা কি। কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জনে বেশি দেরি হ'ল না তাঁর। শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই জেলা সহরের জজকোর্টের এক জুনিয়ার উকিলের সঙ্গে যখন সম্বন্ধ আনলেন রুবির মামা, প্রিয়গোপাল সাগ্রহেই তার সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন।

এক বন্ধুকে নিয়ে উৎপল চন্দ্র নিজেই এল মেয়ে দেখতে। রুবির নির্ভুল ইংরেজী

লেখা দেখে খুশি হ'ল, পাঠানুরাগের পরিচয় পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করল। রুবির মা মন্দাকিনী বললেন, 'কলেজে পড়া মেয়ে বলে ও যে শুধু বইই পড়েছে তা ভেব না, ঘর সংসারের কাজকর্মও ভালোই জানে।' উৎপলের বন্ধু বলল, 'একটু কম জানলেও ক্ষতি নেই। বিয়ে হয়ে গেলে ঘরকন্নার কাজ মেয়েরা নিজের গরজেই শিখে নেয়।'

বাড়িতে গিয়ে উৎপল তার কাকার জবানীতে এক চিঠি পাঠাল। মেয়ে তাদের অপছন্দ হয়নি। অন্য কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেলেই এ সম্বন্ধ করা যেতে পারে। দেড় হাজার টাকা নগদ, কুড়ি ভরি সোনা, এ ছাড়া জামাইকে যৌতুক হিসাবে যা দিতে সাধ যায় প্রিয়গোপাল তাই দেবেন। তা নিয়ে বরপক্ষ কোন আপত্তি করবে না। দাবীর ফর্দ দেখে প্রিয়গোপাল মাথায় হাত দিলেন, বললেন, 'এত টাকা কোথায় পাব।' রুবির মামা বললেন 'আরে রাখ। অত চাইলেই কি অত আমরা দিচ্ছি নাকি।' তারপর চিঠিপত্রে দর কষাকষি চলতে লাগল। শেষপর্যন্ত টাকার অঙ্ক দেড়হাজার থেকে একহাজারে নামল। কুড়ি ভরির ভার কিছু লাঘব হ'ল পনেরোয় এসে। কিন্তু তা দেওয়াও প্রিয়গোপালের পক্ষে কষ্টকর। রুবি বলল, 'বাবা, তুমি অত খরচ করতে যেয়ো না। তার চেয়ে আমার এম. এ. পড়বার ব্যবস্থা করে দাও। তা অনেক কম টাকায় হবে।'

প্রিয়গোপাল একটু হেসে বললেন, 'দুইয়ের মধ্যে তফাৎ আছে মা, যে ইউনিভার্সিটিতে তোমাকে পাঠাচ্ছি, তা অন্য সব ইউনিভার্সিটি থেকে বড়, তাই তার খরচও বেশি। রুবির মা মেয়েকে ধমক দিলেন, 'তুই এসব দেনা পাওনার কথার মধ্যে কেন আসিস। বেহায়া মেয়ে।'

রুবির পক্ষে অবশ্য এসব কথায় না থাকাটাই শোভন। কিন্তু সে না থেকে পারেই বা কি করে। মন যে খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকে। বাবা তো তাকে মূর্খ করে রাখেননি। কলকাতায় হোস্টেলে রেখে ভালো কলেজে পড়িয়েছেন, যথেষ্ট ব্যয় করেছেন তার জন্য, তবু কেন তাঁকে দেনা করে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তাহলে রুবির নিজের কৃতিত্ব রইল কিসে। তাহলে অল্পশিক্ষিত রেখা আর তার মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায়। একটা নিষ্ফল অসহায় অসন্তুষ্টিতে মন ভরে উঠল। তার থেকে পরিত্রাণের কোন পথ পেল না।

কিন্তু উৎসবের আনন্দটা সংক্রামক। বিয়ে বাড়ির উৎসবের ছোঁয়াচ আর সকলের মত তার মনে এসেও লাগল। রুবির ছোট ভাইবোনেরা নতুন জামা কাপড় আর জুতো পেয়ে খুশি হয়ে উঠল। রুবির যে দাদা বাড়িতে ফেরবার নাম করত না, সেও এই উপলক্ষে বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে বৈষয়িক পরামর্শে যোগ দিল, বিয়ের উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠল। দিন কয়েকের জন্যে সবাই ভুলে গেল যে এই খরচ জোগাতে বাবাকে চড়া

শুদে দেনা করতে হয়েছে, মা প্রায় বাক্স খালি করে নিজের সব গয়না স্যাকরার বাড়িতে পাঠিয়েছেন। সেই সোনা ভেঙে রুবির জন্যে নতুন গয়না হবে।

রুবি বলেছিল, 'মা সবই আমাকে দিলে তুমি কি পরবে।'

রুবির মা জবাব দিয়েছিলেন, 'তুই পরলেই আমার পরা হবে। আমি তো জীবন ভরেই পরলাম।'

রুবি বলেছিল, 'কিন্তু আমার ভারি খারাপ লাগছে মা।'

মা হেসে বলেছিলেন, 'খারাপ লাগবার কি আছে। তুই আবার তোর মেয়ের বিয়েতে এমনি করে দিবি।'

আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি ভরে গেল। সকলের কাছে রুবির যেন নতুন রূপ ধরা পড়েছে। ছোট ছেলে-মেয়েরা তার কাছ ছাড়া হতে চায় না। কে তার সবচেয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি।

শ্বশুর বাড়িতে রুবি এর চেয়েও বড় এক উৎসবের রাজ্যে গিয়ে পড়ল। পরনে গাঢ় লাল রঙের শাড়ি। গা ভরা গয়না। ঘর ভরা খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, স্বামীর স্বজন-বন্ধুদের দেওয়া রঙ-বেরঙের শাড়ি, বই, চায়ের সেট, ফুলদানী, নানা ধরনের প্রসাধনের উপকরণ। এ সবই তার। রুবি হঠাৎ এক পরম ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হয়েছে। শাশুড়ী দেওর আর ননদে ভরা এক নতুন জগৎ। সব নতুন নতুন মুখ। আর সেসব মুখে নতুন নতুন সম্বোধন। দিন ভরে কেবল বউমা আর বউদি। আর রাত ভরে শুধু রুবি আর রুবি। উৎপল দিনের বেলায় কারো সামনে তার নাম ধরে ডাকে না। কিন্তু রাত্রে রুদ্ধ ঘরে মুহুর্মুহু স্ত্রীর নাম কারণে অকারণে উচ্চারণ করে। সারাদিনের না ডাকা পুষিয়ে নেয়। রুবিকে শুনিয়ে শুনিয়ে গুন গুন করে, 'তোমারই নাম বলব নানা ছলে।'

রুবি মনে মনে ভাবে এর চেয়ে মেয়েদের বড় সুখ আর কি আছে। তার সমস্ত স্বপ্ন সমস্ত কল্পনা এই চার দেয়াল ঘেরা একখানি ঘরের মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে। তার বাল্যের রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রের দল, প্রথম কৈশোরের চুরি করে পড়া নভেলগুলির নায়কেরা মফঃস্বল সহরের একটি কালো রোগাটে চেহারার যুবকের মধ্যে রূপান্তর গ্রহণ করেছে। রুবি সুখী, খুব সুখী। পাড়া ভরে তার যশ ছড়িয়ে পড়েছে। এমন সুন্দরী বিদুষী বুদ্ধিমতী বউ সহরে আর আসেনি।

উৎপল একদিন বলল, 'তোমাকে জজ ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরেই ঠিক মানাত।'

রুবি হেসে বলল, 'কেন, এখানে কিছু কম মানিয়েছে নাকি!'

...তারপরে যেমন হয়ে থাকে, একটু একটু করে উৎসবের রঙ মিলিয়ে যেতে লাগল।

কুটুম্ব-স্বজনেরা বিদায় নিলেন। শ্বশুরবাড়ির আটপৌরে চেহারা আস্তে আস্তে ফুটে বেরুতে লাগল।

রুবির চোখে পড়ল তার শ্বশুরবাড়িটি বড় পুরনো। তার দাদাশ্বশুরের আমলের। সে-বাড়ি জীর্ণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভালো করে তার সংস্কার হয়নি। এর কারণ যে অর্থের অস্বাচ্ছন্দ্য তা বুঝতে রুবির দেরি হল না। কিন্তু একটা ব্যাপারে সে ভাল করে বুঝে উঠতে পারল না। নিজেদের চালচলন আদব-কায়দা রুচি-রীতিতেও এরা সেই ঠাকুরদার আমল বজায় রেখেছে কেন। তার সংস্কারে তো অর্থের প্রয়োজন হয় না। শুধু শিক্ষা আর বুদ্ধিই যথেষ্ট। সেই আধুনিক শিক্ষার আলো এদের বাইরে যতখানি পড়েছে, ভিতরে তার সিকির সিকিও গিয়ে পৌঁছায়নি। একথা ও যত বেশি জানতে পারল তত তার মন বিরূপ হয়ে উঠতে লাগল।

প্রথম আরম্ভ হ'ল ছোট ছোট ব্যাপার নিয়েই। রুবির ঘোমটা অত্যন্ত খাটো আর তাও তার মাথায় সব সময় থাকে না। এই নিয়ে বাড়িতে সমালোচনা চলতে লাগল। শুধু বাড়িতে নয়, পাড়ায় শাশুড়ীর সমবয়সীদের মধ্যেও ওর বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকানো সুরু হল। নতুন বউ হিসেবে তার লাজলজ্জা কম, সঙ্কোচের বালাই নেই। সব পুরুষের সঙ্গেই কথা বলে। বরং মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের সঙ্গে আলাপ করতেই তার যেন বেশি আগ্রহ। আর সবচেয়ে বড় অভিযোগ রুবি কারো কোন কথা মানে না, কোন উপদেশ নির্দেশ শুনতে চায় না। আদেশ-নির্দেশ উৎপলও দিতে সুরু করল। একদিন রাত্রে ভূমিকা করে বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি। কুমারী বয়সে কলেজের হোস্টেল-বোর্ডিংএ মেয়েদের যেভাবে কাটে, বাপেরবাড়িতে যেভাবে চলে, শ্বশুরবাড়ি এসে ঠিক সেভাবে চলে না।

রুবি বলল, 'কেন চলবে না, শ্বশুরবাড়ি যদি আমার নিজের বাড়িই হয়, তাহলে সেখানেও আমার সমান অধিকার—সমান স্বাধীনতা থাকবে। এ তো তোমার শ্বশুরবাড়ি নয় যে একদিন দু'দিনের জন্যে গেলে আর কুটুম্বের মত কাটিয়ে এলে। মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি মানে নিজের বাড়ি। সেখানকার সে স্থায়ী বাসিন্দা।'

উৎপল বলল, 'দেখ ওসব বড় বড় কথা নাটক নভেলে পড়তে ভালোই লাগে। কিন্তু ঘর-সংসারের বেলায় ওসব বুলি তেমন কাজে আসে না। দশজনের সংসার। তাদের সবাইর সঙ্গে যদি মানিয়ে চলতে না পারো, তাহলে পদে পদে তোমাকেই অসুবিধা ভোগ করতে হবে।'

দশজনের সঙ্গে তো দূরের কথা, একজনের সঙ্গে মানিয়ে চলাই রুবির পক্ষে ক্রমে দুঃসাধ্য হয়ে উঠতে লাগল। সে লক্ষ্য করল যে-উৎপল স্যুট পরে গলায় টাই বেঁধে

জজকোর্টে ওকালতি করতে যায়, উচ্চশিক্ষিত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা করে, তার সঙ্গে লুঙ্গি-পরা গা-খোলা গৃহকর্তা উৎপলের অনেক তফাৎ আছে। সামাজিক চেহারার সঙ্গে তার পারিবারিক চেহারায় অনেক অমিল। বন্ধুমহলে উৎপল বেশ মিশুক সদালাপী। কিন্তু বাড়িতে ঢুকলেই তার মূর্তি যেন বদলে যায়, বাড়ির লোকজন সবাই তার ভয়ে তটস্থ। যেন সকলেই তার মক্কেল-মুহুরী। সব সময় তার মতটাই প্রধান, তার হুকুমটাই বড়।

উৎপলের এই একাধিপত্য বাড়ির আর সকলের মত রুবি যদি মেনে নিতে পারত তাহলে কোন গোলমাল বাধত না। কিন্তু ওর মনটা অত মানানসই নয় বলেই যত উপসর্গের সুরু হ'ল। প্রথমে তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে কথান্তর মতান্তর, তারপর একটু বড় উপলক্ষ্য ঘটল। উৎপলের বাড়ির সোজাসুজি লালরঙের দোতলা নতুন বাড়িটা ফণী চাটুজ্যে নামে একজন সাবজজ এসে ভাড়া নিলেন। আর তার ভাই মণিমোহন গরমের ছুটিতে দাদার কাছে বেড়াতে এল। কলকাতায় হোস্টেলে থেকে এম. এ. পড়ে। বেশ সুদর্শন চটপটে চালাক চতুর ছেলে। সপারিবারে সাবজজকে উৎপলই একদিন চায়ের নিমন্ত্রণ করল। তাঁর কোর্টে গোটা দুই মোকদ্দমা ছিল উৎপলের। পরের সপ্তাহে সাবজজের বাড়ি থেকেও নিমন্ত্রণ এল। তাঁদের আদব-কায়দা, ড্রয়িংরুম সাজাবার ধরন থেকে সুরু করে সবকিছুই রুবির পছন্দ হ'ল। একথাও রুবির বুঝতে বাকি রইল না যে ওদের বাড়ির সকলেরও তাকে পছন্দ হয়েছে।

তারপর থেকে প্রায়ই তাদের বাড়ি থেকে রুবির ডাক পড়তে লাগল। মণিমোহন নয় তার বউদিই ডেকে পাঠান। কখনো বা রেডিওর ভালো প্রোগ্রাম শুনতে, কখনো বা তাস খেলার সঙ্গী হতে। বলাবাহুল্য সে আসরে মণিমোহন রোজ থাকে। কিন্তু রুবি না থাকলে কোনদিনই আসর জমে না।

দিন কয়েক বাদে শাশুড়ী হঠাৎ একদিন অনুশাসনের সুরে বললেন, 'বউমা, ওবাড়িতে তুমি আর যেয়ো না।'

রুবি বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন মা?'

শাশুড়ী বললেন, 'আমি কৈফিয়ৎ দিতে পারব না। নিষেধ করলুম, শুনতে হয় শোন, না হয় না শোন।'

অযৌক্তিক নিষেধ শুনতে রুবি রাজী নয়। তাছাড়া একটা ভদ্রতাবোধ তো আছে। কোন ঝগড়া নেই, মনোমালিন্য নেই, বাড়ির কাজ-কর্মের কোন ক্ষতি হচ্ছে না। হঠাৎ ওখানে যাওয়া বন্ধ করলে কাজটা কি ভালো দেখায়? তাই সুধাদি নিজে যখন ফের ডাকতে এলেন, না গিয়ে পারল না।

কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ার ফল ফলতে দেরি হ'ল না। সেদিনই রাত্রে উৎপল চোখ পাকিয়ে তার কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করে বসল, 'কেন তুমি ও বাড়িতে গিয়েছিলে। আমার মার কথা তোমার গ্রাহ্য হয় না।'

রুবি বলল, 'কেন, গেলে কি দোষ?'

উৎপল বলল, 'নিশ্চয়ই দোষ আছে। যাও তো মণিমোহনের সঙ্গে আড্ডা দিতে।'

রুবি বলল, 'মিথ্যে কথা। সে সবসময় বাড়িতে থাকে না। প্রায়ই সাইকেল নিয়ে ঘুরতে বেরোয়। মণিবাবুর বউদি থাকেন, তাঁর বোন মাধুরী থাকে। আমরা সবাই মিলে গল্পগুজব করি।'

উৎপল বলল, 'কি কর না কর সবই আমার কানে যায়। ওসব তাস খেলা আর আড্ডা দেওয়া আমার বাড়িতে থেকে চলবে না। ঘরের বউ তুমি, ঘরের বউয়ের মতই তোমাকে থাকতে হবে।'

রুবি বলল, 'বেশ।'

পরদিন মাথা ধরার অছিলায় রুবি আর সেদিন সাবজজের বাড়িতে গেল না। তার শাসনে ফল হয়েছে ভেবে উৎপল ভারি খুশি হোল। রাত্রে স্ত্রীকে যখন আদর করতে এল, রুবি হঠাৎ তাকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'খবরদার আমাকে ছুঁয়ো না। তুমি দিন ভরে ঝগড়া করবে, আর রাত্রে সোহাগ জানাতে আসবে—এ আমি সইতে পারব না।'

উৎপল দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'আলবৎ সইতে হবে।'

তারপর রুবির একান্ত অনিচ্ছা আর আপ্রাণ প্রতিরোধকে অগ্রাহ্য করে উৎপল তাকে বুকের ওপর তুলে নিল। রুবির মনে হ'ল এ তো আদর নয়, এ পীড়নেরই আর এক রূপ। নারী-পুরুষের এ সুস্থ স্বাভাবিক মিলন নয়। মিলনের ছদ্মবেশে এক বিকৃত ব্যাভিচার। তারপর থেকে বেশির ভাগ রাতই সেই ব্যাভিচারের বিস্বাদে ভরে উঠল রুবির।

…ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ায় মণিমোহন বিদায় নিল। দিন কয়েক বাদে একখানা চিঠি লিখল তার বউদির চিঠির মধ্যে। অতি সাধারণ চিঠি। রুবির সঙ্গে আলাপ করে মণিমোহনের খুব ভালো লেগেছে। বিশেষত ব্রীজের পার্টনার হিসেবে রুবির তুলনা হয় না। শেষের ক'দিন রুবি কেন তাদের তাসের আসরে যেত না? মণিমোহনরা কি কোন অপরাধ করেছে? যদি করে থাকে, তার কি কোন মার্জনা নেই?

রুবি ভেবেছিল চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু ছিঁড়তে শেষপর্যন্ত মায়া হ'ল। চিঠিখানা রাখল দেরাজের মধ্যে।

কিন্তু ননদ তার দাদাকে কখন যে কথাটা লাগিয়েছে, রুবি টের পায়নি। উৎপল সেদিন কোর্টে যাওয়ার আগে বলল, 'কই দাও দেখি চিঠিটা।'

রুবি অবাক হয়ে বলল, 'কোন্ চিঠি?'

উৎপল গম্ভীরভাবে বলল, 'যে চিঠি মণিমোহন লিখেছে।'

রুবি বলল, 'ও চিঠি আমার কাছে লেখা। তুমি ওর কি দেখবে?'

উৎপল বলল, 'আমার দেখা দরকার।'

'বেশ দেখ।' বলে রাগ করে চিঠিটা রুবি ছুড়ে দিল স্বামীর দিকে।

উৎপল চিঠিটা পড়ে একটু হেসে বলল, 'তবে এতদিন ধরে সতীপণা করছিলে! তবে নাকি সাবজজের বউ, বোন আর ছোট ছেলেমেয়েদের ছাড়া তুমি আর কাউকে চিনতে না!'

রুবি বলল, 'চিনতাম না সেকথা কখনো তো বলিনি।'

উৎপল বলল, 'কিন্তু যতখানি চিনতে তার অল্পই আমাদের বলেছ। আজ সব বলতে হবে।'

রুবি বলল, 'আমি আর কিছু বলব না। আমার আর কিছু বলবার নেই।'

তারপর থেকে আরো কড়া শাসন সুরু হ'ল। রুবির কোথাও বাইরে বেরোবার জো রইল না। অন্য বাড়ির কোন লোকের সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ হ'ল। তার বাপের বাড়ি থেকে কি কলেজের দু'একজন বান্ধবীর কাছ থেকে যেসব চিঠি পত্র আসে, উৎপল সব খুলে খুলে দেখে।

রুবি একদিন আপত্তি করল, 'আমার চিঠি রোজ তুমি কেন খুলবে?'

উৎপল বলল, 'আগে তো খুলিনি, এখন খোলা দরকার বোধ করছি।'

রুবি বলল, 'যত দরকারই তুমি বোধ কর না, আমার মত না নিয়ে আমার চিঠি খুলে পড়বার কোন অধিকার তোমার নেই।'

কিন্তু উৎপলের বাড়িতে থেকে সাধ্য কি ওর অনধিকার চর্চাকে রুবি বাধা দেয়? ঝগড়া আর কান্না ছাড়া আর কোন্ অস্ত্র আছে তার হাতে? চারদিকে দেয়াল ঘেরা যে-ঘরকে মনে হয়েছিল সুখের স্বর্গরাজ্য, তাকেই প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে কারাগার বলে মনে হতে লাগল। মনে হ'ল এই কারাগৃহ ভেঙে বের হতেই হবে। নইলে আর বাঁচবে না সে। শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবে।

...শেষে রুবির চিঠি পেয়ে প্রিয়গোপাল ব্যস্ত হয়ে তাকে দেখতে এলেন। মেয়েকে সুস্থ দেখে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'যাক, ভালোই আছিস তাহলে।'

রুবি বলল, 'হ্যাঁ খুব ভালো আছি। আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল বাবা।'

রুবির বাবা বললেন, 'বেশ চল। তোর মাও তোকে দেখতে চাইছে। অনেকদিন তো যাসনে।'

কিন্তু উৎপল বাধা দিল। উৎপলের মা বাধা দিলেন। রুবির এখন যাওয়া হতে পারে না। উৎপলের এক জ্ঞাতি ভাইয়ের বিয়ে। এ অবস্থায় বাড়ির বউ বাড়ি ছেড়ে যায় নাকি? তারপর রুবির বাপকে একটু আড়ালে ডেকে তার শাশুড়ী বললেন, 'মেয়েকে লেখাপড়াই শিখিয়েছিলেন বেয়াই, কিন্তু কোন সংশিক্ষা দিতে পারেননি।'

প্রিয়গোপাল ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কেন, কি করেছে ও?'

রুবির শাশুড়ী জবাব দিলেন, 'কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা বলব। আপনার মেয়ের কি গুণের অভাব আছে?'

রুবি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সবই শুনতে পেল আর প্রচণ্ড রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল।

খানিক বাদে প্রিয়গোপাল বেরিয়ে এসে বললেন, 'একটু বুঝে সুঝে মানিয়ে টানিয়ে চলিস রুবি। জানিস তো আমাদের দিন-কাল কি খারাপ যাচ্ছে! কারবার পত্র একেবারেই ডুবেছে। সংসার চলা ভার। মনে শান্তি নেই। তারপর তোর এখানে এসে যদি এরকম শুনি—'

সবকথার জবাবে রুবির এককথা, 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও বাবা।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'তোর সেই দেওরের বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর উৎপল নিজেই তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, ওর সঙ্গে আমার সেই কথাই হয়েছে।'

বাবার ভীরুতা দেখে রুবির রাগ হ'ল। তিনি চলে যাওয়ার পর রুবি শাশুড়ীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'কেন আপনি আমার বাবাকে অমন করে অপমান করলেন?'

শাশুড়ী মুখ ভেংচিয়ে বললেন, 'অপমান? যে বেহায়া বদমাস মেয়ের জন্ম দিয়েছে তোর বাবা, তাতে তার দুর্ভোগের এখনো ঢের বাকি। অপমানের এখনই হয়েছে কি।'

রুবি চড়া গলায় বলল, 'খবরদার যা তা বলবেন না, তুই তোকারি করবেন না আমার সঙ্গে।'

কথাটা কানে যেতেই উৎপল ঘর থেকে বারান্দায় লাফিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরল স্ত্রীর। তারপর চীৎকার করে বলল, 'আমার মাকে চোখ রাঙাস এত বড় আস্পর্দা তোর!' এখন আর ওর পরনে লুঙ্গি কাঁধে গামছা নেই। কোর্টে বেরোবার সুসভ্য বেশে সে সজ্জিত। সাবজজের স্ত্রী আর বোন এসে তাঁদের জানালায় দাঁড়ালেন। আশেপাশে অন্য বাড়িগুলির জানালায়ও কৌতূহলী বউ-ঝিয়েদের ভিড় বাড়ল।

টানতে টানতে উৎপল রুবিকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল, কিন্তু ব্যাপারটা আর বেশিদূর গড়াতে পারল না। দেওর-ননদেরা এসে তাদের দাদাকে ছাড়িয়ে নিল।

সেই রাত্রে বেশ ভোরবেলায় যে ট্রেন ছিল রুবি সেই ট্রেনে বাপের বাড়ি পালিয়ে চলে এল। ইচ্ছা ছিল সবাইকে জানিয়েই আসে। কিন্তু আশঙ্কা হ'ল, তাহলে আর আসতে পারবে না।

বাবা মা দেখে অবাক হলেন। রুবি তাঁদের কাছে সবই খুলে বলল। তবু মা বললেন, 'কিন্তু এভাবে লুকিয়ে এলি কেন। এতে কত দুর্নাম রটতে পারে তা জানিস ?'

রুবি অভিমান করে বলল, 'আমার প্রাণের চেয়ে দুর্নামের ভয়ই তোমাদের বেশি হ'ল মা ?'

মা বললেন, 'মেয়েদের ওর চেয়ে বড় ভয় আর কি আছে ?'

রুবি বলল, 'অন্য মেয়ের বেলায় হয়ত নেই। কিন্তু আমার কাছে প্রাণের দাম বেশি, তার চেয়েও বেশি দাম নিজের সম্মানের।'

মা একথা মানলেন না। গোপনে গোপনে চিঠি দিলেন তাঁর বেয়ানকে। তাঁর মেয়ে অনেক দোষে দোষী। তবু সে তো উৎপলেরই বউ। তিনি যেন তাকে ক্ষমা করে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু রুবির শাশুড়ী এর উত্তরে কড়া চিঠি লিখলেন। অমন বউকে ফিরিয়ে নেওয়ার গরজ তাঁদের মোটেই নেই। যদি দরকার থাকে, মেয়ের বাপই যেন মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে আসেন।

কিন্তু প্রিয়গোপাল আর যেতে রাজী হলেন না। এই নিয়ে রুবির বাবা আর মার মধ্যে দাম্পত্য-কলহ চলতে লাগল। পাড়াপড়শীরা রুবিকে দেখে নানাজনে নানা মন্তব্য করল। শ্বশুর বাড়ি থেকে রুবির পালিয়ে আসবার কাহিনীটা কারো আর জানতে বাকি নেই। ছোট্ট মহকুমা সহরের প্রত্যেকটি চায়ের দোকানে, বাজারে, বারলাইব্রেরীতে ঘটনাটা নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ল। ঘর থেকে রুবির বাইরে বেরোন দায়। পাড়ার বকাটে ছেলেরা তাকে দেখে শিস দেয়, তেরচা চোখে তাকিয়ে অদ্ভুত সব মুখভঙ্গি করে।

ঘরেও শান্তি নেই। সেখানে মায়ের হা-হুতাশ আর গঞ্জনা। বাপেরবাড়িতে কুমারী অবস্থায় যে আদর ছিল রুবির, এখন আর তার কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। অভাবের সংসারে রুবি এখন বোঝার ওপর বোঝা। বাবা মা এক জায়গায় হলেই আফশোস করেন, 'অতগুলি টাকা খরচ করে বিয়ে দিলাম—দুটো বছরও গেল না। সব জলে গেল।'

রুবি শোনে আর হাসে। তার মনের অশান্তির চেয়ে টাকার শোকটাই বাবা মার কাছে বড় হয়ে উঠল। এই ওঁদের সন্তান স্নেহ! মিথ্যে—সব মিথ্যে। স্নেহ মায়া মমতা

ওসব ভালো ভালো কথা যেমন নরম তেমনি ক্ষণভঙ্গুর। ওদের কোন দাম নেই। সংসারে দাম শুধু আছে অর্থের। আসলে তাই পরামার্থ।

এ খোঁটাও রুবিকে শুনতে হ'ল যে তার কলঙ্কের জন্যেই ছোটবোন রেখার বিয়ে হচ্ছে না। বার বার ভালো ভালো সম্বন্ধ এসে ভেঙে যাচ্ছে।

...তারপর থেকে ঘরে বসেই চাকরির জন্যে দরখাস্ত পাঠাতে লাগল রুবি। কলকাতার অফিসে অফিসে স্কুলে স্কুলে তার গুণ যোগ্যতার বর্ণনা দিয়ে নানা ধরনের আবেদন পাঠাল। কিন্তু কোন জায়গা থেকেই কোন জবাব এল না। সহপাঠিনীদের কাছেও চিঠি লিখল। আর লিখলো মণিমোহন চাটুয্যের কাছে। তার কাছ থেকে জবাব এল। নীলরঙের প্যাডের কাগজে চিঠি লিখেছে মণিমোহন। লিখেছে তার বউদি আর বোনের চিঠিপত্রে সবই সে জানতে পেরেছে। রুবির মত মেয়ের এই অবস্থা ঘটেছে জেনে তার দুঃখের শেষ নেই। তার উপকারের জন্যে মণিমোহন সবই করতে পারে।

রুবি তার জবাবে জানাল আপাতত কোন গার্লস স্কুলে একটি মাস্টারী আর কোন সস্তা হোস্টেলে একটুখানি থাকবার জায়গা পেলে সে বর্তে যায়। এর চেয়ে বড় কাম্য তার আর নেই।

আশ্চর্য, দিন পনেরোর মধ্যেই রুবির আশা পূরণ করল মণিমোহন। শ্যামবাজারের সর্বমঙ্গলা গার্লস হাইস্কুল থেকে ইণ্টারভিউ এল রুবির। সেখানকার হেডমিস্ট্রেস মণিমোহনের আত্মীয়া।

রুবির বাবা মা দু'জনেই আপত্তি করলেন। কিন্তু রুবি সেসব আপত্তি না শুনে পাড়া-সম্পর্কে এক কাকার সঙ্গে কলকাতায় এসে হাজির হ'ল।

তখনো রুবির সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা।

...হেডমিস্ট্রেস বললেন, 'আপনি বিবাহিতা। স্বামীর মত আছে তো এ-কাজে।'

রুবি মৃদুস্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

হেডমিস্ট্রেস বললেন, 'দেখবেন যেন শেষ পর্যন্ত কোন ফ্যাসাদে না পড়তে হয়।'

রুবি বলল, 'না না, সেজন্যে ভাববেন না।'

হেডমিস্ট্রেস বললেন, 'আপনার চাকরির কি দরকার পড়লো। তিনি কি কোন কাজকর্ম করেন না?'

পুরোপুরি সত্যকথা বলায় বিপদ আছে। রুবি তাই অসত্যের আশ্রয় নিল, বলল, 'যা করেন, তাতে সকলের কুলোয় না।'

...চাকরি হয়ে গেল রুবির। হেডমিস্ট্রেসই একটি হোস্টেলের সন্ধান দিলেন। স্কুলের আরো কু'জন টিচার সেখানে থাকে। এছাড়া অফিসের চাকরীজীবিনীরাও জনকয়েক

আছে। দেখে রুবির ভরসা হ'ল। কাজের দরকায় একারই তার হয়নি। তার দলে আরো অনেকে আছে।

মণিমোহন তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের মায়া কাটায়নি। ইংরেজীতে রেজাল্ট আশানুরূপ হয়নি বলে ফের ইতিহাস নিয়ে পড়ছে। সে প্রায়ই রুবির সঙ্গে দেখা করতে আসে। ঠিক হ'ল রুবিও ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষা দেবে। কিন্তু দু'জনের সেই ইতিহাস-চর্চা দেখে হোস্টেলের অন্য অন্য বাসিন্দারা আড় চোখে তাকায়, গা টেপাটিপি করে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেও ছাড়ে না, 'উনি তোমার কে হন।'

রুবি জবাব দেয়, 'বন্ধু।'

এতে তাদের কৌতূহল বাড়ে ছাড়া কমে না।

···এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। রুবি সেদিন ক্লাসে ঢুকে সবে রোলকল শুরু করেছে, হেডমিস্ট্রেস অফিস-ঘরে তাকে ডেকে পাঠালেন। কে একজন ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

রুবি হেডমিস্ট্রেসের ঘরে গিয়ে দেখল উৎপল এসে একটা চেয়ার চেপে বসে। তার মুখ গম্ভীর। বর্ষীয়সী চিরকুমারী হেডমিস্ট্রেসের মুখও থমথম করছে।

রুবি ঘরে ঢুকতে তিনি উৎপলকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি আপনার স্বামী ?'

রুবি মাথা নিচু করে মৃদুস্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

হেডমিস্ট্রেস বললেন, 'আপনি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলেন ? অথচ এখানে কাজ নেওয়ার সময় বলেছিলেন সংসার চলে না বলেই আপনি স্বামীর সম্মতি নিয়ে চাকরি করতে বেরিয়েছেন।'

উৎপল গর্জে উঠল, 'She is a damn liar.'

হেডমিস্ট্রেস তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আস্তে। অত চেঁচাবেন না। এটা একটা স্কুল।' তারপর রুবির দিকে তাকিয়ে ফের তিনি আদেশ করলেন, 'আমার কথার জবাব দিন।'

রুবি বলল, হ্যাঁ, পালিয়ে এসেছিলাম ঠিকই। কিন্তু কেন এসেছিলাম, সেকথা ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন।'

হেডমিস্ট্রেস একটুকাল গম্ভীর থেকে বললেন, 'আমার প্রয়োজন নেই। নিজেদের ঝগড়া নিজেরা মিটিয়ে নিন, তা যদি না পারেন কোর্টে যান। দয়া করে এখানে আর হাঙ্গামা করবেন না। এটা ভদ্রঘরের মেয়েদের স্কুল। থানা নয়, আদালতও নয়। আর মিসেস দে, আপনি দু'মাসের ছুটি নিন। এসব গোলমাল যতদিন না মেটে ততদিন আপনাকে আর আসতে হবেনা।'

'স্কুল থেকে বেরিয়ে দু'জনে রাস্তায় এসে নামল।

উৎপল বলল, 'তোমার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হচ্ছি।'

রুবি জবাব দিল, 'আমিও অবাক হচ্ছি তোমার মূর্খতা দেখে। ভেবেছিলাম ওকালিতি করে খাও, কিছু বুদ্ধি-শুদ্ধি অন্তত আছে। নিজের নাক কেটে আমার যাত্রাভঙ্গ করে তোমার কি লাভ হ'ল।'

উৎপল বলল, 'এ-কথার জবাব বাড়িতে গিয়ে দেব, এখানে নয়। চল আমার সঙ্গে।'

রুবি বলল, 'আমি যাব না।'

উৎপল বলল, 'তুমি যাবে না তোমার ঘাড় যাবে। জানো এখনই যদি আমি পুলিসে খবর দিই—'

রুবি বলল, 'দাও না। পুলিশের কাছে আমারও বলবার আছে।'

রাস্তায় ভিড় জমে যাচ্ছিল, উৎপল রুবির সঙ্গে তার হোস্টেল পর্যন্ত এল। সেখানেও আরেক দফা শাসন অনুশাসন এমনকি অনুনয় বিনয়ের পালা চলল। কিন্তু রুবির মুখে এক কথা। সে এখন কিছুতেই যাবে না। নিজে চাকরি-বাকরি করে স্বাধীন ভাবে থাকবে। তারপর যদি উৎপলের স্বভাব বদলায় আর রুবির মনের পরিবর্তন ঘটে, তখন ফের একসঙ্গে থাকবার কথা ভেবে দেখা যাবে।

কিন্তু রুবির এই ঠাণ্ডা কথায় উৎপলের মাথা গরম হয়ে উঠল। সে কুৎসিত ভাষায় চীৎকার করে বলতে লাগল, 'মাগী বদমাস, তুমি আমার পরিচয় দিয়ে শাঁখা সিঁদুর পরে সতী সেজে যা খুশি তাই করে বেড়াবে আর আমি বেঁচে থেকে তা সহ্য করব, তাই ভেবেছ না?'

রুবি বলল, 'আমার ভুল হয়েছিল। আজ তোমার পরিচয়ের সব চিহ্ন আমি মুছে ফেলব। যাও এখান থেকে চলে যাও তুমি। আর যেন আমাদের দেখা সাক্ষাৎ না হয়।'

উৎপল শাসিয়ে গেল, 'আলবৎ হবে। তোকে আমি জেলে দেবো।'

হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টের কড়া হুকুমে উৎপলকে খানিকবাদে বিদায় নিতে হ'ল। এত কাণ্ডের পর রুবিরও আর সেখানে স্থান হ'ল না। নতুন আশ্রয় খুঁজে নিতে হ'ল।

এই পর্যন্ত বলে কাহিনীতে রুবি ছেদ টানল।

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল দু'জনে। একটু বাদে বিভাস আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর?'

রুবির হাসির শব্দ শোনা গেল, 'তারপর? এর পরেও আপনার কৌতূহল আছে?'

বিভাস বলল, 'আছে।'

রুবি বলল, 'আশ্চর্য। কিন্তু তারপরের কাহিনী বড় গোলমেলে। বড় বাঁকাচোরা ঘোরানো জড়ানো। আপনার মত সুবোধ সরল মানুষের তা ঠিক শোনবার যোগ্য নয়।'

বিভাস বলল, 'দেখুন যে মানুষ সরল সেই মানুষ আবার জটিল। আমি আপনার মত জমকালো বেশের অনুরক্ত নই বলেই যে জীবনে আমার কোন জটিলতা নেই তা ভাবলে ভুল করবেন। জটিলতা আপনারও আছে আমারও আছে। তবে আপনি জট পাকিয়ে আনন্দ পান, আমি জট খুলে আনন্দ পাই, এইটুকুই যা তফাৎ। শিল্পীর সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের যে প্রভেদ। আপনি জীবন-শিল্পী, আমি জীবন-বিজ্ঞানী।'

জীবন-শিল্পী! এত বড় কথা শুনে হঠাৎ বড় চমক লাগল রুবির। এর আগে বহু পুরুষের মুখ থেকে তার রূপ-গুণের নানারকম স্তুতি সে শুনেছে। কিন্তু সে যে জীবন-শিল্পী এমন কথা তো কেউ বলেনি। কথাটা অন্য কেউ বললে একে মিথ্যে চাটুকারিতা বলে রুবি হেসে উড়িয়ে দিত। তার মুখের ওপর বলত, 'হ্যাঁ আমি জীবন-শিল্পী বটে। তবে নিজের জীবন নিয়ে নয়, তোমাদের জীবন নিয়ে আমি সেই শিল্প-রচনার খেয়াল মেটাই। খোদার ওপর খোদকারী করি। খোদাইকরা যত সব শিব আর বুদ্ধ মূর্তিকে ভেঙে ভেঙে বাঁদর আর হনুমান বানাই।' কিন্তু বিভাস তো স্তুতি করেনি, পরিহাস করেনি, ওকে কি জবাব দেবে রুবি। এই লোকটির চালচলন-কথাবার্তা সব সিসার মত ভারি। ওকে অত সহজে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রুবি বলল, 'আপনি বোধহয় বলতে চেয়েছেন জীবন সম্বন্ধে শিল্পীর যে মনোভাব আমার ভাবভঙ্গি অনেকটা সেই রকমের। কি জানি! আমি যে কি আর কি নয় তা অত করে ভেবে দেখিনি।'

বিভাস বলল, 'সে থাকগে। আপনার কাহিনী এবার শেষ করুন।'

রুবি হেসে উঠল, 'শেষ? মৃত্যুর আগে কি জীবন-কাহিনীর শেষ হয় বিভাসবাবু। মাঝে মাঝে মনে হয় বটে, এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল। এর পরে আর কিছু নেই। কিন্তু কখন যে পুনশ্চ দিয়ে লেখা সুরু হয়ে যায় টেরও পাইনে। টের যখন পাই দেখি বড় দেরি হয়ে গেছে, তখন সে লেখা পছন্দ না হলেও ফের আর মুছে ফেলবার জো থাকে না।'

বিভাস বলল, 'লেখা অপছন্দ হচ্ছিল গোড়া থেকে তা কি বুঝতে পারেননি?'

রুবি বলল, 'না। আপনার মত বুদ্ধিমান তো সবাই নয়। ভেবেছিলাম সব শেষ হয়ে গেল। স্বামী শেষ পর্যন্ত আইন আদালত করতে সাহস পেল না। আত্মীয় বন্ধুরা পরামর্শ দিল, যে মেয়েমানুষ নষ্ট হয়ে বেরিয়ে গেছে কিম্বা বেরিয়ে গিয়ে নষ্ট হয়েছে তার

পিছনে অর্থব্যয়ে কোন্ পুরুষার্থ বাড়বে ? তার চেয়ে ফের বিয়ে করা ভালো। বাঙলা দেশে মেয়ের তো আর অভাব নেই।'

বিভাস বলল, 'তারপর ?'

রুবি হাসল, 'রূপকথাপ্রিয় সেই ছেলেমানুষটি আপনার মত নৈয়ায়িক আর নীতি-বাগীশের মধ্যেও লুকিয়ে আছে দেখছি। ভেবেছিলাম এই শেষ। পুরুষের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধে আমি জড়াব না। স্বাধীন ভাবে থাকব। চাকরি-বাকরি আর পড়াশুনো নিয়ে জীবনটা বেশ কেটে যাবে। কিন্তু মণিমোহন তা হতে দিল না, আমাকে নিয়ে ও কবিতা লিখতে সুরু করল। ততদিনে আমি হাতের শাঁখা খুলে সিঁদুর তুলে ফেলেছি। উৎপল খোঁটা দিয়েছিল বলেই নয়, শাঁখা সিঁদুর রাখার অনেক অসুবিধে বলে। ওসব আছে তো স্বামী নেই কেন ? কৈফিয়তের জবাবদিহি করতে করতে প্রাণ যায়। সব সময় জুৎসই কথা মুখে জোগায় না।'

বিভাস বলল, 'তারপর সেই কবিতার রঙ বুঝি আপনার মনে লাগল ?'

রুবি একটু হেসে বলল, 'হিংসে হচ্ছে নাকি! শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আপনার হিংসা দ্বেষ নেই, কিন্তু আমার অন্য বন্ধুরা সবাই মণিমোহনের কথা শুনে তাকে হিংসে করেছে। তাদের ধারণা আমি সত্যিই বুঝি সেই কাঁচা ছন্দের ডাঁসা কবিতা ভালোবেসেছিলাম।'

বিভাস বলল, 'ভালোবাসতে পারলে ভালোই হ'ত।'

রুবি বলল, তাই নাকি! কিন্তু মণিমোহনের বিচক্ষণ সাবজজ দাদার তা মনে হয়নি। খবর পেয়ে তিনি কলকাতায় এসে ভাইয়ের ভালোর জন্যে তাকে দারুন শাসন করলেন। ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ায় আত্মীয়-স্বজন মহলে ছি ছি পড়ে গেল। কাউকে মুখ দেখাবার আর জো রইল না মণিমোহনের। কিছুদিন বাদে লজ্জায় দুঃখে অভিমানে সে বনে নয়, বিলেত চলে গেল। মাস তিনেক বাদে আমাকে যেতে হলো ডাঃ দের ক্লিনিকে।'

বিভাস বলল, 'ক্লিনিকে ? কেন ?'

রুবি রূঢ়স্বরে বললে, 'আপনি কি না বুঝবার ভাণ করছেন ? না কি আমি কতখানি স্পষ্ট করে বলতে পারি তার পরীক্ষা নিতে চান ? ক্লিনিকে যেতে হয়েছিল কারণ আমাদের সেই কাব্য-চর্চা নিতান্ত নিষ্ফল হয়নি। সেই ফল সমূলে তুলে ফেলবার জন্যে ডাক্তারের ছুরির দরকার হয়েছিল।'

বিভাস মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'ছিঃ। এই ডাঃ দে—'

রুবি বলল, 'কিন্তু ওঁর কোন দোষ নেই, উনি তখন আমার বন্ধুর কাজই করেছিলেন।'

বিভাস বলল, 'তারপর ?'

কবি বলল, 'তারপর আর কি ?' ডাক্তারের সেই বন্ধুত্বের ঋণ আজ পর্যন্ত শোধ দিয়ে উঠতে পারিনি। চক্রবৃদ্ধি হারে তা শুধু বাড়ছে, কেবলি বাড়ছে।'

বিভাসের মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না।

কবি হেসে বলল, 'আমি জানি এ-কাহিনী আপনার হজম করতে কষ্ট হবে। এর আগের শ্রোতাদের কাছে সহজ পাচ্য করে এনেছি। কিন্তু আপনি সৎসাহসের বড়াই করছিলেন কিনা, তাই একবার সাহসের বহরটা মেপে দেখলাম। ভাববেন না আপনার মত একজন পাদ্রীকে পেয়ে আমি সব কনফেস করলাম। পাপপুণ্যের থিয়োরী আমি মানিনে। প্রায়শ্চিত্তকে ঘৃণা করি।'

বিভাস বলল, 'তবে এসব কেন বলতে গেলেন ?'

কবি বলল, 'বলতে ভালো লাগল। মুখ বদলে নিলাম। মিথ্যে বলতে বলতে বড় একঘেয়ে হয়ে আসছিল। তাতে আর যেন কোন মজা ছিল না। এখন দেখছি সত্যটা মিথ্যের চেয়েও মাঝে মাঝে বেশ মজাদার হয়।'

'মাঝে মাঝে নয়, সব সময়।' বলে বিভাস উঠে দাঁড়াল।

কবি তেমনি বসেই রইল। উঠল না, আলো জ্বালল না।

বিভাস একাই এসে ভেজান দোর খুলে ফেলল। খুলেই চমকে উঠল। উমা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। তার গা ভরা বসন্ত, মুখে বসন্ত, চোখ ভরা আগুন।

বিভাস বলল, 'উমা, তুমি এখানে !'

উমা সেকথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'বেরুলে কেন। এখন রাত সবে দুটো, আরো তো অনেক রাত বাকি ছিল। কাবার করে এলেই পারতে।'

বিভাস বলল, 'ছিঃ, কি যা তা বলছ। চল ঘরে চল।' এগিয়ে এসে স্ত্রীর হাত ধরল বিভাস।

উমা জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'খবরদার, আমাকে ছুঁয়োনা। আমাকে ছোঁয়ার কোন অধিকার তোমার নেই। লম্পট বদমাস কোথাকার।'

'উমা, কি সব বাজে কথা বলছ ! যাও ঘরে যাও।'

রুবি কখন উঠে এসে দোরের সামনে দাঁড়িয়েছে কেউ লক্ষ্য করেনি।

উমা ওর গলার স্বর শুনে আরো জ্বলে উঠল, 'খবরদার, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে এসো না, বদমাস মেয়েমানুষ কোথাকার !'

নিজেকে সংবরণ করতে একটু সময় নিল রুবি, তারপর ফের শান্ত স্বরে বলল, 'যাও, ঘরে যাও উমা। এ-সময় তোমার ঠাণ্ডা লাগানো ঠিক না। তাতে অসুখ আরো বাড়বে।'

উমা বলল, 'থাক থাক আর ঢং করতে হবে না। আমার অসুখ বাড়ে বাড়বে, তাতে তোমার কি। নির্লজ্জ কোথাকার! কালই এ বাড়ি ছেড়ে তোমাকে উঠে যেতে হবে। আমি অনেক সহ্য করেছি, আর না। এ কেলেঙ্কারি আমি আর কিছুতেই সহ্য করব না। তোমাকে উঠতে হবে, উঠতে হবে। বদমাস বেশ্যা কোথাকার!'

রুবি এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল, মুখ সামলে কথা বলো উমা। আমিও এতক্ষণ যথেষ্ট সহ্য করেছি, কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে।'

বিভাস জোর করে স্ত্রীকে টেনে নিয়ে ঘরে চলে গেল।

রুবি খানিকক্ষণ জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থেকে সশব্দে দোর বন্ধ করে দিল।

ঘরে এসে উমা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল, 'তুমি যে এমন হবে আমি ধারণাও করতে পারিনি। আমি মরছি রোগে ভুগে আর তুমি সেই সুযোগ নিয়ে একটা চরিত্রহীন বদমাস মেয়েমানুষের সঙ্গে—ছি ছি ছি!'

রুগ্না স্ত্রীকে এতক্ষণ একা ফেলে রেখে বিভাস নিজেও লজ্জিত হয়েছিল। কিন্তু তার জন্যে উমা এতক্ষণ ধরে যে কাণ্ড করল, তাদের দু'জনের নামে যে মিথ্যা অপবাদ দিল, আর যে অকথ্য ভাষায় তা সে প্রকাশ করল, তাতে নিজের কাজের জন্যে লজ্জা-অনুশোচনার চেয়ে স্ত্রীর ওপরই একধরনের রাগ আর বিদ্বেষ তীব্র হয়ে উঠল। রুগ্ন বলে স্ত্রীকে সে ক্ষমা করতে পারল না। ঈর্ষা হিংসা আর অবিশ্বাসের এই কুৎসিত প্রকাশ বিভাসের কাছে অসহ্য লাগল।

দিন কয়েকের মধ্যে সুরবালা সুস্থ হয়ে উঠলেন। উমারও সুস্থ হতে বেশি দেরি লাগল না। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পরেও তার সেই জেদ গেল না। অসুখের মধ্যেও যেমন বলেছে, সুস্থ হয়েও তেমনি স্বামীর কাছে সে দাবী করতে লাগল, 'ওকে তুলে দিতে হবে।'

বিভাস গম্ভীর ভাবে বলল, 'বাড়িও আমার নয়, তুলে দেবার মালিকও আমি নই। ও নিজের ঘরে নিজে ভাড়া দিয়ে থাকবে, তাতে তোমার আমার আপত্তি করবার কি আছে।'

উমা বলল, 'তা জানি। তোমার এখন কোন কিছুতেই আর আপত্তি করবার নেই। আপত্তি কেন থাকবে, সেখানে যে তুমি মধুর খোঁজ পেয়েছ।'

বিভাস বিরক্ত হয়ে বলল, 'দেখ, তোমার এ ধরনের কথা আমি অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিৎ উমা।'

উমা বলল, 'মানুষের ভণ্ডামিরই শুধু কোন সীমা নেই। তুমি বাড়িওয়ালা শ্রীবিলাস-বাবুকে ডেকে ওকে তুলে দিতে বলবে কিনা তাই বল।'

বিভাস বলল, 'অসম্ভব।'

উমা বলল, 'বেশ, আমি সম্ভব করে তুলব। তুমি না পার, আমি বলব।'

সেই রাত্রের পর থেকে বিভাস আর রুবিকে উমা কোন আলাপ করতে দেখেনি। রুবি উমাদের ঘরে আর আসেনি। বিভাসও যায়নি ওর ঘরে। কিন্তু মুখে কথা না বললে কি হবে, যে ভাবে ওরা পরস্পরের দিকে তাকায় তাতেই যেন ওদের অনেক কথা বলা হয়ে যায়। রুবিকে স্বামীর চোখের আড়ালে নিয়ে গিয়ে ওদের চোখে চোখে কথা বলা উমা চিরতরে বন্ধ করবে।

' বিভাস সকালে বেরিয়ে গেলে উমা পাশের বাড়ির ছেলেটিকে ডেকে বলল, 'মাধব, তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই।'

মাধব ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। প্যাণ্ট ছেড়ে সবে মাস কয়েক হল ধুতি ধরেছে। উমার কাছ থেকে অনেক গল্প-উপন্যাস চেয়ে নিয়ে পড়ে আর তার বদলে উমার নানারকম ফাই-ফরমায়েস খাটে।

উমার ডাকে সাড়া দিয়ে মাধব বলল, 'কি কাজ বউদি।'

উমা বলল, 'বাড়িওয়ালা শ্রীবিলাসবাবুকে তুমি চেন?'

মাধব বলল, 'বাঃ চিনব না কেন? ওই তো এগার নম্বর বাড়িতে থাকেন।'

উমা বলল, 'হ্যাঁ এগার নম্বরেই। তাঁকে একবার ডেকে দিতে হবে ভাই। আমার কথা বলবে। তাঁর সঙ্গে আমার একটু জরুরী দরকার আছে। আজই যেন বিকেলে উনি দয়া করে আসেন।'

মাধব বলল, 'আচ্ছা, বউদি। কলেজে যাওয়ার সময় ওঁকে খবর দিয়ে যাব। এই কাজ! আমি ভেবেছিলাম কি শক্ত কাজের কথাই না বলবেন।'

উমা হেসে বলল, 'আগে সহজ সহজ কাজ করে হাত পাকাও, তারপর শক্ত কাজ দেব। শক্ত কাজের অভাব কি?'

···বিকেলের দিকে সত্যিই শ্রীবিলাসবাবু এসে হাজির হলেন। উমা তাঁকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে যত্ন করে বসাল। চা জলখাবার করে আনল, দুটি পান শুদ্ধ ডিবাটি এগিয়ে দিল সামনে।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'ব্যাপার কি বলুন তো?'

উমা সুরবালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পিসীমা, আপনিই বলুন।'

সুরবালা বললেন, 'অত কথা আমি গুছিয়ে বলতে পারব না বাপু। ওসব কথা আমার মুখে আসবেও না, যা বলবার তুমিই বল।'

শ্রীবিলাসবাবু পান মুখে দিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কি ? আমার কাছে কোন সংকোচ করবেন না আপনারা।'

উমা বলল, 'কিন্তু বিষয়টা সত্যিই বড সঙ্কোচের শ্রীবিলাসবাবু। একজনের নামে নিন্দেমন্দ করা আমি পছন্দ করিনে। কিন্তু আজ বাধ্য হয়েই করতে হচ্ছে। এ বাড়িতে আপনার যে আরেক ঘর ভাড়াটে আছে তার কথা বলছিলাম।'

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'বুঝেছি। মিস রায়ের কথা তো? তাঁর আবার নতুন কি হ'ল ?'

উমা মনে মনে ভাবল, নতুন যা হয়েছে তা তো অন্যের কাছে বলা যায় না। তাতে স্বামীর নামে কলঙ্ক লাগে, নিজেরও মান থাকে না। তাই একটু রেখে-ঢেকে সাবধানেই বলল, 'নতুন কিছু হয়নি। তার পুরনো স্বভাবেরই বাড়াবাড়ি চলছে। একবাড়িতে এভাবে তো আর বাস করা যায় না। আপনি হয় আমাদের একটা ব্যবস্থা করুন আর না হয় ওকে অন্য বাড়ি ঠিক করে দিন।'

সুরবালা বললেন, 'হ্যাঁ, তাই করুন। বাড়ির মধ্যে সাপ নিয়ে কি মানুষ বাস করতে পারে, কোন্ সময় কী সর্বনাশ হয়ে যাবে তার ঠিক কি ! আমার তো ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। জীবনে তো কম দেখলাম না।'

উমা চোখের ইশারায় সুরবালাকে থামিয়ে দিল। ঘরের কথা পরকে জানিয়ে লাভ নেই।

সুরবালা নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'কখন আসে কখন যায় তার কিছু ঠিক নেই, আর নিত্য-নতুন লোক ওর ঘরে আসছে তো আসছেই, সে আসারও কি সময় অসময় আছে ! কোন মেয়েমানুষের যে এত পুরুষের সঙ্গে জানাশোনা থাকতে পারে তা আমি এর আগে তো দেখিনি। আপনি বাড়িওয়ালা, এখানকার গণ্যমান্য লোক। আপনি এর একটা ব্যবস্থা করুন।'

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'বুঝেছি। আর কিছু বলতে হবে না আপনাদের। আমি কিন্তু বিভাসবাবুকে তখনি বলেছিলাম। মেয়েটির চালচলন ভাল ঠেকছে না। নানা জনে নানা কথা বলছে, ওকে তুলে দিই। অন্য ভাড়াটেও তখন আমার হাতে ছিল। কিন্তু উনি কিছুতেই তা' হতে দিলেন না।'

উমা বলল, 'উনি ওই রকমই, চোখের উপর সব দেখছেন শুনছেন তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছেন না। পাছে অভদ্রতা হয়। কিন্তু এর পরে লোকে আমাদেরই নিন্দে করবে। করবে কিনা বলুন ?'

শ্রীবিলাসবাবু দ্বিতীয় পানটি মুখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'তা তো ঠিকই। আচ্ছা, আপনারা কিছু ভাববেন না। আমি শীঘ্রই এর একটা ব্যবস্থা করব।'

…উমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে শ্রীবিলাসবাবু কিছুটা পথ কেবল এগিয়েছেন, রুবির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অফিস থেকে আজ একটু সকাল সকালই ফিরে এসেছে রুবি। শ্রীবিলাসবাবু মুখে অনেকখানি হাসি টেনে বললেন, 'এই যে মিস রায়, ভালো আছেন ?'

রুবি গম্ভীরভাবে বলল, 'হুঁ ভালোই। কোন্‌দিকে গিয়েছিলেন ?'

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'এই আপনাদের বাড়িতেই। আপনাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের জন্যেই এসেছিলাম।'

কাদের সঙ্গে দেখা করতে যে শ্রীবিলাসবাবু এসেছিলেন তা রুবির বুঝতে বাকি রইল না। ভ্রুকুঞ্চিত করে পাশ কাটিয়ে সে চলে আসছিল, শ্রীবিলাসবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'শুনুন মিস রায়, আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। আবার কবে দেখা-সাক্ষাৎ হবে, কথাটা সেরেই নিই। চলুন আপনার ঘরে।'

শ্রীবিলাসবাবুর ওপর গোড়া থেকেই রুবির রাগ ছিল। বিভাসের কাছে তিনিই প্রথমে তার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আপত্তিকর কথা বলেছিলেন, তা রুবি ভুলে যায়নি। আজও ওঁর ভণিতা দেখে সেই রকমই কিছু একটা বলবেন বলে রুবি আন্দাজ করতে পারল। আরও বিতৃষ্ণা, আরও বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল ওর মন। শ্রীবিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে রুবি বলল, 'মাপ করুন, আজ আমার সময় নেই। আমাকে এক্ষুণি আবার বেরুতে হবে। এ মাসের ভাড়া তো আপনি পেয়ে গেছেন। আর কি কথা থাকতে পারে আমার সঙ্গে।'

রুবির কথা বলবার ভঙ্গিতে মনে মনে চটে উঠলেন শ্রীবিলাসবাবু। ভারি অপমান বোধ করলেন। রুবির দিকে চেয়ে রূঢ় স্বরে বললেন, 'ভাড়া পাওয়া না পাওয়াটাই তো একমাত্র কথা নয়, আরো কথা আছে।'

রুবি ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'বেশ তো বলুন।'

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'কথাটা একটু গোপন। ভিতরে চলুন।'

রুবি বলল, 'আপনার সঙ্গে কোন গোপন কথাই আমার থাকতে পারে না। যা বলবার এখানেই বলুন।'

শ্রীবিলাসবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল, 'বেশ, তা হলে শুনুন। আপনার চালচলন সম্বন্ধে আমি ফের আপত্তিকর রিপোর্ট পাচ্ছি। এমন করলে তো আপনাকে আমি এ বাড়িতে আর রাখতে পারব না মিস রায়। আপনাকে অন্যত্র উঠে যেতে হবে।'

রুবি বলল, 'বটে। আমি যদি না উঠি ?'

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'কোর্টের সাহায্য নিতে হবে আমাকে।'

রুবি বলল, 'বেশ, তাহলে তাই নেবেন।'

রুবি আর সেখানে দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি চলে এসে তালা খুলে নিজের ঘরে ঢুকবার

আগে উমার দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে মনে বলল, 'এই অপমানের শোধ আমি তুলবই। যেমন করে পারি তুলবই। দেখে নেব, তুমি কেমন মেয়ে। কত বড় সতী-সাধ্বী তুমি, কতখানি তোমার জোর।'

ঘরে এসে শাড়ি-টাড়ি না ছেড়েই বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল রুবি। শ্রীবিলাসের অপমানটা গায়ে যেন এখনো বিঁধছে। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে।

একটু বাদে ঠাণ্ডা হয়ে মাথা ঠিক করে ভাবতে চেষ্টা করল রুবি। বাড়িঅলার সঙ্গে চটাচটি কাজটা কি সে ভাল করল। যদি সত্যিই হাঙ্গামা স্থরু করে। নোটিশ ফোটিশ দিয়ে বসে। ওদের হাতে টাকা অনেক, অনেক অনেক শক্তি। কিন্তু এই সব শক্তিধরকে কাবু করার মন্ত্র তো রুবির অজানা নেই। পুরুষের মুঠি থেকে টাকা বার করার কৌশল সে জানে। প্রচণ্ড বদরাগী করে তুলতে রুবির দু'দিনের বেশি সময় লাগবে না। তবু কেন শ্রীবিলাসবাবুর সঙ্গে সে অমন ঝগড়া করতে গেল। তার চেয়ে ওই ভুঁড়িঅলা ভদ্রলোকটিকে নিজের ঘরে ডেকে আনলেই হ'ত। ভুঁড়িতে হাত বুলাতে হ'ত না, একটু আঙুল ছোঁয়ালেই চলত। সব রাগ জল হয়ে যেত। বলত, 'তুমি যতদিন খুশি থাক, তোমার স্বভাব-চরিত্র খারাপ একথা কে বলে, আমার স্পর্শে তুমি সোনা হয়ে গেছ।'

এখনও সময় আছে। এখনও ঠাণ্ডা করার শান্ত করার সময় আছে বাড়িঅলাকে। কিন্তু রুবির ইচ্ছে নেই, প্রবৃত্তি নেই। বাড়িঅলার সঙ্গে শত্রুতা করবে মামলা মোকদ্দমা করবে সেও ভালো, কিন্তু ওই ভুঁড়ির কাছে নতজানু হবে না। এবাড়ি তাকে যদি শেষপর্যন্ত ছেড়ে যেতেই হয়, রুবি একা যাবে না, উমার ওই সাধের স্বামী বিভাসকেও টেনে নিয়ে যাবে।

কথাটা ভাবতেই হাসি পেল রুবির। বিভাস! বিভাসকে নিয়ে সে কি করবে। অমন একটি শান্ত-শিষ্ট ভদ্রলোক-গোছের মানুষকে দিয়ে কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তার। যে কেবল কথায় কথায় বচন আওড়াবে আর নীতি উপদেশ দেবে! এই পাদ্রীজাতীয় পুরুষটি তার কোন্ কাজে লাগবে। মন্দ কি, এর আগে ডাক্তার পুষেছে, উকিল পুষেছে, অভিনেতা পুষেছে, এখন না হয় দিন কয়েক একজন পাদ্রীকেই পুষবে। বাইবেলের ভাষায় শুনবে প্রেম নিবেদন। তারপর দু'দিন বাদে বিদায় করে দেবে। তবু উমাকে জব্দ করা তার চাইই। শোধ নেওয়া চাই তার অপমানের। জ্বলে পুড়ে মরুক উমা। ওর ঘর জ্বলুক, ওর সর্বাঙ্গ মন জ্বলে খাক হয়ে যাক। ও হাড়ে হাড়ে টের পাক রুবি রায়কে অপমান করার অর্থটা কি!

বিভাসের ওপর তার কিছুমাত্র মোহ নেই। শুধু বিভাস কেন, কোন পুরুষই এখন

আর তার মন আকর্ষণ করে না। তারা শুধু তার দেহ নিয়ে টানাটানি করে। করুক, তাতে রুবির আর কিছু এসে যায় না। মাঝে মাঝে রুবির মনে হয় এ দেহ যেন তার নয়, খুব যেন নিবিড় সম্পর্ক এর সঙ্গে নেই। এ শুধু পরের জন্যে। পরের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে শত্রুকে আঘাত করার জন্যেই এই মারাত্মক অস্ত্রে দিনের পর দিন সে শান দিচ্ছে। এবার এই অস্ত্রের পরীক্ষা চলবে বিভাসের ওপর দিয়ে। বিভাস ভারি নিরীহ জীব। কিন্তু সে উমার মত অত্যন্ত দজ্জাল মেয়ের স্বামী। তাকে ক্ষমা নেই, না কাউকে ক্ষমা নেই।

অফিসের সাজসজ্জা ছেড়ে রুবি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। চৌবাচ্চা থেকে মগ ভরে ভরে জল ঢালতে লাগল মাথায়। দেহ ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা যদি একটু জুড়োয়, জ্বলুনি যদি একটু থামে। অনেক সময় নিজের আক্রোশে নিজেই ছটফট করতে থাকে রুবি। নিজের রাগ নিজের জ্বালা নিজের মধ্যে যেন আর ধরে রাখা যায় না। কিন্তু অত অস্থির অত অধীর হলে চলবে না। ধীরে ধীরে এগুতে হবে।

গভীর মনোযোগে বিজ্ঞাপনের কপি দেখায় বিভাস ব্যস্ত ছিল। হলঘরের পুব-দক্ষিণ কোণ থেকে অপারেটর রিসিভারটা উঁচু করে দেখিয়ে বলল, 'আপনার ফোন বিভাসবাবু।'

বিভাস উঠে গিয়ে ফোন ধরে বলল, 'হ্যালো, কে ?'

'কার গলা বলে মনে হচ্ছে ?'

বিভাস বলল, 'রুবী দেবী।'

'যাক্ চিনতে পেরেছেন। কিন্তু আবার একটা দেবী দিচ্ছেন কেন ?'

বিভাস বলল, 'কিছু একটা তো দিতেই হয়। সে যাকগে, ব্যাপার কি বলুন তো।'

রুবি বলল, 'ব্যাপার আছে বলেই আপনাকে একটু বিরক্ত করলাম। ছুটির পর আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার একান্ত দরকার। আপনিই আসবেন না আমি যাব ?'

'খুবই কি দরকার ?'

'হ্যাঁ, জরুরী। আপনি অপেক্ষা করবেন আমার জন্যে। ছুটির পর আমি আপনাদের অফিসের গেটের কাছে থাকব।'

বিভাস একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'না না তার দরকার নেই, আমিই যাচ্ছি।'

রুবি বলল, 'ধন্যবাদ, গরজ যখন আমার, আমারই যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু—।'

'একই কথা', বলে বিভাস ফোন ছেড়ে দিল।

একটি বড় ব্যবসায়ীর রঙের বিজ্ঞাপন লিখতে লিখতে বার বার কাটা ছেঁড়া হতে

লাগল বিভাসের। কি জন্যে ডেকেছে রুবি, তার এমন কি দরকার থাকতে পারে, যাওয়া সঙ্গত হবে কি না এই সব এলোমেলো টুকরো টুকরো চিন্তা তার কাজে বার বার ব্যাঘাত ঘটাল। কিন্তু কাজ ছেড়ে উঠে পড়বার লোক সে নয়। নিজেকে কঠিন চেষ্টায় সংযত করে ফের কাজে মন দিল। কপিটা শেষ করতে করতে এনগেজমেন্টের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করতে পেরে খানিকটা সন্তুষ্টি আর আত্মপ্রত্যয় এল বিভাসের মনে। ম্যাঙ্গো লেন থেকে বেরিয়ে বেণ্টিক স্ট্রীটে রুবিদের সেই পাঁচতলা অফিস বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

রুবি গেটের কাছে অধীর ভাবে অপেক্ষা করছিল। বিভাসকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, 'এই যে, আমি ভাবলাম আপনি বুঝি এলেনই না।'

বিভাস ঘড়িটা একটু দেখে নিয়ে সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল, 'হাতে কাজ ছিল তাই একটু দেরি হয়ে পড়ল।'

রুবি সামান্য হেসে বলল, 'আপনি যে কাজের মানুষ তা নতুন করে না জানালেও হ'ত, কিন্তু কথা দিয়ে সময় মত কথা রাখাটাও তো একটা কাজ।'

বিভাস বলল, 'আপনার কথাটা আগে বলুন।'

রুবি বলল, 'সেকথা এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলবার মত নয়। চলুন এগুই।'

অফিস ছুটির পর বাড়ি ফেরার কাজে সবাই ব্যস্ত। লোকজন যানবাহনের ভিড়ে পথ চলা দায়। বেশ খানিকটা সময় লাগল রাস্তা পার হতে।

বিভাস বলল, 'ওদিকে কোথায় চললেন?'

রুবি মুখ ফিরিয়ে একটু হাসল, 'ভয় নেই, কোন অজায়গায় নিয়ে যাচ্ছিনে, গঙ্গার দিকেই যাচ্ছি। আপনার কি কোন আপত্তি আছে?'

বিভাস বলল, 'না আপত্তি আর কি, বলুন।'

আউটরাম ঘাটের দোতলায় মুখোমুখি বসল দু'জনে। গঙ্গার ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সূর্যের উদয়-অস্তের সঙ্গে বহুদিন সম্পর্ক নেই বিভাসের। আজ যেন নতুন করে দেখল সূর্যাস্তের রঙ। সে রঙ যেন রুবির মুখেও লেগেছে।

মুখ নিচু করে চায়ের কাপের মধ্যে ছোট্ট চামচটি নাড়তে নাড়তে রুবি বলল, 'আমি ভেবেছিলাম সেই রাত্রির পর থেকে আপনি আমাকে ঘৃণা করতে সুরু করেছেন। তাই কথা বলেন না, এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন। হয়তো অত কথা খুলে বলা আমার ঠিক হয়নি। হয়ত দুঃসাহস হয়েছে। সংসারে বন্ধুত্ব খুব সুলভ নয়। সে বন্ধুত্ব বেশ সাবধানে সন্তর্পণে রক্ষা করতে হয়। আমি হয়ত অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম।'

বিভাস চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনি যদি অসাবধান হয়ে থাকেন, আগের জীবনে হয়েছেন। অসতর্ক হওয়াটাই দোষের, তার কাহিনী বলাটা দোষের নয়। সেজন্যে আমাদের বন্ধুত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। আমি আপনাকে যদি এড়িয়ে চলে থাকি, তা অন্য কারণে। কারণটা যে কি, আপনার আন্দাজ না করতে পারার কথা নয়।'

রুবি একটু হাসল, 'আন্দাজ না করতে পারব কেন। উমার জন্যে। উমাকে আপনি ভয় করেন এই তো?'

বিভাস বলল, 'আপনি ভুল করছেন। উমাকে ভয় করিনে, ভয় করি অশান্তিকে, অনর্থক সংসারে জটিলতা বাড়িয়ে লাভ কি। ও দুঃখ পাক তা আমি চাইনে।'

স্ত্রীর ওপর বিভাসের এই অতিরিক্ত দরদে রুবির মনে একটু খোঁচা লাগল। ঈর্ষার জ্বালা বোধ করল একটু। কিন্তু সে জ্বালা এই মুহূর্তে রুবি কণ্ঠস্বরে ধরা পড়তে দিল না। শান্তভাবে বলল, 'আপনার স্ত্রীকে আপনি দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইবেন, এ তো খুব স্বাভাবিক। স্ত্রী যদি আর একটি মেয়েকে চূড়ান্ত অপমানও করে তবু তার প্রতিবাদ করা চলে না কারণ সে দুঃখ পাবে। আপনার সম্বন্ধে আমার কিন্তু অন্যরকম ধারণা ছিল বিভাসবাবু।' রুবি বিভাসের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, ভেবেছিলাম, 'আপনি কেবল পত্নীপরায়ণই নন, সেই সঙ্গে ন্যায়পরায়ণও।'

বিভাস লজ্জিত হয়ে বলল, 'দেখুন, সেদিন রাত্রে উমার ব্যবহারের জন্যে আমি ভারি দুঃখিত, তার জন্যে আমি তাকে তিরস্কার কম করিনি।'

রুবি বলল, 'আমাকে যখন চরম অপমানিত হয়ে বাড়ি থেকে উঠে যেতে হবে, তখনও আপনি বলবেন আপনার স্ত্রীর ব্যবহারের জন্যে আপনি তাকে যথেষ্ট তিরস্কার করেছেন।'

বিভাস বলল, 'তার মানে? আপনাকে হঠাৎ যেতে হবে কেন?'

রুবি তখন সমস্ত কথা খুলে বলল। বাড়িঅলা শ্রীবিলাসবাবু যে রাস্তার ওপর তাকে অপমান করেছেন, তার একটা সুদীর্ঘ করুণ বর্ণনা দিল। তার খানিক আগে যে শ্রীবিলাসবাবু বিভাসদের ঘর থেকে বেরিয়েছেন, উমাই যে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল, সেকথাও রুবি উল্লেখ করতে ভুলল না। অবশেষে বলল, 'আপনি এক কাজ করুন বিভাসবাবু। আমার জন্যে যেমন তেমন একটা বাসা ঠিক করে দিন। কোনরকম কেলেঙ্কারির মধ্যে আমি যেতে চাইনে। কিন্তু তাই বলে রাস্তায়ও সত্যি সত্যি বাস করা সম্ভব নয়।'

ভারি করুণ আর কাতর শোনাল রুবির গলা। সমূহ নিরাশ্রয় হওয়ার ভয়ে সত্যি যেন ও শঙ্কিত আর উদ্বিগ্ন হয়েছে।

স্ত্রীর অশোভন ব্যবহারের কথা শুনে বিভাস ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে

উঠেছিল। রুবির কাতর ভঙ্গিতে ওর ওপর মমতা আর সহানুভূতিতে এবার মন ভরে উঠল। রুবির ওপর অবিচার করা হয়েছে কোন সন্দেহ নেই। কারো কোন অবিচার বিভাস সহ্য করে না। সে উৎপীড়িতের সহায়ক।

একটু কাল চুপ করে থেকে রুবিকে ভরসা দিয়ে বিভাস বলল, 'আপনি কোন ভয় পাবেন না। কারো সাধ্য নেই আপনাকে ও বাড়ি থেকে তুলে দেয়। আমি যদি ওখানে থাকতে পারি আপনিও পারবেন। আমার কথা বিশ্বাস করুন আপনি।'

রুবি বলল, 'শুধু বিশ্বাস নয়, আমি আপনার ওপরই নির্ভর করে আছি।'

এরপর দু'জনেই চুপ করে বসে রইল।

রুবির মনে হ'ল প্রেমের অভিনয়ের মধ্যেও যেন কোথায় খানিকটা আপাত সত্যতা আছে। না হলে কারো ওপর সত্যিই নির্ভর করে রয়েছে এমন একটা মিথ্যে কথা বলতে তার এতটা ভালো লাগবে কেন।

বিভাস ভাবছিল মানুষের রূপ কি মুহূর্তে মুহূর্তে বদলায়? এই মেয়েটির মধ্যে যে এত কোমলতা এত কমনীয়তা লুকিয়েছিল, তা সে ধারণায় আনতে পারেনি। এই শান্ত গঙ্গার তীরে এই প্রশান্ত সন্ধ্যায় হালকা সবুজ রঙের শাড়ি-পরা মেয়েটিকে নতুন করে ভালো লাগল বিভাসের। যেন নতুন রূপে দেখল। বিভাস ভাবল মানুষের ভিতরকার রূপ তো সব সময় দেখা যায় না। তার ওপর নানা ছদ্মবেশের আবরণ পড়ে। যে দেখবে তার দৃষ্টিও যে সবসময় স্বচ্ছ থাকে তা নয়। কত আত্মাভিমান আর সংস্কারে তা বার বার আচ্ছন্ন হয়ে যায়। দুর্লভ ক্ষণে সেই ঢাকনা যখন সরে তখনই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিল হয়, রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়ে মানুষের কাছে মানুষ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। পরম যে আত্মীয় তার সঙ্গেও এই নিবিড় মিল কদাচিৎ ঘটে। সে মিল চকিত, অপ্রত্যাশিত, তাই একান্ত ক্ষণিক।

বাড়িতে ফিরে প্রথমে স্ত্রীর সঙ্গে বিভাস কোন কথা বলল না। গম্ভীর মুখে জামা কাপড় ছাড়ল, হাত মুখ ধুয়ে নিল।

উমা বলল, 'ব্যাপার কি, আজ যে ভারি চুপচাপ দেখছি। অফিসে বড় কর্তার বকুনি খেয়েছ নাকি?

বিভাস বলল, 'হুঁ।'

উমা বলল, 'হুঁ নয়, কি হয়েছে বলতো?'

বিভাস বলল, 'কি হয়েছে তুমিই সবচেয়ে ভাল বলতে পারো। আমাকে না জানিয়ে শ্রীবিলাসবাবুকে ডেকে এনেছিলে কেন, আমি তার কৈফিয়ৎ চাই?'

উমা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সে কথা তুমি কার কাছে শুনলে ?'

বিভাস বলল, 'যার কাছেই শুনিনা। কেন ডেকেছিলে বলতেই হবে।'

উমা স্বামীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'যদি এতই শুনেছ, তাহলে কেন ডেকেছিলাম তাও নিশ্চয়ই শুনে থাকবে।'

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে এসব নোংরা কাজে হাত দেওয়া তোমার অত্যন্ত অনুচিত হয়েছে। এর জন্যে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

উমা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'কার কাছে ? তোমার রুবির কাছে ?'

বিভাস জ্বলে উঠল, 'খবরদার, যা তা ব'ল না। হ্যাঁ, তুমি যা করেছ তার জন্যে রুবির কাছেও তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। শ্রীবিলাসবাবুকে ডেকে এনে তুমি আমার সম্মান নষ্ট করেছ।'

উমা বলল, 'আর শ্রীবিলাসবাবুকে না ডেকে তুমি যে আমার মান নষ্ট করেছ, আমার মাথা হেঁট করেছ তার কি হবে ? ওকে আমি যে-ভাবে পারি এ-বাড়ি থেকে তুলে ছাড়ব।'

বিভাস বলল, 'আমি কিছুতেই তা হতে দেব না।'

পাশের ঘর থেকে সুরবালা এসে দাঁড়ালেন, 'রাত দুপুরে তোরা কি ঝগড়া আরম্ভ করলি বিভাস ? ছি ছি ছি ! বাবলুকে অনেক করে ঘুম পাড়িয়েছি। তোদের চেঁচামেচিতে ছেলেটা উঠে পড়বে।'

বিভাস বলল, 'তা পড়ুক। কিন্তু শ্রীবিলাসবাবুকে কেন ডাকিয়ে আনা হয়েছিল তার আমি কৈফিয়ৎ চাই।'

সুরবালা বললেন, 'তোর যত সৃষ্টিছাড়া কথা, এর আবার কৈফিয়ৎ কিসের। মানুষের বাড়িতে কি মানুষ আসে না ? তাঁকে তো আমিই সব কথা বলেছি। এসে অবধি মেয়েটা যা কাণ্ড-কারখানা করছে, তাতে ওকে তুলে দেওয়া উচিত একথা কে না বলবে। তোর মতিভ্রম না হলে তুই ফের ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলতে আসতিস নে।'

এই সরাসরি অভিযোগে বিভাস একটুকাল স্তম্ভিত হয়ে রইল, তারপর বললে, 'তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না পিসীমা।'

সুরবালা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'খুব বুঝেছি বাপু। জীবন ভর এই জিনিস বুঝে এলাম। আমাকে আর বুঝতে হবে না, তুমি নিজে এবার সমঝে চল।'

এসব বিষয় নিয়ে উমা স্বামীকে যে-খোঁটাই দিক না, এনিয়ে পিসী-শাশুড়ীও যে কথা বলতে আসবেন, ধমক দেবেন এটা সে চায়নি। সুরবালার এই হস্তক্ষেপ তার ভালোও

লাগল না। লজ্জার সঙ্গে এর মধ্যে একধরনের অগৌরবও আছে। সেই অসম্মানের খোঁচা তাকে বিঁধতে লাগল।

সে অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি বাবলুর কাছে যান পিসীমা, এসব বাজে কথার মধ্যে আপনার থেকে দরকার নাই।'

সুরবালা বললেন, 'না থেকে পারলে তো ভালোই হত মা। থাকতে কে চায়, আমি কোথাও চলে যেতে পারলে বাঁচতুম। এ জিনিস আমার আর সহ্য হয় না, জীবন ভর আমি যথেষ্ট সয়েছি।' বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

উমা এবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসল, 'এই বুড়ো বয়সে পিসীমার কাছে খেলে তো একটা ধমক। যদি আমার কথা না শোন পাড়ায় আরো অনেকের কাছে এমন ধমক খাবে। আমি যা বলছি শোন। আমার কাজে বাধা দিয়ো না। তা ছাড়া তোমার তো কোন দোষ নেই। পুরুষ ছেলে হয়ে তুমি তো আর কোন মেয়ের বিরুদ্ধে লাগনি। আমিই লেগেছি। নিজের ঘর-সংসারের মঙ্গলের জন্যে, গৃহস্থ বাড়ির সম্মান সৌষ্ঠব রাখবার জন্যে আমিই ওকে তাড়াচ্ছি। সব দোষ আমি ঘাড়ে করে নেব। তোমার গায়ে কোন কলঙ্ক লাগতে দেব না।

বিভাস আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু তুমি যা চাইছ তা হবে না উমা। একটি মেয়ের নামে অপবাদ দিয়ে তুমি তাকে তুলে দিতে পারবে না। যেতে হয় ও স্বেচ্ছায় যাবে। না হলে এ বাড়িতেই থাকবে। ওর যতদিন ইচ্ছা থাকবে।'

উমা দৃঢ় স্বরে বলল, 'না ওকে থাকতে দেব না।'

বিভাস বলল, 'দিতে হবে। এখন থেকে যদি ও ভাল ভাবে চলে, কোনরকম অশোভন আচরণ যদি ওর আর না দেখি, তাহলে আমাদের আপত্তির আর কোন কারণ থাকতে পারে না।. ওকে শোধরাবার, ওকে ভালো হবার সুযোগ দিতেই হবে আমাদের।'

উমা বলল, 'না, আমি কাউকে আর কোন সুযোগ দেব না। ওকেও না, তোমাকেও না।'

বিভাস আর কোন তর্ক করল না। নিঃশব্দে রাত্রের খাওয়া সারল। বিছানায় গিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। যেন একটি অপরিচিতা নিঃসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক তার শয্যার আধখানা অধিকার করে রয়েছে। করে তো করুক, অবাধ্য একগুঁয়ে স্ত্রীকে আর কোন অধিকার বিভাস দেবে না।

উমা বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করল। ছটফট করল, স্বামীর সঙ্গে একথা-ওকথা নিয়ে আলাপের চেষ্টা করল বারকয়েক। কিন্তু বিভাস নিশ্চল, নির্বিকার।

উমার সর্বাঙ্গ রাগে জলে যেতে লাগল। সে মনে মনে বলল, আচ্ছা, এর শোধ আমিও

একদিন নেব। কিন্তু তুমি যা চাইছ, তা কিছুতে হতে দেব না। তা কোন মেয়ে দিতে পারে না। অমন যে সেকেলে সতীসাধ্বী পিসীমা, তিনি পর্যন্ত সতীনকে সহ্য করতে পারলেন না। তাঁকে সব ছেড়ে আসতে হ'ল। কিন্তু আমি পিসীমা নই, আমি ছেড়ে যাব না। কেন ছাড়ব, নিজের অধিকার আমি কেন ছাড়ব। কিন্তু ওকে ছাড়তে হবে। বাড়ি ছাড়তে হবে, দেশ ছাড়তে হবে। লক্ষ্মীছাড়ীকে আমি সব ছাড়া করব।'

দিন দুই পরে রুবি ফের ফোন করল বিভাসকে, 'আপনাকে আজও বিরক্ত করছি।'

বিভাস বলল, 'বিরক্ত করতে যদি আপ নি ভালোবাসেন না হয় করলেনই।'

রুবি ফোনের ওপার থেকে বলল, 'যাক অর্ধেক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।'

বিভাস বলল, 'অর্ধেক কেন ?

ফোনের ভিতর দিয়ে রুবির হাসির শব্দ পাওয়া গেল, 'বিরক্ত হতে আপনি ভালোবাসেন একথা জানতে পারলে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।'

বিভাস বলল, 'ওসব কথা থাক, কোন কাজের কথা থাকলে বলুন।'

রুবি বলল, 'ভয়ঙ্কর কাজের কথা আছে। বাড়িতেও বলতে পারতাম। কিন্তু জটিলতা বাড়াতে আপনার যেমন ইচ্ছে নেই, আমারও ঘোরতর অনিচ্ছা।'

বিভাস বলল, 'বেশ তো ফোনেই বলুন।'

রুবি বলল, 'না, তাও বলা সম্ভব নয়। কিন্তু রোজ আপনাকে আমাদের অফিসে টেনে আনব এমন জোর আপনার ওপর আমার নেই। আমিই আসছি ছুটির পর, আমার জন্যে দয়া করে অপেক্ষা করবেন। ভারি বিপদে পড়েছি। হাল্‌কা ভাবে বলছি বলে বিপদটা কিন্তু সত্যি হাল্‌কা নয়। গেলেই বুঝতে পারবেন।'

ঠিক পাঁচটার সময় রুবি এসে বিভাসের ম্যাঙ্গো লেনের অফিসের সামনে দাঁড়াল। আজ আর কাজ নিয়ে বিভাসের দেরি হয়নি। আজ সে সত্যিই সময়ের অনুবর্তী হতে পেরেছে।

রুবি ওর সঙ্গে এগুতে এগুতে বলল, 'আজও কি গঙ্গার ধারে যাবেন ?'

বিভাস বলল, 'না, আজকে আর বেড়াবার সময় নেই আমার। পার্টটাইম চাকরি আছে।'

রুবি নিজের ঠোঁটে একটু কামড় দিয়ে বলল, 'বেড়াবার জন্ত আপনাকে ডাকতে আসিনি। জরুরী কথা বলতেই এসেছি। কিন্তু আপনার যখন সময় নেই, তখন থাক।'

বিভাস বলল, 'আচ্ছা, একটু সময় না হয় করে নেওয়া যাবে, চলুন।'

কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে দুজনে ঢুকল। কাটা দরজার আড়ালে পর্দা ঘেরা

একটু খুপরী। মাঝখানে ছোট টেবিলের ব্যবধানে সামনাসামনি দুখানা চেয়ার দুজনে দখল করল।

রুবি বলল, 'আমার কোন ব্যাপারে আপনাকে টেনে আনার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সেদিন আপনি অত করে ভরসা দিয়েছিলেন বলেই চিঠিটা আপনাকে না দেখিয়ে পারছিনে। এই নিন।'

একটা মুখ ছেঁড়া খাম বের করে রুবি দিল বিভাসের হাতে। রুবির নামে একটা রেজিস্ট্রী করা চিঠি। উকিলের চিঠি দিয়েছেন বাড়িঅলা—'রুবির চাল-চলন নিয়ে পাড়ায় আপত্তি উঠেছে। বাড়ির অন্য ভাড়াটেও আপত্তি করেছেন। সুতরাং একমাসের মধ্যে সমস্ত ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে রুবি যেন ঘর খালি করে দেয়।'

চিঠিটা আর একবার পড়ে গম্ভীরভাবে বিভাস বলল, 'অসম্ভব।'

কাপে চা ঢালতে ঢালতে রুবি মুখ তুলে হাসল, 'অসম্ভব' মানে?'

বিভাস বলল, 'অসম্ভব মানে আপনার যাওয়া হতে পারে না।'

রুবি বলল, 'হতে পারে না! কিন্তু বাড়িঅলার সঙ্গে বিবাদ করে থাকাই বা চলতে পারে কি করে?'

বিভাস বলল, 'কিন্তু না থাকার অর্থ কি জানেন?'

রুবি বলল, 'জানি। সমস্ত অসম্মান-অপমানকে স্বীকার করে নেওয়া। কিন্তু উপায় কি বলুন। আমার তো কোন সহায়-সম্পদ নেই।'

বিভাস বলল, 'সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনি নিজে। সহায়তা যদি প্রয়োজন হয়, যদি নিতে চান তো পাবেন। এইটুকুই শুধু বলতে পারি।'

রুবি বলল, 'এইটুকুই যথেষ্ট, এ-চিঠির একটা জবাব তাহলে দিতে হয়।'

বিভাস বলল, 'নিশ্চয়ই। উকিলের মারফৎ এ চিঠির জবাব দিতে হবে। নোটিশ উইথড্র না করলে মানহানির মামলা আনতে হবে বাড়িঅলার বিরুদ্ধে।'

মামলা মোকদ্দমার কথায় রুবি একটু আতঙ্কিত হ'ল, বলল, 'আমি বলি কি বিভাস-বাবু, কাজ নেই ওসব গোলমালের মধ্যে গিয়ে।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু এছাড়া আর কোন পথ নেই। আত্মসম্মান রাখতে হলে গোলমেলে পথেই আপনাকে যেতে হবে। কিন্তু আপনার ভয় নেই, আমার জানাশোনা উকিল আছে। তাকে দিয়েই কাজ চালান যাবে। গোড়া থেকে ওভাব দেখালে ব্যাপারটা হয়ত বেশি দূর গড়াবে না।'

রুবি বলল, 'বেশ, আপনি যা ভালো বোঝেন করুন। কিন্তু এই নিয়ে উমার সঙ্গে

একটা গোলমাল না হয়, আপনি যার ভয় করছেন, সেই জটিলতার মধ্যে গিয়েই শেষ পর্যন্ত না পড়তে হয় আপনাকে।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু ভয় করলেই তো জটিলতাকে এড়ান যায় না। তার চেয়ে সাহস করে জট ছাড়াবার চেষ্টা করা ভালো।' বলে উঠে পড়ল।

রুবির ইচ্ছে ছিল আরো খানিকক্ষণ বসে গল্প-টল্প করে। কিন্তু বিভাসের সময় নেই। তার সময় না থাক আরও অনেকের সময় আছে। বহু পুরুষ বন্ধু এখনো তার জন্য সময় দিতে উদগ্রীব। তাদের যে-কোন একজনকে ডেকে নিলেই হয়। কিন্তু কোন কোন সময় যে কোন একজনে মন খুশি হয় না, শুধু একজনকে চায়। বিশেষ একজনকে। এই চাওয়ার কি শেষ নেই!

সকাল সকালই সেদিন ফিরে এল রুবি। এসে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। মনে মনে ভাবল, বড় অদ্ভুত, এই দেহের তৃষ্ণা বড় অদ্ভুত, দেহের রহস্য বড় অদ্ভুত। অন্য পুরুষ বন্ধুদের সান্নিধ্যে আর শিক্ষায় দেহ সম্বন্ধে তার শুচিতা গেছে। সতর্ক হয়ে চলতে হবে, স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যরক্ষার নিয়ম মানতে হবে এই পর্যন্ত। দিব্যেন্দুরা বলেছিল দেহ সম্বন্ধে এইটুকু সাবধান হলেই যথেষ্ট, রুবিও তাই বিশ্বাস করে। সে নিয়ম মানে না। এই একই দেহ তার উপভোগের উপকরণ, আবার কার্যোদ্ধারের সহায়। এ নিয়ে আগে তার একটু আধটু খুঁৎখুঁতি ছিল, আজকাল আর নেই। শেষ ধাপ পর্যন্ত এগুলে যদি বন্ধুত্ব দৃঢ় হয় এগুতে ক্ষতি কি, কোন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে এর দরকার হয়। কারণ পুরুষে তাই চায়। এ ছাড়া ঘনিষ্ঠতার অন্য কোন মানে তারা বোঝে না, এতদিন এই ছিল রুবির ধারণা। কিন্তু আজ নিজের মনের দিক তাকিয়ে একটু যেন শঙ্কিত হয়ে উঠছে রুবি। পুরুষের তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে সে নিজের মধ্যেও অনন্ত তৃষ্ণাকে সংক্রামিত করে রেখেছে। কোন পুরুষের আদর সোহাগের চাইতে তার ঔদাসীন্য কি অমনোযোগ রুবির সেই দেহতৃষ্ণাকে আরো যেন বেশি করে জ্বালিয়ে দেয়। হোক সে পুরুষ সামান্য, হোক সে সাধারণ, তবু সে তার দেহ নিয়ে দূরে সরে রইল, তাকে আরো কাছে টেনে না আনতে পারলে যেন শান্তি পাওয়া যায় না। অলভ্য সেই একটি দেহাধারের মধ্যে এক অসাধারণ রহস্য আরোপ করে নিয়ে রুবির মন তার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। অবশ্য ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর দেখা যায় কোন নতুনত্ব নেই, কোন বৈচিত্র্য নেই, সেই একই পুরনো স্বাদ। শেষ পর্যন্ত বিস্বাদ বলেও মনে হয় একেক সময়। তবু শেষ পর্যন্ত না গিয়ে রুবি পারে না। অভ্যাস তাকে টেনে নিয়ে যায়।

আজকাল বিভাসও তাকে টানছে। বিভাস না, এ রুবিরই অভ্যাস। কিন্তু অভ্যস্ত তৃষ্ণায় তৃপ্তিতে বার বার বাধা ঘটছে। বিভাস ভীরু কিশোরের মত এক পা এগুচ্ছে তো

দু' পা পিছিয়ে যাচ্ছে। যেন নির্মল হিতৈষণা ছাড়া ওর মনে আর কিছু নেই, যেন রুবির অপূর্ব সুন্দর দেহ সম্বন্ধে ওর কোন কৌতূহল নেই, আগ্রহ কি ঔৎসুক্য নেই। নেই আবার! নিশ্চয়ই আছে। ওর চোখে মুখে ওর প্রত্যেকটি কথায় সেই আগ্রহের অস্তিত্ব ফুটে উঠছে। একটা মিথ্যে সাত্ত্বিকতার সংস্কারে শুধু পিছিয়ে আছে বিভাস। কিন্তু ওর এই সংস্কার ভাঙতে হবে, ওর এই ভীরুতাকে জয় করতে হবে। ও যে ভীরু হয়েও শক্তিমানের খ্যাতি অর্জন করবে তা রুবির সইবে না। রুবির ইচ্ছে নয় কোন মামলা-মোকদ্দমার হাঙ্গামায় যাওয়া। দুটো ঘর শুদ্ধ একটা ফ্ল্যাট সে যে-কোনো মুহূর্তে পায়। এর জন্যে বন্ধুদের সে বলেও রেখেছে। একমাস পরে সে তার মালপত্র নিয়ে উঠেও যাবে। বাড়িঅলা ভাড়া তার কাছ থেকে কি করে আদায় করে রুবি তা দেখে নেবে। ওদের ওষুধই তাই, টাকা মেরে দেওয়া। একটাকা গেলে ওরা লক্ষটাকার শোকে বুক চাপড়ায়। রুবি শ্রীবিলাসকে সেই ভাবে শাস্তি দেবে। আর উমাকে শাস্তি দেবে বিভাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে। তার জন্যে দুর্বল সাজতে হবে, তার জন্যে বিভাসের কাছে ভীরু অসহায়ের অভিনয় করতে হবে। এমন ভাব দেখাতে হবে যেন বিভাসের হাতেই তার সমস্ত মানসম্মান নির্ভর করছে। নির্ভর করবার মত আর লোক পেল না রুবি। নিজের খরচে বিভাস যদি উকিল ব্যারিস্টার লাগায় তো লাগাক, পরে সুবিধে মত রুবি কেস উইথড্র করে নিতে পারবে। এখন একটি পয়সাও রুবি খরচ করবে না। তার হাতে টাকা কই যে ব্যয় করবে।

কিন্তু পরদিন ভোরেই বিভাস এসে উপস্থিত। শ্রীবিলাসের চিঠির জবাব তার এক উকিল বন্ধুকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে এসেছে।

টাইপ করা চিঠিটায় একবার চোখ বুলিয়ে রুবি বলল, 'বেশ তো।'

বিভাস বলল, 'এটা তাহলে আজই পোস্ট করে দেওয়া যাক।'

রুবি বলল, 'দিন।'

বিভাস একটু ইতস্তত করে বলল, 'একটা কথা আছে। সুধাংশুকে টাকাটা আজই দিয়ে দিতে হয়।'

রুবি বলল, 'টাকা!'

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ। অবশ্য ইচ্ছে করলে কিছুদিন বাকিও রাখা যায়। সুধাংশুর সঙ্গে আমার খুবই জানাশোনা। কিন্তু সে সুযোগ আমি নিতে চাইনে। তাছাড়া ওরও তো দরকার।'

রুবি একটু চুপ করে রইল। ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও বলতে পারল না, 'টাকা আমি এখন দিতে পারব না,' কি 'টাকা আমার এখন হাতে নেই', বলল, 'কত দিতে হবে বলুন।'

বিভাস বলল, 'টাকা আষ্টেক দিন, কিছু কম টম যদি দিয়ে পারি চেষ্টা করে দেখব।'

রুবি বাক্স খুলে গম্ভীর মুখে দশ টাকার একখ'না নোট বের করে দিল।

বিভাস আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

পরক্ষণেই নিজের বোকামির জন্যে নিজের উপর রাগ হতে লাগল রুবির। কেন মিছামিছি সে টাকাটা জলে দিতে গেল। স্পষ্ট বলে দিলেই হ'ত, 'টাকা আমি দিতে পারব না। ওসব চিঠি-পিঠিতে দরকার নেই আমার।'

শুধু পোষাক আর প্রসাধন ছাড়া অন্য ব্যাপারে রুবি ভারি ব্যয়কুণ্ঠ। এমন কি খাওয়ার জন্যেও সে যত পারে কম ব্যয় করে। অনেক কষ্টের রোজগারের টাকা, এর থেকে একটা পয়সাও ব্যয় করতে তার ইচ্ছে করে না। তার চেয়ে দু'চার টাকা করে সে জমাতে ভালোবাসে। টাকা খরচ হলে তো হয়েই গেল। কিন্তু ব্যাঙ্কের পাস বইয়ে রাখা কয়েকটি অঙ্কের মধ্যে টাকাটা থাকলে সব রইল। সঞ্চিত টাকার মধ্যে ভোগের নানারকম সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ব্যয়ের মধ্যে কেবল এক রকমের সুখ। তাছাড়া আরো এক কারণে অর্থের সঞ্চয়ের দিকে ইদানীং মন দিচ্ছে রুবি। বয়স বাড়ছে। বেশি দিন লোকে আর তার জন্যে অর্থ ব্যয় করবে না, তার যা খামখেয়াল তাতে কোন চাকরি বেশি দিন মন দিয়ে করা তার সাধ্য নয়। সঞ্চয় ছাড়া তার আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। যে যাই বলুক, জীবন ভর টাকার দরকার! টাকা ছাড়া এক মুহূর্তও চলা যায় না। বহু যত্ন করলেও স্বাস্থ্য আর যৌবন এক সময় যাবে। কিন্তু চেষ্টা করলে সঞ্চয়ের অভ্যাস বাড়ালে অর্থকে তার চেয়ে বেশি সময় ধরে রাখা যায়, সে রাখা ভোগ না করে ভোগের ক্ষমতাকে ধরে রাখা। ভবিষ্যৎকে করতলগত করে রাখা। সেজন্য বর্তমানে কৃচ্ছতার প্রয়োজন। পরের অর্জিত অর্থ বর্তমানের জন্যে আর নিজের অর্জিত অর্থ ভবিষ্যতের এই হিসাবে রুবি আজকাল চলতে সুরু করেছে। কিন্তু আজ কি বেহিসেবী কাজ করে ফেলল, কেন জলে দিল টাকা কটা। বিভাসের উকিল বন্ধুকে দেওয়া তো জলে ফেলে দেওয়াই, ভেবে নিজের ওপরও রাগ হ'ল, বিভাসের ওপরও আক্রোশ হ'ল রুবির। না সে বড়ই ভুল করে ফেলেছে।

রুবির ঘর থেকে বেরুতেই উমা বিভাসকে পাকড়াও করল, 'আবার ও ঘরে যাওয়া হয়েছিল কেন?'

বিভাস বলল, 'দরকার ছিল।'

'কি দরকার শুনতে পারিনে?'

বিভাস বলল, 'নিশ্চয়ই পার। বাড়িঅলা রুবিকে ঘর ছেড়ে দেওয়ার জন্য নোটিশ দিয়েছে। তাও ভদ্রভাবে দেয়নি। অসঙ্গত ভাবে অপমান করেছে।'

উমা না জানার ভান করে বলল, 'ওমা তাই নাকি! তারপর?'

বিভাস বলল, 'আমি সুধাংশু মুখুজ্যেকে দিয়ে একটা জবাব দেওয়ালাম।'

উমা বলল, 'তুমি তাহলে ওর হয়ে লড়বে এইটাই ঠিক করেছ ?'

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ।'

উমা বলল, 'বেশ আমিও দেখে নেব তুমি কি করে ওকে এবাড়িতে রাখতে পার। দেখব তোমার কতখানি জোর।'

বিভাস বলল, 'আমার জোর নয়, নিজের জোরে নিজের দাবীতে থাকবে !'

…ছুটির পরে আজ নিজেই গিয়ে রুবির অফিসের গেটের কাছে দেখা করল বিভাস, বলল, 'এই নিন আপনার রিসিট আর ব্যালান্স।'

রুবি লজ্জিত হয়ে বলল, 'টাকাটা না হয় আপনার কাছে থাকতই, তার জন্যে এতখানি ছুটে আসবার কি দরকার ছিল !'

বিভাস বলল, 'শুধু যে টাকা দিতেই এসেছি, তাই বা ভাবছেন কেন ?'

রুবি বিভাসের দিকে তাকাল, 'ও, শুধু টাকা দিতে নয়, তবে আর কী জন্যে !'

বিভাস বলল, 'আপনার সঙ্গে আরো কথা আছে।'

রুবি বলল, 'কি ভাগ্য, আমার সঙ্গে কথা !'

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে এসে ঢুকল ইডেন গার্ডেনে। একটা খালি বেঞ্চ পেয়ে রুবি বলল, 'আসুন এখানে বসা যাক, দেখছেন কি হতভাগা চেহারা হয়েছে গার্ডেনটার।'

বড় বড় পাতায় ঢাকা ছোট্ট জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে বিভাস বলল, 'হুঁ।'

রুবি বলল, 'অনেকদিন পর এলাম এখানে। আজকাল এসব জায়গায় কেউ আর বড় একটা আসে না। কিন্তু মাঝে মাঝে পুরনো জায়গা বড় ভালো লাগে। পুরনো দিনগুলি নতুন মনে হয়। পুরনো অভ্যাসে নতুন অনুভূতির স্বাদ আসে। কিন্তু আপনি কিছু শুনছেন না। কি ভাবছেন বলুন তো ?'

রুবি আলগোছে বিভাসের কাঁধ ধরে একটু নাড়া দিল। বিভাস একটু যেন চমকে উঠল। সরে বসে মাঝখানের ব্যবধানটা বাড়িয়ে নিল আরও একটু। তারপর বলল, 'কিছুই ভাবছিনে। আপনি যা বললেন সবই শুনেছি।'

রুবি বলল, 'শুনেছেন ? আশ্চর্য, কি অদ্ভুত আপনার শ্রবণশক্তি !'

বিভাস এবারও কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি কি এসব কথা সত্যিই বিশ্বাস করেন ?'

রুবি বলল, 'কোন্ সব ?'

বিভাস বলল,'এই একটু আগে যা বলছিলেন, নতুন অনুভূতির স্বাদে পুরনো অভ্যাস নতুন হয়। জীর্ণতা আর থাকে না। মনে হয় সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত।'

রুবি বলল, 'করি। আমি যখন যা বলি, সেই মুহূর্তের জন্যে তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

কথার ওপর আমার ভারি মমতা। আমার এই কথাগুলিকে কাগজে-কলমে ধরে রাখতে পারিনে, সুর দিয়ে ভরে রাখতে পারিনে, তুলি দিয়ে যে এঁকে রাখব সে সাধ্যও নেই, উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা হাওয়ায় মিশিয়ে যায়। তাদের কিছুই আমি দিতে পারিনে, কিন্তু নিজের বিশ্বাসটুকু দিই, অন্তরের উত্তাপটুকু দিই তাদের মধ্যে। হ্যাঁ, আমি যা বলি তা আমি বিশ্বাস করি, আর আমার শ্রোতাকে বিশ্বাস করাতে চাই।'

বিভাস রুবির মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে কি দেখল, তারপর বলল, 'আমার কি মনে হয় জানেন, আপনার ভিতরে এক অবরুদ্ধ শিল্পী আত্মগোপন করে রয়েছে। তাকে বেরুবার পথ দিচ্ছে না। তাই বার বার আপনাকে সে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি তাকে মুক্তি দিন। নিজেকে মুক্ত করুন।'

রুবি একটুকাল স্তম্ভিত থেকে বলল, 'এসব কি বলছেন আপনি ?'

বিভাস বলল, 'ঠিকই বলছি। আজ দেখলাম দেয়ালে টাঙানো সেতারটায় ধুলো পড়ে রয়েছে। কেন ধুলো পড়তে দিচ্ছেন, কেন বাজাচ্ছেন না ?'

রুবি বলল, 'সময় পাই কই। তাছাড়া তেমন ভালোও লাগে না। আপনাকে তো আগেও বলেছি শিল্পে আমার তেমন প্রীতি নেই।'

বিভাস বলল, 'আপনি ধরে রেখেছেন নেই। ভেবে রেখেছেন না থাকাতেই কৃতিত্ব, নেই বলাতেই ফ্যাসান। কিন্তু আছে কি নেই তা একবার পরখ করে দেখুন।'

রুবি বলল, 'দেখলে আপনি খুশি হবেন ?'

বিভাস বলল, 'হব। কেবল আমি কেন, আপনি নিজেও আনন্দ প বেন ?'

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসছিল। বিভাস এবার উঠে দাঁড়াল।

রুবি বলল, 'ওকি, এখনই উঠছেন যে !'

বিভাস বলল, 'পার্টটাইম-টার সময় হয়ে এসেছে।'

রুবি বলল, 'আপনার পার্টটাইমের কি কোনকালেই শেষ হবে না ?'

বিভাস একথায় জবাব না দিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, 'যে কথা বলতে এসেছিলাম তা বলা হল না।'

রুবি বলল, 'সব কথা বলা হয়ও না ; অনেক কথাই অমুক্ত থেকে যায়, অমুক্ত রাখতে হয়।'

বিভাস বলল, 'না, এ-কথাটা অমুক্ত রাখলে চলবে না। দেখুন, সুধাংশু তো খুবই ভরসা দিল।'

রুবি বলল, 'সুধাংশু মানে তো আপনার সেই উকিল বন্ধু ? দোহাই, তাঁর কথা আর তুলবেন না। উকিলের ভরসা দেয়াটাই মক্কেলের ভয়ের কারণ।'

বিভাস হেসে বলল, 'সুধাংশু সে ধরনের উকিল নয়। শ্রীবিলাসবাবু যদি কেস করেন, সুধাংশু আমাদের পক্ষে দাঁড়াবে। দরকার হলে আরো ভালো উকিল কম খরচে ঠিক করে দেবে। কিন্তু আপনাকে একটু সাবধান হয়ে চলতে হবে। চালচলনে কেউ যেন আর কোন খুঁৎ ধরতে না পারে।'

রুবি বলল, 'একি উকিলের পরামর্শ না তাঁর বন্ধুর ?'

বিভাস বলল, 'দুজনেরই।'

রুবি বলল, 'তথাস্তু। মামলা জেতার জন্যে সবান্ধব উকিলের পরামর্শ না হয় দিন কয়েক মেনেই চলা যাবে।'

এস্‌প্লানেডে এসে দুজনে ট্রাম ধরল। একটা বেঞ্চে বসল পাশাপাশি কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। দুজনেই কি যেন ভাবছে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে বিভাস নেমে গেল। যাওয়ার সময় বলল, 'আপনি বাসাতেই ফিরছেন তো ?'

রুবি বলল, 'সাহস করে বলতে পারলেন না যে বাসায় ফিরুন। হ্যাঁ, বাসাতেই ফিরব। পথে পথে ঘুরে আর লাভ কি। আপনি তো ঢুকবেন গিয়ে অফিসে।'

বিভাস বলল, 'উপায় কি !'

বিভাস নেমে যাওয়ার পর রুবি একবার ভাবল সেও নামে। কি হবে এত সকাল সকাল ফিরে। কিন্তু কেন যেন বেঞ্চ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করল না। সময়টা মন্দ কাটেনি। পুরনো জায়গা, পুরনো ধরন, তবু কেটেছে যেন নতুন রকমে। সকালে টাকা ব্যয় করবার অনুশোচনা এই মুহূর্তে মনের কোন কোণে লুকাল। আশ্চর্য মন। এর কোণের যেন আর অবধি নেই। শেষ নেই লুকোচুরি খেলার।

লুকোচুরিটা নিজের মনের কাছেও ধরা পড়তে সুরু করেছে বিভাসের। বাড়িতে দেখা-সাক্ষাৎ করলে উমা বাধা দেয়, তাই নিয়ে হাঙ্গামা করে। তাই বাইরে-বাইরেই ছুটির পর রুবির সঙ্গে সে দেখা করে। সুরুতে উকিলের কথাটা তোলে, শেষটাও মামলার কথাতেই হয়। কিন্তু মাঝখানের কথাগুলি মোটেই মামলা-মোকদ্দমার আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে না। বিভাস এতদিন মনে মনে ভেবেছে একটি মেয়ের সম্মান-রক্ষার দায়িত্ব সে নিয়েছে, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু শরীর খারাপ বলে সেদিন রুবি অফিসে বেরুল না, আর ছুটির পর সমস্ত বিকেলটা বিভাসের কাছে ফাঁকা ফাঁকা মনে হতে লাগল ; তখন টের পেতে তার আর কিছুই বাকি রইল না। শুধু রুবির মান রক্ষা নয়, শুধু কর্তব্যবোধও নয়, ওর সান্নিধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দবোধও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

একথা নিজের কাছেও বিভাসের স্বীকার করবার জো নেই, কিন্তু অস্বীকারেরও কি উপায় আছে! মনে মনে ভারি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল বিভাস। গ্লানি বোধ করতে লাগল নিজের স্ত্রীকে মনে মনে বঞ্চনা করেছে বলে। সেদিন আর ওয়েলিংটন স্ট্রীটের সুনন্দা প্রেসের চাকরিতে গেল না। উমা ফুল ভালবাসে। তার জন্যে রজনীগন্ধার তোড়া কিনল, আর এক বাক্স দামী সাবান। বাবলুর জন্যে কিনে নিল চকোলেট আর খেলনা; তারপর পকেট বোঝাই করে সকাল সকালই বাসায় ফিরে এল।

ঘরে ঢুকেই দেখল পাড়ার সেই মাধব ছোকরাটি এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। হেসে বলল, 'কি মাধব ভালো আছ? পড়াশুনো কেমন চলছে তোমার?'

মাধব ঘাড় নেড়ে বলল, 'ভালো।' তারপর আর দাঁড়াল না।

বিভাস স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'এসো, জিনিসগুলি ধরো। আজকের ফুলগুলি দেখেছ? বেশ তাজা, অনেকদিন থাকবে, না?'

কিন্তু ঘরের এককোণে দেয়ালের সঙ্গে মিশে উমা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিভাস বলল, 'কি হ'ল তোমার? বাবলু পিসীমা ওঁরা সব কোথায়?'

উমা বলল, 'পাশের বাড়ি গেছেন।'

বিভাস হেসে বলল, 'বেশ করেছেন। বুদ্ধি করে যদি একটু দেরি করে ফেরেন তাহলেই বাঁচি। এবার ফুলগুলি নাও। কতক্ষণ ধরে থাকব।'

উমা তীব্র জ্বালাভরা কণ্ঠে বলল, 'ধরে থাকবে কেন, যাও ওঘরে দিয়ে এস।'

বিভাস বলল, 'তার মানে?'

উমা বলল, 'তার মানে আজ তো আর অফিসের পর গার্ডেনে কি গঙ্গার ধারে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াতে পারোনি, রোজ যেমন বেড়াও। যাও যেখানকার ফুল সেখানে দিয়ে এসো।'

বিভাস একটু কাল স্তম্ভিত হয়ে থেকে বলল, 'এসব বাজে কথা তুমি কোথায় শুনলে?'

উমা চেঁচিয়ে উঠল, 'বাজে কথা। মিথ্যে কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না? এতদিন এসব গুণ তোমার ছিল না, আজকাল তাও হচ্ছে। কিন্তু তুমি ভেবেছ মিথ্যে বলে পার পাবে? কলকাতা সহরের আর কেউ আউটরাম ঘাটে যায় না? আর কেউ রেস্টুরেন্টে চা খায় না? আর কারো চোখ নেই। সবারই আছে! গেছে কেবল তোমার! তুমিই অন্ধ না হলে এই বয়সে এমন খানায় কেউ পড়ে? মাধব আজ সব খুলে বলল। অনেক দিন দেখেছে। কেবল ওর কেন, ওর অনেক বন্ধুরও চোখে পড়েছে। পাড়াময় এই নিয়ে কানাকানি চোখ চাওয়াচাওয়ি হচ্ছে। আমার আর মুখ দেখাবার জো রইল না।'

বিভাস কৈফিয়তের সুরে বলল, 'শোন, ওর সঙ্গে বাইরে কেন আমায় দেখা করতে হয়েছে, সব বুঝিয়ে বলছি আমি তোমাকে।'

উমা চেঁচিয়ে বলল, 'আমাকে আর কিছু বোঝাতে হবে না। দোহাই তোমার। আমার বোঝাবুঝির পালা সব শেষ হয়ে গেছে।'

বিভাস আর কোন কথা না বলে হাতের জিনিসগুলি নামিয়ে রাখল। তারপর ফুলগুলি নিজেই তুলে রাখতে গেল ফুলদানিতে। কিন্তু রাখার সঙ্গে সঙ্গে উমা চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার ও ফুল আমার ঘরে নয়, ও ফুল আমার ঘরে নয়। আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব বলছি।'

বিভাস স্ত্রীর কথা গ্রাহ্য না করে ফুলগুলি রেখে দিয়ে জামার বোতাম খুলতে লাগল। কিন্তু উমার আর সহ্য হ'ল না। সে ফুলগুলি শুদ্ধ দামী ফুলদানিটা উঠনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঝন্ ঝন্ করে শব্দ একটা। নীলাভ ফুলদানিটা উঠনে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

মুহূর্তের জন্যে একটা তীব্র ক্রোধ জাগল বিভাসের মনে। উমা যেমন ফুলদানিটা ভেঙেছে, ইচ্ছা হলো শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে স্ত্রীকেও সে চুরমার করে ফেলবে। দুরন্ত ক্রোধে সে বাইরের দিকে পা বাড়াল। কি হ'ত বলা যায় না। কিন্তু বাবলুকে কোলে নিয়ে সুরবালা তার পথ আটকে দাঁড়ালেন, কঠিন স্বরে ডাকলেন, 'বিভাস!'

উমা উঠনে দাঁড়িয়ে বলল, 'ছেড়ে দিন পিসীমা। মারুক এসে আমাকে। এর চেয়ে একেবারে মেরে ফেলুক সেই ভালো। বিত্তের মধ্যে এখন তাইতো বাকি আছে।'

বিভাস কোন জবাব দিল না। শান্তভাবে বেরিয়ে কলের কাছে এসে হাত ধুতে লাগল।

একটু আগে রুবির ঘর থেকে সেতারের শব্দ আসছিল; উমার চেঁচামেচিতে রুবি এসে দোর খুলে দাঁড়াল। বিভাস মুখ ফেরাতেই চোখাচোখি হ'ল ওর সঙ্গে। কেউ কোন কথা বলল না। আস্তে রুবি ফিরে গেল ঘরে। নিঃশব্দে দোর ভেজিয়ে দিল। বিভাস একটু কাল দাঁড়িয়ে রইল উঠনে। সেতার আর বাজল না। কিন্তু বাইরের ঝঙ্কার থেমে গেলেও কিসের একটা করুণ সুর ওর অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হতে লাগল। আধখোলা দোরের পাশে একটি শান্ত গম্ভীর মূর্তি ওর চোখের সামনে আর একবার ভেসে উঠল। বিভাসের মনে হল রুবির অমন সহানুভূতি কোমল চোখ এর আগে সে আর দেখেনি।

রাস্তায় রাস্তায় বহুক্ষণ ঘুরে বেড়াল বিভাস। ফিরল অনেক দেরি করে। যান্ত্রিকভাবে রাত্রের খাওয়া দাওয়া শেষ হ'ল। বিভাসের মশারি টানিয়ে দিয়ে উমা মেঝেয় আলাদা বিছানা করে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল।

বিভাস একবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কিছু খেলে না?'

উমা কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। পাশের ঘর থেকে সুরবালা বললেন, 'এত সাধাসাধি করেও কিছুতে খাওয়াতে পারলাম না। ভাতের ওপর যে তোমাদের কিসের রাগ তা বুঝিনে বাপু।'

অনেক রাত্রে চাপা কান্নার শব্দ শুনে বিভাস উঠে এসে স্ত্রীর কাছে বসল। তার চুলের ওপর আলগোছে হাত বুলতে বুলতে ডাকল, 'উমা।'

উমা তেমনি কান্নাভরা স্বরে বলল, 'তুমি যাও, শুয়ে ঘুমোও গিয়ে।

বিভাস আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, 'রাগের মাথায় তুমি অমন সুন্দর ফুলদানিটা ভেঙে ফেললে।'

উমা আস্তে আস্তে বলল, 'ফুলদানি! আর তুমি যে একটা গোটা সংসার চুরমার করে দিচ্ছ।'

বিভাস বলল, 'ভুল, তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা উমা। একটা কাল্পনিক দুঃখে তুমি নিজেও কষ্ট পাচ্ছ, আমাকেও কষ্ট দিচ্ছ।'

আরও নানা কথা বলে স্ত্রীকে বিভাস সান্ত্বনা দিতে লাগল। কিন্তু নিজের কাছেই মনে হ'ল এ যেন কেবল আর্তকে বঞ্চিতকে প্রবোধ দান। কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, গভীর সহানুভূতির অভাব ঘটছে। একটা বিদ্বেষবোধ যেন কিছুতেই মন থেকে যেতে চাইছে না। বার বার মনে হচ্ছে তার সখ করে কেনা ফুলদানিটা কেন অমন করে ভাঙতে গেল উমা। স্ত্রীর পক্ষ থেকে যতবার ব্যাপারটাকে ভাবতে চেষ্টা করল, যতবার মনকে বোঝাল ঈর্ষা থেকেই এই প্রচণ্ড বিদ্বেষ এসেছে, কিছুতেই নিজের হৃদয়কে ওর দিকে উন্মুখ করে তুলতে পারল না। কোথায় যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সে শূন্যতা কিছুতেই ভরে উঠতে চাইছে না। নিজের এই অনৌদার্যে বিভাস নিজে মনে মনে পীড়িত বোধ করল। কিন্তু সে পীড়াও যেন কর্তব্যহানির পীড়া। গভীর যন্ত্রণাবোধ নয়। দুজনের ভিতরকার অতি-কোমল অতি-সূক্ষ্ম সংবেদনশীল একটি অদৃশ্য তন্তু যেন ছিঁড়ে গেছে। কেন এমন হ'ল, কার দোষে এমন হ'ল। বিভাস কেবল নিজেকেই দোষ দিতে পারল না। মনে মনে ভাবল উমারও দোষ আছে, ওর অপরিমিত ঈর্ষার অশোভন প্রকাশ, অতিপ্রচণ্ড অসহিষ্ণুতাই এই দুর্ঘটনার জন্যে বেশীর ভাগ দায়ী।

দিন কয়েক বিভাস রুবির আর খবর নিল না। দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা বলবার চেষ্টা করল না। অফিসের কাজকর্মে আরও বেশী করে মন দিল। বাড়িতে ফিরে ছেলের সঙ্গে খেলতে লাগল। যে ফুলদানিটা উমা ভেঙেছিল ঠিক তেমনি একটা ফুলদানি কিনে নিয়ে এল। স্ত্রীর জন্যে নিয়ে এল চাঁপা রঙের একখানা রঙীন শাড়ি। চাঁপা ফুলের রঙ উমা ভারি ভালোবাসে।

উমা বলল, 'এসব আবার কেন? আমার তো শাড়ি আছে।'

বিভাস বলল, 'চাঁপা রঙের শাড়ি তো নেই।'

উমা একটু হাসল, 'তবু ভালো চাঁপা রঙের কথাটা তোমার মনে আছে।'

বিভাস বলল, 'আমার সব মনে থাকে উমা।'

আস্তে আস্তে স্ত্রীর একখানা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিল বিভাস। মুঠির ভিতরে অনেকক্ষণ চেপে রাখল। উমা খুশি হয়ে বলল, 'চল বাইরে যাই একটু। আকাশে কি চমৎকার চাঁদ উঠেছে! কতকাল যে চাঁদ দেখিনি!'

আকাশে শুধু চাঁদ নয়, মেঘ আর চাঁদের লুকোচুরি খেলা চলেছে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে উঠনে এসে দাঁড়াল বিভাস। হঠাৎ রুবির ঘরের দিকে ওর চোখ পড়ল। রুবির ঘরে আলো নেই, ঘরে কোন শব্দ নেই। একটা বড় সীসার তালা ঝুলছে দরজায়।

বিভাস বলল, 'একি, রুবি এত রাত্রেও ফেরেনি!'

স্বামীর উদ্বেগে একটু বিস্মিত হয়ে উমা তার মুখের দিকে তাকাল, 'সেকি, তুমি জানো না? ও তো আজ সকালে ভদ্রেশ্বর চলে গেছে। ওর মায়ের নাকি অসুখ। চিঠি পেয়েছে।'

বিভাসের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, 'আমায় না জানিয়েই চলে গেল!'

উমা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে দেখল, তারপর নিষ্ঠুর বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'সত্যিই তো, মহা অন্যায় করেছে সে। তোমাকে জানিয়ে যায়নি, কি আশ্চর্য!'

স্ত্রীর দিকে একপলক তাকিয়ে থেকে বিভাস চোখ ফিরিয়ে নিল।

আকাশের চাঁদ মেঘের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আটকে রইল। মেঘের আড়ালে তার ক্ষীণ আভাস দেখা যাচ্ছে। বিভাসের মনে হ'ল ওটাও একটা সীসার তালার মত।

উমা ঘরে এসে নতুন কেনা শাড়িখানা ছেড়ে ফেলল। বিভাস চেয়ে চেয়ে স্ত্রীর কাণ্ড দেখতে লাগল, কোনরকম মন্তব্য করল না।

বিছানায় শুয়ে বিভাস স্ত্রীকে আর একবার কাছে টানতে গেল। কিন্তু উমা অনেক দূরে সরে গিয়ে বলল, 'আমাকে ছুঁয়োনা, আমাকে ছুঁয়োনা। তোমার ছোঁয়ায় আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে।'

বিভাস বলল, 'উমা, তুমি এত নিষ্ঠুর!'

উমা উঁচু গলায় বলল, 'আমি নিষ্ঠুর! লজ্জা করে না বলতে! নির্লজ্জ লম্পট কোথাকার!'

বিভাস বলল, 'আস্তে উমা, আস্তে কথা বলো—ওঘরে পিসীমা রয়েছেন।'

উমা বলল, 'থাকুন। তাঁর যেন জানতে কিছু বাকি আছে। তোমার কেলেঙ্কারির কথা সবাই জানে, সবাই জানবে।'

বিভাস আর কিছু না বলে নিঃশব্দে পাশ ফিরল। আজও অনেক রাত্রে সে স্ত্রীর চাপা কান্না শুনতে পেল। কিন্তু আজ আর তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোন চেষ্টা করল না। হৃদয়টা সীসার মত কঠিন আর ভারি হয়ে গেছে।

...সকাল বেলায় সাংসারিক কাজকর্ম সারার পর বিভাস ছেলেকে আদর করতে বসল, তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'বাবলু, আজ তোমার জন্যে কি আনব বল তো?'

বাবলু হেসে ছোট ছোট কয়েকটি দাঁত বের করে বলল, 'গালি।'

বিভাস বলল, 'গাড়ি? রেল গাড়ি না মোটর গাড়ি? মোটর গাড়ি? আচ্ছা তাই আনব।'

উমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ছেলের ওপর হঠাৎ ভারি যত্নবান আর মনোযোগী হয়ে উঠল বিভাস। আশা, বাৎসল্য তাকে অন্যমনস্ক করবে, সীসার হৃদয়টাকে গলিয়ে দেবে, সীসার তালাটাকে ভুলিয়ে দেবে বাবলুর কোমল সুন্দর মুখ।

বাৎসল্যের চর্চায় আরো দুদিন কাটল। রুবির ঘরের ঝুলনো তালাটার দিকে সে ফিরেও তাকাল না। সংসারের দু'একটা টুকটাক জিনিসের নাম কাগজে লিখে উমা ছেলের হাতে দিয়ে বলল, 'বাবলু, তোমার বাবনকে দাও।'

ছেলের হাত থেকে ফর্দটা তুলে নিয়ে পকেটের ময়লা রুমালটা তার হাতে দিয়ে বলল, 'বাবলু, তোমার মাকে এটা বদলে দিতে বলো।'

রুমালটা নাকের কাছে একটু তুলে ধরে বাবলু অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বলল, 'ঈঃ গন্ধ!' উমা হেসে ফেলে বলল, 'তোমার বাবার কাণ্ড।'

বিভাস বলল, 'তোমার মা যেন আর কোনরকম কাণ্ড করতে জানেন না। আজকাল একেবারে পূর্ণ অসহযোগ চলছে। রুমালটাও বদলে দেওয়া হয় না।'

উমা ছোট একখানা সাদা রুমাল বের করে ছেলের হাতে না দিয়ে নিজেই এসে স্বামীর ঝুল পকেটে গুঁজে দিল। বিভাস লক্ষ্য করল রুমালখানা উমার নিজের। রুমাল দিতে গিয়ে একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হ'ল। যেন অনেকদিন পরে স্পর্শ পেল পরস্পরের।

বেরুবার আগে বিভাস নীচু হয়ে বাবলুর গালে চুমো খেল। দাম্পত্য-কলহে সন্ধিপত্রের বাহন এই পুত্র, ওর কাছে বিভাস কৃতজ্ঞ। বাবার চুমো খেয়ে বাবলু মার কাছে এসে দাঁড়াল, 'মা তুমি দাও।'

উমা বলল, 'শয়তান। একজনের দেওয়ায় বুঝি হয় না।' বলে ছেলের দুই গালে দুই চুমো খেল। বিভাস যে গালে চুমো খেয়েছিল, সেই গালেই আগে ঠোঁট ছোঁয়াল।

শান্ত প্রসন্নচিত্তে অফিসে রওনা হয়ে গেল বিভাস। অনেকদিন পরে নতুন স্ফূর্তিতে কাজে মন দিল। জমিয়ে রাখা কাজগুলি আজ শেষ করে তবে উঠবে।

…টিফিনের আগেই ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেণ্টের বেয়ারা এসে একখানা এনভেলপ হাতে দিল বিভাসের। সুন্দর হস্তাক্ষরে ইংরেজীতে তার নিজের নাম লেখা। কোণায় লেখা 'পার্সনাল।'

এ হাতের লেখা যেন চেনা চেনা। তবু ঠিক সম্পূর্ণ চিনতে সাহস পেল না বিভাস। দুরু দুরু বুকে খামের মুখ ছিঁড়ে ফেলল। ঠিকানা, তারিখ, সম্বোধন বাদ দিয়ে আকস্মিকভাবে চিঠি আরম্ভ হয়েছে, 'আপনাদের সংসারে দিনের পর দিন যে কাণ্ড ঘটছে, তাতে আমার আর ও বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়, থাকা সঙ্গতও নয়। কয়েকদিন বাদে আমি অন্য জায়গায় উঠে যাব। আপনি আপনার উকিল বন্ধুকে নিষেধ করে দেবেন।'

তারপর একটু ফাঁক দিয়ে অসংলগ্নভাবে আর একটি লাইন আছে।

'আমি শুক্রবার সন্ধ্যা ছ'টার ট্রেনে ফিরব। ইতি রুবি।'

বিভাস তাড়াতাড়ি চিঠিটা বন্ধ করল। কিন্তু শেষ লাইনটি তার মনের মধ্যে বারবার ধ্বনিত হতে লাগল—'আমি সন্ধ্যা ছ'টার ট্রেণে ফিরব।'

লাইনটাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করল বিভাস অন্য চিন্তা আর কথার ফাঁকে বারবার চাপা দিতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠল না। দেয়ালে টানানো ক্যালেণ্ডারের দিনটা বারবার চোখে পড়তে লাগল। আজই শুক্রবার। ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটাটা আস্তে আস্তে কোন এক অমোঘ নিয়মে ছটার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বিভাসের মনে হ'ল শেষের কথাটিই একমাত্র কথা। চিঠির আর বাকি কথাগুলি অবাস্তর অর্থহীন! শেষ কথাটির জন্যেই চিঠি লিখেছে রুবি। কিন্তু বিভাস যাবে না অফিস ছুটির পরও। চেয়ারে শক্ত হয়ে বসে রইল। স ড়ে পাঁচটা বাজল, পৌনে ছটা বাজল। তবু উঠল না, বসে বসে পুরনো ফাইল ঘাঁটতে লাগল। অফিস প্রায় খালি হবার জো হয়েছে, বেয়ারা অনন্ত এসে বলল, 'বাবু, আজ উঠবেন না? ছ'টা যে প্রায় বাজতে চলল!'

'এ্যাঁ, ছ'টা বেজে গেছে!, নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকাল বিভাস। 'না বাজেনি, দেরি আছে এখনো চৌদ্দ মিনিট।'

বিভাস তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'ফাইলগুলি গুছিয়ে রাখ তো অমূল্য, আমায় এক্ষুনি বেরুতে হবে।'

তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রামলাইন পার হয়ে ছুটে গিয়ে হাওড়াগামী একটি চলন্ত বাসের হ্যাণ্ডেল আঁকড়ে ধরল বিভাস। আর প্রত্যেকটা স্টপেজে মনে মনে ভাবতে লাগল এখনো নেমে গেলে হয়, এখনো ফিরে যাওয়ার সময় আছে। কিন্তু নেমে গেল না,

ফিরে যেতে পারল না। উঠে গিয়ে বাসের মধ্যে ভালোভাবে দাঁড়াবার জায়গা করে নিল। মনে মনে ভাবল ও আকর্ষণের সঙ্গে আর কিছুর তুলনা নেই, আর কিছুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। বাৎসল্যের সঙ্গে নয়, স্ত্রীর ওপর স্নেহ ভালোবাসার সঙ্গে নয়, এ সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়, একক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু নিজের অসহায় বিহ্বলতায় নিজেই একসময় হাসল। এত বিমূঢ় হবার কি আছে। হাওড়া স্টেশনে তার আর কোন কাজ থাকতে পারে না? অফিসের ছুটির পর একজন পরিচিত মেয়েকে স্টেশন থেকে তুলে আনবার মধ্যেই বা এমন কি দোষের বস্তু আছে।

স্টেশনে এসে প্লাটফর্মের টিকেট কাটল বিভাস। খবর নিয়ে জানল গাড়ি দশ মিনিট লেট আছে। আরো অনেকের সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে মিশে প্লাটফর্মে ঢুকে পড়ল। যেন অন্য সকলের সঙ্গে তার আসার কোন পার্থক্য নেই।

...একটি থার্ডক্লাস কামরা থেকে বেরুতেই অপেক্ষমান বিভাসের সঙ্গে রুবির চোখাচোখি হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'আপনি!' তারপর একটু বাদে বলল, 'আমি জানতুম।'

বিভাসের ইচ্ছা হ'ল তীব্র প্রতিবাদ করে বলে, 'তুমি যা জেনেছ তা ভুল। তুমি যা ভেবেছ তা ঠিক নয়।' কিন্তু কথাগুলি মুখ থেকে বেরুল না। কোন মিথ্যে কৈফিয়ৎ হঠাৎ মাথায় এল না। মুহূর্তকাল ব্যর্থ চেষ্টার পর বিভাস মরীয়া হয়ে এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে দিয়ে তীব্র রূঢ় স্বরে বলল, 'এসো, নেমে এসো।'

বিভাসের মুখের দিকে তাকিয়ে রুবির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ভঙ্গিতে হাতটা টেনে নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিভাস ততক্ষণে ওর মুঠি চেপে ধরেছে। আশ্চর্য, রুবির সর্বাঙ্গ আজও একবার শিউরে ওঠে, বুকটা আজও একবার কাঁপে। এমন তো কতবার হয়েছে, তবু মনে হয় এমন আর কোনবারই হয়নি, এই প্রথম!

ট্রামে উঠে বিভাস নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে বলতে চেষ্টা করল, 'তোমার মা কেমন আছেন?'

রুবি বলল, 'ভালো!' সারা পথ আর কেউ কোন কথা বলল না।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে এসে আজও বিভাস নেমে গেল।

রুবি এবার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

বিভাস বলল, 'সুনন্দা প্রেসে।'

অনেক রাত্রে বিভাস বাড়ি ফিরলে উমা জিজ্ঞেস করল, 'আজ যে তোমার এত দেরি হ'ল।'

বিভাস সংক্ষেপে বলল, 'কাজ ছিল।'

উমা বলল, 'জিনিসগুলি এনেছ? বাবলু তার গাড়ির জন্যে অনেকক্ষণ জেগেছিল, ভালো কথা, রুবি আজ এসেছে জানো?'

বিভাস বলল, 'তাই নাকি!'

উমা অভ্যাসমত বিভাসের জামাটা উল্টিয়ে আলনায় তুলে রাখতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বুক পকেট থেকে কি একটা কাগজ পড়ে গেল।

উমা বলল, 'এটা কি' বলে অত্যন্ত কৌতূহলে চিঠিটা খুলে পড়তে আরম্ভ করল, পড়া শেষ করল, তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি?'

বিভাস বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছ একটা চিঠি।'

সমস্ত সময়টা তার এত বিহ্বলতার মধ্যে কেটেছে যে চিঠিটা সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার কথা পর্যন্ত সে ভুলে গেছে।

উমা বলল, 'হ্যাঁ, তা পাচ্ছি বইকি। আরো অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি।'

চিঠিটা তুলে ফের স্বামীর বুক পকেটেই রেখে দিল উমা। ঝুল পকেটে হাত দিয়ে দেখল তার দেওয়া রুমাল আর ফর্দখানা ঠিক তেমনি আছে।

...ভোরে উঠে উমা বলল, 'আমি বাবলুকে নিয়ে উত্তরপাড়া চলে যাচ্ছি। ওবাড়ির মাধব আমায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। আমি একাও যেতে পারি।'

বিভাস বলল, 'বেশ তো, অনেকদিন তো তোমার বাবা মার কাছে যাওনি, দিন কয়েক ঘুরেই এসো না হয়।'

উমা বলল, 'অমনি রাজী। চোখের সামনে থেকে সরে গেলে খুব সুবিধে হয়, না? কিন্তু যা ভেবেছ তা হবে না, আমি এক পা-ও এখান থেকে নড়ব না!'

বিভাস বিরক্ত হয়ে বলল, 'বেশ তো, নড় না।'

উমা বলল, 'নড়ব নাই তো। আমি শেষ পর্যন্ত যুঝব। আইন আদালত করতে হয় তাও করব। তোমাদের সহজে ছেড়ে দেব ভেবেছ বুঝি?'

বিভাস বলল, 'না, তা কেন ছাড়বে?'

...উমা বাপের বাড়ি গেল না। দুপুরের পর প্যাড খুলে বাবাকে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখতে বসল। ভেবেছিল অনেক কথাই লিখবে, সবই লিখবে। কিন্তু বহু কাটাকুটির পর লিখল মাত্র দু'লাইন!

শ্রীচরণেষু

বাবা, তুমি চিঠি পাওয়া মাত্র চলে আসবে। আমি বিপদে পড়েছি, ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছি।

ইতি—উমা

খামের মুখ আটকে নিজে গিয়ে চিঠি পোস্ট করে এল।

…সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। বাইরে দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। পাশের ঘরে পিসীমা বাবলুকে বুকের কাছে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছেন। তাঁর নাক ডাকার মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। আহা, উমাও যদি এমনি করে ঘুমুতে পারত। আশ্চর্য, পিসীমা কি করে ঘুমুচ্ছেন, পিসীমা কি করে সব ভুলতে পেরেছেন। প্রথমে নিশ্চয়ই পারেননি, প্রথমে তাঁকেও উমার মত ঠিক এমনি সারাদিন সারারাত ছটফট করতে হয়েছে। তারপর সব অস্থিরতা থেমেছে। সময়। সময়ে সব থামায়, সময়ে সব ভুলায়। পিসীমার মত সময়ের হাতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উমারও কি কোন গতি নেই? না, তা সে পারবে না। পিসীমার মত অমন ভালো-মানুষিতা করে কিছুতেই সব সে ছেড়ে আসতে পারবে না! কেন ছাড়বে, তার অধিকার কেন সে ছাড়বে?

কিন্তু ছাড়তে পারবেই বা না কেন, বিভাস তো কত অনায়াসে ছেড়েছে। বিভাস তো কত অনায়াসে ভেঙেছে। সম্পর্ক গড়বার সময় দুজনের দরকার হয়, কিন্তু ভাঙবার সময় একজনই যথেষ্ট। সেই ভাঙা জিনিসকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরবার জন্যে কেন উমার এই কাঙালপণা। বিভাস যেমন ছেড়েছে সেও কি তেমনি ওকে ছেড়ে দিতে পারে না? বিভাস যেমন ভেঙেছে সেও কি তেমনি দুপায়ে সব গুঁড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। লেখাপড়া সেও তো কিছু শিখেছে। পিসীমার মত তাকে পর-মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। স্বাধীনভাবে নিজের খরচে সে নিজে চালিয়ে থাকতে পারবে। এমন তো আজকাল কত মেয়ে থাকে। তারপর প্রেম? বিভাস যেমন অন্য মেয়ের প্রেমে পড়েছে, উমাও তেমনি অন্য কোন ছেলের প্রেমে পড়তে পারে। হ'লই বা একটি সন্তান। এখনো তার চেহারা খারাপ হয়নি। বিভাসের কাছে সে পুরনো হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অন্য যে কোন যুবকের পক্ষে সে নতুন, সে রহস্যময়ী।

ফের প্যাডটা টেনে নিল উমা। রুবি যেমন বিভাসকে চিঠি লিখেছে, সেও তেমনি অন্য পুরুষকে লিখবে! তাকে প্রেম নিবেদন করবে!

প্যাডের পাতা খুলে কলম তুলে নিল উমা। কিন্তু কাকে? কাকে লিখবে? দু' একজন কৈশোর সঙ্গীর নাম মনে পড়ল, দাদার দু' একজন বন্ধুর মুখ মনে পড়ল। বিয়ের আগে তাদের এক-আধটু ভীরু অনুরাগের নিদর্শন চোখের সামনে ভেসে উঠল উমার। কিন্তু তাদের কাউকেই চিঠি লেখা চলে না। তখন হয়তো চলত কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। এখন বড় জোর চিঠিতে কুশল প্রশ্ন করা চলে, তাদের বউ-ছেলের কথা জিজ্ঞেস করা চলে, এ ছাড়া অন্য কিছু লিখলে তারা ভাববে—উমা পাগল হয়ে গেছে। তাছাড়া লিখতে না লিখতে উমার নিজেরই হাসি পাবে যে। না কেউ নেই, তার হৃদয়-নিবেদনের

জন্যে আর কোন দ্বিতীয় পুরুষ নেই দুনিয়ায়! বিভাস সরে গেলে সব সরে যাবে। বিভাসকে সে ছাড়বে না, কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। কিন্তু পারা উচিত ছিল। অবিশ্বাসী ব্যাভিচারী স্বামীকে তার ছাড়তে পারা উচিত ছিল যে! আশ্চর্য, তবু কেন পারে না। উমার সমস্ত হৃদয়টা যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল। যে পরিত্যজ্য, তাকে কেন সে ত্যাগ করতে পারে না। যে ভালোবাসার অযোগ্য তাকেও কেন ভালোবাসতে হয়!

অফিসে টিফিন রুমের নির্জন কোণে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে, বিভাসও ঠিক এই কথাই ভাবছিল, যে ভালোবাসার অযোগ্য তাকেও কেন ভালোবাসতে হয়। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে কোনদিক থেকেই তো রুবির যোগ্যতাকে সে স্বীকার করে না। তবু বিভাসের মনের মধ্যে এতখানি স্বীকৃতি সে কী করে পেয়ে বসল। ওর সঙ্গে বিভাসের রুচির মিল নেই, রীতির মিল নেই, জীবনাদর্শের মিল নেই। ওর উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অনেক কাহিনীই তো বিভাস শুনেছে, আরো অনেক অনুক্ত কাহিনীর কথা সে অনুমান করে নিয়েছে। ওকে একমুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করা যায় না। তবু বিশ্বাস না করে পারা যায় না কেন? দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভাস ওর সব গ্লানি সব পঙ্কিলতা ভুলে যায় কি করে? নিজের দায়িত্ব, কর্তব্য, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের সংসারে নিজের বিশেষ একটি মর্যাদাময় স্থান সব বিভাসের ভেসে যায় কিসে? এই দুর্বার খরস্রোতের উৎস কোথায়? সে কি বিভাসের নিজের মধ্যে না রুবির মধ্যে? নাকি দুজনের রক্তেই তার অস্তিত্ব? সেই যুক্তধারার প্লাবনেই কি সব ডুবে যায়, সব ভেসে যায়? কিন্তু ভেসে যেতে তো দিতে পারে না বিভাস। না, কিছুতেই না। তাকে শক্তভাবে দৃঢ় পায়ে মাটি আঁকড়ে থাকতে হবে। আত্মরক্ষা করতে হবে তাকে।

রুবি তাকে কি দিতে পারে? রুবির কাছে সে চায়ই বা কি? এমন কি বস্তু সে পেতে পারে যা উমার কাছে পায়নি, যা উমা তাকে দেয়নি? বরং উমা যা দিয়েছে তার অনেক কিছুই রুবি দিতে পারবে না। সেবাশুশ্রূষায় বিশ্বাসে নির্ভরতায় উমার সঙ্গে রুবির তুলনাই হয় না। এমন কি আছে রুবির মধ্যে, কোন্ অনাস্বাদিত পরম-বস্তু আছে, যার জন্যে বিভাসের মন এমন তৃষিত হয়ে উঠেছে? এক বাকচাতুর্য ছাড়া আর কি আছে ওর মধ্যে? বিভাস কি শুধু তাহলে এক বাগ্মীকে ভালোবাসে? শুধু কি ওর কথা শুনতে চায়? শুধু শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ছাড়া কি ওর সান্নিধ্য-লাভের আর কোন উদ্দেশ্যই বিভাসের নেই। কিন্তু এও তো নিজের মনকে আঁখি ঠারা। শুধু মুখের কথা শুনতেই যে ভালো লাগে তাতো নয়, মুখ দেখতেও যে ভালো লাগে। একথা তো নিজের কাছে আর অস্বীকার করার জো নেই। তাহলে এ আকর্ষণ শুধু দেহের? এই বন্ধুত্ব বহুকামিতা ছাড়া

আর কিছু নয় ? একথা স্বীকার করতে বড় লজ্জা, বড় অগৌরব। না, বিভাস তা স্বীকার করতে পারবে না, বিভাস দেহের অন্যায় দাবীকে কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। সে আর পাঁচজনের মত নয়।

অফিসের সাদা ইউনিফর্ম পরা অনন্ত এসে দাঁড়াল, 'বিভাসবাবু, আপনার ফোন এসেছে। একটি মহিলা ডাকছেন আপনাকে।'

বিভাস বলল, 'বলে দাও আমি নেই।'

অনন্ত হাসি গোপন করে বলল, 'নেই বলতে হবে! বেশ, বলে দিচ্ছি।'

ওকে ফিরে ডাকতে না ডাকতেই অনন্ত চলে গেল। বিভাস মনে মনে ভাবল, ছি ছি ছি একি করল সে! অনন্ত কি মনে করবে। তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল। চাকর-বেয়ারার সামনেও মাথা সে ঠিক রাখতে পারে না। তাছাড়া রুবির যদি সত্যিই কোন দরকার পড়ে থাকে, যদি কোন অসুবিধেয় পড়ে থাকে সে, বলা তো যায় না।

সীটে ফিরে যাওয়ার আগে বিভাস ফোনের রিসিভারটা তুলে ধরে রুবিদের অফিসের নম্বর চাইল।

রুবির গলা শোনা গেল, 'একটু আগে আমি ফোন করেছিলাম।'

বিভাস বলল, 'তা জানি।'

রুবি বলল, 'জানো ? আশ্চর্য! ওরা যে বলে দিলে তুমি নেই।'

বিভাস বলল, 'তখন ছিলাম না, এখন আছি।'

রুবি বলল, 'ভারি অদ্ভুত কথা তো, তুমি কি ক্ষণে ক্ষণে এমনি উধাও হও নাকি ? এই বুঝি ক্ষণজন্মা পুরুষের লক্ষণ ?'

বিভাস বলল, 'বোধহয়, ফোন করেছিলে কেন ?'

রুবি বলল, 'একটি খবর আছে। কোর্টের সমন পেয়েছি। শিগগির এবার সুধাংশু-বাবুকে বল, যেমন করেই হোক কেসটা মিটিয়ে দিন। আমি যে-কোন মুহূর্তে ঘর ছেড়ে দিতে রাজী আছি।'

বিভাস বলল 'উঁহু, তা হবে না। তোমাকে লড়তেই হবে।' বলে ফোন ছেড়ে দিল।

...ছুটির পর ফের এসে বিভাসের সঙ্গে দেখা করল রুবি। সেই পর্দা ঘেরা চায়ের কেবিনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এ তুমি কি পাগলামি শুরু করলে বল তো।'

বিভাস বলল, 'কেন, তোমার ভয় কিসের ?'

রুবি বলল, 'ভয়ের কথা নয়, ভয় আমি কাউকে করিনে। কিন্তু ওই তুচ্ছ দু'খানা ঘরের জন্যে অত খরচ অত হাঙ্গামা করতে যাব কেন ?'

বিভাস বলল, 'শুধু দু'খানা ঘরের জন্যেই তো নয়। তোমার নিজের মর্যাদা বাঁচাবার

জন্যে এই মামলা করা দরকার। শ্রীবিলাসবাবু যে অভিযোগ তোমার নামে এনেছেন, তা অত্যন্ত অসম্মানকর। তাকে কিছুতেই স্বীকার করে নেওয়া যায় না—সেকথা ভুলে যাচ্ছ কেন?'

রুবি বলল, 'ভুলিনি। কিন্তু কোর্টে কি মর্যাদা বাঁচবে?'

বিভাস বলল, 'নিশ্চয়ই বাঁচবে। যাতে বাঁচে তার জন্যে সব রকম চেষ্টা করতে হবে।'

'কিন্তু—' বলেই রুবি থেমে গেল। বলতে যাচ্ছিল যদি 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ' বের হয়—কিন্তু কথাটা বলতে নিজেরই যেন কোথায় বাধল। নিজেকেও বুঝি অতখানি ছোট করা যায় না।

বিভাস বলল, 'এর মধ্যে কিন্তুও নেই, যদিও নেই। কেস যখন উঠেছে চালাতেই হবে। কেস আমরা জিতবই। তার জন্যে কিছুদিন তোমাকে চালচলন সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে। আর তোমার বাবা কি দাদা-বৌদিকে লিখে দাও—এখানে এসে তাঁরা থাকবেন।'

রুবি একটু হাসল, 'তা না হয় হ'ল। চালচলনও শোধরালুম, দাদা-বৌদিও না হয় এসে রইলেন। কিন্তু তুমি যদি এ ব্যাপারে অত খোলাখুলি ভাবে জড়াতে যাও, তোমার নামেও তো কলঙ্ক রটতে পারে।'

বিভাস বলল, 'তা রটলই বা।'

রুবি বলল, 'তা' রটতে দিয়ে কি লাভ। তুমি শুধু জড়াবার কলঙ্কটাই চাও, আসলে জড়াতে চাও না।' বলে চোখ নামিয়ে নিল।

একটু যেন করুণ হতাশার সুর বাজল ওর গলায়।

বয় প্লেটে করে খাবার দিয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে কেউ তাতে হাত দিল না।

একটু বাদে বিভাস বলল, 'আসলে জড়াবার মানে কি?'

মুহূর্তের জন্যে রুবির মুখটা আরক্ত হয়ে উঠল, 'মানে আমি জানিনে।'

কিন্তু পরক্ষণেই কাটলেটের একটা টুকরো কেটে কাঁটায় বিঁধে মুখে তুলতে তুলতে রুবি অনুচ্চ কিন্তু তীব্র উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'জানাব না কেন, জড়াবার মানে তুমিও জানো আমি জানি। কিন্তু জেনেও তুমি না জানার ভান করছ। এগিয়ে এগুতে সাহস পাচ্ছ না। হ্যাঁ, একে তুমি শুচিতা বলতে পার, সাধুতা বলতে পার কিন্তু আমি বলব সাহসের অভাব।'

বিভাস রুবির কথার পুনরাবৃত্তি করল, 'সাহসের অভাব!'

রুবি বলল, 'নিশ্চয়ই, তা ছাড়া কি। নানা ভয়েই তুমি এগুতে পারছ না।'

বিভাস বলল, 'নাকি! দু'চার রকম ভয়ের বিবরণ শুনি তোমার মুখে।'

রুবি বলল, 'আমার মুখ থেকে শুনতে তোমার খারাপ লাগবে। কারণ মেয়েরা এসব

কথা বলে না। কিন্তু আমার মুখে কিছু আটকায় না সেকথা তুমি জানো। আমি সব বলতে পারি।'

বিভাস একটু হাসতে চেষ্টা করল, 'বেশ তো বল না।'

রুবি বলল, 'বলবই তো। একনম্বর ভয় আরো বেশিদূর এগুলে তোমার দায়িত্ব বাড়বে। হয়তো তোমার কাছে শাড়ি গয়না, বাড়ি গাড়ির দাবী করে বসব।'

বিভাস বলল, 'বিচিত্র কি! তাও তো করতে পার।'

রুবি বলল, 'না, সেসব আমরা লোক বুঝে করি।'

বিভাস বলল, 'যাক, একটি ভয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার দোসরা নম্বর ভয়ের কারণটা কি বলে তোমার মনে হয়?'

রুবি বলল, 'সেটি তোমার অর্থহীন আধ্যাত্মিকতা—হাস্যকর বিদেহবাদ।'

বিভাস বলল, 'হাস্যকর!'

রুবি বলল, 'হাস্যকর বইকি। তুমি ভেবেছ বুঝি দেহকে বাদ দিয়ে চলতে পারছ, মোটেই নয়। তোমার চোখ মুখের ভাব তো তুমি নিজে দেখতে পাচ্ছ না, আমি পাচ্ছি। পুরুষের চোখ দেখলেই টের পাই। যাদের চক্ষুলজ্জা বেশি, তারা শুধু চোখ দিয়ে ভোগ করে। তুমি সেই জাতের লাজুক।'

এই নির্লজ্জা উপযাচিকা মেয়েটির কথায় মুহূর্তকাল স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল বিভাস। অপমানে মুখ তার কালো হয়ে গেল। বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল মন। অত্যন্ত অপ্রিয়ভাষিণী, অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাষিণী রুবি। কিন্তু কথাগুলি যে একেবারে অসত্য একথাই বা বিভাস বলতে পারে কই? তবু যে-কষ্টে নিজেকে সে সংযত করে রাখছে এর কি কোন মূল্য নেই? এই সংযম কি একান্তই অর্থহীন!

রুবি বলতে লাগল, 'দেহকে কেউ বাদ দিতে পারে না, তুমিও পারছ না। প্রতি পদে তা' ধরা পড়ছে। যেটুকু পার্থক্য আছে সে শুধু ডিগ্রীর পার্থক্য। তাকে প্রকার ভেদ বলা যায় না। এই যে তুমি আমার কথা শুনছ, আমার সঙ্গে কথা বলছ, আমরা দুজনে মুখোমুখি বসে আছি, এও তো দেহজ সুখ।'

বিভাস বলল, 'তবু কি কোন পার্থক্য নেই?'

রুবি বলল, 'যেটুকু আছে আমি তার কোন দাম দিই নে।'

বিল নিয়ে বয় এসে ঘরে ঢুকল। বিভাস পকেটে হাত দিচ্ছিল, রুবি তাকে বাধা দিয়ে হেসে বলল, 'থাক, চায়ের দামটা আমি মাঝে মাঝে দিই।'

বিভাস বলল, 'দাও, আমার জবাব তোমাকে আমি পরে দেব।'

উমার বাবা রাজমোহনবাবু কোর্ট ফেরৎ বিকেলে এসে হাজির হলেন। সবাইকে

শরীরিক সুস্থ দেখে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'যাক, তাহলে ভালোই আছিস সবাই। বিভাস কোথায়, অফিস থেকে ফেরেনি বুঝি ?'

উমা বলল, 'না।'

রাজমোহনবাবু বললেন, 'কিন্তু তুই কি সাংঘাতিক মেয়ে বাপু, অনর্থক অমন ধরনের চিঠি কেউ লেখে ? চিঠি পেয়ে তোর মা তো ভেবেই অস্থির। ভেবেছিলাম বিভাসের কোন শক্ত অসুখ-বিসুখ হ'ল ?'

উমা মুখ নিচু করে বলল, 'শক্ত অসুখই হয়েছে বাবা।'

রাজমোহনবাবু বললেন, 'তার মানে ?'

উমা একটুকাল চুপ করে রইল। এসব কথা সহজে বলা যায় না। এমন যে আপনজন বাবা, তাঁর কাছেও নয়। তাতে কোথায় যেন আত্মমর্যাদায় ঘা লাগে। নিজের নারীত্ব ছোট হয়ে যায়। কিন্তু তবু বলতেই হবে। স্বামীর পর পুত্র কিন্তু স্বামীর আগে বাবা। বাবার কাছে কিছুই সে লুকোবে না। আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে সবই খুলে বলল। শেষে বলল, 'তুমি শাসন কর বাবা। ও যে ক্রমেই সব বিচার-বিবেচনা, ভয় আর শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছে।'

রাজমোহনবাবু আলুর দমে লুচির টুকরো ভিজিয়ে মুখে দিতে দিতে সস্নেহে মেয়েকে আশ্বাস দিলেন, 'দূর পাগলি। তা কি কখনো হয়, বিভাসের মত ছেলে কি এমন কাজ করতে পারে ?'

কিন্তু মনে মনে মেয়ের অনেক কথাই তিনি বিশ্বাস করলেন। অসম্ভব নয়, অসম্ভব নয়। মানুষ নষ্ট মেলে, খাটাল নষ্ট তেলে। সংসর্গে কি না করে। তাছাড়া তাঁর মনে পড়ল তাঁদের 'বারের' পরিতোষ একদিন এমন একটা কথা বলেছিল বটে, 'আরে রাজমোহন-দা, তোমার জামাইকে তো সেদিন দেখলাম একটা আধা-ফিরিঙ্গী মেয়ের সঙ্গে হাওয়া খেতে ! ব্যাপার কি বল তো ?' কিন্তু রাজমোহন সেদিন পরিতোষের কথা কানে তোলেননি। পরিচিত স্বজন বন্ধুর বিরুদ্ধে এ ধরনের বাজে কথা রটাবার অভ্যাস আছে পরিতোষ ভদ্রের। কি আর করবে। বার লাইব্রেরীতে বসে বসে খবরের কাগজ পড়ে আর ঘুমোয়। বছরে একটি কি দুটির বেশি মক্কেল জোটে না। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর খোসগল্প জমাবার জন্যে উড়ো খবর জুটিয়ে আনে। কিন্তু এখন মেয়ের কথা শুনে খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরিতোষ তো তাহলে নেহাৎ মিথ্যে বলেনি। ওর আর্গুমেণ্ট যতটা বাজে, খবর তো ততটা নয়।

উমা বলল, 'যেমন করে পার রুবিকে তুলে দিতেই হবে। বাড়িওয়ালা ওর নামে নালিশ করেছেন। তুমি যদি তাঁকে সাহায্য কর—'

রাজমোহনবাবু বললেন, 'সে আর এমন বেশি কথা কি। তুই কিছু ভাবিসনে। কিন্তু তোকে একটা কথা বলি, তুই এই উগ্রচণ্ডী মূর্তিটা ছাড তো। বেশ লক্ষ্মীর মত বিভাসের সেবা যত্ন কর, যা ভালোবাসে তাই করে-টরে দে। দেখবি সব শুধরে যাবে। তোয়াজ পেলে সবাই খুশি হয়।'

উমা বলল, 'তুমি কি বলছ বাবা? সে দোষ করেছে জেনেও আমি তোয়াজ করব? আমি তোমার মেয়ে বাবা, তোমার ঠাকুমা নই। সেকেলে সতী-সাধ্বীর আদর্শ আমাকে শেখাতে এসো না। দেখি দু'চার দিন আরো চেষ্টা করে, ফেরে তো ভালো। নইলে আমিও আমার পথ দেখবো।'

রাজমোহনবাবু মেয়ের পিঠে হাত বুলতে বুলতে বললেন, 'দুর পাগলি, অত অধীর হসনে। সবসময় চড়া মেজাজে কোন কাজ হয় না। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একসময় যদি কোন একজনের দোষ ত্রুটি হয়ই, তা ঢাকতে হয়, ক্ষমা করতে হয়। তবে তো শোধরায়। নইলে তো মুহূর্তে মুহূর্তে ঘর ভেঙে পড়ে।'

উমা বলল, 'পড়ে পড়ুক বাবা, আমি কিছুতেই এ-জিনিস সইতে পারব না।'

রাজমোহনবাবু বিভাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাত আটটায় ফিরে এল বিভাস। শ্বশুরকে দেখে কৈফিয়তের স্বরে বলল, 'আপনি কি কোর্ট থেকে ফিরছেন। আমার বড্ড দেরী হয়ে গেল! আপনার শরীর ভালো?'

রাজমোহনবাবু বললেন, 'ভালো আর তোমরা থাকতে দিচ্ছ কই বাপু?'

বিভাস বলল, 'তার মানে?'

উমা সামনে থেকে অন্য একটি কাজের অছিলায় সরে গেল।

রাজমোহনবাবু ধীরে ধীরে আরম্ভ করলেন, 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারো কারো অবশ্য একটু বেশি সন্দেহ বাতিক থাকে। কিন্তু স্বামীর বাতিক থাকলে স্ত্রীর উচিৎ তা কাটিয়ে দেওয়া। আবার স্ত্রীর থাকলে স্বামীরও শুধরে নেওয়া উচিৎ। যাতে ঐ বাতিক না বাড়ে সেই ভাবে চলতে হয়! সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ বাতিকে যে ভোগে সেও কষ্ট পায়, যাকে ভোগায় তারও দুঃখের অবধি থাকে না!

বিভাস অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'আমি বুঝেছি। এসব আলোচনা আমার সঙ্গে··· আপনার মেয়ের সঙ্গে যা করেছেন তাই যথেষ্ট।'

রাজমোহনবাবু ভিতরে ভিতরে চটলেন কিন্তু আগের মতই শান্তভাবে বললেন, 'যথেষ্ট হলে কি আর তোমাকে এসব কথা বলি। মেজাজ গরম করে তো লাভ নেই। বুদ্ধিমানের মত কাজ করতে হয়। যখন পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে সুরু করেছে, ও মেয়েটির সঙ্গে আর

মেলামেশা ক'র না। আর যা সব শুনছি তাতে ওকে এখান থেকে তুলে দিতে পারলে ভালো।'

বিভাস বলল, 'অসম্ভব। তুলে দিতে কেউ পারবে না।'

রাজমোহনবাবু বললেন, 'আচ্ছা পারে কি না পারে আমি দেখব। তুমি আর এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, বরং এক কাজ করো। দেওঘরে আমার মক্কেল সুধন্য সা'র বাড়ি খালি পড়ে আছে—উমাকে নিয়ে তুমি অন্তত দিন পনেরর জন্যে সেখান থেকে ঘুরে এসো গিয়ে। হাওয়া বদলানো মাঝে মাঝে দরকার। শরীর মন তুইই তাতে ভালো থাকে।'

বিভাস বলল, 'আমার শরীর মন ভালোই আছে। উমার দরকার থাকে তো তার হাওয়া-বদলের আপনি ব্যবস্থা করুন।'

রাজমোহনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আচ্ছা, দেখি কি করা যায়। মাথার উপর তোমার যখন কোন অভিভাবক নেই, ব্যবস্থা একটা আমাদেরই করতে হবে বৈকি। তুমি চাইলেও করব, না চাইলেও করব।'

বিভাস আর কথা না বলে নিঃশব্দে শ্বশুরকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে এল।

রাজমোহনবাবু বিদায় নেওয়ার সময় আর একবার জামাইকে উপদেশ দিলেন, 'বুদ্ধিমানের মত কাজ ক'র বিভাস। মানুষের অনেক সময় ভুলভ্রান্তি হয়। জীবনে নানারকম মোহ এসে পথ আটকায়। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে পথ কেটে কেটে যেতে হয়। কি বল, ঠিক কিনা।'

বিভাস নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

...রাত্রে স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করল বিভাস, 'তুমি বুঝি তোমার বাবাকে ওসব কথা বলেছ ? নিজের সম্মান নষ্ট করছ, আমারও রাখছ না।'

উমা বলল, 'মিথ্যে সম্মানের কোন দাম আমার কাছে নেই, বিপদে-আপদে পড়লে সবাই আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য নেয়। আমিও বিপদে পড়েছি, বাবা ছাড়া আমার আর কে আছে।'

বিভাস বলল, 'বেশ দেখি, তোমার বাবা কিভাবে তোমায় উদ্ধার করেন।'

উমা তীব্রস্বরে বলল, 'আমাকে উদ্ধার না করতে পারেন, কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমায় জেলে দিয়ে তবে ছাড়বেন।'

বিভাস শুধু বলতে পারল, 'বেশ তো।'

একই বিছানায় কিছুটা ব্যবধান রেখে দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে। অন্ধকার ঘর। ইচ্ছা করলে এই ব্যবধানটুকু যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে দেওয়া যায়। হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে কাছে

টেনে নিতে পারে বিভাস, উমা নিজে থেকেও এগিয়ে আসতে পারে। কিন্তু কেউ এগুলো না। যে যার জায়গায় স্থির হয়ে রইল। ব্যবধানটুকু ক্রমেই যেন দুস্তর দুরতিক্রম্য হয়ে উঠেছে। তা পার হবার কারু সাধ্য নেই।

কিছুক্ষণ পরে বিভাস বলল, 'উমা, তোমাকে একটা কথা বলি শোন।'

উমা বলল, 'বল।'

বিভাস বলল, 'আমার মনে হয় তোমার-আমার মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক আর নেই। তুমি আমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছ না, ভলোবাসতেও পারছ না। তোমার মনে আমার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-প্রীতি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই—যা আছে তা শুধু অধিকারবোধ। কিন্তু একতরফা এই অধিকার আইনের কাছে থাকলেও, হৃদয়ের কাছে এর কোন মূল্য নেই। স্বত্ব নিয়ে মিথ্যে টানাটানির মধ্যে শুধু বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু নেই। বুঝেছ?'

উমা নীরস স্বরে বলল, 'বুঝেছি।'

বিভাস বলল, 'তাহলে এসো আমরা ভেবে দেখি কি করা যায়।'

উমা বলল, 'তুমি কি করবে তাই আগে ঠিক কর। আমার ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না।'

হঠাৎ বিভাস স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়ে এসে কোমল স্বরে ডাকল, 'উমা।'

কিন্তু উমা এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি ছেড়ে দাও আমাকে। তোমার এই আদর আমার সহ্য হয় না। আজকাল তোমার নিষ্ঠুরতা আমি সইতে পারি, শত্রুতা কর তা সইতে পারি কিন্তু তোমার এই শুকনো আদর সহ্য করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

বিভাস বলল, 'উমা!'

উমা বলল, আমাকে বলতে দাও। তাছাড়া তোমার এই আদর তো আমি পাইনে, আমার দেহের ভিতর দিয়ে তুমি সারাদিন যার কথা ভাব, সারাদিন যার সঙ্গে থাক সে পায়। আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রেখে তুমি রুবির সঙ্গে কথা বলছিলে।'

বিভাস বলল, 'কি যা তা বলছ!'

উমা বলল, 'যা-তা নয়, সত্যি। প্রথমে আমি চমকে উঠলাম। শেষে মনে হ'ল স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু ফের মনে হল এ হয়তো সত্যি স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের ভান। তুমি তো আজকাল ভান করতেও শিখেছ। আমি আবার চমকে উঠলাম। তুমি তাহলে তার কথাই ভাবছ। তাহলে আমার মধ্যে তাকেই কল্পনা করে নিচ্ছ। এ আদর তুমি আমায় দিচ্ছ না, দিচ্ছ রুবিকে। তুমি আমার ভিতর দিয়ে তাকে চাচ্ছ, তাকে পাচ্ছ। এর চেয়ে তুমি উঠে তার

ঘরে চলে যাও, সরাসরি তাকে ভোগ কর। আমাকে এই মিথ্যে দুর্ভোগ থেকে বাঁচাও। আমি যে আর পারছিনে।'

স্বামীর বুকে মুখ রেখে হঠাৎ কেঁদে উঠল উমা। বিভাস আস্তে আস্তে স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যেন রোগিনীকে শুশ্রূষা করছে। স্ত্রীর জন্যে সে সহানুভূতি অনুভব করল, অনুকম্পায় মন ভরে উঠল। কিন্তু অন্তরের গভীর মূলদেশে কিসের এক উৎস যেন শুকিয়ে গেছে। সে শুষ্কতা অশ্রুতে ভেজে বটে কিন্তু যাতে প্লাবিত হয়, সে রস আলাদা।

···দিন কয়েক ফের রুবির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা বন্ধ করল বিভাস।

কিন্তু বেশিদিন তা চলল না। মামলার ব্যাপারে সুধাংশু তাকে ডেকে পাঠাতে লাগল। বিভাসের মনে হ'ল এসময় রুবিকে ছেড়ে গেলে অকর্তব্য হবে। কারণ রুবি তার ভরসায়, তার পরামর্শেই কেস চালাচ্ছে। বিভাসই জোর করে তাকে মিটমাট করতে দেয়নি।

এদিকে ঘরে বসে নিজের মূর্খতার কথা ভাবছিল রুবি। এই ঘরের জন্যে মামলা চালান বোকামি ছাড়া আর কি। এসব হাঙ্গামায় তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। এখনও কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই। অথচ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে যেন তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এমন তো কোনদিন হয়নি। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাকে কোন কাজ করিয়ে নিতে পারেনি। তবে কেন এমন হচ্ছে? তার ইচ্ছার ওপর জোর খাটাচ্ছে কে? সে কি ওই দুর্বল ভীরু আদর্শবাদের বাতিকগ্রস্ত বিভাস? স্বীকার করতে ইচ্ছা করে না, স্বীকার করতে মন চায় না। আশ্চর্য, তবু সে জড়াচ্ছে! কিছুতেই যেন এখান থেকে উঠে যেতে পারছে না। বড় ক্লান্তি, বড় একঘেয়ে। রাজ্যের অবসাদ যেন তার সর্বাঙ্গে এসে ভর করেছে। যা ঘটছে ঘটুক, যা হচ্ছে হোক, রুবি আর হাত-পা নাড়বে না। নিজে না নড়ে অন্য একজনকে নড়াতে মাঝে মাঝে বেশ লাগে। বিভাস তার জন্য নড়াচড়া করছে। স্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে, শ্বশুরের মতের বিরুদ্ধে, স্বজন বন্ধুদের পরিহাস-উপহাস উপেক্ষা করে বিভাস তার পক্ষ নিয়ে লড়ছে। বেশ লাগছে, বেশ লাগছে রুবির। একেই তো বলে একজনের জন্যে আর একজনের পাগল হওয়া। আরেক জনের মত্ততা ছাড়া নিজের অস্তিত্বকে যেন ভালো করে টের পাওয়া যায় না। পুরনো বন্ধুদের সেই মত্ততা গেছে। দিব্যেন্দু ভালো সরকারী চাকরি পেয়ে দিল্লীতে স্থায়ী হয়ে বসেছে। সুবিমল প্রমথ দত্তের সহকারী হিসেবে নতুন ছবির কনট্র্যাক্ট পেয়েছে। রুবির একবার খোঁজও করেনি! সবচেয়ে অদ্ভুত আর আশ্চর্য খবর—ডাক্তার দে বিয়ে করেছে। খবরটা প্রথমে তেমন সুস্থভাবে নিতে পারেনি রুবি। কথাটা তীরের মত এসে বিঁধেছিল। বহুক্ষণ পর্যন্ত জ্বলুনি ছিল মনে। ভেবেছিল ডাক্তারের বউয়ের কাছে গিয়ে একবার নিজের পরিচয়টা দিয়ে আসে। কিন্তু যাওয়ার সময় কিসের যেন একটা সঙ্কোচ রুবি বোধ করেছে। ডাক্তার তো

একবার নিমন্ত্রণও করেনি। এতদিনের পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতাকে একটুও স্বীকৃতি দেয়নি। পাছে তার বিবাহিত জীবনে রুবি কোন ছায়া ফেলে। পুরুষ এমন সুবিধাবাদীই বটে। তবু পুরুষকে ছাড়া তার চলে না। যেভাবে হোক্ একজন না একজনের সান্নিধ্য ওর চাইই। মনের এ কি কাঙালপনা! না, মন বলে ও কিছু মানে না। সবই অভ্যাস, দেহের অভ্যস্ততার এ কি বিড়ম্বনা! কি করলে এই অভ্যাসের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়? কি করলে এই নিঃসঙ্গতা থেকে রক্ষা মেলে? ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল রুবি। র‍্যাকের বইগুলি এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। ড্রেসিং টেবিলটা অগোছালো। একটা চায়ের কাপের মধ্যে গোলানো রঙ। নিজের মুখের জন্যে ও ব্যবহার করেছিল। একপাশে লণ্ড্রীতে দেওয়ার জন্যে ময়লা শাড়ি সেমিজ বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়াড় স্তূপিকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। বড় নোংরা হয়ে আছে ঘরখানা, বড় নোংরা। অফিসে বেরুবার আগে নিজেকে মেজে-ঘসে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিতেই ওর সব-সময় চলে যায়। ঘরের দিকে তাকাবার আর সময় থাকে না। কিন্তু আজ চেয়ে দেখল সেদিকে তাকানোর জো নেই। ঝাড়-পোঁছ না করায় একেবারে হতচ্ছাড়া চেহারা হয়েছে ঘর দু'খানার। বিছানা থেকে উঠে পড়ল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঝাঁটা নিল হাতে।

আধ ঘণ্টাখানেক পরে ঘর দু'খানা বেশ পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল। একেবারে চেহারা ফিরে গেছে। যেন সম্পূর্ণ নতুন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে রুবি। ভারি ভালো লাগল। শারীরিক শ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। আর এই ঘাম ঝরার সঙ্গে খানিক আগের সমস্ত অবসাদ আর জড়তা যেন দেহ থেকে সম্পূর্ণ ঝরে গেছে। এতক্ষণে ঘরের দিকে তাকিয়ে বেশ তৃপ্তি বোধ করল রুবি। এ তারই ঘর। আর কিছু না থাকুক, আর কোন সঙ্গী না থাকুক, থাকবার এই ঘর তার আছে। এই ঘরের সঙ্গে সে একাত্ম। এখান থেকে তাকে কেউ উচ্ছেদ করতে পারবে না! এর জন্যে প্রাণপণে সে লড়বে। এই ঘরের জন্যে সর্বস্ব পণ করবে! বিভাস যা করছে ঠিকই করছে। এই ঘরের সঙ্গে শুধু তার সম্মান নয়, অস্তিত্বও জড়িত। এই ঘরের সঙ্গে সে অঙ্গাঙ্গী। এ ঘর সে ছাড়বে না, কিছুতেই না। বিভাস বলেছে তেমন করে মামলা চালাতে পারলে ঘর তাকে ছাড়তে হবেও না, উল্টে মানহানির মোকদ্দমা করা যাবে বাড়িঅলার নামে। বিভাস তাকে ভরসা দিয়েছে, তার জন্যে সে চেষ্টা করছে। হঠাৎ বিভাসের ওপর আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় ওর মন ভরে উঠল। সেদিন ওসব কড়া কড়া কথা ওকে বলা ঠিক হয়নি। ছি ছি ছি, বিভাস না জানি তাকে কি মনে করেছে! ও যা ভেবেছে, রুবি ওকে যা ভাবতে সুযোগ দিয়েছে, আসলে সে তা নয়। কথাগুলি তার দেহতৃষ্ণা নয়, দেহতত্ত্ব। বিভাসকে ডেকে বলতে হবে কথাটা।

নীল রঙের ঢাকনায় মোড়া সেতারটা ঝুলছে দেয়ালে। কয়েকদিন ছোঁয়া হয়নি।

আস্তে আস্তে সেতারটা আজ আবার নামিয়ে নিল রুবি। সস্নেহে আঙুল বুলতে লাগল তারগুলির ওপর। সেতারটা ফের সে যত্ন করে শিখবে। খবর দিতে হবে পুরনো মাস্টারমশাইকে।

রান্নাঘরে বসে সুরবালা তরকারী কুটে দিচ্ছিলেন, আর রুবির সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, 'যাক, আজকাল বাড়াবাড়িটা একটু কমেছে।'

উমা বলল, 'কোথায় কমেছে ? বাড়াবাড়ি ছাড়া ও আবার থাকতে পারে কবে ! এখন বাড়াবাড়ি চলছে সেতার নিয়ে। আবার একজন মাস্টার রাখা হয়েছে। কতই দেখব ! দিন নেই, রাত নেই, কান ঝালাপালা করে তুলল।'

বাজনাটা মাঝে মাঝে অবশ্য মন্দ লাগে না সুরবালার। অনেক রাত্রে যখন রুবি বাজায়, ভারি একটা করুণ সুর যেন বাতাসে ভাসতে থাকে। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। কান খাড়া করে থাকেন। মনে হয় এই সুরের সঙ্গে তাঁরও যেন মনের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। সে কথা যে কি, দুঃখ যে কোথায় তা কথায় বলা যায় না। একজনের সুরের মধ্যে যেন কিছুটা আভাস মেলে।

কিন্তু উমার কাছে রুবির কোন প্রশংসাই আর করবার জো নেই। ওর কথা শুনলেই উমা চটে। অথচ একসময় কি গভীর ভাবই না ছিল দুজনের মধ্যে। বকাবকি করেও কাছ ছাড়া করা যেত না ; আর এখন উমা ওর ঘরে শুদ্ধ পা দেয় না। দেখলে এমন ভাব করে যেন কোন চেনা-পরিচয় নেই। এই রকমই হয় বটে। সওয়া যায় না, এ দুঃখ কিছুতেই সওয়া যায় না।

উমার কথায় সায় দিয়ে সুরবালা বললেন, 'যা বলেছ। ওর সবতাতেই বাড়াবাড়ি। যখন যা ধরবে, একেবারে তার চূড়ান্ত করে ছাড়বে।'

উমা খুশী হয়ে কি মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, বিভাসের গলা শোনা গেল, 'পিসীমা, এ ঘরে এসো একবার।'

সুরবালা উঠে এলেন, 'কি রে কি হোল আবার তোর ?'

বিভাস বলল, 'দেখ কে এসেছেন।'

বেঁটে-খাট কালো মোটাসোটা বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক হেঁট হয়ে সুরবালার পায়ের ধুলো নিলেন, 'আমায় চিনতে পারছেন তো কাকীমা ?'

সুরবালা লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে বললেন, 'চিনব না কেন, সোমেশ্বর। ভাসঠাকুর মারা যাওয়ার পর তুমি তো সেবারও একবার এসেছিলে। তারপর খবর কি তোমাদের ? ছেলেপুলে সব ভালো আছে ? বউমার শরীর-টরীর—।'

সোমেশ্বর বলল, 'এই চলে যাচ্ছে একরকম। অতগুলি লোক বাড়িতে, সবাই তো আর একসঙ্গে ভালো থাকতে পারে না। কারো না কারো অসুখ-বিসুখ থাকবেই। কিন্তু আর কারো জন্যে তো ভাবনা ছিল না। ভাবনা বড়কাকার জন্যে। তাঁকে যে এবার তুলতে পারি—'

বলতে বলতে সোমেশ্বর থেমে গেল।

সুরবালা একটুকাল চুপ করে থেকে বললেন, 'কেন, কি হয়েছে তাঁর?'

ছেলেবেলায় দু'একবার দেখা পিসেমশাইর সম্বন্ধে বিভাসের তেমন কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হোল না। বিভাস বলল, 'আচ্ছা ধীরে-সুস্থে সব শোনা যাবে। উনি তো আছেন এবেলা,—উমাকে বল চা-টা এনে দিক।'

কিন্তু সোমেশ্বর ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না, আমায় বরিশাল এক্সপ্রেসে আজই রওনা হতে হবে। ওষুধ নিতে কলকাতায় এসেছিলাম। আর কাকীমা, তৈরী হয়ে নিন। আপনাকেও যেতে হবে। বড়কাকা দেখতে চেয়েছেন।'

সুরবালা বললেন, 'আমি যাব, এ তুমি কি বলছ সোমেশ্বর!'

'ঠিকই বলছি কাকীমা। জীবন ভরেই তো মান-অভিমান করলেন! কিন্তু এখন সবই যখন শেষ হতে চলেছে, তখন আর—।'

রুদ্ধ কান্না আর অভিমানে সুরবালার গলা আটকে এল, বললেন, 'শেষ যদি হতেই চলেছে, শেষ হয়ে যাক। সে-দৃশ্য দেখতে আমাকে আর টেনে নেওয়া কেন। তোমাদের সুখসম্পদের সময় যখন আমাকে কেউ ডাকেনি, এখন কেন ডাকতে এসেছ? আমি যাব না।'

সোমেশ্বর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'আমি তাহলে চলি কাকীমা। আমাকে খবর দিতে বলেছিলেন। খবর দিয়ে গেলাম। এখন আপনার কর্তব্য আপনি করবেন। কিন্তু আমার তো মনে হয় গেলেই ভালো করতেন। পরে সকলেরই একটা আফশোষ থেকে যাবে।'

সুরবালা বললেন, 'বস, সব শুনি। অসুখটা কি? স্বাস্থ্য তো ভালোই ছিল।'

চা আর খাবার করে নিয়ে এল উমা। খেতে খেতে সোমেশ্বর তার বড়কাকার অসুখের বিবরণ সব খুলে বলতে লাগল। রোগটা ক্যানসার। ধরা পড়েছে অনেক পরে। কলকাতা থেকে কয়েকবার চিকিৎসাও করিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন আর নড়াচড়া করা সম্ভব নয়, ডাক্তারও নিষেধ করেছেন। কাকারও আর ইচ্ছা নয় কোথাও নড়া। নড়লেই অনর্থক কষ্ট। খুলনা থেকে তিনি আর কোথাও যেতে চান না। কিন্তু দূরের আত্মীয়স্বজন সবাইকে দেখতে চান। সোমেশ্বরকে ডেকে তিনি বললেন, 'সবাইর সঙ্গে তো দেখাসাক্ষাৎ হোল,—কিন্তু একজন কোন খবরও পেল না, এলও না। তাকে একটা খবর

দিতে পারিস্ সোমেশ্বর ? একবার শুধু দেখে যাবে, তাকে আমি আটকে রাখব না।' নতুন কাকীমা বললেন, 'যান ভাসুরপো, তাঁকে নিয়ে আসুন গিয়ে। এসময় শত্রুও তো এসে শত্রুকে দেখে যায়। আর আমি বাড়ির ওপর থাকতে তিনি যদি এ-বাড়িতে না ওঠেন, তাহলে ছেলেপুলে নিয়ে না হয় কদিন অন্য বাড়ি গিয়ে থাকব, তবু, তিনি এসে চোখের দেখাটা দেখে যান।'

সুরবালা চুপ করে রইলেন। চোখ দুটো তাঁর জলে ভরে উঠেছে, বললেন, 'ঈস কি দরদ! সারা জীবন আগলে রেখে, এখন আমায় চোখের দেখা দেখবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন! অসীম অনুগ্রহ তাঁর। তুমি চলে যাও সোমেশ্বর, বল গিয়ে কারো দয়া আমি চাইনে। আমার কেউ ছিলও না, কেউ নেইও।'

···বিভাস নাওয়া খাওয়া সেরে অফিসের জন্যে তৈরী হতে লাগল। সে বেরুতে যাবে, সুরবালা তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আজ আর অফিসে নাই গেলি বিভাস। আমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আয়।'

বিভাস বলল, 'সেকি পিসীমা, এই না বললে তুমি যাবে না।'

সুরবালা সলজ্জ ভঙ্গিতে বললেন, 'যে অবস্থার কথা শুনলাম তাতে কি না গিয়ে পারা যায় বাবা! আমি একবার দেখেই চলে আসব। চিঠি পেয়ে তুই আমাকে নিয়ে আসিস গিয়ে।'

যাত্রার আয়োজন চলল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুরবালা তৈরী হয়ে নিলেন। বড় ট্রাঙ্কটা নিলেন না, ছোট একটা বাক্সয় ক'খানা কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিলেন। একটা বোতলে নিলেন গঙ্গাজল আর কৌটায় কালীঘাটের প্রসাদ। উমা তাঁর সাদা-পাকা চুলের মধ্যে চওড়া করে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করে বলল, 'উনি একটু ভালো হলে আবার আসবেন তো পিসীমা?'

সুরবালা বললেন, 'আসব বৈকি মা। মা কালীকে ডাক, যেন গিয়ে ভালো দেখি, যেন ভালো হয়ে ওঠেন। আর তুমিও খুব সাবধানে থেকো উমা। মনে কোন অশান্তি এনো না। বিভাসকে যত্ন-টত্ন কোরো। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রুবি অফিসে যায়নি। দোরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। যাওয়ার আগে সুরবালাই তার কাছে এগিয়ে এলেন, বললেন, 'চললুম, সাবধানে থেক।' একটু আগে যে উপদেশ উমাকে দিয়েছেন, সেই উপদেশই তাঁর মুখ থেকে বেরুল। এই চরম মুহূর্তে অদ্ভুত এক সমত্ববোধ এসেছে ওঁর মনে।

কি ভেবে রুবি আজ নত হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিল। সুরবালাকে এই তার প্রথম প্রণাম।

স্বরবালা আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোমার মতিগতি ভালো হোক মা। শান্তি আসুক মনে।'

রুবি বলল, 'গিয়ে একটা খবর দেবেন।'

স্বরবালা বললেন, 'দেব বৈকি মা। সবাই মিলে ভগবানকে ডাক, যেন খবর দেওয়ার মত অবস্থা গিয়ে পাই।'

বাবলু ভারি কান্নাকাটি করতে লাগল। সেও যাবে ঠাকুরমার সঙ্গে। যাওয়ার সময় তাকেও একটু কোলে নিয়ে আদর করলেন স্বরবালা। ছেলের খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে যত্ন নেয়ার জন্যে বার বার উমাকে বলে গেলেন।

সোমেশ্বরের সঙ্গে রিকসায় উঠে বসলেন স্বরবালা। বিভাস হেঁটেই চলল পিছনে পিছনে। মোড় থেকে ট্রাম কি বাস একটা ধরবে।

উমার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রুবি স্বরবালার স্বামীগৃহ যাত্রা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। অনেকদিন বাদে স্বামীর কথাটা মনে পড়ল রুবির। মৃত্যুশয্যায় পড়লে উৎপলও কি তাকে এমনি করে একদিন ডেকে পাঠাবে? একবার চোখের দেখা দেখবার আকুতি জানাবে? না, তা বোধ হয় আর সে জানাবে না। আর রুবিও তো যেতে পারবে না। জীবনের শত্রুতা শুধু কি মৃত্যুতে শেষ হয়? স্বামীর ঘর ছেড়ে আসার সঙ্গে উৎপল তাকে কুলটা বলে আত্মীয়-স্বজনের কাছে রটিয়ে বেড়িয়েছে। আর রুবিও চরম শোধ নিয়েছে তার। সেও প্রচার করেছে উৎপলের নপুংসকত্বের কথা। কয়েকটা বিয়ের সম্বন্ধ এসে ভেঙে গেছে উৎপলের। সে খবর রুবি জানে। আরো জানে উৎপলও ঠিক থাকতে পারেনি। তারও স্বভাব-চরিত্র বিগড়ে গেছে। দুজনেই দুজনের চরম সর্বনাশ করেছে। মৃত্যুশয্যায়ও কেউ আর কাউকে স্মরণ করবে না। কারণ পরস্পরের কাছে মৃত্যু তাদের অনেক আগেই ঘটে গেছে। শুধু মানুষেরই নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেরও জন্ম-মৃত্যু আছে। রুবির মতে সেই মৃত্যুর পর আর পুনর্জন্ম নেই।

উমাও ভাবছিল পিসী-শাশুড়ীর কথা। যাওয়ার সময় তার চোখে জল এসে পড়েছিল। শ্বশুরবাড়িতে এসে অবধি পিসী-শাশুড়ীকে আর কোথাও যেতে দেখেনি উমা। সুখের দিনে স্বামী-গৃহে তাঁর স্থান হয়নি, এবার রোগশয্যায় তাঁর ডাক পড়েছে। তবু যাওয়ার সময় উৎসাহটা তাঁর লক্ষ্য করবার মত। এতদিন যেন অন্যের বাড়িতে ছিলেন, আজ নিজের জায়গায় নিজের অধিকারে ফিরে যাচ্ছেন। এত বিপদের মধ্যেও তাঁর সেই যাওয়ার উৎসাহটা উমার কাছে অগোচর ছিল না। স্বামীর সুখ-শয্যার ভাগ সতীনের সঙ্গে পিসীমা নিতে পারেননি, কিন্তু মৃত্যুশয্যায় দুই সতীনের স্থান হতে বাধা নেই। বিভাসকেও কি মৃত্যুর পূর্বে আর উমা আপন করে পাবে না, মৃত্যুর পূর্বে ছাড়া বিভাস কি তাকে আগের

মত কাছে ডাকবে না? হঠাৎ উমা চমকে উঠল। ছি ছি ছি, এসব কি ভাবছে সে। না না মৃত্যু নয় মৃত্যু নয়। মৃত্যু হলে তো সবই শেষ হয়ে গেল। মৃত্যু না হয়ে খুব একটা কঠিন অসুখ-বিসুখ বিভাসের হোক, দীর্ঘ দিন ভুগুক। আর সেই রোগশয্যায় উমা একা দিনরাত তার শুশ্রূষা করবে। রুবিকে তার কাছেও যেতে দেবে না।

মামলার প্রথম পর্যায়ে দশ পনের দিন অন্তর অন্তর তারিখ পড়তে লাগল। তেমনি একটা তারিখের দিনে অফিসের পর বিভাসের সঙ্গে দেখা করল রুবি।

বিভাস বলল, 'সুধাংশু তো খুবই ভরসা দিয়েছে।'

রুবি বলল, 'আমার ভয়ও নেই ভরসাও নেই। ওসব ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিয়েছি। আজ তোমাকে অন্য কথা বলতে এসেছি।'

বিভাস বলল, 'বল।'

রুবি বলল, 'আমার সেতারের মাস্টারমশাইর বাড়িতে ছোট মত একটি জলসার আয়োজন হয়েছে আজ সন্ধ্যায়। আমাকে যাওয়ার জন্যে বিশেষ করে বলেছেন। ভেবেছি যাব। ফিরতে একটু রাত হতে পারে। একা একাই যাব, না তুমিও আসবে সঙ্গে?'

বিভাস বলল, 'আমি?'

রুবি বলল, 'হ্যাঁ তুমি, তুমি। তোমার কথাই বলছি। গান-বাজনা তুমিও তো ভালোবাস। চল শুনে আসবে। উমাকে বলা যেত। কিন্তু সে তো আমি যার সংস্পর্শে আছি তার ছায়া মাড়াবে না। যাবে কিনা বল, তাহলে আমি তোমাকে ঠিকানা দিয়ে দিই।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু তোমার মাস্টারমশাই তো আমাকে নিমন্ত্রণ করেননি।'

রুবি বলল, 'কেন, ছাত্রীর নিমন্ত্রণ বুঝি যথেষ্ট নয়? তাছাড়া আসলে যাঁরা রসিক তাঁরা রবাহুত হয়েও যান। রসের আসরে তাঁদের আমন্ত্রণটা বাইরের নয়, ভিতরের।'

বিভাস বলল, 'কতদূরে তোমার মাস্টারমশাইর বাড়ি?'

রুবি বলল, 'বেশি দূর নয়, কাছেই। পার্ল রোডে গিয়ে রমজান চৌধুরীর নাম বললেই হবে।'

বিভাস একটু চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা।'

সন্ধ্যার পর সুনন্দা প্রেসে একবার হাজির দিয়ে পার্কসার্কাসের ট্রামে উঠে বসল বিভাস। দেশী খৃস্টান আর মুসলমান বাসিন্দাদের একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি। দোতলার একটি হলঘরে গৃহকর্তা বিভাসকে নিয়ে বসালেন। ঘর জুড়ে ফরাস পাতা হয়েছে। একপাশে সেতার

এস্রাজ আর স্বরোদযন্ত্র। নেহাৎই ঘরোয়া ধরনের জলসা। রমজান চৌধুরীর কয়েকটি বন্ধু-বান্ধব ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রুবিও আছে। সে তার সেতার-শিক্ষকের সঙ্গে বিভাসের পরিচয় করিয়ে দিল। মাঝবয়সী দাড়ি-গোঁফ কামানো বেশ সুপুরুষ ভদ্রলোক। রমজান বিভাসকে আপ্যায়ন করে বসতে বললেন।

একটু বাদেই বাজনা আরম্ভ হোল। শুধু যন্ত্রসঙ্গীতের আসর।

রমজান বললেন, 'রুবি, তুমি বাজাও একটু।'

রুবি বলল, 'আমি কি বাজাব। আমার তো সবে সুরু।'

রমজান বললেন, 'তাহোক, তুমিই সুরু কর।'

কে একজন বললেন, 'গুরুবাক্য অমান্য করতে নেই।'

আর কোন কথা না বলে ঢাকনা খুলে ফেলে সেতারটা কোলে তুলে নিল রুবি। তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে করুণ ইমন কল্যাণের আলাপ চলল। এ রাগ বিভাস ওকে আগেও বাজাতে শুনেছে। দিনকয়েক ধরে ক্রমাগত এই রাগেরই সে চর্চা করছিল। কিন্তু ওর হাতে বাজনাটা আজ যেমন খুলেছে তেমন আর কোনদিনই খোলেনি। তবলচী বাঁয়া-তবলায় মৃদু শব্দে সঙ্গত করে যাচ্ছিলেন। তাল-লয়ে চমৎকার সামঞ্জস্য ঘটল। আসরের শ্রোতারা সবাই মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করলেন রুবির। সেতারটি রেখে দেওয়ার সময় রুবি বিভাসের দিকে একবার তাকাল। বিভাস মুখে কিছুই বলল না। শুধু দু'চোখের প্রসন্ন আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়ে ওকে অভিনন্দন জানাল।

রুবির পরে আরো জন দুই ভদ্রলোক বাজালেন। সবচেয়ে শেষে বাজালেন রমজান চৌধুরী নিজে। স্বরোদে মালকোষ আলাপ করলেন। ভারি মিষ্টি হাত, দেড় ঘণ্টা সময় তিনি নিলেন। সারাক্ষণ শ্রোতারা মুগ্ধ উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

আসর যখন ভাঙল রাত তখন প্রায় একটা বাজে। চৌধুরী সাহেব বললেন, 'ট্রাম বাস তো বন্ধ হয়েছে। বিনয়বাবুর গাড়িতে যান আপনারা।'

বিভাস বলল, 'না না, গাড়ি লাগবে না। আমরা হেঁটেই যেতে পারব।'

চৌধুরী সাহেব ওদের মনের ভাব বুঝতে পেরে একটু হাসলেন। রুবির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার সেতারটি তবে রেখে যাও, কাল পৌঁছে দেব।'

রুবি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

...গভীর রাত্রে নির্জন রাস্তা দিয়ে দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

রুবি এক সময় জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল তোমার ?'

বিভাস বলল, 'চল বলছি।'

তারপর বড় পার্কটার সামনে এসে বলল, 'এসো, একটু বসি।'

রুবি বলল, 'সে কি ! অনেক যে রাত হয়ে গেছে। এখন পথে পার্কে ঘুরে বেড়ালে পুলিশে ধরবে যে।'

বিভাস বলল, 'ধরুক, এসো।' তারপর রুবি একটি বেঞ্চে বসতে গেলে, ফের বলল, 'না, এসো ঘাসের ওপরই বসা যাক।'

ওর মনের ভাব ঠিক আন্দাজ করতে না পেরে রুবি চটুল গলায় বলল, 'আমার দামী শাড়িটা নষ্ট হবে, খেয়াল আছে ? কি পাগলামি হচ্ছে। চল বাসায় ফিরি।' একটু যেন কেঁপে গেল ওর গলা।

কিন্তু বিভাস ততক্ষণে ঘাসের ওপর বসে পড়েছে।

অগত্যা রুবি গিয়ে বসল ওর মুখোমুখি। বিভাস বলল, 'আজ আমি তোমার কথার জবাব দেব রুবি। সেজন্যেই এখানে ডেকে আনলাম।'

কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশে চাঁদের দেখা নেই। অসংখ্য তারা জ্বলছে।

রুবি বিভাসের চোখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত স্বরে বলল, 'কোন কথার ?'

বিভাস বলল, 'রেস্টুরেণ্টে বসে সেই যে তোমার দেহকৈবল্যবাদের কথা বলছিলে, সে-আলোচনার কিছুটা সেদিন বাকি ছিল। সেদিন তোমার কথার জবাব দিতে পারিনি। আমার মনে ভাবটা ছিল কিন্তু কথা জোগায়নি। আজ আমি তোমার সুরের মধ্যে সেই কথা খুঁজে পেয়েছি।' ওর গলার স্বর আবেগে উদ্বেল। সমস্ত দেহ কিসের এক বাসনায় থর থর কাঁপছে।

রুবি বলল, 'কি তোমার সেই কথা বল।'

বিভাস বলল, 'তুমি যে এতক্ষণ বাজালে, যে আনন্দ আমি অতক্ষণ ধরে অনুভব করলাম, তাও তো দেহজ। তোমার আঙুলগুলি সেই দেহেরই অংশ। আর সেতারের তারগুলি যত সূক্ষ্মই হোক তাও বস্তু ছাড়া কিছু নয়। সুরটিকে পদার্থ-বিদ্যার বিশ্লেষণে বস্তু ছাড়া কিছুই বলা যায় না। তবু ওটা সাধারণ বস্তু নয়, ভাববস্তু। প্রকার ভেদই বল, আর পরিমাণ ভেদই বল, ভেদ রয়েছে। তোমার সুরকে যেভাবে উপভোগ করলাম, ঠিক তেমনি করে কি তোমার সৌন্দর্যকে আমি ভোগ করতে পারি নে ? ঠিক শিল্পোপভোগের মত ? এও কান দিয়ে শোনা, চোখ দিয়ে দেখা। আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে তোমার ব্যক্তিত্বের স্বাদ গ্রহণ। হ্যাঁ, এও দেহমিলন। তবু কিছু প্রভেদ আছে।'

রুবি বলল, 'তা তো আছেই। ছোঁয়া আর চুমু খাওয়ার মধ্যেও তো স্পর্শসুখের তারতম্য আছে। কিন্তু তাতে কি এসে গেল। তোমার বলবার কথাটা কি ?'

বিভাস বলল, 'আমার বলবার কথাটা এই যে সেই তারতম্যের মধ্যেই যত স্বাদ-বৈচিত্র্য। কোন মেয়েকে আমি শুধু ছোঁব আর কোন মেয়েকে চুমু খাব—সম্পর্কের এই

বৈচিত্র্য ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি নে। সম্বন্ধের এক-আকারে আমাদের তৃপ্তি নেই, আমাদের বহু আকার চাই।'

রুবি একটু হাসল, 'তাহলে আমার পথে এস, আমার মতে এস। একনিষ্ঠতা তবে বাজে কথা। আমরা সকলেই অনেকনিষ্ঠ।'

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ, অনেকনিষ্ঠ। কিন্তু তুমি যে অর্থে কথাটা ব্যবহার করছ, ঠিক সে অর্থে নয়। এই অনেকনিষ্ঠা আমাদের অন্য সব সম্পর্কের মধ্যে আছে, মা মাসী পিসীমার মধ্যেও আছে। সে-সম্পর্কের জাত এক, তবু তাঁরা এক নন। মেয়ে ভাইঝি ভাগ্নীর মধ্যেও আছে। সে-সম্পর্কের জাত এক, তবু তারা এক নয়। তেমনি যারা প্রিয়া, তাদেরও যদি একাকার করে দেখি একাকার করে চাই, তা'লে আর অনেকনিষ্ঠা রইল না। কিন্তু এই স্বাদ-বৈচিত্র্য বজায় রাখা সহজ নয় রুবি, ভারি কঠিন।'

এই স্বীকৃতিতে রুবি খুশি হয়ে বলল, 'কঠিন ? তুমিও বলছ কঠিন ?'

বিভাস বলল, 'বলছি বইকি। আমিও তো রক্তমাংসের মানুষ। মুহূর্তে মুহূর্তে মনে হয় এই যে চকখড়ির দাগ দেওয়া সীমারেখা তা রক্তের প্লাবনে ভেসে গেল বলে। তবু আমি তাকে ভাসতে দিইনি। সেই চকখড়ির দাগ পলকে পলকে রঙ বদলাচ্ছে, রক্তের রঙ ধরছে। কিন্তু তা রঙ, রক্ত নয়, কখনো শুধু রক্তে আমাদের আনন্দ—কখনো শুধু তার বর্ণে।'

রুবি একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে কোমল স্বরে বলল, 'কিন্তু বিভাস, এই কৃচ্ছ্র-সাধনের কি কোন মূল্য আছে, কোন অর্থ আছে এই পুরনো কনভেনশনের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরার ? তুমি যেখানে কেবল বর্ণ দেখছ, আমার সেখানে বিবর্ণতাও চোখে পড়েছে। মানুষের সহজ কামনা-বাসনাকে চেপে মারার ফলে কত লোক যে জীবন্মৃত হয়ে রয়েছে, প্রতিদিনের আচার-ব্যবহারে হাজারো বিকৃতির ছাপ বয়ে বেড়াচ্ছে—তাকি তুমি দেখনি ?'

বিভাস বলল, 'দেখেছি। কিন্তু এই জীবন্মৃততা স্থায়ী হবে না রুবি। সহজের কাছে আত্মসমর্পণ করা সহজিয়ার সাধনা নয়। তার সাধনা কঠিন, দুরূহ। আমার মনে হয় শিল্পের অমৃত মানুষকে রক্ষা করবে।'

রুবি বলল, 'শিল্প ? শিল্পের ওপর তুমি বেশি নির্ভর করছ। বড় বেশি দাবী করছ তার কাছে। শিল্পের কি সত্যিই অত অলৌকিক শক্তি আছে ?'

বিভাস বলল, 'অলৌকিক নয়, অতিমাত্রায় লৌকিক। সেই হিসেবে অতিলৌকিক বলতে পার। আমাদের ব্যক্তিগত দুঃখ নৈরাশ্য বাসনা কামনা ব্যর্থতা সার্থকতা শিল্পের মধ্যে দিয়ে অতিব্যক্তিক রূপ নেয়, তার অতিব্যাপ্তি ঘটে। শিল্প অসামাজিককে সামাজিক করে। তার স্পর্শে লোহাও সোনা হয়, তুমিও সোনা হবে রুবি।'

রুবি বলল, 'আমার কথা বাদ দাও। কিন্তু তোমার শিল্পের ওই স্পর্শ-মাহাত্ম্য কি সত্যিই আছে? যারা শিল্প চর্চা করে তারাই কি ভালো? এমনকি যারা সৎ-শিল্পী তারাও সবসময় সৎ লোক নয়, লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু যতক্ষণ তারা শিল্পের সাধনায় নিযুক্ত, ততক্ষণ তারা সাধু, ততক্ষণ তারা সৎ।'

রুবি বলল, 'কিন্তু সেই ক্ষণই তো জীবনের সর্বক্ষণ নয়, শিল্পকে যদি ক্ষণপ্রভা বলতে চাও, আমার আপত্তি নেই।'

বিভাস বলল, 'না, শিল্প এখনো মানুষের সর্বক্ষণের সামগ্রী হতে পারেনি, কিন্তু তা যে মাহেন্দ্রক্ষণের সেকথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। আজও মানুষ আর শিল্পীমানুষ এক নয়। কিন্তু মানুষের সাধনা তো সেই সাধনাই, মনে-প্রাণে শিল্পী হবার সাধনা।'

রুবি বলল, 'কিন্তু সবাই কি শিল্পী, সবাই কি স্রষ্টা?'

বিভাস বলল, 'সবাই রুবি,—সবাই। তুমি সুর দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করলে, আমি তোমার-আমার সম্পর্ক দিয়ে। চল, এবার ওঠা যাক।'

কিন্তু ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে বিভাসের চমক ভাঙল। ঈস, অনেক রাত হয়ে গেছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দুটো পঁয়ত্রিশ, মনে পড়ল উমার কথা। বাচ্চা ছেলে নিয়ে সে একা আছে বাড়িতে। হয়তো জেগেই আছে।

রুবি উঠে বিভাসের বিহ্বলতা লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি যাও, আমি ফিরি।'

বিভাস বলল, 'সেকি, তুমি কোথায় যাবে?'

রুবি বলল, 'রমজান সাহেবের বাড়িতেই যাই।'

বিভাস বলল, 'ছি, তা হয় না। চল বাড়ি চল।'

রুবি বলল, 'কিন্তু এভাবে এই শেষ রাত্রে একসঙ্গে বাড়ি ফেরার কি মানে হবে বুঝতে পারছ? বাড়ির একটি মাত্র সদর আর সেই দোরে একটি মাত্র রক্ষিনী। সেখানে কি রক্ষা মিলবে?'

সে আশঙ্কা বিভাসের মনেও উঠেছিল; কিন্তু মুখে বলল, 'বাজে কথা রাখ। এসো আমার সঙ্গে।'

···বাড়ির সামনে গিয়ে দেখল উমা একা নয়, পাশের বাড়ির মাধব, মাধবের বাবা সারদাবাবু বিভাসদের বৈঠকখানা ঘরে জেগে বসে আছেন।

বিভাস আর রুবিকে একসঙ্গে ফিরতে দেখে কেউ কোন কথা বললেন না।

একটু বাদে সারদাবাবু বললেন, 'এই যে বিভাসবাবু। এসেছেন আপনি? আর সারা

কলকাতা শহরে আপনাকে খুঁজতে লোক বেরিয়েছে। উমা মা তো ভেবে অস্থির। কোন এ্যাকসিডেন্টই ঘটল নাকি। হাসপাতালে পর্যন্ত লোক গেছে। ছি ছি ছি বিভাসবাবু, আপনার কাছ থেকে এ আমরা আশা করিনি। এতদিন কানাঘুষই শুনেছি, আজ স্বচক্ষে দেখলাম। চল মাধব, বাড়ি চল।'

বিভাস প্রতিবাদ করতে গেল, 'কিন্তু আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। একটা গানের জলসায় আমাদের দেরি হয়ে গেল।'

সারদাবাবু হেসে বললেন, 'গানের জলসা? বেশ বেশ তবু ভালো। উমা-মা যাও ঘরে যাও তুমি। কোন চিন্তা ক'র না। আমি কালই এর ব্যবস্থা করব। পাড়ার মধ্যে এসব অনাচার আমরা মোটেই সইব না। আদালত ফাদালতের দরকার হবে না। আমার একখানা বাঁশের লাঠি এখনো আছে। তাতেই চলবে। তার কাছে আর কোন ওষুধ নেই।' বলে ওঁরা চলে গেলেন।

রুবি কোন কথা না বলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তার মুখ শুকনো, বুক কাঁপছে। কতদিন কতরাত্রে বিভিন্ন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে আমোদ স্ফূর্তি করে সে ঘরে ফিরেছে। কোনদিন এমনভাবে ধরা পড়েনি। আজ ধরা পড়ল। অথচ ধরা পড়বার আজ কিছুই ছিল না। সব বিভাসের জন্যে, সব বিভাসের জন্যে। কিন্তু আশ্চর্য এই অবিবেচক কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটির ওপর তার যতটা রাগ হওয়া উচিৎ ছিল ততটা যেন হোল না এবং ওর জন্য একটা অদ্ভুত মমতা আর সহানুভূতিতে মন ভরে উঠল। বিভাসের জন্যে ভয় হোল ওর মনে। নিজের সম্মান গেছে যাক, কিন্তু নির্দোষ থেকেও বিভাসের সম্মান যে গেল পাড়া-প্রতিবেশী দশজনের সামনে যে নাকাল হতে হোল ওকে, রাত পোহালে আরো কত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে সেই আশঙ্কায় ওর মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। ওর জন্যে ভারি দুঃখ বোধ করতে লাগল রুবি। নিজের জন্যে দুঃখ নেই, শুধু আরেকজনের দুঃখ। আঃ কি শান্তি আর একজনের দুঃখের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়ায়, আরেকজনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ায়। এমন নিবিড় একাত্মতার আনন্দ শুধু দুঃখের ভিতর দিয়েই পাওয়া যায়! দেহ-সম্মিলনে নয়, শুধু ভাব-সম্মিলনেই মেলে।

...বিভাস ঘরে ঢুকলে উমা আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে দিল। ওর দেহে যেন কোন স্পন্দন নেই, যেন ওর সমস্ত শরীর মন নিষ্প্রাণ পাষাণে রূপ পেয়েছে।

বিভাস আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল, ডাকল, 'উমা।'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উমা সরে দাঁড়াল, কোন কথা বলল না।

বিভাস বলল, 'তুমি বিশ্বাস—কর—'

উমা অদ্ভুত একটু হাসল, 'আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি। আমার আর একফোঁটা সন্দেহ-

সংশয়ও নেই। আশ্চর্য তোমার এত বড় দুঃসাহস তুমি আমার চোখের ওপর—সকলের চোখের ওপর—তুমি !'

বিভাস বলল, 'আমি কোন অন্যায় করিনি বলেই সেই সাহস আমার আছে। অন্যায় করিনি বলেই আমাকে কারো চোখের আড়ালে যেতে হয়নি।'

উমা বলল, 'চুপ কর, চুপ কর। আর মিথ্যে কথা বল না। সাহস! সাহসের বড়াই করছ তুমি। সাহস না থাকলে কি মানুষ চোর হতে পারে, লম্পট হতে পারে। কিন্তু সে সাহসের শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয়। চিন্তা নেই। সে শাস্তি তুমিও পাবে।'

…রাত ভোর হতে না হতেই সারদাবাবুর দল এসে বাড়ি ঘিরে ধরল। লাঠি একখানা নয়, অনেকগুলি। সারদাবাবু ডাকলেন, 'বিভাসবাবু উঠুন।'

শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রার মত এসেছিল বিভাসের, সোরগোলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার !'

সারদাবাবু বললেন, 'মেয়েটাকে বের করে দিন। গাট্টি-বোঁচকা নিয়ে ও চলে আসুক। ওর জন্যে আমরা আলাদা ঘর ঠিক করেছি।'

বিভাস বলল, 'অসম্ভব, তা আমি কিছুতেই পারব না।'

সারদাবাবু বললেন, 'আপনি না পারেন আমরা পারব। ছাড়ুন, পথ ছেড়ে দিন।' ইঙ্গিতে জন দুই লোক বিভাসকে ধরে সরিয়ে দিল। তারপর তারা ওর ঘরের পাশ দিয়ে উঠন পেরিয়ে সোজা রুবির ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

গুণ্ডামি বদমাইসির জন্যে পাড়ায় যার খ্যাতি আছে সেই নিবারণই এগিয়ে গেল আগে। রুবির দরজায় লাঠির ঠোকা দিয়ে বলল, 'কই দিদিমণি, অনেক ঘুমিয়েছ। ওঠো এবার।'

সারদাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'এই, যা বলবার ভদ্রভাবে বল। ওসব কি !'

অনুচরদের ওপর নির্ভর না করে সারদাবাবু নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, 'রুবি, ওঠো দরজা খুলে দাও।'

রুবি দোর খুলে এসে সামনাসামনি দাঁড়াল, বলল, 'এসব কি ?'

সারদাবাবু বললেন, 'কিছু না। তোমার জন্যে আলাদা ঘর আমরা ঠিক করেছি। সেখানে তোমাকে চলে যেতে হবে। মালপত্রের জন্যে ভাবনা নেই। আমাদের লোক সেসব পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

রুবি স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কিন্তু আপনাদের অত কষ্ট করবার কোন প্রয়োজন দেখছিনে। এ-ঘর থেকে আমি যাব না। আপনারা চলে যান।'

সারদাবাবু বললেন, 'কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে। আমরা বাড়িওয়ালার মত নিয়ে এসেছি।'

রুবি বলল, 'কিন্তু তাঁর মতই তো সব নয়। তিনি মামলা করেছেন—মামলায় যদি জেতেন তা'লেই ঘর ছাড়ব, তার আগে কিছুতেই ছাড়ব না।'

সারদাবাবু বললেন, 'বেশ তো, মামলা তুমি অন্য বাড়ি থেকেও চালাতে পারবে। কোর্টের রায় না পাওয়া পর্যন্ত এ ঘর তালাবন্ধ থাকবে। অন্য কাউকেও ভাড়া দেওয়া হবে না। কিন্তু তোমাকে আজই চলে যেতে হবে।'

এইসময় বিভাস এসে দাঁড়াল, 'আপনি সম্পূর্ণ অন্যায় বলছেন সারদাবাবু।'

সারদাবাবু একটু হাসলেন, 'অন্যায় কথা বলছি ? আপনার ন্যায়-অন্যায়ের নমুনা তো কাল রাত্রেই দেখলুম। আপনি আর কথা বলবেন না। চুপ করুন। অন্য কেউ হলে মাথা নিচু করে থাকত।'

বিভাস বলল, 'মাথা নিচু করবার কিছু নেই। আমি বলছি আপনারা বাড়ি থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যান, নাহলে পুলিশ ডাকব।'

'বটে !' সারদাবাবুর সঙ্গীরা বিভাসের দিকে এগিয়ে গেল।

তাদের উনি বাধা দিয়ে বললেন, 'এই খবরদার।' তারপর বিভাসের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আগে পাড়ার লোক তারপরে তো পুলিশ। আমরা ছেড়ে না দিলে আপনি এখান থেকে বেরুতেই পারবেন না। তাছাড়া আমি এখানকার পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট তা বোধহয় আপনি ভুলে গেছেন।'

বিভাস বলল, 'না, ভুলিনি। কিন্তু আপনারা এখন যান। আমাকে ভেবে দেখতে দিন। তারপর বিকেলে এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

সারদাবাবু বললেন, 'আশ্চর্য, এর মধ্যে আবার ভাবাভাবির কি আছে ! বেশ, উমা-মা যদি সময় দিতে চায়, বিকেল পর্যন্ত আমরা সময় দিতে পারি। কি বল উমা-মা ?' বিভাসের পিছনে এসে উমা দাঁড়িয়েছিল, তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বল ?'

উমা রাণীর মত হুকুম দিয়ে বলল, 'না, আর এক মুহূর্তও সময় নয়। ও পাপকে এক্ষুনি বিদায় করুন আপনারা।'

সারদাবাবু হেসে বললেন, 'শুনলেন তো, আমার সতীমার আদেশ, শুনলেন তো ? যতদিন আপনি সৎ ছিলেন, আমরা আপনাকে মানতুম। কিন্তু এখন আপনার কথা শোনাও যা একটা পাগলের কথা শোনাও তাই।'

সঙ্গীদের একজন পিছন থেকে টিপ্পনী কাটল, 'প্রেমপাগল।'

বিভাস এবার উমার কাছে এগিয়ে বলল, 'আচ্ছা উমা, আর একটি মেয়ের অপমানে কি তোমার অপমান নয় ?'

উমা বলল, 'মেয়ে হলে নিশ্চয় অপমান বোধ করতাম। কিন্তু ও মেয়ে নয়, বাজারের একটা বেশ্যাও যা, ও তাই। ওকে সম্মান করলেই আমার অপমান।'

বিভাস চেয়ে দেখল রুবি স্তব্ধ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিবর্ণ ফ্যাকাসে তার মুখ। স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'সে যাই হোক তবু তার অপমানে আমার অপমান, তোমার অপমান। আমি স্বামী হয়ে তোমার কাছে অনুরোধ করছি, এখন ওঁদের যেতে বল। অন্ততঃ বিকেল পর্যন্ত সময় দাও।'

উমা বলল, 'স্বামী হয়ে এ অনুরোধ তুমি করতে পার না। একটা লম্পট বদমাস হিসেবেই পার। সেই লম্পটের অনুরোধ আমি রাখতে বাধ্য নই।'

সারদাবাবু বললেন, 'আঃ কেন মিছামিছি গোলমাল বাড়াচ্ছেন বিভাসবাবু! যেতে দিন যেতে দিন, রুবিকে যেতে দিন।'

হঠাৎ বিভাস এগিয়ে এসে রুবিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'না, ও যেতে পারবে না, ওকে আমি যেতে দেব না।'

সারদাবাবু বললেন, 'আঃ কি পাগলামি করছেন বিভাসবাবু! যেতে দেবেন না তো এ বাড়িতে ওকে আপনি রাখবেন কি করে ? ও আপনার কে ?'

বিভাস বলল, 'ও আমার কে ? অন্য কোন সম্পর্ক তো আপনারা বুঝবেনও না, স্বীকারও করবেন না। ও আমার স্ত্রী।'

সারদাবাবু বললেন, 'স্ত্রী ?'

রুবি অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ছিঃ, কি বলছেন আপনি বিভাসবাবু!'

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ, স্ত্রী। এবার শুনলেন তো ? যান এবার আপনারা।'

সারদাবাবু বললেন, 'আরে দাঁড়ান মশাই, অত সহজেই কি যাওয়া যায়! নতুন বিয়ে-থা করলেন, মিষ্টিমুখ না করিয়েই বিদায় দেবেন সেকি কথা। তাহলে আপনার দুটি স্ত্রী বলুন। এ-ঘরে একটি, ও-ঘরে আর একটি।'

বিভাস বলল, 'না, শুধু একটিই।'

কিছুক্ষণ কেউ আর কোন কথা বলল না।

সারদাবাবু রুবিকে লক্ষ্য করে কি বলতে গেলেন, উমা এগিয়ে এসে বলল, 'এর পর আর কথা চলতে পারে না। আপনারা এবার যান মেসোমশাই।'

সারদাবাবু বললেন, 'তুমি কি বলছ! একটা পাগলের কথায় বিশ্বাস করে আমরা চলে যাব! একটা অসম্ভব কথা বললেই হোল ?'

উমা বলল, 'কিছুই অসম্ভব নয় মেসোমশাই। আপনারা এখন যান, বিকেলে আসবেন। বিকেল পর্যন্ত তো সময় চেয়েছে ওরা? বেশ, তাই দেওয়া গেল। আপনারা বিকেলে আসুন।' উমা হাত জোড় করল।

সারদাবাবু তার দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তাই হবে।' দলবল নিয়ে তিনি বিদায় হলেন। আর বিভাস সোজা রুবির ঘরে ঢুকল।

রুবি ততক্ষণে ঘরের মধ্যে এসে তক্তপোষের এক কোণায় চুপ করে বসেছিল। বিভাসকে দেখে ও চমকে উঠল, আরক্ত হয়ে উঠল ওর মুখ। বলল, 'ছি ছি ছি, এ তুমি কি করলে, এ তুমি কি বললে!'

বিভাস বলল, 'আমি ঠিক বলেছি।'

এগিয়ে এসে বিভাস এবার ওর হাত ধরল শক্ত করে, বলল, 'যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। আমার কথা আর ফিরিয়ে নেব না। আজ থেকে তোমার আমার ভিতরকার সেই চকখড়ি সাদা দাগ তুলে ফেলব, মুছে ফেলব। তোমার সাদা সিঁথিতে ফের সিঁদুর পরাব। সমাজ সংসার সন্তানের ভিতর দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ভরে দেব, তোমাকে সম্পূর্ণ করে চাই রুবি, সম্পূর্ণ করে দিতে চাই।'

রুবি দোরের দিকে দেখে অস্ফুট স্বরে বলল, 'উমা, উমা রয়েছে ওখানে।'

উমা দোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পেরেও বিভাস ঘাড় ফিরাল না, কিম্বা হাত ছাড়ল না। বলল, 'আসুক। ও এখুনি চলে যাবে। ও না যায়, আমরা যাব। ও আমাদের সম্পর্ককে অস্বীকার করেছে। ওর চোখে আমি আর স্বামী নই, লম্পট। আমিও ওকে আর স্বীকার করব না। ভিতরে ভিতরে বিবাহবিচ্ছেদ আমাদের হয়ে গেছে। শুধু অনুষ্ঠানটুকু বাকি।'

উমা আর দাঁড়াল না, দাঁড়াতে পারল না। ঘরে গিয়ে নিজের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, 'মা-গো!'

রুবি বলল, 'ছাড়, আমাকে ভাবতে দাও।'

বিভাস বলল, 'এর মধ্যে আর ভাববার কিছু নেই।'

ভাববার কিছু নেই! রুবির বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। বিভাসের হাতের মধ্যে কেঁপে উঠল ওর হাত। ভাববার কিছু নেই! ফের স্বামী সন্তান সংসার! ভাঙা জাহাজে আর ঘাটে ঘাটে এমন করে ভেসে বেড়ান নয়। পোতাশ্রয়ে নিরাপদ আশ্রয় লাভ। হ্যাঁ, এবার আশ্রয় চাই তার। সে বড় নিঃস্ব, বড় নিঃসঙ্গ, বড় ক্লান্ত। একমাত্র স্বামী সন্তানের বাহুবন্ধনের নিবিড় নীড় ছাড়া আর কোথাও এই ক্লান্তির অবসান হবে না। পরিপূর্ণ শান্তি আর তৃপ্তিতে ভরে উঠবে না বুক।

…রুবির চোখের সামনে একটুকরো ছবি ভেসে উঠল। এ ঘর হয়তো ছেড়ে দিতে হবে, এ পাড়া ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু তাতে কি। যেখানে দুজন সেখানেই ঘর, সেখানেই পাড়া। এই শহরেরই আরেক পাড়ায় আরেক অজানা গলিতে ঘর বাঁধবে রুবি। মনের মত করে ঘর সাজাবে। নিজের শরীরের যত্ন না নিলেও চলবে, কিন্তু ঘরের যত্নের কথা ভুললে চলবে না। কারণ সে ঘর তো তার একার নয়, দুজনের। শুধু কি দুজনের? ক্রমে আরো একজন আসবে। আর একটি শিশুর দুরন্তপণায় তাঁর সাজানো ঘর অগোছালো হয়ে উঠবে। তার ছুটোছুটি দাপাদাপির শব্দে মুখর হয়ে উঠবে, মধুর হয়ে উঠবে পৃথিবী। তার পায়ের শব্দ কি এখনই শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, একটি শিশু ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকল—'মাসীমা! মাসীমা!'

উমার ছেলে বাবলু। রুবি বিভাসের মুঠির ভিতর থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কিরে বাবলু, কি হয়েছে?'

বাবলু কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'আমার মা মরে গেছে। কথা বলছে না, তুমি শিগ্‌গির এসো, বাবা শিগ্‌গির এসো।'

বিভাস চমকে উঠল, 'তবে কি—'

রুবি চমকে উঠল, 'তবে কি—।'

তারপর বাবলুকে নিয়ে দুজনেই উমার ঘরে এসে ঢুকল। না, তেমন কিছু নয়। উমা শুধু মূর্ছিত হয়ে পড়েছে। বিছানা ছেড়ে মেঝের ওপর গড়িয়ে এসেছে ওর দেহ। কাপড়-চোপড় এলোমেলো। চুলের রাশ খুলে পড়েছে। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। দাঁতে দাঁত লাগা। অতি ক্ষীণভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে।

রুবি ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে কি দেখল। একখানা পাখা নিয়ে বসল ওর মাথার কাছে। বিভাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর কি আগে হিষ্টিরিয়ার দোষ ছিল?'

বিভাস বলল, 'ছিল অনেক আগে। ছেলে হওয়ার পর আর হয়নি।'

বাবলু বলল, 'মাসীমা, মা কি মরে গেছে?'

রুবি সস্নেহে বলল, 'মরবে কেন, তোমার মা এই জেগে উঠল বলে। তুমি কি কিছু খাবে সোনা?'

বাবলু বলল, 'হুঁ, ক্ষিদে পেয়েছে।'

তাকের ওপর একটা কাঁচের বৈয়মে কিছু বিস্কুট আর চকোলেট তোলা ছিল। রুবি তারই কয়েকটা বের করে বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, 'খাও ততক্ষণ, তোমাকে এক্ষুণি হরলিকস তৈরী করে দিচ্ছি।'

খানিকক্ষণ চেষ্টার পর উমা একবার চোখ মেলে শূন্য দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাল।

বিভাস ওর পাশে বসে হাতের মুঠ খুলে দিচ্ছিল, উমা এবার স্বামীর হাতখানা শক্ত করে ধরে চোখ বুজল, তারপর অর্ধ অচৈতন্যের ভিতর থেকে বলল, 'তুমি চলে যেয়ো না, তুমি ছেড়ে যেয়ো না।'

বিভাস কোন কথা বলল না।

রুবি উমার শিয়রের কাছ থেকে উঠে দাঁড়াল।

বিভাস বলল, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

রুবি বলল, 'এবার ওর জ্ঞান ফিরে আসছে। আর আমার এখানে থাকবার দরকার নেই।' আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

বিভাস উঠে আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু উমা শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরল। মাথা রাখল কোলের ওপরে। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'তুমি যেয়ো না, তুমি যেয়ো না।' এবার ওর সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ফিরে এসেছে।

একটু বাদে হরলিকসের ছোট গ্লাস হাতে নিয়ে বাবলু ঘরে ঢুকল, 'বাবা, মামীমা চলে যাচ্ছে! কত বড় গাড়ি!'

বিভাস বলল, 'সেকিরে ?' উঠে গিয়ে সদরের কাছে দাঁড়াল।

একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির সামনে। মালপত্র ওঠানো চলেছে একটা দুটো করে।

বিভাস বলল, 'একি, তুমি কোথায় চললে আমাকে না বলে ?'

রুবি একটু হাসল, 'তোমাকে না বলে যেতুম না। তাছাড়া মুখের বলাটাই কি সব ? এই নাও ঘরের চাবি। বাড়িওয়ালা আর আদালত-ওয়ালার সঙ্গে মিটমাট করে নিও। আমার হাতে এখন নগদ টাকা নেই, পরে একসময় পাঠিয়ে দেব।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু কোথায় যাচ্ছ ? কোন্ ঠিকানায় ?'

রুবি বলল, 'তা জেনে লাভ নেই। সেখানে তোমর যাওয়া নিষেধ।'

বিভাস বলল, 'কিসের নিষেধ ?'

রুবি বলল, 'সেই চকখড়ির দাগের। সেই তোমার সম্পর্ক-শিল্পের। কাল বলছিলে, আজই ভুলে গেলে ?'

কথা শেষ করে রুবি আস্তে আস্তে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

গল্প ও কাহিনী

চড়াই-উৎরাই

বরেণ্য কথাশিল্পী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

রস

কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করল মোতালেফ। তারপর দিন পনের যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজুখাতুনকে। পাড়াপড়শী সবাই তো অবাক। এই অবশ্য প্রথম সংসার নয় মোতালেফের। এর আগের বউ বছর খানেক আগে মারা গেছে। তবু পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জোয়ান পুরুষ মোতালেফ। আর মাজুখাতুন ত্রিশে না পৌঁছলেও তার কাছাকাছি গেছে। ছেলেপুলের ঝামেলা অবশ্য মাজুখাতুনের নেই। মেয়ে ছিল একটি, কাঠিখালির শেখেদের ঘরে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঝামেলা যেমন নেই, তেমনি মাজুখাতুনের আছেই বা কি। বাক্স সিন্দুক ভরে যেন কত সোনাদানা রেখে গেছে রাজেক মৃধা, মাঠ ভরে যেন কত ক্ষেত-ক্ষামার রেখে গেছে যে তার ওয়ারিশি পাবে মাজুখাতুন। ভাগের ভাগ ভিটার পেয়েছে কাঠা খানেক, আর আছে একখানি পড়ো পড়ো শণের কুঁড়ে। এই তো বিষয়-সম্পত্তি, তারপর দেখতেই বা এমন কি একখানা ডানাকাটা হুরীর মত চেহারা। দজ্জাল মেয়েমানুষের আঁট-সাঁট শক্ত গড়নটুকু ছাড়া কি আছে মাজুখাতুনের যা দেখে ভোলে পুরুষেরা, মন তাদের মুগ্ধ হয়।

সিকদার-বাড়ির, কাজী-বাড়ির বউঝিরা হাসাহাসি করল, 'তুক করছে মাগী, ধুলা-পড়া দিছে চৌখে।'

মুন্সীদের ছোটবউ সাকিনা বলল, 'দিছে ভালো করছে। দেবে না? অমন মানুষের চৌখে ধুলাপড়া দেওয়নেরই কাম। খোদা তো পাতা দেয় নাই চৌখে। দেখছো তো কেমন ট্যারাইয়া ট্যারাইয়া চায়। ধুলা ছিটাইয়া থাকে তো বেশ করছে।'

কথাটা মিথ্যা নয়, চাউনিটা একটু তেরছা তেরছা মোতালেফের। বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের খোঁজ ক'রে ঘোরে তার চোখ। অল্পবয়সী খাপসুরৎ চেহারার একটি বউ আনবে ঘরে, এতদিন ধরে সেই চেষ্টাই সে করে এসেছে। কিন্তু দরে পটেনি কারো সঙ্গে। যারই ঘরে একটু ডাগর গোছের সুন্দর মেয়ে আছে সে-ই হেঁকে

বসেছে পাঁচকুড়ি সাতকুড়ি। সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল মোতালেফের ফুলবানুকে। চরকান্দার এলেম সেখের মেয়ে ফুলবানু। আঠার উনিশ বছর হবে বয়স। রসে টলটল করছে সর্বাঙ্গ, টগবগ করছে মন। ইতিমধ্যে অবশ্য একহাত ঘুরে এসেছে ফুলবানু। খেতে পরতে কষ্ট দেয়, মার ধোর করে এই সব অজুহাতে তালাক নিয়ে এসেছে কইডুবির গফুর সিকদারের কাছ থেকে। আসলে বয়স বেশী আর চেহারা সুন্দর নয় বলে গফুরকে পছন্দ হয়নি ফুলবানুর। সেই জন্যই ইচ্ছা ক'রে নিজে ঝগড়া কোন্দল বাঁধিয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু একহাত ঘুরে এসেছে বলে কিছু ক্ষয় যায়নি ফুলবানুর, বরং চেকনাই আর জেল্লা খুলেছে দেহের, রসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে। চরকান্দায় নদীর ঘাটে ফুলবানুকে একদিন দেখেছিল মোতালেফ। এক নজরেই বুঝেছিল যে, সেও নজরে পড়েছে। চেহারাখানা তো বেমানান নয় মোতালেফের। নীল লুঙ্গী পরলে ফর্সা ছিপছিপে চেহারায় চমৎকার খোলতাই হয় তার, তাছাড়া এমন ঢেউ-খেলানো টেরিকাটা বাবরিই বা এ তল্লাটে ক'জনের মাথায় আছে। ফুলবানুর সুনজরের কথা বুঝতে বাকি ছিল না মোতালেফের। খুঁজে খুঁজে গিয়েছিল সে এলেম সেখের বাড়িতে। কিন্তু এলেম তাকে আমল দেয়নি। বলেছে গত বার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে তার। এবার আর না দেখে শুনে যার তার হাতে মেয়ে দেবে না। আসলে টাকা চায় এলেম। গাঁটের কড়ি যা খরচ করতে হয়েছে মেয়েকে তালাক নেওয়াতে গিয়ে, সুদে আসলে তা পুরিয়ে নিতে চায়। গুনাগার চায় সেই লোকসানের। আঁচ নিয়ে দেখেছে মোতালেফ সে গুণাগার দু'এক কুড়ি নয়, পাঁচকুড়ি একেবারে। তার কমে কিছুতেই রাজী হবে না এলেম। কিন্তু অত টাকা সে দেবে কোথেকে।

মুখ ভার ক'রে চলে আসছিল মোতালেফ। আশ্‌শেওড়া আর চোখ-উদানের আগাছার জঙলা ভিটার মধ্যে ফের দেখা হলো ফুলবানুর সঙ্গে। কলসী কাঁখে জল নিতে চলেছে ঘাটে। মোতালেফ বুঝল সময় বুঝেই দরকার পড়েছে তার জলের।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিক ক'রে একটু হাসল ফুলবানু, 'কি মেঞা, গোসা কইরা ফিরা চললা নাকি?'

'চলব না? শোনলা নি টাকার খাককাই তোমার বা-জানের!'

ফুলবানু বলল, 'হ, হ, শুনছি। চাইছে তো দোষ হইছে কি? পছন্দসই জিনিস নেবা, বা-জানের গুনা, তার দাম দেবা না?'

মোতালেফ বলল, 'ও খাককাইটা আসলে বা-জানের নয়, বা-জানের মাইয়ার। হাটে বাজরে গেলেই পারো ধামায় উইঠা।'

মোতালেফের রাগ দেখে হাসল ফুলবানু, 'কেবল ধামায় ক্যান্, পালায় উইঠা বসব।

মুঠ ভইর্যা ভইর্যা সোণা জহরৎ ওজন কইর্যা দেবা পালায়। বোঝব ক্ষেমতা, বোঝব কেমন পুরুষ মাইনষের মুঠ।' মোতালেফ হন হন ক'রে চলে যাচ্ছিল। ফুলবানু ফের ডাকল পিছন থেকে, 'ও সোন্দর মিঞা, রাগ করলানি? শোন শোন।'

মোতালেফ ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি শোনব?'

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আরো একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কি, শোনবা মনের কথা। শোন, বা-জানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনা দানাও চায় না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মাইনষের। মাইনষের ত্যাজ দেখতে চায়, বুঝ্ছ?'

মোতালেফ ঘাড় নেড়ে জানালে, বুঝেছে।

ফুলবানু বলল, 'তাই বইলা আকাম কুকাম কইরো না মেঞা, জমি ক্ষেত বেচতে যাইও না।'

বেচবার মত জমি ক্ষেত অবশ্য মোতালেফের নেই, কিন্তু সে গুমর ফুলবানুর কাছে ভাঙল না মোতালেফ, বলল, 'অইচ্ছা, শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব। কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবেনি দেখবার?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বেসবুর বিবি ভাইবো না আমারে।'

গাঁয়ে এসে আর একবার ধারের চেষ্টা করে মোতালেফ। গেল মল্লিকবাড়ি, মুখুজ্যেবাড়ি, সিকদারবাড়ি, মুন্সীবাড়ি—কিন্তু কোথাও সুরাহা হয়ে উঠল না টাকার। নিলে তো আর সহজে হাত উপুড় করবার অভ্যেস নেই মোতালেফের। ধারের টাকা তার কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতে বেজায় ঝামেলা। সাধ ক'রে কে পোয়াতে যাবে সেই ঝক্কি।

কিন্তু নগদ টাকা ধার না পেলেও শীতের সূচনাতেই পাড়ার চার পাঁচ কুড়ি খেজুর গাছের বন্দোবস্ত পেল মোতালেফ। গত বছর থেকেই গাছের সংখ্যা বাড়ছিল, এবার চৌধুরীদের বাগানের দেড়কুড়ি গাছ বেশি হোল। গাছ কেটে হাঁড়ি পেতে রস নামিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক রস মালিকের, অর্ধেক তার। মেহনৎ কম নয়, এক একটি ক'রে এতগুলি গাছের শুকনো মরা ডালগুলি বেছে বেছে আগে কেটে ফেলতে হবে। বালিকা-চায় ধার তুলে তুলে জুৎসই ক'রে নিতে হবে ছ্যান। তারপর সেই ধারালো ছ্যানে গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুঁততে হবে সরু কঞ্চি ফেড়ে। সেই নলের মুখে লাগসই ক'রে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি। তবে তো রাতভরে টুপ টুপ ক'রে রস পড়বে সেই হাঁড়িতে। অনেক খাটুনি, অনেক খেজমৎ। শুকনো শক্ত খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের। এতো আর মার দুধ নয়, গাইয়ের দুধ নয় যে বোঁটায় বানে মুখ দিলেই হোল।

অবশ্য কেবল খাটতে জানলেই হয় না, গাছে উঠতে-নামতে জানলেই হয় না, গুণ থাকা চাই হাতের। যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছের ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে। এ তো আর ধান কাটা নয়, পাট কাটা নয় যে, কাচির পোঁচে গাছের গোড়াশুদ্ধ কেটে নিলেই হোল। এর নাম খেজুরগাছ কাটা। কাটতেও হবে, আবার হাত বুলোতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না হয় গাছের। একটু এদিক ওদিক হলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফা রফা হয়ে যাবে, মরা মুখ দেখতে হবে গাছের। সে গাছের গুড়িতে ঘাটের পৈঠা হবে ঘরের পৈঠা হবে, কিন্তু ফোঁটায় ফোঁটায় সে গাছ থেকে হাঁড়ির মধ্যে রস ঝরবে না রাত ভরে।

খেজুর গাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা মোতালেফকে নিজে হাতে শিখিয়েছিল রাজেক মৃধা। রস সম্বন্ধে এ-সব তত্ত্বকথা আর বিধি-নিষেধও তার মুখের। রাজেকের মত অমন নামডাকওয়ালা 'গাছি' ধারে-কাছে ছিল না। যে গাছের প্রায় বারো আনা ডালই শুকিয়ে এসেছে সে গাছ থেকেও রস বেরুত রাজেকের হাতের ছোঁওয়ায়। অন্য কেউ গাছ কাটলে যে গাছ থেকে রস পড়তো আধ-হাঁড়ি, রাজেকের হাতে পড়লে সে রস গলা-হাঁড়িতে উঠতো। তার হাতে খেজুর গাছ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত গৃহস্থরা। গাছের কোন ক্ষতি হোত না, রসও পড়ত হাঁড়ি ভরে। বছর কয়েক ধরে রাজেকের সাকরেদ হয়েছিল মোতালেফ, পিছনে পিছনে ঘুরত, কাজ করত সঙ্গে সঙ্গে। সাকরেদ দু'চারজন আরো ছিল রাজেকের—সিকদারদের মকবুল, কাজীদের ইসমাইল। কিন্তু মোতালেফের মত হাত পাকেনি কারো। রাজেকের স্থান আর কেউ নিতে পারেনি তার মত।

কিন্তু কেবল গাছ কাটলেই তো হবে না কুড়িতে কুড়িতে, রসের হাঁড়ি বয়ে আনলেই তো হবে না বাঁশের বাখারির ভারায় ঝুলিয়ে, রস জ্বাল দিয়ে গুড় করবার মত মানুষ চাই। পুরুষ মানুষ গাছ থেকে কেবল রসই পেড়ে আনতে পারে,—কিন্তু উনান কেটে, জ্বালানি জোগাড় ক'রে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে সেই তরল রস জ্বাল দিয়ে তাকে ঘন পাটালিগুড়ে পরিণত করবার ভার মেয়েমানুষের ওপর। শুধু কাঁচা রস দিয়ে তো লাভ নেই, রস থেকে গুড় আর গুড় থেকে পয়সায় কাঁচা রস যখন পাকা রূপ নেবে তখন সিদ্ধি, কেবল তখনই সার্থক হবে সকল খেজমৎ মেহনৎ। কিন্তু বছর দুই ধরে বাড়িতে সেই মানুষ নেই মোতালেফের। ছেলেবেলায় মা মরেছিল। দু'বছর আগে বউ মরে ঘর একেবারে খালি করে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর মোতালেফ এসে দাঁড়াল মাজুখাতুনের ঝাঁপ-আঁটা ঘরের সামনে, 'জাগনো আছো নাকি মাজুবিবি?'

ঘরের ভিতর থেকে মাজুখাতুন সাড়া দিয়ে বলল, 'কেডা ?'

'আমি মোতালেফ। শুইয়া পড়ছ বুঝি ? কষ্ট কইরা উইঠা যদি ঝাপটা একবার খুইলা দিতা, কয়ডা কথা কইতাম তোমার সাথে।'

মাজুখাতুন উঠে ঝাপ খুলে দিয়ে বলল, 'কথা যে কি কবা তা তো জানি। রসের কাল আইছে আর মনে পইড়া গেছে মাজুখাতুনরে। রস জ্বাল দিয়া দিতে হবে। কিন্তু সেরে চাইর আনা কইরা পয়সা দেবা মেঞা। তার কমে পারব না। গতরে সুখ নাই এ বছর।'

মোতালেফ মিষ্টি ক'রে বলল, 'গতরের আর দোষ কি বিবি। গতর তো মনের হাত ধইরা ধইরা চলে। মনের সুখই গতরের সুখ।'

মাজুখাতুন বলল, 'তা যাই কও তাই কও মেঞা, চাইর আনার কমে পারব না এবার।'

মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাইর আনা ক্যান বিবি, যদি ষোল আনা দিতে চাই, রাজী হবা তো নিতে ?'

মোতালেফের হাসির ভঙ্গিতে মাজুখাতুনের বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন ক'রে উঠল, কিন্তু মুখে বলল, 'তোমার রঙ্গ তামাসা থুইয়া দাও মেঞা। কাজের কথা কবা তো কও, নইলে যাই, শুই গিয়া।'

মোতালেফ বলল, 'শোবাই তো। রাইত তো শুইয়া ঘুমাবার জন্যেই। কিন্তু শুইলেই কি আর চোখে ঘুম আসে মাজুবিবি, না চাইয়া চাইয়া এই শীতের লম্বা রাইত কাটান যায় ?'

ইসারা ইঙ্গিত রেখে এরপর মোতালেফ আরো স্পষ্ট ক'রে খুলে বলল মনের কথা। কোনরকম অন্যায় সুবিধা সুযোগ নিয়ে চায় না সে। মোল্লা ডেকে কলমা পড়ে সে নিকা ক'রে নিয়ে যেতে চায় মাজুখাতুনকে। ঘর গেরস্থালির ষোল আনা ভার তুলে দিতে চায় তার হাতে।

প্রস্তাব শুনে মাজুখাতুন প্রথমে অবাক হয়ে গেল, তারপর একটু ধমকের সুরে বলল, 'রঙ্গ তামাসার আর মানুষ পাইলা না তুমি ! ক্যান, কাঁচা বয়সের মাইয়া পোলার কি অভাব হইছে নাকি দেশে যে তাগো থুইয়া তুমি আসবা আমার দুয়ারে।'

মোতালেফ বলল, 'অভাব হবে ক্যান মাজুবিবি। কম বয়সী মাইয়া পোলা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু শত হইলেও, তারা কাঁচা রসের হাঁড়ি।'

কথার ভঙ্গিতে একটু কৌতুক বোধ করল মাজুখাতুন, বলল 'সাঁচাই নাকি ! আর আমি ?'

'তোমার কথা আলাদা। তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়, তোমার সাথে তাগো তুলনা ?'

তখনকার মত মোতালেফকে বিদায় দিলেও তার কথাগুলি মাজুখাতুনের মন থেকে সহজে বিদায় নিতে চাইল না। অন্ধকার নিঃসঙ্গ শয্যায় মোতালেফের কথাগুলি মনের ভিতরটায় কেবলই তোলপাড় করতে লাগল। মোতালেফের সঙ্গে পরিচয় অল্পদিনের নয়। রাজেক যখন বেঁচে ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যখন কাজকর্ম করত মোতালেফ, তখন থেকেই এ বাড়িতে তার আনাগোনা, তখন থেকেই জানাশোনা দুজনের। কিন্তু সেই জানা-শোনার মধ্যে কোন গভীরতা ছিল না। মাঝে মাঝে একটু হাল্‌কা ঠাট্টা তামাসা চলত, কিন্তু তার বেশী এগুবার কথা মনেই পড়েনি কারো। মোতালেফের ঘরে ছিল বউ, মাজুখাতুনের ঘরে ছিল স্বামী। । স্বভাবটা একটু কঠিন আর কাটখোট্টা ধরনেরই ছিল রাজেকের। ভারি কড়া-কড়া চাঁছা-ছোলা ছিল তার কথাবার্তা। শীতের সময় কুড়িতে কুড়িতে রসের হাঁড়ি আনত মাজুখাতুনের উঠানে আর মাজুখাতুন সেই রস জ্বাল দিয়ে করত পাটালিগুড়। হাতের গুণ ছিল মাজুখাতুনের। তার তৈরী গুড়ের সের দু'পয়সা বেশি দরে বিক্রী হতো বাজারে। রাজেক ঘরে যাওয়ার পর পাড়ার বেশির ভাগ খেজুর গাছই গেছে মোতালেফের হাতে। দু'এক হাঁড়ি রস কোনবার ভদ্রতা ক'রে তাকে খেতে দেয় মোতালেফ কিন্তু আগেকার মত হাঁড়িতে আর ভরে যায় না তার উঠান। গতবার মাসখানেক তাকে রস জ্বাল দিতে দিয়েছিল মোতালেফ। চুক্তি ছিল দু' আনা ক'রে পয়সা দেবে প্রতি সেরে, কিন্তু মাসখানেক পরেই সন্দেহ হয়েছিল মোতালেফের মাজুখাতুন গুড় চুরি ক'রে রাখছে, অন্য কাউকে দিয়ে গোপনে গোপনে বিক্রী করাচ্ছে সেই গুড়, ষোল আনা জিনিষ পাচ্ছে না মোতালেফ। ফলে কথান্তর মনান্তর হয়ে সে বন্দোবস্ত ভেস্তে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তার ঘরে রসের হাঁড়ি পাঠাবার প্রস্তাব নিয়ে আসেনি মোতালেফ, মাজুখাতুনকেই নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এমন প্রস্তাব পাড়ার আধ-বুড়োদের দলের আরো করেছে দু'একজন কিন্তু মাজুখাতুন কান দেয়নি তাদের কথায়। ছেলে ছোকরাদের মধ্যে যারা একটু বেশি বাড়াবাড়ি রকমের ইয়ার্কি দিতে এসেছে তাদের কান কেটে নেওয়ার ভয় দেখিয়েছে মাজুখাতুন। কিন্তু মোতালেফের প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাকে যেন তেমনভাবে তাড়ান যায় না। তাকে তাড়ালেও তার কথাগুলি ফিরে ফিরে আসতে থাকে মনের মধ্যে। পাড়ায় এমন চমৎকার কথা বলতে পারে না আর কেউ, অমন খাপসুরৎ মুখও কারোও নেই, অমন মানানসই কথাও নেই কারো মুখে।

মোতালেফকে আরো আসতে হোল দু'এক সন্ধ্যা, তারপর নীল রঙের জোলাকী শাড়ি পরে, রঙ-বেরঙের কাঁচের চুড়ি হাতে দিয়ে মোতালেফের পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো মাজুখাতুন।

ঘরদোরের কোন শ্রী ছাঁদ নেই, ভারি অপরিষ্কার আর অগোছালো হয়ে রয়েছে সব।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে মাজুখাতুন লেগে গেল ঘরকন্নার কাজে। ঝাঁট দিয়ে দিয়ে জঞ্জাল দূর করল উঠানের, লেপেপুঁছে ঝক্ঝকে তক্তকে ক'রে তুলল ঘরের মেঝে।

কিন্তু ঘর আর ঘরণীর দিকে তাকাবার সময় নেই মোতালেফের, সে আছে গাছেগাছে। পাড়ায় আরো অনেকের—বোসেদের, বাঁড়ুয্যেদের গাছের বন্দোবস্ত নিয়েছে মোতালেফ। গাছ কাটছে, হাঁড়ি পাতছে, হাঁড়ি নামাচ্ছে, ভাগ ক'রে দিচ্ছে রস। পাকাটির একখানা চালা তুলে দিয়েছে মাজুবানুকে মোতালেফ উঠানের পশ্চিমদিকে। সারে সারে উনান কেটে তার ওপর বড় বড় মাটির জালা বসিয়ে সেই চালাঘরের মধ্যে বসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রস জ্বাল দেয় মাজুবানু। জ্বালানির জন্যে মাঠ থেকে খড়ের নাড়া নিয়ে আসে মোতালেফ, জোগাড় করে আনে খেজুরের শুকনো ডাল। কিন্তু তাতে কি কুলোয়। মাজুবানু এর ওর বাগান থেকে জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে আনে ঝাঁকা ভরে ভরে, পলো ভরে ভরে, বিকেলে বসে বসে দা দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে শুকনো ডাল কাটে জ্বালানির জন্যে। বিরাম নেই বিশ্রাম নেই, খাটুনি গায়ে লাগে না, অনেকদিন পরে মনের মত কাজ পেয়েছে মাজুবানু, মনের মত মানুষ পেয়েছে ঘরে।

ধামা ভরে ভরে হাটে-বাজারে গুড় নিয়ে যায় মোতালেফ, বিক্রি ক'রে আসে চড়া দামে! বাজারের মধ্যে সেরা গুড় তার। পড়ন্ত বেলায় ফের যায় গাছে গাছে হাঁড়ি পাততে। তল্লা বাঁশের এককেটি ক'রে চোঙা ঝুলতে থাকে গাছে। সকালে রসের হাঁড়ি নামিয়ে ঝরার চোঙা বেঁধে দিয়ে যায় মোতালেফ। সারাদিনের ময়লা রস চোঙাগুলির মধ্যে জমে থাকে। চোঙা বদলে গাছ চেঁছে হাঁড়ি পাতে বিকেলে এসে। চোঙার ময়লা রস ফেলা যায় না। জ্বাল দিয়ে চিটে গুড় হয় তাতে তামাক মাখবার। বাজারে তাও বিক্রি হয় পাঁচ আনা ছ' আনা সের। দু'বেলা দু'বার ক'রে এতগুলি গাছে উঠতে নামতে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে মোতালেফের, পৌষের শীতেও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝড়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। সকালবেলায় রোমশ বুকের মধ্যে ঘামের ফোঁটা চিক চিক করে। পায়ের নিচে দুর্বার মধ্যে চিক চিক করে রাত্রির জমা শিশির। মোতালেফের দিকে তাকিয়ে পাড়াপড়শীরা অবাক হয়ে যায়। চিরকালই অবশ্য খাটিয়ে মানুষ মোতালেফ কিন্তু বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে, দিনরাত এমন কলের মত পরিশ্রম করতে এর আগে তাকে দেখা যায় নি কোনদিন। ব্যাপারটা কি? গাছ কাটা অবশ্য মনের মত কাজই মোতালেফের, কিন্তু পছন্দসই মনের মানুষ কি সত্যিই এল ঘরে?

সেরা গাছের সবচেয়ে মিষ্টি দু' হাঁড়ি রস আর সের তিনেক পাটালি গুড় নিয়ে মোতালেফ গিয়ে একদিন উপস্থিত হোল চরকান্দায় এমেল শেখের বাড়িতে। সেলাম জানিয়ে এলেমের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখলে রসের হাঁড়ি, গুড়ের সাজি, তারপর

কোঁচার খুঁটের বাঁধন খুলে বের করল পাঁচখানা দশ টাকার নোট, বলল, 'অর্ধেক আগাম দিলাম মেঞাসাব।'

এলেম বলল, 'আগাম কিসের ?'

মোতালেফ বলল, 'আপনার মাইয়ার—'

তাজা করকরে নোট বেছে নিয়ে এসেছে মোতালেফ। কোণায়, কিনারে চুল পরিমাণ ছিঁড়ে যায় নি কোথাও, কোন জায়গায় ছাপ লাগে নি ময়লা হাতের। নগদ পঞ্চাশ টাকা। নোটগুলির ওপর হাত বুলোতে বুলোতে এলেম বলল, 'কিন্তু এখন আর টাকা আগাম নিয়া আমি কি করব মেঞা? তুমি তো শোনলাম নেকা কইরা নিছ রাজেক মেরধার কবিলারে। সতীনের ঘরে যাবে ক্যান্ আমার মাইয়া। যাইয়া কি ঝগড়া আর চিল্লাচিল্লি করবে, মারামারি কাটাকাটি কইরা মরবে দিন রাইত।'

মোতালেফ মুচকে হাসল। বলল, 'তার জৈন্যে ভাবেন ক্যান্ মেঞাসাব। গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে, মাজুখাতুনও তদ্দিন আছে আমার ঘরে। দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ হইয়া যাবে উইড়া।'

এলেম শেখ জলচৌকি এগিয়ে দিল মোতালেফকে বসতে, হাতের হুঁকোটা এগিয়ে ধরল মোতালেফের দিকে, তারিফ ক'রে বলল, 'মগজের মধ্যে তোমার সাঁচাই জিনিষ আছে মিঞা, সুখ আছে তোমার সাথে কথা কইয়া, কাম কইরা।'

ফুলবানুকেও একবার চোখের দেখা দেখে যেতে অনুমতি পেল মোতালেফ। আড়াল থেকে দেখতে শুনতে ফুলবানুর কিছু বাকী ছিল না। তবু মোতালেফকে দেখে ঠোঁট ফুলালো ফুলবানু, 'বেসবুর কেডা হইল মেঞা? এদিকে আমি রইলাম পথ চাইয়া আর তুমি ঘরে নিয়া ঢুকাইলা আর একজনারে।'

মোতালেফ জবাব দিল, 'না ঢুকায়ে করি কি!'

মানের দায়ে জানের দায়ে বাধ্য হয়ে তাকে এই ফন্দি খুঁজ্তে হয়েছে। ঘরে কেউ না থাকলে পানি-চুনি দেয় কে, প্রাণ বাঁচে কি ক'রে। ঘরে কেউ না থাকলে রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী করে কে। আর সেই গুড় বিক্রি ক'রে টাকা না আনলেই বা মান বাঁচে কি ক'রে।

ফুলবানু বলল, 'বোঝলাম, মানও বাঁচাইলা, জানও বাঁচাইলা, কিন্তু গায়ে যে আর একজনের গন্ধ জড়াইয়া রইল তা ছাড়াবা কেমনে।'

মনে এলেও মুখফুটে এ কথাটা বলল না মোতালেফ যে, মানুষ চ'লে গেলে তার গন্ধ সত্যিই আর একজনের গায়ে জড়িয়ে থাকে না, তা যদি থাকত তা'হলে সে গন্ধ তো ফুলবানুর গা থেকেও বেরুতে পারত। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে মোতালেফ ঘুরিয়ে জবাব

দিল, বলল, 'গন্ধের জন্য ভাবনা কি ফুলবিবি। সোডা সাবান কিনা দেব বাজার গুনা। ঘাটের পৈঠায় পা ঝুলাইয়া বসব তোমারে লইয়া। গতর গুনা ঘইসা ঘইসা বদ্ গন্ধ উঠাইয়া ফেইলো।'

মুখে আঁচল চাপতে চাপতে ফুলবানু বলল, 'সাঁচাই নাকি ?'

মোতালেফ বলল, 'সাঁচা না ত কি মিছা ? শুইঙ্গা দেইখো তখন নতুন মাইন্ষের নতুন গন্ধে ভুর ভুর করবে গতর। দক্ষিণা বাতাসে চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে ভুর ভুর করবে, কেবল সবুর কইরা থাক আর দুইখান মাস।'

ফুলবানু আর একবার ভরসা দিয়ে বলল, 'বেসবুর মানুষ ভাইবো না আমারে।'

যে কথা সেই কাজ মোতালেফের, দু'মাসের বেশি সবুর করতে হোল না ফুলবানুকে। গুড় বেচে আরও পঞ্চাশ টাকার জোগাড় হতেই মোতালেফ মাজুখাতুনকে তালাক দিল। কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে পাড়াপড়শীকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। মাজুবিবির স্বভাব-চরিত্র খারাপ। রাজেকের দাদা ওয়াহেদ মৃধার সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার ভারি আপত্তিকর।

মাজুখাতুন জিভ কেটে বলল, 'আউ আউ, ছি ছি! তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতিমেঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরী তোমার মনে ? গুড়ের সময় পিপড়ার মত লাইগা ছিলা, আর গুড় যাই ফুরাইল অমনি দূর্ দূর্!'

কিন্তু অত কথা শোনবার সময় নেই মোতালেফের ; ধৈর্যও নেই।

আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পরে এল বসন্ত, মাজুখাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের মতই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিঃশ্বাসে। পাড়াপড়শী বলল, 'এবার মানাইছে, এবাব সাঁচাই বাহার খোলছে ঘরের।'

ফুর্তির অন্ত নেই মোতালেফের মনে। দিনভর কিষাণ কামলা খাটে। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই এসে আঁচল ধরে ফুলবানুর, 'থুইয়া দাও তোমার রান্ধন-বাড়ন ঘর-গেরস্থালি। কাছে বস আইসা।'

ফুলবানু হাসে, 'সবুর সবুর! এ কয়মান কাটাইলা কি কইরা মেঞা ?'

মোতালেফ জবাব দেয়, 'খেজুর গাছ লইয়া।'

নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ফুলবানুর, একটু নিঃশ্বাস নিয়ে হেসে বলে, 'তুমি আবার সেই গাছের কাছেই ফিরা যাও। 'গাছি'র আদর গাছেই সইতে পারে।'

মোতালেফ বলে, 'কিন্তু 'গাছি'র কাছেও যে গাছের রস দুই-চাইর মাসেই ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বার মাস চোয়াইয়া চোয়াইয়া পড়ে।'

মাজুখাতুন ফের গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেকের পড়ো-পড়ো শণের কুঁড়েয়। ভেবেছিল আগের মতই দিন কাটবে। কিন্তু দিন যদিবা কাটে, রাত কাটে না। মোতালেফ তার সর্বনাশ ক'রে ছেড়েছে। পাড়াপড়শীরা এসে সাড়ম্বরে সালঙ্কারে মোতালেফ আর ফুলবানুর ঘরকন্নার বর্ণনা করে, একটু বা সকৌতুক তিরস্কারের স্বরে বলে, 'নাঃ, বউ বউ কইরা পাগল হইয়াই গেল মানুষটা। যেখানেই যায় বউ ছাড়া আর কথা নাই মুখে।'

বুকের ভিতরটা জ্বলে ওঠে মাজুখাতুনের। মনে হয় সেও বুঝি হিংসায় পাগল হয়ে যাবে। বুক ফেটে মরে যাবে সে।

দিন কয়েক পরে রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদই নিয়ে এল সম্বন্ধ। বউটার দশা দেখে ভারি মায়া হয়েছে তার। নদীর ওপারে তালকান্দায় নাদির শেখের সঙ্গে দোস্তি আছে ওয়াহেদের। এক মাল্লাই নৌকা বায় নাদির। মাসখানেক আগে কলেরায় তার বউ মারা গেছে। অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে গেছে অনেকগুলি। তাদের নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছে বেচারা। কমবয়সী ছুঁড়ী-টুড়িতে দরকার নেই তার। সে হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলেমেয়ের যত্ন-আত্তি করবে না কিছু। তাই মাজুখাতুনের মত একটু ভারিক্কি ধীরবুদ্ধি গৃহস্থঘরের বউই তার পছন্দ। তার ওপর নির্ভর করতে পারবে সে।

মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'বয়স কত হবে তার?'

ওয়াহেদ জবাব দিল, 'তা আমাগো বয়সীই হবে। পঞ্চাশ, এক-পঞ্চাশ।'

মাজুখাতুন খুশী হয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ ওই রকমই তার চাই। কম বয়সে তার আস্থা নেই। বিশ্বাস নেই যৌবনকে।

তারপর মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'গাছি না তো সে? খাজুর গাছ কাটতে যায় না তো শীতকালে?'

ওয়াহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'গাছ কাটতে যাবে ক্যান্! ওসব কাম কোন কালে জানে না সে। বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে। ক্যান্ বউ, 'গাছি' ছাড়া, রসের ব্যাপারী ছাড়া কি তুমি নিকা বসবা না কারো সাথে?'

মাজুখাতুন ঠিক উল্টো জবাব দিল। রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালের খেজুর গাছের ধারে কাছেও যে যায় না, নিকা যদি বসে মাজুখাতুন তার সঙ্গেই বসবে। রসের ব্যাপারে মাজুখাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে।

ওয়াহেদ বলল, 'তাহ'লে কথাবার্তা কই নাদিরের সাথে? সে বেশি দেরি করতে চায় না।'

মাজুখাতুন বলল, 'দেরি কইরা কাম কি।'

দেরি বেশি হোলও না, সপ্তাহখানেকের মধ্যে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। নাদিরের সঙ্গে এক মাল্লাই নৌকায় গিয়ে উঠল মাজুখাতুন। পার হয়ে গেল নদী।

মোতালেফ স্ত্রীকে বলল, 'আপদ গেল। পেত্নীর মত ফাঁৎ ফাঁৎ নিশ্বাস ফেলত, চোখের উপর শাপমন্যি করত দিন রাইত, তার হাতগুনা তো বাঁচলাম, কি কও ফুলজান?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'পেত্নীরে খুব ডরাও বুঝি মেঞা?'

মোতালেফ বলল, 'না, এখন আর ডরাই না। পেত্নী তো ছুইটাই গেল। এখন চোখ মেললেই তো পরী। এখন ডরাই পরীরে।'

'ক্যান্, পরীরে আবার ডর কিসের তোমার?'

'ডর নাই? পাখা মেইলা কখন্ উরাল দেয় তার ঠিক কি!'

ফুলবানু বলল, 'না মেঞা, পরীর আর উরাল দেওয়ার সাধ নাই। সে তার পছন্দসই সব পাইয়া গেছে। এখন ঘরের মাইন্‌ষের পছন্দ আর নজরডা বরাবর এই রকম থাকলে হয়।'

মোতালেফ বলল, 'চৌখ যদ্দিন আছে, নজরও তদ্দিন থাকবে।'

দিনরাত ভারি আদরে তোয়াজে রাখল মোতালেফ বউকে। কোন্ মাছ খেতে ভালোবাসে ফুলবানু হাটে যাওয়ার আগে শুনে যায়, ট্যাঁকে পয়সা না থাকলে কারো কাছ থেকে পয়সা ধার ক'রে কেনে সেই মাছ। ডিমটা, আনাজটা, তরকারিটা যখন যা পারে হাট-বাজার থেকে নিয়ে আসে মোতালেফ। ফি হাটে আনে পান সুপারি খয়ের মসলা।

ফুলবানু বলে, 'অত পান আন ক্যান্, তুমিতো বেশি ভক্ত না পানের। দিন রাইত খালি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ তামাক টানো।'

মোতালেফ বলল, 'পান আনি তোমার জৈন্যে। দিন ভইরা পান খাবা, খাইয়া খাইয়া ঠোঁট রাঙ্গাবা।'

ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, 'ক্যান্, আমার ঠোঁট এমনে বুঝি রাঙ্গা না যে, পান খাইয়া রাঙ্গাইতে হবে? আমি পান সাইজা দেই, তুমিই বরং দিন রাইত খাওয়া ধর। তামাক খাইয়া খাইয়া কালা হইয়া গেছে ঠোঁট, পানের রসে রাঙ্গাইয়া নেও।'

মোতালেফ হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙ্গা হয় না, আর-একজনের পানখাওয়া-ঠোঁটের রস লাগে।'

নিজের ভুঁই ক্ষেত নেই মোতালেফের। মল্লিকদের, মুখুজ্যেদের কিছু কিছু জমি বর্গা চষে। কিন্তু ভালো কৃষাণ বলে তেমন খ্যাতি নেই, জমির পরিমাণ, ফসলের পরিমাণ অন্য সকলের মত নয়। সিকদারদের, মুন্সীদের জমিতে কিষাণ খাটে। পাট নিড়ায়, পাট কাটে, পাট জাগ দেয়, ধোয়, মেলে। ভারি খেজমৎ খাটুনি খাটে। ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায় মোতালেফের। বর্গা জমির পাট খুব বেশি ওঠে না উঠানে। সিকদাররা, মুন্সীরা

নগদ টাকা দেয়। কেবল মল্লিক আর মুখুজ্যেদের বিবেচারেক ভুঁইয়ের ভাগের ভাগ অধেক জাগ-দেওয়া পাট নৌকা ভরে খালের ঘাটে এনে নামায় মোতালেফ। পাট ছাড়াতে ভারি উৎসাহ ফুলবানুর। কিন্তু মোতালেফ সহজে তাকে পাটে হাত দিতে দেয় না, বলে, 'কষ্ট হবে, পচা গন্ধ হবে গায়।'

ফুলবানু বলে, 'হইল তো বইয়া গেল, রউদে পুইড়া তুমি কালা কালা হইয়া গেলা, আর আমি পাট নিতে পারব না, কষ্ট হবে! কেমনতরো কথাই যে কও তুমি মেঞা।'

নিজেদের পাট তো বেশি নয়, পাকাটি পাওয়া যায় না। ফুলবানুর ইচ্ছা, অন্য বাড়ির জাগ-দেওয়া পাটও সে ছাড়িয়ে দেয়। সেই ছাড়ানো পাটের পাটখড়িগুলি পাওয়া যাবে তাহ'লে। কিন্তু মোতালেফ রাজী নয় তাতে, অত কষ্ট বউকে সে করতে দেবে না।

আশ্বিনের শেষের দিকে আউস ধান পাকে। অন্যের নৌকায় পরের জমিতে কিষাণ খাটতে যায় মোতালেফ। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে ধান কাটে। আঁটিতে আঁটিতে ধান তুলতে থাকে নৌকায়। কিন্তু মোমিন, করিম, হামিদ, আজিজ—এদের সঙ্গে সমানে সমানে কাচি চলে না তার। হাত বড় 'ধীরচ' মোতালেফের, জলে ভারি কাতর মোতালেফ। একেক দিন পিঠে বগলে জেঁাক লেগে থাকে। ফুলবানু তুলে ফেলতে ফেলতে বলে, 'জেঁাকটাও ছাড়াইতে পার না মেঞা, হাত তো ছিল সঙ্গে?'

মোতালেফ বলে, 'ধান কাটার হাত দুইখান সাথেই ছিল, জেঁাক ফেলাবার হাত থুইয়া গেছিলাম বাড়িতে।'

যেখানে যেখানে জেঁাকে মুখ দিয়েছিল সে সব জায়গায় সযত্নে চুন লাগিয়ে দেয় ফুলবানু, আরো পাঁচজন কৃষাণের সঙ্গে ধান মলন দেয় মোতালেফ, দেউনি পায় পাঁচভাগের একভাগ। ধামায় ক'রে পৈকায় ক'রে ধান নিয়ে আসে। ফুলবানু ধান রোদে দেয়, কুলোয় ক'রে চিটা ঝেড়ে ফেলে ধান থেকে। মোতালেফ একেকবার বলে ভারি কষ্ট হয় বউ, না?'

ফুলবানু বলে, 'হ, কষ্টে একেবারে মইরা গেলাম না! কার নাগাল কথা কও তুমি মেঞা। গেরস্থ ঘরের মাইয়া না আমি, না সাঁচাই আশমান গুনা নাইমা আইছি!'

বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন কার্তিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের দিন মোতালেফের বতরের দিন। কিন্তু শীতটা এবার যেন একটু বেশি দেরিতে এসেছে। তা হোক, আরো বেশি গাছের বন্দোবস্ত নিয়ে পুষিয়ে ফেলবে মোতালেফ। খেজুর গাছের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ে। এ কাজে নাম ডাক আছে মোতালেফের, এ কাজে গাঁয়ের মধ্যে সে-ই সেরা। এবারেও বাঁড়ুজ্যেদের কুড়িদেড়েক গাছ বেড়ে গেল।

গাছ কাটবার ধুম লেগে গেছে। একটুও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই মোতালেফের, সময় নেই তেমন ফুলবানুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি রঙ্গরসিকতার। ধার দেনা শোধ দিতে হবে, সারা বছরের রসদ জোগাড় করতে হবে রস বেচে, গুড় বেচে। দৈত্যের মত দিনভর খাটে মোতালেফ, আর বিছানায় গা দিতে না দিতেই ঘুমে ভেঙ্গে আসে চোখ। দু'হাতে ঠেলে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফুলবানু, কিন্তু মানুষকে নয়, যেন আস্ত একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। অসাড়ে ঘুমোয় মোতালেফ। শব্দ বেরোয় নাক থেকে, আর কোন অঙ্গ সাড়া দেয় না। মোটা কাঁথার মধ্যেও শীতে কাঁপে ফুলবানু। মানুষের গায়ের গরম না পেলে, এত শীত কি কাঁথায় মানে ?

কেবল রস আনলেই হয় না, রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানি চাই। এখান থেকে ওখান থেকে শুকনো ডালপাতা আর খড় বয়ে আনে মোতালেফ। ফুলবানুকে বলে, 'রস জ্বাল দেও,—যেমন মিঠা হাত, তেমন মিঠা গুড় বানান চাই, সেরা আর সরেস জিনিস হওয়া চাই বাজারের।'

কিন্তু হাঁড়িতে হাঁড়িতে রসের পরিমাণ দেখে মুখ শুকিয়ে যায় ফুলবানুর, বুক কাঁপে। দু'এক হাঁড়ি রস জ্বাল দিয়েছে সে বাপের বাড়িতে, কিন্তু এত রস এক সঙ্গে সে কোনদিন দেখেনি, কোনকালে জ্বাল দেয়নি।

মোতালেফ তার ভঙ্গি দেখে হেসে বলে, 'ভয় কি, আমি তো আছিই কাছে কাছে—আমারে পুছ কইরো, আমি কইয়া কইয়া দেব। মনের মইধ্যে যেমন টগবগ করে রস, জ্বালার মধ্যেও তেমন করা চাই।'

কিন্তু উনানের কাছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে মনের রস শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, নিবু নিবু করে উনানের আগুন, তেমন ক'রে টগবগ করে না জ্বালার রস। সারা দুপুর উনানের ধারে বসে বসে চোখ-মুখ শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, রূপ ঝলসে যায়, তবু গুড় হয় না পছন্দমত। কেমন যেন নরম নরম থাকে পাটালি, কোনদিন বা পুড়ে তেতো হয়ে যায়।

মোতালেফ রুক্ষস্বরে বলে, 'কেমনতরো মাইয়ামানুষ তুমি, এত কইয়া কইয়া দেই, বুঝাইলে বোঝ না। এই গুড় হইছে, এই নি খইদ্দারে কেনবে পয়সা দিয়া ?'

ফুলবানু একটু হাসতে চেষ্টা করে বলে, 'কেনবে না ক্যান। বেচতে জানলেই কেনবে।'

মোতালেফ খুশি হয় না হাসিতে, বলে, 'তাইলে তুমি যাইয়া ধামা লইয়া বইস বাজারে। তুমি আইস বেইচা। খাপসুরৎ মুখের দিকে চাইয়া যদি কেনে, গুড়ের দিকে চাইয়া কেনবে না।'

বোকা তো নয় ফুলবানু, অকেজো তো নয় একেবারে। বলতে বলতে শেখাতে

শেখাতে দু'চারদিনের মধ্যেই কোনরকমে চলনসই গুড় তৈরী করতে শিখল ফুলবানু, বাজারে গুড় একেবারে অচল রইল না। কিন্তু দর ওঠে না গতবারের মত, খদ্দেররা তেমন খুশি হয় না দেখে।

পুরোন খদ্দেররা একবার গুড়ের দিকে চায় আর একবার মুখের দিকে চায় মোতালেফের, 'এ তোমার কেমনতরো গুড় হইল মিঞা? গত হাটে নিয়া দেখলাম গেল বছরের মত সোয়াদ পাইলাম না। গেলবারও তো গুড় খাইছি তোমার, জিহ্বায় যেন জড়াইয়া রইছে, আস্বাদ ঠোঁটে লাইগা রইছে। এবার তো তেমন হইল না। তোমার গুড়ের থিকা এবার ছদন শেখ, মদন সিকদারের গুড়ের সোয়াদ বেশি।'

বুকের ভিতর পুড়ে যায় মোতালেফের, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। গতবারের মত এবার স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে। কেন, সে তো কম খাটছে না, কম পরিশ্রম করছে না গতবারের চেয়ে। তবু কেন স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে, তবু কেন দর উঠছে না, লোকে দেখে খুশি হচ্ছে না, খেয়ে খুশি হচ্ছে না, গুড়ের সুখ্যাতি করছে না তার। অত নিন্দামন্দ শুনতে হচ্ছে কেন, কিসের জন্যে?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রস জ্বাল দেওয়ার কৌশলটা আরো বার কয়েক মোতালেফ বলল ফুলবানুকে, 'হাতায় কইরা কইরা ফোঁটা দেইখো নামাবার সময় হইল কিনা, ঢালবার সময় হইল কিনা রস।'

ফুলবানু বিরক্ত বিরস মুখে বলে, 'হ হ, চিনছি। আর বক বক কইরো না, ঘুমাইতে দেও মাইন্‌ষেরে।'

হঠাৎ মোতালেফের মনে পড়ে গেল মাজুখাতুনের কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে রস আর গুড়ের কত আলোচনা করেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। মাজুখাতুন এমন ক'রে মুখ ঝামটা দেয়নি, অস্বস্তি জানায়নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে, সাগ্রহে শুনেছে, সানন্দে কথা বলেছে।

পরদিন বেলা প্রায় দুপুর নাগাদ কোত্থেকে একবোঝা জ্বালানি মাথায় ক'রে নিয়ে এল মোতালেফ, এনে রাখল সেই পাকাটির চালার দোরের কাছে, 'কি রকম গুড় হইতেছে আইজ ফুলজান?'

কিন্তু চালার ভিতর থেকে কোন জবাব এল না ফুলবানুর। আরো একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বিস্মিত হয়ে চালার ভিতর মুখ বাড়াল মোতালেফ, কিন্তু ফুলবানুকে সেখানে দেখা গেল না। কি রকম গন্ধ আসছে যেন ভিতর থেকে, জালার মধ্যে ধরে গেল নাকি গুড়? সারে সারে গোটা পাঁচেক জালায় রস জ্বাল হচ্ছে, টগবগ করছে রস জালার মধ্যে। মুখ বাড়িয়ে দেখতে এগিয়ে গেল মোতালেফ। যা ভেবেছে ঠিক তাই। সবচেয়ে দক্ষিণ-

কোণের জালাটার রস বেশি জ্বাল পেয়ে কি ক'রে যেন ধরে গেছে একটু। পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে ভিতর থেকে। বুকের মধ্যে জ্বালাপোড়া ক'রে উঠল মোতালেফের, গলা চিরে চীৎকার বেরুল,—'কই, কোথায় গেলি হারামজাদী?'

ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ফুলবানু। বেলা বেশি হয়ে যাওয়ায় দু'দিন ধ'রে স্নান করতে পারেনি। শীতের দিন না নাইলে গা কেমন চড চড করে, ভালো লাগে না। তাই আজ একটু সোডা সাবান মেখে ঘাট থেকে সকাল সকাল স্নান ক'রে এসেছে। নেয়ে এসে পরেছে নীল রঙের শাড়ি। গামছায় চুল নিংড়ে তাতে তাড়াতাড়ি একটু চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছিল ফুলবানু, মোতালেফের চিৎকার শুনে ত্রস্তে চিরুনি হাতেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভিজে চুল লুটিয়ে রইল পিঠের ওপর। এক মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে মুঠি ক'রে ধরল সেই ভিজে চুলের রাশ, 'হারামজাদী, গুড পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর গুনা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী, এই জৈন্যই গুড খারাপ হয় আমার, অপমান হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জৈন্যে!'

ফুলবানু বলতে লাগল, 'খবরদার, চুল ধইরো তাই বইলা, গায়ে হাত দিও না।'

'ও, হাতে মারলে ম্যান যায় বুঝি তোমার?' পায়ের কাছ থেকে একটা ছিটা কঞ্চি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে হাতে বুকে পিঠে মোতালেফ সপাসপ চালাতে লাগল ফুলবানুর সর্বাঙ্গে, বলল, 'কঞ্চিতে মারলে তো আর মান যাবে না শেখের ঝির। হাতেই দোষ, কঞ্চিতে তো আর দোষ নাই।'

ভারি বদরাগী মানুষ মোতালেফ। যেমন বেসবুর বেবুঝ তার অনুরাগ, রাগও তেমনি প্রচণ্ড।

খবর পেয়ে এলেম শেখ এল চরকান্দা থেকে। জামাইকে শাসালো, বকলো, ধমকালো, মেয়েকেও নিন্দামন্দ কম করল না।

ফুলবানু বলল, 'আমারে লইয়া যাও বা'জান তোমার সাথে—এমন গোঁয়ার মাইন্‌ষের ঘর করব না আমি।'

কিন্তু বুঝিয়ে শুঝিয়ে এলেম রেখে গেল মেয়েকে। একটু আস্কারা দিলেই ফুলবানু পেয়ে বসবে, আবার তালাক নিতে চাইবে। কিন্তু গৃহস্থঘরে অমন বারবার অদল-বদল আর ঘর-বদলানো কি চলে। তাতে কি মান-সম্মান থাকে সমাজের কাছে। একটু সবুর করলেই আবার মন নরম হয়ে আসবে মোতালেফের। দু'দণ্ড পরেই আবার মিলমিশ হয়ে যাবে। স্বামীস্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি। দিনে হয়, রাত্রে মেটে। তা নিয়ে আবার একটা ভাবনা।

মিটে গেলও। খানিক বাদেই আবার যেচে আপোষ করল মোতালেফ। সেধেভজে

মান ভাঙাল ফুলবাহুর। পরদিন ফের আবার উনানের পিঠে রস জ্বাল দিতে গিয়ে বসল ফুলবানু। দুপুরের পর ধামায় বয়ে গুড় নিয়ে চলল মোতালেফ হাটে। যাবার সময় বলল, 'এই দুইটা মাস কাইটা গেলে কোন রকমে তোমার কষ্ট সারে ফুলজান।'

ফুলবানু বলল, 'কষ্ট আবার কি।'

কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার কথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দুজনের কারোরই মুখ দিয়ে। সে কথার ধরণ আলাদা, ধ্বনি আলাদা; তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারো। বলে ও জানে, শোনে ও জানে।

হাটের পর হাট যায়, রসের বতর প্রায় শেষ হয়ে আসে; গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না মোতালেফের, দর চড়ে না; কিন্তু তা নিয়ে ফুলবানুর সঙ্গে বাড়ি এসে আর তর্কবিতর্ক করে না মোতালেফ, চুপ ক'রে ব'সে হুঁকোয় তামাক টানে। খেজুর গাছ থেকে নল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস পড়ে হাঁড়ির মধ্যে। ভোরে গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে আনে মোতালেফ, কিন্তু গত বছরের মত যেন সুখ নেই মনে, স্ফূর্তি নেই। ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাকাটির মত খট খট করে মন, দুপুরের রোদের মত খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটা ফোঁটা নেই রসের। রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয় দুনিয়া।

একদিন হাটের মধ্যে দেখা হয়ে গেল নদীর পারের নাদির শেখের সঙ্গে।

'সেলাম মেঞাসাব।'

'আলেকম আসলাম।'

মোতালেফ বলল, 'ভালো তো, সব ছাওয়ালপান ভালো তো—?'

মাজুখাতুনের কথাটা মুখে এনেও আনতে পারলে না মোতালেফ। নাদির একটু হেসে বলল, 'হ মেঞা, ভালোই আছে সব। খোদার দয়ায় চইলা যাইতেছে কোন রকম সকমে।'

মোতালেফ একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'ছাওয়ালপানের জৈন্যে সের দুই তিন গুড় লইয়া যান না মেঞা। ভালো গুড়।'

নাদির হেসে বলল, 'ভালোই তো। আপনার গুড় তো কোনকালে খারাপ হয় না।'

হঠাৎ ফস ক'রে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় মোতালেফের, 'না মেঞা, সে দিনকাল আর নাই।'

অবাক হয়ে নাদির এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে মোতালেফের দিকে। এ কেমনতরো ব্যাপারী! গুড় বেচতে এসে নিজের গুড়ের নিন্দা কি কেউ নিজে করে?

নাদির জিজ্ঞাসা করে, 'কত কইরা দিতেছেন?'

'দামের জৈন্যে কি? দুই সের গুড় দিলাম আপনার পোলাপানরে খাইতে। কয়ন জানি, চাচায় দিছে।'

নাদির ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না না না, সে কি মেঞা, আপনার বেচবার জিনিস, দাম না দিয়া নেব ক্যান আমি।'

মোতালেফ বলে, 'আইচ্ছা, নিয়া তো যায়ন আইজ। খাইয়া গ্যাখেন। দাম না হয় সামনের হাটে দিবেন।'

বলতে বলতে কথাগুলো যেন মুখে আটকে যায় মোতালেফের। এবারেও জিনিস কাটাবার জন্যে বলতে হয় এসব কথা, গুড়ের গুনপনার কথা ঘোষণা করতে হয় খদ্দেরের কাছে, কিন্তু মনে মনে জানে কথাগুলি কত মিথ্যা, পরের হাটে এসব খদ্দের আর পারতপক্ষে গুড কিনবে না তার কাছ থেকে, ভিড় করবে না তার গুড়ের ধামার সামনে।

অনেক বলা-কওয়ায় একসের গুড় কেবল বিনা দামে নিতে রাজী হয় নাদির, আর বাকি দু' সেরের পয়সা গুনে দেয় জোর ক'রে মোতালেফের হাতের মধ্যে।

মাজুখাতুন সব শুনে আগুন হয়ে ওঠে রেগে, 'ও গুড় ছাওয়ালপানরে খাওয়াইতে চাও খাওয়াও, কিন্তু আমি ও গুড় ছোব না হাত দিয়া, তেমন বাপের বিটি না আমি।'

এক হাট যায়, নাদির আর ঘেঁষে না মোতালেফের গুড়ের কাছে। মাজুখাতুন নিষেধ ক'রে দিয়েছে নাদিরকে; 'খবরদার, ওই মাইনষের সাথে যদি ফের খাতির নাতির কর, আমি চইলা যাব ঘরগুনা। রাইত পোহাইলে আমারে আর দেখতে পাবা না।'

মনে মনে মাজুখাতুনকে ভারি ভয় করে নাদির। কাজে-কর্মে সরেশ, কথায়-বার্তায় বেশ, কিন্তু রাগলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না বিবির।

দিন কয়েক পরে একদিন ভোরবেলায় দু'টি সেরা গাছের সবচেয়ে ভালো দু' হাঁড়ি রস নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে খেয়া নৌকায় উঠে বসল মোতালেফ। ঝাপ্টানো কুলগাছটার পাশ দিয়ে ঢুকল গিয়ে নাদিরের উঠানে; 'বাড়ি আছেন নাকি মেঞা?'

হুঁকো হাতে নাদির বেরিয়ে এল ঘর থেকে; 'কেডা? ও, আপনে? আসেন, আসেন। আবার রস নিয়া আইছেন ক্যান্ মেঞাসাব?'

মোতালেফকে আমন্ত্রণ জানাল বটে নাদির কিন্তু মনে মনে ভারি শঙ্কিত হয়ে উঠল মাজুখাতুনের জন্য। যে মানুষের নাম গন্ধ শুনতে পারে না বিবি, সেই মানুষ নিজে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে। না জানি, কি কেলেঙ্কারিটাই ঘটায়।

যা ভেবেছে নাদির, তাই। বাঁখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোতালেফকে দেখতে পেয়েই স্বামীকে ঘরের ভিতর ডেকে নিল মাজুখাতুন, তারপর মোতালেফকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল,

'যাইতে কও এ বাড়িগুনা, এখনই নাইমা যাইতে কও। একটুও কি সরম ভরম নাই মনের মইধ্যে? কোন মুখে উঠল আইসা এখানে?'

নাদির ফিস ফিস ক'রে বলে, 'আস্তে, আস্তে,—একটু গলা নামাইয়া কথা কও বিবি। শো•তে পাবে। মাইন্‌ষের বাড়ি মানুষ আইছে, অমন কইরা কথা কয় নাকি। কুকুর বিড়ালডারেও তো অমন কইরা খেদায় না মাইন্‌ষে।'

মাজুখাতুন বলল, 'তুমি বোঝবা না মিঞা, কুকুর বিড়াল থিকাও অধম থাকে মানুষ, শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়। পুছ কর, রস খাওয়াইতে যে আইল আমারে, একটুও ভয়ডর নাই মনে, একটুও কি নাজসরম নাই?'

একটা কথাও মৃদুস্বরে বলছিল না মাজুখাতুন, তার সব কথাই কানে যাচ্ছিল মোতালেফের। কিন্তু আশ্চর্য, এত কঠিন, এত রূঢ় ভাষাও যেন তাকে ঠিক আঘাত করছিল না, বরং মনে হচ্ছিল এত নিন্দা-মন্দ, এত গালাগাল তিরস্কারের মধ্যেও কোথায় যেন একটু মাধুর্য মিশে আছে; মাজুখাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহত বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রস।

দাওয়ায় উঠে রসের হাঁড়ি দু'টি হাত থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে মোতালেফ নাদিরকে ডেকে বলল, 'মেঞাসাব, শোনবেন নি একটু?'

নাদির লজ্জিত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'বসেন মেঞা, বসেন। ধরেন, তামাক খান।'

নাদিরের হাত থেকে হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিল মোতালেফ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ লাগিয়ে টানতে শুরু করল না, হুঁকোটা হাতেই ধরে রেখে নাদিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার হইয়া একটা কথা কন বিবিরে।'

নাদির বলল, 'আপনেই ক'ন না, দোষ কি তাতে।'

মোতালেফ বলল, 'না, আপনেই কন, কথা কবার মুখ আমার নাই। ক'ন যে মোতালেফ মেঞা খাওয়াবার জৈন্যে আনে নাই রস, সেইটুক্ বুদ্ধি তার আছে।'

নাদির কিছু বলবার আগেই মাজুখাতুন ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠল, 'তয় কিসের জৈন্যে আনছে?'

নাদিরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই জবাব দিল মোতালেফ, বলল, 'কয়ন যে আনছে জ্বাল দিয়া দুইসের গুড় বানাইয়া দেওয়ার জৈন্যে। সেই গুড় ধামায় কইরা হাটে নিয়া যাবে মোতালেফ মিঞা। নিয়া বেচবে অচেনা খইদ্দারের কাছে। এ বছর একছটাক পছন্দসই গুড়ও তো সে হাটে বাজারে বেচতে পারে নাই। কেবল গাছ বাওয়াই সার হইছে তার।'

গলাটা যেন ধরে এল মোতালেফের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড় বড় আর-দুটি চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠেছে। চুপ ক'রে তাকিয়ে রইল মোতালেফ। আর কিছু বলা হোল না।

হঠাৎ যেন হুঁস হোল নাদির শেখের, বলল, 'ও কি মেঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না? আগুননি নিবা গেল কইলকার?'

হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, 'না মেঞাভাই, নেবে নাই।'

অবতরণিকা

সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই সরোজিনী একটু কান খাড়া ক'রে রইলেন।

তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'এই বোধ হয় এলেন আমাদের মহারাণী। রাত আটটার সময় ঘরের লক্ষ্মীর ঘর-সংসারের কথা মনে পড়ল। দুদিন ধরে মেয়েটার যে জ্বর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই! যাই খুলে দিয়ে আসি।'

সরোজিনী উঠে দাঁড়ালেন।

সুব্রত তক্তপোষে বসে এতক্ষণ স্ত্রীর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগগুলি শুনছিল, সরোজিনীকে বাধা দিয়ে বলল: 'তুমি থাক মা, আমিই যাচ্ছি।'

হাত দেড়েক দূরে পূবদিকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে রুগ্না নাত্নির কাছে বসে প্রিয়গোপাল দুহাতের তেলোয় ঠেকিয়ে অভ্যস্তভাবে হাঁটু নাড়ছিলেন, মন্তব্য করলেন: 'এত রাত্রি অবধি কোন্ গৃহস্থের বউ বাইরে থাকে! এমন যে হবে, আমি আগেই জানি। আস্তাবলের ঘোড়া আর ঘরের বউ-ঝি'র রাশ যদি একবার ছেড়ে দেওয়া যায়—'

সরোজিনী বাধা দিয়ে বললেন: 'থাক্ থাক্। তোমাদের কার যে কতখানি মুরোদ, তা দেখা গেছে।'

তারপর ছেলের দিকে তাকালেন সরোজিনী: 'যাচ্ছ, যাও। কিন্তু খবরদার, ভোম্বল, বোউয়ের সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া করতে যেয়ো না, অশান্তি বাধিয়ে দরকার নেই। ধীরে সুস্থে যা বলবার পরে বলো।'

সুব্রত কোন কথা না বলে সদরের দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে দিতেই আরতি ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল: 'কতক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছি! আচ্ছা বাতিক হয়েছে মনোমোহনবাবুর; সন্ধ্যা হতে না হতেই সব সদর বন্ধ করবেন, তারপর দোর ভেঙে ফেললেও কেউ খুলতে আসবে না।'

সুব্রত স্ত্রীর দিকে তাকাল।

সদর দরজায় আলোর ব্যবস্থা নেই। দোর খুললেই গলির মোড়ের গ্যাসের আলোর খানিকটা এসে পড়ে, সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল, আরতির চেহারা—দীর্ঘ দোহারা গড়ন। এই ক'মাসের মধ্যে যেন আরো ইঞ্চিখানেক বেড়েছে আরতি। কিংবা হাই হীল পরেছে বলেই ওই রকম মনে হয়। বাঁ হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। ডান হাতে একটা গ্লুকোজের টিন, আরো কি একটা ঠোঙা। মাথায় আঁচল নেই।

সুব্রত বলল: 'সন্ধ্যা হয়ে গেছে দু ঘণ্টা আগে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

স্বামীর প্রশ্নের ভঙ্গিতে আরতি একটু হাসল, বলল: 'বেড়াচ্ছিলাম লেকের ধারে।'

সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিল সুব্রত।

আরতি বলল: 'ওকি, চললে নাকি! দাঁড়াও, হাতের জিনিষগুলো ধরো দেখি একটু।'

সুব্রত বলল: 'কেন?'

আরতি বলল: 'আহা ধরই না, মান যাবে না তাতে, মাথার কাপড়টা একটু ঠিক ক'রে নেই, বাবা মা রয়েছেন।'

সুব্রত বলল: 'সারা রাস্তাটাই যখন বেঠিক হয়ে আসতে পারলে, ঘরে ওটুকু লজ্জা না দেখালেও চলবে।'

হন্ হন্ ক'রে সুব্রত চলে গেল ভিতরে।

একটু বাদেই আরতি এসে ঘরে ঢুকল। দেখা গেল সুব্রতের সাহায্য ছাড়াই সে মাথায় আঁচল টানবার ব্যবস্থা করতে পেরেছে।

'কেমন আছে মন্দিরা?'

হাতের জিনিষগুলি তাকের ওপর নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল আরতি।

প্রথমে কেউ কোন কথা বলল না। একটু বাদে সুব্রত বলল: 'সে খোঁজে তোমার কি কোন দরকার আছে?'

আরতি এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে এসে ঘুমন্ত মেয়ের কপালে একটু হাত রেখে বলল: 'জ্বর এখন অনেক কম।'

পাশের ঘরে সুব্রতের ছোট ভাইবোনেরা পড়া মুখস্থ করছিল, আরতির সাড়া পেয়ে ছুটে এল নীলা, নন্তু আর সন্তু।

সন্তুর আগ্রহ সবচেয়ে বেশী: 'কমলা লেবু এনেছ বউদি?'

আরতি তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল: 'এনেছি।'

প্রিয়গোপাল ধমক দিয়ে উঠলেন: 'যাও পড় গিয়ে। রোজ কমলালেবু তোমাদের না হলেই চলবে না, না?'

আরতি শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে বলল : 'লেবুগুলো আজ একটু সস্তাতেই পেয়ে গেলাম বাবা। কাল যে লেবু আপনি আটটা ক'রে এনেছিলেন, আজ তার চেয়েও বড় লেবু দশটা এনেছি টাকায়। আপনাকে ঠকিয়ে দিয়েছিল।'

প্রিয়গোপাল বললেন : 'বুড়ো মানুষকে সবাই ঠকায় মা। কিন্তু জিনিষ কিনতে হয়, দিনের বেলায় কিনবে। কেনা-কাটার জন্য এত রাত করা কি ভালো?'

আরতি এবার গম্ভীরভাবে জবাব দিল : 'কেনা-কাটার জন্য রাত হয়নি বাবা। অফিসের কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। তাছাড়া ট্রামের গোলমালেও দেরি হোল খানিকটা।'

সরোজিনী এতক্ষণ বাদে কথা বললেন : 'মেয়েকে কি আর রাখা যায়? সারা বিকেল ভ'রে মা আর মা।'

আরতি এ কথার কোন জবাব না দিয়ে আটপৌরে একখানা শাড়ি তুলে নিল আলনা থেকে। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সুব্রত এল পিছনে পিছনে : 'দাঁড়াও, কথা শোন।'

আরতি তাড়াতাড়ি দরজার পাল্লাটা ঠেলে দিয়ে বলল : 'কাপড়টা ছাড়তে দাও আগে।'

সুব্রত রূঢ়কণ্ঠে বলল : 'পরে ছেড়ো, আগে জবাব দাও আমার কথার। আমার নিষেধ সত্ত্বেও কেন অফিসে গেলে, আজ?'

আরতি ঘরের ভিতর থেকে জবাব দিল : 'না গেলে চলবে কি ক'রে? মেয়ের অসুখের জন্যে বলছ তো? মন্দিরার সামান্য জ্বর, কি পেটের অসুখের জন্য তুমি কামাই করতে পার অফিস? তা ছাড়া একা তো ফেলে যাইনি তোমার মেয়েকে। বাড়িতে আদর-যত্নের মানুষ আরো না ছিল, তা তো নয়।'

সুব্রত একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : 'অফিস তোমাকে আমি কামাই করতে বলিনি। যে অফিসের কাজে রাত আটটা অবধি তোমাকে বাইরে থাকতে হয়, বাড়ির কারো সুবিধা-অসুবিধা অসুখ-বিসুখ পর্যন্ত দেখা চলে না, তেমন অফিস তোমাকে কিছুতেই করতে দেব না আমি।'

আরতি বলল : 'দেরি তো আর রোজই হয় না। তা ছাড়া চাকরি না করলে চলবেই বা কেমন ক'রে?'

সুব্রত বলল : 'কি ক'রে চলবে, তা আমি বুঝব। এতদিন যে চাকরি করনি, তাতে অচল ছিল সংসার? তা ছাড়া আমার যখন ভালো একটা পার্ট-টাইম জুটে গেছে, কি দরকার তোমার অত কষ্ট ক'রে?'

শেষ কথাটা বেশ নরম সহানুভূতির সুরে বলল সুব্রত।

শোয়ার সময় প্রসঙ্গটা ফের একবার উঠল। খাওয়া-দাওয়া সেরে পান-মুখে ঘরে যখন শুতে এল আরতি, হাতের বইটা বন্ধ ক'রে এক-আধটু একথা-ওকথার পর সুব্রত স্ত্রীকে বলল : 'কালই একটা রেজিগ্‌নেশন লেটার ছেড়ে দিয়ো।'

আরতি এবার অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল : 'আমার চাকরি ছাড়া নিয়ে তোমার অত মাথা ব্যথা হয়েছে কেন বল তো?'

স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল সুব্রত ; তারপর শান্তভাবে বলল : 'আজকাল কথাবার্তার চমৎকার ধরণ হয়েছে তোমার!'

আরতি লজ্জিত ভঙ্গিতে চুপ ক'রে থেকে একটু হাসল : 'সত্যি মেজাজ ঠিক থাকে না সব সময়। আজ কি রকম ঘোরাঘুরিটা গেছে, তাতো জানো না। সেই টালিগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। দেরী তো সেই জন্যই হোল। দেরি হলেও কাজ হয়েছে, ইন্দিরারা নেবে একটা মেশিন, বার টাকা রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে গেল।'

আরতি ভেবেছিল, কথাটায় সুব্রত আগের মত একটু উল্লাস বোধ করবে। কিন্তু তেমন কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সুব্রত তেমনি নীরস আর গম্ভীরভাবে বলল : 'রাত আটটা অবধি যেখানে সেখানে তোমার ঘুরাঘুরি করেও দরকার নেই, রোজগারেরও দরকার নেই।'

আরতি বলল : 'টাকা এলে তো ফেলা যায় না! সংসারের কাজেই লাগে।'

সুব্রত জবাব দিল : 'কিন্তু টাকার চাইতেও বড প্রেস্টিজ্, বড পারিবারিক শান্তি। তা ছাড়া আমি চাইনে আমার স্ত্রী শুধু একটা টাকা-আনা-পাইয়ের থলি হয়ে থাক।'

আরতি একটু হাসল : 'তুমি আজকাল ঠিক যেন অনেকটা বাবার মত কথা বলছ।'

বাবা মানে সুব্রতর বাবা।

সুব্রত স্ত্রীর মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল : 'হ্যাঁ, বলছি। বলবার দরকার হয়েছে বলেই বলছি। সংসারের প্রয়োজনে তোমাকে আমিই চাকরি নিতে বলেছিলাম, আবার দরকার বুঝে আমিই তোমাকে ছাডতে বলছি। চাকরি তোমাকে ছাড়তে হবে।'

'বেশ।' ব'লে আরতি পাশ ফিরল এবং তারপর আর কথা বলল না।

এ মৌনতা যে সম্মতির লক্ষণ নয়, তা বুঝতে দেরি হোল না সুব্রতের। আশ্চর্য, দিনের পর দিন আরতির জেদ বেড়ে যাচ্ছে! অর্থের লোভ যাচ্ছে সীমা ছাড়িয়ে। একে তো সুব্রত কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারে না। দিনরাত আরতির এই অর্থোপার্জনের চেষ্টাকে ভারি স্থূল মনে হয় সুব্রতের, মনে হয় আরতির সমস্ত সুকুমার বৃত্তি দিনের পর দিন টাকার নীচে তলিয়ে যাচ্ছে।

মাস ছয়েক আগে গরজটা অবশ্য প্রথমে স্বব্রতই দেখিয়েছিল। অফিস থেকে যা মাইনে পায়, তা মাসের পনের দিন যেতে না যেতেই নিঃশেষ হবার উপক্রম হয়। টিউশনির টাকাটা নিয়মিত আদায় হয় না। ফলে পরের দুই সপ্তাহের রেশন আর বাজারের টাকাটা সংগ্রহ করতে প্রতি মাসে প্রাণান্ত হয় সুব্রতের। সংসারে রোজগেরে সে একা হলেও পোষ্য অনেক। নিজেরা স্বামী-স্ত্রী, আর দুটি ছেলে-মেয়ে। তা ছাড়া আছেন বুড়ো বাপ, মা, আর ছোট ছোট তিনটি ভাইবোন। ভাই দুটিকে স্কুলে দিতে হয়েছে। উল্টোডাঙ্গার সরু গলির মধ্যে একতলায় ছোট ছোট দুখানা ঘর। তারই ভাড়া গুণতে হয় মাসে মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা। সাংসারিক খরচ ছাড়াও অসুখ-বিসুখের খরচ আছে। লোক-লৌকিকতাও কিছু না দেখলে চলে না। ফলে প্রতি মাসে জমার চেয়ে খরচের অঙ্ক ভারী হয়ে ওঠে।

টাকা ধারের চেষ্টায় বেরিয়ে একদিন বন্ধুর বাড়ি থেকে শুধু হাতে ফিরে এল সুব্রত। আরতি স্বামীর মুখ দেখেই সব বুঝতে পেরেছিল।

'দেখা হোল না বুঝি?'

সুব্রত বিরস মুখে বলল: 'দেখা আর হবে না কেন? পরিমল দুঃখ জানিয়ে বলল, তার হাতও এখন ভারি ঠেকা। বলল, দুজনে মিলে চাকরি করছে, তবু সংসারের খরচের সঙ্গে পেরে উঠছে না।'

কথাটা কানে বাধল আরতির, বলল: 'দুজনে মিলে মানে?'

সুব্রত বলল: 'দুজনে মিলে মানে মাধুরীও চাকরি করে আজকাল। মাস্টারি করে কি একটা গার্লস্ স্কুলে। সবাই তো আর আমাদের মত নয়।'

আরতি চুপ ক'রে রইল। খোঁচাটা হজম করল মনে মনে। পরিমলবাবুর স্ত্রী মাধুরীও তাহ'লে চাকরি নিয়েছে! এর আগে আরো কয়েকজন বন্ধু-পত্নীর চাকরির খবর দিয়েছে সুব্রত। কারো মাস্টারি, কারো কেরাণীগিরি।

একটু বাদে সুব্রত ফের বলল: 'পুরুষ হোক, মেয়ে হোক, আজকাল বসে খাওয়ার কি জো আছে কারো? চেষ্টাচরিত্র করে তুমিও যদি একটা জোটাতে পারতে মন্দ হোত না। বিশ হোক, পঁচিশ হোক, যা আনতে, তাতেই সাহায্য হোত আমার।'

আরতি একটু বিস্মিত হয়ে বলল: 'আমি? আমাকে চাকরি দেবে কে? তা'ছাড়া তোমরাই কি আর করতে দেবে?'

সুব্রত বলল: 'করতে নামলে কেউ কি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারে?'

এতদিন আরতি সংসারের খরচ কমাবার চেষ্টা ক'রে এসেছে। জমা-খরচের খাতা খুলে খুঁটে খুঁটে দেখেছে, ব্যয়ের অঙ্কটার কোথায় ছাঁটাই চলে। স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে

সপ্তাহে তিনদিন নিরামিষ-ভোজনের ব্যবস্থা করেছে, জামা কাপড়ের বেশির ভাগ নিজেরা কেচে নিয়ে কমিয়েছে ধোপার খরচ, কয়লার ব্যয় হ্রাস করবার জন্য সকালে বিকালে গুল দিতে বসেছে নিজের হাতে। প্রতি মাসেই ভেবেছে, সংসারের খরচটা অনেক কম হবে এমাসে। কিন্তু ঠিক সেই মাসেই হয়ত ছিঁড়ে গেছে শ্বশুরের পাঞ্জাবী, কাচতে ফেঁসে গেছে শাশুড়ীর শাড়ি, না হয় মেয়েটা পড়েছে কঠিন অসুখে, কিংবা পাড়ার সিনেমা-হাউসে এসেছে খুব ভালো একখানা বই। লুকিয়ে লুকিয়ে একা তো আর দেখবার জো নেই, সাধ-আহ্লাদ সকলেরই আছে।

এবার তার খেয়াল হোল, কেবল খরচ কমানো নয়, আয় বাড়াবার দিকেও সে চেষ্টা করতে পারে। একেবারে মূর্খ তো সে নয়। ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিল বিয়ের আগে। কলেজেও পড়েছিল বছর খানেক। তারপর বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুর-বাড়ি গাঁয়ে, সেখানে স্কুল-কলেজ নেই। বাবা বলেছিলেন : 'বেশ তো, যদি পড়তেই চাস, একটা বছর আমার বাসায় থেকে পড়ে পরীক্ষা দে। ভয় নেই খরচ নেব না তোর শ্বশুরের কাছ থেকে।'

কিন্তু প্রিয়গোপাল রাজী হননি। আরতির বাবাকে ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন : 'বেয়াই মেয়েকে যা শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন, আগে তাই হজম করতে পারি কি না দেখি, তারপর না হয় স্কুল কলেজে পাঠাব।'

পুত্রবধূকে পূজোর ঘর থেকে গোয়ালঘর পর্যন্ত সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে বলেছিলেন : 'সব ভার এবার থেকে তোমার মা। স্কুল বল, কলেজ বল সংসারের চেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় আর নেই। এখানে হাতে-কলমে যা শিখবে, দশটা ইউনিভার্সিটির সাধ্য নেই তা শেখায়।'

তারপর বছর দুয়েকের মধ্যেই জমিদারী সেরেস্তার চাকরি গেল প্রিয়গোপালের। খরচা বেশী পড়ায় গরুটা বিক্রি করে দিতে হোল। পূজোর মণ্ডপে ধূপ-দীপ থেকে নৈবেদ্যের থালা সবই সংক্ষিপ্ত হয়ে এল। আরো পরে এল পাকিস্তানের হাঙ্গামা। পাঁচজন ভদ্র প্রতিবেশীর দেখাদেখি প্রথমত বাড়ির বয়স্থা বউ-ঝিদের কলকাতায় পাঠালেন প্রিয়গোপাল। কিন্তু সুব্রত লিখল : 'দু'জায়গায় খরচ চালাবার আমার সাধ্য নেই। মাকে নিয়ে আপনিও চলে আসুন।'

স্থাবর অস্থাবর খানিকটা ছাড়িয়ে, খানিকটা জ্ঞাতি ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে রেখে শেষ পর্যন্ত প্রিয়গোপালও চলে এলেন ছেলের বাসায়। ভেবেছিলেন, দু'এক মাস থেকেই চলে যাবেন। কিন্তু যাই যাই ক'রে আর নড়তে পারলেন না। আজ নিজের অসুখ, কাল নাতির, তা ছাড়া সহস্র অভাব-অনটনের মধ্যেও কেমন এক ধরনের সুখও আছে শহরে থেকে। যৌবনের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন প্রায় সবাই এসে জড়ো হয়েছে শহরে! আনা চারেক

পয়সা কোন রকমে পকেটে করতে পারলেই এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চলে যাওয়া যায়। দেখা-সাক্ষাৎ চলে পুরনো বন্ধু-বান্ধব, কুটুম্ব-স্বজনের সঙ্গে চায়ের দোকানে, রেশনের লাইনে নতুন আলাপও মন্দ লাগে না। মাঝে মাঝে আক্ষেপ করেন প্রিয়গোপাল : 'শহর তো নয়, সপ্তরথীর চক্রব্যূহ। এখানে কেবল ঢুকবার পথ আছে বেরুবার রাস্তা নেই।'

আরতি বলে : 'বেরুবেন কেন বাবা? থাকুন আমাদের কাছে।'

তারপর আরতি দৈনিক কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপনে চোখ বুলায়, আর খামের ওপর পোষ্টবক্সের নম্বর উদ্ধৃত করে পাঠায় আবেদন পত্র।

সে আবেদন নিজেই রচনা ক'রে দেয় সুব্রত, অফিস থেকে নিজেই টাইপ করিয়ে আনে। আরতি শুধু সুন্দর হাতে নাম স্বাক্ষর করে। মাঝে মাঝে বেশ লাগে। যেন নতুন রোমাঞ্চের সন্ধান পেয়েছে দুজনে। নতুন ধরনের যৌথ সৃষ্টি!

কিন্তু লক্ষ্য কেবল ভ্রষ্টই হয়, ভেদ আর হয় না। দু' একটা স্কুল থেকে 'ইণ্টারভিউ' হয়ত আসে। তারপর দেখা সাক্ষাৎ ক'রে আসবার পর শোনা যায়, তারা সেই পোষ্টে একজন গ্রাজুয়েটকে পেয়ে গেছে।

অবশেষে এল ক্যানিং ষ্ট্রীটের মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী ফার্ম থেকে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ। কিছুদিন আগে কয়েকজন ভদ্র ঘরের তরুণী ডিমনষ্ট্রেটর চেয়ে ছিলেন তাঁরা। মাইনে সুরুতে একশ, ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে।

সুব্রত একবার বলল : 'কিন্তু—'

আরতির মনেও যে খুঁৎখুঁতি একটু না ছিল; তা নয়। মাস্টারি কেরাণীগিরির মত তেমন সম্ভ্রান্ত চাকরি নয়। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এ চাকরির কথা কি তেমন ক'রে বলা যাবে?

'কিন্তু মাইনে তো একশ?' আরতির ফের মনে পড়ে গেল।

এদিকে সুব্রতের টিউশনির টাকাটা নিয়মিত আদায় হচ্ছে না। ছাত্রটি ফেল করেছে। এক মাসের টাকা হয়ত মারাই যাবে।

একটু চুপ ক'রে থেকে সুব্রত বলল : 'আজকাল অবশ্য বাছাবাছির কোন মানে হয় না, কত জনে কত কি করছে!'

আরতি ম্লানভাবে একটু হাসল : 'আমি তো বাছতে চাইনে। কিন্তু যারা নেবে, তারা তো বেছেই নেবে? ওদের কি পছন্দ হবে আমাকে? ইণ্টারভিউতে কি পারব?'

সুব্রত বলল : 'তা কি ক'রে বলব? তবে আমি যদি বোর্ডে থাকতাম, হয়ত পছন্দই করতাম।'

আরতি হাসল : 'হুঁ, তাই না আরো কিছু। তুমি সব চেয়ে আগে অপছন্দ করতে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে বাঙ্গালীরা নিজের স্ত্রীর মুখই নাকি সবচেয়ে সুন্দর দেখত। এখন তাদের চোখ বদলেছে।'

অসুস্থ শ্বাশুড়ীকে দেখবার নাম ক'রে সুব্রতই অফিসে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল ক্যানিং স্ট্রীটে। চারতলা বাড়ির দোতলা থেকে ঝুলছে মুখার্জী এণ্ড মুখার্জীর সাইন বোর্ড। করিডোরে একদল মেয়ের ভিড়।

সুব্রত নিচ থেকেই বলল : 'যাও ভিড়ে পড়' গিয়ে।'

আরতি বলল : 'তুমি যাবে না সঙ্গে ?'

সুব্রত বলল : 'হ্যাঁ তোমার ইণ্টারভিউ হোক, আর আমি স্বামী হয়ে সাক্ষী গোপালের মত দাঁড়িয়ে থাকি ! অত ঘাবড়াচ্ছ কেন, ভয় কিসের ? আরো কত মেয়ে এসেছে। ক'জন স্বামীকে নিয়ে এসেছে সঙ্গে ?'

অবশ্য স্বামী অনেকের হয়নি। সুব্রত আড়চোখে অন্যান্য সাক্ষাৎ-প্রার্থিনীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। বেশির ভাগই কুমারী।

সুব্রত বলল : 'তা ছাড়া অফিসে জরুরী কাজ আমার। দেরি করলে চলবে না।'

তবু আরতি আর একটু কাছে ঘেঁষে বলল : 'কি জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করবে বল দেখি ? ভয়-ভয় করছে, পারব কি পারব না।'

সুব্রত সাহস দিল স্ত্রীকে : 'না পারবার কি আছে ? দোকানের কাজে এমন কিছু সবজান্তা মেয়ের তো আর দরকার নেই। চটপটে চালাক চতুর আছ কিনা, তাই হয়ত দেখে নেবে। তা ছাড়া, যে জিনিষটা ওরা চেয়েছে, সেই সেলাই টেলাই তো তোমার ভালোই জানা আছে, ভাবনা কি ?'

যেতে যেতে আর একবার পিছন ফিরে তাকাল সুব্রত। আরতির মুখ দেখে মনে হোল, বেশ একটু ঘাবড়ে গেছে। মায়াও হোল খানিকটা। নিজের প্রথম দিককার ইণ্টারভিউ-গুলির কথা মনে পড়ল। তখন সুব্রতও কি ঘাবড়াত না? হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল একটু। হাতে সময় থাকলে আর কাজের চাপ না থাকলে, আরতির কাছেই সে থেকে যেতে পারত।

অফিস থেকে ফিরে আসবার পর চায়ের সঙ্গে স্বামীকে সুখবর দিল আরতি—মেয়ে ছিল তেইশ জন, গ্রাজুয়েটও ছিল জন দুই, তাদের মধ্যে চার জনকে পছন্দ হয়েছে মুখার্জী এণ্ড মুখার্জীর, আরতি সেই চারজনের অন্যতম।

সুব্রত চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল : 'কি ক'রে বুঝলে যে তুমি মনোনীতাই হয়েছ, অমনোনীতাদের দলে পড়নি ?'

আরতি একটু হাসল : 'তা কি আর বুঝতে বাকি থাকে ? তা ছাড়া সিনিয়র মুখার্জী

একরকম স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন আসবার সময়। আমার সংসারে কে কে আছে, ছেলে পুলে রেখে আসতে পারব কিনা, অভিভাবকদের মত হবে কিনা—খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞেস করবার পর বলেই দিলেন, আমাকে তাঁদের পছন্দ হয়েছে। দু'তিন দিনের মধ্যেই এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার আসবে।'

এলও তাই। ইংরাজীতে চিঠি এল আরতি মজুমদারের নামে। মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী তাকে অস্থায়িভাবে অফিস এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হিসাবে নিয়োগ করতে পেরে আনন্দিত হয়েছেন। কাজের যোগ্যতা দেখে তিনমাস পরে স্থায়ী পদের অধিকার দেওয়া হবে।

সুব্রত জিজ্ঞেস করল : 'কাজটা কি ?'

'কাজ এমন কিছু শক্ত নয়। ষ্টেশনারী ষ্টোর্স ছাড়াও বোম্বাই থেকে নূতন ধরনের এক উলেন মেশিনের এজেন্সী নিয়েছেন মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী। সে মেশিনে শীতের সোয়েটার আর জাম্পার তৈরী হবে। গরমের দিনেও তৈরী করা যাবে মেয়েদের নানা ধরনের অঙ্গাবরণ। প্রথমে যন্ত্রের ব্যবহার শিখে নিতে হবে কোম্পানীরই এক মেমসাহেবের কাছে, তারপর ব্যবহার শিখিয়ে দিয়ে আসতে হবে ক্রেতাদের মানে ক্রেত্রীদের ঘরে ঘরে গিয়ে। আড়াইশ টাকা দামের মেশিন। প্রধানত সখেরই জিনিস। অবস্থাপন্ন বড লোকের ঘরে ছাড়া বড় একটা বিক্রী হবে না। মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী এমন মেয়ে চান, যে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘর থেকে এলেও অভিজাত পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে রুচিসম্মতভাবে আলাপ ব্যবহার করতে পারবে। যাদের চেহারা চোখকে পীড়িত করে না, আচার-আচরণ, কথাবার্তা মনকে প্রসন্ন করে, এমন মেয়েদের চেয়েছিলেন মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী।'

আরতি সে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু এরপর আর প্রসঙ্গটা বাপ-মার কাছে গোপন রাখলে চলে না।

সুব্রত স্ত্রীকে বলল : 'তুমিই বল বাবাকে। তোমাকে স্নেহ করেন।'

আরতি বলল : 'আর তোমাকে বুঝি করেন না ? আমি কিছুতেই ওঁদের কাছে বলতে পারব না।'

সুতরাং সুব্রতই বলল।

প্রিয়গোপালের গড়গড়া থেমে গেল। খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন : 'একথা তুমি উচ্চারণ করলে কি ক'রে ভোম্বল ! আমি বেঁচে থাকতে মজুমদার বাড়ির বউ চাকরি করবে, আর আমি তা চোখ মেলে দেখব ?'

সরোজিনী বললেন : 'তোমরা যে ভিতরে ভিতরে একটা কিছু পাকিয়ে তুলছ, তা আমি গোড়াতেই টের পেয়েছিলাম। বেশ করুক বউ চাকরি। আমি কিন্তু এখানে আর থাকব না। আমাকে তাহলে পটলডাঙ্গায় দিয়ে এস।'

পটলডাঙ্গায় সরোজিনীর বড় ভাইয়ের বাসা।

বন্ধু-বান্ধব মহলে চাকুরিবতী স্ত্রী কার কার ঘরে আছে, তার একটা লম্বা তালিকা দিলে সুব্রত।

কিন্তু প্রিয়গোপাল অটল থেকে বললেন : 'যারা করে, তারা করুক। আমাদের বংশে ওসব কোনদিন হয়নি, হবেও না।'

সুব্রতেরও একগুঁয়েমি কম নয়। প্রথমে খুব একচোট তর্ক-বিতর্ক করল বাপের সঙ্গে। তারপর হঠাৎ বলে বসল : 'বেশ, তাহলে সংসার কিভাবে চলবে, তাই ভাবুন। আমি আমার সাধ্যমত করছি। এক মুহূর্তও তো বসে নেই। কিন্তু এত বড় সংসার একার চাকরিতে চালিয়ে নেওয়া কারোরই সাধ্য নেই আজকাল।'

প্রিয়গোপাল কি বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। হাতুড়ির ঘায়ের মত লাগল একটা কথা—এত বড় সংসার !

ভোম্বলের সংসার বড় করেছেন তাঁরাই—স্বামী-স্ত্রী আর নাবালক তিনটি ছেলেমেয়ে। সেই খোঁটাই কি তাঁকে দিচ্ছে ভোম্বল ? এত বড় আঘাত বুড়ো রুগ্ন বাপকে ভোম্বল দিতে পারল ? সে কি কোনদিন ছোট ছিল না ? তাকে কি খাইয়ে পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে প্রিয়গোপাল মানুষ করে তোলেন নি ? নাকি মায়ের পেট থেকে পড়েই ভোম্বল বড় হয়েছে, চাকরি করতে শিখেছে ?

দুঃখে, ভাবাবেগে খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে কথা বেরুল না প্রিয়গোপালের। তারপর যে অস্ত্র ছেলে তাঁকে ছুঁড়ে মেরেছে, সেই অস্ত্রেই তিনি ফের আঘাত করলেন ছেলেকে। দেখিয়ে দিলেন তারও পৌরুষের, তারও ক্ষমতার ক্ষীণতা। বললেন : 'এত বড় সংসার ! কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সবশুদ্ধ সাত আটটি খাইয়ে। কিন্তু সতের বছর বয়সে চোদ্দটি পোষ্য আমি একা ঘাড়ে নিয়েছিলাম ভোম্বল। তার জন্য তোমার মাকে চাকরিতে পাঠাতে হয়নি !'

সুব্রত জবাব দিতে পারত, সেদিন আর নেই। তাছাড়া স্ত্রীর চাকরি করা সে মর্যাদা-হানিকরও মনে করে না। কিন্তু কোন কথা না বলে নিজের সঙ্কল্পে অটুট রইল। প্রিয়গোপাল বললেন, তিনি স্ত্রী আর ছোট ছেলেদের নিয়ে দেশে চলে যাবেন। কিন্তু মাসের শেষে কোথায় পথ-খরচ ? নতুন ইংরেজী মাস না পড়লে সুব্রত তাঁকে যাওয়ার খরচও দিতে পারবে না।

তারপর সুব্রতই জয়ী হোল। বজায় রাখল তার নিজের জেদ। জেদ না যুক্তিমার্গ।

পরদিন শ্বশুর খেলেন না, শাশুড়ী খেলেন না, বেলা ন'টা বাজতে না বাজতে স্বামীর পাতে খেতে বসতে নিজেরও যেন বাধো বাধো লাগল আরতির। সরোজিনী গম্ভীর মুখে পরিবেষণ করে গেলেন। অর্ধেকের বেশি ভাত পড়ে রইল পাতে।

সাধারণত রঙীন বেশবাসই আরতির পছন্দ। কিন্তু সেদিন পরল ফিতে পেড়ে সাদা খোলের শান্তিপুরী। গায়ের সাদা ব্লাউজের হাতায় সামান্য একটু এমব্রয়ডারীর ছোঁয়া, গহনার মধ্যে দু'গাছা করে চুড়ি, আর গলায় সরু হার। মুখে প্রসাধনের ক্ষীণ আভাষ আছে কি নেই। খাওয়ার পরে একটা পান ছাড়া আরতির চলে না, কিন্তু আজ শুধু মুখে তুলল এক টুকরো সুপারীর কুচি। পান খেয়ে অফিসে বেরোন শোভন নয়, তাতে ঠোঁট দুটো লাল হয় ঠিকই, কিন্তু দাঁতের কুন্দশুভ্রতা অক্ষুন্ন থাকে না।

তের বছরের ননদ নীলা এসে কানে কানে বলল : 'বউদি, আজ কিন্তু তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

প্রথমে একটু লজ্জিত হোল আরতি, তারপর সস্নেহে তার গাল টিপে দিল : 'নিন্দুক কোথাকার! অন্যদিন বুঝি খুব কুচ্ছিৎ দেখায়?'

কিন্তু বাসা থেকে বেরুবার মুখে আর এক ফ্যাসাদ বাধল। এক বছরের ছেলে বাবলু তার ছোটপিসীর কোল থেকে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছে, মার কাছে যাবে। এদিকে তিন বছরের মেয়ে মন্দিরা এসে আরতির শাড়ির খুঁট মুঠির মধ্যে চেপে ধরেছে : 'আমি চাকলি করতে যাব মা। আমাকেও নিয়ে যাও!'

আরতি মুখ ফিরিয়ে গোপন করল ছল-ছল চোখ। তারপর ফের মেয়ের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসল : 'যেয়ো, তোমার চাকরি ঠিক হোক আগে, তারপর যেয়ো।'

কিন্তু মন্দিরা এখনই যাবে। তার চাকরি ঠিক হয়ে গেছে। আজই তার 'জয়েন' করা চাই।

প্রিয়গোপাল বাসা থেকে বেরিয়ে গেছেন। কিন্তু সরোজিনী ঘর থেকে বেরুলেন না। জেদ করেই ধরলেন না নাতি-নাতনীকে। বললেন : 'কেন, চাকরি করতে যেতে পারে, ছেলেমেয়ের ব্যবস্থা ক'রে যেতে পারে না? ঝি চাকর রেখে যাক, ছেলেমেয়ে আগলাবে। আমি কারো ছেলেমেয়ে রাখতে পারব না।'

দুঃখে অভিমানে চোখ সরোজিনীরও ছল্-ছল্ ক'রে উঠল : 'আশা ক'রে বিয়ে দিয়েছিলাম ভোম্বলকে, খুব সুখ হোল আমার!'

দাদার ধমক খেয়ে নীলা আর নন্তু সন্তুই জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেল মন্দিরা আর বাবলুকে। গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তা পর্যন্ত ছেলেমেয়ের কান্না ভেসে আসতে লাগল। স্বামীর সঙ্গে ট্রামে উঠে পাশাপাশি বসেও সেই কান্নার শব্দই বাজতে লাগল আরতির কানে।

সুব্রত বলল : 'ব্যাপার কি, বার বার বাইরের দিকে কি দেখছ অমন ক'রে?'

আরতি কুণ্ঠিত কাতর স্বরে বলল : 'মনটা ভারি খারাপ লাগছে। অমনিতে ওরা তো

আমার কাছে মোটেই ঘেঁষে না। ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, কাকা, পিসি—এঁদের কোলে-পিঠেই থাকে। কিন্তু আজ দেখলে তো কাণ্ড?'

সুব্রত ঠোঁটে সিগারেট চেপে সংক্ষেপে জবাব দিল : 'দেখলাম।'

আরতি আর্দ্রস্বরে বলল : 'আজ সারাদিনই ওরা দুজনে বোধ হয় কাঁদবে।'

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সুব্রত হাসল : কেবল কি দু'জন? আরো একজনের চোখের জলে ভেসে যাবে ক্যানিং স্ট্রীট। এমনি ক'রেই চাকরি করবে তুমি?'

কিন্তু দু' সপ্তাহ যেতে না যেতে আরতি সুব্রতকে দেখিয়ে দিল সত্যিই কি ক'রে চাকরি করতে হয়, এমন যে অফিসনিষ্ঠ সুব্রত, সে পর্যন্ত হার মানল। ভোরে উঠে সংসার-যাত্রা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরতির অফিস- যাত্রার প্রস্তুতিও চলতে থাকে। সকালেই স্নান সেরে নেয়, চায়ের পাটটা কোন রকমে সারে, চোখ বুলায় খবরের কাগজে। কিন্তু রান্নাঘরের পাট নিতান্ত অনিবার্য ভাবেই পড়েছে সরোজিনীর ওপর। আরতি মাঝে মাঝে সাহায্য করতে যায়, মাছ তরকারি কুটে, ধুয়ে দেয়। চাকরি নেওয়ার আগে আরতি যেটুকু করত, বড়জোর সেটুকুই করে। রান্নার প্রধান দায়িত্ব নিতে হয় সরোজিনীকেই। কাজ করতে করতে ক্ষোভ করেন সরোজিনী : 'এসেছি হেঁসেল ঠেলতে, হেঁসেল ঠেলেই যাই। ছেলের বিয়ে দিয়ে খুব সুখ হোল আমার।'

প্রায় আটটা থেকেই আরতি নাইতে যাওয়ার তাগিদ দিতে থাকে সুব্রতকে ; বলে : 'এখন ওঠ। এর পর বাথরুম খালি পাবে না। লেট্ হয়ে যাবে অফিসে।'

সুব্রত জবাব দেয় : 'আমার লেট্ হবার ভয় নেই, ঠিক সময় গিয়েই পৌছব। কিন্তু তুমি না হয় লেট্ এক আধ দিন হলেই।'

আরতি যেন শিউরে উঠে : 'ওরে বাবা! হিমাংশুবাবু মোটেই তা পছন্দ করেন না।'

মুখার্জী এণ্ড মুখার্জীর বয়সের দিক থেকেই জুনিয়ার হিমাংশু মুখুয্যে। কিন্তু আধিপত্যে পদমর্যাদায় তাঁরই সিনিয়রিটি। সাহেবী মেজাজের মানুষ, সময় আর নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার দিকে বিশেষ ঝোঁক। এক চোখ এ্যাটেনডেন্‌স্ খাতায়, আর এক চোখ ঘড়ির কাঁটায়। কিন্তু সমান চোখে দেখেন সব কর্মচারীকে। মেয়ে-পুরুষ বলে ভেদ করেন না। মেয়েদের জন্য আলাদা বসবার জায়গা অফিসে আছে, কিন্তু তাই বলে মেয়েদের জন্য আলাদা পক্ষপাত নেই তাঁর মনে। ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়স। দীর্ঘ বলিষ্ঠ গড়ন, রূপবান ঠিক বলা যায় না, কিন্তু স্বাস্থ্যে, সপ্রতিভ বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে রূপের ত্রুটি চোখেই পড়ে না। অবস্থাপন্ন বড় ঘরের ছেলে। বিয়ে করেছেন মধ্যবিত্ত ঘরের একটি এম-এ পাশ মেয়েকে।

'লাভ্-ম্যারেজ।' বলে মৃদু হেসেছিল আরতি : 'একদিন গাড়িতে এসেছিলেন অফিস পর্যন্ত। ভারি মিষ্টি চেহারা।'

হিমাংশু মুখুয্যের চমৎকার স্বাস্থ্য আর তাঁর স্ত্রীর মিষ্টি চেহারা। কিন্তু সবটুকু গর্ব যেন আরতির নিজের। তার বর্ণনার ভঙ্গিতে সেইরকমই মনে হয়েছিল সুব্রতের।

সুব্রতকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে আরতি তার পাতে অসঙ্কোচে বসে যায়, সরোজিনীকে ডেকে বলে : 'দিন মা, কি রান্না হয়েছে। দিন তাড়াতাড়ি।'

এখন আর আরতির পাতে ভাত পড়ে থাকে না। সুব্রতের চেয়েও সে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়, দেরি হয়ে গেলে কোনদিন তার পাশেই আর একখানা থালা নিয়ে বসে পড়ে। সরোজিনী সরে যান। নীলা পরিবেশন করতে করতে মৃদুস্বরে বলে : 'আবার আলাদা কেন? এক সঙ্গে বসে গেলেই পারতে বউদি। বেশ হোত দেখতে।'

খুবই স্বাভাবিক বন্দোবস্ত। তবু কোথায় যেন খোঁচা লাগে সুব্রতের মনে।

তারপরে শাড়ি বদলাবার পালা। তিনদিন বাদে বাদে অফিসের শাড়ি বদলায় আরতি। আর একখানা ধুতিতে সুব্রতকে কমের পক্ষে পাঁচ দিন চালাতে হয়। কথাটা একদিন উল্লেখ করায় আরতি বলেছিল : 'মিঃ মুখার্জী 'শ্যাবিনেস্' বড় অপছন্দ করেন। তিনি নিজেও যেমন 'টিপটপ' থাকেন, নিজের অফিসটিকেও তেমনি রাখতে চান।'

কিন্তু আরতির গর্ব কেবল হিমাংশু মুখার্জীকে নিয়েই নয়। নতুন মেসিনের ক্রেত্রীদে ব্যবহার শেখাতে গিয়ে ভবানীপুর, বালিগঞ্জের নতুন নতুন অভিজাত পরিবারের সঙ্গে প্রায় রোজ আলাপ হয় আরতির। তাঁদের বিচিত্র প্যাটার্নের দোতলা, তেতলা সব বাড়ি। গ্যারেজে গাড়ি পড়ে আছে নতুন নতুন মডেলের, কারো একখানা, কারও বা একাধিক। বাড়ির বড় বড় ঘরগুলি' সুপরিচ্ছন্ন, রুচিসম্মত আসবাবে সাজানো। সুদৃশ্য কাচের আলমারিতে রাশি রাশি বাঁধান বই। দেখলে চোখ মুগ্ধ হয়। মেয়েরা প্রায় সবাই রূপবতী। শিক্ষায়, শালীনতায়, মধুর-স্বভাবা। আরতি যেখানেই যায়, আদর-আপ্যায়ন, খাতির-যত্ন পায় · একদিন গিয়েছিল চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে এক মাড়োয়ারীর বাড়ি। সে বাড়ির একটি সুন্দরী বউ নিয়েছে আরতিদের মেশিন। কেবল বউটিই সুন্দরী নয়, তার স্বামীও রূপবান। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স। মাড়োয়ারী হলে হবে কি ভুঁড়ি নেই। আলাপ-ব্যবহারে ভারি সুজন। আসবার সময় তিনি সস্ত্রীক গাড়ি নিয়ে বেরোলেন। আরতিকেও না তুলে ছাড়লেন না।

সুব্রত ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিল : 'তুমি উঠতে গেলে কেন তাদের গাড়িতে?'

আরতি জবাব দিয়েছে : 'বা রে তাতে কি হয়েছে? ভদ্রলোক .অত ক'রে বললেন, তাছাড়া তাঁর স্ত্রীও তো সঙ্গে ছিলেন। দোষ কি?'

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের খুব কৌতূহল। আরতিদের বাড়ি আর অফিস সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা অবশ্য ইংরেজীতেই হচ্ছিল। তাঁর স্ত্রী ইংরেজী জানেন না, তাঁর সঙ্গে চালাতে হয়েছিল হিন্দী। আর ড্রাইভারটি বাঙালী। ঢাকা জেলার লোক। তার সঙ্গে একেবারে নিজের মাতৃভাষা ব্যবহার করেছিল আরতি।

'এক সঙ্গে তিন-তিনটি ভাষা—তোমার কোনদিন সুযোগ হয়েছে বলবার?'

আত্মপ্রসাদে উচ্ছল, উৎফুল্ল দুটি চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিল আরতি।

'কিন্তু ইংরেজী সত্যি সত্যি বলতে পারলে তো?' সুব্রত সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেছিল।

'কেন পারব না? কলোকিয়াল ইংলিশ এডিথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার বেশ রপ্ত হয়ে গেছে।' জবাব দিয়েছিল আরতি।

এই এডিথের কথাও মাঝে মাঝে শুনেছে সুব্রত। আরতির এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান 'কলিগ'। মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী তাকেও নিয়েছেন। সাহেব পাড়ায় কি অন্যান্য অবাঙালী মহলে যেখানে যেখানে মেশিন বিক্রি হয়, সেখানে যায় এডিথ সিমনস্। বয়সে আরতির চাইতে বড়ই হবে। কিন্তু এমন সেজে-গুজে আসে যে ছোট দেখায়। আরতির কাছে তার রূপ-বর্ণনা শুনতে শুনতে বেঁটে, কালো, ঠোঁটে কড়া লিপষ্টিক আর আঙুলের নখে পালিশ লাগানো একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের রূপ সুব্রতের চোখে ভেসে ওঠে।

সুব্রত সাবধান ক'রে দেয়: 'খবরদার ওসব মেয়ের সঙ্গে মোটেই মিশবে না।'

আরতি বলে: 'মিশি কি আর তেমন? এক সঙ্গে কাজ করতে গেলে যতটুকু আলাপ-পরিচয় রাখতে হয় ততটুকুই, তার বেশি না। কিন্তু আগে কথায় কথায় বলত কি জানো? —I can't follow you. তোমার ইংরেজী প্রায়ই জার্মান আর ইটালীয়ানের মত শোনায়। তার চেয়ে তুমি হিন্দীতেই বল। আমি হিন্দী জানি।'

কিন্তু আরতি নাছোড়বান্দা। সে যতটা লেখাপড়া শিখেছে, তার সিকির সিকিও এডিথ্ শিখেছে নাকি যে, সে আরতির ইংরেজী উচ্চারণের দোষ ধরতে যায়?

আরতিও এডিথ্‌কে শুনিয়ে দিয়েছে,—'তুমি 'ফলো' করতে না পারো আমি নাচার মিসেস্ সিমনস্। এতদিন তোমাদের উচ্চারণ আমরা নকল করেছি, তোমাদের বদ বাংলা উচ্চারণ সহ্য করেছি, এখন দয়া ক'রে আমরা যে ইংরেজী বলি, তাই যথেষ্ট। এবার থেকে আমাদের উচ্চারণই তোমাদের রপ্ত ক'রে নিতে হবে।'

স্বামীর কাছে এডিথ্-সমাচার বলতে বলতে খিল খিল ক'রে হেসে উঠেছিল আরতি: 'কি বল, ঠিক বলিনি?'

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে দেবর, ননদ আর ছেলেমেয়েদের জন্য লজেনস্ আর লেবু, শাশুড়ীর জন্য এক কৌটো ভালো জরদা, অসুস্থ শ্বশুরের জন্য এক ঠোঙা আঙুর, আর স্বামীর জন্য এক টিন ভালো সিগারেট, আর নিজের দুটো ব্লাউসের জন্য দু' গজ অর্গাণ্ডি কিনে এনেছিল আরতি।

সুব্রত দেখে মুখ ভার ক'রে বলেছিল: 'অর্ধেক টাকা বোধ হয় বাজারেই রেখে এলে ?'

আরতি বলেছিল : 'ঈস্! তাই ভেবেছ বুঝি ? এই দেখ।'

হ্যাণ্ডব্যাগের ভিতর থেকে ছোট্ট আর একটি ব্যাগ খুলে একশ টাকার আস্ত নোটখানাই স্বামীকে বের ক'রে দেখিয়েছিল আরতি।

সুব্রত একটু বিস্মিত হয়ে বলেছিল : 'তাহলে বাকি টাকাটা কোথায় পেলে ? প্রথম মাসেই হিমাংশুবাবু কর্মচারীদের বক্শিস্ দিলেন নাকি ?' বলে অদ্ভুত একটু হেসেছিল সুব্রত।

আরতি একটু যেন আরক্ত হয়ে উঠেছিল, তারপর স্বামীকে ধমকের সুরে বলেছিল : 'ভারি বিশ্রী ধরণ তোমার কথার! বকশিস্ দিতে আসবেন তিনি কোন্ সাহসে ? আমি কি ঝি-চাকর ? বকশিস্ নয়—পাওনা। হিমাংশুবাবুর দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না, আমরা জোর ক'রে আদায় ক'রে নিয়েছি।'

তারপর স্বামীকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বুঝিয়ে দিয়েছিল আরতি। উলেন মেশিন বিক্রির কমিশন। এডিথ্ নিজের বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিক্রি করেছে দুটো, আরতি একটা, মল্লিকা একটা, রমা একটাও না। এজেণ্টরা সাড়ে বার থেকে পনের পার্সেণ্ট কমিশন পায়। কিন্তু আরতিরা অফিসে কাজ করে বলে হিমাংশুবাবুর একেবারেই ফাঁকি দেওয়ার মতলব ছিল। হাসতে হাসতে বলেছিলেন : 'এতো আপনাদের নিজেদেরই অফিস। মেশিনটার যত পাবলিসিটি হয়, ততই আপনাদের পক্ষে ভালো, আপনারা তো আর বাইরের কেউ নন, যে আলাদা কমিশন দিতে হবে।'

কিন্তু বড় ঝানু মেয়ে এডিথ। তাকে ভুলানো অত সহজ না। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে তো! তার চোখে মুখে কথা। কিন্তু এ ব্যাপারে সে নিজে মুখ খোলেনি, আরতিকেই চোখ টিপে দিয়েছিল। কারণ যোগ্যতার জন্য আরতিকে মিঃ মুখার্জী যে বেশ একটু খাতির করেন, তা সবাই জানে। আরতিই বলে কয়ে শেষ পর্যন্ত ফাইভ পার্সেণ্ট কমিশন আদায় করেছে। তার জন্য এডিথ্‌রা সবাই তার কাছে কৃতজ্ঞ। বেচারা রমা উপ্‌রি টাকা না পেয়ে মুখ কালো ক'রে ফিরে যাচ্ছিল। আরতিরা সবাই মিলে চাঁদা ক'রে তাকে রেষ্টুরেণ্টে খাইয়ে দিয়েছে, সেই সঙ্গে উপহার দিয়েছে ভালো এক কৌটো স্নো।

সেদিন অনেকদিন পরে ভাল সিগারেট টেনেছিল সুব্রত। কিন্তু ঠিক যেন আগেকার

মত স্বাদ নেই। অফিসের মাইনে থেকে পুরো টাকা কোনদিনই সুব্রত ঘরে আনতে পারে না। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর রিফ্রেশমেণ্ট রুমে টাকা পনের রেখে আসতে হয়। কিন্তু চাকরির প্রথম মাসেই মাইনে ছাড়া উপ্‌রি এনেছে আরতি। এদিক থেকে তার কৃতিত্ব আছে বই কি! কিন্তু পার্সেণ্ট আর কমিশন কথাগুলির মধ্যে কেমন যেন একটা কমার্শিয়াল গন্ধ। দামী সিগারেটের সুগন্ধকে তা ডুবিয়ে দিয়েছে।

একশ টাকার নোটখানা প্রথমে শ্বশুরের কাছেই নিয়ে গিয়েছিল আরতি। কিন্তু প্রিয়গোপাল সে টাকা ছোঁন নি। পুত্রবধূর দিকে মুহূর্তকাল জ্বলন্ত চোখে তাকিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্য, গলায় তাঁর আগুন ঝরেনি, জল ঝরেছিল। আর্দ্র স্বরে প্রিয়গোপাল বলেছিলেন: 'আমাকে অপমান করতে এসেছ মা?'

শ্বশুরের কথার ভঙ্গিতে আরতির বুকের মধ্যে ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছিল। একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদু মোলায়েম গলায় বলেছিল আরতি: 'না, বাবা, প্রণামী দিতে এসেছি। আজ শুনেছি, আপনার জন্মদিন।'

রুগ্ন, শয্যাশায়ী প্রিয়গোপাল ঝোঁকের মাথায় উঠে বসেছিলেন, মাথা নেড়ে বলেছিলেন: 'না না, ভুল শুনেছ, আজ আমার মৃত্যুর দিন। যত মধুর ক'রেই বল না মা, ওটা প্রণামী না, ঘুষ। তোমরা ঠিকই জানো, এ ঘুষ কোন না কোন রকমে আমাকে নিতেই হবে। তাই এত সাহস তোমাদের।'

জমিদারী সেরেস্তার কাজে ঘুষ তো প্রিয়গোপাল মাঝে মাঝে নিয়েছেন, কেবল প্রজাদের কাছ থেকে নয়, প্রজাদের বউয়েরাও সিকিটা আধুলিটা যে যা পারে দিয়েছে। তারাও বলেছে প্রণামী। তখন হাত ফেরাননি প্রিয়গোপাল। তাদের কাছে হাত পাতাই ছিল দস্তুর। সত্যি সত্যি যেন ন্যায্য প্রণামীই তখন আদায় করেছেন প্রিয়গোপাল। কিন্তু আজ পুত্রবধূর এই প্রণামীর স্বরূপ তাঁর বুঝতে বাকি নেই। তাঁর আদর্শ, তাঁর সংস্কার, তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে মাত্র ওই একশ টাকার একখানা নোটে কিনে নিতে এসেছে আরতি। যৌবনে কি এমন শত শত টাকা রোজগার করেন নি প্রিয়গোপাল? শত শত নোট ওড়ান নি হাওয়ায়?

সরোজিনী কিন্তু ছেলে আর ছেলের বউয়ের পক্ষ নিয়েছিলেন, স্বামীকে তিরস্কার ক'রে বলেছিলেন: 'তোমার কি বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে? প্রথম মাসের মাইনে বউটা কত সাধ ক'রে দিতে গেছে, আর তুমি অমন যা তা বলে ওকে কাঁদিয়ে দিচ্ছ? নাও, হাত পেতে নাও।'

কিন্তু প্রিয়গোপাল মাথা নেড়েছিলেন: 'নিতে হয়, তুমি নাও ভোম্বলের মা।'

তারপর থেকে সবই আবার প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। কেবল স্বাভাবিক নয়, আগের চাইতে সচ্ছলও, সব সময়ের জন্য বাসায় একটি ঝি রাখা হয়েছে। বাইরের কাজকর্ম সে সবই করে। ইচ্ছা করলে তাকে দিয়ে রাঁধানোও যায়। কিন্তু জাতে বামুন নয় বলে প্রিয়গোপাল আর সরোজিনী আপত্তি করেছেন। নীলা এতদিন বাড়িতে পড়ত বউদির কাছে। এবার থেকে তাকেও স্কুলে দেওয়া হয়েছে। অসুবিধার আর তেমন কোন কারণ নেই।

কিন্তু সাংসারিক সুবিধাটাই তো সব নয়। সুব্রতের মনে হয় সংসারের চেহারাটাও দিনের পর দিন বদলে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম হয় পাতে না হয় সঙ্গে খেতে বসত আরতি, আজকাল সুব্রতের আগেই সে বেরিয়ে যায়। তাদের অফিস আধঘণ্টা এগিয়ে এসেছে। সাড়ে ন'টায় বসে আজকাল। আরতিরা আপত্তি করেছিল। কিন্তু কাজের চাপের কথা বলে মিঃ মুখার্জী তাদের নিরস্ত করেছেন, বলেছেন : 'এস্টাব্লিশমেণ্ট খরচ তো দেখেছেন ? গোড়ায় খেটেখুটে কোম্পানীকে একবার দাঁড় করিয়ে দিন। তারপর দুপুরে বিকালে যখন খুসি আসবেন। কিন্তু প্রথম প্রথম দয়া ক'রে একটু সকাল সকালই আসতে হবে সবাইকে।'

আরতি স্বামীর দিকে তাকিয়ে নিগূঢ় রহস্যে একটু হেসেছিল : 'সেই ফাইভ পার্সেণ্টের জের, বুঝেছ ? আমরাও এর ওষুধ জানি, দেখা যাক।'

সুব্রত সংক্ষেপে বলেছিল : 'হুঁ।'

প্রথম দিন কয়েক অফিসে যাওয়ার সময় স্ত্রীর সঙ্গে একই ট্রামে উঠত সুব্রত। ট্রামের হাতলে ঠেকত পরস্পরের হাত, একই বেঞ্চে দুজনে বসত পাশাপাশি। ঠিক গা ঘেঁষে যে তা নয়, বরং একটু দূরে দূরে ফাঁক রেখে। কিন্তু সেই ফাঁকটুকু ভরে উঠত রোমান্সে। রোমান্স—হ্যাঁ,—বিবাহিতা স্ত্রীর পাশে বসেও রোমাঞ্চ হয়েছে সুব্রতের। আঁটসাঁট ভঙ্গিতে শাড়ি পরে অফিসে বেরোয় আরতি। একটু চটুল স্বভাবের ওপরে পড়ে গাম্ভীর্যের আভরণ। ট্রাম-বাসে, পথে-ঘাটে সংযত গম্ভীরভাবে চলতে সুব্রত শিখিয়ে দিয়েছে স্ত্রীকে, সে উপদেশ আরতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। এমন কি স্বামীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটতে দেয় নি। যেতে যেতে খুব কম কথা হয় দুজনের মধ্যে। যেন সবে সামান্য পরিচয় হয়েছে, —খুলতে শুরু হয়েছে অসামান্য রহস্যের আবরণ। কল্পনা ক'রে ভারি অদ্ভুত লাগে সুব্রতের। প্রেমজ বিবাহ নয় তাদের। বিবাহজ প্রেমের স্বাদ প্রথম বছরে যা ছিল, দ্বিতীয়-তৃতীয় বছরে তা যেন অনেকখানি গিয়েছিল পানসে হয়ে। অফিস যাত্রার প্রথম ক'দিন নতুন ক'রে যেন সেই প্রথম বছর ফিরে এল। একেকবার এমনও মনে হোল এ কেবল বিয়েরই প্রথম বছর নয়, প্রাক্-বৈবাহিক কোন প্রেমের প্রথম বছর। আরতি যেন শুধু আর

অতি পরিচিতা নিত্যকার জীবনসঙ্গিনী নয়, সেই সঙ্গে মাত্র আধ ঘণ্টার যাত্রা সঙ্গিনীও। সহজলভ্যা স্ত্রীর মধ্যে পরস্ত্রীর সুদূর দুর্ভেদ্য রহস্যময় রূপ প্রথম ক'দিন দেখতে পেল সুব্রত।

কিন্তু অফিসের সময় বদলে যাওয়ায় শেষ হোল সেই যৌথ যাত্রার রোমান্স। সুব্রতের অনেক আগে আরতি খেয়ে বেরিয়ে যায়। আগে আগে ছুটির দিনে বেলা দু'টোর সময় যখন বন্ধুদের বাড়ি থেকে আড্ডা দিয়ে ফিরত সুব্রত, দেখত সবাই খেয়ে ঘুমিয়েছে কিন্তু আরতি শুকনো মুখে বসে আছে তার ভাত নিয়ে। সুব্রত রাগ করত : 'তুমি খেয়ে নিলে না কেন ? আমার কি আর জায়গা আছে পেটে ?'

আরতি বলত : 'তা'হলে আমারও নেই, আমিও খাবনা কিছু।'

বিরক্ত হোত সুব্রত : 'কি যন্ত্রণা !'

কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুসি হোত অনেক বেশী।

সুব্রতের খাওয়ার আগেই আরতি যখন আঁচিয়ে এসে তোয়ালেতে মুখ মুছতে থাকে, তখনকার সঙ্গে এখনকার দিনের তুলনাটা সুব্রতের মনে পড়ে যায়।

কেবল তাই নয়, বিকালে বেশিরভাগ দিনই চা করে, বিছানা ঝাড়ে কুমুদিনী ঝি। কেননা ফিরতে আরতির সন্ধ্যা উৎরে যায়। এসে হাঁপায়। কোন কোনদিন টান হয়ে শুয়ে পড়ে। তখন তাকে গার্হস্থ্য কাজে ডাকা —নিষ্ঠুরতা। কুমুদিনীকে বলে বলে সব কাজই শিখিয়ে দিয়েছে আরতি। সেই সঙ্গে শিখিয়েছে পরিচ্ছন্নতার মাহাত্ম্য। কাজ খুব গুছিয়ে পরিপাটি-ভাবেই করে কুমুদিনী। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হলেও দেখতে বেশ স্বাস্থ্যবতী। খুব খাটতে পারে, কাজে আলিস্যি নেই। তবু মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে সুব্রতের। অকারণে বিরক্তি আসে, মেজাজ বিগড়ে যায়। বউয়ের কাজ কি ঝি'কে দিয়ে চলে ?

কিন্তু কেবল ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য মন খারাপ করবার ছেলে সুব্রত নয়। বউ যদি চাকরি করে, আর সে চাকরিতে যদি সময় আর সামর্থ্য দুইই বেশী দিতে হয়, দাম্পত্য-জীবনের চেহারা তো একটু আধটু বদলাবেই। তাতে আপত্তি নেই সুব্রতের। কিন্তু আরতির মনের চেহারা যেভাবে বদলাতে শুরু করেছে, সেটাকে তেমন সুলক্ষণ বলে ভাবতে পারছে না সুব্রত। আগে ছেলেমেয়েদের সাজসজ্জার দিকে ভারী লক্ষ্য ছিল আরতির। রোজ নিজের হাতে তাদের কাজল পরাত, পাউডার মাখাত, মাথা আঁচড়ে জুতো পরিয়ে দিত। এসব না করলে আরতি যেন স্বস্তি পেত না। এখন সেসব গেছে। কেবল সময় নেই বলেই নয়, সুব্রতের মনে হয়, যেন মনও নেই। এখন ছুটি-ছাটার দিন ছাড়া ছেলেমেয়েদের আদর-যত্ন বেশির ভাগই সুব্রতের মা আর ঝিয়ের ওপর দিয়ে আরতি নিশ্চিন্ত হয়েছে।

আরো অনেক কিছুই বদলেছে আরতির। গানের সখ, সেলাইর সখ, মাসিক কাগজের

গল্প পড়বার সখ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। কারণ সময়ে কুলোয় না। যেটুকু সময় পায়, সেটুকু সময়ও মেশিন বিক্রির চিন্তা ঘোরে তার মাথার মধ্যে। মেশিন বিক্রির চেষ্টায় সমস্ত শহরের পরিচিত মহলে ঘুরে বেড়ায় আরতি।

টাকা অবশ্য আসে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো কথা আসে কানে। ট্রামে-বাসে বড় বেশি ঘোরে আরতি। বড় বেশি মেশে স্ত্রী-পুরুষ সকলের সঙ্গে। ঘরের বউ-ঝিদের পক্ষে এতটা স্বাধীনতা কি ভালো!

গাঁয়ের যেসব লোক সম্প্রতি শহরে এসেছেন, তাঁরাই বাড়ি বয়ে এ সব খবর দিয়ে যান প্রিয়গোপালকে। তিনি মাঝে মাঝে চটেন, চেঁচান, কোন দিন বা নিতান্ত শান্তভাবে ছেলের কাছে ঘটনাটা বিবৃত করেন মাত্র। ভবানীপুর অঞ্চলের কোন একটা রেস্টুরেণ্টে এক অপরিচিত যুবকের সঙ্গে আরতি নাকি চা খাচ্ছিল। নিজের চোখে দেখেছেন সুব্রত-দের গাঁয়ের সুবোধ ভদ্র।

সুব্রত স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিল: 'ব্যাপারটা কি! কোন্ অপরিচিত ভদ্রলোক চা খাইয়েছেন তোমাকে?'

আরতি হেসেছিল: 'ক্ষেপেছ? চা কি অতই সস্তা যে, অপরিচিত ভদ্রলোকেরা দল বেঁধে ছ'পয়সা দু'আনা ব্যয় ক'রে আমাকে চা খাওয়াবে? শৈলেনদা তোমাদের ভদ্র মশাইর কাছে অপরিচিত হলে কি হবে আমাদের ফ্যামিলিতে খুবই পরিচিত। বিয়ে করেছেন আমার মামাত বোনের ননদ কল্যাণীকে। শৈলেনদাকে গছালাম একটা মেশিন। নিজের কমিশন থেকে কিছু ছাড়তে হোল। শত হলেও কল্যাণীর তো বর! সেই খাতিরে কিছু সস্তায় করিয়ে দিলাম। আর সেই কৃতজ্ঞতায় চা আর ফাউল কাটলেট খাওয়ালেন শৈলেনদা।'

সেই টাকা আনা পাই, সেই স্থূল ব্যবসায়-বুদ্ধি। এর চেয়ে আরতি যদি বলত, শৈলেনদার একটু দুর্বলতা ছিল আমার ওপর, সেই দিনগুলির কথা মনে ক'রে দু'কাপ চা খেলাম আমরা। তাও যেন সুব্রতের এত অসহ্য লাগত না, কে জানে সম্পর্কটা হয়ত সেই ধরনেরই ছিল। আজ সেই সুবাদে আরতি তার কাছে কমিশনের লোভে মেশিন বিক্রী করে, আর সেই খাতিরে শৈলেন পাঁচ টাকা কমে মেশিন কিনে দু'টাকা ব্যয় করে রেস্টুরেণ্টে।

তারপর একদিন সুব্রত সত্যিই গিয়ে হাজির হোল আরতিদের ক্যানিং স্ট্রীটের অফিসে। যাবে যাবে প্রথম থেকেই ভাবছিল, কিন্তু সংকোচের কাছে হার মেনেছে কৌতূহল। স্ত্রীর অফিসে গিয়ে পরিচয় দিতে হবে: 'আমি অমুক দেবীর স্বামী!' অন্যের কানে সেটা

কৌতুকের মত শোনালেও নিজের মুখে যেন এখনও বাধে। তবু সুব্রতের শেষ পর্যন্ত মনে হোল, হিমাংশুবাবুর সঙ্গে একবার গিয়ে দেখা করা দরকার। তাঁকে বলতে হবে এ্যাপয়েন্টমেণ্টের সময় যে-সব সর্ত ছিল, তা তিনি পুরোপুরি মানছেন না। মানে পুরোপুরি ষোল আনার ওপরে আঠারো আনা আদায় ক'রে নিচ্ছেন। কনফাইনমেণ্ট বেশী করেছেন, খাটুনি বাড়িয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একবার খোলাখুলি আলাপ করা দরকার।

অফিস থেকে ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়ে সুব্রত গিয়েছিল। ক্যানিং ষ্ট্রীটের মুখার্জী এণ্ড মুখার্জীতে।

নীচের তলায় স্টেশনারী দোকান। সেখানে দুটি অপরিচিত বাঙালী মেয়েকে দেখতে পেল সুব্রত। পুরুষ ক্রেতাদের ভিড় জমেছে। প্রৌঢ় গোছের আরো দুজন কর্মচারী কাজ করছেন একদিকে, কাউণ্টারের আর একদিকে বসেছেন বুড়ো ক্যাশিয়ার। সেখানে আরতি নেই। ভাগ্যই বলতে হবে সুব্রতের, যে, স্ত্রীর সঙ্গে এখানে চোখাচোখি হয়নি। হিমাংশু মুখার্জীর নাম করতে দারোয়ান নিয়ে গেল দোতলায়। চেয়ার, টেবিল, ফ্যান, ফোনে সাজানো, পুরো অফিস। জন চার পাঁচ লোক মাথা গুঁজে কাজ করছে। আরতিদের সঙ্গে এখানেও দেখা হোল না।

নাম লিখে স্লিপ পাঠাতে সঙ্গে সঙ্গে সাদর আহ্বান এল। হিমাংশু নিজেই উঠে এসে তাকে নিয়ে গেলেন নিজের কামরায় : 'আসুন, আসুন।'

সুব্রত একটু বিস্মিত হয়ে বলল : 'আপনি কি চেনেন আমাকে?'

হিমাংশুবাবু একটু হাসলেন : 'না চিনবার কি আছে? মিসেস মজুমদারের অফিসিয়াল চিঠিপত্র তো আপনার কেয়ারেই যায়। 'প্রপার' নেম আমি ভুলি না। তা ছাড়া দূর থেকে একদিন আপনাকে দেখিয়েওছিলেন মিসেস মজুমদার। ওঁকে অনেকদিন বলেছি আপনাকে নিয়ে আসতে। কিন্তু আপনার বোধ হয় সময় হয়নি। ওঁরও সঙ্কোচ ছিল হয়ত!'

সুব্রত বলল : 'না, সঙ্কোচের কি আছে?'

'সত্যিই কিছু নেই। আমরাও পূর্ববঙ্গের মানুষ মশাই। অত সংকোচ-টঙ্কোচের ধার ধারিনে। দেশের মানুষ দেখলে রেখেঢেকে আলাপ করতে জানিনে। একেবারে প্রাণ খুলে দিই।'

সুব্রত খুশি হোল : 'ও আপনিও পূর্ববঙ্গের? কোন্ জেলার?'

সিগারেটের কৌটা এগিয়ে দিতে দিতে হিমাংশুবাবু হাসলেন : 'খোদ ঢাকার। আপনাদের বাড়িও তো মুন্সীগঞ্জ সাবডিভিশনে? সবই শুনেছি।'

দেশলাই জেলে প্রথমে সুব্রতের সিগারেটটা ধরিয়ে দিলেন হিমাংশুবাবু তারপর ধরালেন নিজের, সত্যিই খুব বলিষ্ঠ লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান পুরুষ। মিহি ধুতি ও আদ্দির

পাঞ্জাবিতে চমৎকার মানিয়েছে। চওড়া কপাল, বড় বড় চোখ, গোল গোল ভরাট মুখ, ছাইদানিতে সিগারেট ঝাড়লেন হিমাংশুবাবু। সুব্রত লক্ষ্য করল তাঁর হাতের দু'আঙুলে দু'টো হীরের আংটি জ্বলজ্বল করছে।

হিমাংশুবাবু আর একবার আত্মপরিচয় দিলেন: 'সব বাঙাল মশাই, কোন চিন্তা করবেন না। বাঙালে বাঙালে ছেয়ে ফেলেছি আমরা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রায় বার আনি তুলে আনতে হোল পাকিস্তান থেকে। কিন্তু চুপচাপ বসে তো আর থাকা যায় না হাত পা কোলে ক'রে। ভাবলাম দেখি কপাল ঠুকে, আর ঢিল ছুঁড়ে! ভাগ্য পরীক্ষা করতে আমরা পূর্ববঙ্গের লোক তো কোনদিন পিছ-পা নই। আর পূর্ববঙ্গের লোক ছাড়া হঠাৎ মেয়েদের জন্য এমন একটা নিউ এভিনিয়ু কেই-বা খুলতে সাহস করত? পূর্ববঙ্গের লোক না হলে আপনিই কি এত সহজে পাঠাতেন আপনার—'

হঠাৎ থেমে গেলেন হিমাংশুবাবু, ছাইদানিতে সিগারেটের মুখটা ফের একটু ঝেড়ে নিয়ে হাসলেন: 'একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে সুব্রতবাবু। মিসেস মজুমদার বউবাজারের দিকে বেরিয়েছেন একটু।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হিমাংশুবাবু বললেন: 'আর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবেন।'

সুব্রত এবার বলল: 'আউটডোর ডিউটিটাই বোধ হয় বেশী আপনার এখানে?'

হিমাংশুবাবু স্নিগ্ধ সৌজন্যে হাসলেন: 'আজ্ঞে, তা একটু বেশী। নতুন ধরনের মেশিন। প্রথম দিকে পুশিং সেলের দরকার, তারপর একবার চালু হয়ে গেলে—তবে একথা মনে করবেন না যে, প্রকাশ্যভাবে ক্যানভাস্ করবার জন্য মেয়েদের আমরা বাইরে পাঠাই। ওঁরা ডিমনস্ট্রেট করেন, কি ভাবে হ্যাণ্ডল করতে হয় শিখিয়ে দেন। মিসেস্ মজুমদার এদিক থেকে খুব এফিসিয়েন্ট হ্যাণ্ড। যেসব পার্টির বাড়ি তিনি গেছেন, সব জায়গা থেকে আমরা খুব ভালো রিপোর্ট পেয়েছি। যে বাড়িতে মিসেস মজুমদার যান, সে বাড়িতে অন্য কোন মেয়েকে পাঠাবার উপায় নেই। পার্টির পছন্দ হয় না, তাঁরা খুঁৎ খুঁৎ করেন। মিসেস মজুমদারকে ছাড়া চলে না তাঁদের। আলাপ আলোচনায়, কাজে সব দিক থেকে তিনি পার্টিকে খুশি করতে পারেন।'

বসে বসে স্ত্রীর প্রশংসা শোনে সুব্রত।—অন্য একজন পুরুষের মুখে স্ত্রীর প্রশংসা। চাকরিতে পাঠাবার সুযোগ না হলে স্ত্রীর এসব গুণ সুব্রতের কাছে অনাবিষ্কৃত থাকত।

চা এল। সেই সঙ্গে চলল দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা। হিমাংশুবাবু বললেন: ব্যবসা-বাণিজ্যে তেমন সুবিধে করা যাচ্ছে না। দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে ব্যাপার। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের আড়ত থেকেও এইরকম সব খবর আসছে।

নিজের অভিযোগগুলি উত্থাপন করবার ঠিক যেন সুযোগ পেল না সুব্রত। তাছাড়া কেমন যেন নিরর্থকও মনে হোল সে সব কথা।

একটু বাদে সত্যিই এসে উপস্থিত হোল আরতি। পিছনে পিছনে চাকর এসেছে ছিট কাপড়ে ঢাকা লম্বা মত একটা যন্ত্র হাতে নিয়ে,—অনেকটা সেতারের মত দেখতে। কিন্তু বাদ্যযন্ত্র নয়, সীবন-যন্ত্র।

স্বামীকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হোল আরতি, সুব্রতও হঠাৎ কি বলবে ভেবে পেলো না।

কিন্তু হিমাংশুবাবুর সপ্রতিভতা অটুট আছে। হেসে বললেন: 'আসুন মিসেস মজুমদার, আমাদের নতুন একজন কাষ্টমার এসেছেন।'

আরতি লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল: 'কখন এসেছে?'

'এই খানিকক্ষণ।'

হঠাৎ আর একদিনের কথা সুব্রতের মনে পড়ে গেল। বিয়ের বছর খানেক পরে আরতির কলেজের একজন বন্ধু এসেছিল দেখা করতে। ভারি লাজুক নম্রস্বভাবের ছেলে, নাম ছিল বুঝি পুলিন। খানিকটা ভয়, খানিকটা ঈর্ষার চোখে তাকাচ্ছিল সে সুব্রতের দিকে। সুব্রত পরম দাক্ষিণ্যে মুখ মুচকে হেসেছিল। তারপর আরতি ঘরে ঢুকতে প্রায় ঠিক এই ভঙ্গিতেই বলেছিলো: 'এস আরতি, দেখো, কে এসেছেন, চিনতে পারো নাকি?'

সেদিন আরতি আর পুলিন কেউ কোন কথা বলতে পারেনি কিন্তু হিমাংশুবাবু আর আরতির সম্পর্ক এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। হিমাংশুবাবু তার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী নন, স্ত্রীর শ্রমের অংশীদার। মাত্র একশটি টাকা দিয়ে আরতির বেশীর ভাগ শ্রম আর সামর্থ্যকে তাঁরা কিনে নিয়েছেন। স্ত্রীর কাছ থেকে সেই জন্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে সেবা-শুশ্রূষা পাচ্ছে না সুব্রত। এখানে পুলিনের মতই তার অবস্থা। কিন্তু সুব্রত ভেবে দেখল যতক্ষণ আরতি চাকরি করছে হিমাংশুর অফিসে ততক্ষণ নিজের ষোল আনা স্বামীত্বের দাবী তোলবার কোন মানে হয় না। স্ত্রীর দেহ মন তারই। কিন্তু দৈহিক শ্রমের দশ আনার সরিক হিমাংশু মুখার্জী।

তারপর সুব্রতের সামনেই হিমাংশু আরতির সঙ্গে অফিস সংক্রান্ত আলোচনা সুরু করল। ঠিক যেমন পুলিনের সামনে আরতির সঙ্গে সুব্রত পারিবারিক সাংসারিক আলোচনা তুলেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল কি কি আসবে বাজার থেকে, বাবার জন্য আজই ডাক্তার ডাকা দরকার হবে নাকি।

হিমাংশুও তেমনি বলতে লাগলেন: 'মল্লিকদের ওখানে আর ক'দিন যেতে হবে আপনাকে? হ্যাঁ, শ্যামবাজার থেকে যে তিনটা অর্ডার আসবার কথা ছিল—'

নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল সুব্রত! যে কথা বলবার জন্য সে এসেছিল, হিমাংশুবাবুই তা অন্য ভাষায় বলে দিলেন : 'আসবেন মাঝে মাঝে, ভারি খুশি হব পায়ের ধুলো দিলে। একদিন মিসেসকে নিয়ে যাবেন না আমাদের একডালিয়া রোডের বাড়িতে। আমার স্ত্রী ভারী খুশি হবেন।'

এই গেল ভূমিকা। তারপর হিমাংশুবাবু নিজেই সুব্রতের দুঃখে সহানুভূতি দেখাল : 'মিসেস মজুমদার অবশ্য কিছু বলেন না, তবু বুঝি, ছেলেপুলে নিয়ে সংসার—এতক্ষণ আটকা থাকতে খুবই কষ্ট হয়! সবই বুঝি। আমরাও তো গৃহস্থ মানুষ, ঘর-সংসার আছে। কিন্তু বুঝেও কি করব বলুন? সবাই মিলে খেটেখুটে বিজনেসটা তো আগে দাঁড় করাতে হবে। যা দিনকাল পড়েছে, আর যা বাজার, দেখতেই তো পাচ্ছেন। এই হিউজ্ এষ্টাব্লিশমেণ্ট চার্জ দিয়ে কিছু থাকে না মশাই, কিছু থাকে না—'

ফিরে এসে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সুব্রত একটা পার্টটাইম জোটাবার। ইন্সিওরেন্সের এজেন্সীর কাজ সুব্রত প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল, ফের সুরু করল বেরুতে। দু'তিনটে কেস জুটলও, আর জুটল পার্টটাইম। পাঁচটার পরে ছোট্ট একটা পারফিউমারী ফার্মে তাদের হিসাবের খাতাপত্রগুলি দেখে দিতে হবে। মাত্র ঘণ্টা দেড়েকের ব্যাপার। প্রথম মাসে ষাট টাকা ক'রে দেবে তারা তারপর কাজ-কর্ম দেখে সত্তর। ছুটির দিনে লাইফ ইন্সিওরেন্সের এজেন্সী নিয়ে বেরুলে মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা সহজেই রোজগার করতে পারবে সুব্রত। সুতরাং এবার সে আরতিকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারে।

কিন্তু আরতি ছাড়বে না। তার কত হিসাব, কত যুক্তি, কত রাগ, কত কাকুতি-মিনতি! চাকরি আরতি করবেই। চাকরির মোহ—নিজের হাতে টাকা রোজগারের মোহ তাকে পেয়ে বসেছে। তা সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। সংসারের তহবিল সরোজিনী রাখতে রাজী হননি। হিসাবপত্রের ঝামেলা তিনি পোহাতে চান না। খরচের টাকা আরতির কাছেই থাকে। মাসের প্রথম মাইনে পেয়ে সব টাকা সুব্রত তো আরতির হাতেই তুলে দেয়। কিন্তু শুধু সেই কটা পেয়ে তৃপ্তি নেই আরতির। তার নিজের হাতে রোজগার করা চাই। কেবল সুব্রতের হাত থেকে টাকা নিয়ে সে খুশি নয়, আট ন' ঘণ্টা খাটুনির বিনিময়ে টাকা নেওয়া চাই তার হিমাংশু মুখুয্যের হাত থেকেও।

রাত্রে অত ক'রে নিষেধ করা সত্ত্বেও পরদিন সুব্রতের চোখের সমুখ দিয়ে ফের সেজেগুজে হাই-হিল জুতো পরে অফিসে বেরুল আরতি।

সুব্রত বলল : 'তুমি আবারও যাচ্ছ!'

আরতি স্বামীর কাছে এগিয়ে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল তারপর মিষ্টি একটু হেসে বলল : 'হ্যাঁ যাই, আজ আর অত রাত হবে না। ছ'টার মধ্যেই ফিরব।'

সুব্রত বলল : 'তবু তুমি যাবেই !'

আরতি তেমনি হাসিমুখে বলল : 'না গেলে চলবে কি ক'রে ? তা ছাড়া অফিস তো ? একটা নিয়ম-কানুন আছে। নিজেও তো অফিস কর। সেসব যে না জানো, তা তো নয়। হুট্ ক'রে কি ছেড়ে দিয়ে আসা যায় ? নোটিশ-ফোটিশ দিতে হয় তো একটা ?'

অফিস থেকে ফিরে আসবার পর সুব্রত ফের জিজ্ঞেস করল : 'দিয়েছিলে নোটিশ ?'

আরতি তেমনি হেসে জবাব দিয়েছিল : 'দেব। এত ব্যস্ত কেন ? ক্ষেপে গেলে নাকি ?'

সুব্রত কঠিন স্বরে বলেছিল : 'ক্ষেপে এখনো যাইনি, কিন্তু তুমি বোধ হয় সত্যিই ক্ষেপিয়ে ছাড়বে।'

দিন পনের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল সুব্রত। ঠিক পুরোপুরি ধৈর্য নয়, মাঝে মাঝে দাম্পত্য-কলহ চলতে লাগল। এমন ভয় পর্যন্ত দেখাল : 'তোমায় হয় চাকরি ছাড়তে হবে, নয় আমাকে। চাকরি যদি করতে হয়, অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা কর।'

আরতি মাঝে মাঝে চটে ওঠে : 'বেশ তো। তাই হবে।'

কিন্তু অফিস থেকে ফেরার পথে সেই দিনই হয়ত নিয়ে এল সুব্রতের ছোট ভাইদের জন্য জামা প্যান্ট, নিজের ছেলেদের জন্য চকোলেট, সুব্রতের জন্য রজনীগন্ধার তোড়া, কিংবা দামী সুগন্ধী এক পাউণ্ড চা।

তারপর নিজের হাতে চা করতে বসে।

সুব্রত জিজ্ঞেস করে : 'আজও বুঝি মেশিন বিক্রি হোল একটা ?'

আরতি সে কথার জবাব না দিয়ে বলে : 'চা'টা কেমন ? খুব ভালো গন্ধ বেরুচ্ছে না ?'

সুব্রত সে কথার জবাব না দিয়ে চায়ের কাপটা ঠেলে সরিয়ে রাখে। অর্ধেক চা-ই পড়ে থাকে বাটিতে।

প্রিয়গোপাল সরোজিনী আজকাল আর কোন কথা বলতে চান না। আরতির অসাক্ষাতে সুব্রতকে বলেন : 'আমরা আর কি বলবো বাবা ? বলবার মুখ কি তুমি রেখেছ ? করো তোমাদের যা খুশি।'

বাপ-মার ওপর রাগ করে ফোনে শ্বশুরকেও একদিন খুব শাসিয়ে দিল সুব্রত : 'চরম কিছু করবার আগে আপনাকে জানিয়ে রাখা কর্তব্য মনে করছি। শেষে আমাকে দোষ দিতে পারবেন না।'

কোর্টে আসামীর পক্ষসমর্থনের সময় কিছু কিছু অসংলগ্ন কথা বলায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একবার ধমক খেয়েছেন নিবারণ বাঁড়ুয্যে। বার-লাইব্রেরীতে এসে জামাইয়ের কাছে

ফোন মারফৎ ফের ধমক খেয়ে আরো ঘাবড়ে যান। এক হাতে টেকো মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলেন: 'ব্যাপারটা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। হয়েছে কি তোমাদের?'

সুব্রত ধমকে ওঠে: 'যদি বুঝতে চান, please come down here.'

'কোথায়, তোমার অফিসে?'

'বেশ, বাসায় আসুন। সে-ই ভালো।'

বাসায় এলে শ্বশুরকে সংক্ষেপে সবই বলে সুব্রত: 'আরতির ব্যবহার চাল-চলন অত্যন্ত আপত্তিকর হয়েছে। যদি এখনও আমার কথামত না চলে আমাকে আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

নিবারণবাবু বলেন: 'ওকে চাকরি-বাকরিতে দেওয়া আমার তো গোড়া থেকেই অনিচ্ছা ছিল। প্রকারান্তরে নিষেধও করেছিলাম কিন্তু তা তো কেউ শুনলে না।'

তারপর মেয়েকে ডেকে ধমকে দেন: 'এসব কি হচ্ছে খুকি? তুই নাকি কথাবার্তা কিছু শুনিসনে? সুব্রত যখন ছেড়ে দিতে বলছে ছেড়ে দে চাকরি। কেবল টাকা টাকা করছিস কেন? সংসারে টাকাটাই কি সব? টাকার এতই যদি তোর দরকার পড়ে থাকে—'

নিবারণবাবু থেমে গেলেন, বলতে যাচ্ছিলেন: 'নিস আমার কাছ থেকে।' কিন্তু বললেন না। জামাই কি ভাববে! তাছাড়া যা দিনকাল নিজের সংসারই চালান কঠিন। মেয়ে হাত পাতলে সত্যিই কি কিছু দিতে পারবেন তিনি?

চা জলখাবার দিতে এসে স্বামীর দিকে ক্রুদ্ধ তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকাল আরতি; কিন্তু বাবাকে হাসিমুখেই বলল: 'লীগাল প্রাকটিশনার হয়ে তুমি এমন বে-আইনী কাজ করছ কেন বাবা? ট্রেসপাসের দায়ে পড়ে যাবে যে।'

নিবারণবাবু গম্ভীর হয়ে থাকেন। তারপর আর বেশীক্ষণ থাকেন না। কাজের অজুহাতে উঠে চলে যান।

তারপর চলল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা বন্ধ আর অসহযোগিতার পালা।

আরতি বলেছিল: তুমি শেষ পর্যন্ত বাবার কাছে নালিশ করতে গেলে!'

সুব্রত জবাব দিয়েছিল: 'নালিশ নয়, তিনি তোমার বাবা, তাঁকে জানিয়ে রাখা সঙ্গত মনে করলাম।'

কথা বন্ধ হোল, কিন্তু অফিস যাওয়া বন্ধ হোল না আরতির। অদ্ভুত এক জেদে পেয়ে বসেছে তাকে। পারতপক্ষে সংসারের সমস্ত কাজই সে করে। অফিসের পরেও এসে খাটে সংসারের জন্য। আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করে। কিন্তু এ সমস্তই যে তার জেদ,

সে কথা বুঝতে কারো বাকি থাকে না। ছেলের অশান্তির কথা ভেবে প্রিয়গোপাল আর সরোজিনীর মন খারাপ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে দু'চার কথা বলতেও যান সরোজিনী। কিন্তু এ প্রসঙ্গ ওঠামাত্রই আরতি কাজের অজুহাতে নিজেই উঠে যায় সেখান থেকে।

একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে থাকে সুব্রত আর আরতি। ছেলেমেয়েরা থাকে সরোজিনীর কাছে। কিন্তু এত ঘন সান্নিধ্যে থেকেও কোন কথা হয় না। পিছন ফিরে-শোওয়া আরতির উদ্ধত ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে এক একবার সুব্রতের হাত নিস-পিস ক'রে ওঠে। অতি কষ্টে সংযত রাখতে হয় নিজেকে।

এভাবে আর চলে না। সুব্রত স্থির করল, কিছুদিন আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করাই ভালো। ফের ফোন করলে শ্বশুরকে: 'কিছুদিন ওকে আপনি নিজের কাছে নিয়ে রাখুন। সব দিক ভেবে আমি এই প্ল্যান নেওয়াই ঠিক করেছি। আর এই last attempt. মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে।'

শ্বশুর জবাব দিলেন: 'সেই ভালো। আমি কালই কোর্টের পর ওকে গিয়ে নিয়ে আসব। কড়া শাসনেরই দরকার হয়ে পড়েছে ওর।'

শ্বশুরের বশ্যতা আর সহযোগিতায় মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল সুব্রতের কিন্তু সেই দিনই বিকালে একটা আকস্মিক কাণ্ড ঘটে গেল। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এসে বললেন: 'এক কাজ করুন, ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে সমস্ত ক্যাশ বুঝে নিয়ে পাঠিয়ে দিন ক্লাইভ ষ্ট্রীটের হেড অফিসে। নিজেদের কোন রিস্‌ক্ নিয়ে কাজ নেই।'

এ্যাকাউণ্টাণ্ট সুব্রত বলল: 'সে কি? আমাদের ব্যাঙ্ক তো সাউণ্ড। দু'দিন ধ'রে সামান্য একটু 'রাণ' হচ্ছে, কিন্তু তাতে—'

ম্যানেজার বললেন: 'আরে মশাই যা বলছি, তাই করুন। সবই কর্তার ইচ্ছায়, আমরা কি বুঝি? বুঝতে চান তো ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়ি চলে যান।'

ফোনে হেড অফিসের সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ কি আলাপ ক'রে ছুটির পরে ম্যানেজার তাকে ডেকে নিয়ে ফিস ফিস ক'রে বললেন: 'ভালো চান তো কাল আর আসবেন না, পাবলিকের হাতে মারধোর খেতে হবে তাহলে। যতটা বুঝতে পারছি, আজ রাত্রেই তালা পড়বে।'

সুব্রত বলল: 'তার মানে?'

'মানে জানেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

পরদিন সুব্রতও জানল। সহরের আর যারা জয়লক্ষ্মী ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছিল, তাদের কাছেও খবরটা অবিদিত রইল না। তাদের টাকা গেছে, সুব্রতের গেছে চাকরি। সেভিংস

এ্যাকাউণ্টে শ' খানেকের বেশি ছিল না। কিন্তু তার চাইতেও দুশো টাকার চাকরির শোকটাই সুব্রতকে মুহ্যমান ক'রে রাখলো।

বিকালের অনেক আগেই নিবারণবাবু এসে পৌঁছলেন। আরতিকে নেওয়ার প্রসঙ্গটা চাপা পড়ল। কারণ, নিবারণবাবুরও হাজারখানেকের একটি সেভিংস এ্যাকাউণ্ট ছিল জয়লক্ষ্মী ব্যাঙ্কের হাইকোর্ট শাখায়। সুব্রতই গরজ ক'রে খুলিয়েছিল এ্যাকাউণ্টটা।

নিবারণবাবু খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে শান্তভাবে বললেন, 'তোমার আর দোষ কি? তবে তোমরা ভেতরে ছিলে, কেন যে খবরটা আগে দিতে পারনি তাই ভাবি। অফিসে কেবল ঘাড় নিচু ক'রে কলম পিষলেই কি দুনিয়াটা চলে? আমার যা গেছে যাক। কিন্তু এখন থেকে চোখ কান খোলা রেখে চলতে শেখ।'

আরতি এবার মুখ খুলল: 'তুমি ভেব না বাবা। ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা যদি শেষ পর্যন্ত আদায় না-ই করা যায়, আমি বছর দুইয়ের মধ্যে তোমার সব টাকা শোধ ক'রে দেব।'

পরদিন থেকে ফের পুরো দমে অফিস চলল আরতির। অনেক সকালে বেরোয়, অনেক রাত্রে ফেরে। মেশিন বিক্রির কমিশনের জন্য টালা থেকে টালীগঞ্জ টহল দিয়ে বেড়ায়। কেউ কোন কথা বলে না।

সুব্রতও চাকরির চেষ্টায় বেরোয়। মাঝে মাঝে দেখা হয় আরতির সঙ্গে। কোন কোন দিন তার সঙ্গে সেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে দেখা যায়। সুব্রত কিছু বলবে বলবে ভাবে। কিন্তু বলে না। আগে চাকরি জুটুক একটা।

সুব্রতের আগে আরতিই কথা বলল: 'অত ভাবছ কেন? চলেই যাবে। একরকম ক'রে।'

সুব্রত বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলে: 'আমি কি বলছি যে চলবে না?'

স্বামীর অন্যমনস্কতা দূর করবার জন্য মাঝে মাঝে অফিসের গল্পও করে আরতি। কিন্তু দু' মাস আগের গল্পের সঙ্গে এখনকার গল্পের মিল নেই। ভবানীপুর, বালীগঞ্জের সেই সব বড় বড় লোকের বাড়িঘর ঠিকই আছে। সেই গ্যারেজ গাড়ি, কার্পেট-মোড়া ঘরে দামী দামী সব আসবাব, সব ঠিকই আছে, কিন্তু তার ভিতরকার চেহারা যেন বদলে গেছে, আরতির চোখে। আরতি গল্প করে আজকাল—মাত্র মিনিট পনের দেরি হওয়ায় রাসবিহারী এভেন্যুয়ের ব্যারিষ্টার এইচ. এন. হালদারের মেয়ে শুচিস্মিতা তাকে কিভাবে তিরস্কার করেছে। ট্রামের গোলমালেই দেরি হয়ে গিয়েছিল আরতির। কিন্তু শুচিস্মিতার ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল, কথাটা তার বিশ্বাস হয়নি। বলেছিল: 'যে জন্যই হোক, আমার তো সময় অনেকখানি নষ্ট করলেন আপনি। বসে বসে অপেক্ষা করছি তো

করছিই, আপনার আসবার নাম নেই। আমি এক্ষুনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতাম। কিন্তু নেহাৎ যাতায়াতে আপনার কতকগুলি পয়সা দণ্ড যাবে—'

আরতি সুব্রতের কাছে মন্তব্য করেছিল : 'মেয়েটিকে যা ভেবেছিলাম তা নয়।'

বড়বাজারের লৌহ ব্যবসায়ী রসময় প্রামাণিকের বাড়িতেও একটা মেশিন বিক্রি হয়েছে আরতির। তাঁর পুত্রবধূ কমলাকে সেদিন উলেন মেশিনের ব্যবহার শেখাতে গিয়েছিল আরতি। গেলে খুব আদর-আপ্যায়ন করে কমলারা। চা-জলখাবার খাওয়ায়। ঘরসংসারের কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কিভাবে মেশিনটা হ্যাণ্ডেল করতে হয়, তা তিন চারদিন দেখাবার পরেও যখন কমলা ধরতে পারেনি, আরতি তখন একটু বিরক্ত হয়ে বলেছিল : 'আঃ কি করছেন আপনি? হয় আপনার মন নেই এদিকে, নয় বুদ্ধি-শুদ্ধির অভাব আছে।'

বলেই অবশ্য হেসে ফেলেছিল আরতি।

কিন্তু কমলা হাসেনি। রাগে তার সমস্ত মুখ ফেটে পড়েছিল, বলেছিল : 'আপনি আজ যেতে পারেন। আজ মেশিন নিয়ে বসবার সময় নেই আমার।'

কিন্তু কেবল এতেই ব্যাপারটা শেষ হয়নি। কমলার শাশুড়ী উপস্থিত ছিলেন সেখানে; তিনি জবাব দিয়েছিলেন : 'আমাদের ঘরের মেয়েছেলেদের বুদ্ধি শুদ্ধি একটু কম থাকলে ক্ষতি নেই মা। যেটুকু আছে, তাতেই আমাদের চ'লে যায়। আমাদের ঘরের বউ-ঝিদের তো আর বেটাছেলের মত বাইরে বেরুতে হয় না, জিনিস ফিরি ক'রে বেড়াতে হয় না লোকের বাড়ি বাড়ি! গেরস্ত ঘরের মেয়ে-ছেলের বুদ্ধি একটু কম থাকাই ভালো।'

আরতি অবাক হয়ে গিয়েছিল। কমলা সেদিন কিছুতেই আর সেলাই নিয়ে বসেনি। কমলার স্বামী নিরঞ্জনবাবু নাকি আরতিদের অফিসে তাই নিয়ে রিপোর্টও করেছেন। হিমাংশুবাবু মৃদু তিরস্কারের সুরে বলছিলেন সে কথা।

বেশ বোঝা যায়, এসব অপ্রীতিকর গল্প স্বামীর কাছে আরতি করতে চায় না। কিন্তু চেপে রাখতে রাখতে কি ক'রে যেন হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিসের একটা ঝাঁজ যেন ফুটে বেরোয় গলায়। কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না আরতি।

সুব্রত সাবধান ক'রে দেয় : 'খবরদার' এখন কিন্তু মেজাজ দেখাবার সময় নয় আমাদের। খুব সাবধানে, খুব হিসাব ক'রে চলতে হবে। এসব রিপোর্ট-টিপোর্ট যাওয়া ভালো কথা নয়। সংসারের অবস্থাটা তো দেখছ।'

আরতি ম্লান একটু হাসল : 'না দেখে কি জো আছে? হিসাব-জ্ঞান কারো চেয়ে আমার কম নয়। ভেব না।'

ফের চাপাচাপি চলল সংসারে। ঝি ছাড়িয়ে দেওয়া হোল। দুধ, কয়লা, চা, ধোপা—সব খরচের ছাঁটাই হোল যথাসম্ভব। সময় বুঝে শাশুড়ীও রোগে পড়লেন। বাড়ি আর অফিস একাই প্রায় সামলাতে হয় আরতিকে। চাকরির চেষ্টায় বেরোবার আগে সুব্রত স্ত্রীকে রান্না আর ঘর-সংসারের কাজে সাহায্য করে। স্ত্রীকে বলে : 'দেখ যেন লেট্-ফেট্ না হয়। এ সময় ইরেগুলারিটি ভালো হবে না।'

কিন্তু অফিস থেকে ফিরবার সময় আরতির মুখ প্রায়ই শুকনো শুকনো দেখা যায় আজকাল। সুব্রত জিজ্ঞাসা করলে বলে : 'কিছু নয়। খাটুনি তো একটু বেশিই পড়ে আজকাল, তাই।'

সুব্রত একদিন ধরে বসল : 'সত্যি ক'রে বল তো অফিসে গোলমাল-টোলমাল চলছে নাকি কিছু?'

আরতি হেসে নিশ্চিন্ত ক'রে দিল স্বামীকে : 'না না, গোলমাল আবার কি হবে? তবে মিঃ মুখার্জীর মেজাজ একটু খিট-খিট হয়ে আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা, তা আমরা কি করব? আমরা তো চেষ্টার কোন ত্রুটি করছি না।'

সুব্রত বলল : 'তোমাকে বলছেন না কি কিছু?'

'আমাকে আবার কি বলবেন?'

সুব্রতের মনে হোল তবে আরতির সম্বন্ধে ভালো ধারণাই আছে হিমাংশু মুখার্জীর।

আর একদিন সামান্য একটু উত্তেজিত দেখাল আরতিকে। সুব্রত বলল : 'কি ব্যাপার?'

আরতি হাসতে চেষ্টা ক'রে বলল : 'কিছু না। কমিশন নিয়ে সামান্য কথান্তর হয়ে গেল হিমাংশুবাবুর সঙ্গে।'

সুব্রত বলল : 'কথান্তর!'

আরতি বলল : 'আমার সঙ্গে নয়, এডিথের সঙ্গে। মিঃ মুখার্জী বলেছিলেন—এক মাসে তিনটা মেসিন যদি বিক্রি করতে পারি, ফাইভ পার্সেন্টের বদলে টেন পার্সেন্ট কমিশন দেবেন। এ মাসে এডিথ বিক্রি করেছে চারটে আর আমি তিনটে। কিন্তু মিঃ মুখার্জী এখন তাঁর কথা উইথড্র করছেন। বলছেন, অত্যন্ত ডাল মার্কেট, এদিকে হিউজ এষ্টাব্লিশমেন্ট চার্জ। এ সময় যদি আপনারা এমন চাপ দেন—'

সুব্রত বলল : 'ঠিকই তো বলেছেন।'

আরতি বলল : 'বল কি তুমি! ঠিক বলেছেন?'

সুব্রত বলল : 'আঃ ছেড়ে দাও। অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। উপরি পরে হবে, আগে নিচের মূলটুকু ঠিক রাখ। যা সময় পড়েছে, দেখছ তো ছুটো-ব্যাঙে চালস্ পেতে পেতেও

পেলাম না, হার্ড ডেজ। ভাবছি ওই পঞ্চাশ টাকার পার্টটাইমটাই আপাততঃ ধরি। বসে থাকবার কোন মানে হয় না। ইয়ে—তোমার সঙ্গে কোন হিচ্ হয়নি তো?'

আরতি স্বামীকে আশ্বস্ত ক'রে বলল: 'আরে নাঃ, আমি কিছু বলিনি। এডিথের সঙ্গেই যা একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে। তবে আমার ভালো লাগছিল না।'

সুব্রত বলল: 'আরে ভালো তো লাগেই না। সময় বুঝে লাগাতে হয়। দাঁড়াও, একটা চাকরি-বাকরি জোগাড় করতে দাও আমাকে—তারপর সব দেখে নেওয়া যাবে। সবুর কর ক'টা দিন।'

কিন্তু ক'টা দিন সবুর বুঝি আর আরতির সইল না। সুব্রত একটা চাকরির ইণ্টারভিউর জন্য বর্ধমান গিয়েছিল। পরে বুঝেছে, লোক দেখানো বিজ্ঞাপন, নিজেদের লোক আগেই ঠিক হয়ে আছে। জোর সুপারিশ নিয়ে গিয়েছিল সুব্রত, তবু সুবিধা হয়নি। বেলা দশটায় বাসায় ফিরে এসে দেখল, আরতি দিব্যি সংসারের কাজ করছে, অফিসে যাওয়ার নাম নেই!

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল: 'ব্যাপার কি তোমার আজ ছুটি নাকি?'

আরতি স্বামীর চোখের দিকে না তাকিয়ে মুখ নীচু ক'রে জবাব দিল: 'হুঁ।'

ভারি বিষণ্ণ আর ম্লান মুখ আরতির, কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে ভিতরে ভিতরে। চোখ দেখে মনে হয় সারা রাত ঘুমোয়নি।

সুব্রত বলল: 'কিসের ছুটি?'

'পরে বলছি।'

'পরে নয়, এখনই বল।'

নিজের ঘরের ভিতরে স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে গেল সুব্রত: 'ব্যাপার কি—'

আরতি ফিস ফিস ক'রে বলল: 'আস্তে। আমি বাবা-মাকে জানাইনি। ছুটি নয়, চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।'

সুব্রত মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে বলল: 'ছেড়ে দিয়েছ! কেন?'

আরতি বলল: 'মান-সম্মান নিয়ে ওখানে আর কাজ করা যায় না।'

এবার কঠিন দেখাল সুব্রতের মুখ, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল: 'হিমাংশুবাবু তোমাকে অসম্ভ্রমকর খারাপ কিছু বলেছেন? I shall teach him a lesson. ভেবেছে কি সে?'

আরতি স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটু হাসল: 'না, সে সব কিছু না।'

সুব্রত একটু শান্ত একটু আশ্বস্ত হয়ে বলল: 'তবে কি?'

আরতি বলল: 'এডিথকে হিমাংশুবাবু অপমান করেছেন।'

'ও এডিথকে! তাতে তোমার কি? কি বলেছেন তিনি এডিথকে?'

আরতি সংক্ষেপে বলল ঘটনাটা।

কমিশন-টমিশন নিয়ে এডিথের সঙ্গে হিমাংশুবাবুর একটু খিটিমিটি হয়ে যাওয়ার পর, তিনি অফিসের রেগুলারিটি সম্বন্ধে আরো একটু সতর্ক হয়েছেন। কোন কাষ্টমারের বাড়ি থেকে ফিরতে একটু দেরি হলে কড়া কৈফিয়ৎ তলব করেন, আর কাউকে তেমন নয় এডিথের ওপরই তাঁর আক্রোশটা বেশি, ফিরতে একটু দেরি হলে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, 'কোত্থেকে আড্ডা দিয়ে ফিরলেন?'

আরতি এতদিন কোন কথা বলেনি। যা জবাব দেওয়ার এডিথই দিয়েছে।

কিন্তু কাল এডিথ ছিল না। অসুস্থতার কথা আগেই ফোন ক'রে জানিয়েছিল। চিঠিও দিয়েছিল একটা। এদিকে রিপন ষ্ট্রীটে একটি মাদ্রাজী ক্রিশ্চিয়ানের বাড়িতে সেদিনই মেশিনটা ডিমনষ্ট্রেট্ করতে নিয়ে যাওয়া দরকার। হিমাংশু এডিথকে না দেখে আগুন হয়ে গেল।

'সিমনস্ কোথায়?'

আরতি বলল: 'সে আসেনি। অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অফিসের দারোয়ানের সঙ্গে চিঠি পাঠিয়েছে।'

চিঠিটি দেখাতে গিয়েছিল আরতি।

হিমাংশু অধীর হয়ে বলেছিল: 'থাক্ থাক্ চিঠি দিয়ে আমি কি করব? অসুস্থ! অসুস্থ না ঘোড়ার ডিম! ইচ্ছা ক'রে আমাকে জব্দ করবার জন্য কামাই করেছে। সে জানে আজ তাকে না হলে আমার কাজের ক্ষতি হবে, তাই—'

আরতি শান্তভাবে বলেছিল: 'তা হয়ত নয়; দারোয়ান তাকে বিছানায় শোয়া অবস্থায় দেখে এসেছে।'

হিমাংশু একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিল: 'তা শুয়ে থাকবে না করবে কি? কাল রবিবার গেছে। উপ্‌রি রোজগারের লোভে গেষ্টদের এণ্টারটেন ক'রে আজ আর উঠতে পারবে কেন?'

রমা আর মল্লিকা দু'জনেই ছিল রুমের মধ্যে। তারা আরক্ত হয়ে মুখ নীচু ক'রে রইল। পূর্ব প্রান্তের একজন যুবক কেরাণী পশ্চিমের আর একজন প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

হিমাংশু চলে যাচ্ছিল, কিন্তু আরতি তীরের মত চেয়ার ছেড়ে সোজা উঠে দাঁড়াল: 'আপনি এডিথের নামে অমন যা তা বলতে পারবেন না।'

হিমাংশু বলল: 'সরি, আপনাদের সামনে কথাটা বলা হয়ত ঠিক হয়নি। কিন্তু যা বলেছি তা ঠিকই। ওরা ও-ই।'

আরতি তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করেছিল : 'কক্ষণো না। এডিথের স্বামী আছে, সন্তান আছে—'

হিমাংশু একটু হেসেছিল : 'তা সব মেয়েরই থাকে। আপনি ওদের চেনেন না।'

আরতি তেমনি অসহিষ্ণু উদ্ধত ভঙ্গীতে বলেছিল : 'আমি খুবই চিনি। এডিথের সঙ্গে আমি আজ ছ' মাস ধরে কাজ করছি। আপনিই না জেনে শুনে তাকে ইনসাল্ট করেছেন। আপনি যা বলেছেন উইথড্র করা উচিত।'

হিমাংশু কিছুক্ষণ জ্বলন্ত চোখে আরতির দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল : 'বটে! আমি যা বলেছি তার একটা অক্ষরও উইথড্র করা উচিত নয়, উইথড্র আমি করব না। আমি আবার বলছি, সে অত্যন্ত খারাপ টাইপের লুজ মরাল্‌সের মেয়ে।'

আরতি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেছিল : 'আপনি যা বলেছেন উইথড্র না করলে কোন ভদ্রলোকের মেয়েছেলে আপনার এখানে কাজ করতে পারে না।'

'বেশ তো।' বলে চেম্বারে ফিরে গিয়েছিল হিমাংশু ; কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে যখন রেজিগনেশন লেটার বেয়ারা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল আরতি তখন হিমাংশুই ফের উঠে এসেছিল : 'আপনি কি পাগল হলেন নাকি মিসেস মজুমদার ? কোথাকার একটা যা তা টাইপের মেয়ে, জাতে মেলে না, ধর্মে মেলে না, তার জন্য আপনি চাকরি ছাড়তে যাবেন কেন ? আপনাকে তো কিছু আর বলা হয়নি ?'

আরতি বলল : 'আমাদেরই বলা হয়েছে।'

হল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ফের ডেকেছিল হিমাংশু : 'শুনুন, শুনুন। পাগলামি করবেন না। আপনাদের বাড়ির অবস্থা আমি জানি।'

আরতি ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল : 'আপনি উইথড্র করছেন তাহ'লে ?'

হিমাংশু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গম্ভীর, কঠিন স্বরে বলেছিল : 'না'।

আরতি আর দাঁড়ায়নি।

সমস্ত বাড়িটা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত কেউ কোন সাড়া শব্দ করল না। কি একটা সাংঘাতিক অঘটন যে ঘটেছে, তা কারো বুঝতে বাকি নেই। মন্টু সন্টু ফিস ফিস করতে লাগল, 'বৌদিরও চাকরি গেছে।'

ছেলের কাছে প্রিয়গোপাল আর সরোজিনী সব শুনলেন। কিন্তু সব বুঝলেন না। সত্যিই তো কোথাকার না কোথাকার একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। ওরা তো ওই ধরনেরই হয়। কাজের গাফিলতির জন্য মনিব যদি চটে গিয়ে দু'চার কথা তার সম্বন্ধে বলেই থাকে তো কি হয়েছে ? দোষ দেখলে তাঁরা বলেন না তাঁদের ঝি, চাকরকে ? যে

গরু দুধ দেয় তার চাঁটও সয়। চাকরি করতে গেলে মনিবের মেজাজ বুঝে চলতে হয় বৈকি। তা ছাড়া আরতিকে তো হিমাংশু কিছু বলেনি। বলবে কেন, একই জেলার লোক, জাতে একই বামুন, বলতে গেলে আত্মীয়ের মত।

প্রিয়গোপাল অবশ্য কোন কথাই বললেন না। খলের মধ্যে ডালিমের রসের সঙ্গে স্বর্ণ-সিন্দুর মেড়ে জিভ দিয়ে চেটে চেটে খেতে লাগলেন। সংসারের কোন কথার মধ্যে তিনি আর নেই।

সরোজিনী বঁটিতে কুটনো কুটতে কুটতে নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'আর এই কি আমাদের মেজাজ দেখাবার গোঁয়ার্তুমি করবার সময়? এমন চাকরি নেওয়াই বা কেন, আর ছাড়াই বা কেন? কিছু বুঝিনে বাপু।'

সুব্রত কাছেই চুপ ক'রে বসেছিল, মার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল: 'সবচেয়ে মজার কথা মা, সত্যি সত্যি যাকে অপমান করেছে সে হয়ত দিব্যি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে অফিসে হাজির হয়ে এতক্ষণে কাজও সুরু করে দিয়েছে। সে তো আর সেন্টিমেণ্টাল বাঙ্গালী মেয়ে নয়।'

'তুমি, তুমিও তাই বলছ?'

আরতি চোখ তুলে তাকাল স্বামীর দিকে।

সুব্রত দেখল এতক্ষণে, এতদিন বাদে আরতির আয়তসুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে!

জৈব

'...সুতরাং হেরেডিটি বা বংশানুক্রমণ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে প্রচলিত ধারণা আছে তার ভিত্তি এবং সত্যতা আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে পিতামাতা এবং ঊর্ধতন পিতৃকুল মাতৃকুলের শারীরিক গঠন-বিন্যাস থেকে সুরু ক'রে মানসিক গুণাগুণ, বৃত্তি-প্রবৃত্তির কতখানি অংশ বংশানুক্রমের সূত্রে উত্তরপুরুষে এসে পৌঁছতে পারে, আবার পারিপার্শ্বিকের প্রভাব—মানে প্রাকৃতিক আবহাওয়া, পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্যই বা সেই বংশানুক্রম ও মানুষের জীবনযাত্রাকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে...'

রেডিওর সুইচটা অফ্ ক'রে দিতে দিতে করবী বিরক্তির ভঙ্গিতে বলল, 'নাঃ ফের সেই বক্তৃতা সুরু হোল। এতরাত্রে কোথায় দু' একটা ভালো গান-টান দেবে প্রোগ্রামে, তা নয়—'

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আমার ডাক্তার বন্ধু বাসব মুখুয্যে চুপচাপ সিগারেট টানছিল করবীর দিকে চেয়ে, হঠাৎ বলে উঠল, 'আহাহা বন্ধ ক'রে দিলেন নাকি ?'

করবী বলল, 'বন্ধ করব না কি করব, যে সে লোকের যত সব বাজে বক্তৃতা শুনবেন নাকি বসে বসে ?'

বাসব বলল, 'বক্তৃতা বাজে কিনা তা অবশ্য সঠিক বলা যায় না। কিন্তু লোকটি একেবারে যে সে নয়, ইউনিভার্সিটির স্কলার, এখানকার এক কলেজের প্রফেসর—'

করবী এবার বেশ একটু ঘাবড়ে গেল, কিন্তু মুখের জেদ ছাড়ল না; বলল, 'তা হোলই বা স্কলার। আর প্রফেসর হলেই যে—'

বাসব বলল, 'কেবল তাই নয়, মৃগাঙ্ক মজুমদারের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয়ও আছে!'

করবী বলল, 'ও তাই বলুন, সেই জন্যই বুঝি অমন মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনছিলেন, সত্যি ফোনে' রেডিওতে আত্মীয়-স্বজন, চেনা-শোনা বন্ধু-বান্ধবের গলা আমারও ভারি ভালো লাগে শুনতে।'

রেডিওটা আবার খুলতে যাচ্ছিল করবী, বাসব বাধা দিয়ে বলল, 'ওকি, আবার খুলছেন নাকি ? না না, থাক্ থাক্।'

এবার আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কেন। এই না বললে তোমার কোন প্রফেসর বন্ধুর বক্তৃতা!'

বাসব বলল, 'তাই বলে সেই বক্তৃতা যে আগাগোড়া শুনতেই হবে এমন কথা বলিনি। তাছাড়া রেডিওতে বন্ধু-বান্ধবের গলা আমার ভালো লাগে না, আমার কান তো আর তোমার স্ত্রীর কানের মত নয়।'

হেসে বললুম, 'তা তো নয়ই। তুমি বড়জোর চামড়ার স্টেথোস্কোপ কানে গুঁজতে পারো, কিন্তু আমার স্ত্রীর মত এমন রত্নখচিত কান তুমি কোথায় পাবে!'

বাসবও হাসল, 'সে কথা সত্যি।'

করবী বলল, 'তাহলে শুনবেন না আপনার বন্ধুর বক্তৃতা ?'

বাসব মাথা নাড়ল, 'না থাক, মৃগাঙ্কবাবুর এসব টক্ আমার ভারি খারাপ লাগে। ওঁর বোঝা উচিত সুহৃত্তা এতে কত কষ্ট পান, অশান্তি ভোগ করেন। তাঁর মনের ওপর এগুলির প্রতিক্রিয়া—'

শুধু গলায় নয়, চোখেমুখেও কৌতূহল ঝলকে উঠল করবীর, 'সুদত্তা কে ?'

বাসবের মুখ দেখে মনে হোল কথাগুলি ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলে সে লজ্জিত হয়ে পড়েছে।

একটু গম্ভীর হয়ে বাসব বলল, 'সুদত্তা মৃগাঙ্কবাবুর স্ত্রী।'

করবী বলল, 'তাহ'লে স্বামীর বক্তৃতা শুনতে তাঁর কষ্ট হবে কেন, কি যে বলেন।'

প্রসঙ্গটা একটু হালকা করবার চেষ্টায় আমি বললুম, 'তা ঠিক। মাথা মুণ্ড না থাকলেও স্বামীর বক্তৃতা আর তাল মান না থাকলেও স্ত্রীর গান পরস্পরের কানে বোধ হয় সব চেয়ে সুখশ্রাব্য।'

আমার এমন রসিকতাটা মাঠে মারা গেল, কারণ বাসব তেমনি গম্ভীর হয়ে রইল। করবীও আমার কথায় কোন রকম কান না দিয়ে বাসবের দিকে চেয়ে বলল, 'বিষয়টা কি বাসববাবু ? অবশ্য খুব গোপনীয় হলে—'

বাসব একটু হেসে বলল, 'খুবই গোপনীয়। তবু না হয় খানিকটা কৌতূহল আপনার মেটাতে পারতুম কিন্তু ব্যাপারটা আপনার কাছে বলাও মুশকিল।'

করবী বলল, 'কিচ্ছু মুশকিল হবে না। আমার নার্ভ আপনাদের কারো চেয়ে কম শক্ত নয়।'

বাসব একটু হাসল, 'মেয়েরা প্রথম প্রথম ওই রকমই ভাবে, ওই রকমই বলে, কিন্তু শেষে দেখা যায়—'

করবী অধীর হয়ে বলল, 'শেষে যা দেখা যায় তা আমরা না হয় শেষেই দেখব। কিন্তু বলতেই যদি চান গোড়া থেকেই বলুন দয়া ক'রে।'

ছাই-দানিতে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল বাসব, তারপর বলল, 'আচ্ছা, তাহলে শুনুন। তবে গোড়া থেকে নয়, মাঝখান থেকে। কেননা গোড়ার ব্যাপারটা আমিও তেমন জানি না।'

দাঙ্গার সময়কার ঘটনা। ডিস্‌পেন্‌সারীতে সেদিন তেমন ভিড় নেই। কারণ আমার বেশীর ভাগ রোগীই মুসলমান, দাঙ্গাহাঙ্গামার জের তখনও চলতে থাকায় হিন্দুপাড়ায় তারাও আসতে পারে না, আমারও ওদিকে যাওয়া নিরাপদ নয়। কিন্তু চাল ডাল তেল নুনের প্রয়োজন তো আর দাঙ্গার জন্য অপেক্ষা করে না। আর তার জন্য টাকারও দরকার হয়। মন মেজাজ ভারি খারাপ। অন্য সময় রাত ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত বেশ ভিড় থাকে রোগীর। সেদিন আটটা বাজতে না বাজতেই ডিসপেনসারী খালি হয়ে গেল। পাড়ার দু' চার জন রোগী যা ছিল প্রায়ই খাতিরের। তাদের বিদায় দিয়ে উঠি উঠি করছি। ডিসপেনসারীর সামনে সশব্দে হঠাৎ এক খানা ট্যাক্সী এসে থামল। রোগীর

সাড়া পেয়ে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে সোজা হয়ে বসলুম, নিমেষের মধ্যে টেবিলটাকেও গুছিয়ে নিলাম একটু। ততক্ষণে ভদ্রলোক এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন।

মুখের দিকে তাকিয়ে চেনা চেনা মনে হোল, একটু ইতস্তত করে বললুম, 'বসুন।'

সাতাশ আঠাশ বছরের স্বাস্থ্যবান সুদর্শন ভদ্রলোক সামনের চেয়ারে বসে বললেন, 'আপনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারলেন না। আমরা স্কটিশে বছর দুই একসঙ্গে পড়েছিলুম।'

বললুম, 'ও ঠিক ঠিক, এবার মনে পড়েছে, আপনার নাম বোধ হয়—'

'মৃগাঙ্ক মজুমদার।'

বললুম, 'অনেকদিন পরে দেখা হোল।' .

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা হোল। দেখুন, আমি খুব একটা দরকারে আপনার কাছে এসেছি।'

মৃগাঙ্কবাবুর দিকে একটু তাকিয়ে নিলুম। বেশ লম্বা-চওড়া সবল চেহারা। ফর্সা গায়ের রঙ। চওড়া কপাল। মাথার চুল ব্যাক্‌ব্রাস করা। অস্বাস্থ্যের তেমন কোন লক্ষণ চোখে পড়ল না। কিন্তু অসুখ তো আর সব সময় প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। এমন কি ডাক্তারের চোখেও নয়।

'বলুন।'

ভদ্রলোক একবার ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা বিশেষ গোপনীয়।'

ডিসপেনসারীতে দ্বিতীয় জনপ্রাণী নেই। পার্টিশনের ওপাশে কম্পাউণ্ডার রমেশ ওষুধের আলমারীর সামনের টুলটায় ঢুলছে। চাকর হরিদাসও কাছাকাছি নেই। কোথাও বোধ হয় মোড়ের পান বিড়ির দোকানটায় গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

বললুম, 'তাহলেও এখানে বলতে পারেন। আর যদি কোন অসুবিধা বোধ করেন, তাহলে পাশের কেবিনে চলুন।'

একবার কেবিনের কাটা দরজার দিকে আর একবার বাইরে দাঁড়ানো ট্যাক্সীটার দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আমার স্ত্রী রয়েছেন গাড়িতে।'

একজন মহিলা যে গাড়িতে বসে আছেন তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু যেন এইমাত্র ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম তেমনি ভঙ্গিতে বললুম, 'সে কি, ওঁকে নিয়ে আসুন এখানে।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'দরকার হলে পরে আনব।'

বললুম, 'আচ্ছা তাহলে কি কেবিনের ভিতর যাবেন?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'দরকার নেই, এখানেই বলছি। She is in family way. But we don't want it. বুঝতে পারছেন ?'

বললুম, 'বুঝেছি। কতদিন হোল ?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'stageটা একটু advanced. চার মাস চলছে।'

বললুম, 'একটু মানে বেশ advanced. এখন কিছুই করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া মনে কিছু করবেন না, এ সব কথা আপনারা ভাবছেনই বা কেন। আপনাদের আর কি কোন সন্তান আছে ?'

'না।'

'তাহলে ? তা ছাড়া এ সব ব্যাপারে আগে থেকে সাবধান হওয়াই ত ভাল।'

'Precaution আমরা নিতাম।'

'Fail করেছে বুঝি ? কিন্তু দু' একটি সন্তানও হ'তে দেবেন না এই বা কোন্ কথা ? আপনার স্ত্রীর বয়স কত ?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তেইশ চব্বিশ।'

বললুম, 'এই বয়সে দুটি একটি সন্তান থাকাই তো ভালো।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা জানি কিন্তু আমার স্ত্রীকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না।'

একটু অবাক হয়ে থেকে বললুম, 'মাতৃত্বটা কেন যে মেয়েরা আজকাল পছন্দ করেন না বুঝি না, ওঁকে যদি এখানে আনেন আমি বরং বুঝিয়ে বল্‌তে পারি। তাছাড়া এখন তো কিছুই করা সম্ভব নয়। কোন বুদ্ধিমান লোকই এতে রাজী হবে না।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'অন্যান্য ডাক্তাররাও সেই কথা বলেছেন। আচ্ছা আপনিই বরং সুদত্তাকে একটু বুঝিয়ে বলুন। দেখুন আমার মোটেই ইচ্ছে নয়। কতখানি বিপদের সম্ভাবনা তা খুবই বুঝতে পারছি। তবু ওকে নিয়েই বড় মুশকিলে পড়েছি।'

মৃগাঙ্কবাবু উঠে গিয়ে গাড়ি থেকে স্ত্রীকে নামিয়ে আনলেন। লম্বা দোহারা চেহারার ফর্সা সুন্দরী বধূ। বেশ স্বাস্থ্যবতী। এ অবস্থায়ও তেমন কোন অবসাদ কি ক্লান্তির ভাব নেই। অথচ কেন এসব অদ্ভুত খেয়াল এঁদের হচ্ছে আমি ভেবে পেলাম না।

বললুম, 'পাশের ঘরে চলুন।'

মহিলাটিকে বেশ একটু খুশি মনে হোল। যেন আশাপ্রদ খবর কিছু পেয়েছেন।

তিনজনেই ঢুকলুম কেবিনে। গদিআঁটা বেঞ্চটায় পাশাপাশি বসলুম।

আমি কিছু বলবার আগে ভদ্রমহিলাই কথা বললেন, 'আপনি তাহলে রাজী আছেন? আপনি পারবেন ?'

মাথা নেড়ে বললুম, 'কেউ পারবে না। এ সব অসম্ভব ব্যাপার আপনারা চিন্তা করছেন কেন বলুন তো ?'

স্বদত্তার মুখখানা একটু যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল কিন্তু পর মুহূর্তেই আরক্ত মুখে উত্তেজিত স্বরে তিনি বললেন, 'দেখুন, আপনার কাছে আমি হিতোপদেশ শুনতে আসিনি। এসব উপদেশ ডাক্তাররা আজ মাস দেড়েক ধরে আমাকে শোনাচ্ছেন। কোন পথ আছে কি না, তাই বলুন, যত টাকা লাগে—'

ভদ্রঘরের এমন একটি সুন্দরী শিক্ষিতা মহিলার মুখে এসব কথা উচ্চারিত হতে শুনে আহত হয়ে বললুম, 'দেখুন, টাকার প্রশ্ন নয়, বৈধতার প্রশ্নও না-হয় বাদ দিলুম। কিন্তু আপনার জীবনের যেখানে risk—'

'জীবনের risk !' যেন অসহায় ভাবে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন স্বদত্তা, 'আপনি তো জানেন না প্রতিমুহূর্তে পলে পলে আমি কি ভাবে দগ্ধ হয়ে মরছি। সব সময়ের জন্য গা ঘিন ঘিন করছে আমার, গা বমি বমি করছে। খেতে শুতে উঠতে বসতে কাঁটার মত বিঁধছে আমাকে। আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না, কিছুতেই না। দয়া ক'রে আপনি আমাকে বাঁচান। অশুচিতার হাত থেকে রক্ষা করুন। চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব আপনার কাছে।'

আমি অবাক হয়ে মৃগাঙ্কবাবুর দিকে তাকালুম। তিনি স্ত্রীর আধা-হিস্টেরিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে আছেন।

একটু পরে স্বদত্তাই ফের কথা বললেন, 'ওঁকে বল, ওঁকে সব বুঝিয়ে বল। কোন কথা গোপন করবার দরকার নেই।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'কিন্তু সব খুলে বললেই তো আর ডাক্তারী শাস্ত্র বদলে যাবে না স্বদত্তা, খুলে তো এমন আরো দু'চার জনকে বলেছি।'

'ওঁকেও বল। উনি নিশ্চয়ই কিছু একটা পথ বলে দিতে পারবেন।'

মৃগাঙ্কবাবু আমার দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে পাশের ঘরে আসতে বললেন। স্বদত্তা বসে রইলেন কেবিনে।

আড়ালে বসে একটু ইতস্তত ক'রে মৃগাঙ্কবাবু সংক্ষেপে আমাকে বললেন, 'উত্তর ভারতে দাঙ্গার সময় আমার স্ত্রী লাহোরে ছিলেন।'

বললুম, 'আত্মীয়ের কাছে বুঝি ?'

'হ্যাঁ, সেইখানেই দুর্ঘটনা ঘটে। মাস তিনেক পরে একটি ছোট্ট স্টেট্ থেকে স্বদত্তাকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। কিন্তু মনের স্বাভাবিক অবস্থা কিছুতেই ওর ফিরে আসছে

না, কেবল ডাক্তারের বাড়ি দৌড়োদৌড়ি করাচ্ছে। অথচ আমি বেশ জানি এ অবস্থায় ডাক্তারদের কিছু করবার নেই, করা সঙ্গতও নয়।'

আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'না, ওঁকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে শান্ত রাখাই আমাদের এখন উচিত।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা তো বটেই। আমি ওকে যথেষ্ট বুঝিয়েছি। একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি। We must wait for the proper time'.

বললুম, 'ওঁকে ওঁর বাপমার কাছে পাঠিয়ে দিন না কেন। সেখানে হয়তো খানিকটা শান্তিতে থাকবেন।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'বাপ মা নেই। দূরসম্পর্কের কাকা কাকীমা আছেন। সেখানে জোর ক'রে পাঠিয়েছিলাম। দু'দিন বাদেই ফিরে এসেছে। তাঁরাও তো সব শুনেছেন। এসব ঝক্কি পোহাতে তাঁরাও ভিতরে ভিতরে রাজী নন।'

মৃগাঙ্কবাবু উঠে দাঁড়ালেন. 'অকারণে আপনাকে বিরক্ত করলুম। আপনার ফীজ—'

বললুম, 'ছি ছি ছি আপনাদের জন্যে কিছু করতে পারলে খুব খুশি হতুম কিন্তু এ অবস্থায়—। পরে যদি কোন দরকার হয়—।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। দরকার তো হবেই, ওই সময় কোন হাসপাতাল-এর সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে হবে। আমার তেমন কোন জানাশোনা নেই—'

বললুম, 'সেজন্য কোন অসুবিধে হবে না। কারমাইকেলের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগাযোগ আছে। সময়মত সেখানেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি ভাববেন না।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ। একদিন আসুন না আমাদের ওখানে। বিডন স্ট্রীটে আমার বাসা। এলে খুব খুশি হব। সেই সব কলেজী দিনগুলিই ভালো ছিল মশাই।'

বললুম, 'সত্যি।'

বাসব একটু থেমে করবীর মুখের দিকে তাকাল। করবী একটি মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছে। মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু শুনবার আগ্রহ যে তেমনি আছে সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ রইল না। বললুম, 'তারপর?'

বাসব আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'তারপর পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে বারকয়েক দেখা সাক্ষাৎ হোল মৃগাঙ্কবাবুদের সঙ্গে। যত আলাপ পরিচয় হতে লাগল, মৃগাঙ্কবাবুর ওপর আমার তত শ্রদ্ধা বাড়তে লাগল। সত্যি বলতে কি, কলেজের ভালো ছেলেদের সম্বন্ধে আমার তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। ফার্স্ট বেঞ্চ আর ফার্স্ট-ক্লাস ওয়ালারা

জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে নিতান্তই তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ, এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবুকে দেখে সে ধারণা পালটাতে সুরু করল। ওঁর নিজের সাবজেক্ট কেমিস্ট্রি। কিন্তু রসায়নেই ওঁর রসের পিপাসা সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধেও বেশ ঔৎসুক্য আছে। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধেও উৎসাহের অভাব নেই। কিন্তু আমাকে যা আকর্ষণ করল তা ওঁর পাণ্ডিত্য নয়, মৃগাঙ্কবাবুর অমায়িক ব্যবহার, সৌজন্য, শিষ্টাচারেই আমি বেশি মুগ্ধ হলাম। বিশেষত স্ত্রী সম্বন্ধে যে দুর্ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে তাকে তিনি অত্যন্ত সহজভাবে নিতে পেরেছেন দেখে আরো ভালো লাগল। যতই বলি আমি নিজে হ'লে এমন হয়তো পারতাম না।

কথায় কথায় মৃগাঙ্কবাবু একদিন বললেন, "সেদিন রাত্রের ব্যবহারে আপনি আশ্চর্য হয়েছিলেন বোধ হয়। আমি জানি ওসব হবার নয়, বিন্দুমাত্র রিস্ক আমি নিতে চাইনে। কিন্তু কি করব বলুন, সুদত্তাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারলুম না, ওকে দেখাবার জন্যই—"

বললুম, "তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। না হলে আপনার মত লোক অমন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব—"

আরো এ্যাডভানস্‌ড্ স্টেজে পৌঁছে সুদত্তাও ওসব চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হলেন। তিনিও বুঝতে পারলেন শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব নয়, কেউ তাঁকে কোন রকম সাহায্য করবে না, করতে পারবে না।

কিন্তু বাইরে নিশ্চেষ্ট রইলেন বটে ভিতরে ভিতরে কথাটা প্রায়ই তাঁর মনে খোঁচা দিতে লাগল। একদিন গভীর অভিমানে বললেন, "আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রের ওপর আমার আর কিছু মাত্র বিশ্বাস নেই।"

আমি চুপ ক'রে রইলুম। ডাক্তারী শাস্ত্রের পক্ষ নিয়ে ওকালতি করতে মন সরল না। কারণ এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর স্ত্রী যে কত কষ্ট পাচ্ছেন তা মৃগাঙ্কবাবু আমাকে সবই প্রায় খুলে বলেছিলেন। সব সময় একটা অশুচি অপবিত্রতার ভাব সুদত্তা মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। এমনকি স্বামীর গাঢ় আলিঙ্গনের মধ্যেও সুদত্তা শিউরে উঠতেন, কিংবা আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন। স্ত্রীর ভাবভঙ্গি দেখে মৃগাঙ্কবাবুরও যে মাঝে মাঝে আড়ষ্টতা না আসত তা নয়, কিন্তু অসীম তাঁর ধৈর্য, অদ্ভুত তাঁর বৈজ্ঞানিক সহিষ্ণুতা। স্ত্রীর স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য মৃগাঙ্কবাবুরও চেষ্টার অন্ত ছিল না। এর আগে সিনেমা থিয়েটার মৃগাঙ্কবাবু পছন্দ করতেন না। নিজের কাজ কর্মের পক্ষে অনিষ্টকর বলে মনে করতেন ওগুলিকে। অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে সুদত্তা দেখতে যেতেন সিনেমা থিয়েটার। কিন্তু এই ব্যাপারের পর মৃগাঙ্কবাবু নিজে হলেন তাঁর সঙ্গী। সুদত্তা অবশ্য বেশি

বাইরে যেতে চাইতেন না। সারা দিন রাত ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চাইতেন। কিন্তু আমিই পরামর্শ দিয়েছিলাম, ওঁকে একা থাকতে দেওয়া ঠিক নয়। বরং এ সময় একটু হাঁটা-চলা করা ভালো, যাতে আলো হাওয়া গায়ে লাগে আর মনটা প্রফুল্ল থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

এসব উপদেশ অবশ্য সুদত্তা মোটেই কানে তুলতেন না। বরং এই অবস্থায় শরীরের পক্ষে যত রকম অনিয়ম অত্যাচার করা সম্ভব সবই তিনি করতেন। সময় মত নাইতেন না, খেতেন না, নানাভাবে নিজের শরীরকে নিপীড়ন করতেন। আমরা বুঝতে পারতুম এই নিপীড়নের মূল লক্ষ্য কি।

একদিন সুদত্তা বললেন, "বাসববাবু, এমন কিছু করা যায় না, ভিতরের জিনিসটা যাতে আপনা আপনি নষ্ট হয়ে যায়? আমি যে আর সহ্য করতে পারছিনে।"

আমি বুঝতে পারতুম এই সব কথা বলবার জন্যই, এই সব আলোচনার জন্যই সুদত্তা আমাকে তাঁদের বাসায় মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন। মৃগাঙ্কবাবুও চাইতেন আমি তাঁদের ওখানে যাই। সুদত্তা এসব কথা আলোচনা করুন আমার সঙ্গে। কারণ এভাবে সুদত্তার মনের ঘৃণা, বিতৃষ্ণা, ওই ধরনের চিন্তা প্রকাশের পথ পাবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুদত্তাও খানিকটা তৃপ্তি আর স্বস্তি বোধ করবেন।

'একদিন এক কাণ্ড ঘটল। মৃগাঙ্কবাবুর মুখেই শুনেছিলাম ঘটনাটা। তাঁর দূর সম্পর্কের এক পিসীমা থাকতেন কাশীতে। চোখের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসে মৃগাঙ্কবাবুদের বাসায় রইলেন কিছুদিন। আমিই তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। দুই চোখেই ক্যাটার‍্যাক্ট। অপারেশন করাতে হবে। মৃগাঙ্কবাবুর পিসীমা কেবল যে চোখেই কম দেখেন তা নয়, কানেও কম শোনেন। এসব দাঙ্গাহাঙ্গামা আর মৃগাঙ্কবাবুদের ভাগ্য বিপর্যয়ের খবর তাঁর কানে যায়নি।

কিন্তু চোখে যতই কম দেখুন, সুদত্তার সন্তান সম্ভাবনাটা তাঁর দৃষ্টি এড়াল না।

'ক'মাস হোল? বউয়ের সাধটাধ দিয়েছিস?'

মৃগাঙ্কবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'ওসব আমরা মানিনে পিসীমা।'

পিসীমা বললেন, 'তা মানবি কেন। যত সব ম্লেচ্ছ খৃষ্টানের দল। সাধ না দিলে কি হয় জানিস? ছেলে 'ছোঁচা' হবে। সব সময় লালা বেরুবে মুখ দিয়ে। কোলে নিতে পারবি নে, জামা কাপড় সব নষ্ট হয়ে যাবে। ভালোয় ভালোয় সাধ দে। বউয়ের যা খেতে ইচ্ছা করে এনে এনে খাওয়া। এ খাওয়ানো কেবল পরের মেয়েকে নয়। যে আপন জন পেটের মধ্যে আস্তানা গেড়েছে, মায়ের মুখ দিয়ে সে-ই এসব ভালো অভালোর স্বাদ

নেবে। তা যেমন বাপের ঘরে জন্মেছিস তেমনি তো হবি? যেমন আমার দাদার হাত দিয়ে জল গলে না, তেমনি হয়েছিস তুই, কৃপণের শিরোমণি।'

মৃগাঙ্কবাবুর বাবা কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন। এদিকে অবস্থা একটু শান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাড়িতে গেছেন। জমি-জমা বিষয়-সম্পত্তি সব সেইখানে। নিজেকেই দেখতে হয়।

দাদার পরিবর্তে তাঁর বোন মৃগাঙ্কবাবুর পিসীমাই বউয়ের সাধের বন্দোবস্ত করলেন, ভাইপোকে ধমকে ফরমায়েস ক'রে ক'রে আনালেন সব জিনিসপত্র। নিজের হাতে রাঁধলেন মিষ্টান্ন, তৈরী করলেন পিঠে পায়েস। আনালেন নতুন শাড়ি। তারপর সব সাজিয়ে ধরলেন বউয়ের সামনে।

সুদত্তা পিসী শাশুড়ীর অলক্ষ্যে সব নর্দমায় ফেলে দিলেন। স্বামীকে ডেকে বললেন, 'পিসীমাই না হয় কিছু জানেন না, কিন্তু তুমি জেনে শুনে আমাকে এমন ক'রে অপমান করছ কেন?'

তারপর বালিশে মুখ চেপে এই কান্না। সুদত্তা নান না, খান না, বেরোন না ঘর থেকে।

অপারেশন শেষ হলেও মৃগাঙ্কবাবুর পিসীমা প্রায় মাসখানেক হাসপাতালে রইলেন। যাওয়ার সময় বললেন, 'যদি দরকার হয় বল। এ সময় একজন কারো বউয়ের কাছে থাকা উচিত। যদি বলিস আমি থেকে যাই।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'না পিসীমা, তোমাকে আর আটকে রাখতে চাইনে, তুমি কিচ্ছু ভেব না, আমি নার্স রেখে দেব।'

পিসীমা একটু দুঃখিত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা, ভালোয় ভালোয় সব হয়ে গেলে একটা খবর দিস। ছেলে না মেয়ে জানাস কিন্তু একটা পোষ্টকার্ড দিয়ে। আহা, বাবা বিশ্বনাথ করুন ছেলেই যেন হয় তোর ঘরে। পাকা ডালা দেব বাবার মন্দিরে। নাম রাখব বিশ্বেশ্বর।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার গাড়ির সময় হোল, গুছিয়ে নাও তাড়াতাড়ি।'

মৃগাঙ্কবাবুদের বাড়ির একতলায় আর এক ঘর ভাড়াটে থাকে। স্বামী, স্ত্রী আর শাশুড়ী। বউটি নিঃসন্তান। অনেক ডাক্তার কবরেজ দেখান হয়েছে, কালী মন্দিরে তারকেশ্বরে মানত রয়েছে বহু। হাতে তাবিজ, গলায় মাদুলী। বউটি মাঝে মাঝে সুদত্তাকে বলে, 'দিদি, একি মেমসাহেবী ঢং আপনাদের। সাত রাজার ধন মানিক আসছে

ঘরে। কোন রকম সাড়া শব্দই নেই। শীত এলো। জামা আর মোজা কিছু ক'রে টরে রাখুন। নইলে শেষে কিন্তু ভারি অসুবিধে হবে।'

সুদত্তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা ক'রে বলেন, 'ওসব কিছু দরকার হয় না আমাদের।'

বউটি বলে, 'হয় আবার না। দিদি, নিজের পেটেই না হয় কিছু হয়নি। তাই বলে দেখিনি শুনিনি এমন তো নয়। আমার তিন বোনের তেরটি ছেলে মেয়ে। কাঁথা টাথা না ক'রে রাখলে ভারি কষ্ট হয় শেষে। আচ্ছা, আপনার নিজের যদি আলস্য লাগে, আমাকে আনিয়ে দিন উল টুল আমি সব ক'রে দেব, কিচ্ছু ভাবনা নেই আপনাদের। লোকে চেয়ে পায় না, আর আপনারা—'

এত সব কথার পরেও সুদত্তা জিনিসপত্র আনয়ে দিলেন না দেখে বউটি নিজের স্বামীকে দিয়ে উল আনিয়ে টুপী আর মোজা বুনতে সুরু করল।

সুদত্তা স্বামীকে বললেন, 'আর তো পারিনে। তার চেয়ে ওদের সব খুলে বল। জগৎ শুদ্ধ্ লোককে জানিয়ে দাও—উঃ, জঘন্য, জঘন্য, আমি আর সহ্য করতে পারব না—'

কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু সহ্য করতে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে কথা-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে কখনো তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে দেখিনি।

তারপর শেষ পর্যন্ত সুদত্তার সময় এল। কারমাইকেলে আমি কিছুদিন হাউস সার্জন ছিলাম জানো বোধ হয়। গেলে এখনো সবাই খাতির যত্ন করে। কোন রকম অসুবিধাই হোল না। আলাদা একটা কেবিন নেওয়া হোল সুদত্তার জন্য। দু'জন নার্স রাখা হোল। ওয়ার্ডের ডাক্তার বোসকে আমি বিশেষ ভাবে বলে দিলুম খোঁজ খবর নিতে। তবু মৃগাঙ্কবাবু আমাকে অনুরোধ করলেন, 'আপনার পক্ষে যদি থাকা সম্ভব হয়, খুব উপকৃত হব—'

হেসে বললুম, 'তার দরকার হবে না। তবু আমি সাধ্য মত খোঁজ খবর নেব। ডেলিভারির পরই যাতে আমাকে ফোনে জানানো হয় তারও ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি।'

স্বামীর উদ্বেগ দেখে সুদত্তাও একটু হাসলেন, 'অত ভাবছ কেন তুমি, কিছু ভয় নেই—'

সুদত্তার মুখের এই হাসিটুকু ভারি ভালো লাগল। বেশ লাগল তাঁর স্বামীকে আশ্বাস দেওয়ার ধরণটুকু। মনে হোল তিনি নিজেও আশ্বস্ত হতে পারছেন। উদ্বেগ অশান্তি অস্বস্তির হাত থেকে এবার মুক্তি। আগেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সব বন্দোবস্ত ক'রে রাখা হয়েছে। ডেলিভারির পর সন্তানটিকে নার্স অন্য ঘরে সরিয়ে নেবে, তারপর মেথর টেথর কেউ যদি নেয় দিয়ে দেওয়া হবে তাকে, আর না হয় কোন আশ্রম টাশ্রমে। সে সব ব্যবস্থা ওরাই করবে। সেজন্য মৃগাঙ্কবাবুকে কিছু ভাবতে হবে না। এমন কেস্ মাঝে মাঝে

আসে এখানে। কি করতে হয় না হয় নার্সরাই সব জানে। ওদের হাতে টাকা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়। সে টাকা জলে যায় না।

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'কিন্তু যাই বলুন, আমার কিছু ভাল লাগছে না বাসব বাবু। জীবনে সজ্ঞানে কোনদিন কোন মিথ্যার আশ্রয় নিইনি। আর এসব নোংরামির মধ্যে আমাকেই কিনা জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে।'

বললুম, 'উপায় কি বলুন।'

সুদত্তা দৃঢ়স্বরে বললেন, 'ওঁর কথায় কান দেবেন না। যা ব্যবস্থা হয়েছে তার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না।'

হাসপাতাল থেকে নার্স আমাকে রিং করল সকালে। শেষ রাত্রে ছেলে হয়েছে সুদত্তার। বিশেষ কোন কষ্ট পান নি মিসেস মজুমদার। সন্তানটিও ভালোই আছে। বেশ স্বাস্থ্যবান সন্তানই হয়েছে।

খবরটির প্রথমাংশ ফোনে জানিয়ে দিলুম মৃগাঙ্কবাবুকে।

তিনি বললেন, 'চলুন একবার দেখে আসি সুদত্তাকে।'

একটু বিরক্ত হলুম মনে মনে। আবার আমাকে কেন টানাটানি করছেন। বললুম, 'আমার তো বেলা একটার আগে অবসর হবে না।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'বেশ একটাতেই যাব।'

তারপর আমরা দুজনে মিলে উপস্থিত হলুম হাসপাতালে। পর্দা ঠেলে নার্সের সঙ্গে ঢুকলুম গিয়ে মিসেস মজুমদারের কেবিনে। ঢুকেই দুজনে দোরের কাছে একটু থমকে দাঁড়ালুম। একটি নার্স সুদত্তার বেডের কাছে দামী একটি তোয়ালেতে জড়িয়ে শিশুটিকে দু'হাতে মেলে ধরে টুলের ওপর বসেছে। আর সুদত্তা অপলকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন সন্তানকে। তাঁর চোখে ঘৃণা নেই, দ্বেষ নেই, অস্বস্তি অশান্তির চিহ্ন মাত্র নেই। গভীর শান্তি আর পরিতৃপ্তিতে সুদত্তার মুখ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সুন্দর আর প্রশান্ত।

'কিন্তু আমাদের দেখে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে উঠলেন সুদত্তা। ফ্যাকাশে ক্লান্ত মুখখানিতে যেন দেহের সমস্ত রক্ত ছড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই নার্সকে ধমকে উঠলেন, 'যান, যান, নিয়ে যান এখান থেকে। ওকে কে আনতে বলল আপনাকে।'

নার্সটি মুহূর্তের জন্য বুঝি একটু হতভম্ব হয়ে রইল তারপর মুচকে একটু হেসে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি সুদত্তার দিকেই তাকিয়েছিলাম। মৃগাঙ্কবাবুর মুখভাবের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করবার সুযোগ পাই নি। যখন তাঁর দিকে তাকালুম কোন বিকৃতির ভাব দেখতে পেলুম না।

একটু বাদে স্ত্রীকে তিনি সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ সুদত্তা!'

প্রকৃতিস্থ হতে একটু সময় লাগল মিসেস মজুমদারের, চোখ নিচু ক'রে বললেন, 'ভালো।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আমার এত ভয় হচ্ছিল।'

সুদত্তা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'ভয়ের কি আছে।'

মৃগাঙ্কবাবু একটু যেন হাসলেন, 'না এবার নিশ্চিন্ত।'

খানিক বাদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম আমরা। হঠাৎ মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'বাসববাবু আগের এ্যারেন্‌জমেণ্ট সব ক্যান্‌সেল করুন। আমি বাড়ি নিয়ে যাব।'

আমি চমকে উঠে বললুম, 'সে কি। তা কি ক'রে হবে। মিসেস মজুমদারই বা তাতে রাজী হবেন কেন। না না না, ও সব করতে যাবেন না মৃগাঙ্কবাবু, জটিলতা বাড়াবেন না।'

মৃগাঙ্কবাবু সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে হাসলেন, 'জটিলতার তো কিছু নেই। মাতৃত্ব সব চেয়ে সহজ, সব চেয়ে প্রাঞ্জল।'

আমি প্রতিবাদ ক'রে বললুম, 'না না না, কি বলছেন আপনি। এখানকার মাতৃত্ব তো অবিমিশ্র নয়। তার সঙ্গে সমাজ, সম্মান, কত রকম কত সংস্কার, সুবিধা-অসুবিধা-বোধ জড়িয়ে আছে। মিসেস মজুমদারের যে বাৎসল্য আপনি দেখলেন, তা হয় তো নিতান্তই ক্ষণিক, নিতান্তই ফিজিক্যাল।'

মৃগাঙ্কবাবু একটু হাসলেন, 'সবই তো তাই।'

আমার বাধা মানলেন না মৃগাঙ্কবাবু। তখনই নার্সদের সঙ্গে আগের বন্দোবস্ত সব নাকচ ক'রে দিয়ে এলেন।

আমি বললুম, 'কিন্তু মিসেস মজুমদার—'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আমি সব ম্যানেজ ক'রে নেব। আপনি ভাববেন না।'

বেশ একটু বিরক্তির সুর মৃগাঙ্কবাবুর গলায়। মনে মনে ভাবলুম, 'আমার ভাববার কি আছে।'

সপ্তাহখানেক বাদে স্ত্রীপুত্রকে বাড়ি নিয়ে গেলেন মৃগাঙ্কবাবু। শুনলুম সুদত্তা খুব আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু কান দেন নি। বলেছিলেন, 'আচ্ছা পাগল তো তুমি। না হয় তোমার মত সুন্দর হয় নি, একটু কালোই হয়েছে, তাই বলে ছেলে কেউ ফেলে দিয়ে যায় নাকি।'

বাড়িতে পৌঁছে ফোনে আমাকে খবর দিলেন মৃগাঙ্কবাবু, 'সব ঠিক হয়ে গেছে। মাঝখান থেকে যথেষ্ট কষ্ট দিলুম আপনাকে—'

আমি বললুম, 'না না না।'

সেই সময় মজুর শ্রেণীর একটি রোগী আমার ডিসপেনসারীতে বসেছিল। সঙ্গে স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে। ছেলেটিই বড়। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যই এসেছে। দেখে শুনে ওষুধ দিয়ে দিলুম। ছোট ছেলেটি মার কোলে উঠেছে দেখে বড়টিও কোলে উঠবার দাবী জানাতে লাগল। স্বামী তাকে নিজে তুলে নিল কোলে।

বললুম, 'ছেলে বুঝি তোমার খুব বাধ্য ?'

ও জবাব দিল, 'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। ভারি ন্যাওটা।'

মনে মনে হাসলুম। ছেলেটি ওর স্ত্রীর আগের পক্ষের। ও আমার অনেক দিনের পেশেণ্ট। ওদের সব খবরই জানি। ওর আগের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বর্তমান স্ত্রীকে সে বিয়ে ক'রে এনেছে। তখন বিধবা মেয়েটির কোলে ছিল এই ছেলেটি। আজ সে তার মার কোল ছেড়ে দিব্যি আমার রোগীর কোলে চড়ে বসেছে। সবই অভ্যাস, সবই সংস্কার। যেমন মনের জোর দেখেছি মৃগাঙ্কবাবুর তাতে তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

তারপর বছর খানেকের মধ্যে কোন খোঁজ খবর রাখিনি মৃগাঙ্কবাবুর। ওঁরাও খোঁজ নেন নি। আমিও ইচ্ছা ক'রে দূরে সরে রয়েছি। আমার সঙ্গ খুব প্রীতিকর আর বাঞ্ছনীয় নাও হতে পারে ওঁদের পক্ষে।

কিন্তু মাসখানেক আগে মিসেস মজুমদার হঠাৎ সেদিন আমাকে ফোনে ডেকে বললেন, তিনি অসুস্থ। দয়া ক'রে আমি যদি যাই তিনি খুব উপকৃত হবেন।

আমি বললুম, 'আচ্ছা। কিন্তু মিষ্টার মজুমদার কোথায় ?'

'তিনি একটু বাইরে গেছেন।'

হরিপাল লেনে আর একটা কল ছিল। শেষ করতে করতে বেলা দেড়টা, তারপর হাজির হলাম মৃগাঙ্কবাবুর বাড়ি।

পুরোন চাকর অমূল্য আমাকে গত বছর থেকেই চেনে ; দেখে হেসে বলল, 'আসুন ডাক্তারবাবু, অনেকদিন আসেন না আমাদের এদিকে।'

খুব যে শক্ত অসুখ বিসুখ আছে এ বাড়িতে তার রকমসকম দেখে তা মনে হোল না। অমূল্যের পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলুম। ভাড়াটে বাড়ির তিনখানা ঘর নিয়ে থাকেন মৃগাঙ্কবাবুরা। তার মধ্যে একখানা তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরী, আর একখানা বসবার, ভিতরের দিকের সবচেয়ে বড় ঘরখানায় সুদত্তার গৃহস্থালী। দেখলুম অন্ত দু'খানা ঘর বাইরে থেকে তালাবন্ধ। অন্দরের ঘরখানার সামনে এসে অমূল্য বলল, 'যান, মা আছেন ভিতরে।'

সাড়া পেয়ে সুদত্তাও এসে দাঁড়ালেন দোরের সামনে, 'আসুন, ভাবলুম আপনি বুঝি এলেনই না।'

দেখতে আরো যেন সুন্দর হয়েছেন সুদত্তা, প্রথম দিককার সেই উন্মত্ততা কেটে গেছে। প্রশান্ত, গম্ভীর মুখশ্রী, কিন্তু দুই চোখের নিচে কেমন যেন বিষণ্ণতার আভাস।

বললুম, 'কি অসুখ আপনার।'

সুদত্তা একটু হাসলেন, 'এসেই অসুখের খোঁজ করছেন—'

বললুম, 'ডাক্তারদের কি কেউ সুখের দিনে ডাকে ?'

সুদত্তা কোন জবাব দিলেন না।

ঘরের মধ্যে দোলনায় বছর খানেকের একটি শিশু ঘুমুচ্ছে, বললুম, 'ছেলে ভালো আছে তো ?'

সুদত্তা বললেন, 'হ্যাঁ, বিশুর কোন অসুখ বিসুখ নেই।'

বললুম, 'বিশু ?'

সুদত্তা একটু আরক্ত হয়ে উঠে বললেন, 'পিসীমার দেওয়া নামই রাখা হয়েছে। বিশ্বেশ্বর।'

গদি-আঁটা চেয়ারটায় বসে বললুম, 'বেশ ভালো নাম হয়েছে। যাক্ অসুখ বিসুখ কিছু নেই তাহলে। শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলুম। খবর সব ভালো হলেই ভালো। মৃগাঙ্কবাবু বাইরে গেলেন যে হঠাৎ ?'

'হ্যাঁ, নাগপুরে গেছেন একটু। নতুন এক ধরনের গিনীপীগ নাকি দেখা গেছে সেখানে। তার কিছু সংগ্রহ ক'রে আনবেন।'

অবাক হয়ে বললুম, 'গিনীপীগ! গিনীপীগ দিয়ে করবেন কি তিনি ?' সুদত্তা বললেন, 'ক্রসব্রীডিং নিয়ে উনি যে এক্স্পেরিমেণ্ট করছেন তাতে দরকার হবে।'

বললুম, 'ক্রসব্রীডিং !'

সুদত্তা আমার চোখের দিকে তাকালেন, 'হ্যাঁ, বায়োলজিই তো ওঁর এখন মেইন সাবজেক্ট, হেরিডিটি সম্পর্কে—'

তারপর সুদত্তা হঠাৎ বললেন, 'আমি আর পারছিনে ডাক্তারবাবু।'

একটু হাসতে চেষ্টা করে বললুম, 'বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী হলে এমন এক-আধটু উৎপাত—'

সুদত্তা তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'উৎপাত! বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী কি মানুষ নয় ডাক্তারবাবু? সে কি ইঁদুর না গিনীপীগ ?'

তারপর একটু একটু ক'রে সবই খুলে বললেন সুদত্তা। তালা বন্ধ দুটো ঘরের দিকে

আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'বায়োলজির বই আর বোতল ভরা পোকা মাকড়ে দুটো ঘরই এখন ভরতি। বোধ হয় বিশুকেও ওর ভিতরে ভরে রাখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এনভিরনমেণ্টের প্রভাব পরীক্ষা করবার জন্য মানুষের বেলায় অতখানি সতর্কতার দরকার হয় না বোধ হয়।'

একটু হতভম্ব হয়ে বললুম, 'কি যে বলেন!'

সুদত্তা বলতে লাগলেন, তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন বিশুকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু কিছুতেই রাজী হন নি। নিজের জিনিস কি কেউ ছাড়ে? মৃগাঙ্কবাবুর চোখে বিশু একটা জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়। বিশু তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপাদান। কিন্তু নিজের চোখে কিছুতেই এসব সহ্য করতে পারছেন না সুদত্তা। দামী পোষাক, দামী সব খাদ্য আর খেলনার ব্যবস্থা তিনি করেছেন বিশুর জন্য। দিনের মধ্যে অন্তত তিন চার বার খোঁজ নেন ছেলের, কোলে করে আদর করেন, চুমুও খান। তারপর হঠাৎ বিশুর দিকে চেয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখেন আর কলম খুলে নোট নেন পকেট বুকে। নিজের চোখে ওই দৃষ্টি কি ক'রে সহ্য করেন সুদত্তা?

কি বলব হঠাৎ ভেবে পেলাম না। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে উঠে দাঁড়ালুম, 'আজ একটু তাড়া আছে সুদত্তা দেবী। আজকের মত—'

সুদত্তা বাধা দিয়ে বললেন, 'না, আর একটু আসুন। আরো কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

অবাক হয়ে বললুম, 'আবার কি?'

একটু চুপ ক'রে রইলেন সুদত্তা, মুহূর্তের জন্য বুঝি ইতস্তত করলেন একটু তারপর হঠাৎ বললেন, 'দেখুন, এবারো আমি—! এবার আর তত এ্যাডভান্সড্ স্টেজ নয়। এবার আপনি নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন।'

আমি চমকে উঠে বললুম, 'কি বলতে চান আপনি?'

এতক্ষণ মুখ নিচু ক'রে কথা বলছিলেন সুদত্তা, এবার সরাসরি আমার দিকে তাকালেন। প্রথম দিনের সেই উন্মত্ত দৃষ্টি। যেন আজও তিনি ঠিক সহ্য করতে পারছেন না। কি একটা অপ্রবৃত্তি আর ঘৃণায় আজও যেন তাঁর সর্বাঙ্গ রি রি ক'রে উঠেছে।

সেদিনের মতই সুদত্তা সোজাসুজি আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি যা চাই তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আমি আপনার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর কম্প্যারেটিভ ষ্টাডির মেটিরিয়াল জোগাতে চাইনে।'

বাসব থেমে সিগারেট ধরাল। আমি সামান্য একটু মন্তব্য করতে যাচ্ছিলাম, করবী

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রেডিও খুলে দিল। বক্তৃতা নয়, গল্পও নয়, 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান।'

অনুরোধের আসর।

করবী বলল, 'বাঁচলুম।'

হেডমাস্টার

টাইপ করা কতকগুলি জরুরী চিঠিপত্রে নাম স্বাক্ষর করছিলাম। টাইপিস্ট পরেশবাবু নিজে এসে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আজই চিঠিগুলি ডাকে পাঠাতে হবে। সই করতে করতে একটু ধমকও দিলাম পরেশবাবুকে, 'একেবারে ছুটির সময় নিয়ে এলেন, এক্ষুনি উঠব ভাবছিলাম।'

পরেশবাবু বোধ হয় তাঁর সহকারীর ঘাড়ে দোষটা চাপাতে যাচ্ছিলেন, বেয়ারা নিতাই এসে সামনে দাঁড়াল।

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তোমার আবার কি।'

নিতাই বলল, 'আয়ো একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, স্লিপ দিয়েছেন।'

একবার তাকিয়ে দেখলাম, অফিসেরই ছোট্ট ভিজিটিং স্লিপ। পেন্সিলে লেখা দর্শনপ্রার্থীর নাম কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার। দেখা করতে চান নিরুপম নন্দীর সঙ্গে। উদ্দেশ্যটা উহ্য। হয়ত গুহ্য বলেই। নাম দেখে কারো মুখ মনে পড়ল না। ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বেয়ারাকে বললাম, 'বল বসতে হবে। ব্যস্ত আছি।' চিঠিগুলিতে নাম স্বাক্ষর শেষ করতে না করতে ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের বেয়ারা শীতল আর এক গাদা চেক এনে হাজির করল। চেকগুলির উল্টো পিঠে ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্ট্যান্টের সই চাই।

চটে উঠে বললাম, 'নিয়ে যাও। এখন সই হবে না।'

বেয়ারা চেকগুলি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ক্লিয়ারিং-এর ইনচার্জ পরিমলবাবু নিজেই সেগুলিকে ফের বয়ে নিয়ে এলেন, 'সব ঠিক ক'রে রেখেছি। শুধু আপনার সইটাই বাকি। কাল শনিবার। এসেই তাড়াতাড়ি হাউসে পাঠাতে হবে।'

বললাম, 'তা জানি, একটু আগে পাঠালেই পারতেন। এঁর পর থেকে কোন কাগজ-পত্রে ছুটার পর আমি আর সই করব না।'

পরিমলবাবু মুখ কালো ক'রে বললেন, 'অমনিতেই আমার ডিপার্টমেন্টে একজন লোক

শর্ট আছে। তারপর বিনয়বাবু আজ আসেন নি। সব ঠিকঠাক ক'রে আনতে দেরি হয়ে গেল। এখন শুধু আপনার সইটা হলেই হয়ে যায়।'

শুধু সই, ভাবখানা এই, আমরা এত পরিশ্রম করেছি, আর আপনি শুধু সইটা করতে পারবেন না! সংক্ষেপে কেবল নিজের নামটুকু স্বাক্ষর করতে এত কষ্ট বোধ করছেন আপনি। কিন্তু সই করাটা যে সব সময় সহজ এবং প্রীতিপ্রদ নয় সে ধারণা এদের নেই।

মনে পড়ল ছেলেবেলায় নাম স্বাক্ষর করতে শিখে যেখানে-সেখানে দেয়ালে, কপাটে, বাবার নতুন পঞ্জিকায়, পুরোন দলিলে, নিরুপম নন্দীকে অমর করে রাখবার কি চেষ্টাই না করেছি। কিন্তু ঠেকে ঠেকে এখন শিক্ষা হয়ে গেছে। যত্রতত্র নাম স্বাক্ষর করতে আজকাল সহজে স্বীকৃত হই না। অনেক কুণ্ঠা, অনেক কার্পণ্য প্রকাশ করি। তা সত্ত্বেও অফিসের রাশি রাশি কাগজপত্রে নিত্যই যখন নাম স্বাক্ষর করতে হয়, তখন আর নামটাকে নিজের বলে মনে হয় না,—এমনকি অক্ষর পরিচয়ের ওপর ঘৃণা জন্মে যায়।

স্বাক্ষর পর্ব শেষ ক'রে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ টেবিলের ওপর সেই চিরকুটটি চোখে পড়ল। কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার। জ্বালাতন ক'রে ছাড়লে। বেয়ারাকে ডেকে বললাম, 'কে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন বাইরে। আসতে বল।'

একটু পরেই ভদ্রলোক আমার চেম্বারের কাটা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন। তাঁকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'একি মাস্টারমশাই, আপনি।'

আমাদের সাগরপুর এম. ই. স্কুলের হেডমাস্টার।

মাস্টারমশাই ততক্ষণ আমার সামনের চেয়ারটায় বসে বললেন, 'বসো, কয়েকদিন ধরেই আসব আসব ভেবেছিলাম। শেষ পর্যন্ত এসে পড়লাম।'

ছেলেবেলার শিক্ষক। জোড় হাতে নমস্কার চলে না। পায়ে হাতে প্রণামই বিধেয়। কিন্তু ইউরোপীয় পোষাকে প্রণামের প্রাচ্যপদ্ধতির অনুসরণ অশোভন না হোক, অসুবিধাজনক। তবু একটু ইতস্ততঃ ক'রে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালাম। তারপর এগিয়ে এসে নিচু হয়ে মাস্টারমশাইর পাম্‌শু ঢাকা পায়ে ছুটো আঙ্গুল ছোঁয়ালাম। আঙ্গুলে অবশ্য ধুলো লাগল না কিন্তু মনে হো'ল নতুন কেনা টাইয়ের আগাটা মেঝের ধুলোয় মাথামাখি হয়ে গেছে।

সত্যিই পায়ের ধুলো নিই কিনা দেখবার জন্ম মাস্টারমশাইও এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। এবার নিঃসংশয় হয়ে হাত ধরে বসিয়ে বললেন, 'থাক থাক, সিটে বস গিয়ে। ভাল তো সব?' নিশ্চিন্ত হয়ে আত্মপ্রসাদে এবার একটু হাসলেন মাস্টারমশাই। আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম সামনের ছুটো দাঁত মাস্টারমশাইর পড়ে গেছে। মনে পড়ল দাঁতের ওপর ভারি যত্ন ছিল মাস্টারমশাইয়ের। নিমের ডাল ভেঙ্গে রোজ সকালে

দাঁত মাজতেন। লবঙ্গ, হরিতকি ছাড়া কোন দিন পান খেতে তাঁকে দেখিনি। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দাঁতের অধ্যায়টা একেবারে লাইন বাই লাইন মেনে চলতেন মাস্টারমশাই। তবু দন্তপংক্তিতে ভাঙ্গন ধরেছে।

ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে বললাম, 'দুটো দাঁত পড়ে গেছে দেখছি।'

মাস্টারমশাই ইংরেজীতে স্বীকৃতি জানালেন, 'yes, I have lost two of them. কিন্তু আর গুলো সব শক্ত আছে।'

শেষ কথাটায় মাস্টারমশাইর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠল। মৃদু হেসে বললাম, 'তারপর স্কুলের খবর কি বলুন। কেমন চলছে?'

মাস্টারমশাই একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন,'স্কুল? তুমি কি দেশগাঁয়ের কোন খবরই রাখ না নাকি?'

অপরাধীর ভঙ্গিতে বললাম, 'না শীগগির কোন খবরটবর—'

মাস্টারমশাই সংক্ষেপে গম্ভীরভাবে বললেন, 'স্কুল আমি ছেড়ে দিয়েছি।' বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সেকি স্যার, আপনি স্কুল ছাড়লেন?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'হ্যাঁ ছেড়ে এসেছি। এসেছি যখন সবই বলব, সবই শুনবে। তার আগে যে জন্য আসা। একটা চাকরি-বাকরি জোগাড় ক'রে দাও নিরুপম। তোমাদের অফিসে আছে নাকি খালিটালি কোন জায়গা?'

'আমাদের অফিসে?' মাস্টারমশাইর মুখের দিকে আমি একটুকাল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তিনি কি পরিহাস করছেন? কিন্তু পরিহাসের সম্পর্ক তো নয়। তাছাড়া ঠাট্টা-পরিহাসের মত মুখের ভাবও তাঁর এখন নেই। দাঁতগুলো শক্ত থাকা সত্ত্বেও গাল দুটো ভাঙ্গা ভাঙ্গা, চোয়াল জেগে উঠেছে। গভীর রেখা পড়েছে কপালে। কালো লম্বাটে মুখখানায় কেমন এক ধরনের করুণ শীর্ণতা। মাথার চুল ছোট ক'রে ছাঁটা, কিন্তু কালোর চেয়ে সাদা রঙের ভাঁজই চুলে বেশি। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেলাম। হেড মাস্টারমশাইও বুড়ো হয়েছেন। তাঁর যুবক বয়সের কিশোর ছাত্র ছিলাম আমরা। মাস্টারমশাইর বার্ধক্যে নিজের বয়োবৃদ্ধি সম্বন্ধে যেন নতুন ক'রে সচেতন হয়ে উঠলাম।

কিন্তু একি বলছেন মাস্টারমশাই। পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে বয়স। এই বয়সে তিনি নতুন ক'রে চাকরিতে ঢুকবেন। মাথা কি ওঁর—। মাস্টারমশাইর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললাম, 'স্কুল ছেড়ে এলেন কেন?'

মাস্টারমশাই রূঢ়কণ্ঠে বললেন, 'ছেড়ে এলাম কেন? ছাড়ব না কি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই বুড়ো বয়সে না খেয়ে মরব? তাই বল তোমরা!'

বেয়ারা একবার দোর ঠেলে উঁকি দিয়ে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম ছটা বাজে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'চলুন মাস্টারমশাই বেরুনো যাক। যেতে যেতে সব শুনব।'॥

ডালহৌসী স্কোয়ারের মোড় থেকে দক্ষিণ কলিকাতাগামী ট্রাম ধরলাম। তারপর মাস্টারমশাইর পাশাপাশি বসে শুনতে লাগলাম সাগরপুর এম. ই. স্কুল আর তাঁর ইদানীংকার ইতিহাস।

পাকিস্তানের হুজুগে গাঁয়ের বেশিরভাগ হিন্দু ছাত্র চলে আসায় স্কুলের ছাত্র সংখ্যা প্রায় দশ আনি কমে গেছে। বাকি ছয় আনির মধ্যে অর্ধেকের বেশি ছাত্রের কাছ থেকে নিয়মিত মাইনে আদায় হয় না। একমাত্র সরকারী সাহায্য পঞ্চাশ টাকা ভরসা। এম. ই. স্কুলের পাঁচজন মাস্টারের মধ্যে সেটা বাঁটোয়ারা হয়। সাহায্য বৃদ্ধির জন্য জেলা সহরে গিয়ে ধরাধরি করেছেন হেড মাস্টারমশাই, কিন্তু ইনস্পেক্টর এসে স্কুল পরিদর্শন ক'রে রিপোর্ট দিয়েছেন স্কুলের যা ছাত্র সংখ্যা তাতে পঞ্চাশের চাইতে বেশি সাহায্য সাগরপুর এম. ই. স্কুল আশা করতে পারে না। চার মাইল দূরে হোসেনপুরের নতুন এম. ই. স্কুলের ছাত্র সংখ্যা সাগরপুরের দেড়া, অথচ সে স্কুলের বরাদ্দ পঞ্চাশের চাইতে এখনো পাঁচ টাকা কম আছে।

কিন্তু এতেও হেড মাস্টারমশাই ঘাবড়ান নি। টুকটাক ক'রে চালিয়ে নিচ্ছিলেন সংসার। সব চেয়ে বড় ভরসা ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারী নিত্যনারায়ণ চৌধুরী। চৌধুরী বাড়ির টিউশনিও গোড়া থেকেই বাঁধা ছিল হেড মাস্টারমশাইর। নিত্যনারায়ণবাবুর ছোট ভাইদের থেকে স্বরু ক'রে তাঁর ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতিনীদের পর্যন্ত হেড মাস্টারমশাই পড়িয়েছেন। প্রথমে পনের টাকায় আরম্ভ করেছিলেন। চৌধুরীমশাইর নাতি-নাতনীর সংখ্যা বছরের পর বছর বাড়তে থাকায় টিউশনির টাকার অঙ্কও বেড়ে বেড়ে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত উঠেছিল। স্কুলে লিখতে হোত ষাট, মিলত চল্লিশ। মাইনের সঙ্গে টিউশনির এই উপ্‌রি টাকার সংযোগে সংসার চলত।

কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর চৌধুরীরাও শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়লেন। ছেলেরা পুত্র-কলত্র নিয়ে কেউ কলকাতা, কেউ এলাহাবাদ, কেউ দিল্লী পর্যন্ত পাড়ি দিল। নিত্যনারায়ণ নিজেও এলেন শহরে। হেড মাস্টারমশাই বললেন, 'আপনারা সব শুদ্ধ চলে গেলে চলবে কি ক'রে ? আমরা কি করব ?'

নিত্যনারায়ণ বললেন, 'তাইতো, মাস্টার, তোমার সমস্যাটা তো রয়েই গেল। বাড়িতে ছেলেপুলে তো কেউ রইল না। পড়বে কে।'

নিত্যনারায়ণের চার বছরের নাতনী পাপড়ি পয়সার লোভে দাদুর পাকা চুল বেছে

দিচ্ছিল, সমস্তার সমাধানে এগিয়ে এল। কেন দাছ, সরকারকাকা রইলেন, দারোয়ান মন বাহাতুর রইল, ঝি রইল, মাস্টারমশাই তাদেরই তো পড়াতে পারবেন।'

নিত্যনারায়ণ হো হো ক'রে হেসে উঠেছিলেন, 'শুনলে? শুনলে মাস্টার? আমার দিদিমণির কথা শুনলে!'

কিন্তু নিত্যনারায়ণের হাসিতে সমস্যাটার সমাধান হয়নি। চৌধুরী চলে আসবার পর কুণ্ডুপাড়ায় হেড মাস্টারমশাই পাঁচটাকার আরো ছুটো টিউশান পেয়েছিলেন, কিন্তু নেন নি। সেকেণ্ড মাস্টারমশাইর মাস্টারী ছাড়াও মাতুল সম্পত্তি আছে, থার্ড মাস্টারমশাইর আছে মুদী দোকান, হেড পণ্ডিতের উপার্জনক্ষম ছুই ছেলে, সেকেণ্ড পণ্ডিত শ্রীবিলাস চক্রবর্তীর যজমানী আর গুরুগিরি, কিন্তু হেড মাস্টারমশাইর সম্বল ছিলেন চৌধুরীরা। তিনি সব চেয়ে বেশি নিঃসম্বল হলেন। এদিকে পোষ্যের সংখ্যা অনেক।

গোড়ার দিকে তিনটি মেয়ে। তাদের ছুটিকে অবশ্য পার করেছেন। একটি আছে এখনো ঘাড়ের ওপর। তারপর পর পর ছেলে হয়েছে তিনটি। বড়টির বয়স সবে সাত।

হেড মাস্টারমশাই বললেন, 'দেখলে বিধাতার মার। এমন অসময়ে ছেলেপুলেগুলি হোল—। নইলে গীতাকে কোন রকমে পার করতে পারলে আমার আর ভাবনা ছিল কি। ওই হতচ্ছাড়াগুলোর জন্যই তো—'

বুঝতে পারলাম ছেলেদের ভরণ-পোষণের ভাবনায় শেষ পর্যন্ত দেশ আর মাস্টারী ছুই-ই তাঁকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। মনে পড়ল এই হেড মাস্টারীর ওপর কি মমতাই না ছিল মাস্টারমশাইর। টিচার হিসাবে সুখ্যাতি ছিল বলে রতনপুরে আর রাধাগঞ্জের ছুইটি হাই স্কুলে মাস্টারমশাই চান্স পেয়েছিলেন। কিন্তু যাননি। হাইস্কুলে তো আর হেডমাস্টার হয়ে যেতে পারবেন না। একবার আমাদের সাগরপুর এম. ই. স্কুলকেও হাইস্কুল করবার প্রচেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সবচেয়ে বেশি বাধা দিয়েছিলেন হেড মাস্টারমশাই নিজে। কমিটির মিটিংএ বক্তৃতা দিতে উঠে বলেছিলেন, 'এ প্রস্তাব নিতান্তই অযৌক্তিক। এ গাঁয়ে হাইস্কুল চলবে না, চলতে পারবে না। যদি বা চলে খুঁড়িয়ে চলবে। কিন্তু অখ্যাত একটি হাইস্কুলের চাইতে কীর্তিমান, খ্যাতিমান একটি এম. ই. স্কুলকে আমি বহুগুণে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।'

হেডমাস্টারের কথায় যুক্তি ছিল, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে দৃঢ়তা ছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মনের কোণের গোপন ছুর্বলতাটুকু টের পেতে কমিটির অন্যান্য সভ্যদের দেরি হয় নি। এই নিয়ে তাঁরা কেবল গা টেপাটিপিই করেন নি, আড়ালে আবডালে টিপ্পনীও কেটেছিলেন, এম. ই. স্কুল হাইস্কুল হলে আমাদের হেডমাস্টারের হেডটুকু যাবে যে?

হেডমাস্টার সব ছাড়তে পারে, কিন্তু সাগরপুর এম. ই. স্কুলের ইন্দ্রত্ব কিছুতেই সে ছাড়তে রাজী নয়।

সেই ইন্দ্রপদও হেড মাস্টারমশাইকে ছেড়ে আসতে হোল।

হাজরা রোডের মোড়ে ট্রাম থামতেই হেড মাস্টারমশাই উঠে দাঁড়ালেন, 'এখানে নামতে হবে আমাকে।' হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটে বাসা, চল না নিরুপম। গীতা, গীতার মা তোমাকে দেখলে সবাই খুশি হবে। ওরাই তো আম'কে ঠেলে পাঠাল তোমার কাছে। গীতা কার কাছ থেকে যেন তোমার ঠিকানা জোগাড় করেছিল।'

মনে পড়ল না গীতার চেহারা, যখন মাইনর ক্লাসে পড়তাম দু' তিনটি ছোট ছোট ফ্রক পরা মেয়ে দেখেছিলাম হেড মাস্টারমশাইর। হয়ত তাদেরই কেউ হবে, কিংবা তাদেরও পরে জন্মেছে। কিন্তু গীতাকে মনে না পড়লেও তার মার কথা মনে পড়ল। লুকিয়ে লুকিয়ে তখন সবে নভেল পড়তে শুরু করেছি, নায়িকার রূপ বর্ণনা পড়তে পড়তে হেড মাস্টারমশাইর স্ত্রীর কথা মনে হোত। অমন সুন্দরী বউ আমাদের গাঁয়ে চৌধুরী বাড়িতেও ছিল না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'কাজ ছিল একটু সন্ধ্যার দিকে, আচ্ছা চলুন দেখে যাই বাসা।'

কালীঘাটের টিনের বস্তী। তারই ভিতরে একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছেন হেডমাস্টার-মশাই। সামনে খোলা দাওয়ায় তোলা উনানে রান্না উঠেছে।

হেড মাস্টারমশাই বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে ঢুকলেন, 'আলোটা ধর গীতা, দেখ এসে নিরুপমকে নিয়ে এসেছি।'

ছোট একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এল আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে, পিছনে পিছনে কৌতূহলী গুটি দুই ছেলেও এসে দাঁড়াল, হলুদ মাখা হাতে মাথায় আঁচল টানতে টানতে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন একটু পুষ্টাঙ্গী একজন মহিলা। চিনতে পারলাম ইনিই মাস্টারমশাইর স্ত্রী।

মাস্টারমশাই বললেন, 'নিরুপম নন্দী, আমার স্কুল থেকে থার্টিটুতে স্কলারশিপ পেয়েছিল, ফার্স্ট হয়েছিল ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে। মনে আছে আমাদের বারান্দার তক্তপোষে রাত জেগে জেগে বৃত্তি পরীক্ষার পড়া পড়ত? নিরুপম নন্দী আর নুরুদ্দিন সিকদার। আচ্ছা নিরুপম, নুরুদ্দিন কোথায় আছে বলতে পার?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

তারপর নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিতে গেলাম মাস্টারমশাইর স্ত্রীর।

তিনি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'থাক থাক।'

একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের সুরে বললেন, 'তোমার নুরুদ্দিন ফুরুদ্দিন এখন রাখ তো।'

তারপর আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন, 'আমাদের খুবই মনে আছে। তোমার বৃত্তি পাওয়া কীর্তিমান ছাত্রের দলই মাস্টারমশাইদের একেবারে ভুলে গেছে।'

মাস্টারমশাইর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম এই চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আগেকার সেই স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যের সামান্যই অবশিষ্ট আছে। মাস্টারমশাইর মত অবশ্য অতটা চেহারা খারাপ হয়নি, দাঁত পড়েনি, কি চুলও পাকেনি। কিন্তু কঠিন জীবন সংগ্রামের ছাপ প্রৌঢ়ত্বকে আরো স্পষ্ট ক'রে তুলেছে। তা সত্ত্বেও হাসিটুকু ভারি ভালো লাগল, ভারি মিষ্টি লাগল অভিযোগের ভঙ্গিটুকু।

বললাম, 'ভুলব কেন, তবে নানারকম কাজ-কর্মের চাপে খোঁজখবর আর নিয়ে ওঠা হয়নি।'

'ওঁরা কি দাঁড়িয়ে থাকবেন মা। বসতে বল না তক্তপোষে।'

মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। এই বোধ হয় মাস্টারমশাইর মেয়ে গীতা। মায়ের মত অত সুন্দরী নয়। রঙটা একটু ময়লা। কিন্তু মায়ের চেয়ে স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু দীর্ঘ দোহারা চেহারায়, মুখের ডৌলে, নাক চোখের সুন্দর গড়নে ষোল সতের বছর আগেকার আর একটি তরুণী গৃহিণীর কথা মনে পড়ল। জ্যামিতির উপপাদ্য মুখস্থ করতে করতে হ্যারিকেনের তেল যখন ফুরিয়ে যেত, সলতে আসত নিবু নিবু হয়ে তখন মাস্টারমশাইর স্ত্রী উঠে এসে বোতল থেকে আমাদের হ্যারিকেনে তেল ঢালতে ঢালতে বলতেন, 'আর পারিনে। বৃত্তি পেয়ে মাস্টারমশাইকে মহারাজ করবেন। কাল থেকে বোতলে ক'রে বাড়ি থেকে তেল নিয়ে এস নিজেরা। আমি আর এক ফোঁটা তেল দিতে পারব না।'

কিন্তু নিপুণ হাতে হ্যারিকেনের মুখটুকু আটকে দিয়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে স্নিগ্ধস্বরে বলতেন, 'নিরু, নুরুদ্দিন তোমাদের বোধ হয় খুব মশা লাগছে। মশারী টাঙিয়ে দিয়ে যাব? মশারীর মধ্যে বসে পড়বে?'

নুরুদ্দিন জবাব দিত, 'না মাসীমা। মশারীর মধ্যে গেলেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। তার চেয়ে মশার কামড় বরং ভালো।'

মাসীমা হেসে উঠতেন, 'প্রায়ই বিবেকের কামড়ের মত, তাই না? ওদিকে ঘরের মধ্যে মশারীর ভিতরে আর একজনকে বিবেকে কামড়াচ্ছে। অতিষ্ঠ হয়ে তিনিও উঠে এলেন বলে।'

মাসীমা চলে গেলে আমি আর নুরুদ্দিন পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু

হাসতাম। মাইনর ক্লাসে পড়লে কি হয়, গোঁফের রেখা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঠোঁটে। গাঁয়ের ছেলে আন্দাজে আভাসে তখন থেকেই একটু-আধটু সব বুঝতে শিখেছি।

তক্তপোষে পা ঝুলিয়ে বসে চা জলখাবার খেতে খেতে মাস্টারমশাইর আরও খানিকটা ইতিহাস শুনলাম মাসীমার মুখে। চৌধুরীরা ছেড়ে এলেও মাস্টারমশাই স্কুল ছাড়তে ইতস্তত করছিলেন, বলছিলেন, 'স্কুলের কি দশা হবে?'

মাস্টারমশাইর স্ত্রী রাগ ক'রে বলেছিলেন, 'যে দশা হয় হোক। আমাদের দশাটা কি তোমার চোখে পড়ছে না? স্কুলের ভাবনা কি, তুমি চলে গেলে সেকেণ্ড মাস্টার হোক্ থার্ড মাস্টার হোক্ একজনকে ওরা হেডমাস্টার বানিয়ে নেবে। ভারি তো বিদ্যা লাগে তোমার ওই এম. ই. স্কুলের হেডমাস্টারীতে।'

মাস্টারমশাই তবুও বলেছিলেন, 'কিন্তু—'

'কিন্তু টিন্তু বুঝি না, তুমি থাক তোমার হেডমাস্টারী নিয়ে, আমি চললাম। ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরতে পারব না।'

মাসীমার দুই দাদা থাকেন ভবানীপুরে। একজন উকিল, আর একজন পুলিস ইনস্পেক্টর, তাঁদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করলেন মাসীমা, তাঁরা বললেন, 'বেশ চলে এস, একটা গতি হবেই।'

কিন্তু থাকবার মত ঘর নেই বাড়িতে। সপ্তাহ দুই থাকবার পর নানারকম অসুবিধা হ'তে লাগল। দাদা বললেন, 'অন্য একটা ঘরটর কোথাও খুঁজে নে। আমরা যা পারি কিছু কিছু—'

এদিকে ঘরও মেলে না শহরে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে শেষে এই হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটের গলিতে মিলেছে বাসা। এই তো ঘর—আলো নেই, হাওয়া নেই, জল আনতে হয় রাস্তার কল থেকে। তবু মাসে মাসে এরই ভাড়া গুণতে হয় কুড়ি টাকা। ছ' মাসের ভাড়া আগাম দিতে হয়েছে বাড়িওয়ালাকে। মাঝখানে পাড়ার একটা রেশনের দোকানে খাতা লেখার চাকরি পেয়েছিলেন মাস্টারমশাই কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতে কি সব গণ্ডগোলে গভর্ণমেণ্ট সে দোকান বন্ধ ক'রে দিয়েছে। এখন মাসখানেক ধ'রে একেবারে বেকার।

মাসীমা বললেন, 'তোমরা একটা ব্যবস্থা ট্যাবস্থা এবার ক'রে দাও নিরুপম।'

বললাম, 'আচ্ছা দেখি। আমাদের টালীগঞ্জ হাইস্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে মোটামুটি জানাশোনা আছে। তাঁকে বলে টলে সেই স্কুলে যদি মাস্টারমশাইকে—'

মাস্টারমশাই প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন, 'না নিরুপম, আর মাস্টারী নয়। না খেয়ে মরবো, তবু মাস্টারী আর জীবনে করব না। কেরানীগিরি থেকে কুলিগিরি যা বল

করতে রাজী আছি। কিন্তু মাস্টারী আর নয়। সাতাশ বছর ধ'রে মাস্টারী করার সুখ তো দেখলাম। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।'

মাসীমা বললেন, 'উনি মাস্টারী আর করতে চাইছেন না। অন্য কোন কাজকর্ম—'

আমি কিছু বলবার আগে গীতাই তার মাকে মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলল, 'কি যে বল মা, নতুন অফিসে ঢুকবার মত বয়স কি স্বাস্থ্য আছে নাকি বাবার।'

মাস্টারমশাই ধমক দিয়ে বললেন, 'না নেই, ওকে বলেছে নেই। কি হয়েছে আমার স্বাস্থ্যের। দেখতো নিরুপম, ছেলেবেলাও তো দেখেছ, এখনো দেখ।'

বলে মাস্টারমশাই পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটিয়ে তাঁর বাইসেপ দেখালেন আমাকে, 'It is as strong as ever.' দেখ, টিপে দেখ। তোমার প্রায় ডবল বয়সী হব তো আমি। কিন্তু বাজী রেখে বলতে পারি এখনো তুমি যতটা হাঁটতে পারবে, দৌড়তে পারবে তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম পারব না আমি। কলেজ জিম্‌ন্যাসিয়ামে একদিনও কেউ আমাকে গরহাজির হতে দেখেনি। বয়স হয়েছে বলে শরীরের সেই ফরম-টরম একেবারেই কি ধুয়ে মুছে গেছে? স্পোর্টস-এও কারো চেয়ে কম যেতাম না। ফুটবলে অফেনসের চেয়ে ডিফেনসই আমাকে অবশ্য বেশি খেলতে হোত। আমি যেদিন গোলে না দাঁড়াতাম—'

এবার স্ত্রীর ধমক খেলেন মাস্টারমশাই। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ থাম, ওসব কে শুনতে চাইছে তোমার কাছে।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'মাসেলটা একটু টিপে দেখই না নিরুপম।'

মাসেলের চাইতে মাস্টারমশাইর বাহুর ওপর দিয়ে যে রগগুলো জেগে উঠেছে তাই আমার চোখে পড়ল বেশি। তবু বললাম, 'না না না, শরীর তো বয়সের তুলনায় সত্যিই বেশ ভাল আছে আপনার। তাছাড়া বয়সটাই বা কি। ওদের দেশে তো শুনি ষাট বছরে জীবন কেবল আরম্ভ হয়। আপনার কত হবে? বছর পঞ্চান্ন—'

মাস্টারমশাইর স্ত্রী বললেন, 'না না না! এই বৈশাখে সবে একান্নতে পড়েছেন।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'এক্সাক্টলি, যাস্ট ফিফ্‌টিওয়ান। কিন্তু দৌড়ে, সাতারে যেকোন একুশ বছরের ছেলের সঙ্গে যদি তুমি আমাকে পাল্লা দিতে বল—'

মাস্টারমশাইর স্ত্রী আবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'কি যা তা বলছ। অফিসের চাকরীতে দৌড় ঝাঁপের জন্য কে ডাকতে যাচ্ছে তোমাকে।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তবে ওঁর মত ইংরেজী লিখতে আমি কাউকে আর দেখিনি নিরুপম। আমার বড় দাদা এম. এ. বি. এল. হলে কি হবে ইংরেজীতে ওঁর সঙ্গে পেরে ওঠে না। লেখার বাঁধুনী তো দূরের কথা, হাতের লেখাটাই যেন কেমন কাঁচা কাঁচা, আমাদের মেয়েদের মত। কিন্তু ওঁর লেখা সম্বন্ধে সে কথা কেউ

বলতে পারবে না। আর লেখেনও খুব তাড়াতাড়ি। পাড়ার লোকের পক্ষ থেকে সেদিন ডাস্টবিন দেওয়া সম্বন্ধে কর্পোরেশনে একটা দরখাস্ত করেছিলেন। টাইপ ক'রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাতের লেখা কাগজটা আছে এখানে। কাগজখানা আন দেখি গীতা, দেখা তোর নিরুপমদাকে।'

গীতা কাগজখানা খুঁজতে লাগল।

মাস্টারমশাই তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, 'আমার ছাত্রের কাছে আমার বিদ্যার সার্টিফিকেট আর দিতে হবে না তোমাকে। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত লেখার ব্যাপারে নিরুপম যেমন ছিল শ্লো, তেমনি ওর হাতের লেখা ছিল কদর্য। ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম ওকে নিয়ে। একটা বছর স্কুলের স্কলারশিপটা বুঝি বাদই যায়। অথচ অঙ্ক, বাঙলা, ইতিহাস, ভূগোল সব বিষয়েই ভালো। কেবল ইংরাজী। ভাবলাম দু'বছরে একটা বিষয়ে কি আর টেনে তুলতে পারব না? থার্ডমাস্টার, পণ্ডিতমশাই সব হাল ছেড়ে দিলেন, কিন্তু আমি অত সহজে ছাড়বার পাত্র নই। হাতের প্রত্যেকটি অক্ষর ধরে ধরে শুধরে দিয়েছি, বেত মেরে মেরে মুখস্থ করিয়েছি গ্রামারের প্রত্যেক রুল।'

মাস্টারমশাই আমার দিকে তাকিয়ে পরম আত্মপ্রসাদে ফের হাসলেন, 'গ্রামারে আর বোধহয় তোমার ভুল হয় না, না নিরুপম?'

ভাষার গ্রামারের কথা জানি না, জীবনের গ্রামারে এখনো যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তি হয়। কিন্তু সেকথা মাস্টারমশাইর কাছে স্বীকার না ক'রে নিজের বৈয়াকরণিক বিশুদ্ধির কথাই ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিলাম।

ফেরার সময় সরু গলির মোড় পর্যন্ত দু'জনেই এলেন পিছনে পিছনে। মাস্টারমশাইর স্ত্রীর হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন। বিদায়ের আগে তিনি আর একবার বললেন, 'তোমার ভরসাতেই কিন্তু রইলাম নিরুপম।'

বললাম, 'আচ্ছা, সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা নয়, কিছু একটা তোমাকে ক'রে দিতেই হবে। সবই তো শুনলে।'

বললাম, 'আচ্ছা।'

প্রথমে মার্চেণ্ট অফিসের দু'চারজন বন্ধুকে বললাম মাস্টারমশাইর কথা। কেউ কেউ মুচকি হাসল, কেউ বা সশব্দে। মার্টিনের সতীশ বলল, 'এতই যদি গুরুভক্তি নিজের ব্যাঙ্কেই নিয়ে যাও-না কেন।'

ধরলাম জেনারেল ম্যানেজার মিঃ গুপ্তকে। লোকজন নেওয়ার ভার তাঁরই হাতে।

তিনিও প্রথমে হাসলেন, 'বলছ কি নন্দী। একান্ন বছর বয়সে নতুন চাকরী। তারপর

সাতাশ বছরের মাস্টারী। শুনি ও কাজ বারো বছর করলেই নাকি—। ব্যাঙ্কের এসব ফিগার ওয়ার্ক টোয়ার্ক তিনি কি পারবেন ? তাছাড়া খাটুনিও তো কম নয়।'

বললাম, 'তিনি বলছেন, মাস্টারী ছাড়া তিনি সব পারবেন, সব করবেন। মাস্টারীতে নাকি তাঁর বিতৃষ্ণা এসে গেছে। যাই হোক আমাদের ব্যাঙ্কে ওঁকে একটা চান্স আপনায় দিতেই হবে মিষ্টার গুপ্ত।'

'আচ্ছা, তুমি যখন বলছ অত ক'রে দেখা যাক।'

ইণ্টারভিউর জন্ম আর চিঠি পাঠান হোল না। মুখেই খবর দিয়ে এলাম। সবাই খুব খুশি।

গীতা বলল, 'না নিরুপমদা, চা না খেয়ে যেতে পারবেন না।'

মাস্টামশাইর স্ত্রী বললেন, 'দেখ দেখি বৈয়মটায় সুজি আছে খানিকটা। আর ওই টিনের কৌটোয় মধ্যে চিনি আছে।'

বললাম, 'আবার ওসব কেন ? শুধু চা হলেই তো হোত।'

'ওই চা-ই, চা ছাড়া আর কিইবা তোমার সামনে ধরে দেওয়ার শক্তি আছে।'

চায়ের সঙ্গে একটু হালুয়াও প্লেটে ক'রে সামনে এনে রেখে দিল গীতা।

মৃদু হেসে বললাম, 'মিষ্টিমুখটা চাকরী হওয়ার পরে করালেই তো ভাল হোত।'

গীতা কোন জবাব দিল না, তার মা বললেন, 'তুমি যখন রয়েছ, ও চাকরী হওয়ার মধ্যেই। তা ছাড়া চাকরীর জন্ম কি। গরীব মাস্টারমশাইর বাসায় অমনিতেই না হয় একটু চা আর খাবার খেলে। তাতে জাত যাবে না।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'মাস্টারী ছেড়ে দিলাম, তবু মাস্টার মাস্টার করা ছাড়লে না তোমরা।'

মাস্টারমশাইর স্ত্রীও এবার হাসলেন একটু, 'আহা ছেড়ে দিলেও নিরুপমের তো মাস্টারমশাই তুমি।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'এখনো আছি, কিন্তু দু'দিন বাদে চাকরীটা যদি হয়েই যায় ওদের ওখানে, তখন আর মাস্টার নয়, কলীগ, সাবঅরডিনেট।'

চাকরি হোলও। মিঃ গুপ্ত খুবই ভদ্রতা করলেন। ইণ্টারভিউতে নাম ধাম ছাড়া বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কেবল বলেছিলেন, 'এতদিনের মাস্টারী ছাড়লেন কেন, তাছাড়া ব্যাঙ্কের কাজকর্ম কি আপনার ভালো লাগবে।'

মাস্টারমশাই জবাব দিয়েছিলেন, 'মাস্টারীর মনোটনির তুলনায় সব কাজই বোধ হয় ভালো।'

মিঃ গুপ্ত মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'বেশ দেখুন, কেমন লাগে।'

বিশেষভাবে ধরে পড়ায় মাইনের বেলায়ও বেশ একটু খাতির করলেন মিঃ গুপ্ত, আমাদের ব্যাঙ্কে সাধারণত আণ্ডার গ্রাজুয়েটদের স্টার্টিং ষাটে। জেনারেল ম্যানেজারকে বললাম, 'কিন্তু ওঁর নিজের বয়সই তো প্রায় ষাট হ'তে চলল, এই বয়সে ষাট টাকা দিয়ে উনি করবেন কি,—তাছাড়া অতগুলি পোষ্য।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে খানিকক্ষণ কি পরামর্শ ক'রে আরও খানিকটা দাক্ষিণ্য দেখালেন জেনারেল ম্যানেজার। স্পেশাল কেস হিসাবে গণ্য ক'রে ষাট থেকে উঠলেন পঁচাশিতে। বললেন, 'দেখি কাজ কর্ম কি রকম করেন না করেন, তারপর দেখা যাবে।'

সপরিবারে মাস্টারমশাই কৃতজ্ঞতা জানালেন। এম. ই. স্কুলে সারা জীবন থাকলেও এত টাকা পেতেন না মাস্টারমশাই।

চৌধুরীদের টিউশনির টাকা ধরেও সংখ্যাটা অতখানি উঁচুতে পৌঁছত কি না সন্দেহ। খবর পেয়েই কালীবাড়িতে ডালা পাঠিয়েছিলেন মাস্টারমশাইর স্ত্রী। গীতার চায়ের সঙ্গে ফুলের পাপড়ি শুদ্ধ প্রসাদের অংশও পেলাম।

গীতা মৃদুস্বরে বলল, 'মা ভারি খুশি হয়েছেন।'

বললাম, 'আর তুমি?'

গীতা বলল, 'আমাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিন, আমিও হব।'

হেসে বললাম, 'খুশি হবার জন্য জুটিয়ে অবশ্য তোমাকে কিছু একটা দিতে হবে, কিন্তু সে চাকরি কি না তাই ভাবছি।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে গীতা একটু আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট সরল গলায় বলল, 'না নিরুদা আজকালকার মেয়েদের আর কিছু জুটিয়ে দিয়ে খুশি করবার দরকার হয় না। তার চাইতে একটা কাজকর্মের সন্ধান দিলেই তারা সব চেয়ে বেশি খুশি হয়।'

প্রথমে পরিমলবাবুর ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেন্টেই দিলাম মাস্টারমশাইকে, তিনি লোক চেয়েছিলেন। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টেও অবশ্য লোকের দরকার। তবু পরিমলবাবুকেই সবচেয়ে আগে খাতির করলাম।

পরিমলবাবু কিন্তু এ্যাসিস্ট্যান্ট পেয়ে খুব খুশি হলেন না। বললেন, 'শেষ পর্যন্ত একজন চুল পাকা বুড়োকে পাঠালেন আমার ডিপার্টমেন্টে?'

পরিমলবাবুর নিজের বয়সও চল্লিশ বিয়াল্লিশের কম হবে না, ঘরে বিবাহ-যোগ্য মেয়ে আছে। মাঝে মাঝে ছেলের সন্ধান করেন আমার কাছে।

হেসে বললাম, 'অত বয়স বিচার করছেন কেন পরিমলবাবু? জামাই তো আর

নিচ্ছেন না, এ্যাসিস্ট্যাণ্টই নিচ্ছেন। বয়স দিয়ে কি হবে, আপনার কাজ চলে গেলেই হোল। গোড়াতে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে।'

ছুটির পরে ডালহৌসীর মোড়ে মাস্টারমশাইর সঙ্গে দেখা। দেখলাম এই বয়সে প্রায় তরুণ জামাইর মতই সেজেছেন মাস্টারমশাই। যখন স্কুলে পড়েছি, তখন এত পারিপাট্য দেখিনি। ইস্ত্রী করা সাদা পাঞ্জাবীতে কালো বোতাম লাগানো। ঝুলন্ত কোঁচাটা নিপুণ হাতে কোঁচানো, পায়ের পাম্‌শুটা পুরোন হলেও সদ্য পালিসে চক্ চক্ করছে। গোঁফ দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। চুলটা বোধ হয় আজই ছেঁটেছেন। সেলুনের ছাঁট বেশ বোঝা যায়। স্কুলে যখন ছিলেন, তখন জামা থাকতো বোতাম থাকতো না, হয়তো দু পাটি চটির দু'খানা পায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়তেন।

বললাম, 'অফিস কেমন লাগছে মাস্টারমশাই ?'

মাস্টারমশাই একটু হাসলেন, বললেন, 'ভালোই তো।'

ট্রামে পাশাপাশি বসে হঠাৎ বলে ফেললাম, 'একদিনেই আপনি যেন আমূল বদলে গেছেন। স্কুলের অন্যান্য মাস্টারমশাইরা আপনাকে দেখলে এখন আর চিনতে পারবে না।'

মাস্টারমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন ?'

বললাম, 'তখনকার পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে একেবারেই তো কোন মিল নেই কি না। এবার দাঁত দুটো বাঁধিয়ে নিলেই—' মনে হোল ঠিক আগেকার দিনের মত ক্রুদ্ধ চোখে মাস্টারমশাই আমার দিকে তাকালেন।

একটু লজ্জিত হলাম। এতখানি প্রগল্‌ভতা হঠাৎ না দেখালেও পারতাম। তখনকার দিনে হেডমাস্টারমশাইর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারতাম না, আর এখন দিব্যি ঠাট্টা তামাসা করছি। এতখানি আধুনিকতা মাস্টারমশাই সহ্য করতে পারবেন কেন।

ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখলাম মাস্টারমশাইর তাকাবার ভঙ্গিটা এরই মধ্যে বেশ বদলে গেছে।

মনে হোল আমার দিকে চেয়ে মাস্টারমশাই একটু হাসলেন, বললেন, 'ও আমার সাজসজ্জার কথা বলছ। তুমি বুঝি ভেবেছ এসব আমি নিজের গরজে নিজের হাতে করেছি ?'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'তবে ? গীতা বুঝি ?'

মাস্টারমশাই মাথা নেড়ে রহস্যগম্ভীর স্বরে বললেন, 'তাও নয়।'

বললাম, 'তবে ?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'লাবণ্য, I mean গীতার মা,' মাস্টারমশাইর স্ত্রীর নামটা

এবার মনে পড়ে গেল। তখনকার দিনে লাবণ্যলেখা সরকারের নামে প্রায়ই চিঠি যেত ডাকে। গাঁয়ের পোস্টঅফিসে পিওন ছিল না। পোস্টমাস্টারের হাত থেকে আমরাই চিঠি নিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিতাম। ভারি সুন্দর লেগেছিল নামটি। লাবণ্যলেখা, মনে হয়েছিল তাঁর স্বভাবের সঙ্গে, চেহারার সঙ্গে নামটি চমৎকার মানিয়ে গেছে। এছাড়া তাঁর অন্য কোন নাম যেন কল্পনাই করা যেত না।

এতদিন বাদে স্ত্রীর নাম আমার সামনে উচ্চারণ ক'রে ফেলে মাস্টারমশাই নিজেও যেন ভারি লজ্জিত হয়ে পড়লেন। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকালেন বাইরের দিকে, গড়ের মাঠের ওপারে গঙ্গা, গঙ্গার ওপারে লাল হয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। লজ্জায় কি আরক্ত দেখাচ্ছে মাস্টারমশাইর মুখ, না কি এ রঙ সূর্যাস্তের। একটু বাদে ফের মুখ ফেরালেন, মাস্টারমশাই বললেন, 'এ সব গীতার মার কাণ্ড। বাধা দিয়েছিলাম, বলেছিলাম লোকে হাসবে যে। সে জোর ক'রে বলল, না হাসবে না। আর হাসে যদি হাসলই বা। এতদিন নিজের হাতে বেশভূষা ক'রে লোক হাসিয়েছ আজ না হয় আমার জন্যই হাসালে।'

আমি প্রতিবাদ ক'রে বললাম, 'না না হাসবার কি হয়েছে মাস্টারমশাই।'

মাস্টারমশাই আমার কথা যেন শুনতে পাননি, নিজের মনেই বললেন, 'ভাবলাম ওর কোন সাধ আহ্লাদ তো মেটেনি, আজ যদি এভাবে একটু মেটাতে চায় মেটাক।'

মনে হোল আমার পাশে বসে আমাদের ছেলেবেলার .বেত হাতে সেই কড়া হেডমাস্টার কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার আর কথা বলছেন না, অন্নচিন্তায় কাতর পঞ্চাশ বছরের কোন প্রৌঢ় কেরাণীও নয়, ইনি সম্পূর্ণ আর একজন। স্ত্রীর অপূর্ণ সাধ আহ্লাদের কথা জীবন সায়াহ্নে যাঁর মনে পড়ে গেছে।

কথায় কথায় এম.ই. স্কুলের হেডমাস্টারের জীবনের আর এক গোপন অধ্যায় আমার কাছে উদ্ঘাটিত হোল।

লাবণ্যলেখা তখন গীতা, গোবিন্দের মা নন এমন কি আমাদের শ্রদ্ধেয় হেডমাস্টার-মশাইর স্ত্রীও নন ; সিটি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র কৃষ্ণপ্রসন্নের সখের ছাত্রী তখন লাবণ্য।

কৃষ্ণপ্রসন্ন তখন কলেজ হস্টেলে থাকে। স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে ডিবেটিং ক্লাবে জোর বিতর্ক করে। জিমনাশিয়ামে বার বার বারবেলের খেলা দেখায়। ফুটবলে তেমন আসক্তি না থাকলেও টিমের ক্যাপ্টেন জোর ক'রে তার হাতে তুলে দেয় গোলরক্ষার দায়িত্ব, এসব ছাড়া অবসর বিনোদনের আরও একটু জায়গা আছে কৃষ্ণপ্রসন্নের, শ্যামবাজারের নলিন সরকার স্ট্রীটের একটি দ্বিতল বাড়ির দক্ষিণ খোলা একখানা ঘরে। বাড়িটি একেবারে নিঃসম্পর্কিত নয়। জেঠতুতো বোনের শ্বশুরবাড়ি। দিদির শ্বশুরের সেজো মেয়ে লাবণ্য।

চৌদ্দ উৎরে পনেরোয় পড়েছে। পড়াশুনোয় ভারি আগ্রহ। কিন্তু দিদির শ্বশুরমশাই এসব বিষয়ে ভারি রক্ষণশীল। মেয়েকে ইংরেজী স্কুলের দু তিন ক্লাস পড়িয়েই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন। এনে তুলে দিয়েছেন পাকা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো মাস্টারের হাতে। কৃষ্ণপ্রসন্নের পরম ভাগ্য দিদির শ্বশুরবাড়িতে যাতায়াত শুরু করার দিন পনের যেতে না যেতেই সেই বুড়ো মাস্টারের শক্ত অসুখ হোল। দিদির শ্বশুরের মত বর আর দেবরেরা সেকেলে নয়। তাঁরা বললেন, 'লাবুর পরীক্ষা এসেছে, কৃষ্ণপ্রসন্ন তুমিই একটু ওকে দেখিয়ে শুনিয়ে দাও না।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন জিভ কেটে বলেন, 'ওরে বাবা, থিয়েটার বাড়ি থেকে নারদের এক গোছা পাকা দাড়ি তাহলে ধার ক'রে আনতে হয়।'

কিন্তু দাড়ি ধার করবার দরকার হোল না। দিদি আর দিদির শাশুড়ীর সার্টিফিকেটে কৃষ্ণপ্রসন্নই তরুণ হয়েও বসতে শুরু করল সেই বুড়ো মাস্টারের পরিত্যক্ত চেয়ারে। প্রথমে কেউ কোন কথা বলে না, কেউ কারো দিকে তাকায় না, বইয়ের দিকে দুজনেই চোখ নিচু ক'রে থাকে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি যে ছাপার অক্ষরে আবদ্ধ থাকে না। তারপর মাস তিনেক বাদে ফের যখন সেই বুড়ো মাস্টারমশাইর আসবার কথা হোল, লাবণ্য বলল, 'আমি আর তাঁর কাছে পড়ব না।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন বলেন, 'তবে কার কাছে পড়বে?'

'এখন যার কাছে পড়ছি।'

'বা রে আমি কি সারা জীবন মাস্টারী করব নাকি?'

লাবণ্য হেসে বলল, 'করবেই তো, মাস্টারীর মত এমন মহৎ কাজ আর নেই।'

কিন্তু দু'বছর বাদে গাঁয়ের এম. ই. স্কুলে হেডমাস্টারী নেওয়ার সময় এই লাবণ্যই সবচেয়ে বেঁকে দাঁড়িয়ে ছিল। জেঠতুতো বোনের মধ্যস্থতায় লাবণ্য তখন শুধু আর কৃষ্ণপ্রসন্নের ছাত্রীই নয়, সাগরপুর সরকার বাড়ির বউ হয়ে ঘরে এসেছে। আর বি. এ. পরীক্ষা দিতে বসে এক জ্ঞাতি ভাইয়ের মুখে স্ত্রীর ডবল নিউমোনিয়ার খবর পেয়ে পরীক্ষার হল ছেড়ে একেবারে দেশে চলে এসেছে কৃষ্ণপ্রসন্ন। বাবা বললেন, 'ইচ্ছা করেই আমরা খবর দিইনি। পরীক্ষার চেয়ে তোর বউ বড় হোল?'

কৃষ্ণপ্রসন্ন বলল, 'স্ত্রীর জীবনের চাইতে আমার পরীক্ষা বড় নয়।'

রোগটা ঠিক ডবল নিউমোনিয়া ছিল না। অল্প দিনেই লাবণ্য উঠে বসল এবং উঠে বসেই বলল, 'তোমার পরীক্ষার কি হোল?'

কৃষ্ণপ্রসন্ন জানাল পরীক্ষা সে দেয়নি।

লাবণ্য বলল, 'ছি ছি ছি আমার জন্য তুমি পরীক্ষা বন্ধ করলে ? আমি মুখ দেখাব কেমন ক'রে ? তুমি এক্ষুনি ফের কলকাতায় চলে যাও।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন অতদূর গেল না। তখন দক্ষিণ পাড়ায় চৌধুরীদের উদ্যোগে নতুন এম. ই. স্কুল হচ্ছে গাঁয়ে। নিত্যনারায়ণ তাকে ধরে বসলেন, 'তোমার কলেজ খোলার তো ঢের দেরি। তার আগে আমাদের স্কুলটা একটু ঠিকঠাক ক'রে দিয়ে যাও।' তারপর কতবার কলেজ খুললো, বন্ধ হোল। কিন্তু কৃষ্ণপ্রসন্নের আর যাওয়া হোল না।

লাবণ্য বলেছিল, 'তুমি কি সত্যিই মাস্টারী নিলে ?' কৃষ্ণপ্রসন্ন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হেসেছিল, 'নিলামই বা। মাস্টারীই তো সব চেয়ে মহৎ বৃত্তি।'

বাড়ির আর গাঁয়ের সব লোক জানল বউকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে পারবে না বলেই কৃষ্ণপ্রসন্ন বিদেশে গেল না। এমন স্ত্রৈণ পুরুষ আর দুটি নেই। লাবণ্য জানাল অবশ্য অন্য কথা। তারপর—তার একটানা সাতাশ বছর।

হাজরা রোডের মোড়ে নেমে যাওয়ার আগে ফের সাতাশ বছরের পরের একটু খবর দিয়ে গেলেন মাস্টারমশাই, হেসে বললেন, 'ছেলেমেয়েদের চোখের আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে গীতার মা চুপি চুপি আমাকে কি জিজ্ঞেস করেছিল জানো নিরুপম ?'

বললাম, 'কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?'

মাস্টারমশাই একটু হাসলেন, 'আচ্ছা, নিরুপমের মত সবাই কি স্যুট পরে আসে ? তার মানে সবাই যদি স্যুটধারী হয়, তাহলে আমারও পরিত্রাণ নেই। তাহলে তাঁর বড় বউদির কাছ থেকে তাঁর দাদার পুরোন একটা স্যুট ধার ক'রে আনবেন আর তাঁর বউদিদের মতই নিজের হাতে টাই বাঁধবেন আমার গলায়।' হেসে বললাম, 'সামনের মাসে আপনাকে একটা স্যুট আমি করিয়ে দেব মাস্টারমশাই।'

'পাগল নাকি ? এই ধুতী পাঞ্জাবির চোটেই অস্থির। দু'বার ক'রে নিজের হাতে কেচেছে, পাশের বাসার ইস্ত্রীটা চেয়ে এনে ইস্ত্রী করেছে, কেবল কি তাই ? কোঁচাটা পর্যন্ত নিজের পছন্দমত কুঁচিয়ে দেওয়া চাই। বলে কি জানো।—এ তো তোমার গাঁয়ের স্কুল নয়, শহরের অফিস।' হেড মাস্টারমশাই ফোকলা দাঁতে একটু হাসলেন। তা সত্ত্বেও দাঁতের সেই বিশ্রী ফাঁক আমার চোখে তেমন যেন আর বিসদৃশ লাগল না। কারণ সাতাশ বছর আগেকার সেই লাবণ্য আর কৃষ্ণপ্রসন্ন আমার মনকে তখনো আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে।

কিন্তু মাস্টারমশাই সম্বন্ধে এই রোমান্টিক আচ্ছন্নতা বেশি দিন বজায় রইল না। সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতেই ঝড়ের বেগে ক্লিয়ারিং-এর পরিমলবাবু আমার চেম্বারে এসে ঢুকলেন।

বললাম, 'ব্যাপার কি পরিমলবাবু ?'

'আচ্ছা নিরুপমবাবু, ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ আমি না কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু?'

বললাম, 'আপনি, এতো সবাই জানে।'

'কিন্তু কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু জানেন না। জানলেও মানেন না।' তারপর অভিযোগের পূর্ণ বিবরণ দিলেন পরিমলবাবু। এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়েও কথায় কথায় তাঁর সমালোচনা করেন মাস্টারমশাই। ছোকরা কর্মচারীদের সামনে তাঁর ইংরেজীর ভুল ধরেন। কথাবার্তার খুঁৎ ধরেন। মুহূর্তে মুহূর্তে কাজের ব্যাঘাত হয়। পরিমলবাবু বললেন, 'লোকের আমার আর দরকার নেই মশাই, একজন লোক শর্ট নিয়ে আমি আজীবন কাজ করতে রাজী আছি। রাত দশটা পর্যন্ত থাকতে হয় তাও স্বীকার। কিন্তু এই বুড়োকে আপনি সরিয়ে নিন। দুষ্ট গরুর চেয়ে আমার শূন্য গোয়াল ভালো।'

পরিমলবাবুকে যেতে বলে মাস্টারমশাইকে ডেকে পাঠালাম। তাঁর মুখও থম থম করছে।

বললাম, 'ব্যাপার কি মাস্টারমশাই? পরিমলবাবুর সঙ্গে নাকি আপনি ঝগড়া করেছেন।'

মাস্টারমশাই উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ঝগড়া? ওকে যে বেতিয়ে পিঠ লাল ক'রে দিইনি আমি সেই ওর —'

বাধা দিয়ে বললাম, 'থামুন থামুন। করেছেন কি তিনি।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'প্রথম তো, এক লাইনও ইংরেজী লিখতে পারবে না। একটা সেন্‌টেন্‌সে দুটো বানান ভুল, তিনটে গ্রাম্যাটিক্যাল মিসটেক। শুধরে দিলেও শুনবে না, কেবল উড়ো তর্ক।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'বেশ, লিখছে লিখুক ভুল ইংরেজী। তা না হয় নাই ধরলাম। কিন্তু ছেলের বয়সী সব ছোকরা। তাদের সঙ্গে প্রকাশ্য অফিসের মধ্যে এসব কি ইয়ার্কি। ভদ্রঘরের মেয়েদের কথা নিয়ে, সিনেমা স্টারদের নিয়ে এমনকি ব্রথেলের—. ছি ছি ছি। এ সব তুমি সহ্য করতে বল নিরুপম?'

আদিরসে পরিমলবাবুর একটু বেশি আসক্তি আছে। আট ন' ঘণ্টা কলম পিষে পিষে অন্তরাত্মা যখন শুকিয়ে আসে, ঝিমিয়ে আসে, অল্প-বয়সী কেরানীর দল তখন স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত ব্যাঙ্কে নানা ধরনের মেয়েদের প্রসঙ্গ আর যৌনজীবনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে তিনি নিজের এবং সহকর্মীদের কলম মন দুইই রসাপ্লুত করেন। এ খবরটা আমি জানি। কিন্তু পরিমলবাবু কাজকর্মে ভারি দক্ষ লোক। ক্লিয়ারিং মেলাতে ওঁর মত যোগ্যতা আর কারো নেই ব্যাঙ্কে।

মাস্টারমশাইকে বললাম, 'এখানে সবাই কলীগ। অত বাদ-বিচার'—

মাস্টারমশাই তেমনি তীব্র কণ্ঠে বললেন,'কলীগ, তাই বলে স্থানকালপাত্র ভেদ নেই? অশ্লীল অশ্রাব্য আলোচনায় ছেলের বয়সী ছাত্রের বয়সী সব ছোকরাদের মাথা চিবিয়ে খেতে হবে? ফের যদি পরিমলবাবুর মুখে আমি এই সব কুৎসিত কথা শুনি, আমি থাপ্পড় মেরে গাল ভেঙ্গে দেব। হাতাহাতি হয়ে যাবে আমার সঙ্গে।'

গম্ভীরভাবে বললাম, 'আচ্ছা যান। আমি এর ব্যবস্থা করব।'

সেইদিনই মাস্টারমশাইকে স্থানান্তরিত করলাম বিল ডিপার্টমেণ্টে। পরিমলবাবু থেকে তাঁর অল্পবয়সী সহকারীরা সবাই খুশি।

'বাঁচিয়েছেন নিরুপমবাবু। আর এক সপ্তাহ মাস্টারমশাইর সঙ্গে থাকলে আমরা পাগল হয়ে যেতাম। লোক আপনি পারেন দেবেন, না পারেন না দেবেন, কিন্তু মাস্টার-টাস্টার আর পাঠাবেন না।'

কিন্তু দিন পাঁচ ছয়ও কাটল না। বিল ডিপার্টমেণ্টেও ফের গোলমাল উঠল। বিলের ইনচার্জ ননীবাবু এসে গম্ভীর মুখে নালিশ করলেন, 'মাস্টারমশাইকে সরিয়ে নিন। ওঁর দ্বারা আমার কাজ চলবে না।'

মাস্টারমশাই নামটা এরই মধ্যে সমস্ত ব্যাঙ্কে ছড়িয়ে পড়েছে।

বললাম, 'কি হয়েছে ননীবাবু।'

'আরে মশাই, নিজে কাজকর্ম কিছু বুঝবেন না, বুঝতে চেষ্টা করবেন না। কেবল আমার দোষ ধরবেন। কার দ্বারা কতটুকু কাজ হয় না হয়, আমি জানি, আমি বুঝি। ডিপার্টমেণ্টের এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপারে উনি কেন মাথা গলাতে আসেন বলেন তো। ওঁর সঙ্গে কাজ করা impossible, বিল থেকে হয় ওঁকে আপনি সরিয়ে নিন, না হয় আমাকে সরান। আপনি যদি কোন ব্যবস্থা না করেন, আমি জেনারেল ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করব।'

গম্ভীরভাবে বললাম, 'আচ্ছা দেখছি।' মাস্টারমশাইকে ডেকে পাঠিয়ে বললাম, 'ব্যাপার কি, আপনার নামে ফের কমপ্লেন এসেছে।'

তিনি বললেন, 'কমপ্লেন? আমি ননীবাবুর বিরুদ্ধে কমপ্লেন করছি। মানুষ না ব্রুট।'

বললাম, 'ব্যাপারটা কি।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'ব্যাপার কি আর। ক্লিক, কেবল ক্লিক। জন পাঁচেক মাত্র লোক ডিপার্টমেণ্টে। তার মধ্যে দুটো ক্লিক। একজন আর একজনের বিরুদ্ধে লাগাচ্ছে ইনচার্জের কাছে। কিন্তু ননীবাবু তো হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট। তাঁর তো উচিত নিরপেক্ষ থাকা, সুবিচার করা। কিন্তু পক্ষপাত তাঁরই সব চেয়ে বেশি। নির্মল বলে একটি

ছেলে আছে। সবে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে আই. কম.-এ ভর্তি হয়েছে। ছেলেটি একটু স্পষ্ট বক্তা। সেই জন্য ননীবাবুর যত আক্রোশ তাঁর ওপর।'

বললাম, 'তা থাক, আপনি ওর ভিতরে না গেলেই তো পারেন।'

মাস্টারমশাই উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'বল কি তুমি? না গেলেই পারি? আমার চোখের সামনে ছেলেটাকে এমন ক'রে নির্যাতন করবে আর আমি কোন কথা বলব না? পাঁচটার মিনিট কয়েক আগে থেকে ননীবাবু এমন ক'রে কাজ চাপাবেন ওর ঘাড়ে যে সপ্তাহে ছেলেটির চার পাঁচ দিন কলেজ কামাই হয়। এইতো একরত্তি ছেলে, খাটাতে খাটাতে ওর জিভ বের ক'রে ফেলেছেন ননীবাবু। কথা না বলে কোন মানুষে পারে?'•

বললাম, 'ননীবাবু জেনারেল ম্যানেজারের নিজের ভাগ্নে। তিনি যদি কোন রিপোর্ট টিপোর্ট করেন তাহলে কিন্তু শত চেষ্টা ক'রেও আমি আপনার চাকরি রাখতে পারব না মাস্টারমশাই, মাস্টারীর মায়া যখন ছেড়েছেন একেবারে ছাড়ুন। অফিসে এসে আর কক্ষণো মাস্টারী করবেন না মাস্টারমশাই।'

আমার শাসনের ভঙ্গিতে মাস্টারমশাই বেশ একটু ঘাবড়ে গেলেন, 'না বাবা দোহাই তোমার, চাকরি টাকরির যেন কোন গোলমাল না হয়। তুমি বরং ননীবাবুকে আমার হয়ে।—আচ্ছা আমিও না হয় তাঁর কাছে ক্ষমা চাইব।'

বললাম, 'ক্ষমা চাওয়ার হয়ত দরকার হবে না, কিন্তু খুব সমঝে চলবেন।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'আচ্ছা নিরুপম তাই চলব। কিন্তু খবরদার, তুমি যেন আমার বাসায় গিয়ে অফিসের এসব গোলমালের কথা বল না বাবা। গীতার মা শুনলে—।'

হেসে মাস্টারমশাইকে অভয় দিয়ে বললাম, 'না, তিনি এসব জানতে পারবেন না।'

কিন্তু দু'দিন বাদে ফের মাস্টারমশাইর নামে ননীবাবু অভিযোগ করলেন। তিনি ফের ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করেছেন। তাঁকে নিয়ে কাজ করা অসম্ভব।

সুতরাং আবারও অন্য ডিপার্টমেন্টে বদলী করতে হোল মাস্টারমশাইকে।

মাস্টারমশাই মুখ ভার ক'রে বললেন, 'বারবার তুমি আমারই দোষ দেখছ নিরুপম। শাস্তি দিয়ে আমাকেই সরাচ্ছ।'

বললাম, 'তা ঠিক নয় মাস্টারমশাই, কিন্তু অফিসের একটা ডিসিপ্লিন আমাকে মেনে চলতে হবে। ননীবাবু এখানকার পুরোন লোক আর খুব এফিসিয়েণ্ট হ্যাণ্ড। তা'ছাড়া জেনারেল ম্যানেজারের—।'

মাস দুয়েকের মধ্যে ব্যাঙ্কের প্রায় সমস্ত ডিপার্টমেণ্টেই মাস্টারমশাইকে ঘুরিয়ে আনলাম। লেজার, লোন, ফিক্স-ডিপজিট, এ্যাকাউণ্টস, ডেসপ্যাচ—কোন বিভাগই বাদ রইল না, কিন্তু সব জায়গা থেকে অভিযোগ আসতে লাগল। মাস্টারমশাই সর্বত্রই অপ্রিয়

হয়ে উঠেছেন। তিনি 'কেঅস' সৃষ্টি করছেন অফিসে। তাঁকে নিয়ে কাজ করা অসম্ভব। কর্তৃপক্ষের কাছেও তাঁর নামে রোজ নানা ধরনের অভিযোগ যেতে শুরু করল।

ভারি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মাস্টারমশাইর চাকরি বুঝি আর রাখা গেল না।

এর মধ্যে একদিন তাঁর বাসায়ও গেলাম। খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন মাস্টারমশাইর স্ত্রী। নানারকম তরকারি রেঁধে পাতের চার ধারে সাজিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'উনি কেমন কাজকর্ম করছেন নিরুপম।'

আশায় উৎসুক তাঁর দুটি চোখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফের ভাত মাখতে মাখতে মুখ নিচু ক'রে জবাব দিয়েছিলাম, 'ভালোই।'

তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল স্বরে বলেছিলেন, 'কেমন, বলিনি গীতা ? ইচ্ছা করলেই উনি পারবেন।'

গীতা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেছিল, 'বাঃ রে, পারবেন না আমি বলেছি নাকি ?'

কিন্তু ডেসপ্যাচ থেকেও যখন ক্রমাগত অভিযোগ আসতে লাগল আমি মাস্টারমশাইকে ডেকে বললাম, 'কেয়ার-টেকার প্রফুল্লবাবু কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, আপনি তাঁর জায়গায় কাজ করুন, বেয়ারাদের দেখা শোনা করবেন।'

মাস্টারমশাই অভিমানের সুরে বললেন, 'সমস্ত না শুনে, না জেনে বার বার তুমি আমাকেই জব্দ করছ নিরুপম। ডেসপ্যাচার ভুবনবাবু সেদিন কানাই বেয়ারাকে সামান্য কারণে যেভাবে গালাগালি করেছিলেন তা কোন ভদ্রলোক করে না, কোন ভদ্রলোক তা সইতেও পারে না, আমি আপত্তি করেছিলাম, তাই বুঝি তিনি এসে লাগিয়েছেন ?'

বললাম, 'সে যাক, আপনি আজ থেকে বেয়ারাদের ভার নিন। ওরা কখন আসে যায় লক্ষ্য রাখবেন, যে ডিপার্টমেণ্টে যে কজন বেয়ারার দরকার হয় ঠিক মত হিসাব ক'রে দেবেন। দেখবেন কেউ যেন কাজে ফাঁকি না দেয়, চুপচাপ বসে না থাকে। এই হোল মোটামুটি কাজ। বোধ হয় এতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না।'

রাগে অভিমানে মাস্টারমশাই যেন কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তারপর বললেন, 'তার মানে তুমি আমাকে অপমান করছ। তার মানে বেয়ারাদের সর্দারি করা ছাড়া আর কোন কাজের যোগ্য বলে তুমি আমাকে মনে করছ না।'

বিরক্ত হয়ে ফাইল থেকে মাথা তুলে বললাম, 'কি মনে করছি না করছি সে সব আলোচনা পরে আর এক সময় করব মাস্টারমশাই। আপাততঃ আমি ভারি ব্যস্ত।'

মাস্টারমশাই বেরিয়ে গেলেন।

প্রথম দিনকয়েক বেয়ারাদের কাছ থেকেও অভিযোগ আসতে লাগল, মাস্টারমশাই

বড় রূঢ়ভাষী। হাজিরা সম্বন্ধে ভারি কড়াকড়ি তাঁর! চাল চলন আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ভারি খুঁতখুতি। একদিন নাকি কি একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলার জন্য শীতলকে চড় মেরেছিলেন।

কিন্তু সপ্তাহ দুই বাদে অভিযোগের ধরণগুলি অন্য রকম হতে শুরু করল। মাস্টারমশাই বেয়ারাদের হয়ে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। কোনো বেয়ারাকে একটু কড়া কথা বলবার উপায় নেই, মাস্টারমশাই তেড়ে এসে প্রতিবাদ করবেন। কোনো ব্যক্তিগত কাজকর্মে তাদের পাঠানো চলবে না। মাস্টারমশাই বলেন, 'তা হলে অফিসের কাজ সাফার করে। বাবুদের কেবল পান সিগারেট জোগাবার জন্য ওদের রাখা হয় নি।'

ক্লিয়ারিং-এর পরিমলবাবু এসে একদিন বললেন, 'ভালো চান তো বেয়ারাদের সর্দারী থেকে এখনো মাস্টারমশাইকে সরিয়ে আনুন, আস্কারা দিয়ে দিয়ে ওদের উনি মাথায় তুলে ছাড়বেন।'

বললাম, 'আচ্ছা যান। দেখছি।'

ইয়ার ক্লোজিং-এর সময় কাজ সারতে সারতে রাত প্রায় আটটা হোল। অফিসের আর সব ডিপার্টমেণ্ট চলে গেছে। নিজের ডিপার্টমেন্টের দু'জন সহকর্মীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা যেতেই মনে পড়ল দেরাজটা চাবিবন্ধ ক'রে আসিনি। কতকগুলি জরুরী চিঠি টেবিলেই পড়ে আছে। সহকর্মীদের ছেড়ে দিয়ে আমি ফের এসে ঢুকলাম অফিসে। গেটের কাছে দারোয়ান খৈনি টিপছে, মাথা নিচু ক'রে সেলাম জানাল।

দেরাজে চাবি বন্ধ ক'রে ফিরে আসছি: হঠাৎ লক্ষ্য করলাম অফিসের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেন্টের কাছাকাছি আলো জ্বলছে। মৃদু আলাপ শোনা যাচ্ছে জনকয়েকের, বেয়ারাদের জনকয়েক অফিস বিল্ডিং-এই রাত্রে থাকে। ছাতের ওপর রান্না-বান্না করে, খায় দায়। ভাবলাম তারাই আড্ডা দিচ্ছে।

ফিরে আসছিলাম, হঠাৎ কানে গেল, 'আচ্ছা স্বাধীনতা শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ জানো তোমরা?' একি এ যে মাস্টারমশাইর গলা। এত রাত্রে মাস্টারমশাই কি করছেন এখানে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম।

দেখলাম সাত আটটা ছোট ছোট টুল পেতে শীতল, বিপিন, নিবারণ, কানাই এবং আরও কয়েকজন মাস্টারমশাইকে প্রায় ঘিরে বসেছে। ডেসপ্যাচারের চেয়ারটায় বসেছেন মাস্টারমশাই। সবাইকে ছাড়িয়ে কাঁচা পাকা চুলে ভর্তি তাঁর মাথাটা উঁচু হয়ে উঠেছে। বেয়ারাদের কারো হাতে খাতা পেন্সিল, ব্যাঙ্কেরই সব বাতিল কাগজপত্র। কারো হাতে খড়ি আর শ্লেট। আমাকে দেখেই মাস্টারমশাই আর ছাত্রের দল সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল।

মুহূর্তকাল আমিও কোন কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, 'এসব কি হচ্ছে মাস্টারমশাই। ক্লাস নিচ্ছেন নাকি ?'

মাস্টারমশাই অপ্রতিভ হয়ে অপরাধীর মত উঠে দাঁড়ালেন, 'না না ক্লাস ট্লাস কিছু নয়। অমনিই ওদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। অফিস ডিসিপ্লিনটা ভালো ক'রে আয়ত্ব করানোই অবশ্য আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তার জন্য আক্ষরিক শিক্ষাটাও কিছু কিছু দরকার, কি বল ?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

মাস্টারমশাই বললেন,'এদের মধ্যে একটি ছেলে কিন্তু অদ্ভুত মেরিটরিয়াস। আমাদের এই কানাই, চেন ওকে ?' বার তের বছরের কালো, রোগাপানা একটি ছেলের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চিনি।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'অদ্ভুত মাথা। ইংরাজী বল, অঙ্ক বল, সব বিষয়ে সমান উৎসাহ। এই সব ছেলেকে দিয়েই স্কলারশিপের এ্যাটেম্পট নিতে হয়। প্রায় ক্লাস সিক্সের স্ট্যাণ্ডার্ডে আছে। জানো, খানিকটা কেয়ার নিতে পারলে ওকেও ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ফার্স্ট ক'রে তোলা যায়।'

বেরিয়ে আসছিলাম, দেখি মাস্টারমশাই আমার পিছনে পিছনে এসেছেন। আমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মাস্টারমশাই বললেন, 'চল, আমিও যাচ্ছি, একটা request নিরুপম, এসব কথা যেন গীতার মা. কি জেনারেল ম্যানেজারের কানে না যায়।'

মনে মনে হাসলাম, প্রথম মাস্টারীও মাস্টারমশাই এমনি লুকোচুরির ভিতরেই শুরু করেছিলেন।

হেডমিস্ট্রেস

সকালের চায়ের পাট শেষ ক'রে তক্তপোষে সাডম্বরে শুয়ে সিগারেট মুখে খবরের কাগজে চোখ আর চার বছরের মেয়ে মিণ্টুর পিঠে সস্নেহে হাত বুলাচ্ছিল শৈলেন। হঠাৎ কানে এল, "না, অর্চনা মিত্তিরটা একেবারেই যা তা। যাই বল। কেবল স্টাইল আর পোষাক-আসাকের দিকেই লক্ষ্য। পড়াশুনার ধারেও ঘেঁষবে না। ইংরাজীতে এবারও ফেল করল।"

কাগজ থেকে মুখ তুলে শৈলেন স্ত্রীর দিকে তাকাল। একটু দূরে জানালার কাছে টুলটা টেনে নিয়ে সুপ্রীতি খাতা দেখছে। ফার্স্ট ক্লাসের খাতা ক'খানা এখনই দেখে শেষ করা চাই। পূজো উপলক্ষে আজ বন্ধ হয়ে যাবে স্কুল।

শৈলেন একটু হাসল, 'ফেল করল, আহা হা বেচারা। কেউ ফেল করেছে শুনলে বড় দুঃখ লাগে। দাওনা ওকে কটা নম্বর দিয়ে পাশ করিয়ে।'

সুপ্রীতি খাতা থেকে মুখ তুলে স্বামীর দিকে তাকাল। শ্যামবর্ণের ওপর মুখখানা বেশ সুন্দর। চোখ দুটি বড়, লম্বা নাকটি একটু বাঁকানো, পাতলা ঠোঁট, কোমল চিবুক, হাসলে টোল পড়ে।

সুপ্রীতি কিন্তু হাসল না, জোড়া ভ্রূ কুঁচকে, স্বামীর দিকে চেয়ে রুক্ষ স্বরে বলল, 'তার মানে ?'

শৈলেন সিগারেটের ধোঁয়া ছাডতে ছাড়তে ফের একটু হাসল, 'মানে আর কি। টাকা তো নয়, গোটা কয়েক নম্বরই তো। বাক্স থেকে তো আর বের ক'রে দিতে হবে না। রঙীন পেনসিলে অকৃপণ হাতে কোন এক জায়গায় বসিয়ে দিলেই চলবে। তাই দাও, মেয়েটা খুশি হোক।' নিজের মনটা ভারি খুশি রয়েছে আজ শৈলেনের। যদিও খুশি হওয়ার বিশেষ কারণ নেই। অফিস থেকে এবার আর বোনাস দেবে না ; মাসের মাইনেটি প্রথম দশ দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবু আজ অফিস ছুটি। ভোর থেকে শীত শীত হাওয়া দিচ্ছে। আকাশে বাতাসে শারদীয় ভাব। শহরতলীর পাশাপাশি দুটো রাস্তায় লাল কাপড়ে সার্বজনীন পূজোর সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আর জানালার বাইরে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ একটি নীল অপরাজিতা চোখে পড়েছে শৈলেনের। কৈশোরের আর প্রথম যৌবনের অনেকগুলি দিন রাত সেই রঙ মেখে স্মৃতির দুয়ারে এসে হাজির হয়েছে। অবশ্য কেবল রঙীন স্মৃতিই নয়, তার নেপথ্যে একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতিও আছে। সুপ্রীতি আজ দু'মাসের মাইনে পাবে। শৈলেন ভেবেছিল ভোরে উঠে বলবে "শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে একটু গাওনা প্রীতি", কিন্তু বলতে সাহস হয়নি। দক্ষিণ সিঁথি বিদ্যাবীথির হেডমিস্ট্রেস শ্রীযুক্তা সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায় গভীর মনোযোগ আর গম্ভীর মুখভঙ্গীর সহযোগে ছাত্রীদের ইংরেজী জ্ঞানের পরীক্ষা নিচ্ছেন। দেশী সওদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ সারির সাধারণ একটি কেরাণীর কোন চাপল্য দেখলে তিনি হয়তো বেত তুলতেও পারেন।

স্বামীর কথা শুনে সুপ্রীতি অবশ্য বেত তুলল না, কিন্তু মুখখানাকে আরও কঠিন, গলার স্বরটিকে আরও রুক্ষ ক'রে তুলল, 'তোমার সবই ঠাট্টা, না ? স্কুলের পরীক্ষাটা বুঝি আর পরীক্ষা নয় ? কোন রকম দায়িত্ব তার নেই। শুধু চোখ বুজে নম্বর বসিয়ে গেলেই হোল, তাই বুঝি ভাব তুমি ?'

রীতিমত হেডমিস্ট্রেসসুলভ ধমক। এর উত্তরে শৈলেন হাসতে পারত, অন্যদিন হাসেও, কিন্তু আজ তার হাসি পেল না। তার বদলে মিণ্টুই হেসে উঠল, 'কি মজা।

বাবাকে বকো মা, আরো বকো। আমাকে নতুন জুতো কিনে দিলে না। কেবল বলে দেব দেব, কোন দিন দেয় না।'

সুপ্রীতি মেয়েকে ধমক দিল, 'এই চুপ।' তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'এইতো কাল রাত থেকে বলছি, ক'খানা খাতা দেখে দাও। কাজ-কর্ম তো নেই। অফিস থেকে এসে চুপচাপ বসে বসেই তো সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা অবধি কাটিয়ে দিলে। আজও সকাল থেকে বসে আছ তো আছই। কেন দু'খানা খাতা দেখলে, নম্বরগুলি টোটাল দিলে কি জাত যায়?'

শৈলেন কাত হয়ে ছিল, এবার উঠে সোজা হয়ে বসল, 'আলবৎ যায়। তোমার খাতা দেখে দেওয়াটা কি আমার চাকরি নাকি?'

সুপ্রীতি কঠিন কণ্ঠে বলল, 'তাতো নয়ই। কিন্তু তোমার অফিসের সময় জুতোয় কালি আর জামায় বোতামগুলি রইল কিনা, তা লক্ষ্য করা, দেরাজের চাবি আর জরুরী কাগজপত্র গুছিয়ে পকেটে গুঁজে দেওয়া নিশ্চয়ই আমার চাকরি, কি বল?' খাতার পাতায় চোখ নামাল সুপ্রীতি। নীল পেনসিল দিয়ে অর্চনা মিত্রের আরো কতকগুলি ব্যাকরণের ভুল কেটে ফেলল। দাগের দৈর্ঘ্য আর গভীরতা দেখে ওর রাগের তীব্রতাটা টের পাওয়া গেল।

আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল শৈলেন। আশ্চর্য যে সেবা পরিচর্যাটুকু নিতান্তই ভালোবাসার দান, দৈনন্দিন দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে যা একান্ত স্বাভাবিকভাবেই মিশে রয়েছে, আজকাল তা নিয়েও খোঁটা দেয় সুপ্রীতি, তারও চুলচেরা হিসাব করতে চায়। তার কারণ ওর আর্থিক ক্ষমতা হয়েছে। সংসারে অর্থমূল্যই যে পরম মূল্য তা টের পেয়েছে সুপ্রীতি।

গোড়ার দিকে শৈলেন নিজেই ওর স্কুলের পরীক্ষার খাতাগুলি টেনে নিত, বলত, 'দাও আমি দেখে দিচ্ছি।' খাতা প্রতি দু'আনা ক'রে কিন্তু দিতে হবে, সিগারেটের খরচা বাবদ।' সুপ্রীতি হেসে বলত, 'ওরে বাবা আমার গরীব স্কুল। তোমার শ্বেত হস্তীর খরচ জোগাবে কি ক'রে। দু'টো খাতা আর একটা সিগারেট, এই চুক্তি কেমন?'

শৈলেন সেই সর্তেই রাজী হয়ে যেত। কিন্তু একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে দেখে তার দেখা খাতা স্ক্রুটিনাইজ করতে বসেছে সুপ্রীতি। এদিকে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে মিণ্টুর, উনানে তরকারী পুড়ছে।

শৈলেন বলেছিল, 'খাতাগুলি তো আমি দেখেই রেখেছি। আবার দেখছ কি।'

সুপ্রীতি একটু লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি খাতাগুলি আঁচলের তলায় লুকিয়েছিল। যেন গোপনে লেখা কবিতার খাতা, কি প্রেমপত্র। তারপর স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে জবাব

দিয়েছিল, 'এ্যানুয়ালের খাতা কিনা। তাই একটু ভালো ক'রে দেখছিলাম নম্বর টম্বর ঠিক আছে কিনা। গোলমাল হলে লজ্জায় পড়তে হবে।'

'কেন গোলমাল কিছু দেখলে না কি?'

সুপ্রীতি মুখ টিপে হেসেছিল, 'তা একটু আধটু দেখলাম বইকি। তুমি তো আর seriously দেখনি। বেশির ভাগই আন্দাজী কারবার।' তারপর সুপ্রীতি মুখ তুলে তাকিয়েছিল স্বামীর দিকে, 'অবশ্য দোষটা কেবল তোমার নয়, মেয়েদের স্কুল বলে কেউ seriously নেয় না। স্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারী পর্যন্ত এটাকে একটা ছেলেখেলা বলেই ভাবেন। কেবল মেয়েদের শিক্ষাই বা বলি কেন, গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাই তো তাই। যেহেতু লেখাপড়াটা অল্প বয়সে শিখতে হয়, তোমরা এটাকে অল্প দামী ছেলে ভুলাবার জিনিস ছাড়া কিছু ভাবতে পার না।'

তোমরা—

শৈলেন বাধা দিয়ে বলেছিল, 'দোহাই লক্ষ্মীটি, এমন চমৎকার বক্তৃতাটা টিচার্স কনফারেন্সের জন্য তুলে রাখ। অফিস থেকে খেটে খুটে এলাম এবার একটু চা চাই।'

তারপর থেকে সুপ্রীতির খাতা আর শৈলেন দেখে না। একটু মজা, একটু অবসর বিনোদনের ভাব শৈলেনের মনে ছিল বই কি! সমস্ত জীবনটাই যখন কাজে ভরতি তখন কোন কোন কাজ কারো কারো কাজ নিয়ে এক আধটু খেলতে ইচ্ছা তো হয়ই। আর খেলার মাঠে সাধ হয় কাজের লোক হ'তে।

'আর পাব কোথা
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'

কিন্তু সুপ্রীতি তার স্কুল নিয়ে খেলা ভালোবাসে না। কোন রকম চাপল্য সহ্য করে না ও। মাত্র বছর দেড়েকের চাকরিতে মাষ্টারনীর মুখোশ ওর মুখে শক্ত হয়ে আটকে বসেছে। সে মুখোশ ও কখনো যেন খুলতে চায় না, না কি চাইলেও পেরে ওঠে না। ওর ছাত্রী পড়ানো গম্ভীর মুখে আদর ক'রে চুমো খেতে মাঝে মাঝে দ্বিধা হয় শৈলেনের, ভয় হয়। সে চুম্বন হয়তো ওর মুখোশে ঠেকে যাবে, মুখ স্পর্শ করবে না।

মাঝে মাঝে শৈলেন ভাবে এই মাস্টারীর চাকরি থেকে স্ত্রীকে ছাড়িয়ে আনবে, ওর স্বাস্থ্যের দিকে তাকালে কষ্ট হয়, আরো কষ্ট হয় ওর গলার স্বর, মুখের লাবণ্য বদলে যাচ্ছে দেখে। পেশার ছাপ পড়ে যাচ্ছে ওর চেহারায়, সে ছাপ দিনের পর দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কিন্তু এই সৌন্দর্যপ্রীতি বেশীক্ষণ মনে ঠাঁই পায় না। সুপ্রীতির উপার্জন আজ সংসারের পক্ষে অপরিহার্য। শ্যামবাজারে আছে একান্নবর্তী পরিবারের আর এক ভগ্নাংশ। দাদা, বৌদি, ভাইপো, ভাইঝির দল। কেউ বেকার, কেউ অর্ধবেকার—টিউশনি সম্বল। তারা

এসে হাত পাতে। কারো কলেজের মাইনে বাকি। কারো চিকিৎসার খরচ জোটে না। কোন সপ্তাহে বা থাকে না রেশনের টাকার সংস্থান।

শৈলেন মুখ ঝামটা দেয়, 'আমি কি করব ?'

তবু করতে হয়, না করলে এখনো মন খুঁত খুত করে।

আর সেই সুযোগে সুপ্রীতি দিনের পর দিন ঘরে বাইরে হেডমিস্ট্রেস হয়ে ওঠে। দুঃসহ ! সিগারেটের টুকরোটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল শৈলেন। কিন্তু শিকে ঠেকে জ্বলন্ত টুকরোটা ফিরে এসে পড়ল ট্রাঙ্কের ঢাকনির ওপর। সুপ্রীতির নিজের হাতে তৈয়ারী লতা আঁকা ঢাকনি পুড়তে লাগল। পুড়ুক।

মিণ্টু চেঁচিয়ে উঠল, 'আগুন লাগল, মা আগুন লাগল।'

পোড়া গন্ধ ততক্ষণ সুপ্রীতিরও নাকে গেছে। খাতা ফেলে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, 'হচ্ছে কি সব শুনি ? সবাইকে পুড়িয়ে মারবার ইচ্ছা বুঝি।'

সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুপ্রীতি স্বামীর দিকে তাকাল। সিগারেটের আগুন ততক্ষণ নিভে গেছে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর দুজোড়া চোখ অনন্তকাল ধ'রে জ্বলছে তো জ্বলছেই। একটু বাদে সুপ্রীতি ফের তার জল-চৌকিখানার ওপর গিয়ে বসল। আর শৈলেন গেল আলনার কাছে। জামা চড়াল গায়ে। কোথাও বেরিয়ে পড়বে বন্ধু-বান্ধবের খোঁজে।

কিন্তু বেরুবার জো নেই। রান্নাঘর থেকে ঝি রাসমণি এসে থলি হাতে সামনে দাঁড়াল, 'দাদাবাবু বাজারে যান।'

বিদ্যাবীথির ঝি রাসমণি। সংসারে আর কেউ নেই। খোরাকীর বদলে হেডমিস্ট্রেসের বাসায় কাজ করে। সুপ্রীতি ব্যস্ত থাকলে মাঝে মাঝে রেঁধেও দেয়। স্কুলের সেক্রেটারী অনুকূল সরকারই ঠিক ক'রে দিয়েছেন।

'বিনা মাইনেয় এমন কম্বাইনড্ হাণ্ড আর কোথাও পাবেন না শৈলেনবাবু। জানেন তো আজকালকার দিন, বউ পাওয়া বরং সহজ, কিন্তু সহর ভ'রে খুঁজলেও পছন্দসই একটি ঝি জোগাড় করতে পারবেন না।'

প্রৌঢ় অনুকূলবাবু একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন।

রাসমণির কথায় শৈলেন জবাব দিল, 'আজ আর বাজার হবে না। আমার কাজ আছে।'

রাসমণি অবাক হ'য়ে বলল, 'ওমা সে কি, বাজার না হলে খাবেন কি, ঘরে কি এক রত্তি তরকারিও আছে। তেমন গেরস্থ নাকি আপনারা, যে কিছু জমিয়ে রাখবেন ? ভাঁড়ার সব ধোয়া মোছা। যান শিগগির বাজারে যান, আমার উনুন বয়ে গেল।'

থলিটা হাতে গুঁজে দিতে এল রাসমণি।

কিন্তু দু'পা পিছিয়ে গেল শৈলেন, রুক্ষ স্বরে বলল, 'বলছি তো পারব না। দরকার থাকে নিজে বাজার ক'রে নিয়ে এসো।'

রাসমণি নিজের থুতনিতে আঙুল দিয়ে বলল, 'কি আহ্লাদে কথা রে। দুবেলা দু' মুঠি ভাতের বদলে আমি বাসন মাজব, রাঁধব, আবার মেয়ে মানুষ হয়ে বাজারও করব? ভাবলেন কি আপনারা? যান্ আর দিক্ করবেন না। আমাকে কোন রকমে দুটি নামিয়ে রেখেই আবার ইস্কুলের কাজে বেরুতে হবে।'

কেবল স্কুলের কাজ আর স্কুলের কাজ। বউ আর ঝি দুজনের মুখে একই কথা।

শৈলেন রাগ ক'রে বলল, 'কাল থেকে বাসার কাজ আর তোমাকে করতে হবে না। শুধু স্কুলের কাজই কোর।'

এবার রাসমণি হাসল। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হয়েছে। অল্প বয়সের বিধবা। সন্তানাদি কিছু হয়নি। এখনো বেশ আঁট-সাঁট চেহারা। ভরাট মুখ। পরণে সরু চুল পেড়ে ধুতী। মাথায় কালো মিশমিশে চুল আছে এক গোছা। রঙটা ফর্সাপানা। পান দোক্তায় ভরা মুখ। হাসলে কোন কোন সময় এখনো রাসমণিকে ভালোই দেখায়। কিন্তু এখনকার হাসিতে শৈলেনের চিত্ত জ্বলে গেল। রীতিমত অবজ্ঞার হাসি ঝিটার মুখে। ও জানে শৈলেন ওকে কাজে বহালও করেনি, ওকে ছাড়িয়ে দেওয়ার শক্তিও তার নেই। কোয়ার্টারটা স্কুলের। স্বয়ং সেক্রেটারী হেডমিস্ট্রেসের সেবা পরিচর্যার জন্য তাকে এখানে রেখেছেন। শৈলেন কথা বলবার কে।

রাসমণি সুপ্রীতির দিকে এবার ফিরে তাকাল, 'ও বড দিদিমণি, বলি খাতা তো দেখছেন, এদিকে যে বাজার হয় না। সোয়ামীর সঙ্গে ফের বুঝি এক চোট হয়ে গেছে? ঝগড়া করবেন আপনারা, আর তার ফল ভুগবে আর মানুষে। মজা মন্দ নয়। এত ঝগড়া লাগে কিসে আপনাদের?'

সুপ্রীতি রাসমণির দিকে তাকিয়ে এবার হাসল, 'তুমি থামতো। বাজার না হয়, ডাল ভাত হবে আজ।'

মিণ্টু বলে উঠল, 'আমি কিন্তু ডাল খাব না মা। বাবা ইলিশ মাছ আনবে, তাই খাব।'

সুপ্রীতি কি বলতে যাচ্ছিল, সদর দরজার কথা নড়ে উঠল, 'শৈলেনবাবু আছেন নাকি, ও শৈলেনবাবু?'

সেক্রেটারী অনুকূল সরকারের গলা, শৈলেনের নাম ধ'রে ডাকলেও তিনি এসেছেন হেডমিস্ট্রেস সুপ্রীতি মুখুয্যের কাছে। গৃহস্বামীর সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, বিশেষ

কোন কথাও নেই। স্কুলের দরোয়ান ভজন সিং-এর মত শৈলেনও এই হেডমিস্ট্রেসের কোয়ার্টারের দ্বাররক্ষী মাত্র, আর কিছু নয়। মনে মনে সেক্রেটারীর ওপর অত্যন্ত বিদ্বেষ বোধ করল শৈলেন। ভাবল আজ লোকটির মুখের সামনে দোর বন্ধ ক'রে দেয়।

কিন্তু রাসমণি তাকে ততক্ষণে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে, 'আসুন, বড়বাবু, দোর খোলাই আছে।'

ময়লা শাড়ি পরা ছিল সুপ্রীতির। একটা জায়গায় একটু ছেঁড়াও আছে। আড়ালে গিয়ে তাড়াতাড়ি সেখানা বদলে ফিকে হলদে রঙের পরিষ্কার শাড়িখানা পরে নিয়ে পাশের ঘরের দিকে চলল। ছোট্ট একটু বসবার ঘর আছে লাগাও। সেক্রেটারী চট ক'রে এদের শোয়ার ঘরে ঢোকেন না। ছোট ঘরে ছোট টেবিলের সামনে গিয়েই বসেন। হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে দরকারী কথাবার্তা শেষ ক'রে অনেক সময় সেখান থেকেই চলে যান।

শৈলেন স্ত্রীকে কাঁপা গলায় বলল, 'কেবল কি শাড়ি বদলালেই হবে। মুখে পাউডারের পাফটা একটু বুলিয়ে নেবেনা? গলায় সরু হার ছড়াও পড়ে নাও, বেশ দেখাবে।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে সুপ্রীতি বলল, 'ইতর কোথাকার।'

তারপর সোজা চলে গেল সেক্রেটারীর ঘরে।

রাসমণি ফের এসে তাগিদ লাগাল, 'আর দেরি করবেন না, দাদাবাবু। উনুন জ্বলে গেল। মাস অন্তে আপনিই তো শেষে কয়লার হিসাব করেন। এত লাগে, অত লাগে। কেন লাগে এবার বুঝে দেখুন।'

উপায় নেই। মনে যত বিক্ষোভই থাকুক, দিনযাত্রার এতটুকু ব্যত্যয় হ'লে চলবে না। থলি হাতে ঘর থেকে বেরুল শৈলেন। রাসমণি বলল, 'মাছ, পান, তরকারী আর শুকনো লঙ্কা কিন্তু একেবারেই নেই। মনে থাকে যেন, কালকের মত ভুলে যাবেন না।'

সেক্রেটারীর সঙ্গে ইস্কুল সংক্রান্ত কথা বলতে বলতে হঠাৎ সুপ্রীতি বলল, 'খয়েরের কথা বললিনে রাসমণি, খয়েব আসে যেন।'

অনুকূলবাবুর গলা শোনা গেল, 'অমন ক'রে পিছন থেকে বললে কি কারো কানে যায় মিসেস মুখার্জি, না মনে থাকে। সামনে ডেকে ভালো ক'রে বলুন। ও শৈলেনবাবু এদিকে আসুন, আরে শুনুন, শুনুন, সিগারেট নিয়ে যান।'

আপ্যায়নে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন অনুকূলবাবু।

স্ত্রীর মনিব। সিগারেট তো তাঁকে শৈলেনেরই খাওয়াবার কথা। কিন্তু সিগারেট আর নেই, আছে বিড়ি। তা তো আর দেওয়া যায় না, কিন্তু সিগারেটটা নিতেও যেন কেমন কমন লাগে। এত ঘনিষ্ঠতা কিসের অনুকূলবাবুর। দৌবারিককে কেন এই খাতির।

তবু ডেকেছেন যখন, না যাওয়াটা অভদ্রতা। বসবার ঘরের সামনে শৈলেন দাঁড়িয়ে শুকনো একটু হাসল, 'না না, সিগারেট থাক, এই তো, এই মাত্র খেলাম। বড় tedious job, যাই বলুন।'

অনুকূলবাবু হাসলেন, 'কি বাজার করাটা? আপনাদের মত কবি মানুষের পক্ষে সে কথা ঠিক। কিন্তু আমাদের বেলায় কথাটা খাটে না। আমাদের তো বাজারেই দিন রাত কাটাতে হয়। তবু সকালের বাজারটি কিন্তু নিজের হাতে না করলে মন ওঠে না। চাকর বাকর অবশ্য গোটা তিনেক আছে, কিন্তু সব ব্যাটা পকেট কাটা। তা' দুচার আনা ওরা মারে মারুক, তবু যদি পছন্দসই জিনিসটি ঘরে আসে। তা তো আসবে না, ওরা কি জিনিস চেনে? ওদের হাতে বাজার ছেড়ে দিলে সেদিনের খাওয়াটাই মাটি। নিন।' দামী সৌখীন সিগারেট কেসটি বাড়িয়ে ধরলেন অনুকূলবাবু। অগত্যা একটা গোল্ড ফ্লেক তুলে নিল শৈলেন। কিন্তু আশ্চর্য তেমন যেন স্বাদ নেই গোল্ড ফ্লেকে।

চল্লিশ পেরিয়ে গেছে অনুকূল সরকারের বয়স। কিন্তু বেশ মোটা সোটা শক্ত স্বাস্থ্যবান পুরুষ। ইট শুরকির কারবারে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছেন যুদ্ধের বাজারে। স্থূল জিনিষপত্র নিয়ে নাড়া চাড়া করলেও রুচিটি সূক্ষ্ম। ওপাড়া থেকে এপাড়ায় আসতে হলেও বেশ সেজেগুজেই বেরোন। পরণে খদ্দরের মিহি ধুতি। সাদা পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম পরানো, হাতে লাল, নীল পাথর বসানো গুটি দুই আংটি। কেবল সাজ-সজ্জাতেই নয়, সদনুষ্ঠানেও অনুরাগ আছে অনুকূলবাবুর। সিঁথি বিদ্যাবীথি বলতে গেলে তাঁর নিজেরই উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। কাজকর্মের ফাঁকে যেটুকু অবসর পান স্কুলের উন্নতির জন্য খাটেন। বছর তিন চার হোল স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। তারপর আর বিয়ে করেন নি। স্ত্রী শিক্ষার ওপর অনুকূলবাবুর স্ত্রীর নাকি খুব ঝোঁক ছিল। তাই তাঁরই প্রীতির জন্য এই গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। সেই সঙ্গে অন্নসংস্থান হয়েছে পূর্ববঙ্গের কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবারের। টিচারদের মধ্যে বেশির ভাগই মাত্র ম্যাট্রিক পাশ। দু' তিনজন আণ্ডার-ম্যাট্রিকও আছেন। সেকেণ্ড টিচার আই. এ.। গ্রাজুয়েট শুধু হেডমিস্ট্রেস সুপ্রীতি। এই প্রতিযোগিতার বাজারে অন্য কোন হাই স্কুলে এদের চাকরি জোটা কঠিন হোত। ছাত্রীরাও অধিকাংশই দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। আশে পাশের উদ্বাস্তু ক্যাম্প আর কলোনী থেকেই বেশির ভাগ আসে। অনেককেই অর্ধবেতনের সুবিধা দিতে হয়েছে। কাউকে কাউকে বিনা মাইনেয়ও বিদ্যা দান করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে, কিন্তু সরকারী সাহায্য এখনো এসে পৌঁছোয় নি। তার জন্য চেষ্টা চরিত্র চলছে। কেবল এপাড়া নয়, সহর ভরে অনুকূল সরকারের বন্ধুবান্ধব। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়ও ক'জন আছেন। তাঁদের কাছ থেকে স্কুলের জন্য নিয়মিত চাঁদা তুলে আনেন অনুকূলবাবু।

ছুটি ছাটায় স্কুলবাড়িকে বিয়ে-বাড়ি হিসাবে ভাড়া দেন। তাতেও কিছু টাকা আসে। আর স্কুলের সুনাম আর ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য খাটে সুপ্রীতি নিজে। কেবল ক্লাসে পড়িয়েই তার দায়িত্ব শেষ হয় না, একটি প্রতিষ্ঠানের সে মাথা। তার জন্য সর্বদা তাকে মাথা খাটাতে হয়।

ফিকে হলদে রঙের শাড়ি প'রে পিঠ ভ'রে একরাশ চুল ছড়িয়ে সেক্রেটারীর টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুপ্রীতি। দীর্ঘ তনুদেহ বিনয়ে আনম্র। ভঙ্গিটি অনুরক্তার না হোক, অনুগৃহীতার। মনে মনে হাসল শৈলেন, কোথায় সেই হেডমিস্ট্রেসী প্রতাপ। সীমার কাছে না হোক সেক্রেটারীর কাছে তো মাথা নোয়াতে হয়েছে হেডমিস্ট্রেসকে। পুরুষের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে স্ত্রীলোককে। মুহূর্তের জন্য অনুকূল সরকারের সঙ্গে এক ধরনের সান্নিধ্য, অভিন্নতা অনুভব করল শৈলেন।

অনুকূলবাবু বললেন, 'আজই আবার আমাকে একটা সরকারী কাজে দিল্লী যেতে হচ্ছে। তাই ভাবলাম মিসেস মুখার্জির সঙ্গে দেখা ক'রে যাই, আজকে আবার ওঁদের 'পে ডে' কি না', মৃদু হাসলেন অনুকূলবাবু।

ঠিক ঠিক আজ ওদের মাইনের তারিখ। যেতে যেতে ঝুল পকেটে হাত ঢোকাল শৈলেন। মাত্র টাকা দেড়েকের খুচরো আছে সম্বল। এই দিয়েই দিনটাকে বিকেল পর্যন্ত ঠেলে নিতে হবে।

রাস্তার মোড়ে কৃষ্ণচূড়া গাছটার কাছে দেখা হোল অঙ্কের টিচার অমলা গুপ্তের সঙ্গে। একজন ভদ্রলোকও রয়েছেন পিছনে। হাতে ওষুধের শিশি। ডাক্তারখানা থেকে ফিরছেন। অমলা হেডমিস্ট্রেসের বাসায় মাঝে মাঝে আসে। শৈলেনের সঙ্গে সুপ্রীতি তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ছোটখাট রোগা, ফ্যাকাসে চেহারা অমলার। তবু ওর মধ্যে মুখশ্রীটুকু মন্দ নয়।

শৈলেনকে দেখে অমলা হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানাল, মৃদু হেসে বলল, 'এই যে।'

তারপর পিছনের পুরুষটির দিকে তাকিয়ে শৈলেনের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমাদের হেডমিস্ট্রেসের স্বামী। আর ইনি আমার—'

শৈলেনের দিকে তাকিয়ে ফের একটু হাসল অমলা গুপ্ত।

হেডমিস্ট্রেসের স্বামী এ্যাসিষ্ট্যান্ট টিচারের স্বামীর সঙ্গে নিঃশব্দে নমস্কার বিনিময় করল। কিন্তু কথা বলল অমলার সঙ্গেই, 'ভালো আছেন ?'

'হ্যাঁ, বাজারে চলেছেন বুঝি ?'

স্মিত সৌজন্যে মধুর অমলার গলা। শৈলেন জানে তার এ-খাতির সুপ্রীতির জন্যই।

'আপনার কাজের খুব প্রশংসা শুনি।'

শৈলেনের ঠোঁটে মৃদু হাসি, গলায় ফ্লার্টিং-এর সুর। বিশেষ কিছু নয়, সে স্কুলের সেক্রেটারীরই অনুকরণ করছে। শৈলেন সেক্রেটারী না হ'তে পারে, কিন্তু অমলা গুপ্তের কাছে তাদের হেডমিস্ট্রেসের স্বামী।

অমলা লজ্জিত হয়ে বলল, 'প্রশংসা না আরও কিছু। স্কুলে তো সুপ্রীতি দি' ব'কে কাউকে আস্ত রাখেন না। মেয়েরা আর টিচাররা সমান তটস্থ।'

কড়া হেডমিস্ট্রেস বলে একসঙ্গে সুনাম আর দুর্নাম আছে সুপ্রীতির।

শৈলেন মৃদু হাসল, 'তাই না কি? কিন্তু আপনাকে বকা উচিত নয়, তবে আপনি যেমন লাজুক, আর মুখচোরা তাতে দেখলে সকলেরই বোধ হয় একচোট বকে নিতে ইচ্ছা করে। না বকলে কি আপনার মুখে কথা ফোটে।'

অঙ্কের টিচারের স্বামী ততক্ষণে কটমট ক'রে তাকিয়েছে শৈলেনের দিকে।

শৈলেন মৃদু হেসে পকেট থেকে তাঁকে একটি বিড়ি অফার করল, 'নিন।'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'আমি বিড়ি খাইনে, আচ্ছা চলি নমস্কার।'

সস্ত্রীক বিদায় নিলেন ভদ্রলোক।

শৈলেন নিজে একটা বিড়ি ধরাল, তারপর মনে মনে বলল, 'না খাও না খেলে। হেডমিস্ট্রেসের স্বামী হয়ে আমি বিড়ি টানতে পারি, আর এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট টিচারের স্বামী হয়ে তোমার তাতে মান যায়। ঘরে যে কত সিগারেট জোটে তা তো মোটা ফুটোওয়ালা নাক দেখেই টের পেয়েছি। দিনে রাতে এক পয়সার নস্যি ছাড়া তোমার অন্য গতি নেই।'

হেডমিস্ট্রেসের স্বামী। এ পাড়ায় এই তার একমাত্র পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। শুধু স্কুলের ছাত্রীরা, তাদের অভিভাবকেরা, টিচারেরা আর তাদের স্বামীরাই নয়, গোয়ালা, মুদি, কয়লাওয়ালা, রেশন শপের মালিক পর্যন্ত তাকে ওই পরিচয়েই চেনে। বাসা হেডমিস্ট্রেসের, সংসার হেডমিস্ট্রেসের, স্বামী হেডমিস্ট্রেসের। এপাড়ায় সুপ্রীতি মুখুয্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়া। প্রায় আধানেত্রী গোছের মহিলা। আর শৈলেন শুধু সুপ্রীতির স্বামী, স্ত্রীনাম-ধন্য পুরুষ। অথচ বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, উপার্জনে শৈলেন সুপ্রীতির চেয়ে অনেক ওপরে। তবু এখানে সে অখ্যাতনামা, প্রায় অজ্ঞাতনামা। এপাড়া ছেড়ে দিতে হবে শৈলেনকে, সুপ্রীতিকে ছাড়িয়ে নিতে হবে। আশ্চর্য, সুপ্রীতিও যেন চায় না শৈলেন এপাড়ায় পরিচিত হোক, তাকে লোকে জানুক, চিনুক, নিজের খ্যাতির আড়ালে স্বামীকে যেন সে সরিয়ে রাখতে চায়। স্ত্রীর ওপর অদ্ভুত এক ধরনের বিদ্বেষ বোধ করল শৈলেন। অথচ এক সময় এই সুপ্রীতি নামটিকে পৃথিবীর কাছে বিখ্যাত ক'রে তোলার জন্য কি না করেছে সে, তখনো বিয়ে হয়নি; কিন্তু কলেজের জনবিরল লাইব্রেরী ঘরে জানাশোনা

গভীরতর হয়েছে। ছাপার অক্ষরে সেই গভীর পরিচয়ের সাক্ষ্য রাখবার জন্য সুপ্রীতির নামে কবিতা লিখেছে শৈলেন। শুধু তাই নয়, নিজে লিখে ওর নামে কবিতা ছেপেছে।

সুপ্রীতি আপত্তি করেছে, 'ও কি, তোমার লেখা আমার নামে কেন ছাপালে। আমি তো আর লিখতে জানিনে।'

শৈলেন জবাব দিয়েছে, 'লেখাতে জানো। সেটা কি কম কথা?'

সুপ্রীতি বলেছে, 'তবু মিছেমিছি আমার নাম—'

শৈলেন জবাব দিয়েছে, 'মিছেমিছি কেন হবে। ও নামটা কি কেবল তোমারই। এতে আমার স্বত্ব আরো বেশি।'

সুপ্রীতি স্মিতমুখে স্বীকার করেছে, 'তা তো ঠিকই।'

কিন্তু সেদিন আর নেই।

বাজারে গিয়ে মেছুনীর সঙ্গে ঝগড়া, তরকারীওয়ালার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হোল। তারপর ঘর্মাক্ত দেহে বাজার নিয়ে বাসায় ফিরল শৈলেন।

রাসমণি এসে হাত থেকে থলি নামাল।

শৈলেন বলল, 'তোমার দিদিমণি কোথায়?'

রাসমণি বলল, 'সেক্রেটারী বাবুর সঙ্গে বেরিয়েছেন। বোধহয় প্রেসিডেন্টের বাড়িতেই গেলেন। বললেন, জরুরী কাজ।'

শৈলেন বলল, 'হ্যা কাজ তো সবই তার জরুরী। কেবল ঘর সংসারটাই ফালতু।'

ব্যাপার মন্দ নয়। এতদিন জরুরী কাজের আলোচনাটা ঘরে বসেই হোত। মাসখানেক আগে গেছে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী উৎসব। তার উদ্যোগ আয়োজনের পরামর্শের জন্য প্রায়ই আসতেন সেক্রেটারী। কমিটির আরো দু' একজন মেম্বারও এসে হানা দিতেন। আবৃত্তি অভিনয়ের মহড়া চলত স্কুলের ছাত্রীদের। সারা বাসাটা বাজারে পরিণত হয়েছিল। রীতি-মত রাজকীয় ব্যাপার। কোন্ এক মন্ত্রী এসে সভাপতিত্ব করবেন। তাঁর সম্বর্ধনার জন্য আড়ম্বর আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। আর কথায় কথায় দরকার হচ্ছিল হেডমিস্ট্রেসকে। এইটুকু স্বীকৃতি পেয়ে সুপ্রীতিরও উৎসাহের অন্ত ছিল না। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কর্তৃত্বের মোহ, খ্যাতির লোভ তাকে পেয়ে বসেছিল।

মাঝে মাঝে শৈলেন বাধা দিয়েছিল, 'চাকরি করছ করছ, কিন্তু এত হৈ চৈ করছ কেন।'

সুপ্রীতি জবাব দিয়েছিল, 'হৈ চৈ আর কোথায়। এই উপলক্ষে যদি স্কুলটা দাঁড়ায়, যদি aidটা আসে—'

কেবল স্কুল আর স্কুল। স্কুল ছাড়া কি আর কোন কথা নেই, চাকরি তো শৈলেনও

করে। মাইনে সুপ্রীতির চেয়ে বেশিই পায়। কিন্তু অফিসের সঙ্গে সম্পর্ক তার দশটা পাঁচটার। কলম রেখে আসবার সঙ্গে সঙ্গে কেরাণীর খোলসটাকে ছেড়ে আসে। কিন্তু সুপ্রীতি তখনো হেডমিস্ট্রেস। স্কুলের কোন না কোন কাজ, কোন না কোন প্রসঙ্গ সে বাসার মধ্যে টেনে আনবেই, বছরে বছরে তিনবার ক'রে পরীক্ষার খাতা আসে। রোজ আসে ছাত্রীদের টাসকের খাতা। এছাড়াও স্কুলের নানা রকম রেকর্ড, রিপোর্টের দিকে চোখ রাখতে হয় হেডমিস্ট্রেসকে। তাছাড়া আরো নানা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আসে কমিটির সদস্যদের দু' একজন, কি ছাত্রীদের অভিভাবক; সুপ্রীতির বাসাটা বাসা নয়, স্কুলেরই আর এক অংশ।

বিরক্তির অবধি থাকে না শৈলেনের, মাঝে মাঝে সে বিরক্তি প্রকাশও করে, 'বাসাটা যে বাজারে হয়ে উঠল। আমাকে তাড়াবার মতলব না কি তোমার?'

সুপ্রীতি হাসে, 'সত্যি, তোমার বড় অসুবিধা হয়। কিন্তু কি করি বল, দরকারের জন্যই তো লোকে আসে। আচ্ছা এরপর থেকে অন্য ব্যবস্থা করব।'

স্কুলের অফিস রুমে বসেই কিছুদিন দরকারী কাজ সারে সুপ্রীতি, বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। শৈলেনের তাও ভালো লাগে না। অফিস থেকে ফিরে স্ত্রীকে সামনে না দেখলে কার মেজাজ না বিগড়ে যায়?

আজও মেজাজ বিগড়াল শৈলেনের। সেক্রেটারীর সঙ্গে কোথায় বেরুল সুপ্রীতি, কেন বেরুল? স্কুলের কাজের দোহাই পেড়ে যখন তখন যার তার সঙ্গে বেরুলেই হবে? একটা শোভনতা বোধ নেই? পাড়ার লোকে কিছু ভাবতে পারে সে ভয়টাও কি নেই? মিণ্টুও ঘরে নেই। পাশের বাসার সমবয়সী ছেলেটির সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে কি যেন নতুন খেলা খেলতে সুরু করেছে। জানলা দিয়ে চোখে পড়ল শৈলেনের।

মুখ বাড়িয়ে মেয়েকে ধমক দিল শৈলেন, 'এই মিণ্টু, ঘরে এসো।'

মিণ্টু ঘরে এল না, শুধু ক্রীড়া সঙ্গীকে নিয়ে বাপের চোখের সামনে থেকে সরে গেল। ওরও তাহ'লে চক্ষুলজ্জা আছে।

ভারি নিঃসঙ্গ অসহায় আর অবজ্ঞাত বোধ করল শৈলেন। ভাবল সেও কোথাও বেরিয়ে পড়বে। খুঁজলে দু' একজন প্রাক্তন বান্ধবী তারও কি মিলবে না সারা সহরে?

তাড়াতাড়ি দাড়িটা কামিয়ে নিল শৈলেন। স্নান শেষ ক'রে আয়নার সামনে এসে মাথা আঁচড়াতে লাগল। বন্ধুমহলে সুপুরুষ বলে খ্যাতি আছে তার। বান্ধবীমহলে সে খ্যাতি আরো বেশি। ক্লাসে অমন দীর্ঘ চেহারা, ফর্সা রঙ বড় একটা চোখে পড়ত না। আর চোখে পলক পড়ত না সহপাঠিনীদের। তাদের দলে ছিল সুপ্রীতি। কিন্তু সে আজ আর সহাধ্যায়িনী নয়, হেডমিস্ট্রেস।

লণ্ড্রি থেকে ফর্সা ধুতি জামা কাল আনিয়ে রেখেছিল শৈলেন। কিন্তু কাল ভাঙেনি। ভেবেছিল আজ বিকালে একসঙ্গে বেরুবে সুপ্রীতির সঙ্গে। যাবে কোন সিনেমায়। কিন্তু বিকালের আগেই সদ্য ধোয়া জামাকাপড়ের পাট ভাঙবার দরকার হোল।

দেড়টাকা বাজারেই শেষ হয়েছে। মনে পড়ল রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে দু'টাকার একখানা নোট সেদিন লুকিয়ে রেখেছিল শৈলেন। এমন গোপন সঞ্চয় পরস্পরকে লুকিয়ে দু'জনেই মাঝে মাঝে করে। সে টাকা দুঃসময়ে সংসারের জন্যই ব্যয় হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে তার সংসার নেই, কেউ নেই। দু' টাকার নোটখানা শৈলেন সন্তর্পণে ঘড়িপকেটে রেখে দিল।

রাসমণি রান্নাঘর থেকে বলল, 'ওকি দাদাবাবু, এই অসময়ে না খেয়েদেয়ে কোথায় বেরুচ্ছেন। খেয়ে যান। আমার মাছের ঝোল এই নামল বলে। বেশ তেল আছে কিন্তু ইলিশ মাছটায়।'

তেলালো ইলিশ মাছের কথা শুনে আজ আর জিভ সজল হোল না শৈলেনের। শুকনো, রুক্ষ গলায় বলল, 'বাসায় আজ আর আমি খাব না, বলিস তোর দিদিমণিকে।'

রাসমণি হেসে মুখ বাড়াল, 'নেমন্তন্ন আছে বুঝি দাদাবাবু? সে কথা আগে বলতে হয়।'

শৈলেন মনে মনে ভাবল, নিমন্ত্রণ অবশ্য নেই, কিন্তু কোথাও কিছু না জোটে, হোটেল তো আছে। হেডমিস্ট্রেসের এই বাসার চেয়ে তা অনেক ভালো।

কিন্তু ঘর থেকে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই সদর দরজায় কার গলা শোনা গেল, 'সুপ্রীতিদি' আছেন?'

বিরক্ত হয়ে মুখ বাড়াচ্ছিল শৈলেন, কিন্তু দোরগোড়ায় আর একটি তরুণীর মুখ দেখা গেল। শীর্ণ শুষ্কমুখী কোন মিস্ট্রেস-টিস্ট্রেস নয়, বিদ্যাবীথির প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী সপ্তদশী, অর্চনা মিত্র। আকাশ রঙের শাড়িটি আঁট-সাঁট ক'রে পরা। গায়ে গৌরবর্ণের সঙ্গে বেশ মানিয়েছে। রঙীন ব্লাউজের হাতায় লতানো নিপুণ হাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য। প্রসাধন মার্জিত সুন্দর ভরাট মুখ। পিঠের বেণী কোমর ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত পড়েছে। গলায় সরু হার। ব্লাউসে গোঁজা একটি সেফার্স পেনের চূড়া। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল শৈলেন, 'না, সে তো এখন নেই।'

অর্চনা বলল, 'হেডমিস্ট্রেস নেই বুঝি?'

শৈলেন একটু হাসল, 'না হেডমিস্ট্রেসও নেই, সুপ্রীতিও নেই। এসো না ভিতরে। হয়তো একটু বাদেই তোমাদের হেডমিস্ট্রেস এসে পড়বেন।'

অর্চনা এবার একটু ভরসা পেয়ে বলল, 'না, না, তিনি না এসে পড়লেই ভাল।

গোপনে গোপনে আপনার কাছ থেকে নম্বরটা জেনে যাওয়া যাবে। আচ্ছা, আমাদের ইংরাজী খাতা দেখা হয়ে গেছে, না? এবারও কি খুব কড়া ক'রে খাতা দেখেছেন নাকি হেডমিস্ট্রেস?'

শৈলেন মৃদু হাসল, 'কি জানি।'

অর্চনা বলল, 'এবারও যদি খারাপ নম্বর পাই, বাড়িতে আর মুখ দেখাতে পারব না। কত পেয়েছি জানেন?'

শৈলেন বলল, 'না জানলেও, জানতে কতক্ষণ! খাতাগুলি তো ঘরেই আছে, এসো না!'

অর্চনা বলল, 'আসব? কিন্তু হেডমিস্ট্রেস এসে পড়বেন না তো?' এই আশঙ্কার অন্য অর্থ হতে পারে ভেবেই কি অর্চনা অমন আরক্ত হয়ে উঠল, না কি তার রক্তবর্ণের কর্ণাভরণেরই ছটা গালে গিয়ে পড়ল?

শৈলেন বলল, 'এলেন-ই-বা, এতো আর তাঁর স্কুল নয়। এসো ভিতরে। তাছাড়া অত ভয় থাকলে কি গোপনে গোপনে নম্বর জানা যায়।'

ভরসা পেয়ে অর্চনা শৈলেনের পিছনে ঘরে এসে ঢুকল। ওর হাতে একখানা পাতলা খাতা। বইপত্র কিছুই নেই। ধরণটা অনেকটা কলেজী কলেজী। বয়সের তুলনায় ওকে বড়ও দেখায়। সাধারণ উকিলের মেয়ে। কিন্তু বাড়ির অবস্থার তুলনায় ওকে স্বচ্ছল দেখায় বেশি। নাকি উচ্ছলতাই ওর ঐশ্বর্য।

বেতের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে ওকে বসতে বলল শৈলেন। কিন্তু অর্চনা বসল না। সরে এসে বইয়ের র‍্যাকের সামনে দাঁড়াল! 'বাঃ, এত বই জোগাড় করেছেন? এর আগের বারেও তো এত বই ছিল না। রবীন্দ্ররচনাবলীর এই খণ্ডগুলি নতুন কিনেছেন বুঝি?'

শৈলেন বলল, 'হ্যাঁ!'

নতুনই কিনেছে। টানাটানির সংসারে অনেক কষ্ট হয়েছে কিনতে। কিন্তু কিনে লাভ কি হোল। রবীন্দ্রনাথ আর পড়া হয় না। পড়বার সময় নেই, সঙ্গিনী নেই।

বইয়ের র‍্যাকের কাছে একটু এগিয়ে এল শৈলেন, 'কবিতা তোমার ভালো লাগে?'

অর্চনা হেসে মুখ ফিরাল, 'কবিতা আবার ভালো লাগে না কার। খুব ভালো লাগে। ইংরেজী বাঙলা দুই-ই। ভালো লাগে না কেবল ট্রানস্লেশন আর গ্রামার।'

শৈলেন হেসে বলল, 'আমারও।'

অর্চনা বলল, 'তাই নাকি? আপনিও'—

কথাটা শেষ হোল না অর্চনার। দোরের কাছে হেডমিস্ট্রেস এসে দাঁড়িয়েছেন। শৈলেনের কাছ থেকে দু' পা পিছিয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেল অর্চনা।

সুপ্রীতি দুজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'অর্চনা তুমি এখানে কেন? সাড়ে দশটা বাজে। তোমাদের ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে না?'

রোদেপোড়া তামাটে মুখ সুপ্রীতির। ভারী নিষ্ঠুর, ভারী নির্মম মনে হোল অর্চনার। হঠাৎ তার মুখ থেকে কোন কথা বেরুল না।

কথা বলল শৈলেন, 'আমিই ওকে ডেকে এনেছি।'

সুপ্রীতি বলল, 'ডেকে এনেছ, কেন?'

শৈলেন একটু হাসল, 'ডাকলাম। ডাকতে ভালো লাগল।'

মুহূর্তের জন্য সুপ্রীতিও তার ছাত্রীর মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

মনে মনে নিষ্ঠুর একটা কৌতুক বোধ করল শৈলেন। এবার? এবার কোথায় রইল তোমার হেডমিস্ট্রেসগিরি?

মাত্র একটি কথায় তোমার ফেল-করা ছাত্রীকে এখনও আমি এমন ডবল, চৌডবল প্রমোসন দিয়ে দিতে পারি, তা জান? এদিক থেকে তোমার সেক্রেটারী প্রেসিডেণ্টের চাইতে ক্ষমতা কোন অংশে কম নয় আমার। বরং অনেক গুণ বেশি।

অর্চনা বলল, 'আমি যাই প্রীতিদি, নম্বর জানতে এসেছিলাম।'

সুপ্রীতি রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'নম্বর তো ক্লাসে বসেই জানতে পারতে। জানবার আবার কি আছে? এবারও তো ফেল করেছ। যাও, ক্লাসে যাও।'

প্রায় যেন ঘাড় ধ'রে ওকে বের ক'রে দেবে সুপ্রীতি। ধমক খেয়ে অপমানিত অর্চনা এবার ঘাড় ফিরাল, তারপর মরিয়া হ'য়ে বলল, 'আপনার হাতে যখন খাতা পড়েছে, ফেল তো করবই। এ আর নতুন কথা কি।'

সুপ্রীতি চেঁচিয়ে উঠল, 'এত স্পর্ধা তোমার! বেয়াড়া বকাটে মেয়ে!'

কিন্তু অর্চনা ততক্ষণে সদর পার হয়ে গেছে। বেশ হয়েছে। এতদিন বাদে ঠিক মুখের মত জবাব দিতে পেরেছে সে হেডমিস্ট্রেসকে। এখন তিনি যত গালাগালিই করুন, জিৎ অর্চনারই। ঠিক হয়েছে।

হিংস্র আক্রোশে শৈলেনও মনে মনে ভাবল, 'ঠিক হয়েছে।'

ভারি নিষ্প্রভ আর করুণ দেখাচ্ছে সুপ্রীতির মুখ। পরাজিত শত্রুর ওপর এবার করুণা দেখানো যায়।

শৈলেন কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সুপ্রীতি তা' শুনবার জন্য অপেক্ষা না ক'রে রান্নাঘরে

চলে গেল, 'মিণ্টুকে ডেকে আন রাসমণি, ওর কি নাওয়া খাওয়া নেই? ভাত বাড় আমার বেলা হয়ে গেছে ইস্কুলের।'

রাসমণি বলল, 'বেলা তো সকলেরই হয়েছে বড়দিদিমণি। দাদাবাবুও খান নি। ওঁর নাকি কোথায় নেমন্তন্ন আছে।'

শৈলেন তাড়াতাড়ি বলল, 'না না না, আমি এখানেই খাব। নিমন্ত্রণে আজ আর যাব না।'

মেয়েকে নিয়ে পাশাপাশি খেতে বসল দুজনে। কিন্তু সুপ্রীতির মুখে কোন কথা নেই। শৈলেনের উপস্থিতিকে সে অগ্রাহ্য করছে।

খেতে খেতে হঠাৎ রাসমণির দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্কুলের কোন মেয়েকে আমার ঘরের বইপত্র ঘাঁটতে দিস্‌নে; বুঝলি। আগেই বারণ করবি।'

শৈলেন বলল, 'শুধু সেক্রেটারীর বেলায় এ নিয়ম খাটবে না। তিনি যত ইচ্ছা বই ঘাঁটতে পারেন।'

সুপ্রীতি স্বামীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'ইতরামিরও একটা সীমা আছে।'

শৈলেন বলল, 'কিন্তু সে সীমাটা কোন ছাত্রীর বেলায় না মানলে দোষ হয় না। হঠাৎ অমন ক'রে কোথায় বেরিয়েছিলে?'

সুপ্রীতি বলল, 'তা শুনে কি দরকার তোমার। বেড়াতে কি হাওয়া খেতে বেরোই নি। স্কুলের কাজেই বেরিয়েছিলাম।'

শৈলেন অদ্ভুত একটু হাসল, 'ওরকম স্কুলের কাজ তো তোমার চব্বিশ ঘণ্টাই লেগে আছে।'

সুপ্রীতি রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'আছেই তো। স্কুলের কাজ আছে বলেই সংসার চলছে খাওয়া জুটছে।'

ভাতের গ্রাস মুখে না তুলে শৈলেন বলল, 'কী—কি বললে?' কিন্তু সুপ্রীতি আর কোন কথা বলল না। নিঃশব্দে মেয়েকে খাওয়াতে লাগল।

শৈলেন স্ত্রীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমার রোজগার করা টাকা ফের যদি আমি হাত দিয়ে ছুঁই, আমার নাম ফিরিয়ে নাম রেখ।'

সঙ্গে সঙ্গে আসন থেকে উঠে দাঁড়াল শৈলেন।

রাসমণি বলল, 'ওকি দাদাবাবু, ভাত যে পড়ে রইল, মাছের ডিমের টক আছে। উঠবেন না, উঠবেন না, শুনুন।'

কিন্তু শৈলেন ততক্ষণে জলের ঘটি নিয়ে আঁচাবার জন্য উঠানে নেমে পড়েছে।

রাসমণি সুপ্রীতির দিকে চেয়ে বলল, 'কাজটা তোমারও ভাল হয়নি দিদিমণি। ছি ছি ছি, সোয়ামীকে মেয়েমানুষে খাওয়ার খোঁটা দেয় কোন দিন? বাপের জন্মেও তো দেখি নি—।'

মিণ্টু বলল, 'বাবা ডিমের টক খেল না কেন মা।'

ডিমের টক অবশ্য সুপ্রীতিও খেল না, মেয়েকে বলল, 'তুই বসে বসে খা। আমার বেলা হয়ে গেছে।'

একটু বাদে পরীক্ষার খাতাগুলি বগলে নিয়ে সুপ্রীতি স্কুলে বেরিয়ে গেল। রাসমণিও গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, বাসার কাছেই স্কুল। এক ফাঁকে সে স্কুলের কিছু কাজ আগেই সেরে এসেছে।

মেয়েকে ডেকে শোয়াল শৈলেন। বাবার মেজাজ দেখে আজ আর মিণ্টু তাকে বেশি বিরক্ত করল না, গল্প বলবার বায়না করল না, অল্পেই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু শৈলেনের ঘুম এল না; খানিকক্ষণ একটা বইয়ের পাতা ওল্টালো, মন লাগল না; তবু আরো ঘণ্টা-খানেক গড়িমসি ক'রে কাটিয়ে দিয়ে বাসা আর মেয়ের দায়িত্ব পাশের ঘরের ভাড়াটে বউটির ওপর গছিয়ে শৈলেন এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল।

সমস্ত দুনিয়াটাই ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। সময় আর কাটতে চায় না, তবু কাটল। বিড়ির আগুনে পুড়তে পুড়তে দিন শেষ হোল। অঙ্গারের রঙ লাগল আকাশে।

পাড়ার একটা চায়ের দোকানে উঠে বসল শৈলেন।

'দেখি এক কাপ চা।'

কিন্তু দোকানী চায়ের কাপটি সামনে দিতে না দিতেই পুরোন বন্ধু হেরম্ব হালদার এসে ঢুকলো দোকানে, 'এই যে শৈলেন, চা খাচ্ছ নাকি?' দোকানীকে আর এক কাপ চা দিতে বলল শৈলেন। কিন্তু চা খেয়েও হেরম্ব নিবৃত্ত হোল না, বলল, 'ইয়ে তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

গোটা পঁচিশেক টাকা পেত হেরম্ব। মেয়ের অসুখের সময় নিতে হয়েছিল। টাকা পনেরো শোধ দিয়েছে। দশ টাকা এখনো বাকি।

শৈলেন সংক্ষেপে বলল, 'কাল নিয়ো।'

হেরম্ব বলল, 'কাল? আচ্ছা কাল পেলেই চলবে। ভারি টানাটানি যাচ্ছে। কিছুতেই আর কুলোতে পারছি না ভাই। তোমার আর কি, তুমি তো চতুর্ভুজ। ঘরে বাইরে দু'জনে সমানে রোজগার করছো। গার্লস স্কুল বুঝি আজই ছুটি হয়ে গেল?'

শৈলেন বলল, 'হুঁ।'

হেরম্ব বলল, 'তাহ'লে কাল সকালে, কি বল?'

শৈলেন বলল, 'বললামই তো।'

চায়ের দোকান থেকে নেমে একটু এগুতেই কামধেনু ডেয়ারীর এককড়ি নন্দীর সঙ্গে দেখা। সাইকেল ক'রে দুধ জুগিয়ে ফিরছে। হ্যাণ্ডেলে ঝোলানো বড বড় গোটা দুই কেৎলি, শৈলেনকে দেখে আকর্ণ হেসে বলল, 'এই যে স্যার।'

শৈলেন বলল, 'হুঁ।'

এককড়ি বলল, 'কাল যাব বিল নিয়ে। হেডমিস্ট্রেসকে বলবেন পূজোর পার্বনী এবার কিন্তু ভালো রকম দিতে হবে। সামনের বছর থেকে আমার মেয়েকেও দেব স্কুলে।'

আরো বেশিক্ষণ পথে ঘুরলে ধোপার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, মুদির সঙ্গে দেখা হওয়াটাও বিচিত্র নয়। তার চেয়ে ঘরই ভালো।

ঘরে তখন আলো জ্বলছে। চটি বইয়ে মিণ্টুর মন ওঠে না, মোটা অক্সফোর্ড ডিক্সনারীখানা নিয়ে সে পড়তে বসেছে। মেয়ের হাতে বাজের বই দেখেও আজ আর সুপ্রীতি কেড়ে নেয়নি। ওর হয়েছে কি।

'তোর মা কই রে?' মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল শৈলেন।

মিণ্টু বলল, 'ওই তো জানলা দিয়ে গাড়ী ঘোড়া দেখছে। একটু আগে কত বড একটা ঘোড়া যাচ্ছিল বাবা তুমি তো দেখলে না।'

সত্যিই জানলার গরাদের সঙ্গে মিশে বাইরের দিকে মুখ করে দাড়িয়ে ছিল সুপ্রীতি। সামনে ফাঁকা এক খণ্ড মাঠ। গাড়ি ঘোড়া কিছু সেখানে শৈলেনের চোখে পড়ল না। হেরম্ব আর এককড়ির তাগিদ সে একা কেন ঘাড পেতে নেবে। শৈলেন মনে মনে ভাবল। এসব খরচের জন্য দায়ী তো সুপ্রীতিও। পাওনাদারদের তাগিদটা ওর কাছেও পৌছুক। তারপর শৈলেন নিতান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে যেন গরাদকেই সম্বোধন ক'রে বলল, 'হেরম্ব আর এককড়ির সঙ্গে দেখা হোল, ওরা কাল আসবে।'

সুপ্রীতি একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে অসহায় ভঙ্গীতে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু এলেই বা কি করব?'

ওর কালো আয়ত দুটি চোখ যেন বিষণ্ণ, কিন্তু শান্ত আর গভীর হয়ে উঠেছে।

শৈলেন চমকে উঠল, 'এলেই বা কি করব মানে? মাইনে পাওনি?'

সুপ্রীতির কাছ থেকে এ প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া গেল না। শৈলেন চীৎকার ক'রে ডাকল, 'রাসমণি! এদিকে এসো তো।' রাসমণি এসে সামনে দাঁড়াতে শৈলেন তেমনি তারস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কি? মাইনে হয়নি স্কুলে?'

ব্যাপারটা রাসমনির কাছ থেকে পুরোপুরিই শোনা গেল। ও গোড়া থেকেই সব জানে। শুধু সেক্রেটারী নিষেধ করেছিলেন বলেই আগে কিছু বলেনি।

স্কুলের তহবিলে তেমন টাকা নেই। গত মাসে পুরস্কারবিতরণী আর সভাপতির সম্বর্ধনায় বহু টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। এদিকে ছাত্রীদের মাইনেও তেমন আদায় হয়নি। সেক্রেটারী সেই কথাই হেডমিস্ট্রেসকে জানাতে এসে ছিলেন। টিচারদের দু'মাসের মাইনে কোন রকমেই দেওয়া সম্ভব নয়। এখন তাঁরা এক মাসের বেতনই নিন। পরে ছুটির মধ্যে দিন পনের পরে আবার না হয় সেক্রেটারী একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু সুপ্রীতি তাতে রাজী হয়নি। পঞ্চাশ ষাট টাকা এক-একজনের মাইনে। পুজোর মাসে দু'মাসের টাকা না পেলে টিচারদের চলবে কি ক'রে। এই নিয়ে অনুকূলবাবুর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা কথান্তরও হয়েছিল সুপ্রীতির।

অনুকূলবাবু চটে গিয়ে বলেছিলেন, 'বেশ আপনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করুন। তিনি যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন ভালোই তো, আমার আর কিছু করবার সাধ্য নেই।'

স্থানীয় জমিদার রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী স্কুলের প্রেসিডেন্ট। সেক্রেটারীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে ছুটেছিল সুপ্রীতি। কিন্তু দেখা হয়নি। দারোয়ান বলে দিয়েছে, তাঁর ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে। কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কথা বলা বারণ। তাড়াতাড়িতে কমিটির আর কোন মেম্বারের সঙ্গেই যোগাযোগ করতে পারেনি সুপ্রীতি। তা'ছাড়া ছুটিতে অনেকেই তাঁরা বাইরে চলে গেছেন।

সেক্রেটারী বাড়ি গিয়ে এগারটার সময় চাকরের হাতে চেক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে সব টিচারের এক মাসেরও পুরো মাইনে হয় না। চেকের সঙ্গে হেডমিস্ট্রেসের নামে এক টুকরো নোটও ছিল। স্কুলের নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে তাতে এর চেয়ে বড় চেক কাটা যায় না। হেডমিস্ট্রেস যেন তাঁর সহকারিণীদের বুঝিয়ে শান্ত রাখেন। মিসেস মুখার্জির যদি বেশি দরকার থাকে তিনি ইচ্ছা করলে দু' মাসের মাইনে নিয়ে নিতে পারেন। তাঁর কাছে স্কুল কমিটি কৃতজ্ঞ। কিন্তু যে সব টিচারের যোগ্যতা কম, রেকর্ড খারাপ, তাঁদের পার্ট-পেমেণ্ট করাই বিধেয়।

স্কুলের টিচারদের ডেকে সব কথাই খুলে বলেছিল সুপ্রীতি। সকলেই বিস্মিত হয়েছিল, ক্ষুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু যা পাওয়া যায় তা হাত ছাড়া করতে কেউ রাজী হয়নি। কালই তো রেশনের টাকার দরকার হবে, তখন উপায় হবে কি।

প্রথমে নিজের এক মাসের মাইনেটা আলাদা ক'রেই রেখেছিল সুপ্রীতি। কিন্তু বেশিক্ষণ রাখতে পারেনি। অঙ্কের টিচার অমলা দত্ত প্রায় কাঁদো কাঁদো হবার জো, 'এই চল্লিশ টাকায় আমার কি হবে দিদি। ওঁর যে সাংঘাতিক অসুখ। ডাক্তারেরই যে অনেক টাকা পাওনা। আরও অন্ততঃ গোটা কুড়ি টাকা আমাকে দিন। আমার কাছে এর পর থেকে আর কোন গাফিলতি পাবেন না, খুব খেটে পড়াব।'

পনের টাকা সে না নিয়ে ছাড়ল না।

তারপর এল নীলিমা রায়, রেখা ভৌমিক, উমা চন্দ। কারো স্বামীর চাকরি নেই, কারো বাবার মাইনে কাটা গেছে। সকলেরই ধারে-দেনায় অসুখে বিসুখে সংসার অচল। রমা বসু, সবিতা সেন, ললিতা চক্রবর্তীরও একই দশা।

শৈলেনের দিকে তাকিয়ে রাসমণি বলল, 'দাদাবাবু, এমন বোকা মেয়েমানুষ আমি আমার বাপের জন্মেও দেখিনি। দিতে দিতে সব শেষ। কোন বিদ্যাবুদ্ধিতে যে ইস্কুলের বড়দিদিমণি হয়েছিলেন তা উনিই জানেন। আমার মাইনেটা পর্যন্ত দিল না। দিলে কি আমি আর কাউকে বিলিয়ে দিয়ে আসতাম? ভালোবাসার মানুষ আছে আমার সতের জন? না কি গণ্ডা দু' তিন ছেলেমেয়ে কোথাও আছে? আছে নাকি?'

শৈলেন ঘাড় নেড়ে জানাল, ওসব রাসমণির নেই।

রাসমণি বলতে লাগল, 'ফুরুতে ফুরুতে শেষে যখন গোটা পাঁচেক টাকা বাকি, আমি হাত চেপে ধরলাম,—কর কি বড়দিদিমণি, কালই যে হাঁড়ি চড়বে না। রেশনের টাকাটা অন্তত রাখ।'

শৈলেন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেই পাঁচ টাকা এনেছ নাকি, না তাও আনো নি?'

সুপ্রীতি বলল, 'এনেছি।'

শৈলেন বলল, 'কই, দেখি।'

খোলা দেরাজ টেনে তার ভিতর থেকে পাঁচ টাকার একখানা নোট বের ক'রে ম্লান মুখে এগিয়ে ধরল সুপ্রীতি। শৈলেন হঠাৎ সেই নোটশুদ্ধ স্ত্রীর কোমল হাতখানা নিজের বিপুল মুঠির মধ্যে চেপে ধ'রে ডাকল, 'প্রীতি!'

সুপ্রীতি টাল সামলাতে পারল না।

রাসমণি লজ্জায় জিভ কেটে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ছি ছি ছি, কাণ্ডজ্ঞান যদি এদের থাকে। মানুষ জন ঘরে রইল কিনা সে খেয়াল পর্যন্ত নেই—ছি ছি ছি। ভালবেসে বিয়ে করলে লোকে কি এমনই দিশেহারা হয়!

চড়াই-উৎরাই

সকালের ডাকে দুখানা চিঠিই একসঙ্গে পেলাম।

একসঙ্গে এলেও দুখানার মধ্যে কোন রকম কোন সাদৃশ্য ছিল না, একখানা এনভেলাপ, আরেকখানা সাধারণ সরকারী এনভেলপ নয়, কাঁঠালীচাঁপা রঙের বড় লেফাপা, বাঁ দিকে কোণাকুণিভাবে লেখা 'শুভবিবাহ'। সেইখানাই আগে খুলে দেখলুম, নিজের ও-পাঠ শেষ হয়েছে অনেকদিন, সেদিন নিমন্ত্রণের রঙীন চিঠি আমিও স্বজনবন্ধুদের পাঠিয়েছিলাম, প্রথম দু' এক বছর তার এক আধখানা নিজের ঘরেও ছিল। এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। খোঁজেই বা কে। তবু এখনো যখন প্রজাপতি আঁকা হলদে কি গোলাপী রঙের চিঠি মাঝে মাঝে পাই, রং যেন কেবল চিঠির গায়েই লেগে থাকে না; মনের মধ্যেও তার ছোপ লাগতে চায়।

মনে মনে হাসলুম। কার আবার কপাল পুড়ল। লেফাপা খুলে বের করলাম গোলাপী রঙের চিঠি, দু'চার লাইন পড়তেই বুঝতে পারলাম, সব মনে পড়ে গেল, হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার পরেশ মজুমদারের ছেলে অসিতের বিয়ে, এ বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র পাওয়ার কোন প্রত্যাশা ছিল না, কলেজে অসিতের সঙ্গে পড়েছিলাম বছর কয়েক, সেই সূত্রে তখনকার দিনে অল্পস্বল্প ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল, তারপর বহুকাল ছাড়াছাড়ি, অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, কিন্তু সেদিন বাড়িওয়ালার এক টাইটেল স্যুটের মোকর্দমায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ফের দেখা হয়ে গেল, চিনবার কথা নয়, তবু অসিত চিনে ফেলল।

'আরে কল্যাণ যে, এস এস।'

কাঁধে হাত দিয়ে বার লাইব্রেরীতে তার সীটে আমাকে টেনে নিয়ে গেল অসিত, সামনের চেয়ারে বসতে দিয়ে বলল, 'তারপর খবর-টবর কি।'

ঘর ভরা প্রবীণ নবীন ব্যারিস্টার দল। ইউরোপীয় বেশ বাস, কারো মুখে পাইপ, কারো সিগারেট, অসিতও বছর তিনেক আগে বিলাত ঘুরে এসেছে। দীর্ঘাঙ্গ, সুপুরুষ, সাহেবী পোশাকে চমৎকার মানিয়েছে তাকে, আধ-ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবীতে যেন একটু মক্কেল মক্কেলই মনে হোল নিজেকে। অসিতের ঠিক বন্ধুশ্রেণীভুক্ত নিজেকে ভাবতে পারলাম না।

কিন্তু কথায়বার্তায় ব্যবহারে অসিত ঠিক আগের আমলটা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল। সিগারেট অফার করল, চা আনাল, তারপর নিজের পাইপে তামাক ভরতে

ভয়তে বলল, 'আঃ ভালো হয়ে ছড়িয়ে-টড়িয়ে বসো। অমন কুঁচকে রইলে কেন, কতকাল পরে দেখা হোল বল দেখি, আছ কোথায়, করছ কি ?'

বললুম, 'বিশেষ কিছু না। তার আগে তোমার কথাই শুনি।'

অসিত হাসল, 'আমারই বা এমন কি বিশেষত্ব। একেবারে ব্রীফলেস নই। বাপের দোহাইতে ব্রীফ কিছু কিছু আসে, বাস, ওই পর্যন্ত, এবার তোমার খবর কি বল।'

'খবর আর কি, এ অফিস থেকে ও অফিসে কেরানীগিরি ক'রে বেড়াচ্ছি। দু-এক বছর অন্তর অন্তর বদলাচ্ছি অফিস।'

অসিত বলল, 'এহ বাহ্য, কাব্য সাহিত্যের খবরটবর বল শুনি। চর্চাটা এখনো রেখেছ তো।'

বললুম, 'হ্যাঁ, ভূতটা এখনো নামেনি ঘাড় থেকে।'

অসিত হাসল, 'সবাইর কাঁধ থেকেই যদি ও ভূত নামে তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে নাকি, ভালো কথা মনে পড়ল, একটা কাজ ক'রে দাও দেখি আমার।'

'বল!'

অসিত বলল, 'বন্ধুদের তরফ থেকে বন্ধুর বিয়েতে একটা উপহার-টুপহার গোছের কিছু লিখে দাও দেখি, পদ্য নয়, পদ্য বড় সেকেলে হয়ে গেছে, একেলে মানুষের ভাষা গদ্য, গদ্যেই লেখ, কিন্তু বেশ নতুন রকমের হওয়া চাই।'

বললুম, 'ওসব উপহার-টুপহারের চলন তোমাদের মধ্যেও আছে নাকি ?'

'আমাদের মধ্যে মানে ?' অসিত হেসে উঠল, 'তুমি বুঝি আর আমাদের মধ্যে নও ? না কি বিলাত ঘুরে এসেছি বলে একেবারে কেষ্টবিষ্টু হয়ে গেছি ভেবেছ ? না বাবার একখানা বাড়ি আর দু'খানা গাড়ি আছে বলে বুর্জোয়া নাম দিয়ে বেদলে ঠেলছ আমাদের ?' অসিত আবার একটু হাসল, 'ভুল করছ, আসল বুর্জোয়া ক্রোড়পতি ক্যাপিটালিস্টরা। আমরা কি, হাতীর কাছে, পিঁপড়ে, তোমরা আমরা বলো না। সব আমরা। সব সমান, সবাই সেই ব্যাকুল চিত্ত মধ্যবিত্ত পিত্তপড়া পেট সেই' অসিত সশব্দে হাসল, 'এ ধরনের কবিতা আজকালও লেখ নাকি ? সেই যে ফার্স্ট ইয়ারে থাকতে কলেজ ম্যাগাজিনে লিখেছিলে ? মনে আছে ?'

মনে ছিল না, মনে পড়ল। লাইনটা অসিতের মনে আছে দেখে ভালোও লাগল খুব।

বেয়ারা ডেকে ক্লার্ককে খবর দিল অসিত, তারপর তার কাছ থেকে সাদা কাগজ একখানা চেয়ে নিয়ে আমার সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, 'নাও লেখ।'

বললুম,-'এখনি ?'

অসিত হেসে বলল, 'তবে কি একমাস বাদে ? তোমাদের চালু কলম, ক' মিনিট আর লাগবে লিখতে। পাড়ার ক্লাবের বন্ধুরা ধরে পড়েছে। ভাগ্যক্রমে তোমাকে যখন পেয়ে গেলাম, তুমিই লিখে দাও, না হলে ওরা নিজেরা যা বিদ্যা ফলাবে তা আর কান পেতে শোনা যাবে না, নাম ধাম পরে বলছি, আগে ভিতরকার কথাটুকু চট ক'রে লিখে দাও দেখি।'

চট ক'রে কোন জিনিস লেখায় অভ্যাস নেই, তবু যা হোক দু'চার ছত্র কোন রকমে লিখে দিলাম।

পাইপে আস্তে আস্তে টান দিতে দিতে অসিত বলল, 'বাঃ, বেশ হয়েছে। এবার আন্দাজ করো দেখি এ ব্যাপারে আমার রোলটা কি।'

কথার ধরণে আন্দাজ করাটা শক্ত হোল না, বললুম, 'বিয়ে করছ বুঝি ?'

অসিত বলল, 'আঃ কোথায় একটু কাব্য-টাব্য ক'রে বলবে, তা নয় একেবারে সরাসরি জেরা করছ, এসো কিন্তু, না এলে ভারি দুঃখিত হব। যথা সময়ে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণও করব, ত্রুটি মার্জনা কোরো।'

বড় লেফাফার মধ্যে দামী কাগজে সেই বড়লোক বন্ধুর বিয়ের ছাপান চিঠি, জবানী অবশ্য বন্ধুর নয় তার বাবার। কিন্তু এক কোণায় অসিত নিজেও এক লাইন লিখে দিয়েছে, 'অবশ্য, এসো। লৌকিকতার পরিবর্তে লেখকের নিজস্ব বইয়ের সেট প্রার্থনীয়।'

ভারি ভালো লাগল, বড় লোক বলে অসিত পুরোন সহপাঠীকে ভোলেনি। চাল-চলনে, কথা-বার্তায় সেই আগের দিনের ঘনিষ্ঠতাটুকু এখনো বজায় রেখেছে। বিয়ে গেছে তিন দিন আগে, আজ ওদের সদানন্দ রোডের বাড়িতে প্রীতিভোজ। সময় বেঁধে দিয়েছে। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আটটা।

এবার পোস্টকার্ডখানার দিকে তাকালাম। সম্বোধনটুকু দেখেই বুঝতে পারলাম এ চিঠির মালিক আমি নই, আমার স্ত্রী। তবু চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। লিখেছে মল্লিকা। আমার পিসতুতো ভাইয়ের শালী। বিয়ের পর আরও একটু সম্পর্ক বেড়েছে। ইন্দিরার খুড়তুতো ভাইয়ের সম্বন্ধী বিয়ে করেছে মল্লিকাকে। সেই সম্পর্কের জের টেনে মল্লিকা লিখেছে, ভাই ইন্দুদি, কত কাল আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। মনেই হয় না এক শহরে আছি। সেদিন হাজরা রোডের মোড় থেকে দেখলাম আপনাদের। আপনারা ট্রামে যাচ্ছিলেন। খুব কথা বলছিলেন নিজেদের মধ্যে, তাই বাইরের দিকে তাকালেনই না। খুব ইচ্ছা করে নিজেই গিয়ে একবার দেখা সাক্ষাৎ ক'রে আসি। কিন্তু কি ক'রে যাব ভাই সময় পেয়ে উঠি না। ছেলেপুলে, সংসারের ঝামেলা, তা ছাড়া, উনিও এক মুহূর্ত সময় পান না। প্রেসের চাকরি। ছুটির দিনেও

ওভার-টাইমের জন্য বেরুতে হয়। নিজের শরীরও ভালো না। আবার সেই চোখের উপসর্গ বেড়েছে। ভালো কথা, মেডিকেল কলেজে আপনার একজন মামা আছেন না চোখের ডাক্তার? তিনি কি এখনো ঐ কলেজেই আছেন? কিভাবে তাঁকে ধরা যায়। দয়া ক'রে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন একবার? কল্যাণবাবু কেমন আছেন? তাঁকে আমার নমস্কার জানাবেন। আপনিও নেবেন। ইতি—মল্লিকা।—পুনশ্চ আমাদের মনোহর পুকুর রোডের বাসার নম্বর মনে আছে তো? চোদ্দ নম্বর। আপনি বলেন কিনা, চেনা বাড়িতে চিঠি লেখা অসুবিধা। নম্বর ঠিক থাকে না।'

সাধারণ গতানুগতিক চিঠি। ইন্দিরাকে ডেকে হাতে দিলাম, তার সেখানা নিয়েও ইন্দিরা হাত বাড়াল বিয়ের চিঠিখানার দিকে। বলল, 'ওখানা বুঝি দেখতে পারি না?'

বললুম, 'পার, কিন্তু পেরে লাভ নেই। নিমন্ত্রণটা সবান্ধবে, সস্ত্রীক নয়।'

ইন্দিরা বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা। সবাই তো আর তোমার মত ভোজনানন্দ স্বামী নয়, যে, নেমন্তন্নের চিঠি দেখলেই জিভে জল আসবে?'

চিঠিটা আগাগোড়া একবার পড়ল ইন্দিরা, তারপর বলল, 'বাঃ কনের নামটি তো ভারি সুন্দর—শ্রীমতী রুচিরা। কিন্তু এও দেখছি কালীঘাট। ইচ্ছা করলে ফেরার পথে মল্লিকাদির সঙ্গে তো তুমি দেখা করেও আসতে পার। সদানন্দ রোড থেকে মনোহর পুকুর তো আর বেশি দূর নয়।'

বললুম, 'বরং কাছেই। আজই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে। তেমন কিছু জরুরী খবর-টবর তো আর নেই। যাওয়া যাবে আর একদিন সুবিধা মত। কিন্তু অসিতের বিয়েতে কি দেওয়া যায় বল দেখি।'

ইন্দিরা বস্তুবাদিনী, বলল, 'বড়লোকের বিয়েতে মানানসই কিছু কি আর দিতে পারবে। ফুল আর কবিতার বই দাও সেই ভালো। লেখক মানুষ, কোন দোষ থাকবে না। তা ছাড়' তোমার বন্ধুর নির্দেশ তো দেওয়াই আছে।'

অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের বিয়েতে যেসব উপহারের জিনিস বাছাই করে ইন্দিরা, তার মধ্যে বই কি ফুলের নামগন্ধও থাকে না। একবার ভাবলুম ইন্দিরা নিজে নিমন্ত্রিত হয়নি বলেই বোধহয় আজ সস্তায় সারতে চাইছে। মনটা খানিকক্ষণ খুঁতখুঁত করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে স্ত্রীর পরামর্শই অবশ্য নিখুঁত বলে মনে হোল। মাসের শেষ। বই আর ফুলই ভালো।

সকাল সকাল অফিস থেকে বেরুলাম। খান তিনেক বই আছে নিজের। কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়। কমপ্লিমেন্টারি কপি যতগুলি প্রাপ্য তার চাইতে আট দশ কপি বেশিই চেয়ে নিয়ে বিলিয়েছি। আরো চাইতে সংকোচ হোল। খান দুই

বই নগদ দামে কিনেই নিলাম অন্য দোকান থেকে। সেই সঙ্গে কিনলাম এক খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী আর ফুলের দোকান থেকে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। তারপর উঠে বসলাম বাসে।

যদিও বহুকাল যাতায়াত নেই, তবু বাড়ি চিনতে দেরি হোল না। দীপালী উৎসবের মতই আলোয় জ্বলছে অসিতদের সদানন্দ রোডের তেতলা বাড়ি। বহু দূর থেকে দেখা যাচ্ছে মোটরের সার। সদানন্দ রোডের এ মাথা থেকে ও মাথা গাড়িতে প্রায় ভরে গেছে। একখানা মোটর থেকে জনকয়েক সুদর্শন যুবক আর দুটি চারুদর্শনা মেয়ে নেমে এলেন। বাড়ির ভিতর থেকে কয়েকজন বেরিয়ে উঠে বসলেন আর একখানায়। গাড়িতে উঠবার সময় একটি সপ্তদশীর গাঢ় রক্ত বর্ণ দুটি দুল দুলে উঠল, সমস্ত আলো যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছে সেই দুল দুটির মধ্যে।

'আরে তুমি যে, কখন এলে। যথাস্থানেই দাঁড়িয়েছ দেখছি।' অসিত পিছন থেকে এসে কাঁধে চাপড় দিল, মুখে মুচকি হাসি। সরু পেড়ে কোঁচান শান্তিপুরী ধুতি, আর শিল্কের পাঞ্জাবীতে চমৎকার মানিয়েছে অসিতকে। বাড়ির ভিতর থেকে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে আসছিলেন, অসিত বলল, 'ইনি আমার বাবা, চিনতে পাচ্ছ? আর আমার বন্ধু কল্যাণ। কলেজে পড়তুম একসঙ্গে। লেখেটেখে আজকাল। অনেকদিন আগে একবার এসেছিল। আপনার বোধ হয় মনে নেই।'

অসিতের বাবা মৃদু হাসলেন, 'নিজের ইনটিমেট ক্লাস ফ্রেণ্ডদের নাম আর মুখই আজকাল এক সঙ্গে মনে পড়ে না আর, তো তোমার সহপাঠী—'

অসিতও হাসল, 'কিন্তু বহুকালের পুরোন ক্লায়েণ্টদের নাম তো আপনার কোনদিন ভুল হয় না বাবা, চেহারাও বেশ মনে থাকে।'

পরেশবাবু কোন জবাব দিলেন না, মৃদু হেসে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আরো একখানা মোটর এসে দাঁড়াল। পরেশবাবুর এ ব্যস্ততা দেখে বোঝা গেল আগন্তুক বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথি। কিন্তু অবাক লাগল পরেশবাবুর বেশবাসের ধরণ দেখে। পরনে খাটো ধুতি, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, পায়ে সাধারণ চটি। কিছুমাত্র বিদেশীয়ানা নেই। স্বাধীন হয়ে বেশবাসে আচারে আচরণে আমরা তাহলে সত্যিই স্বদেশী হোলাম এতদিনে। ভারি খুশি হোল মন। বিলাতফেরৎদের সঙ্গে তাহলে আমাদের সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধান এতদিনে ঘুচল।

অসিত সঙ্গে ক'রে আমাকে তাদের বৈঠকখানা গোছের একটা ঘরে নিয়ে বসতে দিয়ে বলল, 'একটু অপেক্ষা করো ভাই আসছি ওপর থেকে, আরো বন্ধুরা আছেন ওখানে। একটু খোঁজখবর নিয়ে আসি।'

ঘরখানা জনবিরল। ঘরের ভিতর দিয়ে লোকজন দলে দলে যাতায়াত করছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ মনে পড়ল বইগুলিতে নাম লিখে আনা হয়নি। এই ফাঁকে লিখে ফেলা যাক।

লিখতে শুরু করেছি এক ভদ্রলোক এসে বললেন, 'এই যে, আপনি বসে বসে কি করছেন এখানে? চলুন, চলুন, ওদিককার প্যাণ্ডেলে চলুন। সবাই গেছেন ওখানে।'

চেয়ে দেখি অসিতদের সেই ক্লার্কটি। প্রায় পরেশবাবুরই মত বয়স। কিন্তু বেশবাসটা মোটেই পরেশবাবুর মত নয়। পরনে মিহি ধুতি পাঞ্জাবী, পায়ে পালিশ করা শু, সোনার বোতাম চিক চিক করছে বুকে।

তিনি বললেন, 'চলুন।'

বিব্রত হয়ে বললুম, 'যাব? কিন্তু এগুলি?'

'ওগুলি কি। ও বই?' ভদ্রলোক হাসলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা। এগুলির না হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

ইতিমধ্যে একদল বন্ধুর সঙ্গে অসিত নেমে এল দোতলা থেকে, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর একটু বসো, এঁদের গাড়িতে তুলে দিয়ে এক্ষুনি আসছি।'

বেশী দেরী করল না অসিত। মিনিট কয়েক বাদে আরো পনের বিশ জন বন্ধুকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এসো এবার।'

পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। দোতলার বড় একখানা হল ঘরে ফুলশয্যার আসর বসেছে। ঘর তো নয়, গোটা একটা নার্সারী। দক্ষিণের দেয়ালটি চাল-চিত্রের মত সাজানো হয়েছে বিচিত্র ফুলে। তার নিচে চৌদোলায় সালংকারা সুন্দরী বধূ। স্মিতমুখে স্বামীর বন্ধুদের উপহার গ্রহণ করছেন, নমস্কার বিনিময় হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। বাঁদিকে আরো কয়েকটি সুশ্রী তরুণী। বোধ হয় অসিতের বোনেরা, ভাগ্নী, ভাইঝিরা। একটি মেয়ে বউয়ের হাত থেকে উপহারগুলি নিয়ে এক পাশে জড়ো ক'রে রাখছেন আর একজন দাতা আর দানের নাম লিস্ট করছেন, খাতায়। ডানদিকে কিউ ক'রে অসিতের বন্ধুশ্রেণী। আমিও দাঁড়িয়ে গেলুম।

স্ত্রীর সঙ্গে একে একে অসিত বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। সুশীতল সেন, ব্যারিস্টার; সমীরণ মুখোপাধ্যায়, এ্যাডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট; সুদর্শন দাশগুপ্ত, জজ; আরো বহু, এ্যাডভোকেট, ব্যারিষ্টার, মুনসেফ, উকিল, প্রফেসারদের পরে আমারও পালা এল।

অসিত বলল, 'কল্যাণ সেন। আমার লেখক বন্ধু।'

বইগুলি হাত থেকে নিতে নিতে অসিতের স্ত্রী আমার দিকে তাকালেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'লেখক!'

অন্য কয়েকটি মেয়েও বিস্ময়ে, কৌতূহলে চাইলেন এদিকে।

অসিত মৃদু হেসে বলল, 'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

রুচিরা লজ্জিত হাস্যে বললেন, 'বিশ্বাস না হবার কি আছে।'

অসিত হেসে আমার দিকে ফিরে তাকাল, 'যাক, এ যাত্রা উৎরে গেলে। ঠকে ঠকে আজকালকার পাঠক পাঠিকারা অনেক সেয়ানা হয়ে গেছে। বইয়ের নায়কের রূপ গুণের সঙ্গে তারা লেখককে মিলিয়ে দেখে না।'

অসিতের আর এক বন্ধু মন্তব্য করলেন, 'তাই বলে নিজেদের সঙ্গেও কি মেলাবার জো আছে? মেলাতে হয় রাঁধুনী, চাকর, কুলী, মজুরদের সঙ্গে। লেখকেরা আরো সেয়ানা হয়েছেন আজকাল।' তিনি আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, বন্ধুদের আর একটি ছোট দল এসে দরজায় দাঁড়াল। পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম।

অসিত বাইরে এসে বলল, 'তারপর? চয়েস কেমন হয়েছে?'

বললুম, 'চয়েস? তবে যে শুনলুম লাভ ম্যারেজ?'

অসিত হেসে বলল, 'নাঃ, কেবল লিখতেই শিখেছ। তাতে বুঝি আর চয়েসের বালাই নেই?'

ভোজের আয়োজন হয়েছে বাড়ির লাগা, একটি খোলা জায়গায়। সামিয়ানা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে ওপরটা। ফ্যান আর ইলেকট্রিক বালবের নীচে অগুনতি চেয়ার। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার, এডভোকেট, মিঃ মজুমদারের ধনী মারোয়াড়ী মক্কেলদের ভিড়ে প্যাণ্ডেল ভরে গিয়েছে, অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার ভারও দেখলাম গ্রহণ করেছেন একজন মারোয়াড়ীই। তিনি ভাঙা বাঙলায় সবাইকে আপ্যায়ন জানাচ্ছেন। সিগারেটের কৌটো তুলে ধরছেন প্রত্যেকের কাছে। উর্দি পরা বেয়ারারা ট্রেতে ক'রে ভোজ্য, পানীয় বিতরণ ক'রে যাচ্ছে। ভোজ্য স্পেশাল প্রিপারেশনের আইসক্রীম,পানীয় এক কাপ কফি।

দৈবাৎ আমার দুই পাশে বসেছিলেন জন-দুই ম্যাজিস্ট্রেট আর জজ। অসিতের বাবা তাঁর কোন একটি কুটুম্বের সঙ্গে তাঁদের যে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তাতেই জানতে পারলুম তাঁদের পদস্থতার কথা। কিন্তু ট্রেতে ক'রে বেয়ারা যখন ভোজ্য পানীয় এগিয়ে নিয়ে এল, তিনজনের দু'জনই স্মিতমুখে ঘাড় নাড়লেন। অসিতের বাবা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'মাফ করতে হবে মিস্টার মজুমদার, বড্ড পেটের গোলমালে ভুগছি।'

তৃতীয় জন অনেক অনুরোধে এক কাপ কফি তুলে নিলেন। বেয়ারা বুঝি ভেবেছিল

এঁদের সঙ্গে যখন বসেছি আমারও পেটের গোলমাল হওয়া স্বাভাবিক। তাই আমাকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, অসিতের বাবা দেখতে পেলেন, বেয়ারাকে ডেকে ধমক দিলেন, 'আঃ; এঁকে দিচ্ছ না কেন? এঁকে দাও, এঁকে দাও', ধমক খেয়ে বেয়ারা ফিরে এসে ট্রে নিয়ে দাঁড়াল।

অসিতের বাবা বললেন, 'নিন, নিন। সংকোচ কিসের অত।'

নিলাম কিন্তু কেমন যেন একটু খিঁচ লাগল। একটু যেন বিরক্তির আভাস আছে মিঃ মজুমদারের গলায়।

শেষ করলুম আইসক্রীম। শেষ করলুম কফি। জজ ম্যাজিস্ট্রেটরা উঠে গেলেন। পাশে এসে বসলেন আর একজন আইন ব্যবসায়ী। নেতৃত্ব কেবল বারেই নয়, রাজনীতিতেও। সভা-সমিতিতে বিশেষ যাই না বলে এতদিন সামনা-সামনি দেখিনি, কিন্তু কাগজে বহুবার ছবি দেখেছি।

মিঃ মজুমদার শশব্যস্তে এগিয়ে এসে বললেন, 'এলেন।'

শ্রীধরবাবু হাসলেন, 'আসব না ভেবে নেমন্তন্ন করেছিলে বুঝি?'

মিঃ মজুমদার হঠাৎ ভেবে পেলেন না কি জবাব দেবেন। এই সময়ে আর একটি বেয়ারা ট্রেতে ক'রে এগিয়ে নিয়ে এল ভোজ্য পানীয়।

শ্রীধরবাবু হেসে ঘাড় নাড়লেন।

মিঃ মজুমদার বললেন, 'দয়া ক'রে একটা কিছু মুখে আপনাকে দিতেই হবে।'

শ্রীধরবাবু হাসলেন। 'পাগল না ক্ষ্যাপা। আমি কোথাও কিছু মুখে দিই যে এখন দেব? দিতে হয় একটা সিগারেট দাও।'

বেয়ারা দাঁড়িয়ে ছিল। এবারো আমার দিকে চোখ পড়ল মিস্টার মজুমদারের। তারপর বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বললেন: 'আঃ তাই বলে ওঁকে দিচ্ছ না কেন? ওঁকে দাও।'

আমি এবার সজোরে ঘাড় নাড়লুম, 'আমি একবার খেয়েছি।'

মিস্টার মজুমদার বললেন, 'ওঃ, তা নিয়েছেন-নিয়েছেন, একবার নিলে যে আর একবার নেওয়া যাবে না তার কি মানে আছে। আপনাদের বয়সে'—মিস্টার মজুমদার একটু হাসলেন।

এবার আমি উঠে দাঁড়ালুম। এই সময়ে অসিত এসে উপস্থিত হোল প্যাণ্ডেলে। হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিতে গেল শ্রীধরবাবুর—তিনি তার হাত ধরে বাধা দিলেন। হেসে পিঠ চাপড়ে দিলেন একটু।

বললুম, 'অসিত, আমি চলি।'

অসিত বলল, 'ওঃ, আমি ভাই আবার আটকে পড়েছিলাম। বোঝই তো। আজ আর কেউ ছাড়তে চাইছে না। কিন্তু চলবে মানে? কিছু খেলে টেলে না।'

বললুম, 'না না, অনেক খেয়েছি। এবার—'

প্যাণ্ডেলের দোর অবধি অসিত আমার পিছনে পিছনে এল। এদিক ওদিক তাকিয়ে, একবার দেখল। কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই। অসিত আমার কাঁধে হাত দিয়ে সহানুভূতির স্বরে বলল, 'অনেক যে কি খেয়েছো তা তো জানি। পেটই ভরল না তোমার। কী যে সব সাহেবীপনা এদের। দিব্যি লুচিমণ্ডার ব্যবস্থা করবে—তা না পার্টি। এ সব কি আমাদের পোষায়। এ সবে কি আমাদের পেট ভরে? ভারি দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্যে।' মনে পড়ল কলেজে থাকতে আমাদের আর একজন বন্ধুর বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল অসিতকে। ছাদে কুশাসন পেতে আমরা সব ভূরিভোজনে বসে গিয়েছিলাম; অসিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল, কিন্তু নিজে একটি সন্দেশের বেশি কিছুতেই নেয়নি, বন্ধু প্রফুল্লকে বলেছিল, 'না ভাই, অভ্যাস নেই।'

সেই ভোজসভার দৃশ্য হয়তো অসিতেরও মনে পড়ে থাকবে। আমার জন্য তার দুঃখটা অকৃত্রিম বলেই মনে হোল, তবু ঠিক তৃপ্তি পেলাম না। পেটের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে চিন চিন করছিল তা ঠিক। কিন্তু অসিতের কথার পর যেন আর এক ধরনের অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

কফিটা বোধ হয় বেশি কড়া হয়ে থাকবে।

বললুম, 'আচ্ছা এবার চলি অসিত।'

'আঃ অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাঁড়াও। দেখি যানবাহনের কোন—'

অসিতের সেই ক্লার্কটি এসে উপস্থিত হোল, 'অসিতবাবু।'

'আবার কি।'

'বালীগঞ্জ স্টেশন রোডের দাস সাহেবের বাড়ির মেয়েরা পেট্রোল নেই বলে নিজেদের গাড়িতে আসতে পারেন নি। তাঁরা ট্রামে যেতে চাইছেন।'

'কারা, শর্মিষ্ঠা আর দেবযানী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পাগল নাকি! বলুন, আমি নিজে তাঁদের লিফ্‌ট দিয়ে আসছি।'

অসিত আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল, 'দুই সতীন নয়, দুই বোন। তবে প্রায়ই সতীন হব হব করছিল। আর একজায়গায় বিয়ে ক'রে বেঁচেছি, বাঁচিয়েছিও। তবু লিফ্‌ট না দেওয়াটা ভারি অশিষ্টতা হবে, কি বলো? কিন্তু তুমি করবে কি।'

অবাক হয়ে বললুম, 'আমি তো বাসে যাব।'

অসিত বলল, 'হ্যাঁ, বাসে যাবে না আরো কিছু। বাস ট্রামে আজকাল মানুষ উঠতে পারে? তুমি এক কাজ করো—।' হঠাৎ পকেট থেকে এক টাকার একটা নোট বের করল অসিত, কিন্তু পরক্ষণেই সেটা রেখে দিয়ে বলল, 'উঁহু, এক টাকায় হবে না বোধ হয়। রিক্সাওয়ালা ব্যাটারা আজকাল ট্যাক্সীর ভাড়া নেয়। দু' টাকাই রাখ! মোড় থেকে একটা রিক্সা নিয়ে চলে যেও। জ্যোৎস্না রাত আছে। টুং টুং ক'রে ছুটবে। ট্যাক্সীর চেয়ে অনেক বেশি রোম্যান্টিক লাগবে দেখ।'

মুহূর্তকাল নির্বাক হয়ে রইলাম, তারপরে বললাম, 'ওসবের কিছু দরকার নেই অসিত। আমি বাসে বেশ যেতে পারব।'

অসিত বিরক্ত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ঝুলে ঝুলে যেতে যেতে একটা এ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে বস আর কি। নাও রাখ।'

বলে দু'টাকার নোটখানা আমার ডান দিকের ঝুল পকেটের ভিতরে টুপ ক'রে ফেলে দিয়ে বলল, 'Be worldly my friend, be practical.'

অসিত আর দাঁড়াল না। একটু দূরে দুটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বোধহয় শর্মিষ্ঠা আর দেবযানীই হবেন। অসিত হাসিমুখে তাঁদের দিকে এগিয়ে গেল, আমি এগোলাম গেটের দিকে।

একবার ভাবলাম টাকা দুটো কোনো ভিখিরীর হাতে দিয়ে দিই, কিন্তু আশ্চর্য, এত বড় বিয়ে বাড়ির ধারে কাছে একটি ভিখারীকেও চোখে পড়ল না। কি হোল পাড়াটার? বিলাত ফেরতের বাড়ি বলে কলকাতার এ অংশটা কি রাতারাতি লণ্ডন হয়ে গেল!

ফুটপাথ ধরে একটু একটু ক'রে এগুতে লাগলাম। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। অসিতের বিয়ের চিঠিতে কি রঙীনই না হয়েছিল সকালটা। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কিছুমাত্র যেন অবশিষ্ট রইল না। হলদে রঙের চিঠি। সে চিঠি যে এখনো পকেটে রয়েছে, কিন্তু তার রঙটুকু গেল কোথায়।-হঠাৎ আর একখানা চিঠির কথা মনে পড়ল। মল্লিকার লেখা সেই সাধারণ পোস্টকার্ডখানার কথা। নিতান্ত সাদাসিধে আটপৌরে চিঠি। আমাকে নয়, আমার স্ত্রীকে লেখা। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের কথা নেই, বরং অসুখ বিসুখের কথাই আছে। চিঠিটা আমার পকেটে নেই, কিন্তু তার প্রতিটি লাইন যেন আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। দু'একটি লাইন গুঞ্জরণ করতে লাগল কানে। 'মনেই হয় না এক শহরে আছি। ট্রামে যাচ্ছিলেন খুব কথা বলছিলেন নিজেরা। বাইরের দিকে তাকালেনই না।—ইচ্ছা হয় নিজেই গিয়ে একবার দেখা ক'রে আসি।'—এসব কথা আমাকে লেখেনি মল্লিকা। লিখেছে আমার স্ত্রী ইন্দিরাকে। কি ক'রে

সরাসরি লিখবে আমাকে ? মল্লিকা নিজেও তো মেয়ে। সে কি আর জানে না এসব বিষয়ে মেয়েদের চোখ কত তীক্ষ্ণ, কত তীব্র তাদের ঘ্রাণশক্তি ?

কিন্তু এখনো অত সতর্কভাবে, অত হিসাব ক'রে চলে কেন মল্লিকা ? তখনকার কথা কি তার এখনো মনে আছে ? আশ্চর্য, আমি কিন্তু একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

এও সেই কলেজী আমলের কাহিনী। পিসতুতো ভাইয়ের শ্বশুর বাড়িতে থেকে বি-এ পড়তুম আর পড়াতুম বউদির ছোট ছোট তিনটি ভাই বোনকে। মল্লিকাও বউদির বোন। তবে তখন আর সে ছোট নয়, বেশ বড়। আমার কাছে বসে তার আর পড়া চলে না। কিন্তু তাই বলে ঠাট্টা তামাসার সম্পর্কে দূর থেকে হোলির দিনে আবীর ছিটাতে তো আর বাধে না। অবশ্য খুব বেশি দূর থেকে নয়, অনেকখানি কাছে এসেই এক মুঠো আবীর আমার চোখেমুখে সেদিন মাখিয়ে দিয়েছিল মল্লিকা। আত্মরক্ষার জন্য আমি তার আবীরসুদ্ধ হাতখানা চেপে ধরেছিলাম, বলেছিলাম, 'আর একটু হলেই চশমা ভাঙত।'

মল্লিকা বলেছিল, 'বেশ হোত। চশমাটার জন্যই তো রঙটা চোখে লাগল না।'

'চোখ নষ্ট করবার মতলবই ছিল বুঝি ?'

'ছিলই তো। হাত ছাড়ুন এবার।'

'মনের অভিসন্ধি জেনেও ছেড়ে দেব ? যদি আর না ছাড়ি !'

এবার আবীর ছাড়াও লাল টুকটুকে হয়ে উঠেছিল মল্লিকার মুখ। মৃদুস্বরে বলেছিল, 'ছাড়ুন, কেউ দেখে ফেলবে।'

তারপর অনেকদিন দেখেছি ভাঁড়ার ঘর থেকে রান্নাঘরে যাতায়াতের পথে মল্লিকা জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়েছে। আঙুলে হলুদের ছোপ। ছাত্রেরা কাছে না থাকলে এদিক ওদিক তাকিয়ে আমিও যে জানালার ধারে দু' একদিন এগিয়ে না গেছি তা নয়, শিকও ধরেছি কিন্তু ভাঙিনি।

তারপর তাঁহৈমশাই মরে যাওয়ার পর আমি অন্য জায়গায় টুইশান নিলাম। মল্লিকাদের জানালাও সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। জীবনে এমন কত জানালা খোলে, কত জানালা নিঃশব্দে বন্ধ হয়, কে তার হিসাব রাখে, কে তার হিসাব রাখতে পারে।

মল্লিকার হিসাবও হারিয়ে ফেলেছিলাম। বছর চার পাঁচ বাদে বিয়ের পর আবার ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হোল। সম্পর্কটা আবিষ্কার করল আমার স্ত্রী। পুরোন সম্পর্ক নয়, নতুন সম্পর্ক। ইন্দিরার এক খুড়তুতো ভাইয়ের অন্নপ্রাশনে সস্ত্রীক আমিও গেছি, যতীশও গেছে। সেখানেই আলাপ পরিচয় হোল। যতীশ ইন্দিরার জেঠতুতো ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ী। তারপর দু'একবার আমরাও গেছি, মল্লিকারাও এসেছে, কিন্তু সেই আবীরের

প্রসঙ্গ আর কোন দিন ওঠেনি। চশমার পাওয়ার বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। কাপড় চোপড়ের দাম বেড়েছে তার চেয়েও বেশি। আজকাল হোলীর দিনে আবীর আর খেলি না। ঘরের মধ্যে দোর জানালা বন্ধ ক'রে বসে থাকি।

স্মৃতির সেই রুদ্ধদ্বার হঠাৎ আজ এমন ক'রে খুলে গেল কেন ভেবে পেলাম না। কিন্তু একটু একটু ক'রে এগুতে লাগলাম মনোহরপুকুরের দিকে। দেখে আসি কে কেমন আছে। চোখের অসুখে শেষ পর্যন্ত মল্লিকাকেও ধরেছে তাহলে। তখনকার দিনে ভারি নভেল নাটক পড়ত মল্লিকা, আর অবসর পেলেই সেলাইয়ের কাজ নিয়ে পড়ে থাকত। সে অভ্যাস বোধ হয় মল্লিকা এখনো ছাড়তে পারেনি। আর তার ফল ফলতে শুরু হয়েছে।

পুরোন একতলা বাড়ি। সদর দরজা খোলাই ছিল। সবে তো সন্ধ্যা হয়েছে। সাতটা বেজে মিনিট কয়েক। তবু দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বার দুই কড়া নাড়লুম। আরো দু'ঘর ভাড়াটে আছে বাড়িতে। হঠৎ ঢুকে পড়া ঠিক নয়। একটু বাদেই ছোট ছোট দুটি ছেলেমেয়ে এল এগিয়ে। আমাকে দেখে উল্লসিত হয়ে ভিতরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'মা দেখ এসে কে এসেছে।'

মল্লিকার ছেলেমেয়েদের চেনা শক্ত হোল না। মায়ের মুখেরই আদল পেয়েছে ওরা। ঠিক সেই রকম ছোট্ট কপাল, জোড়া ভ্রূ, টানাটানা নাক চোখ। তাছাড়া আগেও তো দু'চারবার ওদের দেখেছি মল্লিকার সঙ্গে। কিন্তু ওদের এই উল্লাসে কেমন যেন একটু লজ্জা বোধ করলাম। 'কে এসেছে' খবরটা ওরা মাকে ডেকে দিতে গেল কেন—বাবাকে ডেকেও তো দিতে পারত।

'বাঃ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন কাকাবাবু, আসুন, ভিতরে আসুন।' ছেলেটিই বড়। বছর সাত আট হবে বয়স। এসে হাত ধরল। তার দেখাদেখি মেয়েটি এসে ধরল আর একটা হাত। বছর পাঁচেক হবে বয়স। ফুটফুটে ফর্সা রঙ অবিকল মল্লিকার মত।

সদর দরজা থেকে খানিকটা প্যাসেজের মত গেছে ভিতরের দিকে। দুপাশে চুনবালি ঝরা দেয়াল। মাঝখানে ছোটমত একটু উঠান। উঠানের উত্তরে মল্লিকাদের ঘর। দাওয়ায় রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। শিলনোড়ায় বাটনা বাটছিল মল্লিকা। আমি ঢুকতেই তাড়াতাড়ি আঁচলটা মাথায় তুলে দিতে দিতে বলল, 'আসুন, কি ভাগ্যি। আজই যে আসবেন ভাবতেই পারিনি। চিঠি পেয়েছিলেন বুঝি?'

বললুম, 'পেয়েছিলাম মানে? আমি তো আর পাইনি।'

মল্লিকার আঙুলগুলির দিকে চোখ গেল আমার। হাতে সেই লঙ্কা হলুদের ছোপ।

নখের দিকটা একটু ক্ষয়ে গেছে, একটু শীর্ণও হয়েছে যেন আঙুলগুলি, তা সত্ত্বেও ভারি সুন্দর লাগল।

ঘটির জলে হাত ধুতে ধুতে মল্লিকা বলল, 'তারপর একা যে! ইন্দুদি আসেন নি?'

বললুম, 'না, কেন, একা বুঝি আর আসা যায় না।'

মল্লিকা বলল, 'যাবে না কেন। কিন্তু আসা হয় কই। এপথ তো আজকাল ভুলেই গেছেন।'

বললুম, 'তোমরাই বুঝি খুব মনে রেখেছ। ভালো কথা, যতীশবাবু কোথায়। তাঁকেও তো দেখছিনে।'

মল্লিকা বলল, 'কি ক'রে দেখবেন এখনো তো প্রেসে। রাত দশটা পর্যন্ত ডিউটি আজকাল। বলে কয়ে একটু আগেই বেরোন। না হ'লে তো আর ট্রামবাস পান না।'

মনে পড়ল, দু'তিন ধরনের চাকরি বদলাবার পর কিছুকাল ধরে কম্পোজিটারী করছে যতীশ। ইতিমধ্যে গুটিকয়েক খবরের কাগজ অফিস বদলেছে।

'আসুন ঘরে আসুন। বন্ধু নেই বলে কি ঘরের ভিতরেও ঢুকতে নেই নাকি?'

দুখানা তক্তপোষে ঘরের বারো আনি জুড়ে গেছে। বিছানা, বালিশ, জড়ো হয়ে রয়েছে চৌকির ওপর। একপাশে অয়েলক্লথে দু'তিন বছরের আর একটি মেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। কোলের কাছে পুতুল।

উঁচু ক'রে তক্তপোষ পাতা। তার নিচে আর এক সংসার। বাক্স-তোরঙ্গ, হাঁড়ি-কুড়ি। তক্তপোষের তলা থেকেই ছোট একখানা দড়ির খাটিয়া বের করল মল্লিকা। তাকের ওপর থেকে একখানা আসন নামিয়ে এনে পেতে দিল খাটিয়ায়। বলল, 'বসুন।'

বললাম, 'নিজের হাতে বোনা বুঝি?'

মল্লিকা একটু হাসল, 'সব দিকেই লক্ষ্য আছে দেখি। তারপর কেমন আছেন বলুন। এদিকে কোথায় এসেছিলেন।'

বললুম, 'কেন, এখানে বুঝি আর আসতে পারি না।'

মল্লিকা বলল, 'কই আর পারেন। পারলে তো দেখতামই। নিশ্চয়ই কোন কাজকর্ম উপলক্ষে এদিকে এসেছিলেন। সুবিধামত একটু ভদ্রতা রক্ষা ক'রে গেলেন।'

বললুম, 'ঠিক কাজকর্ম নয়, এসেছিলাম এক বড়লোক বন্ধুর বিয়ের প্রীতিভোজে। খেয়েদেয়ে এত আইঢাই করছে পেট যে, এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল খেতে এলাম তোমাদের এখানে।'

'তা তো বটেই। জল ছাড়া আমরা আর কিই বা খাওয়াতে পারি। কি কি খেলেন বিয়ে বাড়িতে?'

যা যা খেয়েছিলাম, বললাম।

মল্লিকা বলল, 'দেখুন তো কাণ্ড। অফিস থেকে বেরিয়ে সরাসরিই তো এসেছেন এদিকে। খুব খিদে লেগেছে নিশ্চয়ই।'

বললুম, 'আরে না না। বললুম বলেই নাকি।'

মল্লিকা বলল, 'থাক থাক, আর লজ্জার দরকার নেই। আপনি যে খুব লাজুক ভদ্রলোক তা ছুনিয়ায় আর জানতে বাকি নেই কারো।'

লাজুক ভদ্রলোক! কোন ইঙ্গিত আছে নাকি কটাটুকুর মধ্যে?

ছেলেকে ডেকে দাওয়ায় নিয়ে গিয়ে আঁচল থেকে পয়সা খুলে দিল মল্লিকা। কি যেন আনতে পাঠাল মোড়ের দোকান থেকে।

বললুম, 'হচ্ছে কি?'

'কিছুই হচ্ছে না, আপনি চুপ করুন দেখি। বরং একটু এদিকে এসে বসুন এগিয়ে।'

তাকের ওপর থেকে কাঁচের ময়দার বৈয়ম আর ঘিয়ের টিন নামিয়ে আনল মল্লিকা। কাঁধ উঁচু একটি কাঁসার থালায় ময়দা মাখতে বসল। ময়দা ডলার সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকার চুড়ি আর শাঁখার ঠুন ঠুন শব্দ হতে লাগল।

বললুম, 'তারপর আছ কেমন।'

মল্লিকা বলল, 'বেশ আছি।'

'চোখের নাকি অসুখ।'

মল্লিকা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'চোখের অসুখ আবার একটা অসুখ নাকি। ওতো আপনারও আছে।'

বললুম, 'আমার আছে বলেই বুঝি তোমারও থাকতে হবে?'

মল্লিকা এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'ইন্দুদি কেমন আছেন আজকাল?'

সংক্ষেপে বললুম, 'ভালোই।'

তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম দেয়ালের দিকে। বুঝতে পারলাম পুরোন প্রসঙ্গ একটুও আর তুলতে দিতে চায় না মল্লিকা। যেতে চায় না কোন রকম কোন ঠাট্টা-তামাসার মধ্যে। দেওয়ালভরা নতুন পুরোন নানারকমের ক্যালেণ্ডার। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্রের ফটো। ফাঁকে ফাঁকে মল্লিকার হাতে বোনা কার্পেট, কাঁচে বাঁধানো সূচিশিল্প। একটি শিল্পকাজ বিশেষ ক'রে চোখে পড়ল, এপাশে ওপাশে নাম না জানা গুটিকয়েক ফুল। মাঝখানে অলঙ্কৃত অক্ষরে ছুটি পংক্তি—

'সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন
কাঙালিনী পেলে রাণী এহেন রতন।'

মনে মনে হাসলুম। একথা কি কোন বাঙালী হিন্দুর মেয়েকে কখনো ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতে হয়? না কি মনের দেয়াল থেকে বার বার মুছে যেতে চায় বলেই তাকে ঘরের দেয়ালে এমন অক্ষয় ক'রে রাখবার চেষ্টা।

থালায় ক'রে অনেকগুলি লুচি, তরকারি মল্লিকা সামনে এনে রাখল।

বললুম, 'এত কি হবে?'

মল্লিকা বলল, 'এত কই। খানকয়েক মাত্র তো লুচি। রাত্রে বাসায় ফিরে ভালো ভালো জিনিস খেতে পারবেন না, এই তো ভাবনা? বলবেন, বন্ধুর বাড়ি থেকে পেটভরে পোলাও মাংস খেয়ে এসেছেন সেইজন্যেই খেতে পারছেন না।'

মল্লিকার ছেলেমেয়ে দুটি, ননী আর ময়না, কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের হাতে তুলে দিলাম খানকয়েক লুচি। চায়ের প্লেটে ক'রে দুটি মিষ্টি দিয়েছিল মল্লিকা, সে দুটিও ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিলুম।

মল্লিকা বলল, 'বাঃ, সবই বিলিয়ে দিলেন যে।'

বললুম, 'সব বিলিয়ে দিতে আর পারলাম কই। ওরা খেলেই আমার হবে।'

খুব খুশি-খুশি, ভারি উৎফুল্ল দেখাল ননী আর ময়নার মুখ। পান্তুয়ার রস আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেয়ে পড়তে লাগল ময়নার। জল-খাবারের পর চা ক'রে আনল মল্লিকা। নিজেও এক কাপ নিল।

বললুম, 'অনেকদিন পর চা খাচ্ছি মুখো মুখি বসে।'

মল্লিকা বলল, 'আহাহা, বাড়িতে বুঝি একজন আর একজনের দিকে পিছন ফিরে মুখ ঘুরিয়ে বসে খান?'

চায়ের পর আবার রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মল্লিকা। ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে তুলে দিল ডালের কড়া।

বললুম, 'এবার উঠি।'

মল্লিকা বলল, 'আসবেন মাঝে মাঝে। পথ যেন একেবারে ভুলেই গেছেন। বউবাজার আর কালীঘাট যেন কেবল গড়ের মাঠের এপার ওপার নয়, সাত সমুদ্র তের নদীর পার।'

ভারি ভালো লাগল কথাটুকু। এতক্ষণ পরে তাহলে সত্যিই অভিমানের সিন্ধু উথলে উঠেছে মল্লিকার।

জবাব না দিয়ে এগুতে লাগলাম সরু প্যাসেজটুকুর ভিতর দিয়ে। দোর পর্যন্ত মল্লিকা এগিয়ে দিল, ফিরে গেল না। দাঁড়িয়েই রইল একখানা কবাটের আড়ালে মুখ বাড়িয়ে।

কিন্তু দু'এক পা এগুতেই দেখি ননী আর ময়না দুদিক থেকে ফের এসে আমার

দুখানা হাত চেপে ধরেছে, 'কাকাবাবু, বাঃ দিব্যি পালিয়ে যাচ্ছেন। পয়সা দিলেন না!'

'ও: পয়সা।'

ভারি লজ্জিত বোধ করলুম। তাইতো কেবল বড়লোক বন্ধুর ওখানেই লৌকিকতা করেছি—মল্লিকার ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু কিনে নেওয়াই হয়নি। একবারে শুধু হাতে গিয়ে উঠেছি ওদের ওখানে।

বললুম, 'পয়সাই নেবে। না আম-টাম কিছু কিনে দেব?'

ননী নিজেই বলল, 'না-না পয়সাই চাই। আপনি ভারি ফাঁকি দিচ্ছিলেন।' বলে ননী নিজেই আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। এক পকেটে খুচরো আনা দুয়েক পয়সা ছিল। ময়না তা তুলে নিল। ননীর হাতে উঠল সেই দু টাকার নোটখানা। এক মুহূর্ত একটু স্তম্ভিত হয়ে রইল ননী, তারপর হঠাৎ বাড়ির দিকে ছুট দিল।

আমিও মুহূর্তকাল অবাক হয়ে রইলুম, তারপর ননীকে ডেকে বললুম, 'ছুটছ কেন। পড়ে টড়ে যাবে, আস্তে আস্তে যাও।'

ননী মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কেড়ে নেবেন না তো?'

'না-না, কেড়ে নেব না, ভয় নেই।'

কেমন যেন লাগতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটতে সুরু করতে পারলুম না। দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরালাম।

পরমুহূর্তে ফের ছুটে এল ননী, 'কাকাবাবু টাকা তো আপনি আমাকেই দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই তো দিলাম।'

'তাহলে মা কেড়ে নিলে কেন। আসুন ধমকে দিয়ে যান মাকে।'

হাত ধরে টানতে টানতে ফের দোরের কাছে আমাকে নিয়ে গেল ননী। মল্লিকা তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। দু'টাকার নোটখানা তার মুঠির মধ্যে।

হাসতে গেলুম, কিন্তু হাসি যেন ঠিক এলো না, বললুম, 'ব্যাপার কি।'

মল্লিকা বলল, 'আচ্ছা কাণ্ড আপনার। ওদের হাতে অত টাকা দিতে গেলেন কেন।'

বললুম, 'তাতে কি হয়েছে।'

মল্লিকা বলল, 'না-না-না, এসব ভালো নয়। এসব কি, এসব দেবেন কেন।'

ননী এবার বলল, 'আচ্ছা কাকাবাবু। এ-টাকা আমাকে দেননি আপনি?'

আমি ঘাড় নাড়লুম।

'তবে মা কেন কেড়ে নিচ্ছে?'

মল্লিকা একটু হাসল, 'কথা শুনুন ছেলের। কেড়ে নিয়ে যেন পাড়ার পাঁচজনকে বিলিয়ে দেবে মা। এ যেন তোমাদেরই পেটে যাবে না? রাত পোহালে এক মুড়ি মুড়কিতেই কতগুলি পয়সার দরকার—সে হিসাব আছে?'

বলতে বলতে আঁচলে দু'টাকার নোটখানা বেঁধে রাখল মল্লিকা।

মনে হোল ননীর চোখ দুটি ছলছল করছে। কিন্তু ছেলের দিকে মোটেই তাকাল না মল্লিকা, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'লিখেটিখে খুব বুঝি হচ্ছে আজকাল?'

কিসের এক আনন্দে চকচক করছে মল্লিকার চোখ। ঠোঁটের কোণে সেই আগেকার দিনের হাসি।

বলতে গেলুম, 'না-না'—

মল্লিকা বাধা দিয়ে বলল, 'আহা, বললে বুঝি সব আমি কেড়ে রাখব, না? ভয় নেই, তা আমি রাখতে পারব না, তা আপনি দিতেও পারবেন না। কিন্তু দু-এক নাইট সিনেমা দেখাতে তো পারেন? মনে আছে, সেই কতকাল আগে একবার একসঙ্গে— আসবেন একদিন? ওঁর তো আর সময় হয় না।'

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালুম, 'আসব।'

তারপর প্রায় ননীর মত ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলাম গলি থেকে।

স্মৃতি চিন্তা

পিছে ফিরে দেখা

পিছে ফিরে তাকাবার অভ্যাসটা আমাদের সব বয়সেই আছে। আমরা যা কিছু লিখি সবই আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা। সেই অতীত কখনো দূরের কখনো অদূরের। বর্তমান মানে শুধু এই মুহূর্তটি।

পিছনের দিকে তাকাবার প্রবণতাটা সব বয়সেই আছে। তবে কম বয়সে কম, বেশি বয়সে বেশি। সেই বেশি বয়সকে কিছুটা ঢেকে রাখবার জন্তে আমরা পিছনে তাকাবার কথাটা অন্তের কাছে সরবে বড় একটা বলিনে। নিজের মনে তাকাই। মনে মনে তা নিয়ে বিড় বিড় করি। কী দেখলাম না দেখলাম অন্তের চোখের সামনে তুলে ধরিনে।

কিন্তু আজ ধরা পড়বার ভয়ের চেয়ে ধরা দেবার লোভটা প্রবল হয়ে উঠেছে। ইচ্ছা হচ্ছে সেই ফেলে আসা দিনগুলির দুটি চারটি ফের কুড়িয়ে নিতে। দুটি চারটির বেশি পারা যায় না। স্মৃতি সমুদ্রই হোক আর নদীই হোক তার জল আঁজলা ভরেই তোলা যায়। আর তা বেশিক্ষণ ধরে রাখা যায় না।

পিছনের দিকে তাকালে দূর অতীতের কোন দৃশ্যটি আমার প্রথম চোখে পড়ে আমি নিজেকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেছি। একটি দৃশ্যই বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। একটি মৃত্যু দৃশ্য। বাড়িতে একজন মহিলা মারা যাচ্ছেন।

পশ্চিমের ঘরের দুটি দরজা। একটি পুবের দিকে আর একটি দক্ষিণের দিকে। সেই দরজাটি ছোট। অন্দর মহলের সঙ্গে যুক্ত। মেয়েরা এই দোর দিয়েই বেশি যাতায়াত করেন। সেই দরজার সামনে ভিড়, ঘরের মধ্যে ভিড়। মা আমাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাকিয়ে দেখছি। সবাই ব্যস্ত সন্ত্রস্ত শঙ্কিত। কী যেন একটা ঘটছে, কী যেন একটা ঘটবে। আশেপাশে আর কারা ছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না। নিশ্চয়ই জেঠীমা কাকিমারা থেকে থাকবেন। কিন্তু আমার মনে আছে শুধু বাবার পিসীমা ভাইদিদির মুখ। যতদূর মনে পড়ে তখনো তার দাঁত পড়েনি। পিঠভরা কালো চুলের রাশ। পরণে সাদা থান। তিনি তাঁর বউমার মাথার কাছে বসেছিলেন। পরে শুনেছি সেই সময় আমার বয়স বছর চারেক। চার বছর বয়সের সেই স্মৃতির সঙ্গে পরবর্তী কালের শ্রুতি মিশে থাকা অসম্ভব নয়। তবু এই মুহূর্তে স্মৃতির পায়ে পায়ে হাঁটা যাক। স্বপ্নের মত সেই শৈশব স্মৃতি কোথাও উজ্জ্বল কোথাও ঝাপসা। কোথাও বর্ণাঢ্য, কোথাও রঙের লেশ মাত্র নেই। শুধু কি রঙ। তার রেখাগুলিও অবলুপ্ত। ছেঁড়া ছেঁড়া কাটা কাটা অসম্বদ্ধ সেই স্মৃতি যেন স্বপ্নেরই সহোদরা।

তখন সন্ধ্যাবেলা মনে আছে। সন্ধ্যা-বাতি দেওয়া হয়েছে। ঘরে জ্বলছে কেরোসিনের হ্যারিকেন। লক্ষ্মীর আসনের কাছে কাঠের পিলসুজের ওপর পিতলের প্রদীপ। তার সলতেটি নিবু নিবু।

আমি যেন কী বায়না ধরেছিলাম মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ধমক খেলাম। বোধহয় জেঠীমাই চাপাগলায় বলে উঠলেন, 'চুপ চুপ! মায়ের অসুখ দেখতে পাচ্ছিস নে?'

মায়ের কোলে আমি তো বেশ সুখেই আছি। আবার কোন মায়ের অসুখ? জেঠীমার এ কথায় আমার কি কোন বিস্ময়বোধ হয়েছিল? আমি কি কিছু প্রতিবাদ করেছিলাম? কিছু কি জানতে চেয়েছিলাম? মনে পড়ে না।

কোল থেকে কখন আমাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাও মনে নেই।

তারপর দেখতে পাচ্ছি যে-বউটি খাটে শুয়ে রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন তাঁকে কখন মাটিতে নামান হয়েছে। ঘরের একেবারে মাঝখানে তিনি আছেন। কিসের কষ্টে তিনি যেন শুয়ে থাকতে পারছেন না। তাঁকে বসানো হোল। পিঠের নিচে দুটো বালিশ। আরো পিছনে ঘরের বেড়ায় ঠেকে যাওয়া বড় একটা কাঠের আলমারি। তার চূড়ায় মাকড়সার জাল।

আরো পরে ঘর দেখছি বাইরের লোকজনে ভরে গেছে। দুজন ডাক্তার এসেছেন। রোগিনীর বিছানার কাছে পাশাপাশি বসেছেন। তাঁদের একজন বেশ সুপুরুষ। আর একজন দেখতে তেমনি কদাকার। দুজনে ফিস ফিস ক'রে কী যেন পরামর্শ করছেন। বাবা বসে আছেন তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে।

দুই ডাক্তারের মধ্যে পরামর্শ শেষ হোল। তাঁদের চেহারায় মিল নেই। কিন্তু এতক্ষণে বুঝি তাঁদের মনের মিল হয়েছে। দুই ডাক্তার মিলে মিশে একই রোগে একই ওষুধ দিলেন।

বাবার হাতে ওষুধ খাওয়ার ছোট কাঁচের গ্লাস। এক ডোজে একটি গ্লাস কানায় কানায় ভরে গেছে। ওষুধের রঙটি কিন্তু ভালো না। কেমন যেন কালো কালো।

বাবা কম্পিত হাতে রোগিনীর মুখের কাছে ওষুধের গ্লাসটি ধরেছেন।

হঠাৎ বাবার পিসীমা আমাদের ভাইদিদি বলে উঠলেন, 'মহিন্দির, ওষুধ খাওয়াস কাকে? দেখছিস না চোখের অবস্থা। ধর ধর। ধরে বাইরে নিয়ে যা। নইলে কি ঘরের মধ্যে—'

রোগিনীর চোখ দুটি স্থির হয়ে গিয়েছিল। আর সবারই অস্থিরতা দেখে সেই চোখ দুটি কাতর অনুনয়ে কাউকে কিছু বলতে চেয়েছিল কিনা কে জানে।

অতি ব্যস্ততায় তাঁকে ধরাধরি ক'রে বাইরে নিয়ে যাওয়া হোল। শেষ শয্যা পাতা হোল উঠোনে খোলা আকাশের নিচে।

ডাক্তার এসে নাড়ী ধরলেন। তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।

এই নিয়ে পরে বাবাকে অভিযোগ করতে শুনেছি। 'পিসীমা কেন যেন অত তাড়াহুড়ো করলেন। না হয় ঘরের মধ্যেই মরত।' কিন্তু ভাইদিদির সংস্কার ঘরের মধ্যে কাউকে মরতে দিতে নেই। তাহলে আত্মা মুক্তি পায় না। যে চলে যাচ্ছে তাকে সমস্ত বন্ধনের বাইরে এনে রাখতে হয়।

এ ব্যাপারেও দুই ডাক্তারই একমত।

তারপর কী হোল না হোল কিছুই দেখিনি। যা দেখেছি তার কিছুই আর মনে পড়ে না।

পরে শুনেছি সেদিন সন্ধ্যার আগে আগেই আমাদের খাওয়া শেষ হয়েছিল। একটা কিছু যে ঘটবে বাড়ির প্রবীণারা আগেই টের পেয়েছিলেন। তাঁরা সবদিক থেকে তৈরি হয়েছিলেন।

আর মনে পড়ছে শেষ রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল অনেকগুলি কুড়ুলের শব্দ শুনলাম। মা পাশেই ছিলেন। তাঁরও ঘুম ভেঙে গেছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মা ও কিসের শব্দ ?'

'গাছ কাটছে।'

'কেন গাছ কাটছে মা ?'

'পরে বলব। এখন ঘুমোও।'

কিন্তু আমার ঘুম এল না। সেই ঘন ঘন কুড়ুল পড়ার শব্দ শুনতে লাগলাম। আমার মনে হোল এই কুড়ুলের শব্দ আমি যেন ঘুমের মধ্যে আরো শুনেছি। সারা রাত কারা যেন কেবল কাঠ কেটেছে। এত কাঠ দিয়ে কী হবে কে জানে।

ভোরে উঠে দেখতে পেলাম আমাদের বাড়ির উত্তর দিকে যে কয়েকটা আম গাছ ছিল তার একটা নেই। ডাল পাতাগুলি পড়ে আছে।

বাড়ির নিচেই খালের জল। সেই জলে কতকগুলি ছেঁড়া পাতা ভাসছে।

ভাদ্র মাস। কিন্তু তখনো পূর্ববঙ্গে ভরা বর্ষা। চারদিকে জল। আমাদের বাড়িখানি একটি দ্বীপের মত ভেসে আছে।

ভাইদিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'গাছটা কী হোল ?'

'কেটে ফেলেছে ?'

'কেন কাটল ?'

তিনি আমাকে জবাব দিলেন না। পাশে কে যেন বসেছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না। তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'সব চেয়ে ভালো আমগাছটা। ফলন্ত গাছ। আর কী মিষ্টি

আমই না হত। আমি বললাম, মহিন্দির, বাবা ও গাছটা কাটিসনে। ও গাছটা রেখে দে। বরং ওই বাঁদিকের গাছটাকে কাটতে বল। কিন্তু মহিন্দির বলল, না পিসীমা ও গাছের আম টক। ওই চিনিটুরি আমের গাছটাই ওর সঙ্গে দিই। খেতে ভালোবাসত ওই গাছের আম।'

একটু বাদে বললেন, 'বউ তো গেল ছেলের এখন মাথার ঠিক থাকলে হয়। ওই তো এখন বড় রোজগেরে। এক গুষ্টি লোক ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে।'

উঠোনে গোবরছড়া পড়ছে দেখতে পেলাম। তারপর ভাইদিদিই সাদা ধরা (কাচা) এনে আমার আর আমার ছোট ভাই কান্দুর গলায় পরিয়ে দিলেন। তার তখন তু'বছর বয়স।

আমি আপত্তি ক'রে বললাম, 'ওই দড়ি কেন পরব!' ভাইদিদি বললেন, 'ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। পরতে হয়। মা মারা গেলে সব ছেলেই পরে। দেখিসনি তোদের বন্ধু বিনোদ প্রিয়লাল ওরাও পরেছিল। ওদেরও মা মারা গিয়েছে।'

আমি বলেছিলাম, 'মা তো আছে।' ভাইদিদি বলেছিলেন, 'হতভাগা আজ বুঝবিনে পরে বুঝবি। যে চলে গেল সেই তোর আপন মা। যখন বুঝবি তখন কেঁদেও কুল পাবিনে। আমরা ফল চেয়েছিলাম। তিনটি ফল ধরে দিয়ে সে চলে গেল। সতী লক্ষ্মী।'

মাতৃশোকে আমিও কাঁদিনি আমার ছোট ভাইও কাঁদেনি। সে জেঠীমার কোলে মানুষ। আমি বড়মার মধ্যেই মাকে পেয়েছি। কেঁদেছিল নিশ্চয়ই ছোট বোনটা, বছর খানেক বয়স। সেই ছিল কোলে। সেই শুধু কোল ছাড়া হয়েছিল।

মা মারা যাওয়ায় আমরা তো কাঁদিনি, কাউকে কাঁদতে দেখিওনি। হয়তো আমাদের কষ্ট হবে ভেবে আমাদের সামনে কেউ চোখের জল ফেলেনি। তবে একজনের কান্নার কথা শুনেছি। যতদূর মনে পড়ে পরদিনেই শুনেছিলাম সেই কান্নার বর্ণনা।

সকাল বেলা বেশ রোদ উঠেছে। আমরা রান্নাঘরের মেঝেতে কাঁঠালের ছোট ছোট পিঁড়ি পেতে খেতে বসেছি। নিজেরা খাচ্ছিনে। আমাদের খাওয়ানো হচ্ছে। কান্দুকে খাওয়াচ্ছেন জেঠীমা, আমাকে খাওয়াচ্ছেন বড়মা।

বাড়ির চাকর অনাথও খাচ্ছে। সে খাচ্ছে পান্তা ভাত কাঁচা লঙ্কা আর কাসন্দ দিয়ে।

অনাথ আমার চেয়ে বোধ হয় দশ এগার বছরের বড়। মুরুব্বিয়ানায় বাবার পরেই যেন তার স্থান।

খেতে দিতে দিতে কাকীমা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'অনাথ মেজদির কাজ শেষ করতে কতক্ষণ লাগল তোদের?'

অনাথ বলল, 'রাত ভোর হয়ে গেল ধলাঠান। নিতে নিতেই তো কত রাত হোল।'

'মুখাগ্নি করল কে?'

'কে আবার? মেজো কর্তা।'

'ও মা, ভাসঠাকুর নিজেই করলেন?'

অনাথ বলল, 'তাইতো নিয়ম শুনেছি। ছেলেরা ছোট থাকলে স্বামীই তো সব করে। চেলা কাঠে আগুন ধরিয়ে মেজোঠানের মুখের কাছে নিয়ে যেতে কি আর পারেন মেজোকর্তা? বিপিন রাহামশাই তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে গেলেন। মেজোকর্তার দুই চোখ দিয়ে টস টস ক'রে জল পড়ছে।'

সবাই চুপ ক'রে রইল।

অনাথ বলল, 'মেজোকর্তার চোখে জল এর আগে দেখিনি। অমন শক্ত জবরদস্ত মানুষ।'

বড়মা আমাকে খাওয়াচ্ছিলেন। তিনি একবার অনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে ওঠতো। সেই যে জাবর কাটতে বসেছিস।'

বারবাড়ির উত্তর দিকে পুকুরের ধারে একটা হরতুকি একটা তাল গাছ ছিল। আরো তিনটি গাছ নাকি ছিল। বাকি তিনটি আমরা দেখিনি। পঞ্চবটী নামই শুনেছি। তার ধারে মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য ছোট একটি বেদী তৈরি হয়েছিল মনে আছে। আমি আসনে বসে পুরোহিতের মুখ থেকে শুনে শুনে মন্ত্র পড়েছিলাম, ভুল হলে বাবা বলে বলে দিচ্ছিলেন এটুকু মনে আছে।

শুনেছি শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিশেষ কোন আড়ম্বর অনুষ্ঠান হয়নি। বাবার তখন তেমন সামর্থ্য ছিল না তাছাড়া 'অল্পবয়সী বউ মারা গেছে তার আবার ঘটা ক'রে শ্রাদ্ধ কিসের' বাবার গুরুজনেরা বলেছিলেন। বাবার ঠাকুরদা শ্রীনাথ মিত্র তখনো বেঁচে। তিনি একশ বছরেরও বেশি বেঁচেছিলেন।

মা আছেন তবু মা মরা ছেলে বলে সহানুভূতি জানাতেন কেউ কেউ। এই হেঁয়ালীর মর্মোদ্ধার করতে আমার বেশ সময় লেগেছিল। পরে জেঠীমার কাছে ভাইদিদির কাছে শুনেছিলাম কাহিনীটা। নিশ্চয়ই একদিনে নয় অনেকদিন ধরে, অনেকদিন বাদে বাদে আরো পাঁচটি রূপকথার সঙ্গে মিশিয়ে এই পুরোনো পারিবারিক কাহিনী আমার রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

বাবা প্রথম বিয়ে করেন ষোল বছর বয়সে। স্ত্রী চতুর্দশী। অপূর্ব রূপসী। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই রোগে রোগে সেই রূপ লাবণ্য শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গেল। তিনি হলেন মৃতবৎসা। দু'বছর তিন বছর অন্তর একটি ক'রে মেয়ে হয় আর মারা যায়।

তিনি ছ'মাস বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকেন। ছ'মাস স্বামীর কাছে। কিন্তু কাছে থাকলেই কি কাছাকাছি থাকা যায়। ঝগড়াঝাঁটি বিবাদ বিসংবাদ লেগেই থাকে। স্বামী বলেন, 'তোমার ওই সোনার ঝাঁপি কেবল কানাকড়িতে ভরা আগে যদি জানতাম—'

স্ত্রী বলেন, 'আমাকে কেন দোষ দিচ্ছ। আমার ভিতরে কি এত রোগব্যাধি ছিল? তোমাদের বাড়িতে এসে হয়েছে, তোমার জন্যে হয়েছে। আমি সব জানি সব বুঝি।'

তাবিজ কবচ ধারণ, দেবদেবীর কাছে মানত, কত গাছ-গাছড়া তেলপড়া জলপড়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন কিছুতেই কিছু হয় না; কত ডাক্তারী কবিরাজী কিছুতেই কিছু হোল না।

বাবার বন্ধুরা বললেন, 'তুমি আবার বিয়ে কর। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। ছেলেই যদি না হোল শুধু বউ দিয়ে কী হবে। ফলের জন্যেই তো গাছ।'

বাবা কথাটা প্রথমে আমল দিলেন না। বাড়িতে অনেক পোষ্য। বাপ নেই কিন্তু বুড়ো ঠাকুরদা আছেন, বিধবা পিসীমা আছেন, গুটি ছয়েক ভাই আছে, একজন বিধবা বউদি আছেন তাঁর তিনটি ছেলেমেয়ে। এত বড় একান্নবর্তী পরিবারে একটি বউ পোষাই কষ্ট তারপর আবার দুটি। গাঁয়ের মাঠে জোতজমি নেই বললেই চলে। পেশা সামান্য উকিলের মুহুরীগিরি। নেশার অন্ত নেই। গান-বাজনা আছে, যাত্রা-থিয়েটার আছে, তাস-পাশা আছে।

কিন্তু শুধু অর্থ সামর্থ্যের ক্ষীণতার কথাই নয় আর একটি মেয়ের প্রতি হৃদয়হীনতার কথাও তাঁর মনে হয়। সেই রূপবতী স্ত্রী যে রাগ ক'রে নদী মাঠ পার হয়ে মানিকদি গাঁয়ের বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকে আর প্রতিদিন অপেক্ষা করে কাছারির শেষে সন্ধ্যা বেলায় মাঠ প্রান্তর পেরিয়ে আর একজন গিয়ে ঠিক হাজির হবে, মান ভাঙাবে। ছেঁড়া সম্পর্ক এমনভাবে জোড়া লাগাবে যে মাঝখানে কোন দাগই আর থাকবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব বিচার-বিবেচনা ভেসে গেল। কি একটা মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে কাসিমপুর—শ্রীরামপুর গেলেন মহেন্দ্র। সন্ধ্যাবেলায় আতিথ্য নিলেন গাঁয়ের মাস্টার প্যারীমোহন ধরের বাড়িতে। ধরমশাইর ঘরে ছেলেমেয়ে আর ধরে না। পুত্রকন্যা একেবারে ডাল ভেঙে পড়েছে। সবচেয়ে বড় যেটি সে মেয়ে নয়, কিন্তু আদরে সোহাগে মেয়ের চেয়েও বাড়া, বাপ-মা মরা এক ভাগ্নী। মামার কাছে লেখাপড়া শিখেছে। সেবায়-শুশ্রূষায় রান্না-বান্নায় গৃহকর্মে নিপুণা মামী আছে তবু মামার সংসারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রায় সবখানিই বিরাজের ওপর। কিন্তু নিজে সে অরক্ষণীয়া। তাকে নিয়ে গরীব মামার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। গাঁয়ের লোকে কত কি বলে।

মহেন্দ্র প্যারীমোহনের সেই গুণবতী ভাগ্নীটিকে দেখলেন, তার হাতের রান্না খেলেন, তারই পেতে দেওয়া বিছানায় ঘুমোতে গেলেন। কিন্তু ঘুমোতে পারলেন কি না জানিনে।

বাড়িতে ফিরে এসে ঘটনাটা বললেন পিসীমার কাছে। পিসীমা তুলে দিলেন তাঁর বাবার কানে। বাবা কানে শুনতে পান না। কিন্তু এই ঘটনাটা মন দিয়ে শুনলেন। একবার এ-কানে শোনেন আর একবার ও-কানে। তারপর দুজনে মিলে কী পরামর্শ হোল। যার ওপর এতগুলি প্রাণীর নির্ভর তার মন-মেজাজ তো ঠিক রাখতে হবে। সে যাতে খোস মেজাজে কাজকর্ম করতে পারে সে ব্যবস্থা তো গার্জিয়ানদের করা চাই।

সুতরাং চিঠি গেল প্যারীমোহন ধরের কাছে। কথাবার্তা হোল। বুড়ো শ্রীনাথ মিত্র আর একখানি বিয়ের চিঠির খসড়া করতে বসলেন।

মানিকদি গ্রাম থেকে আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু সে আপত্তি টেকেনি। অভিমানিনী শেষ পর্যন্ত বলেছেন, 'কর তোমার যা খুশি। আমাকে দিয়ে কোন সাধ-আহ্লাদই তোমার মিটল না। এবার সাধ যেন মেটে। আমার শ্বশুরের ভিটেয় যেন 'পিরদিপ' জ্বলে। তার চেয়ে বেশি কিছু চাইনে।'

কিন্তু মানুষের বাসনা-কামনা যদি ওই একটি-দুটি প্রদীপের শিখাই হত তাহলে আর কথা ছিল কি।

যতদূর শুনেছি প্রথমা দ্বিতীয়াকে নিয়ে মহেন্দ্রকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। প্রথমা অভিমান ক'রে দূরে পড়ে থাকেননি। সতীন আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও চলে এসেছেন। নিজের অধিকার একবিন্দুও ছাড়েননি। ভাগ আধাআধি নয়, বার আনি চার আনি।

কিন্তু রেষারেষি যতই করুন না জিৎ হোল যে পরে এসেছে তার, সিকি দু'আনি নিয়ে সংসারে যে ছায়ার মত আছে, যে মুখ বুজে থাকে, দিন রাত খাটে, সবাইয়ের সেবা-শুশ্রূষায় যে অক্লান্ত সেই বিরাজবালার। যার রূপের গর্ব নেই কিন্তু গুণকীর্তনে বাড়ির ক্ষুদে চাকর অনাথ থেকে শুরু ক'রে বুড়ো দাদাশ্বশুর শ্রীনাথ মিত্র পর্যন্ত পঞ্চমুখ। এক চোখো ভগবানও তার দিকেই মুখ তুলে তাকালেন। দুই বছর যেতে না যেতেই বিরাজবালার ছেলে হোল।

জগৎমোহিনী হার মেনে বললেন, 'আর আমি এখানে থাকব না। আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। আর কোনদিন এখানে আসতে চাইব না।'

কুলগুরু বঙ্কবিহারী দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় বসে তিলক সেবা করছিলেন, বাহুতে কণ্ঠে কৃষ্ণপদের ছাপ দিচ্ছিলেন, শ্রীনাথ মিত্র টানছিলেন গড়গড়া। কথাটা তাঁদের কানে গেল।

তাঁরা জগৎমোহিনীকে ডেকে পাঠালেন।

বঙ্কবিহারী বললেন, 'সে কি কথা মা। এই আনন্দের দিনে তুমি চলে যাচ্ছ।'

জগৎমোহিনী বললেন, 'গুরুদেব, আমার আনন্দ কিসের। ও তো আমার কেউ নয়।'

বঙ্কবিহারী হেসে বললেন, 'ছিঃ মা। মায়ের কি অমন হিংসে করা সাজে। এ ছেলে তোমারই। বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, যাতে বিশ্বাস হয় আমি তার ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি। বিরাজকে এখানে ডাকো। সেও আসুক। ছেলে যেন কোলে নিয়ে আসে।'

শঙ্কিত লজ্জিতভাবে কুলগুরু আর কুলপতির পায়ের কাছে এসে বসলেন বিরাজবালা। ঘোমটায় ঢাকা মুখ। আঁচলে রঙের বাহার, মুখখানা বিবর্ণ। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন দুজনকে। পায়ের ধুলো নিলেন।

বঙ্কবিহারী প্রসন্ন স্মিতমুখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'বিরাজ এই ছেলে তোমার দিদিকে দাও। তোমার দিদিই ওকে পালবে পুষবে। তাকেই ও মা বলে ডাকবে—'

তরুণী মা ছেলে কোলে নিশ্চল হয়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গেই কুলগুরুর আদেশ পালন করতে পারল না। পিসীমা শশিমুখী গুরুদেবের সেবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে সামনে দাঁড়ালেন। রুষ্টস্বরে বললেন, 'গুরুদেব, আপনাদের এ কী বিচার—'

বঙ্কবিহারী তেমনি প্রসন্ন হেসে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'শশিমুখী তুমি চুপ কর। মাঝে মাঝে তুমি বড়ই মুখরা হয়ে ওঠ। বিরাজ, তুমি ওকে দিয়ে দাও। মন্ত্র যেমন দানের জন্যে, বিদ্যা যেমন দানের জন্যে, সন্তানও তেমনি দানের জন্যে। বুকে আঁকড়ে তাকে আর ক'দিন ধরে রাখা যায়? তুমি ওকে দাও। তোমার দিদি বড় দুঃখী। তোমার কোল জুড়ে আরো ছেলে আসবে, মেয়ে আসবে। আমি আশীর্বাদ করছি তোমার আরো হবে। তোমার ওই দুঃখিনী দিদি ওই একটিকে নিয়ে থাকুক।'

বিরাজবালা কম্পিত হাতে কোলের ছেলেকে সতীনের কোলে তুলে দিলেন। তারপর আর একবার গুরুজনদের প্রত্যেককে প্রণাম ক'রে রান্নাঘরে গিয়ে লুকোলেন।

জগৎমোহিনীর তেজ কম নয়। তিনি বললেন, 'এমন নেওয়া আমি নেব কেন। ভিক্ষার ধন আমি কেন নেব।'

বঙ্কবিহারী তাঁর মাথায় হাত রেখে হেসে বললেন, 'মনকে শান্ত কর মা শান্ত কর। ছেলে নিয়ে ঘরে যাও। শশী আমার আহ্নিকের আয়োজন কর।'

এই হস্তান্তরের উপাখ্যান পরে বড় হয়ে শুনেছিলাম। তার অনেক আগেই বিরাজবালা মারা গেছেন। কিন্তু আমি মাতৃশোক পাইনি, মায়ের অভাব কোন দিন বুঝতে পারিনি। জগৎমোহিনীই আমার মা হয়েছেন। যতদূর মনে পড়ে প্রথম প্রথম দিন কয়েক বোধ হয় তাঁকে বড়মা বলে ডাকতাম। কিন্তু এটা তাঁর মনঃপূত

হয়নি। মায়ের আগে বড় বসালে তাঁকে ছোট করা হয়। ওই একাক্ষরার কোন বিশেষণ লাগে না।

যে মা চলে গেছেন—তাঁর অস্তিত্ব কি অভাব আমি কোন দিন অনুভব করিনি, ছেলেবেলায় গুরুজনদের মুখে শুধু মাঝে মাঝে তাঁর উল্লেখ শুনেছি রহস্যময় রূপকথার মত।

তাঁর কোথায় অন্ত্যেষ্টি হয়েছিল তাও জেনেছি। দূর থেকে দেখেছি সেই ঘনজঙ্গল ভরা ভিটেটি। সেখানে পরে আমগাছ হয়েছে জামগাছ হয়েছে। একটা গাছে তো খুব জাম ফলত। কিন্তু আমাদের সেখানে আম জাম কুড়োবার জন্যে যেতে দেওয়া হত না।

ভাইদিদি বলতেন, 'খবরদার ওখানে যাবিনে। ওখানে কত কী আছে।'

যেতাম না। কিন্তু বর্ষার সময় নৌকায় ক'রে স্কুলে যাতায়াতের পথে মাঝে মাঝে খালের ধারে সেই ভিটেটির দিকে তাকাতাম। ওই জঙ্গলের ভিতরে যাওয়ার জন্যে কিসের একটা আকর্ষণ বোধ করতাম।

কোন কোন দিন বাবাও সঙ্গে থাকতেন। কথা বলতে বলতে সেই ভিটের দিকে তাকিয়ে তিনি হঠাৎ থেমে যেতেন। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে থাকতেন।

মনে পড়ে আমাদের ছেলেবেলায় বাবা বর্ষার সময় একবার ক'রে সেই শ্রীরামপুর যেতেন। কালো চাপ দাড়িওয়ালা বসিরুদ্দিন নৌকো বাইত। ছইয়ের নিচে আমরা শুধু তিনজন থাকতাম। বাবা আমি আর আমার ছোট ভাই। বোনটি বাঁচেনি। মা মারা যাওয়ার মাস ছয়েকের মধ্যে সেও চলে গিয়েছিল।

আমরা তিনজন থাকতাম। সেই স্মরণতীর্থের যাত্রায় বাবা কিন্তু তাঁর প্রথমাকে সঙ্গে নিতেন না।

সেই দূরের নৌকো যাত্রা তখন আমাদের খুব আনন্দের ব্যাপার ছিল। নদী থেকে খালে, খাল থেকে বিলে পড়ত ডিঙি নৌকো। বসিরুদ্দিন কখনো বৈঠা বাইত, কখনো বৈঠা ছেড়ে লগি ধরত। কখনো নৌকো ভিড়িয়ে শ্রান্ত দেহে তামাক সাজতে বসত।

যেতে যেতে শাপলা ফুল দেখতাম, বিলভরা পদ্মফুল দেখতাম। কোথাও বা দেখতাম জেলেরা ভেসাল পেতে মাছ ধরছে। বাবা সেই ভেসালের কাছে নৌকো নিয়ে যেতেন, মাছ কিনতেন। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় প্যারীমোহনের ছেলেমেয়েদের জন্যে মিষ্টির হাঁড়িটি নিতে ভুলতেন না।

ঘাটে নৌকো লাগতে না লাগতে প্যারীমোহন ছুটে আসতেন। বাবার মামাশ্বশুরের তখন দাঁড়ি গোঁফ পাকা। মাথা জোড়া টাক। চোখে নিকেলের ফ্রেমের চশমা, একদিকে সুতো জড়ানো। মানুষটিকে বেশ লাগত দেখতে।

খুব আদর-আপ্যায়ন করতেন ওঁরা। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বলতেন, 'আমাদের বিরাজের ছেলে।'

দিদিমা আমার দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে বলতেন, 'পল্টুর চোখ দুটো প্রায় তার মতই হয়েছে।'

দাদামাশাই বলতেন, 'না না বিরাজের চোখ আরো সুন্দর ছিল, আরো কালো।'

এ বাড়িতে এলে ওই একটি শব্দ বার বার ধ্বনিত হতে শুনতাম 'বিরাজ, বিরাজ।'

কিন্তু বিরাজের সম্বন্ধে আমার তেমন কোন কৌতূহল ছিল না। আমি তখন বুড়ো বুড়ীর হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে ব্যস্ত। আমি তখন বাড়ির সমবয়সী ছেলেদের দলে ভিড়ে পড়ার জন্যে অস্থির। তখন কে শোনে কার বিরাজের কথা।

কৌতূহল জেগেছিল অনেক পরে। বাল্য কৈশোর পার হয়ে প্রথম যৌবনে। যখন মা নয়, নারীর মধ্যে মনোরমাদের আমি দেখতে পাচ্ছি তখন আমার খেয়াল হয়েছিল আমার মা কেমন দেখতে ছিলেন সে কথা জানবার। কিন্তু তখন আর তেমন উপায় ছিল না। তাঁর চেহারার কিছু কিছু বর্ণনা এঁর মুখে ওঁর মুখে শুনেছি। কিন্তু কিছুতেই একটা স্পষ্ট অবয়ব আমি মনের মধ্যে আনতে পারিনি। যা এসেছে তা মনঃপূত হয়নি। তাঁর কোন ফটো নেই, তাঁর কোন হাতের লেখা নেই। তাঁর কোন হাতের চিহ্ন নেই আমরা দু' ভাই ছাড়া। কিন্তু আমরাও তাঁর হাতে গড়া নয়।

তাঁর প্রবৃত্তি প্রবণতার কতটুকু আমার মধ্যে আছে কি না আছে কে জানে।

'জননী, গুণ্ঠন খোল দেখি তব মুখ।'

আমিও মাঝে মাঝে বলেছি।

কিন্তু অবগুণ্ঠন খোলেনি।

এই নিয়ে আমি একটি গল্পও লিখেছিলাম। শৈশবে মাতৃহারা এক চিত্রশিল্পীর হঠাৎ খেয়াল হোল সে তার মায়ের ছবি আঁকবে। কোন ফটো নেই। কোথাও কোন চিহ্ন নেই। জনশ্রুতি মানে স্বজনশ্রুতি সম্বল! শিল্পী এক একজনের কাছে যান। মায়ের চেহারার বর্ণনা শোনে, গুণপনার কথা শোনে। তারপর এসে আঁকতে বসে কিন্তু পছন্দ আর হয় না।

গল্পের এই অংশটুকুর সঙ্গেই আমার নিজের জীবনের উপাখ্যানের মিল। বাকি অংশটুকু আলাদা এবং এখন আমার অমনঃপূত। সেই অংশের উল্লেখ এখন অপ্রাসঙ্গিক।

যে মাকে শৈশবে হারিয়েছি, যার মূর্তি আমার স্মৃতিতে নেই, স্বপ্নে নেই, কল্পনায় নেই তাঁর কথা লিখতে বসে আজ ভাবছি মাতৃমূর্তি আমার লেখায় বেশি ধরা দেয়নি। আমার রচনায় দেবকী-যশোদাদের সার্থক আবির্ভাব বড় কম। রাধাদেরই প্রাধান্য। যদিও জানি রাধাই একমাত্র রসের আধার নন।

অন্য মা

যিনি জননী না হয়েও আমার মা হয়েছেন, যাঁকে পেয়ে আমি মায়ের অভাব কোনদিন অনুভব করতে পারিনি, যিনি আমাকে আশৈশব লালন-পালন করেছেন আদরে-সোহাগে স্নেহধারায় সিক্ত করেছেন তাঁকে আলাদা ক'রে বোঝাবার জন্তে নাম দিয়েছি অন্ত মা। কিন্তু তিনি তো আমার জীবনে অন্যা নন, অনন্যা। তাঁকে ছাড়া আমি আর কাউকে মা বলে ডাকিনি। মাতৃস্নেহের স্বাদ একান্তভাবে তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। আমার এই মায়ের নাম জগৎমোহিনী। তিনি আমার জগৎজননী না হলেও জগদ্ধাত্রী।

বিরাজবালার মৃত্যুর কিছুদিন বাদে মহেন্দ্রের ইচ্ছা হোল তিনি তীর্থ পর্যটনে যাবেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল একাই বেরোবেন। কিন্তু জগৎমোহিনী পিছু ছাড়লেন না। বললেন, 'না। কিছুতেই তোমাকে আমি একা যেতে দেব না।'

মহেন্দ্র বললেন, 'আমি তো আর বিবাগী হয়ে যাচ্ছিনে। আবার ফিরে আসব, সংসার ধর্ম করব। তোমার ভয় নেই।'

জগৎমোহিনী বললেন, 'ভয় নেই, ভরসাই বা কিসের। তুমি দিনরাত বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে ঘুরবে আর তার কথা চিন্তা করবে। আমি তা সইতে পারব না।'

মহেন্দ্র বললেন, 'তোমার কী হিংসা মেজো বউ। মরে গিয়েও তোমার হাত থেকে তার রেহাই নেই।'

জগৎমোহিনী বললেন, 'তুমি আমাকে যত গালাগালই দাও, আমি তোমাকে একা ছেড়ে দেব না। তোমার মনের যা অবস্থা তাতে তুমি কিছুতেই সময়মত নাবে না খাবে না। তোমার শরীর ভেঙে পড়বে। আমি কাছে না থাকলে তোমাকে দেখবে কে?'

'কিন্তু তোমার ছেলে পন্টু? সে থাকবে কার কাছে? বাচ্চা ছেলেকে আমি কিছুতেই সঙ্গে নেব না। যা পথঘাট—'

কানুর জন্তে ভাবনা নেই। জেঠীমার কোলে আছে। আমাকে রেখে গেলেন ওঁরা বাবার পিসীমা—ভাইদিদির কাছে। তাছাড়া কাকা আছেন কাকীমা আছেন। বাড়ি ভরা লোকজন। আমার অযত্ন হবে না।

বেশ মনে আছে পশ্চিম ঘরের জোড়া তক্তপোশে ঢালা বিছানা পাতা হত। ভাইদিদি মাঝখানে থাকতেন। এক পাশে আমি আর এক পাশে বাচ্চু—আমার খুড়তুতো ভাই। আমার চেয়ে বছর আড়াইয়ের ছোট। খুব ফর্সা ফুটফুটে চেহারা। মাথায় কটা কটা চুল। এতদিন সে ভাইদিদির কাছে একাই থাকত উত্তর ঘরের ঢাকা

বারান্দায়। ভাইদিদি ছিলেন তার দখলে। এখন আমাকে অর্ধেক ভাগ ছেড়ে দিতে তার ঘোর আপত্তি। আমি বলি, 'ভাইদিদি তুমি আমার দিকে ফিরে শোও।'

বাচ্চু বলে, 'না আমার দিকে।'

ভাইদিদি বলেন, 'আমি কি রাতভর শুধু একবার এ মুখো হব আর একবার ও মুখো হব? আমার বুঝি ঘুমটুম কিচ্ছু নেই? আমি কারো দিকেই মুখ ফেরাব না। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকব।'

আমরা দুজনেই জব্দ।

আমরা বলতাম, 'আমরা আর ঝগড়া করব না ভাইদিদি, তুমি চিৎ হয়েই শোও। শুয়ে শুয়ে গল্প বলো।'

ভাইদিদির তাতে আপত্তি নেই। তিনি বলেন, 'তোরা যদি শান্ত হয়ে শুনিস তাহলে বলব।'

তিনি গল্প বলতে শুরু করতেন। সব রূপকথার গল্প। রাজপুত্র আর রাজকন্যা ছাড়া অন্য কোন গল্প আমাদের মনে ধরত না। সেইসব রূপকথা শুনতে শুনতে আমরা কোন্দল ভুলে যেতাম, আমাদের বাদ-বিসংবাদ থেমে যেত। আমরা রূপকথার সাত মহলা রাজপুরীতে চলে যেতাম, রাজপুত্র মন্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতাম, ঘুমন্ত রাজকন্যা আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করে থাকত। শুনতে শুনতে নিজেরাই কখন যে ঘুমিয়ে পড়তাম তা বুঝতে পারতাম না। ঘুমের মধ্যে সেই সোনার রাজপুরীই দেখতাম আর স্বর্ণপ্রতিমা রাজকন্যাকে। আর নিজে তখন রাজপুত্রের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে মিশে যেতাম।

এক এক সন্ধ্যায় এক এক গল্প। ছদ্মবেশী রাজপুত্রের গল্প, কাঁটাকুমারীর গল্প। সেসব গল্পের শেষ নেই। ভাইদিদি শুনেছেন তাঁর মা-ঠাকুরমার কাছ থেকে, তাঁরা শুনেছেন তাঁদের দাদু-দিদিমার কাছ থেকে। রূপকথা নেমে এসেছে মুখে মুখে পুরুষানুক্রমে।

একদিন কাকা ভাঙ্গা থেকে একখানা টেলিগ্রাম নিয়ে এলেন, 'পিসীমা, শোন মেজ বউঠানের কাণ্ড।'

ভাইদিদি বললেন, 'কী হয়েছে রে ভাসা?'

কাকার জন্মকালে বন্যা হয়। বাড়িঘর সব ভেসে গিয়েছিল তাই ওই নাম। গৌরবর্ণ ছিপছিপে চেহারা। সুপুরুষ ছিলেন কাকা।

কাকা ভাইদিদির কথায় জবাবে বললেন, 'মেজদা হরিদ্বার থেকে টেলিগ্রাম ক'রে জানতে চেয়েছেন পণ্টু কেমন আছে। মেজ বউঠান এক দুঃস্বপ্ন দেখে দিনভর নাকি কাঁদাকাটি করছেন।'

আমি দিব্যি সুস্থ আছি টেলিগ্রাম ক'রে ওঁদের জানিয়ে দেওয়া হোল। টেলিগ্রামের

পর খামের চিঠিতে মায়ের দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন বাবা। কাকা সেই চিঠি সবাইকে পড়ে শোনালেন।

'আসার সময় মেজবউয়ের কী জেদ। সঙ্গে না এসে ছাড়ল না। কিন্তু সারাটা পথ কেবল পন্টু পন্টু করতে করতে এসেছে। দেবদেবীর মূর্তিই দেখবে, না পন্টুর কথাই ভাববে। কেবল বলে আর কি দেখব চল এবার ফিরে যাই। আমি বলি তাহলে এলে কেন। তারপর হরিদ্বারে এসে কেঁদে আকুল। রাত্রে কী এক দুঃস্বপ্ন দেখেছে। বলছে আর আমার তীর্থে কাজ নেই। এবার ফিরতি গাড়িতে উঠে পড়। কিন্তু তাই কি হয়? আরো সব সঙ্গী আছে, প্রাণনাথ শীল, হরকুমার সরকার। তারাও সপরিবারে এসেছে। তাদের ফেলে কি আমি যেতে পারি? তুমি পত্রপাঠ সকলের কুশল সংবাদ জানাবে। পন্টুর কথা বেশি ক'রে লিখো তোমার মেজ বউঠানের জন্যে।'

সেই চিঠির সব কথা সেদিন বুঝতে পারিনি। কিন্তু এটুকু বুঝেছিলাম মা আমার জন্যে চিন্তা করছেন, আমাকে ছেড়ে থাকতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। এটুকু বুঝতে পেরে খুশী হয়েছিলাম—মার কাছে বাবাই সব নন।

এরপর বেশিদিন ওঁরা আর দেরি করেননি। দু' একটি তীর্থ বাদ দিয়ে হরিদ্বার থেকে একেবারে গৃহদ্বারে ফিরে এসেছিলেন।

শুনেছি প্রতি তীর্থে মা মন্দিরে মন্দিরে মানত করতে করতে এসেছিলেন 'ওকে যেন গিয়ে সুস্থ দেখতে পাই। প্রাণটুকু আছে যেন গিয়ে দেখতে পাই।'

বাবা মা অনেক জিনিসটিনিস নিয়ে এসেছিলেন। প্রতি তীর্থের প্রসাদ আর তীর্থ মাহাত্ম্য বিবরণী। গয়া মাহাত্ম্য, কাশী মাহাত্ম্য। আর বৃন্দাবন থেকে এনেছিলেন পিতলের একখানি ছোট চৌদোলা তার ওপর যুগল রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, যতদূর মনে পড়ে নাড়ু গোপালও দু'দিকে দুটি ছিল। আমি সেই যুগল মূর্তির পূজারী হলাম। ধ্রুব আর প্রহ্লাদের গল্প শুনতে শুনতে ভাবলাম আমিও ওদের মতই হব। তখন কি জানি হব হিরণ্যকশিপু।

মনে আছে সেই ছেলেবেলায় বাবার চেয়ে মাকেই ভালোবাসতাম বেশি। বাবা একটু রাগ করলে, কি ধমক টমক দিলে সঙ্গে সঙ্গে মার কাছে গিয়ে নালিশ করতাম। মার বিরুদ্ধে নালিশ করবার কোন উপলক্ষ ঘটেনি।

খাওয়া নিয়ে কোন বিরোধ ছিল না। কিন্তু শোয়া নিয়ে মনের মধ্যে অসন্তুষ্টি থাকত। গোড়ার দিকে একই খাটে আমরা তিনজন শুতাম।

বাবা মা আর এক পাশে আমি।

সেই কোঁদল, সেই একাধিপত্য দাবি।

'মা তুমি আমার দিকে ফিরে শোবে।'

মা হেসে বলতেন, 'তোর দিকেই তো ফিরে শুই পণ্টু। সারারাত তোর দিকে মুখ ক'রে শুয়ে থাকি।'

কিন্তু এ ব্যাপারে মা সদা সত্য কথা বলেন না তা আমি টের পেতাম।

শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে মিটমিট ক'রে তাকিয়ে দেখতাম মা দিব্যি অন্যমুখী হয়েছেন।

কিছুদিন বাদে বাবা বললেন, 'পণ্টুর জন্যে এবার আলাদা বিছানা ক'রে দাও।'

মা আপত্তি ক'রে বললেন, 'তাই কি হয় নাকি? ওর কি এখনই একা শোয়ার বয়েস হয়েছে? ও ভয় পাবে।'

কিছুদিন বাদে এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছেড়ে বাবা নিজেই ঘরের দক্ষিণ দিকে আলাদা খাট পেতে নিলেন।

অসুখ-বিসুখ হলে ডাক্তার ডাকা হত। কিন্তু তাবিজ-কবচের ওপর মার ভরসা বেশি ছিল। হাতে গলায় বহু তাবিজ-কবচ ছেলেবেলায় বহন করতে হত। মনে হত আমিও যেন কর্ণের মত সহজাত কবচ কুণ্ডল নিয়ে জন্মেছি।

কোন একটি ফেলবার কি হারিয়ে ফেলবার জো ছিল না। মার কাছে প্রতিটি কবচই রক্ষাকবচ। কোন না কোন ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক।

মার স্বতন্ত্র চিকিৎসা পদ্ধতিও ছিল। এক একদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যেতে দেখতাম মশারি টানানোই আছে। মা পাশে দাঁড়িয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে আমার বুকের কড়া আস্তে আস্তে ঠেলে দিচ্ছেন।

আমি অবাক হয়ে বলতাম, 'ওকি করছ মা?'

মা বলতেন, 'তোর বুকের কড়া বেড়েছে। এবার সেরে যাবে।'

সেরে যেত কিনা বলতে পারিনে, কিন্তু প্রক্রিয়াটা আমার বেশি পছন্দ ছিল না। ব্যথা লাগত, অস্বস্তি বোধ হত।

কিন্তু পেটের অসুখে মার পথ্য নির্বাচনের ব্যাপারে আমি খুব কৃতজ্ঞ ছিলাম।

ছেলেবেলায় পেটের অসুখ প্রায় লেগেই থাকত। ভাইদিদির হুকুম সারাদিন ভাত বন্ধ। কিন্তু আমার সাবু বার্লি কি ডাবের জল কিছুই সহ্য হত না। চিঁড়ে ধোয়া জল খেলে বমি হয়ে যেত।

মা লুকিয়ে লুকিয়ে সেই পড়ন্ত বেলায় একটি ঘটিতে ক'রে আমার জন্যে ভাত রাঁধতেন। রান্নাঘরের কোণে বসে পরম গোপনে নুন দিয়ে মেখে আমাকে সেই ভাত খাওয়াতেন।

ভাইদিদি টের পেলে এসে রাগারাগি করতেন,'মেজোবউ, তুমি ওকে মেরে ফেলবে।'

মা জবাব দিতেন, 'ফেলি তো ফেলব। ওর ধাত আমি চিনিনে? ভাত না খাওয়া পর্যন্ত ওর পেটে পাক পড়বে না।' আমার তখন মনের অবস্থা মরি তো মরব, ভাত তো আগে খেয়ে নিই।

বেশির ভাগ দিনই মার চিকিৎসা সফল হত। কদাচিৎ ব্যতিক্রম হলে মা বাড়িসুদ্ধ লোকের বকুনি খেয়ে মরতেন।

তখন আমরা দুই অপরাধী ঘরের এক কোণে আশ্রয় নিতাম। সেই নিবিড় আত্মীয়তা, একাত্মতা আর কার সঙ্গেই বা অনুভব করেছি?

বাবার হাতে ক্বচিৎ কখনো কানমলা কি এক আধটা চড় চাপড় খেয়েছি। মার হাতে কোনদিন মার খেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

কিন্তু একদিন আমি ওঁকে দারুণ আঘাত দিয়েছিলাম।

ছোট ভাই কান্দুর সঙ্গে এক চোট মারামারি হয়ে গেল। হেতুটা ঠিক মনে নেই। খেলার সামগ্রীর অধিকার নিয়েই হবে।

মা রাগ ক'রে বললেন, 'ছি ছি, ছোট ভাইকে অমন ক'রে মারতে হয়? তুই তো ভারি নিষ্ঠুর।'

আমি বিষম চটে গিয়ে বললাম, 'ও যে মারল তা তুমি দেখলে না। তুমি কেবল আমাকেই বকছ। বকবেই তো, সৎমা কিনা।'

সঙ্গে সঙ্গে মার গৌরবর্ণ মুখখানা বিবর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। একটুকাল স্তব্ধ হয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে তোকে একথা শিখিয়ে দিয়েছে শুনি? নিশ্চয়ই পিসীঠাকুরুণের কাজ। পিসীর তো আর মরবার জায়গা হোল না। আমার পিঠের কাক হয়ে বসে আছে।'

শাশুড়ী বউয়ে তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। বুঝতে পারলাম ঘোর অন্যায় ক'রে ফেলেছি। শব্দটার মানেও ভালো ক'রে জানিনে। কিন্তু সৎ শব্দটি যে মোটেই সদর্থক নয় তা তৎক্ষণে আমার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। মার সেই বিবর্ণ মুখচ্ছবি কোনদিন ভুলব না।

শুনতে পেয়ে জেঠীমা বকলেন, কাকীমা বকলেন, বাবা কাকা সবাই শাসন করলেন। খানিক বাদে মা-ই এসে আঁচলে চোখের জল মুছিয়ে আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

মার প্রসঙ্গে মনে পড়ে মামা বাড়ির কথা। মামা বাড়ি মধুর হাঁড়ি। সেখানে স্কুলে যাওয়া নেই, পড়তে বসা নেই, শাসন টাসনের বালাই নেই। স্কুলের দিনেও সেখানে ছুটি। আর অফুরন্ত খেলা এবেলা ওবেলা।

মামা বাড়ির গ্রামের নাম মানিকদি। আমাদের সদরদি থেকে মাইল দেড়েক দূরে। মাঝখানে নদীর নাম কুমার। আসলে নদের নাম। কিন্তু নদ শব্দটি শুধু ব্যাকরণের পাতায় আছে। মুখের কথায় সবই নদী। আমাদের গ্রামের সমুখ দিয়ে উত্তরে দক্ষিণে প্রসারিত এই নদীর বাঁকের যেন সীমা নেই। কথায় বলত কুমারের প্যাঁচ। আর কুমারের পারে যারা থাকে তাদের মনও হয় প্যাঁচালো। জানিনে আমি সেই মন পেয়েছি কিনা। কিন্তু কুমার আমার বাল্য কৈশোর যৌবনকে পরোক্ষভাবে সারাজীবনকে জড়িয়ে রেখেছে। 'সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে।'

নদী পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে দেড় মাইল দূরের মামা বাড়ি ছিল যেন এক দেশান্তর যাত্রার মত। বর্ষাকালে যাওয়া ছিল খুব সহজ। নিজেদের ঘাট থেকে নৌকো ছাড়ত আর নদী খাল পেরিয়ে ধানক্ষেত পাটক্ষেতের ভিতর দিয়ে নৌকো গিয়ে ভিড়ত মামা বাড়ির ঘাটে। কিন্তু শুকনোর সময় খেয়া নৌকোয় নদী পেরিয়ে পায়ে হেঁটে মাঠ পার হতে হত। বড় হয়ে অনেকবার হাঁটা পথে মাঠ পার হয়েছি। দুদিকে শস্য ভরা ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে সরু আল। সেই আলের ওপর দিয়ে পথ।

গোড়ার দিকে একদিন মামা বাড়ি যাওয়ার ঘটনাটুকু মনে পড়ে।

আমাদের ওদিকে গরুর গাড়ি ঘোড়ার গাড়ির চল ছিল না। পুরুষদের জন্যে ছিল পদযান, মেয়েদের জন্যে ছিল ডুলির ব্যবস্থা।

পালকি চড়তেন জমিদারেরা কি তাঁদের নায়েব ম্যানেজারেরা। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পালকিতে উঠতো জীবনে মাত্র দুবার। একবার অন্নপ্রাশনের দিন, আর একবার বিয়ের দিন। সাধারণ গৃহস্থ বধূরা ডুলিতে দুলতে দুলতে বাপের বাড়ি যেতেন, শ্বশুর বাড়ি ফিরে আসতেন।

একবার শুকনোর সময় মা বাপের বাড়ি যাবেন ঠিক হোল। খবর পেয়ে রাজকুমার কাহার আর তার ছেলে ডুলি নিয়ে এসে হাজির। কাঠের ফ্রেমে দড়ি দিয়ে বোনা বসবার জায়গা। কাপড় দিয়ে সেই জায়গাটুকুকে ঘিরে নেওয়া হোল। আরোহিনী তার মধ্যে হাঁটু তুলে গুটি গুটি হয়ে বসেন। বাহকেরা একটি সরু বাঁশের মাঝখানে সেই ডুলিটিকে ঝুলিয়ে নিয়ে ছুটতে শুরু করে। মনে হয় তারা একটি কাপড়ের পুঁটলিই বয়ে নিয়ে চলেছে।

রাজকুমার আর তার ছেলে তারাকুমার এসে আমাদের মাঝখানের উঠানে দাঁড়াল। রাজকুমারের গায়ের রং কালো, ভারি রোগা চেহারা। বয়স যে কত তা বুঝবার জো নেই। পালকি আর ডুলি বইতে বইতে কুঁজো হয়ে গেছে। তার ছেলের বয়স পনের যোলোর বেশি নয়। তার কুঁজো বাপের মাথা সে এরই মধ্যে ছাড়িয়ে গেছে।

রাজকুমার বলল, 'দিন মেজোঠাকরুণ, আপনার একখানা শাড়ি টাড়ি দিন।'

মা একখানা পুরোন শাড়ি বার ক'রে দিলেন। সেই শাড়ি দিয়ে তারা ডুলি তৈরী করতে লাগল।

মা আর আমি যাত্রার জন্যে তৈরি হতে লাগলাম। যতদূর মনে পড়ে তখনো আমার পরনে ধুতিই ছিল। হাফপ্যাণ্ট ছিল না। মা মাথা আঁচড়ে দিলেন, জামার বোতাম লাগিয়ে দিলেন, জুতোর ফিতে বেঁধে দিলেন মনে আছে। নিজে পরলেন, লাল পেড়ে সাদা খোলের শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর, পায়ে আলতা, মুখে পান। একে একে গুরুজনদের প্রণাম ক'রে ডুলির মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। ঢুকবার আগে আমার দিকে একবার চেয়ে বললেন, 'যেতে পারবি তো হেঁটে? বুঝে দেখ।'

'পারব মা।'

ডুলিতে ক'রে শুধু মাই যেতে পারেন, ছেলে যেতে পারে না, একেবারেই কোলের ছেলে না হলে।

ভাইদিদি বললেন, 'সত্যিই কি ও তোদের সঙ্গে হাঁটতে পারবে রাজকুমার?'

রাজকুমার বলল, 'ভয় নেই বুড়ো ঠাকুরুণ। আমরা আস্তে আস্তেই হাঁটব। খোকাবাবুর কোন কষ্ট হবে না।'

আমাদের সঙ্গে বয়স্ক আর একজন কে যেন ছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না। তিনি কি মামাদের কেউ নাকি আমাদের কেউ মনে আনতে পারছিনে।

ডিঙ্গি নৌকোয় আমাদের ঘাট থেকেই নদী পেরোলাম। কুমার কখনো অশান্ত উদ্দাম হয় না, কিন্তু বারোমাস জলধারা বয়।

নদী পেরিয়ে সাইমামুকদি মুসলমানদের একখানি ছোট গ্রাম। তারপরেই মাঠ। ডুলীদের পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলাম। যতদূর মনে পড়ে তখন শীতের সকাল। রোদের তাপ কিছু নেই। দুধারের ক্ষেতে রবিশস্য। সবুজ ক্ষেত কলাই মসুরের। সর্ষে ক্ষেতে হলুদ ফুল। আলের ওপর দিয়ে চলেছে ডুলিরা। আমি চলছি পিছনে পিছনে, আমার পাশে বিস্মৃত পরিচয় সেই ভদ্রলোক অবশ্য আছেন। কিন্তু আমি তাঁর দিকে তাকাচ্ছিনে। আমার চোখ সামনের ডুলির দিকে। আর মার চোখ আমার দিকে। মা ডুলির আব্রু সরিয়ে পিছন ফিরে বারবার আমাকে দেখছেন।

কতটুকুই বা পথ। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছে এ পথ যেন আর ফুরোবে না।

থেকে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'আর কতদূর? মামা বাড়ি আর কতদূর?'

জবাব শুনি, 'ওই যে উঁচু বড় ভিটে দেখা যায়। ওই যে তিনটে তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে। ওই তো মানিকদি। আর বেশি দূর নয়।'

মাঝে দু' একবার মায়ের ডুলি নামানো হোত পথের মধ্যে। মুসলমান চাষীদের কাছ থেকে কলকে চেয়ে নিয়ে দুখানি হাতের তালুর মধ্যে সেই কলকে রেখে তামাক খেয়ে নিল রাজকুমার। তার ছেলে তারাকুমার সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে।

আমি মায়ের ডুলির কাছে এগিয়ে গেলাম। মা সেই কাপড়ের পুঁটুলির ভিতর থেকে মুখ বাড়ালেন। হাত বাড়িয়ে আমার পিঠে রাখলেন। বললেন, 'তোর খুব কষ্ট হচ্ছে। কেন যে তোকে এভাবে হাঁটিয়ে আনলাম।'

আমি বললাম, 'না মা। আমার মোটেই কষ্ট হচ্ছে না।'

ডুলিদের কাঁধে চড়েও মায়ের সুখ নেই। আমি যদি কষ্টের কথা বলি তাঁর কষ্ট আরো বেড়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত তালগাছের ভিটা দেখা গেল। বড় ভিটে ছাড়িয়ে গ্রামের ভিতরে ঢুকে বাঁড়ুজ্যে বাড়ির পাশ দিয়ে মায়ের ডুলি মামাবাড়ির উঠোনে এসে নামল।

মামারা দুই ভাই। বড় মামার নাম রাজেন দত্ত, ছোট মামা কেদার দত্ত। বড় মামা বেশ সুপুরুষ। ফর্সা টকটকে রঙ, টিকোল নাক দীর্ঘ চেহারা। খুব আদর করতেন মনে আছে। পশ্চিমের ভিটের ঘরে তিনি থাকতেন। যে তক্তপোশে তিনি শুতেন তার শিয়রের দিকে অনেক পাঁজি পুঁথি স্তূপীকৃত হয়ে থাকত। তিনি ছিলেন ওই অঞ্চলের কায়স্থ সমাজের কুলপতিদের একজন। নিজের জোত জমি দেখতেন আর সমাজের মুরুব্বিগিরি করতেন।

উত্তরের ঘরে থাকতেন ছোট মামা কেদার দত্ত। রুগ্ন ন্যুব্জ চেহারা। শুনেছি বাতব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন। তিনি কথা বলতে পারতেন না, হাঁটতে চলতেও পারতেন না। বড় মামীমা কি ছোট মামীমা তাঁকে খাইয়ে দিতেন। কিন্তু ছেলে মানুষের মত মতলবী ছিলেন ছোট মামা। মাঝে মাঝে কি যে তাঁর হত কিছুই বুঝতে পারতাম না। এক দুর্বোধ্য ক্রোধে ক্ষোভে ভাতের থালা পঙ্গু বিকৃত পাখানা দিয়ে সরিয়ে ফেলে কপাল চাপড়াতেন আর হাউমাউ ক'রে কাঁদতেন। সে কান্নার ভাষা বোঝা যেত না। যেন বলতে চাইতেন, 'আমার কপাল, আমার কপাল।'

খাওয়ানো রেখে ছোট মামীমা ভ্রূ কুঁচকে সরে আসতেন। বিড়বিড় ক'রে বলতেন, 'শুধু কপালের দোষ দিয়ে কী হবে। নিজের দোষেই তো গেলে।'

মা, দিদিমা, বড় মামীমা ছোট মামাকে শান্ত করতে চেষ্টা করতেন।

আমি দূরে দাঁড়িয়ে সভয়ে সবিনয়ে এই দুর্বোধ্য প্রহেলিকা দেখতাম।

একটু বাদে বড় মামা এসে সামনে দাঁড়াতেন। শান্ত চাপা গলায় বলতেন, 'আঃ কেদার অমন কোরো না। পল্টু ভয় পাবে। অমন করতে নেই।'

ভয় আমি পেতাম। কিন্তু সেখান থেকে সরে যেতে চাইতাম না।

ছোট মামা যখন শান্ত থাকতেন আমাকে কাছে ডেকে তাঁর আদর করতে খুব ইচ্ছা হত।

মা বলতেন, 'ভয় কিরে। যা না ছোড়দার কাছে।'

ছোট মামা সস্নেহে আমার গায়ে হাত দিলে আমার গা সিরসির করত। পুরোপুরি ঘৃণায় নয়, পুরোপুরি ভয়েও নয়, কিসে যে বলা শক্ত। অথচ ছোট মামার জন্তে আমার মায়াও হত।

সেই উত্তরের ঘরের কোণায় বাঁড়ুয্যে বাড়ি আর মামা বাড়ির সীমানায় একটি সুন্দর ডালিম গাছ ছিল। সেই গাছের রক্ত রঙা ফুল আর ঈষৎ হলদে হয়ে ওঠা ফলের দিকে আমার ভারি লোভ ছিল।

মাকে চুপি চুপি বলতাম, 'আমাকে একটা ডালিম পেড়ে দাও না মা।'

মা বলতেন, 'ছিঃ, অমন আবদার করে না। এখনো পাকেনি। পাকলে খেয়ো।'

বড় মামা হেসে বলতেন, 'জগো তোর ছেলে কী চায়।'

মা বলতেন, 'কিচ্ছু না বড়দা। ওর বড্ড আবদার।'

বড় মামা বলতেন, 'তবু তো আবদার করবার মত একজনকে পেয়েছিস। আমাদের তো তাও হোল না।'

বড় মামা ছোট মামা কারোরই ছেলেপুলে ছিল না।

ডালিমের আবদার ভুলবার জন্তে মা আমাকে খেলার সঙ্গী জুটিয়ে দিতেন। সঙ্গী নয় সঙ্গিনী। পাশের বাড়িতে বড় মামার এক জ্ঞাতি ভাই আছেন কামিনীমোহন দত্ত। তার মেয়ে দুলী। ভালো নাম বোধ হয় ছিল দুলালী। সেও কম মোহিনী ছিল না। সে আমাকে ফলাকাঙ্ক্ষা ভুলিয়ে অন্যদিকে টেনে নিয়ে যেত।

দুলী বলত, 'আয় পন্টু, খেলবি আয়।'

মামাদের পুকুর পাড়ের ধারে কলা বাগান। গাছে গাছে কাঁদিতে কাঁদিতে কলা ফলে থাকত। কোন কাঁদির রঙ সবুজ। কোন কাঁদির রঙ হলদে। গাছে গাছে তামাটে রঙের মোচা ঝুলে থাকত অগুনতি।

সেখানে দুলী আমাকে নিয়ে ঘরকন্নার খেলা খেলত। ওর রান্নাবান্নার সরঞ্জামের কোন অভাব ছিল না। হাঁড়ি পাতিল বাসন কোসন সব ছিল। মোচার খোলা কেটে কেটে ও তরকারি রাঁধত।

দুলী বলত, 'তুই বর আমি তোর বউ, বুঝলি ?'

এমন অযাচিত বরমাল্য পরবর্তী জীবনে আর জোটেনি। দুলীর গায়ের রং ময়লা,

চুল ছিল কটা। পরনে খাটো ডুরে শাড়ি। সামনের দুটো দাঁত পড়ে গিয়ে আবার উঠি উঠি করছে। এই স্বয়মাগতাকে আমি দিব্যাঙ্গনা জ্ঞান করতাম।

তুলী রান্নাবান্না সেরে মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে আমাকে পরিবেশন করতে বসত। পরম সোহাগে বলত, 'ওগো হাত গুটিয়ে বসে রইলে কেন ? খাও এবার।'

বালি দিয়ে পরমান্ন তৈরি হয়েছে। কিন্তু সে বালি গুড়ের চেয়েও মিষ্টি।

মা এসে রসভঙ্গ করতেন, 'তোরা এখানে ? এই জঙ্গলের মধ্যে ? আমি সারাবাড়ি খুঁজে হয়রান।'

আমি বলতাম, 'মা, তুলী আজ আমার বউ হয়েছে।'

মা বলতেন, 'তুলী কিরে, তুলীদিদি।'

আমি সেই অনুশাসনে কান দিতাম না। বলতাম, 'মা, তুমি ওকে বউমা বলে ডাকবে তো ? দিদিমা যেমন মামীমাদের ডাকেন।'

মা মুখ টিপে টিপে হাসতেন, 'খুব পেকে গেছ। তোর বউকে বউমা বলতে আমার বয়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে এল। চল, মুখ হাত ধুইয়ে দিই গিয়ে।'

আমাদের দাম্পত্যলীলায় ওপর যবনিকা পড়ত।

বাবা

গায়ে কালো রঙের কোট, পরনে ধুতি, পায়ে ফিতে বাঁধা কালো রঙের জুতো এক ভদ্রলোক সকালবেলায় কাজে বেরোবার আগে স্ত্রীপুত্রের কাছ থেকে হাসি মুখে বিদায় নিচ্ছেন—বাবার এই রকম একটি ছবিই আমার বাল্যস্মৃতির দূরতম দিগন্তে ফুটে ওঠে।

আমি দক্ষিণের ছোট বারান্দায় মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে আছি। তাঁর আঁচল আমার মুঠোয়। ঈষৎ পুষ্ট গোঁফের আড়ালে বাবার মুখে পরিতৃপ্তির হাসি।

তিনি বললেন, 'অমন করে লুকোচ্ছিস কেন পন্টু ? আয় সামনে আয়।'

সে কথা শুনে আমি আরো পিছনে সরে দাঁড়ালাম।

বাবা মার দিকে তাকালেন, 'কী ছেলেই একখানা তৈরি করেছ মেজো বউ। একেবারে আঁচল ধরা হয়ে রইল।'

মা বাবার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন,'প্রথম প্রথম আঁচল অমন অনেক মহাপুরুষই ধরে। তাতে কী হয় ?'

দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। নিঃশব্দে তাঁদের মধ্যে কী কথা হোল শুনতে পেলাম না। শুনতে পেলেও কি তখন বুঝতে পারতাম?

বাবা বললেন, 'মেজো বউ, আমার খুতি দিয়ে যাও।'

খয়েরী রঙের ছোট থলি। তাতে নোট আর রুপার টাকা থাকত, খুচরো পয়সাও থাকত। সেই থলিকে বলা হত খুতি। চামড়ার মানিব্যাগও বাবার ছিল। পরে তাঁর একটি পুরোন ব্যাগের আমি উত্তরাধিকারী হয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাগের চেয়ে বাবা খুতিই বেশি ব্যবহার করতেন। মক্কেলদের মামলা মোকদ্দমার খরচ—কাঁচা টাকা পয়সা রাখবার পক্ষে থলিতেই সুবিধে হত বেশি।

ঘরের মধ্যে পশ্চিমের দিকের বেড়া ঘেঁষা বড় একটি কাঠের আলমারি।

আঁচলের চাবি দিয়ে আলমারি খুলে মা টাকার থলিটি বের ক'রে বাবার হাতে তুলে দিলেন।

কোটের পকেটে থলিটি ভরে রাখবার আগে বাবা সুতোর বাঁধনটি খুলে ফেললেন। তারপর ভিতর থেকে একটি একআনি বের ক'রে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, 'এই নাও।'

আমি আনিটি নিয়ে আবার সরে দাঁড়ালাম।

মা বললেন, 'আমাকে কিছু দিয়ে গেলে না?'

'তোমাকে আবার কী দেব। সবই তো দিয়েছি।'

মা বললেন, 'বাজে কথা। নিজে থেকে তুমি কীই বা দাও। আমি জোর ক'রে কেড়ে নিই, তাই।'

বাবা বেরিয়ে গেলেন। দেড় মাইল দূরে ভাঙ্গা শহর। সেখানে উকিলের সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করেন। এ সব বৃত্তান্ত পরে জেনেছি।

সেই ছেলেবেলায় বাবা বাড়িতে না থাকলেই যেন বেশি স্বস্তি বোধ করতাম। যেদিন শুনতাম রাত্রে বাবা বাড়ি ফিরবেন না, জমিজমা তদারকের কাজে মানিকদি যাবেন—সেদিন মনে মনে বেশ খুশি হতাম।

অথচ বাবা তো শাসন করতেন না, আদরই করতেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ। কেউ কেউ তাঁকে ভয় করত বইকি, কিন্তু আমার কাছে তিনি ছিলেন স্নেহের আধার। আমি যতবার বাবা বলে ডাকতাম তার চেয়ে বেশিবার তিনি আমাকে পিতৃসম্বোধন করতেন। তবু প্রথম প্রথম তাঁকে এড়িয়ে চলার ইচ্ছা আমার মন থেকে নড়তে চাইত না।

তারপর কী ক'রে যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল বলা শক্ত। দিনক্ষণ প্রসঙ্গ

কিছুই মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে আমি কখনো তাঁর বুকের সঙ্গে কখনো পিঠের সঙ্গে। পাশে শুয়েই তিনি বলতেন, 'আমাকে জড়িয়ে ধরে শোও।'

আত্মজকে শিশু বয়সেই এমন একাত্ম করা যায়। বয়স বাড়ে আর অনাত্মীয়তা বাড়ে।

সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি আমাকে সংস্কৃত শ্লোক শেখাতেন।

প্রথমে সূর্যস্তব

জবাকুসুমশঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্॥

তারপর গুরু বন্দনা

অজ্ঞানাতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

তারপর পিতৃপ্রণাম

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥

এমনি আরো অনেক ছিল। শ্লোকগুলির অর্থ তখনো বোধগম্য হত না। বাবা যে সব বুঝিয়ে দিতেন তাও নয়। পরে বড় হয়ে জেনেছি তাঁর শেখানো শ্লোকগুলি সর্বাংশে বিশুদ্ধ ও ব্যাকরণসম্মত ছিল না। কিন্তু সেই যে ছন্দোময় ধ্বনির ভিতর দিয়ে দিন শুরু হত তার যেন মাধুর্যের শেষ ছিল না। দান আর গ্রহণ, প্রত্যাশা আর অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতি যেন এক একটি শ্লোকে গড়ে উঠত।

কোনদিন তিনি শুয়ে শুয়ে গান গাইতেন। বেশির ভাগই প্রাচীন বাংলা গান। শুনে শুনে অনেক গানের পদই আমার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। মনে আছে কিনা দেখবার জন্যে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'বলতো তারপরে কি।'

আমি পদ বলে দিতাম। তিনি তাতে স্বরসংযোগ করতেন। কিন্তু আশ্চর্য, কোন-দিনই তিনি আমাকে গান শেখাননি। কি গাইতে বলেননি। আমি হয়তো শৈশব থেকেই কণ্ঠহীন ছিলাম।

কিন্তু আমি গাইতে পারিনে বলে বাবার মনে কোন উৎকণ্ঠা ছিল না। পরে আমার আরো হাজার রকমের অক্ষমতা তাঁকে উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছিল।

সবাই যা পারে আমি তা পারিনে। গাঁয়ের ছেলেরা কত অল্প বয়স থেকে গাছে ওঠে, নৌকো বায়, তারা কিরকম চালাক চতুর আটপিঠে হয়, আমি তেমন হলাম না।

বুদ্ধির দিক থেকেও জড়তা ধরা পড়তে লাগল। আমি অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করি,

আমি আমার বাবার মত নই, ভাইদের মত নই, বন্ধুদের মত নই, তবে কার মত ? আমি ঈর্ষাতুর চোখে দেখি বাবা আমাকে দুর্বল বলে আদর করেন, কিন্তু কদর করেন কান্দুকে। তার বুদ্ধির দীপ্তিতে বাবা দীপ্ত হন।

মুসলমান পাড়ার বসির শেখ বেশ সম্পত্তি প্রতিপত্তিশালী চাষী। মামলা মোকদ্দমায় পরামর্শ নিতে প্রায়ই বাবার কাছে আসে। গালভরা চাপ দাড়ি। সে একদিন হাসতে হাসতে বলল, 'বাপকা বেটা সেপাইকা ঘোড়া। ছেলের জন্যে এত কাণ্ড করলেন। ছেলে কিন্তু আপনার মত হয়নি। মেজোকর্তা।'

বাবা ম্লান হেসে বলেছিলেন, 'সবাই কি আর একরকম হয় ?'

কিন্তু মৃদুকণ্ঠের এ সান্ত্বনা শুধু মনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্যে, জোর গলায় অপরের কাছে জাহির করবার জন্যে নয়।

তাঁর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আমার বেলায় পুরোপুরি সার্থক হয়নি, একথা আমি তখন থেকেই বুঝতে পারতাম। শুধু বাবা নয়, আত্মীয়-স্বজন সবাইর আচরণে আমি অনুভব করতাম আমি যেন কেমন কেমন। সবদিক থেকে আমি নিম্নসাধারণ। সেই বোধ আমাকে পাঁচজনের সঙ্গ এড়াতে শেখাল। বুঝিয়ে দিল ঘরের কোণ আর নিজের মন ছাড়া তোমার কেউ নেই।

অথচ আদর আপ্যায়ন সতর্কতা অফুরন্ত। যেন পড়ে না যাই, চোট না পাই, ব্যথা না লাগে গায়ে। সব রক্ষাকবচই শুধু দেহরক্ষী। মনের কথা কে শোনে।

দিদি ভাইর মুখে মাঝে মাঝে, বাবার নিজের মুখেও তাঁর সাহস দায়িত্ব বোধ বিচক্ষণতার কাহিনী শুনতাম। তিনি নিম্ন প্রাইমারী মাত্র পাশ করেছেন। তারপর দারিদ্র্যের জন্যে সংসারের চাপে আর লেখাপড়া করতে পারেননি। সংসারই ছিল তাঁর বিদ্যালয়। যা কিছু শিখেছেন সব নিজের আগ্রহ আর অধ্যবসায় থেকে। উকিলের সেরেস্তায় কাজ করেন, কিন্তু মক্কেলরা উকিলের চেয়ে তাঁর ওপর বেশি নির্ভর করে। মুসাবিদার মুন্সীয়ানায় সুখ্যাতি করে সবাই। তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি পাড়াপড়শী আত্মীয় স্বজনের মধ্যে স্বীকৃত। জায়গা জমি জরীপের কাজে, বিবাদ বিরোধে শালিসীর কাজে তাঁর নৈপুণ্যের কথা সবাই জানে। আশেপাশের দশ বিশ থানা গ্রামের লোক বাবাকে চেনে। তাঁরা সততার সঙ্গে যোগ্যতার কথা স্বীকার করে। কিন্তু আমি তাঁর দ্বিতীয় গুণ পাইনি। দ্বিতীয় ছাড়া প্রথম গুণ তো নিতান্তই নিরবয়ব।

বৈষয়িকতার সঙ্গে তাঁর শিল্পানুরাগ শিল্প সৃষ্টির ক্ষমতা অদ্ভুতভাবে মিশেছিল। তিনি গান গাইতে পারতেন, অভিনয় করতে পারতেন, কাব্য উপন্যাস পড়তে

ভালোবাসতেন। শুধু দলিলের মুসাবিদাই করতেন না, বন্ধুবান্ধবদের কাছে চিঠিপত্র লিখতেও তাঁর বেশ উৎসাহ ছিল। পত্রই ছিল তাঁর সাহিত্য।

বড় হয়ে একবার আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এসব উচ্চাঙ্গের গান আপনি কোথায় শিখলেন? কোন ওস্তাদের কাছে কি যাতায়াত করতেন?'

বাবা জবাব দিয়েছিলেন, 'না বাবা, ওস্তাদ কোথায় পাব? আমার কি সেই সময় ছিল, নাকি তেমন পয়সা ছিল? চৌদ্দ বছর বয়সে চৌদ্দটি পোষ্য ঘাড়ে। তারপর তো সংসারের জোয়াল টেনেই চলেছি। যেটুকু লেখাপড়া সব নিজের চেষ্টায়। গান বাজনাও তাই। একেবারেই একলব্য।'

কেউ কেউ আছেন সামান্য সুযোগকেও বেশ কাজে লাগাতে পারেন। প্রতিকূল পরিবেশেই কারো কারো শক্তির স্ফুরণ বেশি হতে দেখা যায়। কে জানে মানুষের এই ক্ষমতা কতখানি অর্জিত, কতখানি বা তাঁর জন্মসূত্রে পাওয়া। আমার প্রবৃত্তি প্রবণতার সবখানি কি আমারই? আমি আমার নিজের হাতে গড়া এ গর্ব আমার নেই। পাঁচজনের হাতের ছাপ স্পষ্ট দেখছি গায়ে পিঠে।

লেখাপড়া আরম্ভ হয়ে গেল। শ্লোক শেখাবার ভার নিজের হাতে রেখে বর্ণ-পরিচয়ের জন্যে বাবা অন্য শিক্ষক নিয়োগ করলেন।

প্রথম শিক্ষা গুরু হলেন অক্ষয়কুমার শীল। আমাদের প্রতিবেশী। দুই বাড়ির মাঝখানে একটি এঁদোপুকুর, চারদিকে বাঁশের ঝাড়। তারই ভিতর দিয়ে যাতায়াতের পথ। সেই পথে আমাদের বাড়িতে আসতেন অক্ষয় মাস্টার। গায়ের রঙ কালো। ছিপছিপে চেহারা। বয়স কত বুঝবার জো নেই। বাবার চেয়ে বছর তিনেকের বড় শুনেছি। বাবা তাঁকে মাস্টার বলে ডাকেন। তিনি ডাকেন 'ভাই মহেন্দ্র।' দু' ভাইয়ের মধ্যে প্রতিবেশী সুলভ রেষারেষি যেমন আছে, সদ্ভাবেরও তেমনি অভাব নেই।

বাবা বললেন, 'মাস্টার, তোমার হাতে দিলাম পন্টুকে। দক্ষিণা কি দিতে হবে বল?'

অক্ষয় মাস্টার বললেন, 'কী যে বল মহেন্দ্র। তোমার কাছ থেকে টাকা নেব তবে তোমার ছেলে পড়াব? আমাদের কি সেই সম্পর্ক? তবে কোর্ট কাছারিতে দরকার টরকার যদি কখনো হয় তুমি উদ্ধার ক'রে দিয়ো ভাই।'

এই বার্টার সিসটেমে বাবা যে খুব খুশি হলেন তা নয়। তবে তখনকার মত ব্যবস্থাটা মেনে নিলেন।

অক্ষয় মাস্টারের নিজের স্কুল আছে শ্রীধরচরে। গাঁয়ের লোকের রসনায় ছিলাদরচর। আমাদের গ্রাম থেকে মাইল দেড়েক উত্তরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের আপার প্রাইমারি স্কুল। অক্ষয় শীল সেই স্কুলের হেডমাস্টার।

স্কুলের কাজ ছাড়াও সকাল সন্ধ্যা দু'বেলা টিউশনি করেন মাস্টার মশাই। ছাত্রদের বাড়িতে গিয়েও পড়ান আবার নিজের বাড়িতে বসেও পড়ান।

আমার সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা হোল।

উত্তরের ঘরের বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে তার ওপর ছাত্র আর মাস্টারের অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলে। বাবা আর কাকা তাই দেখে মৃদু হেসে কাছারিতে বেরিয়ে যান। কান্দু বাপ্পু খেলাধুলোয় মত্ত। ওদের তখনো আমার মত এই বন্দীদশা আসেনি।

যেদিন মাস্টার মশাইর আমাদের বাড়িতে আসবার সময় হয় না সে-দিন শ্লেট-পেনসিল আর বর্ণপরিচয় নিয়ে আমি নিজেই গুরুগৃহে গিয়ে হাজির হই। দিদিভাই একা যেতে দেন না। নিজে সঙ্গে ক'রে রেখে আসেন। মাঝখানে একটা পুকুর আছে। পড়েটরে যেতে পারি। বাঁশ বন থেকে শেয়ালটেয়াল বেরোনও বিচিত্র নয়।

মাস্টার মশাইর বাড়িও এক পাঠশালা। সেখানে ওঁর পুত্রেরাও তখন ছাত্র। তাছাড়া আরো অনেক ছাত্র এসে জুটেছে। আমি তাদের পিছনে গিয়ে বসতাম। তারপর সেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতাম।

মাস্টার মশাইর মন বড় চঞ্চল। পড়াতে পড়াতে প্রায়ই উঠে যেতেন। সাংসারিক কাজে কোন অব্যবস্থা দেখলে স্ত্রীকে কি বাড়ির অন্য লোকজনকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতেন। আবার বাইরের ঘরে গিয়ে মিষ্টি গলায় দু-চার কলি পদাবলীও গেয়ে আসতেন। বইয়ের দিকে চোখ রেখে আমি সেই গানের দিকে কান রাখতাম।

মাস্টার মশাইর বার-বাড়ির সেই ঘরখানায় কীর্তনিয়াদের ভিড় থাকত। খোল করতাল বাজত। অক্ষয় মাস্টার কীর্তনের দলেরও মাস্টার ছিলেন।

তারপর একদিন এক কাণ্ড ঘটল।

সেদিন বেশ একটু বেলার দিকে মাস্টার মশাই আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'কী করছিস বসে বসে? লিখেছিস?'

বললাম, 'হুঁ।'

শ্লেটখানা হাত থেকে টেনে নিয়ে তিনি বললেন, 'কই দেখি।'

তারপর খুশি হয়ে বললেন, 'বাঃ এই তো হয়েছে।'

হঠাৎ মাস্টার মশাই অতগুলি ছেলের সামনে আমাকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, 'শ্লেট পেনসিল শক্ত ক'রে ধরে রাখ। পড়ে যায় না যেন।'

তারপর তিনি সেই বাঁশ ঝাঁড়ের ভিতর দিয়ে পুকুরের পাড় দিয়ে দ্রুত পায়ে আমাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। দূর থেকে ডাকতে ডাকতে এলেন, 'মহেন্দ্র, ও ভাই মহেন্দ্র।'

বাবা সেরেস্তায় বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী মাস্টার, কী হয়েছে।'

মাস্টার মশাই বললেন, 'পন্টু ক খ লিখতে শিখেছে।'

আমি তখন কোল থেকে নামবার জন্যে ব্যাকুল। কিন্তু মাস্টার মশাই আমাকে নামতে দিচ্ছেন না।

আমার হাতের শ্লেটখানায় বাবা একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাস্টার মশাই'র দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ক শুধু লিখতেই শিখেছে? তোমার ছাত্র ক দেখে কেষ্ট বলে কাঁদতে শেখেননি?'

অক্ষয় মাস্টারের ভক্তিরসের আতিশয্য নিয়ে বাবা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করতেন। তা শুধু পরিহাস। উপহাস নয়।

মাস্টার মশাই কোন জবাব দিলেন না। হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি কোল থেকে নেমেই ছুটে চলে যাচ্ছিলাম, বাবা বাধা দিয়ে বললেন, 'ও কি, যাচ্ছিস কেন। জ্যেঠামশাইকে প্রণাম কর, পায়ের ধুলো নে।'

প্রথম লেখকের সেই প্রথম অভ্যর্থনা।

নিরক্ষরতা থেকে সাক্ষরতায় উত্তরণ। শ্লেট-পেনসিলের পর ক্রমে কাগজ-কলমও হাতে এল। তারপর কত কীই তো লিখলাম। কিন্তু সব লেখাই সেই শ্লেটের লেখা। লেখা আর ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলা। নিজের যদি মুছতে মমতা হয়, অদৃশ্য নির্মম হাত অসংখ্য রয়েছে।

শিলালিপি লিখতে আর ক'জনে আসে। তবু যে-কোন লিপিকরেরই অক্ষরের পর অক্ষর রচনায় নিজস্ব আনন্দ আছে। অক্ষয় মাস্টারের আশীর্বাদ সেখানে অফুরন্ত।

বছরখানেক কি বছর দুই বাদে মাস্টার মশাই বললেন, 'ওকে এবার আমার স্কুলে ভর্তি ক'রে দাও মহেন্দ্র।'

বাবা বললেন, 'তোমার স্কুল তো বহুদূরে। দেড় মাইল পথ রোজ হেঁটে যাওয়া আসা। ও কি পারবে?'

অক্ষয় মাস্টার বললেন, 'খুব পারবে। ওই বয়সী কত ছেলে যায়। আমার ছেলেরাও তো পড়ে। তুমি ভেব না। আমি ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসব।'

গাঁয়ের মধ্যে কাছেই আর একটি প্রাইমারী স্কুল আছে। পোস্ট অফিসের কাছে রায়বাড়িতে সেই স্কুল বসে। সেখানেও দুজন মাস্টার, মতি গুহ আর কার্তিক নাগ। নাগমশাই পোস্টমাস্টারও। স্কুলে প্রতাপ-প্রতিপত্তি তাঁরই বেশি। ছেলেরা তাঁকে খুব

ভয় করে। পোস্ট অফিসে থাম পোস্টকার্ডের ওপর যেমন সশব্দে তাঁর হাতের সীল পড়ে, কচি কচি ছেলের গালে তেমনি চড়, এবং পিঠেও সজোরে তেমনি কিল পড়ে।

মতি গুহ অনেক ঠাণ্ডা মেজাজের। কিন্তু কার্তিক নাগের ক্লাসগুলি ডিঙিয়ে তবে মতি মাস্টারের এলাকায় পৌঁছতে চায়।

দিদিভাই বললেন, 'না-না, কার্তিক মাস্টারের হাতে দিয়ে দরকার নেই। তার চেয়ে আমাদের অক্ষয়ই ভালো। তাছাড়া স্কুলে পাঠাবার দরকার কি। আরও ছু-এক বছর বাড়িতে পড়ুক না।'

কিন্তু অক্ষয় মাস্টার আমাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব। আমিও তাই চাই। বাড়িতে পড়া কি আর পড়া? স্কুলে না পড়লে কি আর ছাত্র বলে পরিচয় দেওয়া যায়? প্রেস্টিজ থাকে? পাড়ায় আরও কত ছেলে স্কুলে পড়ে। আমিও যাব না কেন?

বাবা অনুমতি দিলেন, 'আচ্ছা নিয়ে যাও স্কুলে। কিন্তু মাস্টার খুব সাবধান। ও কিন্তু ভারি নরম। আর পাঁচটি ছেলের মত নয়।'

অক্ষয় মাস্টার বললেন, 'সেইজন্যেই ওকে ছেড়ে দিতে হবে মহেন্দ্র। পাঁচজনের সঙ্গে না মিশলে কি আর পাঁচজনের একজন হওয়া যায়? তুমি ভেব না ভাই, আমি ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব, আবার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাব। তোমার কোন চিন্তা নেই।'

প্রথম প্রথম তাই যেতাম। মাস্টার মশাইর সঙ্গেই বই-শ্লেট নিয়ে যেতাম স্কুলে। সাড়ে দশটা-এগারোটার আগে স্কুলে পড়ানো আরম্ভ হত না। বাড়ির কাজকর্ম সেরে ছেলেদের প্রাইভেট পড়িয়ে, কীর্তনের দলকে তালিম দিয়ে স্কুলে পৌঁছতে মাস্টার মশাইর আরও বেলা হত।

আমার ক্লাসের ছেলেরা বলত, 'তুই এত দেরি ক'রে আসিস যে?'

আমি বলতাম, 'মাস্টার মশাই যে দেরি ক'রে আসেন।'

'তিনি আর তুই? তিনি কি তোর সঙ্গে পড়েন?'

কী ক'রে ওদের বুঝাই তিনি সহপাঠী নন কিন্তু সহযাত্রী।

বই-শ্লেট হাতে নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতাম। প্রথমে নদীর পাড় দিয়ে ঢালু পথ। ঝোপঝাড়, আমবাগান, বাঁশবাগান, ফাঁকে ফাঁকে গৃহস্থের বসতি। বাড়ির উঠোনে কাজ করতে করতে বউরা ঘোমটার ফাঁকে অচেনা পথিকদের দিকে এক পলক তাকিয়ে নেয়।

তারপর কাপুড়ে সদরদি ছাড়িয়ে আমরা উঠে পড়তাম জেলা বোর্ডের উঁচু বাঁধানো রাস্তায়। অক্ষয় মাস্টারের হাঁটার বেগ আরও বেড়ে যেত। রোগা শীর্ণ ইক্ষুদণ্ডের মত চেহারা। কী জোরেই না হাঁটতে পারেন মাস্টার মশাই। আমি তাঁর সঙ্গে পারব কেন?

অনেক পিছনে পড়ে থাকতাম। কম্পীট করার জন্য আমাকে ছুটতে হত। একদিন তো আছাড় খেয়ে পড়ে নতুন কেনা শ্লেটখানাই ভেঙে ফেললাম। পকেটের পেনসিল কোথায় যে গড়িয়ে পড়ল তার আর খোঁজ পেলাম না।

মাস্টার মশাই থেমে দাঁড়ালেন। ফিরে এসে গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিলেন। তারপর হেসে সস্নেহে পিঠে হাত রেখে বললেন, 'অত দৌড়চ্ছিস কেন। আস্তে আস্তে আয়। তুইতো পথ চিনে গেছিস। হ্যাঁরে কোথাও লাগেনি তো?'

আমি কাঁদো কাঁদো ভাবে বললাম, 'না। কিন্তু শ্লেট যে ভেঙে গেল।'

মাস্টার মশাই বললেন, 'তাতে কী হয়েছে। নতুন আর একখানা কিনে দেব।'

ভরসা পেয়ে আমি আবার তাঁর পিছনে পিছনে হাঁটতে শুরু করতাম। ডানদিকে রোদে ভরা আদিগন্ত মাঠ। বাঁয়ে চাষী মুসলমানদের বসতি। বাড়ির ভিতর থেকে লাল ঝুঁটিওয়ালা মোরগগুলি ছুটে ছুটে রাস্তায় চলে আসত।

স্কুলে গিয়ে প্রথমে একটু হতাশ হয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম বাড়িতে যেমন পড়েছি স্কুলেও তেমনি অক্ষয় মাস্টার মশাইর ক্লাসেই আমি পড়ব। কিন্তু গিয়ে দেখলাম অন্য ব্যবস্থা। অক্ষয় মাস্টার ছাড়াও আর একজন মাস্টার মশাই অছেন স্কুলে। তাঁর বয়স অল্প। ছিমছাম চেহারা। মুখখানা বেশ হাসিখুশি। তাঁকে আমরা বলতাম ছোট মাস্টার। তিনি নিচের ক্লাসগুলিতে পড়াতেন। বড় মাস্টার আর এক ঘরে বড়দের ক্লাস নেন।

ছোট মাস্টারের ঘরে এসে আমি বললাম, 'আমি এ ঘরে পড়ব কেন? আমি অক্ষয় মাস্টারের ছাত্র। আমি ওই ঘরে গিয়ে পড়ব।'

আমাদের ক্লাসের একটি ছেলের নাম দীনবন্ধু। বাজারের ওপর তাদের বাসা। ভারি তুখোড় ছেলে। সে আমার মুখের কাছে এসে মুখ ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে বলল, 'তোর তো ভারি আশারে। তুই কি ডবল প্রমোশন পেতে চাস? আগে এ-ঘর থেকে পাশ কর, তারপর তো ও-ঘরে যাবি।'

ছোট মাস্টার মশাইও ভালোই পড়াতেন। তিনি সাহিত্য পড়াতেন, অঙ্ক কষাতেন। আবার ড্রয়িং মাস্টারও তিনি ছিলেন। ব্লাকবোর্ডে চক খড়ি দিয়ে চমৎকার টিয়ে পাখি আঁকতেন।

তাঁর নাম মনে করতে গিয়ে দেখি নাম তাঁর কোনদিন আমরা শুনিইনি। ছোট ছোট ছাত্রদের কাছে ছোট মাস্টারই ছিল তাঁর একমাত্র পরিচয়।

এতদিন বাদে তাঁর মুখের আদল, দেহের গড়ন আমার কাছে ঝাপসা হয়ে গেছে। তবে একটি দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে।

সেদিন যতদূর মনে পড়ে অক্ষয় মাস্টার মশাই স্কুলে আসেননি। তাঁর ঘরের ছেলেরা মহা আনন্দে হই চই করছে। সারাটা দিনই তাদের টিফিন। আমাদের টি.ফন বড় অল্প সময়ের জন্যে।

ছোট মাস্টার মশাই সেই টিফিনের সময় আমাকে ডেকে বললেন, 'খোকা শোনো।'

একটু অবাক হলাম। এখন তো মাস্টার মশাই-এর কথা শোনবার কথা নয়। এতক্ষণ ধরেই তো শুনেছি।

বললাম, 'বলুন।'

তিনি বললেন, 'এখানে নয়, বাইরে চল।'

আমি ওঁর সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। স্কুলটি ফাঁকা জায়গায়। গ্রামের বাইরে। কিন্তু একেবারে মাঠের মধ্যে নয়। চারদিকে গাছ-গাছালি আছে। পিছনে ছোট একটি পুকুর। তার পাড়ে সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো।

ছোট মাস্টার আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। সামনে নিয়ে বসালেন। বাবার নাম ক'রে বললেন, 'তুমি তাঁর ছেলে?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তিনি তো চমৎকার গাইতে পারেন।'

'আপনি জানলেন কী ক'রে?'

'বা রে, সেদিন তাঁর গান শুনলাম। থিয়েটার দেখলাম কালীবাড়ির স্টেজে। চন্দ্রগুপ্ত। তিনি সেজেছিলেন অন্ধগায়ক। গাইলেন ঐ মহাসিন্ধুর ওপর হতে কী সঙ্গীত ভেসে আসে। চমৎকার গলা।'

পিতৃপ্রশংসায় আমি স্মিত মুখে চুপ ক'রে রইলাম।

হঠাৎ মাস্টার মশাই বললেন, 'তুমি একটা গান গাও।'

আমি বললাম, 'গান তো আমি জানি নে।'

'তুমি জানো। আমি শুনেছি।'

'কার কাছে শুনেছেন?'

'শুনেছি। গাওনা, লজ্জা কি।'

বিব্রত হয়ে বললাম, 'সত্যিই আমি গান জানিনে স্যার।'

তিনি বললেন, 'মুখ উঁচু করোতো, ওই তো তোমার গলায় তিল আছে?'

'তাতে কি!'

তিনি বললেন, 'যার গলায় তিল থাকে সে গাইতে পারে।'

আরো একটু অনুরোধ উপরোধ চলল। কিন্তু কিছুতেই যখন আমি গাইলাম না, তিনি হতাশ হয়ে উঠে পড়লেন, বললেন, 'চল তাহলে স্কুলে ফেরা যাক।'

আমি সেদিন বিব্রত হয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু সেই সঙ্গে মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটু আনন্দও ছিল। গাইতে না পারলেও অন্তত একজন আমাকে গায়ক বলে জেনেছেন। আমি যে পারিনে বলে গাইনি এ কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করেন নি।

বাড়িতে এসে মার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা বলেছিলাম।

'আমার গলায় তিল আছে মা। আমি তাহলে সত্যিই একদিন গাইতে পারব। কী বলো?'

মা হেসে বলেছিলেন, 'পারাতো উচিত। পারবি।'

কিন্তু কারো প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। সব তিলকণ্ঠই কি আর গীতকণ্ঠ হয়?

দু' বছর পরেই অক্ষয় মাস্টারের স্কুল থেকে বাবা আমাকে ছাড়িয়ে আনলেন। ছোট মাস্টারের ঘর থেকে আর বড় মাস্টারের ঘরে যাওয়া হোল না।

আমি এসে ভর্তি হলাম আমাদেরই গাঁয়ের এম. ই. স্কুলে। মিডল ইংলিশ স্কুল। সেখানে ওয়ান টু নেই। একেবারে থ্রি থেকে শুরু।

প্রাইমারী স্কুলে চার বছর থাকলে অনর্থক সময় নষ্ট।

অক্ষয় মাস্টার অপ্রসন্ন হয়ে বললেন, 'মহেন্দ্র, কাজটা ভালো করলে না ভাই। তোমার ছেলে কাঁচা রয়ে গেল। গোড়ায় যারা কাঁচা থাকে তারা কোনদিন আর পাকে না। আমার স্কুলে থাকলে আমি ওকে বৃত্তি পরীক্ষার জন্যে তৈরি ক'রে দিতাম। জানো প্রতি বছর আমার স্কুল থেকে অন্তত একটি ক'রে ছেলে বৃত্তি পায়। কোনবার দু'টিও পায়। কোন বছরই বাদ যায় না।'

কিন্তু বাবার চিত্তবৃত্তি তখন অন্যরকম। তিনি বৃত্তির কথায় কান দিলেন না। বিদ্যাটা বয়সের অনুপাতে না হলে মানায় না। বয়সের তুলনায় নিচু ক্লাসে পড়লে কি ছেলে কি বাপ মা কারোরই কি কোন মান থাকে?

পুরোন স্কুল ছেড়ে আসতে আমার মনে একটু কষ্ট হয়েছিল। দীনবন্ধু প্রথম প্রথম আমার পিছনে লাগলেও শেষদিকে তো বন্ধুই হয়ে উঠেছিল। আরো কত বন্ধু ছিল ক্লাসে। তাদের আজ নামও মনে নেই, মুখও ভুলে গেছি। নতুন স্কুলে ভর্তি হয়ে পুরোন স্কুল ছেড়ে আসার দুঃখ ভুলে গেলাম। এই ক্ষণভঙ্গুরতা শুধু বাল্য প্রণয়ের ধর্মই নয়, সব প্রণয়ের সঙ্গেই তা জড়িয়ে আছে।

এম. ই. স্কুলে শুধু দুজন মাস্টার নয় চারজন মাস্টার। কখনো বা পাঁচজনও থাকেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিষয় বদলায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় মাস্টার বদলায়। একজনই সব পড়ান না, সব পড়া নেন না। এ স্কুলের কৌলীন্য আলাদা।

নতুন বিধি ব্যবস্থায় নতুন বুক লিস্ট। নতুন নতুন বই। সব বই আবার গাঁয়ের বইয়ের দোকানে পাওয়া গেল না। কলকাতা থেকে ভি. পি.তে বই এল। প্যাকেটে আমার নাম লেখা। কেয়ার অফ অবশ্য বাবার। পোষ্ট অফিসে গিয়ে টাকা দিয়ে ভি. পি. খালাস ক'রে নিয়ে এলাম। বাবা কি কাকা সঙ্গে গিয়েছিলেন ঠিক মনে নেই কিন্তু আমি যে বড় হয়েছি, পাঠশালা থেকে ইংরেজী স্কুলে এসেছি, ছাত্র হিসেবে কত গুরুত্ব বেড়ে গেছে—সে গৌরব কি ভোলবার ?

স্কুল আমাদের বাড়ির কাছেই। শুকনোর সময় হেঁটে যেতে মাত্র পাঁচ সাত মিনিট লাগে। কিন্তু বর্ষার সময় অসুবিধে। তখন নৌকোয় যেতে হয়।

অবশ্য ঘাটে আমাদের নৌকো থাকে, চাকরও থাকে। তখন অনাথ ছিল কর্ণধার। সেই আমাদের স্কুলে দিয়ে আসত আবার 'ছুটি হলে নৌকোয় ক'রে নিয়ে আসত। বর্ষার সময় এমনই স্কুলের ঘণ্টা আমাদের খালের ঘাট থেকে শোনা যেত।

সেদিন এক কাণ্ড হোল। আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস ঠিক মনে নেই। থই থই বর্ষা। ঘাটে নৌকো আছে কিন্তু চাকর নেই। অনাথকে যেন কোন কাজে পাঠানো হয়েছে। এদিকে আমার স্কুলের সময় বয়ে যায়।

আমি মনে মনে বেশ খুশি। আজ আর স্কুলে যেতে হবে না। কামাই করবার বেশ একটা অজুহাত হোল। বইপত্র রেখে দিয়ে জামা খুলে ফেলব, বাবা এসে বললেন, 'ও কি জামা খুলছিস যে।'

আমি বললাম, 'অনাথ যে নেই। স্কুলে দিয়ে আসবে কে ?'

বাবা বললেন, 'সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। আমি তো আছি।'

কি উপলক্ষে যেন তাঁর সেদিন কাছারি ছুটি। কিন্তু আমি ছুটি পেলাম না।

বই খাতা নিয়ে বিরস মুখে নৌকোয় উঠে বসলাম। বাবা বসলেন গলুইতে বৈঠা হাতে নিয়ে।

পাড়া-পড়শীদের মধ্যে কিষাণ কামলা অনেকেই ছিল। তাদের কাউকে ডাকলেই তারা আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসত। কিন্তু বাবা কাউকে ডাকলেন না, ডাকতেও দিলেন না।

তিনি নিজেই নৌকো বেয়ে আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিতে চললেন। গ্রামে তাঁর তখন প্রভাব-প্রতিপত্তি কম নয়। কিন্তু কে কি ভাববে না ভাববে তাঁর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

খালি গা কোমরে কাপড় বাঁধা। হাতে বৈঠা। ঠিক যেন মাঝিমাল্লাদের একজন। আর আমি বাবু হয়ে বই খাতা নিয়ে নৌকোর পাটাতনের ওপর বসেছি।

একটু আগের বিরসতা, স্কুলে যাওয়ার অনিচ্ছা আমার কোথায় চলে গেল।

আমি বসে বসে বাবাকে দেখতে লাগলাম। তিনি অনভ্যস্ত হাতে নৌকো বেয়ে চলেছেন।

আমি বাবু হয়ে বসে আছি।

আমাদের দুজনের মুখেই হাসি।

চাকলাদার

চাকলাদার ঠাকুরদা ঠিক কবে থেকে যে আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে ভালো মনে নেই। পাঁচ ছ' বছর বয়সেই বোধ হয় প্রথম তাঁকে দেখি। তার আগে দেখে থাকলেও ভুলে গেছি। বেশ লম্বা, শ্যাম বর্ণ, ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক কোত্থেকে যেন আমাদের বাড়িতে আসেন। বাবা আর তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে গল্পটল্প করেন। বাবা গান গাইলে তিনি বাঁয়া তবলা নিয়ে বসেন। তাস পাশা চলে। ভারি ফূর্তিবাজ মানুষ। বাবা কাকা তাঁকে বলেন, 'ঠাকুরমামা'। আমাদের বলতে শেখানো হয়েছে 'ঠাকুরদা'।

একদিন মা আর তাঁর মধ্যে একটু অদ্ভুত ভঙ্গিতে আলাপ চলছে লক্ষ্য করলাম।

মা ঘরের মধ্যে আধখানা ঘোমটা টেনে বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছেন আর ঠাকুরদা রয়েছেন বারান্দায়।

আমি চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওঁদের দু'জনের কথাবার্তা শুনছি।

ঠাকুরদা বললেন, 'আমি তাহলে আজ চলি মেজ বউমা।'

মা বললেন, 'আবার কবে আসবেন?'

ঠাকুরদা হেসে বললেন, 'কবে আসব তা তো ঠিক বলতে পারছিনে। আবার একদিন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চলে আসব। জানেন তো আমার ভবঘুরে স্বভাব।'

আমি বললাম, 'ঠাকুরদা, ভবঘুরে মানে কি।' তিনি আমাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'তুমি বুঝি সব শুনছ দাদু? ভবঘুরে মানে যার কোন কাজকর্ম নেই, সারা পৃথিবী টো টো ক'রে ঘুরে বেড়ায়।'

আমি সাগ্রহে বললাম, 'আমিও ভবঘুরে হব ঠাকুরদা।'

তিনি বললেন, 'ছিঃ দাদু, তুমি ভবঘুরে হবে কোন দুঃখে। তুমি মন দিয়ে লেখাপড়া শিখবে, বড় হবে, বিদ্বান হবে। তুমি কেন ভবঘুরে হতে যাবে।' তারপর মাকে উদ্দেশ্য

ক'রে ফের বললেন, এ,বার রওনা হয়ে পড়ি মেজ বউমা। এরপর বেলা একেবারে পড়ে যাবে। ভালো কথা, দুটো লবঙ্গ দিন তো।'

মা বললেন, 'লবঙ্গ কেন, পান নিন না। পান সেজে দিচ্ছি।'

ঠাকুরদা বললেন, 'না না, পানটান সব ছেড়ে দিয়েছি। তামাকটা ছাড়তে পারিনি ওটাই শুধু আছে।'

মা একটু হেসে বললেন, 'সব ছাড়বেন কেন।'

তারপর পিতলের ছোট্ট একখানি রেকাবিতে ক'রে কয়েকটি লবঙ্গ এলাচ এনে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠাকুরদাকে দাও।'

ঠাকুরদা রেকাবি থেকে সেগুলি তুলে নিয়ে পকেটে রাখলেন। একটি লবঙ্গ মুখে দিলেন, আর একটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'খাবে নাকি একটা?'

আমি বললাম, 'খেলে ভবঘুরে হতে পারব?'

তিনি হেসে বললেন, 'পারবে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা লবঙ্গ মুখে দিলাম। স্বাদটা ভালো লাগল না। বললাম, 'বিশ্রী। ঝাল।' ঠাকুরদা হেসে বললেন, 'দাদু, ভবঘুরে বৃত্তিতেও অমনি ঝাল আছে।'

মা এবার সামনে এগিয়ে এসে মাটিতে মাথা রেখে তাঁকে প্রণাম করলেন। কিন্তু তাঁর পা ছুঁলেন না।

ঠাকুরদাও তাঁকে স্পর্শ না ক'রেই আশীর্বাদ করলেন, 'তারা তারা। সুখী হন বউমা। স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকুন।'

তিনি চলে যাওয়ার পর আমি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মা, তুমি অমন আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা বললে কেন।'

মা বললেন, 'মামাশ্বশুরের সঙ্গে সামনা সামনি কথা বলতে নেই। আগে তো একেবারেই বলতাম না। এখন পুরোন হয়ে গেছি। আড়াল থেকে বলি।'

'প্রণাম করলে, পায়ের ধুলো নিলে না যে।'

মা হেসে বললেন, 'তোমার সব ব্যাপারে লক্ষ্য। মামাশ্বশুরকে ছুঁতে নেই। তিনিও ছুঁতে পারেন না। শুনেছি ভাগ্নেবউকে যদি জলে ডুবে যেতেও দেখেন, মামাশ্বশুর তার হাত ধরতে পারেন না, পা ধরতে পারেন না। শুধু চুল ধরে টেনে তুলতে পারেন।'

আমি বললাম, 'ব্যথা লাগে না?'

মা হেসে বললেন, 'কী জানি বাপু, ডুবে তো আর দেখিনি।'

বললাম, 'তোমার মামাশ্বশুরের নাম কি মা?'

মা হেসে বললেন, 'পাজী ছেলে। নাম নিতে নেই জানিসনে?'

'বানান ক'রে ক'রে বল না।'

মা বললেন, 'আমি কি লেখাপড়া জানি ? তোর বাবার কাছে শুনে নিস নামটা। কি তোর দিদিভাইয়ের কাছে। বংশে ওঁরা শুনেছি চাকলাদার।'

পরে জেনেছি ওটা বংশ নয়, নবাবী আমলের পদবী। বংশে যে কী ছিলেন ঘোষ বোস গুহ মিত্র না কি ধর কর দত্ত দাশ তা আর জানা হয়নি। নামটাও পরে শুনে নিয়েছিলাম—কার কাছ থেকে মনে নেই, অবিনাশ চন্দ্র।

তারপরও ঠাকুরদার কয়েকবার যাওয়া আসা চলল। তিনি যখনই আসেন তাঁর কাছ ছাড়া হতে আমার ইচ্ছা করে না। কোন না কোন অজুহাতে আমি স্কুল কামাই ক'রে ঠাকুরদার কাছে বসে থাকি। বসে বসে গল্প শুনি। আমার সেদিন মাথা ধরে, পেটে ব্যথা হয়।

দিদিভাই বলেন, 'চাকলাদার, পল্টু দেখি তোমার শিষ্য হয়ে উঠল।'

ঠাকুরদা বলেন, 'হোক না। দু' একজন শিষ্যসেবক তো থাকা চাই বেয়ান। কাজটা কি আপনাদের ওই ব্রজকিশোর গোঁসাইর একচেটিয়া ?'

দিদিভাই হেসে বলেন, 'তা মন্দ নয়। ব্যবসাটা তুমি জমাতে পারবে। কী মন্ত্র কানে দেবে তাই শুনি ?'

ঠাকুরদা জবাব দেন, 'বীজ মন্ত্র কি অমন সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলা যায় ? না কি বললে তার কোন মাহাত্ম্য থাকে ?'

এসব কথার অর্থ তখন বুঝতাম না। কিন্তু শুনতে ভালো লাগত। ঠাকুরদা আর দিদিভাইয়ের মধ্যে বয়সের তফাত অনেক। কিন্তু দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা ঠাট্টা-তামাশার। সেই রঙ্গ রসের সবখানি উপভোগ করবার বয়স তখন হয়নি। তবু যেটুকু বুঝতাম ভালো লাগত।

তারপর মা একদিন বললেন, 'জানিস তোর সেই চাকলাদার ঠাকুরদা এবার আমাদের বাড়িতে একেবারে পাকাপাকিভাবে আসছেন।'

খুশি হয়ে বললাম, 'তাই নাকি মা ? তাহলে তো খুব মজা হবে।'

মা হেসে বললেন, 'মজাই তো। তিনি এলে তোর পেটের অসুখ আর সারতে চাইবে না। স্কুলও একদম বন্ধ হয়ে যাবে।'

তারপর মালপত্র নিয়ে নৌকো ক'রে ঠাকুরদা সত্যিই এসে হাজির হলেন। খবর পেয়ে আমি কান্দু, বাচ্চু, সবাই নদীর ঘাটে ছুটে গেলাম। খুব বড় নৌকো নয়, দু'মাল্লার একখানি ঘাসি নৌকোয় ঠাকুরদা এসেছেন। মাঝিরা নৌকো থেকে জিনিসপত্রগুলি নামাতে লাগল। বাকস ডেকস হাঁড়িকুড়ির অবধি নেই। সেই সঙ্গে আরো দুজনকে

মা জেঠীমা দিদিভাই হাত ধরে নামালেন। একজন লালপেড়ে শাড়ি পরা একটি সুন্দরী বউ—আমাদের ঠানদি। আর একজন বছর পাঁচ-সাতের ছোট একটি মেয়ে সুন্দর পুতুলের মত দেখতে। অবাক কাণ্ড। যেন এক ভোজবাজি। ঠাকুরদার যে এত জিনিসপত্র আছে, বউ আছে, মেয়ে আছে সে কথা জানতাম না। শুনলেও খেয়াল করিনি। হাসি গল্পে রঙ্গে কৌতুকে তিনি একাই ছিলেন আমাদের কাছে একশ। তাঁর পরিবার পরিজনের কোন দরকার ছিল না।

ঠাকুরদার জিনিসপত্রগুলি এঘরে ওঘরে ছড়িয়ে রাখা হোল। ছোট বড় কাঠের বাক্স গোটা কয়েক, মাছ ধরা জাল দুতিনখানা, ছোট বড় খান কয়েক দা, একখানা রামদা, এইসবগুলিই তখন বেশি ক'রে চোখে পড়েছিল। আর ছিল দুটো বাক্স বোঝাই এক রাশ বই। আমার জীবনের প্রথম লাইব্রেরী।

ঠাকুরদা জিনিসপত্রগুলি নৌকো থেকে গুণে গুণে নামালেন। কোনটা খোয়া না যায়।

ঠানদি বাড়িতে এসে উদাস সুরে বললেন, 'কী হবে অত হিসাব ক'রে। কত জিনিস পাড়াপড়শীকে বিলিয়ে দিয়ে আসতে হোল। যত রাজ্যের জঞ্জাল এনে ঘর বোঝাই করেছিলেন। কোন দামি জিনিস তো চোখে পড়েনি।'

বউদি—আমার জ্যেঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী হেসে বললেন, 'একটি দামি জিনিস কিন্তু ঠাকুরদার ঠিকই চোখে পড়েছিল ঠানদি।'

ঠানদি বুঝতে না পেরে বললেন, 'কিসের কথা বলছ কুসুম ?'

'কেন, আপনি নিজে ? এমন সুন্দরী ঘর আলো করা বউখানি তো ঠিকই খুঁজে পেতে বের করেছিলেন ঠাকুরদা।'

ঠানদি বললেন, 'আর ঘর আলো করা—। ঘর বাড়িই রইল না তো আলো আর অন্ধকার।'

বউদি বললেন, 'কেন ঠানদি আমাদের বাড়ি কি আর আপনাদের বাড়ি নয় ?'

ঠানদি একথার জবাবে কিছু বলেছিলেন কিনা মনে নেই। প্রসঙ্গটা সেদিনকার মত চাপা পড়েছিল।

নিজেদের বাড়িঘর ঠাকুরদা কেন ছেড়ে এলেন প্রথম প্রথম হেঁয়ালির মত লাগত। কিছুদিন বাদে শুনেছিলাম ব্যাপারটা। দামোদরদি গ্রামের সেই বাড়িতে ঠাকুরদার সংসার ভালোভাবে চলত না। বাবা মাঝে মাঝে সাহায্য করতেন। কিন্তু এইভাবে মাঝে মাঝে নগদ টাকা তুলে দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন। তাঁরও তো দায়-দায়িত্ব কম নয়। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের তিনি কর্তা। প্রস্তাবটা ঠিক কোনপক্ষ থেকে এসেছিল

জানিনে। দামোদরদিতে ঠাকুরদার যে ভিটে বাড়ি আর তার লাগা দুএকটা বাগান টাগান আছে তা তিনি বাবার নামে লিখে দিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে এসেছিলেন। ব্যবস্থাটা ঠানদির স্বভাবতই পছন্দ হয়নি। যতদূর বুঝতে পেরেছি তাঁর মতের বিরুদ্ধেই এসব কাজ হয়েছিল। ঠাকুরদা নামেই ঠাকুরদা। বাবার চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড়। বাবারই বরং চুলটুল কিছু পেকেছে। দিদিভাই বলতেন, 'এটা বংশের ধাত। অল্প বয়সেই আমাদের চুল পাকে, দাঁত পড়ে। দাদারও তাই ছিল।'

কিন্তু বাবার চুল পাকলেও ঠাকুরদার চুল একগাছিও পাকেনি। দাঁত পড়েনি। শক্ত মজবুত দেহ। এমন স্বাস্থ্য এমন শরীর নিয়ে কেন যে মানুষটা নিজের ঘর-বাড়ি বিক্রী ক'রে অন্যের সংসারে এসে আশ্রয় নিল ঠানদি তা ভেবে পেতেন না। এই নিয়ে মুখে অভিযোগ তাঁর যতটা ছিল মনে অভিমান ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি।

আমাদের পুবের ঘরখানায় ঠাকুরদাকে সপরিবারে থাবতে দেওয়া হোল। সেই ঘরের আধখানা জুড়ে দুটি বড় বড় ধানের গোলা। আমরা বলতুম ডোল। বাঁশের ছাঁচ দিয়ে তৈরি সেই গোলায় ধান ভরতি থাকত। পাটের সময় পাট রাখবারও ব্যবস্থা ছিল সেই ঘরে। ঘরের মেঝেয় নিচু তক্তপোশ পেতে পাটগুলি ভাঁজ করে রাখা হত। সব পাট ঘরের মধ্যে ধরত না। উঁচু ক'রে বাঁধা চাঙের ব্যবস্থা ছিল। সেগুলি ছোট, বেয়ে চাঙে উঠতাম। সব ঘরেই এমনি চাঙের ব্যবস্থা ছিল। সেগুলি ছোট আকারের দোতলার কাজ করতও। তাতে মানুষ থাকত না, জিনিসপত্র রাখা যেত। বিশেষ ক'রে খাবার জিনিসের ওপর আমাদের লোভ ছিল। মুড়ি, গুড়, মোয়া, নাড়ু, আমের দিনে আম, আম ফুরোলে আমসত্ব। এসব হস্তগত করার জন্যে অসাধুতাই ছিল উৎকৃষ্ট পথ।

আমাদের এই আধা গুদাম পুবের ঘরে চাকলাদার ঠাকুরদার থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হোল। ঘরের দক্ষিণ দিকে তক্তপোশ পাতা হোল একখানা। চাকলাদার নিজেই ঘরের বেড়ায় তক্তা দিয়ে তাক তৈরি ক'রে নিলেন। কাঠের একটি বাকসে তাঁর ছোট করাত, হাতুড়ি, বাটালি সব আছে। ছুতোরের কাজ তিনি জানেন।

দিদিভাই তা দেখে বললেন, 'চাকলাদার, তুমি দেখছি ভাই বিশ্বকর্মা। জেলেদের মত তোমার মাছ ধরার জাল আছে, বঁড়শী আছে, আবার ছুতোরের বাকসও একটি সঙ্গে রেখেছ। এবার পরামানিকের ছোট হাতবাকসটি কোথায় রাখলে? ক্ষুর কাঁচি নরুন টরুন সব বার ক'রে ফেল।'

চাকলাদার বললেন, 'বেয়ান ওসব যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছি। আপনার মুখে যখন গোঁফদাড়ি গজাবে সেগুলি ঠিক বের ক'রে আনব, মোটেই ভাববেন না।'

দিদিভাই হেসে বললেন, 'ওই গোঁফদাড়িটুকুই যা বাকি। নইলে পুরুষের সব কাজই তো আমি করি।'

চাকলাদার বললেন, 'করেনই তো। সেইজন্যেই তো পাড়াশুদ্ধ লোক একডালে বলে, 'ধন্য পুরুষ মহিন্দিরের পিসী।'

ঘরামির কাজও খুব ভালো জানেন ঠাকুরদা। ছোট বড় তাঁর দুতিনখানি দা। সেগুলি দিয়ে তিনি কাজকর্ম করেন। একটিতেও মরচে পড়বার জো নেই। বাঁশের বাখারি তৈরি করেন। চমৎকার নিপুণ তাঁর হাতের কাজ। পাড়ার নামকরা গোপাল ঘরামিও তাঁর কাছে হার মানে। বর্ষার সময় মাছ ধরার সরঞ্জাম দোয়ার বড়নে তৈরি করেন। সুপুরি গাছ কেটে কেটে খোল তৈরি করতেন। নদীতে ঘাটের কাছে সেগুলি পেতে রাখতেন। তাতে বান মাছ পড়ত। ঠাকুরদা নিজেই স্নান করার সময় সেই মাছ তুলতেন। তাঁর দাগুলি সব সময় ঝক ঝক তক তক করে। বালি কাচায় ধার দেন। মাটির নতুন হাঁড়ি উপুড় ক'রে তাতে ধার দেন।

রামদাখানা তাঁর পায়ের কাছে বেড়ার দিকে ঝুলনো থাকে। সেই দাখানাও খুব ধারালো।

আমরা বলি, 'ঠাকুরদা, ওই রামদা দিয়ে আপনি পাঁঠা বলি দিয়েছেন?'

চাকলাদার বলেন, 'দিয়েছি বইকি।'

আমি বলি, 'আবার দেবেন?'

তিনি বললেন, 'এখন আর কোথায় পাঁঠা? তোমরা তো সব বৈরাগী বোষ্টম। তোমাদের বাড়িতে তো আর বলি হয় না।'

বলি হয় না, তবে বাবা আর মা ছাড়া বলির প্রসাদ আমরা সবাই খাই। কবে দুর্গা পূজা কালীপূজা হবে, রায়বাড়িতে পাঁঠা বলি পড়বে তার জন্যে সারা বছর হা পিত্যেশ ক'রে বসে থাকি।

ঠাকুরদা বললেন, 'পাঁঠা মোষ যথেষ্ট কেটেছি। আর ইচ্ছে নেই। এখন শুধু আড়াই প্যাঁচে একটি রাঙা মুরগী জবাই করবার সাধ আছে।'

ঠানদি পাশে বসে জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটছিলেন, ঠাকুরদা আড়চোখে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলেন।

ঠানদি বললেন, 'তাহলে তো বেঁচে যাই রক্ষা পাই। তাহলে তো তুমি আমার পরম বন্ধুর কাজ কর। জন্ম জন্ম যেন আইবুড়ো হয়ে থাকি, তবু তোমার মত স্বামীর হাতে—'

আমি ভাবতাম এমন গুণবান পুরুষ ঠাকুরদা, এমন রসিক মানুষ তবু ঠানদির কেন তাঁকে পছন্দ হয় না। আবার ঠানদিরও তো রূপ কম নয়। অন্য সবাইর সঙ্গে মিষ্টি ক'রে

কথা বলেন, হাসলে কত সুন্দর দেখায় ওঁকে। কিন্তু দুজনের মধ্যে বনিবনাও নেই। ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। পূবের ঘরের দোর জানালা বন্ধ ক'রে দুজনে যখন ঝগড়া করতেন আমার ভয় হত, সত্যিই রামদার কোপ লাগাবেন না তো ঠাকুরদা।

একবার অবশ্য আমিই ওঁদের ঝগড়ার কারণ হয়েছিলাম। ঠানদি লুকিয়ে লুকিয়ে তামাকের মিশি দিতেন দাঁতে। ছোট ছোট পিতলের কৌটোয় তামাকের গুঁড়ো ভরা থাকত। বাড়ির গৃহিণীরা সেই মিশির কৌটো ট্যাঁকে ক'রে ঘুরে বেড়াতেন। যাঁদের মধ্যে ভাব আছে সখিত্ব আছে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে পানদোক্তার মত এই মিশির বিনিময়ও চলত।

ঠাকুরদা এই মিশি লাগানোটা একদম সইতে পারতেন না। বলতেন, 'বড্ড বিশ্রী দেখায়। অমন মুক্তার মত দাঁতগুলি কালো কুচকুচে ক'রে মেয়েরা যে কী সুখ পায় তারাই জানে।'

দিদিভাই বলতেন, 'তোমরা যে তামাক খাও তাতে দোষ হয় না চাকলাদার।'

ঠাকুরদা বলতেন, 'ও একরকমের নেশা।'

'এও তাই।'

ঠাকুরদা বলতেন, 'কিন্তু আমাদের তো ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়, কিন্তু আপনাদের যে গুঁড়ো হয়ে দাঁতের মাঝে লেগে থোকে। তার চেয়ে এক কাজ করুন না। আপনারাও হুঁকো টানুন।'

দিদিভাই বললেন, 'তোমাদের ওই সস্তা হুঁকো টানতে আমার বয়ে গেছে। রুপো দিয়ে গড়গড়া বাঁধিয়ে দাও, অম্বুরি তামাক টামাক সেজে দাও···দেখবে টানতে পারি কি না পারি।'

ঠাকুরদা ঠানদিকে ডেকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, 'খবরদার তুমি কিন্তু দাঁতে মিশিটিশি দিয়ো না।'

ঠানদি বললেন, 'কেন এবাড়ির সবাই তো দেয়। বেয়ান দেয়—'

ঠাকুরদা বললেন, 'তাঁর তো আর দাঁতের বালাই নেই। দু-পাটি দাঁতের সব কটিই খুইয়েছেন। তিনি ভালো মন্দের বাইরে। মিশিগুলি তিনি পানের সঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে ফেলেন। তোমারও যখন ওই দশা হবে তুমি খেয়ো। আমি কিচ্ছু বলতে আসব না।'

ঠানদি বললেন, 'কেন তোমার ভাগ্নে বউরাও তো মিশি দেয়। বড় বউমা দেন, মেজো বউমা দেন।'

ঠাকুরদা বললেন, 'তাঁদের দাঁত তো আমি আর দেখতে পাইনে। ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাখেন।'

ঠানদি বললেন, 'বেশ তো আমিও তোমার সামনে ঘোমটা দিয়ে থাকব। আমার মুখের দিকে তোমার তাকাতে হবে না।'

ঠাকুরদা বললেন, 'ওসব দেবে না। আমি তোমাকে বারণ ক'রে দিচ্ছি।'

আমি বললাম, 'সত্যি আমারও ভারি খারাপ লাগে। মিশি দেবেন না ঠানদি।'

ঠানদি হেসে আমার গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'বুড়ো আর গুঁড়ো দুই-ই সমান। তোরও বুঝি তামাকের গুঁড়োর ওপর খুব রাগ?'

আমি বললাম, 'ঘেন্না করে।'

ঠানদি হেসে বললেন, 'ঘেন্নার মজা দেখাব আমি। তোর যখন বউ আসবে তাকে দাঁতে মিশি দিতে শেখাব। আমার যেটুকু সোনাদানা এখনো আছে তাই ভেঙে তাকে একটি সোনার মিশির কৌটো গড়িয়ে দেব, কেমন?'

দূর ভবিষ্যতে ভাবী স্ত্রীর মিশিরঞ্জিত দন্তপংক্তির কল্পনা আমার মোটেই মনোহর মনে হোল না। বললাম, ধ্যেৎ। ঠাকুরদা নিষেধ করবার পর ঠানদি আর বেশি মিশিটিশি দিতেন না। অল্প-স্বল্প যেটুকু দিতেন খুব লুকিয়ে লুকিয়ে। দিয়ে খানিকবাদে আবার মুখ ধুয়ে ফেলতেন।

ঠাকুরদা জিজ্ঞেস করতেন, 'মিশিটিশি দাও নাকি এখনও।'

ঠানদি বলতেন, 'না না।'

কিন্তু আমি সেদিন বলে দিলাম ব্যাপারটা। 'ঠাকুরদা, ঠানদি এখনো মিশি দেন। লুকিয়ে লুকিয়ে দেন। এই তো কালও দিয়েছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে কি একটা অছিলায় ঠাকুরদা ঠানদিকে পূবের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ ধরে দুজনের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলল।

শেষে ঠানদি বললেন, 'দিয়েছি তো বেশ করেছি। কত সোনাদানা এনে পরাও কত সন্দেশ রসগোল্লা এনে খাওয়াও। কত ক্ষমতা তোমার। এত ক্ষমতা বলেই তো ভিটেমাটি সব খুইয়ে ভাগ্নের ভাতে এসে আছ।'

'আছি তো বেশ করেছি।'

এবার আর কথা নয়, ঠানদিকে দু-চার ঘা লাগিয়ে দিলেন ঠাকুরদা।

আমি ভয়ে বাড়ি থেকে তখনকার মত পালিয়ে গেলাম। এমন যে লঙ্কাকাণ্ড হবে কে জানত!

ফিরে আসবার পর মা আমকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'খবরদার কক্ষনো অমন কোটনামি করবিনে। একজনের কথা আর একজনের কাছে লাগানো ভারি খারাপ।'

দিন কয়েক ধরে ঠাকুরদা ঠানদি কেউ আমার সঙ্গে কথা বললেন না। ঠানদি বলবেন

না তা আমি জানতাম। কিন্তু ঠাকুরদাও যে আমাকে বেদলী ক'রে দেবেন তা ভাবতে পারিনি। খুবই দুঃখ হয়েছিল মনে।

ঠাকুরদা বাড়ির সব কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। জমিতে কিষাণ কামলারা কাজ করত, তিনি খবরদারি করতেন। হাট-বাজার করতেন। কোনদিন চাকর সঙ্গে থাকত, কোনদিন থাকত না। যখন আমাদের বাড়িতে গরু ছিল তার পরিচর্যা করতেন। মাঠে গিয়ে ঘাস কাটতেও তাঁকে দু-একদিন দেখেছি।

ঠাকুরদা সংসারের সব কাজ জানেন। কিন্তু এই দশকর্মা মানুষটি তাঁর কোন কাজকেই জীবিকার প্রয়োজনে লাগাতে পারলেন না। না কি চেষ্টা করলেন না।

বাবা একদিন আমাদের প্রতিবেশী এবং পরিবারের বন্ধু দিগিনকাকার সঙ্গে ওঁর সম্বন্ধে কথা বলেছিলেন, 'জানো দিগিন, মানুষটা চিরজীবন একভাবেই কাটাল। অমন চালাক চতুর মানুষ। বুদ্ধি তোমার আমার চেয়ে কম নয়। বরং বেশি। কিন্তু হলে হবে কি, কিছুই কোন কাজে লাগল না। ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছেন। লেখাপড়া যেটুকু জানেন ভালোই জানেন। অমন সুন্দর হাতের লেখা। আমি একদিন ওঁকে বলেছিলাম, 'ঠাকুরমামা, চলুন ভাঙ্গার রেজিস্ট্রি অফিসে আপনার কাজ ঠিক ক'রে দিই। দলিলটলিল লিখবেন। কতজনে এই ক'রে সংসার চালাচ্ছে, বাড়িঘর করছে, কিন্তু তিনি বললেন, 'দূর, ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

দিগিনকাকা হেসে বললেন, 'ঠাকুরমামা কাজের বাইরে চলে গেছেন মেজদা।'

বাবা বললেন, 'কবেই বা উনি কাজের ভিতরে ছিলেন? পৈতৃক বিষয়-আশয় যা ছিল সবই তো নষ্ট করেছেন। ভিটেঘরটা দু-চার কাঠা যা আছে তাও যেত কিন্তু আমিই নিজের নামে লিখিয়ে নিয়ে কোনরকমে রক্ষা করেছি। লোকের ধারণা খুব মাতুল সম্পত্তি পেয়েছি আমি।'

দিগিনকাকা বলতেন, 'না না মেজদা, সে কথা কেউ ভাবে না। যারা ভিতরের খবর জানে—'

বাবা বললেন, 'কলকাতার অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। কাণ্ড-কারখানা জীবনে কম করেননি। বিয়ে করবেন না পণ ক'রে বসেছিলেন। বলে কয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে আমি ওঁকে রাজি করালাম। গরীবের ঘরের একটি সুন্দরী মেয়েকে পছন্দ ক'রে আনলাম। ভাবলাম এতে যদি ঘরে মন বসে, মতিগতি ফেরে। কিন্তু মজা দেখ দিগিন, শেষ পর্যন্ত দায় এসে আমার ঘাড়েই পড়ল।'

আমি সব শুনছি দেখে বাবা ধমক দিলেন, 'যা এখান থেকে। সব হাঁ ক'রে গিলছিস! পড়াশোনা নেই তোর?'

ঠাকুরদার নিন্দা করলে আমার খুব লাগত। সেই সময় আমি চাকলাদার ঠাকুরদাকে বাবার চেয়েও যেন বেশি ভালোবাসতাম। সংসারে যারা বেমানান অকেজো অসফল তাদের মধ্যেই যেন যত রস আর রহস্য। কাজের মানুষ নিরেট ইটের মত। যদিও তাঁরাই জগৎ সংসারের ভিত্তি। আমি দূর থেকে তাঁদের শ্রদ্ধা করেছি। কিন্তু কাছে যেতে পারিনি, বন্ধুত্ব করতে পারিনি।

ঠাকুরদা অবশ্য আমাকে আরো আনাড়ী আরো অকর্মণ্য মনে করতেন। মনে করার কথাই বা কেন বলি। ওঁদের বিচার নির্ভুল ছিল।

ঠাকুরদা বলতেন, 'তুমি আমার নেছয়াদাদা। আমার দশের ঘরের নামতা। তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। খবরদার দাদা, সংসারের ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা কোরো না। বাইরে বাইরে থেকো। ভিতরে ঢুকতে গেলেই মরবে। আমার মত দশা হবে।'

কারো বিয়েটিয়ে হচ্ছে শুনলে বলতেন, 'এই-রে কার যেন আবার কপাল পুড়ল।'

ঠাকুরদা যখন বাড়ির কাজকর্ম করতেন, আমাকে ডাকতেন না, সাহায্যের জন্যে কানু, বাঙ্কুকে ডাকতেন। কিন্তু আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর সেই বইয়ের বাকসের চাবি। সেখানেই আমি প্রথম পেয়েছিলাম মলাটছেঁড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, মাইকেল গ্রন্থাবলী, নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ, অমরেন্দ্র গ্রন্থাবলী, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। আবার সেই সঙ্গে তবলা তরঙ্গিনী, আতস বাজি প্রস্তুত শিক্ষা, হস্তরেখা পরিচয়, কাকবিদ্যা, কোকশাস্ত্র, যাদু বিদ্যা প্রবেশ। আরো নানা বিষয়ের নানা বই ছিল। কোনটা আস্ত কোনটা ছেঁড়াখোড়া।

আমি বেছে বেছে পড়তাম। ঠাকুরদার মত আমার কৌতূহল অত ব্যাপক ছিল না। সব কিছু হৃদয়ঙ্গম করবার সামর্থ্যও ছিল না।

তবে একদিন সশব্দে বিদ্যাসুন্দর পড়তে গিয়ে জেঠীমার কাছে ধমক খেয়েছিলাম মনে আছে।

তিনি আমার হাত থেকে বইখানা কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'এই বয়সেই বিদ্যাসুন্দর! তুমি তো ইঁচড়ে পেকে গেলে বাবা। নাকি ঠাকুরমামা কিলিয়ে কাঁঠাল পাকালেন?'

ঠাকুরদা বারবাড়ির উঠানে বসে বসে বাঁশের বাখারি তৈরি করতেন, কি দায়ের আছাড়ি লাগাতেন, আমি তাঁর কাছে বসে বলতাম, 'ঠাকুরদা, মেঘনাদ বধ থেকে পড়ুন।'

তিনি গড়গড় ক'রে পড়ে যেতেন। তাঁর মুখস্থ করবার শক্তি দেখে অবাক লাগত।

রাম রাবণের যুদ্ধের পর ক্লাইভ আর সিরাজউদ্দৌলার যুদ্ধের কাহিনীর ফরমায়েশ করতাম।

সেই বেলা দুপুরে ঠাকুরদা আবৃত্তি শুরু করতেন, 'দ্বিতীয় প্রহর নিশি নীরব অবনী।'

দিদিভাই এসে তাড়া দিয়ে বলতেন, 'চাকলাদার আর কবিয়ালি করতে হবে না। যাও এবার নাইতে যাও। বউরা সবাই না খেয়ে দেয়ে তোমার জন্যে বসে আছে।'

শুধু আবৃত্তি নয়, অনুরোধ করলে গান গেয়েও শোনাতেন ঠাকুরদা। কবিগানই বেশি গাইতেন। ধুয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিয়ালদের মত মাঝে মাঝে পদ বানাতেনও। ঠাকুরদার হাত চলত আর গান চলত,

'মন পাগলারে আমার
বিরজা নদীর কূলে বসে
না-জানো সাঁতার।
ভাই বন্ধু দারা সুত কেউ তো কারো নয়
ও মন কেউ তো কারো নয়
দুই চার দিন সাথের সাথী
শুধু পথের পরিচয়।'

ঠাকুরদা বড় বড ঘুড়ি তৈরি ক'রে ঘুড়ি ওড়াতেন। একবার সাপ ঘুড়ি তৈরি করেছিলেন, তার লেজটা মাটিতে মাথাটা আকাশে। শেষ পর্যন্ত লেজটাও আকাশে উঠল। মাঠের সেই প্রদর্শনীতে সারা গাঁয়ের লোক জড হয়েছিল।

নানারকম বাজি তৈরি করতেও ভালোবাসতেন তিনি। বোম, তুবড়ী, চরকি বাজি, ফানুষ।

গাঁয়ের আতসকর মঙ্গল ধূপী তাঁর কাছে এসে শিক্ষা নিত। জাত ব্যবসা জামাকাপড় ধোয়ার কাজ সে বড় একটা করত না। ওসব তার ভাইয়েরা দেখত। বোমা ফেটে মঙ্গল ধূপীর কয়েকটা আঙুল উডে গিয়েছিল। তবু বাজির নেশা যায় নি।

মঙ্গল ধূপী এসে ঠাকুরদার জন্যে তামাক সাজত। তারপর সবিনয়ে বলত, 'চাকলাদার মশাই দশ বছর আপনার পায়ের কাছে বসে শিখলেও আপনার যোগ্য হতে পারব না। আপনার মত ওস্তাদ এই তল্লাটে আর নেই।'

ঠাকুরদার মুখে হাসি, কিন্তু গলার স্বরে ঔদাস্য ধরা পড়ত, 'এসব করে কীই বা হোল মঙ্গল। বাজির আগুনে তোমার তিনটি আঙুল গেছে। আর আমি পুরো একটা জীবনকেই পুডিয়ে শেষ করলাম।'

অমন রসিক স্ফূর্তিবাজ মানুষের মুখে এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে আমার খুব খারাপ লাগত। মনে হত ভিতরে ভিতরে কিসের যেন একটা দুঃখ ওঁর মনে লেগে রয়েছে।

আমি ভাবতাম হয়তো বাবাই এর জন্যে দায়ী। কাজের কথা বলে বলে ওঁর মেজাজটা খারাপ ক'রে দিয়েছেন। উনি যে কত কাজ জানেন, কতরকম ওঁর গুণ-যোগ্যতা তা কি বাবার চোখে পড়ে না? দলিল লেখাটাই সবচেয়ে বড় কাজ হোল!

নানারকম সাংসারিক সমস্যা জট পাকাতে লাগল। তখন এর কারণ ভালো ক'রে বুঝতে পারতাম না। পরে বুঝেছিলাম। একেই তো একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার। ঠাকুরদারা আসায় তা বৃহত্তর জটিলতর হয়েছিল।

ঠানদির সঙ্গে কাজকর্ম নিয়ে মা কি জেঠীমার খিটিমিটি বাঁধলে আমি ঠানদির পক্ষ নিতাম। ঠাকুরদাকে কেউ কিছু বললে আমি তাঁর হয়ে ওকালতি করতাম।

লক্ষ্য করতাম ঠাকুরদা প্রথম যখন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন তখন যেমন আদর আপ্যায়ন চলত এখন আর তেমনি হয় না। এখন আর তিনি তো অতিথি কুটুম্ব নন, এখন এ বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা।

বাবা একদিন বললেন, 'ঠাকুরমামা কী যে আপনার স্বভাব, গাঁয়ের পাঁচজন বামুন কায়েত ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনাকে তো মিশতে দেখিনে। যতসব ধোপা নাপিতের সঙ্গে আপনার আড্ডা। ওদের সঙ্গে যদি ওইভাবে মেশেন তাহলে কি মান থাকে?'

ঠাকুরদা বললেন, 'আমি তো তোমার মত মানী লোক নই মাহিন্দির। আমাকে ওর ডাকে খোঁজে ভালোবাসে তাই ওদের কাছে যাই। তাতে দোষ কী?'

এর মধ্যে কাণ্ড এক ঘটল। সুবর্ণ পিসীর বিয়ে হয়ে গেল। কতই বা তখন ওর বয়স। এগার বার বছরের বেশি হবে না। ঠাকুরদাই গরজ ক'রে ওর সম্বন্ধ আনলেন। কামারদিয়ার সতীশ নাগ। লেখাপড়া তেমন জানে না। কিন্তু দেখতে শুনতে মন্দ নয়। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ বয়স। স্বাস্থ্য ভালো। চাকরিবাকরি কিছু করে না। গাঁয়ে কিছু ক্ষেতখামার আছে। তাই দেখাশোনা করে। বিধবা মা আছেন। সংসারে আর কেউ নেই। নিজেই বাড়ির কর্তা।

সুবর্ণ তার বাবার কাছে বড় একটা ঘেঁষত না। ঠাকুরদাও বোধ হয় তেমন চাইতেন না। নিজের পুতুল খেলা নিয়েই সুবর্ণের দিন কাটত। মাঝে মাঝে অন্দর মহলে এর ওরা কাজের যোগান দিত। ঠানদির তাগিদে কখনো কখনো বই নিয়ে আসত পড়া দেখাবার জন্যে। কিন্তু পড়াশুনোয় তেমন মন ছিল না। খেলা ঘরে সংসার পাতাই ছিল তার নেশা। পুতুলের বিয়ে দিতে দিতে সুবর্ণ শুনল তার নিজেরই বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

বাবা বললেন, 'মেয়ের বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ঠাকুরমামা? ওর কি বিয়ের বয়স হয়েছে? সুন্দরী মেয়ে। বড় হোক। এর চেয়েও কত ভালো সম্বন্ধ ওর আসবে।'

ঠাকুরদা বললেন, 'না মাহিন্দির, তোমার যত ভার কমে ততই ভালো। আমিও তাড়াতাড়ি দায়মুক্ত হতে চাই। তুমিই আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছ। এত বন্ধনের তো কোন দরকার ছিল না।'

বাবা ওঁর আড়ালে একদিন হেসে বললেন, 'ঠাকুরমামা এদিকে খুব বন্ধন বন্ধন করেন। ওদিকে নিজের জামা-কাপড় জুতোর ওপর কী যত্ন দেখিছিস? এখনো কী টেরির বাহার!'

আমরা হেসে সায় দিই। তা ঠিক। নিজের জিনিসপত্রের ব্যাপারে ঠাকুরদার পারিপাট্যের অন্ত নেই। জামা কাপড় গেঞ্জি গামছা সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। জুতোজোড়া নিত্য ব্রাশ করেন। বিছানা পাতায়, মশারি খাটানোয় একটু এদিক ওদিক হলে ঠানদি বকুনি খেয়ে মরেন।

একদিন ঠানদিকে দিয়ে তিনি তিন তিনবার মশারি টানালেন। বারবার মাথা নাড়েন আর বলেন, 'জীবনভর তালিম দিলাম তবু শিখতে পারলে না। আমি কি বউমার ঘোড়ামুখো স্বামী যে আমার জন্যে অমন উটমুখো মশারি টানাবে?'

একদিন দেখি ঠাকুরদার সাদা পাঞ্জাবিটায় তিলে পড়ে গেছে। অসতর্কতার জন্যেই হয়তো পড়েছে। বর্ষার দিনে ভিজে জামা রোদ পায়নি।

আমি বললাম, 'ঠাকুরদা দেখুন কাণ্ড। আপনার মত মানুষের জামাতেও তিলে পড়ল।'

ঠাকুরদা নিজেই মহাদুঃখে মগ্ন হয়েছিলেন। আমার কথায় চোখ তুলে তাকালেন, তারপর ম্লান হেসে বললেন, 'আর ভাই জামা তো জামা আমি মানুষটাতেই এখন তিলে পড়ে গেছি। কারো কারো চোখে তিলে খচ্চর।'

নিজের ব্যবহারের জিনিসপত্র কাউকে ছুঁতে দিতেন না ঠাকুরদা। বলতেন, 'নষ্ট ক'রে ফেলবে।' নিজের দা ছুরি, ছাতা লাঠি সব সাবধান ক'রে তুলে রাখতেন।

একবার যত্ন ক'রে একখানা বাঁশের লাঠি তৈরি করলেন। বেড়াবার ছড়ি।

তপাদার মশাই ছিলেন পেশাদার ঘটক। আমাদের বাড়িতে অবশ্য তখন ঘটকালির কোন ব্যাপার ছিল না। যাতায়াতের পথে অমনিই আসতেন। রাত্রে থাকতেন খেতেন। পরদিন ভোরে উঠে চলে যেতেন।

ঠাকুরদার সেই লাঠিখানা দেখে তাঁর খুব ভালো লেগে গেল। তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'চাকলাদার মশাই, আপনার হাতের কাজ তো ভারি চমৎকার। আমার লাঠি-খানা হারিয়ে গেছে। রাস্তায় চলিফিরি। কোন কোন দিন দিনে দশ পনের মাইলও হেঁটে পাড়ি দিই। একখানা লাঠি হলে বড় ভালো হয়। দেবেন আমাকে আপনার লাঠিখানা?'

ঠাকুরদা প্রসন্ন তপাদারের মুখের দিকে একটুকাল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন, তারপর হেসে বললেন, 'তপাদার মশাই অত লোভ কি ভালো? আজ চোখে সুন্দর লাগছে বলে আমার লাঠিগাছটি চাইলেন। কাল এসে বললেন দিন আপনার ছাতাটি। পরশু এসে বললেন আপনার পরিবারের মুখটি তো বড্ড মিষ্টি, দিন আমাকে।'

প্রসন্ন তপাদার তখন বেশ বুড়ো। মাথা ভরতি টাক। মুখে একটিও দাঁত নেই।

তোবড়ানো গাল। কিন্তু লজ্জায় ভদ্রলোকের মুখখানা ছেলেমানুষের মত লাল হয়ে উঠল। তিনি শুধু বলতে পারলেন, 'রাম রাম।'

জিনিসপত্রের ওপর মায়া-মমতা খুবই বেশি ছিল ঠাকুরদার। তাই বলে যে মনে বৈরাগ্যের সুর ছিল না তাই বা বলি কী করে! একই মানুষ সকালে সম্ভোগী সন্ধ্যায় বৈরাগী। একটা মানুষের মধ্যে যদি শুধু একটা মানুষই বাস করত তাহলে আর কথা ছিল কি।

সুবর্ণের বিয়েটা সাধারণভাবেই হোল। আড়ম্বর অনুষ্ঠান বিশেষ কিছু হোল না। বাবার যেটুকু যা করবার ইচ্ছা ছিল ঠাকুরদা তাতে বাধা দিলেন। বললেন, 'না, মাহিন্দির, ওসব থাক।'

আনন্দ আহ্লাদ যেটুকু হয়েছিল সেটুকু ভেসে গেল যাওয়ার সময় সুবর্ণের চোখের জলে। ঘাটে এসে নৌকো লেগেছে। সেই নৌকোয় ক'রে সতীশ পিসে নতুন বউকে বাড়ি নিয়ে যাবে। কিন্তু সুবর্ণ কিছুতেই নৌকোয় উঠবে না। শ্বশুর বাড়িতেও যাবে না। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে এই কান্না। তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সবাই কাঁদছে। অপরাধীর মত এক কোণে বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে আছে সতীশ পিসে। শেষে পর্যন্ত ঠাকুরদাই মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে নৌকোয় উঠলেন।

তারপর যতবার সুবর্ণকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হত ততবারই সে এমনি ক'রে কাঁদত। স্বামীকে যেন তার যমের ভয়। এত কিসের যে ভয় বুঝতে পারতাম না। সতীশ পিসে ওকে তো বেশ আদর করেন, হেসে হেসে কথা বলেন। কিন্তু সুবর্ণ কেন ওঁর ধারে কাছে ঘেঁষতে চায় না?

দু-তিন বছর বাদে অবশ্য সুবর্ণের এই ভয় কেটে গিয়েছিল। তখন স্বামী এলে সে যত্ন ক'রে সাজত, আলতা পরত, সিঁদুর পরত। সেই সিঁদুরের খানিকটা তার আবার নাকেও এসে পড়ত। ইচ্ছা ক'রে নাকে লাগাত কিনা কে জানে। সিঁথির সিঁদুর নাকে লাগলে নাকি মেয়েরা স্বামী সোহাগিনী হয়।

শুনেছি ঠাকুরদার যে দু-তিনটে ভিটেঘাটা বাবা নিয়েছিলেন সুবর্ণের বিয়ের পর ওদের নামেই আবার তা লিখে দিয়েছিলেন। ঠাকুরদা চাননি, কিন্তু বাবা নিজেই এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

তারপর কী যে হোল, ঠাকুরদা একদিন বললেন, 'মাহিন্দির, এবার আমাকে বিদায় দাও। এবার আমি যাই।'

বাবা বাধা দিলেন, 'সে কি ঠাকুরমামা, যাবেন কেন। আমার কাছেই থাকুন। এক সংসারে থাকতে গেলে দু-এক সময় ঝগড়া-ঝাঁটি হয়, খিটিমিটি লাগে—'

ঠাকুরদা বললেন, 'আরে দূর দূর। তাকি আমি বুঝি না। আমার মন আর এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে চাইছে না। মাহিন্দির, যাই একটু ঘুরে টুরে আসি।'

'আর মামী?'

ঠাকুরদা হেসে বললেন, 'সেও চলুক আমার সঙ্গে। তারও তো কোথাও আর পা বাড়ানো হয়নি।'

আমাদের কারো অনুরোধ উপরোধই শুনলেন না। ঠাকুরদা যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। জিনিসপত্রের এপর এত মায়া। কিন্তু সেসব কিছুই সঙ্গে নিলেন না। কিছু কিছু জিনিস বিলিয়ে দিলেন। বাকি সব আমাদের বাড়িতে রেখে গেলেন।

কোত্থেকে একখানা ছড়ি খুঁজে পেতে এনে আমার হাতে দিলেন।

বললাম, 'এটা কি ঠাকুরদা?'

ঠাকুরদা হেসে বললেন, 'সেই যে তপাদার মশাই চেয়েছিলেন সেই ছড়ি। এর মধ্যে যদি তাঁর দফা রফা না হয়ে গিয়ে থাকে তাঁকে দিয়ো।'

তপাদার মশাই কিন্তু সেই ছড়ি চাইতে আর কোনদিন আসেন নি।

কাশীতে গিয়ে ঠাকুরদা প্রথমে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিলেন। প্রথম প্রথম বাবাকে চিঠিপত্র লিখতেন। তাতে আমাদের সবাইর কথাই থাকত। তারপর চিঠি লেখালেখি প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। একখানা চিঠিতে ঠানদির মৃত্যুর খবর জানিয়েছিলেন।

একথা শুনে দিদিভাই বলেছিলেন, 'সুরবালার ভাগ্য ভালো। জায়গা মত তীর্থস্থানে গিয়ে মরেছে। আমাদের কি আর সেই সৌভাগ্য হবে?'

ঠাকুরদা কিন্তু তীর্থস্থানে মরেন নি। তিনি ঘুরে ঘুরে তাঁর সেই স্বগ্রাম দামোদরদিতেই ফিরে এসেছিলেন। ভিটেয় বোধ হয় তখনও একখানা ঘর কোনরকমে দাঁড়িয়েছিল। ঠাকুরদা সেখানেই শেষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁর দেখাশোনার জন্যে পাড়াপড়শীদের অভাব ছিল না।

তাঁদেরই একজনের কাছ থেকে আমরা তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেলাম। মাত্র তিন চার দিনের জ্বরে ভুগে মারা গেছেন।

জ্বরটা নিশ্চয়ই খারাপ ধরনের ছিল। পোষ্টকার্ডখানা হাতে নিয়ে বাবা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'ঠাকুরমামা সময় মত একটা খবরও দিলেন না। দিলে শেষ দেখাটা হত। সেবাশুশ্রূষা করতে পারতাম। শেষের দিকে বোধ হয় মায়া-মমতাটা কমে গিয়েছিল, নাকি ইচ্ছা ক'রেই আর জড়াতে চাননি।'

একটু থেমে তারপর বললেন, 'মামা হলে কি হবে, উনি ছিলেন আমার বন্ধুর মত। কলকাতায় কতবার থিয়েটার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এক সঙ্গে কত গান-বাজনা করেছি। তবলায় হাত খুব পরিষ্কার ছিল।'

আবার চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে এল।